শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

গৃহস্থ

মাসিক পত্র

ষষ্ঠ খণ্ড

ছি তীয় ভাগ

(সন ১৩২২ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২২ সালের আশ্বিন পর্য্যন্ত)

ইণ্ডিয়া প্রেস—২৭ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী

১। আলোচনা

অকাল মৃত্যু
অর্থাভাব মোচনের উপায়
কৃষি প্রচেষ্টা
আত্মসম্মান ও শিক্ষা
আমেরিকার কাছে আমার নিবেদন
আমেরিকায় প্রচারের আবশ্যকতা
ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধে দুই একটি কথা
এক পয়সা মূল্য
একতাবদ্ধ পরিবার
একতাবদ্ধ চেষ্টা
এসোসিয়েশন আশ্রম
কার্যবিভাগ-প্রণালী
কৃষি শিক্ষা
ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
দার্জিলিঙ্গ শিক্ষা সমিতি
দেশের সঙ্গে সাধারণিক প্রাণগত সম্বন্ধ বা নিষ্ঠা
প্রাচীন হিন্দুদিগের নীল নদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার
পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন ও সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা ৭০৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন
বিজ্ঞানের শিক্ষাদেওয়া
ব্যবসায়ে বাঙ্গালী
বাঙ্গালার সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার, হিন্দী, মারাঠী ও তামিল ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা ৮০৮
ভূদেব ও তাঁহার স্বজাতি ৮০৫
মহারাষ্ট্রের একজন মুসলমান ৮০৩
মহীশূর সহ নৈতিক সম্মিলন ১১১৮
মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য ৯০৩
যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর কর্মবীর পাঠ ৫৯৫
বিশ্বপাত্রিকা ৯৯৭
শিল্পবাণিজ্য,সরকারী,চাকুরী ও আফিসের প্রকৃতি ৬৯৪
শিশুপাঠ্য পুস্তক ৭০১
সফলতার প্রয়োজন ৭০০
স্বদেশী শিল্পের সুযোগ ৯০৩
স্বদেশী সুকার্য বরণাচরণ বিষ
সাহিত্য সম্মিলন
হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
হিতসাধন মণ্ডলী

প্রবন্ধ

আমেরিকায় লেখক ও বক্তৃতাদি—হিন্দুস্থান ৮১৩
আমার আমিত্ব—শ্রীযুক্ত বলরাম কবিভূষণ অমল বেদান্ত ৮৪৫
আমার প্রবেশে হিন্দুত্বের সম্প্রসারণশীলতা—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়… ১১১
ইষ্টপূজা—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু ৮৪১
ইস্পাতী ও উক্কানী ১১১৮
উদাসীনের চিঠি—শ্রীউদাসীন ৮৮১
ওলন্দাজ শিখ বাসিন্দা "সংরক্ষণ-নীতি"—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ… ৯০৯
ওলন্দাজ সাহিত্যে মেরেন্টিয়ার—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বি, এ, ৯৪৭
কদলীর চাষ—শ্রীযুক্ত ঈশচন্দ্র গুহ ৭১১
কবে দেখা পাব!—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু ১০১৮
কুসংস্কার—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র বি, এল ১১৪৬
গ্রাম ও স্বদেশ সেবা—শ্রীগ্রামবাসী ৮৩৮

১৫—শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় এম এ, এল
[illegible] সাহিত্য—[illegible]
[illegible] নবীন—শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]
নব সাময়িক সাহিত্য—শ্রীযুক্ত
নারায়ণগঞ্জ—শ্রীপঞ্চানন
নারী সাহিত্য বর্ত্তমান যুগে—শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
নারী সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগের [illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত বিরজাপ্রসন্ন ঘটকবর্ম্মণ
নারী সাহিত্যে অমর মহাদ—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায়চৌধুরী
পাঁচালি—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
পাঁচালি—শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বসু
পুণ্যক্ষেত্র [illegible]—শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়
পল্লীশিক্ষার [illegible] চিন্তা—শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
ফরাসী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী—শ্রীযুক্ত মহানাথ চক্রবর্ত্তী
বর্ত্তমান যুগের পল্লীসমাজ—শ্রীযুক্ত বসন্তীযোহন চৌধুরী বি, এল
বর্ত্তমান যুগ ও আমাদের [illegible]—শ্রীযুক্ত রামচরণ মুখোপাধ্যায় বি এল
বর্ত্তমানের স্ত্রী-শিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
বর্ত্তমান যুগের [illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী
বিলাতে স্ত্রীধর্ম্ম প্রচার—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সেন
বিবাহ বিধি—শ্রীযুক্ত জীবনকালী রায় বৈষ্ণবর
বিলাতযাত্রীর চিত্র শিল্প—শ্রীযুক্ত চিত্র মনোলোভন
মহাজন—শ্রীযুক্ত [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়
মার্কিন রাষ্ট্রের [illegible]—শ্রীযুক্ত বিনয়
রাসন [illegible]—শ্রীযুক্ত বিদ্যুৎপ্রভা ভট্টাচার্য্য
রাণী জয়মণী—শ্রীযুক্ত ময়থনাথ মজুমদার
✓ [illegible] [illegible] রাণীমূর্ত্তি—শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত সরকার ৮১৫
[illegible] [illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ ১১৭১
[illegible] [illegible]—মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ৪৯৩
শিক্ষাপদ্ধতি—শ্রীযুক্ত [illegible] ৭৯৪
শ্রীকৃষ্ণের সংসার—শ্রীযুক্ত অনুকূল কারা-বাকেরণ তীর্থ ভাগবত ভূষণ
সাত্ত্বা—শ্রীযুক্ত [illegible] বি, এ,
[illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরি এম, এ, বি, এল,
সাধক কবি [illegible]—শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায়
সাহিত্য ও সমাজ—শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার
[illegible]—শ্রীযুক্ত [illegible]

সাহিত্যসেবকের ডায়েরী

[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি

মহারাজাধিরাজ

শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাব্ বাহাদুর

INDIA PRESS, CALCUTTA.

গৌরব

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৬ষ্ঠ খণ্ড | ৬ষ্ঠ বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২২ | সপ্তম সংখ্যা।

আলোচনা

১। সাহিত্যসম্মিলন

বর্দ্ধমানে খুব জমকাল সম্মিলন হইয়া গেল। লক্ষ্মীর বরপুত্র মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহাতাপচাঁদ বাহাদুরের চেষ্টা আগ্রহ ও অজস্র অর্থব্যয়ে সম্মিলনে বেশ সমারোহ হইয়াছিল। এবারকার প্রতিনিধির সংখ্যা চৌদ্দশত! আমোদ প্রমোদ, চণ্ডীর গান, থিয়েটার, আলোকচিত্র, চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় প্রভৃতি সব রকমেই একটা আনন্দের বান ডাকিয়াছিল। সম্মিলনের জনতা দেখিয়া এখন সবাই বুঝিয়াছেন বাঙ্গালীর প্রাণ মিলনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালীর আর

একলা ভাল লাগিতেছে না। সত্য সত্যই এখন বাঙ্গালী বুঝিয়া হউক, না বুঝিয়া হউক ভাবিতেছে—"একোঽহং বহুস্যাম্" আমি এক কিন্তু আমাকে বহু হইতে হইবে। প্রাদেশিক সম্মিলনে পলিটিক্স থাকে তাই অনেকে সেখানে জুটিতে পারেন না। সাহিত্য নিরঙ্কুশ, এখানে সেইজন্য দেখিতে দেখিতে একটি সুন্দর মিলন মন্দির গড়িয়া উঠিতেছে। আজ যে চৌদ্দশ লোকের সমাবেশ, এটি সেই মিলিবার আকাঙ্ক্ষার, বহু হইবার বাসনার বিরাট আত্মপ্রকাশ। বাঙ্গালীর প্রাণের এই বিরাট মূর্ত্তি এখন সমজদার মাত্রেরই কাণে ঠেকিবে। বর্দ্ধমান আজ কালকার বাঙ্গালার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতেছে। দামোদর গত বৎসর কূল ছাপাইয়া সীমা বাধা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা বিপুল বেদনার আঘাতে বাঙ্গালীকে বর্দ্ধমানে মিলাইয়া ছিল। সে দিন বাঙ্গালী ভাইএর ব্যথায় ব্যথী, দুঃখের দুঃখী। বর্দ্ধমানকে আশ্রয় করিয়া সে দিন বাঙ্গালার সেবার শক্তি কাজের যোগ্যতা বিশ্বের সম্মুখে নিজের আভাস দিয়াছিল। আজ আবার সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ বর্দ্ধমানে বিরাটরূপের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ এবার বাঙ্গালী বুঝিয়াছে। সে "দুমার আনন্দ" চায়, তাহার প্রাণের সুপ্ত পুরুষের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তুলিতে ইচ্ছা করে। এক দিক দিয়া একটা পথ ধরিয়া ত বাঙ্গালীর নিষ্কৃতি চরিতার্থতা লাভ করিবে না। "সাহিত্য সম্মিলন" তাই একটা বড় সার্থকতা সম্মুখে রাখিয়া আমাদের সমাজের মাঝখানে নিজের জায়গা করিয়া লইয়াছে। গত বারে আমরা আর একটা কথা বলিয়াছিলাম—সাহিত্য-সম্মিলনকে মিলনের শ্রীক্ষেত্র করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাকে আনন্দের কাঙ্গাল বাঙ্গালীর কাছে আনন্দের এক বিপুল উৎস করিতে না পারিলে চলিবে না। এবার সে বিষয়টীর বেশ সুযোগ ঘটিয়াছিল। অবশ্য সর্ব্বত্র রাজ-আতিথ্য, রাজ-আয়োজন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাণের ঠাকুর যে ভক্ত বিদুরের ক্ষুদ কুঁড়ায় তৃপ্ত। আনন্দের ও মিলনের এই নিয়ত বর্দ্ধনশীল ধারাটিকে আজ যেন আমরা ক্ষুণ্ণ হইতে না দিই। আবার ইহা শুধুই আমাদের আনন্দ ও মিলনের ক্ষেত্রনয়। এখানে আসিয়া আমরা বুঝি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস অবলম্বন করিয়া কত বিচিত্র দিকে এবং বিভিন্ন বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান শাখায় কত কাজের জিনিষ স্বদেশী পোষাকে স্বদেশী আদব কায়দায় আমাদের কাছে উপস্থিত হইল। ইতিহাস শাখায় সকলের অপেক্ষা অধিক প্রাণের পরিচয় পাওয়া গেল। বাস্তবিক ইতিহাস আজ বাঙ্গালীর বড় আদরের জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে, কারণ মাটী খুঁড়িয়া, মাঠ মন্থির হেউল অনুসন্ধান করিয়া পুরাণো পুঁথির জীর্ণ পাতা ঘাঁটিয়া আমরা আমাদের পূর্ব্বগরিমা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইতেছি। সাহিত্য ও দর্শনে অনেক সরস ও জ্ঞাতব্য বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় স্থানলাভের চেষ্টা করিতেছে। একাধারে মিলন আনন্দ ও কাজের মধুর সমাবেশ। তিন দিনের সাহিত্য-চর্চ্চা এমনি করিয়া এই বৈচিত্র্য ও বিপুলতা লইয়া আপনাকে বছরের বার মাসের উপর ছড়াইয়া ফেলুক; আনন্দের এই স্রোতের মুখ যেন আর বন্ধ হইতে না পায় আর এই শক্তিমান্ সর্ব্বজোড়া মিলন যেন বিরাটে মিশিয়া সার্থক হয়।

* *
*

২। মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী

বাঙ্গালী এতদিন মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধীকে চোখে দেখেনি, তাঁহার বাণী শুনিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার অনাথ অসহায় ভারতবাসী নরনারীদের জন্য যখন তিনি, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার পুত্র বার বার জেল খাটিতেছিলেন, তখন বাঙ্গালী এক একবার চোখ মেলিয়া দেখিতেছিল—দক্ষিণ আফ্রিকার সেই প্রকাণ্ড শক্তি ও ত্যাগের স্রোতস্বতীর উদ্ভবস্থল হিমাচলপ্রতিম কর্ম্মবীর গান্ধী। এবার কলিকাতার লোক মোহনচাঁদের মোহনমূর্ত্তি দেখিয়া চোখ সার্থক করিয়াছে। কিন্তু এ নেতা কেমন নেতা? ঘড়াচূড়া পরা লেপাফাদুরস্ত বোলচালওয়ালা নেতা নয়। একটি খাঁটী সোল আনা নিখুঁত নিরেট আস্ত মানুষ। এ যেন দধিচি মুনির তপস্যাপূত অস্থি দিয়ে গড়া। ভড়ং কাহাকে বলে, বক্তৃতার চরকি বাজি কিছুই নাই—আছে একটা সৌম্যশুভ্রদীপ্তি, ত্যাগ ও সংযমের ছাপ আর মনুষ্যত্বের সুস্পষ্ট প্রকাশ। এর কাছে কেমন আপনা আপনি মাথা হেঁট হইয়া যায়, প্রাণ লুটাইয়া পড়ে। ইহাতে মেকি নাই ষোল আনাই খাঁটি সোণা! এমন সব লোককে দেখিয়াই মানুষের আস্থা রাখালবেশ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নিজের ঐশ্বর্য্যে দীপ্ত হইয়া উঠে। ইহাদের বাণী শুনিয়া প্রাণ উদাসী হয়, লোক আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। বাস্তবিকই মনে হয় ইহারা যেন ভগবানের চাপরাস সঙ্গে করিয়া আনেন। আর মানুষ ভাবিতে থাকে তাহার প্রকৃষ্ট স্বাতন্ত্র্য ইহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা। এমন লোকের আদর্শ একটা সংক্রামক ব্যাধির মত ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়ে। গান্ধীজিকে দেখিয়া আমরা সেই নরোত্তমকুলের এক-জনের সাক্ষাৎ পাইলাম। ইনি তরুর মত সহিষ্ণু এবং তৃণের অপেক্ষাও নম্র। কর্ম্মের অভিমান, কর্ত্তৃত্বের অহঙ্কার ইহাঁর চরিত্রকে স্পর্শ করিতেই পারে নাই। সেবকের দীনতায় ভক্তের বিনয়ে গান্ধীর জীবন কি মধুর হইয়া উঠিয়াছে! সবাইকে ভাই বলিয়া যিনি বুকে ধরিবার জন্য ব্যাকুল, সকলের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব দেখিয়া যাঁহার চিত্ত সেবার নিমিত্ত নিয়তই উন্মুখ বাঙ্গালী আজ তাঁহাকে নিঃসঙ্কোচে প্রাণের আনন্দে তাহার পরমাত্মীয় বলিয়া বুঝিল। যথার্থই গান্ধী মহাশয় People'sman—জনসাধারণের আপনার লোক। ইনি একটী দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রীর পুত্র এবং স্বয়ং ব্যারিষ্টার। ইহার সহধর্ম্মিণীও মন্ত্রী-দুহিতা। গান্ধীজীর তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব সার্থক করিয়াছেন। স্বামী যে ব্রত লইয়া নির্য্যাতন মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বারংবার জেলে গিয়াছেন, এই মহীয়সী মহিলাও হাসিতে হাসিতে সেই ব্রতপালন করিবার জন্য কারাদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। একবার গান্ধী জেলে খবর পাইলেন তাঁহার পত্নীর কঠিন পীড়ায় জীবন সংশয়। তখন জরিমানার টাকা জমা দিলেই খালাস পাইতেন। কিন্তু এই ত্যাগবীর জেলেই রহিয়া গেলেন; দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন "কর্ত্তব্যের কাছে স্ত্রী পুত্র কিছুই নয়!" তাঁহাকে যতবার আদালতে লইয়া গিয়াছে, তিনি ততবারই বলিয়াছেন "আইনে যতখানি শাস্তির বিধান আছে আপনারা আমাকে তাহার ষোল আনাই দিন। আমার গরীব দুঃখী ভাইদের সঙ্গে সমান দুঃখ সহিতে চাই।" যতকাল পর্য্যন্ত রেসিষ্ট্যান্স্ চলিয়াছিল, তিনি কুলীর পোষাক পরিয়া কুলীদের সহিত অভিন্ন হইয়াছিলেন। গান্ধীর চরিত্রের আর একটা জিনিষ—তিনি তর্ক

কাহাকে বলে জানেন না। গান্ধী ষোলআনা অভীঃ। বেদান্তে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। সর্ব্বভূতে তিনি ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করেন। মানুষ তাঁহার কাছে ঐশ্বরিক শক্তির আধার। আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন আচণ্ডালে পাত্রে ধরিয়া ভক্তি ও প্রেম বিলাইয়াছিলেন, গান্ধীও সেইরূপ কুলী মজুর ধনী মহাজন সবাইকেই ভালবাসিয়া সকলকে ভাই বলিয়া সকলের সেবাকেই নারায়ণের পূজা, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি স্বার্থমুক্ত, ত্যাগদীপ্ত বৈরাগ্যের অবতার। কিন্তু এ বৈরাগ্য কর্ম্মবিমুখ ঔদাসীন্য নয়। এতবড় কর্ম্মী জগতের ইতিহাসে বিরল, বিশেষতঃ আমাদের এই আলস্য ও নৈরাশ্যের দেশে ইহার জোড়া খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কতকাজই না ইনি করিয়াছেন! গান্ধী বুঝিয়াছেন "ন কর্ম্মনামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে"—কাজগুলি না করিয়া গেলে কি করিয়া কর্ম্মের ক্ষয় হইবে? কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিয়া, কাজ ফেলিয়া রাখিয়া মানুষ কেমন করিয়া মুক্ত হইবে? ইনি কর্ম্মযোগী। নির্ব্বন্ধ নিত্যবস্তুর আশ্রয়বান্ হইয়া কাজ করিয়া যান। কাহারও প্রতি তাঁহার দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ নাই। বিদ্বেষকে তিনি পাপ বলিয়া গণ্য করেন। তিনি কখনও মোহে বা বৈরুব্যে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। আপনার মাঝখানে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ রাখিয়া ভয়ক্রোধমুক্ত হইয়া, অক্ষুব্ধচিত্তে তিনি কর্ত্তব্য পালন করেন। তিনি ভাবেন "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং"—হে নিখিল জগতের জননী আমি যাহা করিব তাহা তোমারই পূজা। তাই তব তাঁহার চরণে আসিয়া প্রণাম করে, দুঃখের কাঁটা ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠে, শাস্তি বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত স্নিগ্ধদীপ্তিতে মধুর হয়। এই মহাপুরুষের জীবন শুধু ত্যাগ, কর্ত্তব্যপালন ও নির্ভীকতার ইতিহাস নহে। ইহাঁর শ্রেষ্ঠশিক্ষা—এই কর্ত্তব্যের কাছে আত্মোৎসর্গ, আর সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, সর্ব্ব কর্ত্তব্যের বিধাতা সেই পরমপুরুষের চরণে আত্মনিবেদন। হাজার হাজার লোক এমন করিয়া সব ছাড়িয়া সমস্ত দুঃখ বেদনা শান্তি মাথায় ধরিয়া ইজ্জৎরক্ষার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল, তাহারমূলে একটা এতবড় শক্তি, এমন ষোলআনা আত্মোৎসর্গ। কাজ যখন বুদ্ধির দিক হইতে আসে, তখন ত গরিমা ও মহিমার তিলক তাহার ললাটে নাই, সে শুধু লাভের অঙ্ক সঙ্গে করিয়া আনে, বড়জোর মানুষের একটা বড়গোছের স্বার্থের কথা স্পষ্ট করিয়া দেয়। অবশ্য এরূপ কাজও উপেক্ষার বিষয় নয়, মানুষ ইহাকে ছাড়িয়াও টিকিতে পারে না। কিন্তু কর্ম্ম যখন ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য যখন প্রাণের ডাক, অন্তরাত্মা যেদিন লাভক্ষতি না গণিয়া পরমপ্রেমে সমস্ত বিদ্বেষ ও ভয় ক্রোধের উপরে উঠিয়া কর্ম্মের মর্ম্মে ভগবানের চরণ চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পায়, তখনই নরের মধ্যে নারায়ণের আবির্ভাব, তখনই মূক বাচাল হইয়া উঠে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। মানুষ তখন ছোট নয়, সে বুঝে "শিবোঽহং"। বাস্তবিকই যখন এমন একটা বিশ্বাস প্রাণে জাগিয়া উঠে, জীব তখন শিব হইয়া যায়। সে তখন মঙ্গলময়ের অনন্ত করুণার অমৃতস্বাদ লাভ করে। সে তখন বিন্দু নহে সিন্ধু—"The dew drop mingles into the ocean.," তাহার হৃদয়ে ভগবানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, সে তখন তাহার ছোটখাট সীমা ভুলিয়া যায়, অসীমের ডাক শুনিতে পায়। আজ আমরা আমাদের মাঝখানে এমনি একটা প্রাণের পরিচয় পাইয়া ধন্য হইলাম। পরি-

পূর্ণতার সাধনা, কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের সমন্বয়, সংযম ও শক্তির মিশ্রণ, এবং এই সকলের মূলীভূতরূপ সমস্ত কর্ম্মে ভগবানের পূজার উপলব্ধি মনুষ্য জাতির কত বড় সম্পদ। ইহা মানুষকে বড় করে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তোলে এবং মনুষ্য জাতির কল্যাণের জন্য ছোটে। গান্ধীর ভক্ত ও অনুরক্ত মণ্ডলীর মধ্যে তাই হিন্দু, মুসলমান, পারসী, ইহুদি, খৃষ্টান, এসিয়াবাসী ও ইউরোপীয় সকলের মধুর মিলন। সন্ন্যাসীর পোষাক, ক্যালেনবাক প্রভৃতি তাই গান্ধীর ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য কারাগারে যাইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বাঙ্গালী বহুকাল খোলা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছে, এবার সে একবার ভিতরে ঢুকিতে শিখুক, অন্তর হইতে অন্তরে লীন হইয়া যাক। গান্ধীর জীবন তাহার কাছে বেদান্তের সত্য, ঋষিদের সাধনা, ভারতবর্ষের মর্ম্মবাণী স্পষ্ট করিয়া তুলিবে। সে তখন কর্ম্মযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবে, তাহার প্রাণে প্রেমের বান ডাকিবে, স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, বিশ্বমানব ও বিশ্বধর্ম্ম তাহার নির্ম্মল জ্ঞানের, স্বস্বার্থাশ্রিত কর্ম্মের ও সর্ব্বপ্লাবী প্রেমের দানে তাহার পরিপূর্ণতার পরিচয় পাইবে।

৩। হিতসাধন মণ্ডলী

সম্প্রতি কলিকাতায় "হিতসাধন মণ্ডলী" নামে একটী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় সভ্য ইহার উদ্যোগী। মণ্ডলীর উদ্দেশ্য :—

"১। নিরাশ্রয় ও সহায়হীন বা পতিত ও নিগৃহীত পুরুষ ও নারীদের উপযুক্ত শিক্ষা বা জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থাদির দ্বারা আত্ম-নির্ভরশীল ও কার্য্যক্ষম করা; এবং বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য করা (যথা, অনুরাশ্রম, অনাথাশ্রম, শিল্পসমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবনাদি বিপদে সাহায্য দান)।

২। নানাবিধ সহজ ও সুলভ উপায়ে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তার (বক্তৃতা, পুস্তিকা প্রচার, আলোক চিত্রাদি প্রদর্শন, পাঠাগার ও নৈশবিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি)।

৩। শারীরিক সুস্থতা ও স্থানীয় জল বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা বিষয়ে ও নানাবিধ ব্যাধির নিবারণ ও প্রতীকার-কল্পে শিক্ষা ও সাহায্য দান।

৪। অনুন্নত ও অশিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তি-দিগকে যথাযোগ্য শিক্ষা দ্বারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে উন্নত ও অগ্রসর করা।

৫। সর্ব্বপ্রকার দুর্নীতি বা কুপ্রথাদির নিবারণ ও সংশোধন চেষ্টা।

৬। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদাদির প্রবর্ত্তন।

৭। সর্ব্ববিধ সামাজিক অবনতি ও দুর্ব্বলতার অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা; এবং সমাজকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার উপায় নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন।"

এই মণ্ডলীর উদ্যোগে ইতিমধ্যে কয়েকটি সভাও হইয়া গিয়াছে। প্রবীণ বক্তারা বেশ বক্তৃতাও করিয়াছেন। অনুষ্ঠানটির উদ্দেশ্য সাধু এবং কার্য্যক্ষেত্র খুব বিস্তৃত। গত কয়েক বৎসর আমরা বাঙ্গালা দেশে এইরূপ অনেক সদনুষ্ঠানের প্রারম্ভ দেখিয়াছি। কিন্তু কোনওটিই বেশীদিন টিকে নাই এবং বিশেষ কিছু কাজ করিয়া উঠিতে পারে নাই। অনেক সাধু সঙ্কল্প সূতিকা গৃহেই পঞ্চত্ব পাইয়াছে। এই মণ্ডলীর পশ্চাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। সুতরাং অর্থ ও পরিচালকের অভাব না হইবার কথা। মণ্ডলী সত্য

আহ্বান করিয়া বেশ যুক্তিপূর্ণ কাজের কথা শ্রোতাদের শুনাইয়াছেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসরে আমাদের যে দারুণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়া গিয়াছে তাহাতে মণ্ডলীর উদ্যোগীদিগকে, তথা, দেশের সেবাকার্যে উন্মুখ ব্যক্তিগণকে দুই একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশে উৎসাহ বেশী দিন স্থায়ী হয় না। আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ইহা একটা মস্ত অভিশাপ। আমরা সময়ে সময়ে এক একটা কাজের জন্য ক্ষেপিয়া উঠি, কিন্তু দেখিতে দেখিতে আমাদের উৎসাহ একেবারে নিভিয়া যায়। আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটুকু উৎসাহ লইয়া কাজে লাগি, তাহা সভা ডাকিতে, বক্তৃতা করিতে, মন্তব্য নির্দ্ধারণে ও রিপোর্ট প্রকাশে নিঃশেষ হইয়া যায়। তারপর যখন কাজের পালা আসে, তখন আমরা একেবারে চুপচাপ। আর একটী কথা, মণ্ডলী কাজ করিতে চান, সুতরাং বৃদ্ধ, প্রবীণ, ভাবুক ও চিন্তাশীলদের ঘটনা বাঁধিয়া এই সব কঠোর খাটুনির কাজে বেশী কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের বুকে আশা ও শরীরে বল আছে, সেই নবীনদের কাছে যাইতে হইবে। তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করা চাই। নবীনগণের প্রাণে মণ্ডলীর মহৎ উদ্দেশ্য জাগাইয়া না তুলিলে চলিবে না। মণ্ডলীর সার্থকতা ইহাদের দ্বারাই হইবে। সুতরাং মণ্ডলীর যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহারা যাহাদের খাটিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা আছে তাহাদের সম্মুখে এই কর্ত্তব্যগুলি উপস্থিত করিবার জন্য সচেষ্ট হউন। তাহারা এই বিষয়ে কি বলিতে চায় কি ভাবে, তাহাদের কতটা সময় ও শক্তি দিতে পারে সেই সব কথা ঘনিষ্ঠ-ভাবে তাহাদের মুখ হইতে শুনিবার চেষ্টা করুন। কাজগুলির ভিতরকার মহিমা ও তাহার পবিত্রতা সভায় অনেকেই শুনে। কিন্তু সব কাজ নিজেদের হাতে করিতে হইবে, তাহার জন্য কিসের প্রয়োজন, কি বাধা বিঘ্ন, কিরূপ অন্তরায় অতিক্রম করা চাই কোথায় কোন ক্ষেত্রে কর্ম্মীদের যাওয়া একান্ত দরকার সেগুলি স্পষ্ট করিয়া কাজের স্বরূপ বুঝাইতে হইবে।

৪। গোখলের আশা

কোন কোন কর্ম্মক্ষেত্রে ত্যাগ, চরিত্রবল এবং আগ্রহের অভাব নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা (training) বা সমূহের (organisation) অভাবে বহুগুণান্বিত কর্ম্মিগণও কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না। ইচ্ছা আছে, প্রকৃত সফলতার প্রবর্ত্তক জ্ঞানের অভাব ত্যাগ আছে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে তাহার বিনিয়োগ নাই। দেশের দুর্দ্দশাবোধ বেশ স্পষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কল্পনা, এলোমেলো চেষ্টা, বিলাস ও উন্মাতেই তাহার পর্য্যবসান ঘটে। মহামতি গোখলে এই মর্ম্মান্তিক সত্যগুলি পদে পদে ঠেকিয়া বুঝিয়াছিলেন। সমূহ গড়িয়া যোগ্য কর্ম্মী নির্ব্বাচনের পর তাহাদিগকে ত্যাগে, শিক্ষায়, সাধনা ও চরিত্রে তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ নিরন্ন, নিরক্ষর, অনৈক্যে দুর্ব্বল, অর্থে স্বাস্থ্যে ও সামর্থ্যে কাঙ্গাল কোটী কোটী নরনারীকে মনুষ্যত্বে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাহাদের রাষ্ট্রীয় জগতে সকলের সমকক্ষ করিয়া তোলা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। গোখলে তাই ১৯০৫ খৃঃ অব্দে পুণা নগরে ভারতসেবক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন।

সমিতির উদ্দেশ্য জাতীয়তার প্রচারক

(national missionaries) একদল কর্ম্মী গড়িয়া তোলা। যাঁহারা জন্মভূমির সেবাকেই প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন, এবং স্বদেশের জন্য যাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে বৈধ উপায়ে ভারতের জনসাধারণের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর কার্য্য সাধনের উপযোগী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। সমিতির সভ্যগণের চেষ্টা মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের প্রতি প্রযুক্ত হইবে।

প্রথমতঃ—উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা মাতৃভূমির প্রতি নিবিড় ও আবেগপূর্ণ ভালবাসা জনসাধারণের হৃদয়ে জাগাইয়া তোলা।

দ্বিতীয়তঃ—রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও আন্দোলন সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালান এবং ইহার জন্য জাতীয়জীবনের সমস্যাগুলি ও রাষ্ট্রীয় জীবন গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ।

তৃতীয়তঃ—বিভিন্ন সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে হৃদয়ের ভালবাসার সম্প্রসারণ ও সমবায় চেষ্টার প্রচলন।

চতুর্থতঃ—শিক্ষাসম্বন্ধীয় আন্দোলনগুলির—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা, জনশিক্ষা, বাণিজ্য এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাহায্য দান।

পঞ্চমতঃ—দেশের বাণিজ্যাদির শ্রীবৃদ্ধি সাধন।

ষষ্ঠতঃ—সমাজের নিম্নস্তরে যাহারা অবজ্ঞার বোঝা মাথায় বহিতেছে, সেই সব উপেক্ষিত জাতির উন্নতিবিধান। পাঁচ বৎসর কাল গোখলে মহোদয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, বিবিধ গ্রন্থাদি পাঠ ও নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া সমিতির সদস্যদিগের কার্য্যোপযোগিতা বাড়াইয়া লওয়া হইবে। তারপর তাঁহারা সমিতির উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত এক একটী বিষয়ে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা সব কাজ ছাড়িয়া দেশের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করিয়া উঠিতে পারেন না, অথচ যাঁহাদের যোগ্যতা ও ত্যাগ আছে এবং যাঁহারা স্বদেশের সেবার জন্য আগ্রহান্বিত তাঁহারা ভারতসেবক সমিতির কার্য্যে সময়, অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করিয়া ইহার সাধারণ সভ্য হইবার অধিকারী। আমাদের আশা হয় এই মণ্ডলী দেশের বহু কল্যাণসাধন করিবেন এবং যে যে বিষয়ে গভীর প্রয়াস ও বহুকালব্যাপী শ্রমের প্রয়োজন সমিতি সেই সব কাজে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিবেন।

উপসংহার

আমরা মোটামুটি গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয়ের জীবনের কাজ বিবৃত করিলাম। তাঁহার একটা আশার কথা বলিয়া উপসংহার করিব। গোখলে বিশ্বাস করিতেন, এবং কতবার গভীর আবেগে সে বিশ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন,—ভারতবর্ষ একদিন রাষ্ট্রীয়জগতে আপনার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে, ভবিষ্যতে ভারতবাসী মনুষ্যত্বে ও সর্ব্ববিধ যোগ্যতায় জগতের যে কোনও দেশের লোকের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। তিনি সারাটা হৃদয় দিয়া এই কথাটি বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের স্বপ্নে কবিতার সৌন্দর্য্য ও গভীর দার্শনিক ভাবের গাম্ভীর্য্য ফুটাইয়া তুলিতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা কার্য্যকলাপে এই আশা তাহার সৌম্যরশ্মি ছড়াইয়া দিয়াছিল। ইহা তাঁহার নিকট ভাব-রস-সম্ভোগের বস্তু ছিল না, তিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই উপায়ের কথাটি বলিয়া মনীষার বেদীতলে, মহান্ স্বদেশসেবার পুণ্যপীঠে আমাদের এই শ্রদ্ধার অঞ্জলি শেষ করিব। গোখলে

বলিতেন ভারতবর্ষের শিক্ষিতসমাজকে দেশের সেবায় কিছু সময় অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করা একটা অপরিহার্য্য পুণ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। প্রায় এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র গ্রাজুয়েট। সুতরাং গ্রাজুয়েটগণ তাঁহাদের দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব করিবেন। গোখলে বলিতেন গ্রাজুয়েটগণ অন্ততঃ খানিকটা সময় ও শক্তি মাতৃভূমির কাজে নিয়োগ করিবার জন্য ব্রত লইবেন। আর ন্যূনপক্ষে শতকরা একজন গ্রাজুয়েট এই হতভাগ্য দেশের অসংখ্য কাজগুলির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বদেশের সেবাব্রত গ্রহণ করিবেন। আমাদের চারিদিকে যে স্তূপাকার কাজ জমিয়া রহিয়াছে, সেইসব কাজের দুরূহতা আমাদের ভাবুক ও কর্ম্মীদের হৃদয়ে অবসাদ আনে আর তিল তিল করিয়া তাঁহাদের আনন্দ হরণ করে। যদি আজ গোখলের চিতা নির্ব্বাণ না হইতে, শোকাশ্রুধারা না শুকাইতে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য সন্তানগণ এই কথাটী স্মরণ করেন, তবে গোখলের ডাক তাঁহাদের কাণে পৌঁছিবে। আর যদি সঙ্কীর্ণ স্বার্থ তাঁহাদের গ্রাস করিয়া না ফেলিয়া থাকে তবে স্বদেশের সেবার মহিমা ও পবিত্রতা তাঁহাদের প্রাণে একটা অপূর্ব্ব স্পন্দন জাগাইয়া তুলিবে। তাহা হইলে আর জাতীয় কবিকে জননীর ম্লানমুখ দেখিয়া আক্ষেপ করিতে হইবে না

"কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়ন নীরে ?
সে যে মোর জননীরে।
• • • •
কতেক মেহ কোল ছাড়ি
চিনিতে আর নাহি পারি
আপন সন্তান করিছে অপমান
সে যে মোর জননীরে।"

তখন মায়ের মুখে হাসি ফুটিবে। আমরা তখন মাতৃভূমির পুলকদীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া ধন্য হইব, দেশের বহুশতাব্দীর পুঞ্জীভূত বেদনার সান্ত্বনা আসিবে। আবার আমাদের মা সুস্মিতা, ভূষিতা, ধরণী, ভরণী রূপে সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন। আমাদের মায়ের কোটী কোটী দীন দুঃখী সন্তান মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আনন্দে তাহাদের মহিমান্বিতা মাতৃভূমির চরণে প্রণাম করিবে।

• •
•

৫। ছুটির কাজ

এখন আমাদের স্কুল কলেজের সর্ব্ব সমেত প্রায় বার হাজার ছাত্রের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আরও বহু সহস্র ছাত্র গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রচুর সময় পাইবেন। প্রায় সকলেই এই সুদীর্ঘ অবকাশ নিজের গ্রামে কাটাইবেন। তাঁহাদের প্রতি আমাদের দুই একটা কথা আছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় পাঠ্য পুস্তকের প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন রাখে। দেশের, দশের ও জগতের কোনও খবর রাখিবার অথবা পড়া শুনা ব্যতীত অন্য কোনও কাজ করিবার অবকাশ তাঁহাদের বড় একটা ঘটে না। কিন্তু এখন এই লম্বা ছুটিটা তাঁহাদের পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ। এই অবসরে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে পড়ার বাহিরে কিছু করিতে পারেন। আমরা এখন পদে পদে ঠেকিয়া একটা বড় জিনিষ শিখিয়াছি। আমাদের অনুষ্ঠানগুলি আমাদের সদিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায়ই বিফল হইয়াছে। আমরা অনেক জিনিষেই হাত দিয়াছি, কিন্তু সাফল্য লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। আর বিফল প্রয়াসের মনস্তাপ ও নৈরাশ্য আমাদের বুকের উপর একটা ভারি

পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে প্রায় সর্ব্বত্রই চরিত্রবলের ও প্রকৃত শিক্ষার (Training) অভাবই আমাদের বিফলতার কারণ। আমরা শিখি এক এবং করিতে চাই অন্য জিনিষ। আমাদের চরিত্রের যে সব গুণগুলির বিকাশ ও পুষ্টির জন্য কেহ কোনও দিন মনোযোগ দেয় নাই, কঠোর কর্ম্ম ক্ষেত্রে সেই গুলিরই দরকার হইয়া পড়ে। আমাদের অধ্যয়ন, চিন্তা, জীবন যাপনের উদ্যোগ প্রভৃতি সব বিষয়েরই কেন্দ্র আত্মস্বার্থ। কিন্তু কাজের সময় আবার সেই স্বার্থকে খাট করিয়া পরার্থে বা পরমার্থে মন না দিলে দশেরও কিছু হয় না আর স্বার্থও অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। আমাদের কাছে লোকে শৃঙ্খলা, সংযম, ধৈর্য্য ও শ্রমশীলতা আশা করেন। আর আমাদের শিক্ষা, জীবন যাপনের রীতি নীতি সবই বিশৃঙ্খলা, অধৈর্য্য ও শ্রমবিমুখ আয়েসিতাবের ভিতর দিয়া। কাজে কাজেই আমরা রুটি দিতে চাহিয়াছি, কিন্তু দিয়াছি পাথর।

আমাদের দেশের লোকেরাও তাই আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছেন। কিন্তু চির-দিন ত এই পড়িবার চেষ্টাগুলি ডাঙ্গায় ডুবিয়া গেলে চলিবে না। আমাদের এখনকার ছাত্র সমাজই ভবিষ্যতের কর্ম্মী। তাঁহাদের এখন হইতে সেই সব দোষগুলি দূর করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত। যে সব গুণের অভাবে আমরা কাজের বাহির হইয়া পড়িতেছি সে গুলি যদি তাঁহারা আয়ত্ত করিবার জন্য কৃত-সঙ্কল্প না হন তবে এই নিষ্ফলতার ইতিহাস আবার আসিবে। এখন তাঁহারা স্বদেশের ও বিদেশের মহাপুরুষ, চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর-গণের জীবন ও কর্ম্ম বেশ তলাইয়া পড়িবার চেষ্টা করুন। তাঁহাদের চরিত্রের গুণগুলি অধিকার করিবার জন্য ছাত্রসমাজের এই দীর্ঘ অবকাশের কতকটা উৎসর্গীকৃত হউক। তাঁহাদের এই কয়টা দিনের মুক্ত জনব্যাপক চিন্তায় ও সদুদ্দেশ্যমূলক কার্য্যের ধ্যানে নিযুক্ত হওয়ার এই অবসর। নিজেদের গ্রাম, তল্লাট, জেলা এবং দেশের অবস্থা, অভাব ও সুযোগগুলি তাঁহারা একবার ভাল করিয়া বুঝুন। পুকুরে জল নাই, কেবল পাঁক ও পানা। গ্রামে আনন্দ ও প্রাচুর্য্যের অভাব, ঘরে ঘরে হাহাকার ও অভাবের আর্ত্তনাদ। স্বাস্থ্য ও শক্তি যেন পুরাবৃত্তের জিনিষ। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগগুলি বাঙ্গালায় যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। শিল্প বাণিজ্য, দোকানদার, ফিরিওয়ালা ও ফোড়িয়ার কার্য্য সীমার মধ্যেই সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। উদার অধ্যাত্ম ধর্ম্মবোধ কতকগুলি মামুলি সংস্কারের মধ্যে কোনও মতে আত্মরক্ষা করিতেছে। বিদ্যা জনসাধারণের সঙ্গে এক রকম সম্পর্ক ঘুচাইয়া ফেলিয়াছে। গোষ্ঠীব্যাপী গ্রাম-প্রসারী সমবেদনা ও ভালবাসা গৃহের প্রাচীর বা বেড়ার বাহিরে যায় না। একলা কোনও কাজ করা অসম্ভব। আর দশজনে মিলিয়া কাজ করার কোনও চেষ্টা আমাদের নাই। যেখানে দশজনে মিলিবার একটু আধটু চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেও কাজের চেয়ে অকাজ ঢের বেশী হইয়াছে।

আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই ত প্রায় এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মরণের বিচিত্র আয়োজন ত নিয়তই বাড়িয়া চলিয়াছে।

কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের চেষ্টাই ত সব অসাধ্যকে সিদ্ধ করিয়াছে। মানুষের সঙ্কল্প, সাধনা, ও সমবায়ই ত আজ জগতে সাফল্যের

ভিত্তি গাঁথিয়াছে। আমাদের ছাত্রগণ এখন একবার চোখ মেলিয়া তাঁহাদের চারিধারের অবস্থা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। ভাল করিয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কত মাল মসলা তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে ছড়ান রহিয়াছে। সেগুলিকে একত্র করিয়া কাজে লাগাইবার ভার ভবিষ্যতে তাঁহাদের উপরে পড়িবে, আর তাহার উপযোগী শিক্ষা ও চরিত্র বল তাঁহাদিগকেই অর্জ্জন করিতে হইবে। সেই-জন্য এই সুদীর্ঘ অবকাশে ছাত্রগণ তাঁহাদের তল্লাটের অভাব ও শক্তি ভাল করিয়া বুঝি-বার চেষ্টা করিবেন। গ্রামসমূহের অতীত ইতিহাস বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে, সামাজিক, বৈষয়িক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তথ্যে মনোযোগ দিতে হইবে।

বঙ্গ সাহিত্যের সহিত আমাদের ছাত্রদের পরিচয় বড়ই কম। তাঁহারা এই অবসর সময়ে তাঁহাদের জাতির সাহিত্য মনোযোগ দিয়া পড়া একান্ত প্রয়োজন। ভাল ভাল চিন্তাশীল এবং জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ যে সব বই বাহির হইয়াছে সেগুলি এবং ইংরাজি কয়েকখানা বাছাই বই পড়ার ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। গ্রামের মুষ্টিমেয় লোক লেখা পড়ার আলোক পাইয়াছে, সুতরাং ছাত্রগণ এই সুযোগে নিরক্ষর লোকগুলির একাংশকেও লেখা পড়া শিখাইবার ভারগ্রহণ করিলে, একটা মহৎ পবিত্র ব্রত পালন করা হইবে। রামায়ণ, মহাভারতের পুণ্য-কাহিনীসমূহ এবং ইতিহাসের ও জীবনচরিতের শিক্ষাপ্রদ মহৎ ঘটনাবলি গ্রামের নরনারীগণকে বিশেষতঃ বালকদিগকে গল্পচ্ছলে বলিলে একটা মস্ত কাজ সহজে সম্পন্ন হইবে। গ্রামে কতকগুলি ভাল পুস্তক লইয়া একটী পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা, এবং অসহায় অভাবগ্রস্ত লোকের সাহায্যের জন্য মুষ্টিভিক্ষা লইয়া সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করিতে পারিলে মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত হইবে। হইবে। এই সব কাজ কত মহৎ অথচ সুসাধ্য! সুতরাং ইহার জন্য কাহারও বিশেষ কিছু কষ্টের সম্ভাবনা নাই। গ্রামের সহৃদয় বিজ্ঞ ও বর্ষীয়ানগণের পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিয়া কাজ করিলে ছাত্রগণ বোধ হয় কিছু কাজ করিয়া উঠিতে পারিবেন এবং ছুটিটা সার্থক আর ভবিষ্যতের কর্ম্মজীবনের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

* *
*

৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন

এবার বাঙ্গালার প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র নবদ্বীপে প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রবীণ স্বদেশসেবক ভারুক ও কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভা-পতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয় পাকা সমঝদার। সুদীর্ঘকাল বিবিধ-ভাবে তিনি তাঁহার স্বজাতির সেবা করিয়াছেন। তাঁহার মত তেজস্বী, সুরসিক, দেশের সকল মফঃস্বলের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতা বড়ই বিরল। দেশের বহু সুখদুঃখের খবর তাঁহার জানা আছে। বিশেষতঃ বঙ্গীয় প্রজার দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব, অভিযোগ, রোগ, শোক মতিলাল ঘোষ মহাশয় যেমন জানেন ও বুঝেন তেমনটি আর কেহই বুঝেন না। রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার মত কেজো জ্ঞান আর কয়জনের আছে? সংবাদপত্রে এই সুদীর্ঘকাল স্বজাতির আশা আকাঙ্ক্ষা, অভাব, দৈন্য সম্বন্ধে যেরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে তিনি ভারতবর্ষের সংবাদপত্র মহলে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দেদীপ্যমান্ হইয়া আছেন।

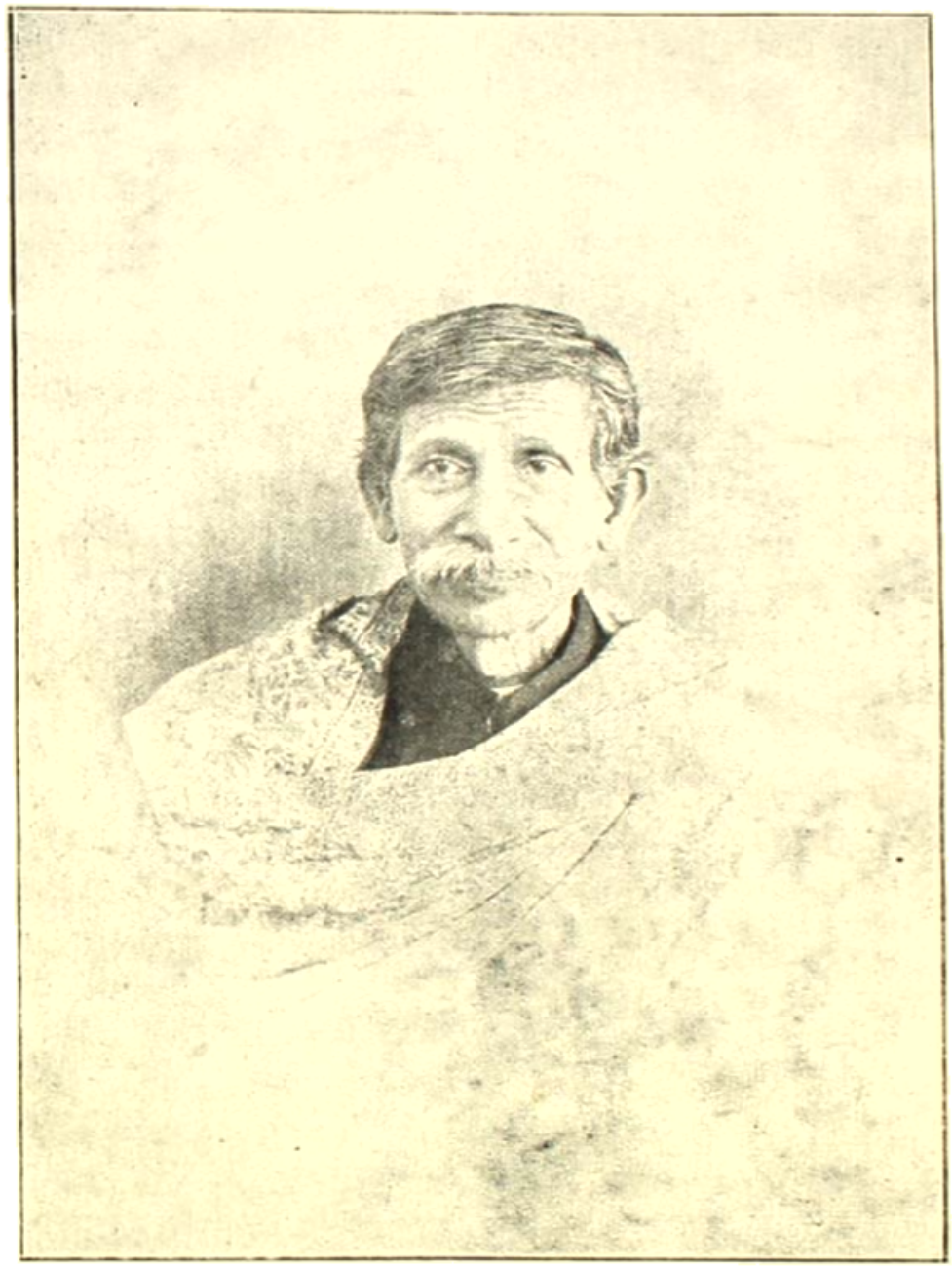

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি

স্বদেশসেবক

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

তাঁহার সভাপতির অভিভাষণটী বেশ সারবান্ হইয়াছে। অনেক কাজের কথা, খাঁটি সত্য, সরলযুক্তি তিনি অবতারণ করিয়াছেন। এবার দুঃখের স্থানাভাব। আমরা আগামী সংখ্যায় মতিবাবুর বক্তৃতার বিশদ আলোচনা করিব। সভায় বহু কাজের কথার অবতারণা হইয়াছিল। আমাদের দেশের সুবক্তারা বেশ মনোজ্ঞ বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। সে গুলিরও আলোচনা আগামী সংখ্যায় হইবে। একটা দুঃখের কথা এবার না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সভায় তেমন লোকসমাগম হয় নাই। বাঙ্গালার স্বদেশসেবকগণ "প্রাদেশিক সম্মিলনে" জমায়েৎ হন নাই। এটা একটা দুর্লক্ষণ বাঙ্গালার "পাব্লিক লাইফে"র নাড়ীর এই দুর্ব্বল স্পন্দনটা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এবার ইষ্টারের ছুটিতে বহু অনেকগুলি সম্মিলনই হইয়াছিল। এখন হইতে এই ঠোকাঠুকি যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

* *
*

লাট কাউন্সিলে বেসরকারি সভ্যগণ

আমরা ইংরাজি শিখিয়াছি। ইংরাজের প্রথা, ইংরাজের ধাঁচ আমাদের হৃদয় খুব অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা এখন পল্লীসংস্কার, পল্লীর পঞ্চায়েৎ মজলিস্, পল্লী-সমাজ সব ভুলিয়া গিয়াছি। আমাদের কর্ত্তাদের কাছে বড়লাট ও ছোটলাটের কাউন্সিলে সদস্যগিরির তারি কদর। মিণ্টো মর্লী সংস্কার আইনের দ্বারা যখন এই সব কাউন্সিলে বেসরকারী সভ্যের দল একটু ভারী করিয়া দেওয়া হইল, তখন আমরা আহ্লাদে আট খানা। বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে ভোটে হারাইয়া মহা আনন্দে দিল্লীতে সদস্যত্ব করিতে ছুটিলেন। কিন্তু যখন দুই জায়গাতেই কর্ত্তারা বড় একটা কাজে পাইলেন না, তখন বোধ হয় তাঁহারা টাল সামলাইতে চেষ্টা করিবেন। এবার কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মিলনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় বঙ্গ কাউন্সিলে তাঁহার প্রশ্ন ও তাহার উত্তরগুলি দাখিল করিয়া একটু আক্ষেপ করিয়াছেন। কাউন্সিলের সদস্য মহোদয়গণের কাছে আমাদের একটা নিবেদন আছে। তাঁহারা অনেকেই বেশ শিক্ষিত, স্বদেশের হিতেচ্ছু এবং খানিকটা কাজ করিবারও অভিলাষ রাখেন। আমরা বেশ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের কাজ ও বক্তৃতাগুলি পর্য্যালোচনা করিয়াছি। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের সহিত একটা সত্য কথা বলিতে হইতেছে। তাঁহাদের কাজের কোনও সুস্পষ্ট সঙ্কল্প বা প্রোগ্রাম ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, অত্যাবশ্যক প্রতিবাদ এবং দুই একটা বিষয় লইয়া প্রস্তাব উত্থাপন ছাড়া বেশী কিছু দেখিলাম না। অবশ্য তাঁহাদের প্রশ্ন ও প্রতিবাদগুলি একেবারে বাতিল করিবার জিনিষ নয়। কিন্তু দেশের রাশি রাশি কাজের কোনও একটাকে কামড়াইয়া ধরিয়া, বক্তৃতার ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা যুক্তির গভীরতার প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া সেই বিষয়টিকে কাউন্সিলে যতবার সুযোগ জোটে, ততবার উপস্থিত করা ত দেখিতে পাইলাম না। স্বর্গীয় গোখলে কত খাটিয়া হিসাব নিকাশ, ফ্যাক্ট্স্ ফিগর্স, যুক্তি তর্ক ঠিক করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবটি দাখিল করিয়াছিলেন। তিনি হারিয়াছেন, তাঁহার

চেষ্টা ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু তিনি আবার তাঁহার প্রস্তাব লইয়া হাজির হইয়াছেন। এবার তিনি নাই, দিল্লীতে প্রাইমারি শিক্ষার কথা কেহই পাড়িলেন না। একজন অক্লান্ত কর্ম্মীর একটা মস্ত আরম্ভ কাজ বাঁচাইয়া রাখিবার কথা কাহারও প্রাণে জাগিল না। অথচ এই বিষয়টির সহিত আমাদের অক্ষর পরিচয় বর্জ্জিত কোটি কোটি লোকের কতটা মঙ্গল জড়িত! গোখলের বজেট বক্তৃতা কি জ্ঞাতব্য কাজের কথায় পূর্ণ থাকিত! তিনি কতদিক হইতে দেশের কল্যাণের কত কথা বলিতেন, তাহার জন্য কি প্রাণান্তকর শ্রম-স্বীকার করিয়া, বিফলতার অবসাদ চাপিয়া রাখিয়া কাউন্সিলে তাঁহার কাজ করিয়া যাইতেন। এখন যাঁহারা কাউন্সিলে সদস্য আছেন, তাঁহাদের অনেক বিষয়ে গোখলে মহোদয়ের অনুসরণ করিতে হইবে। তেমনি করিয়া না খাটিলে চলিবে না। বক্তৃতার আড়ম্বর ও ভাবোচ্ছ্বাস কমাইয়া কেজো কথার অধিক অবতারণা করিতে হইবে। এক একটা দিক ধরিয়া তাহা পুরাদস্তুর আরম্ভ না করিলে আর চলিবে না। ভাসা ভাসা যুক্তি, তরল চটুল বোলচালে ঘরের লোক অথবা গভর্ণমেণ্ট কাহারও মনে ধরিবে না। গোখলের অভাবে কাউন্সিলটা যেন কাণা হইয়া গিয়াছে। সদস্য মহোদয়গণও সংখ্যায় পুষ্ট হইয়াছেন, সুতরাং যেটুকু কাজ করা সম্ভব তাহারও সুযোগ বাড়িয়াছে। এখন আমাদের নিবেদন,—তাঁহারা এক একজন এক একটা কাজ ঠিক করিয়া লউন। কেহ শিক্ষা, কেহ স্বাস্থ্য, অন্য একজন রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়, কেহ আয় ব্যয়, সামরিক ব্যয় সংক্ষেপ, খাজনা কমান, এবং কেহ জন-সাধারণের অধিকারের প্রসার প্রভৃতি বিষয় তলাইয়া বুঝিয়া, কাগজপত্র ঘাঁটিয়া মন্তব্য, যুক্তি, প্রতিপক্ষের উত্তর সবগুলি বেশ একাগ্র-চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া কাউন্সিলে যেটুকু কাজ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন। এইরূপভাবে খাটিলে, এমন করিয়া কর্ত্তব্যে অবহিত হইলে তাঁহাদের কথার মূল্য বাড়িবে। দেশের লোক তাঁহাদের কাছে অনেক জ্ঞানের কথা শুনিবে, আর গভর্ণমেণ্টও অনেক জিনিষের গভীর পরিচয় পাইবেন। নচেৎ একটা বাহোবাহি ব্যাপার করিয়া, কেহ কোনও কিছুর দায়িত্ব ঘাড়ে না লইয়া আসল খাটুনি এড়াইয়া তাঁহারা কি করিতে আশা করেন? যিনি যাহা ভাল জানেন, যে বিষয়টায় তাঁহার অল্পবিস্তর দখল আছে, তাহাতে মনোযোগ দিন। এই কাজটার জন্য সময়, শক্তি ও কিছু অর্থ উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করুন ইহার সফলতার জন্য নিজে-দের অধীনে উপযুক্ত সাহায্যকারী, পরিশ্রমী শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কর্ম্মীর নিয়োগ করা চাই। দেশের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ দুর্দ্দশা, শক্তি ও উপযোগিতার গভীর পরিচয় আবশ্যক। "পাব্লিক লাইফ্"টাকে তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কঠোর খাটুনির সঙ্গে ভাবুকতা, দূরদর্শিতা, মানবচরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির মিশ্রণের একান্ত প্রয়োজন। দেশের মধ্যে পদ মর্য্যাদা, ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে ও শক্তিতে যাঁহারা সম্মানার্হ তাঁহাদের মধ্য হইতেই বেশী ভাগ কাউন্সিলে বাছাই হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের কাজ ও কর্ম্ম-কুশলতার উপর অনেক জিনিষ নির্ভর করিতেছে। আমাদের মাতব্বরগণ যখন অনেক কাঠখড় পোড়াইয়া কাউন্সিলে গিয়াছেন, তখন তাঁহাদের কাছে আমাদের এইরূপ আশা দুরাশা নহে। আর ৺গোখলে

মহাশয় ত অনেক দিকেই পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা এখন এক একজন এক একটী বিষয় লইয়া লাগিয়া থাকুন, আর সেই বিষয়টী নানা ভাবে, নানা যুক্তি ও তর্ক দ্বারা বারংবার পরাক্ষরে দৃক্‌পাত না করিয়া কাউন্সিলে উত্থাপিত করুন।

* *
*

৮। স্বদেশী-শিল্পের সুযোগ

ইউরোপে যুদ্ধ স্বদেশী শিল্পের উন্নতির পক্ষে মস্ত সুযোগ। গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন, ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। কলিকাতায় একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল সেখানে জার্ম্মাণির ও অষ্ট্রীয়ার জিনিষ এবং তাহার পাশেই স্বদেশজাত সেই সব জিনিষ রাখিয়া লোককে স্বদেশী-শিল্পের অস্তিত্ব অবগত করাইবার এবং সেই বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। এখন জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রীয়ার পণ্য ভারতবর্ষের বাজারে আসিতে পায় না। জার্ম্মাণি শিল্পে খুব অগ্রসর। আমাদের বাজার হাট, দোকান পসার সব জার্ম্মাণি জিনিষ ছাইয়া গিয়াছিল। জার্ম্মাণির মত উন্নত শিল্প-বিজ্ঞান জ্ঞানবিশিষ্ট, ধনশালী এবং সমূহবদ্ধ (organised) দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাকে হঠাইয়া আমাদের মাল বেচিবার সম্ভাবনার কথা অল্প সময়ে কেহ ভাবিতেই পারিত না। এদেশে অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রচলিত। রক্ষণশুল্ক (Protective tariff) বসাইয়া আমাদের মত দুর্ব্বল, নির্ধন এবং সমূহ গড়িবার শক্তিহীন জাতির শিশু শিল্প-প্রচেষ্টাগুলি বাঁচাইবার পক্ষে এই খোলা ব্যবসার নিয়মটা প্রকাণ্ড বিঘ্ন। কল কব্জায়, অর্থে, শিক্ষায়, অভিজ্ঞতায়, শক্তিতে এবং জোট বাঁধিবার ক্ষমতায় যাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেকগুণ উন্নত, তাহাদের সহিত আমাদের দেশের লোক কি করিয়া আঁটিয়া উঠিবে আমরা যে সবদিকেই গরীব! তবে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করিতেছে—সেটি আমাদের অভাবের কড়া চাবুক। এখন অনেকেই বুঝিতেছেন, শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আর আমাদের রক্ষা নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই, আমাদের কাছে এই কথাটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। স্বদেশীর দিনে এদিকে বিস্তর চেষ্টাও হইয়াছিল। সেটা আশার যুগ আমাদের জাতির প্রাণে তখন আশার বাণ ডাকিয়াছিল। সুতরাং গরীব ধনী কেহই টাকা দিতে কার্পণ্য করে নাই। আর তিন চার বৎসরকাল চড়াদামে চাক-চিক্যশূন্য জিনিষের হাজার হাজার ক্রেতা জুটিয়াছিল। কিন্তু আমরা সে সময় গুছাইয়া লইতে পারি নাই। অবশ্য সবটার জন্য আমরা দায়ী নহি। স্বদেশীর সঙ্গে একটা আতঙ্ক জুটিয়া শিল্পোন্নতির বিষম দুরূহ করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু আমাদের নিজেদের দোষও বড় কম ছিল না।

(১) কাহারও কোনও অভিজ্ঞতা নাই, অব্যবসায়ীরা ছোট বড় ব্যবসা ফাঁদিয়া দিলেন। ব্যবসায়ীর পক্ষে যে সব গুণের ও জ্ঞানের দরকার, সে গুলির সাধনা না করিয়া, হাতে কলমে কোনও কাজ না শিখিয়া, আমরা কাজ করিতে ছুটিলাম।

(২) জোট বাঁধিতে কোনও দিনই চেষ্টা করা হয় নাই। চারিদিকেই নিজেদের সকলের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখার ঘোল আনা আয়োজন। সুতরাং যৌথকারবারের সফলতার সকল অন্তরায়গুলিই সম্মুখে রাখিয়া যখন আমাদের দেশের লোকেরা কাজে নামিলেন, তখন দেখিতে দেখিতে একে একে তাঁহাদের যৌথ কারবারগুলি লোকসানের গহ্বরে তলাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

(৩) ব্যবসায়ের সাধুতা (commercial integrity) আমাদের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিল না। আমরা গভীর পরিতাপের সহিত সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলাম অসাধুতা নানারূপ ধরিয়া আমাদের ব্যবসায়ের আসর জুড়িয়া বসিতে লাগিল। হায়! হায়! সেদিন কত উৎসাহশীল স্বদেশ প্রেমিকের, দীন দুঃখীর অর্থ উপিয়া গেল এবং একটা প্রগাঢ় বিশ্বাসের মাথায় বাজ পড়িল।

(৪) আমাদের চরিত্রের যে ছাড়া ছাড়া, আল্‌গা আল্‌গা ভাব, যে বিষম শৈথিল্য আমাদের জীবনের ছোট বড় সব চেষ্টা-গুলিকেই খর্ব্ব ও প্রাণহীন করিয়া দেয়, স্বদেশীর যুগে সেটাও আসিয়া জুটিতে বেশী বিলম্ব করে নাই। দিন কত তালপাতার আগুনের মত একটা উৎসাহ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তারপর ক্রমে ক্রমে সব ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করিল। এই নিষ্ঠার (constancy) অভাব চরিত্র ও উদ্দেশ্যের সাধুতাকে পরাস্ত করিয়া কতকগুলি অনুষ্ঠান মাটি করিয়াদিল। সাফল্য যে কি দারুণ ধৈর্য্যের দাবী করে, এখন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝা যাইতেছে।

(৫) তারপর দায়িত্ব বলিয়া একটা জিনিষের খোঁজ খবর সেদিন বিশেষ পাওয়া যায় নাই। আমাদের উৎসাহ ও আবেগ দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে কি লাহনাই না ভোগ করিল! জিনিষটা একটা বারোয়ারি ব্যাপা-রের মত হইয়া উঠিল। কিন্তু বারোয়ারির উৎসাহ ক'দিন রহে? কাজগুলি সকলের কাজ, সুতরাং কাহারও কাজ নহে। দেখিতে দেখিতে আমাদের বড় আশার বড় সাধের প্রারম্ভগুলি বিফলতায় ডুবিয়া গেল।

(৬) প্রয়োজনের উপযোগী টাকার অভাবও একটা মস্ত বাধা। ব্যাঙ্কে আমাদের ধার মিলে না। আর লোকসান সঙ্কুলানের জন্য অথবা জরুরি কাজের নিমিত্ত আমাদের হাতে টাকা মজুত থাকিত না। প্রায় সর্ব্বত্রই মাছের তেলে মাছ ভাজিবার চেষ্টা। যাঁহারা টাকা দিলেন তাঁহাদের কাছে এই সব অসুবিধা দূর করিবার মত প্রচুর টাকা পাওয়া যাইত না। ইহাতেও অনেক চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

(৭) জিনিষের পারিপাট্য, সুলভতা ও উপযোগিতার দিকে সে যাত্রায় তেমন মন দেওয়া হয় নাই। লোকের স্বদেশানুরাগের উপর একটা দুর্ব্বহ শুল্ক বসান হইয়াছিল। স্বদেশী জিনিষ, সুতরাং এক স্বদেশী ছাপের জোরেই কাটিয়া যাইবে। অবশ্য কেহ মনে করিবেন না আমাদের সব জিনিষগুলিই সমাকার, অকেজো বা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই স্বদেশী পণ্য বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতার উপযুক্ত পরিপাটী মজবুত ও সুলভ হয় নাই।

(৮) যাঁহারা বিশেষজ্ঞ সাজিয়া আসিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও সঙ্কীর্ণ। মূলধন, বাজার, ক্রেতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি সবদিক জড়াইয়া বুঝিয়া কারবার চালানর মত জ্ঞান নিতান্ত অভাব ছিল। এ দেশের অবস্থার উপ-যোগিতা, বাজারের অভিজ্ঞতা (know-ledge of the market) এবং শিল্প সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান (expert knowledge) আমরা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই নাই।

(৯) কেজো জিনিষের চেয়ে সৌখীন পোষাকী জিনিষেই যেন আমাদের মনটা বেশী ঢলিয়াছিল। অবশ্য এজন্য এই ভোগ-লালসাতুর বিলাসমুখী নূতন সভ্যতার দায়িত্ব বড় কম নহে। কোন্ জিনিষের প্রয়োজন অধিক, কিসের কাটতির সম্ভব এবং কি কি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অল্প হওয়া সম্ভব, সে সব বিষয়ে তখন তত্তটা দৃষ্টি ছিল না।

(১০) একটা স্বদেশী "বণিক সভা" বাড়িয়া উঠে নাই। চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু কাজে কিছু হইল না। পরস্পরে যেখানে সহযোগিতার দরকার, সেখানে একজন স্বদেশী ব্যবসায়ী আর একজন স্বদেশী ব্যবসায়ীর সহিত আড়া আড়ি জুড়িয়াদিল অথবা পরস্পরের মধ্যে একটা নির্ম্মম ঔদাসীন্যের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল।

(১১) সকল রকম স্বদেশী জিনিষের একত্র সমাবেশ হইয়া উঠিল না। কর্ত্তারা বক্তৃতা করিলেন এবার স্থায়ী স্বদেশী প্রদর্শনী (museum) খোলা হইবে। কিন্তু কোন্ শুভ বৎসরের নূতন পঞ্জিকার কোন্ শুভলগ্নে তাঁহাদের অঙ্গীকার পালন করিবেন তাহা বিধাতাপুরুষই বলিতে পারেন। কন্‌ফারেন্সে স্বদেশী জিনিষের প্রচলনের জন্য রেজলুশন করা হয়, প্রাণ মাতান বক্তৃতারও অভাব ঘটে না। কিন্তু কি কি স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যায়, তাহাদের মূল্য কত, দেখিতে কেমন,

কিরূপ মজবুত, কোথায় পাওয়া যায়, পাইকারী দর ও কমিশনের হারের পরিমাণ প্রভৃতি সবিস্তারে জানাইয়া দেওয়া দরকার। আর, সব রকম জিনিষ যাহাতে এক যায়গায় পাওয়া যায় তাহার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। এই স্বদেশী বাজার ব্যবসায় কেন্দ্রের কাছে, লোকের পক্ষে সুগম স্থানে খুলিতে হইবে। বিবিধ ইংরাজী বাঙ্গালা দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজে মাসে মাসে স্বদেশী বাজারের জিনিষ ও তাহার মূল্য ছাপাইয়া দিলে খুব ভাল হয়। ক্যাপিট্যাল কাগজ বিলাতী কাপড়, পাট, কয়লা, প্রভৃতির বাজারের সংক্ষিপ্ত খবর ছাপিয়া কাজের অনেকটা সুবিধা করিয়া দেয়।

(১২) স্বদেশী জিনিষের যাঁহারা প্রস্তুতকারী, যেমন বোম্বাই কাপড়ের কলওয়ালা, এখানকার জুতার ট্যানারি ওয়ালা প্রভৃতি, তাঁহাদিগকেও এখন একটু ভাবিতে হইবে। তাঁহাদের লাভের আশাটা কমাইয়া এখন মজবুত, সস্তা, সুদৃশ্য মাল তৈয়ারি করুন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বোম্বাই কল ওয়ালারা খুব বেশী পরিমাণে লাভ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন দেখিতে হইবে স্বর্ণ ডিম্ব প্রসূতি হংসীটি যাহাতে বাঁচিয়া থাকে। সোণার ডিমের লোভে আমরা যেন তাহার পেট চিরিয়া না ফেলি। কারণ হংসীটি যত অধিকদিন বাঁচে ততই লাভ। দুই চার বছরে বড় লোক হওয়ার দুরাশা ছাড়িয়া যেন আমরা অল্প লাভে বেশীদিন ব্যবসা বজায় রাখিতে পারি। যাঁহারা নূতন ব্যবসায়ে নামিতেছেন, তাঁহারা যেন রাতারাতি বড়লোক হইবার দুঃস্বপ্ন ত্যাগ করেন। ব্যবসায়ে ধৈর্য্য চাই। রহিয়া বসিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিতে হইবে। তাহাতে নিজেরও মঙ্গল দেশেরও মঙ্গল। আর সফলতার এমনি একটা সংক্রামক শক্তি আছে যে, দেশের লোক যদি আজ দেখিতে পায় স্বদেশী প্রচেষ্টায় কোথাও বেশ লাভ হইতেছে, লোকে বেশ সাধুতার সহিত খাটিতেছে, একটা সমবায় শক্তি গড়িয়া উঠিতেছে তখন তাহারা টাকা দিতে নারাজ হইবে না। দেশে মূলধন পাওয়া যাইবে। কাজের লোক আসিয়া আর বসিয়া থাকিবে না। বাস্তবিকই আমরা দেখিব "Nothing succeeds like success"—দুই চারিটা কাজে সফল হইলে আরও দশ বিশটা কাজে আমরা সফল হইতে পারিব।

(১৩) আর ক্রেতা মহাশয়গণেরও স্বদেশী পণ্যের প্রতি অনুরাগ কর্পূরের মত কিছুদিন সুগন্ধে আমোদিত করিয়া কর্পূরের মতই উবিয়া গিয়াছে। আমাদের শিল্প অনুষ্ঠানগুলির পথে কত বিঘ্ন, কত অন্তরায়, কি মারাত্মক প্রতিযোগিতা একথাগুলি তাঁহারা একটু তাড়াতাড়ি ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বারবার প্রতিজ্ঞা ও সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্র প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের হাতে পড়িয়া কি অপমানই না ভুগিতেছে! স্বদেশী শিল্পকে জগতের শক্তিশালী জাতিদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য কোনওরূপ রক্ষা শুল্ক বসান আমাদের হাতে নাই। কিন্তু এই দারুণ দুরবস্থায় স্বদেশের ও স্বজাতির মুখ চাহিয়া স্বদেশী শিল্পের মরণ বাচনের সঙ্কটে আমাদের মায়ের দেওয়া জিনিষগুলির প্রতি অনুরাগ দেখান কি আজ আমাদের একটা অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য বা ধর্ম্ম নয়? এই স্বদেশ প্রেমের শুল্ক (tariff of love) ও আমাদেরই হাতে। আর ইহাই আমাদের আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। সুতরাং ভারতবর্ষের সুসন্তানগণ আজ এই ব্রতটীর কথা মনে রাখিবেন।

এখন এইসব দোষগুলির প্রতীকার করিয়া আবার কার্য্যারম্ভের শুভলগ্ন দেখা দিয়াছে। এই লগ্ন যেন পার হইয়া না যায়। আশ্বিনের বিরাট পণ্যস্তূপের পথ আজ রুদ্ধ। অট্টীয়ার মালও আর বাজারে ঢুকিতে পাইবে না। সুতরাং এই শুভ অবসরে আমাদের জাগিয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ব্যবসায়ে ওস্তাদ্ জাপান তাহার মাল আমদানি করিয়া বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। অতএব আমাদের বুঝা উচিত "Now or never"—এখন না হইলে আর কখনও হইবে না। কর্ত্তারা এ বিষয়ে অবহিত হউন। তাঁহারা কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শসভা ডাকুন। বিদেশের কোন্

কোন্ ব্যবসা আমরা এখন হাত করিতে পারি তাহা বিচক্ষণতার সহিত নির্ণয় করিয়া দেশের ধনী মহাশয়দের কাছে বার বার এই সুযোগের কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে। উপযুক্ত চরিত্রবান্, শ্রমসহিষ্ণু, নিপুণ বিশেষজ্ঞ বাছিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া, কার্য্যারম্ভ করা চাই। ইংরোপও আমেরিকা হইতে নানা শিল্পশিক্ষা করিয়া, বিদেশের ফ্যাক্টরিতে হাতে কলমে কাজ শিখিয়া কয়েকজন কৃতবিদ্য বিশেষজ্ঞও আজ "বিজ্ঞান এবং বাণিজ্য উন্নতিবিধায়িনী" (Association for the advancement of science and industry) সভার কল্যাণে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে, তাঁহাদের কাজে লাগাইতে হইবে। রাতারাতি বড়মানুষ হইব, ছয় মাস অথবা একবছরে লাভের মুখ দেখিব প্রভৃতি দুরাশাগুলি দমন করিয়া ধীরভাবে পুরাপুরি কাজের মতলবে কোমরপ্রথাদ কাজ আরম্ভ করা আজ নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে। যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া মূলধনের মুণ্ডা ভাঙিতে পারিতেছেন না, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের পাষাণ প্রাচীরে যে সব নিপুণ চরিত্রবান্ অভিজ্ঞশিল্পীর মাথা ঠুকিয়া যাইতেছে, তাঁহারা হয়ত এখন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহারা প্রাণে নব আশা, নবীন সংকল্প জাগাইয়া তুলুন। বিফলতা উপেক্ষা করিয়া, অবসাদ নৈরাশ্য চাপিয়া রাখিয়া আবার তাঁহারা কর্ত্তাদের ও ধনী মহোদয়গণের নিকট তাঁহাদের নিজ নিজ শিল্প প্রচেষ্টার কথা বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন। দেশকে আজ এই নিদারুণ কর্ত্তব্যবিমুখতার হাত হইতে উদ্ধার করা, এই সোণার সুযোগটীকে সার্থক করিয়া তোলা, বঙ্গলক্ষ্মী তথা, ভারতলক্ষ্মীর প্রসন্ন হাস্য চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া আজ তাঁহাদেরই কাজ। যাঁহারা দেশে স্বদেশীর উদ্বোধনমন্ত্র পড়াইয়াছিলেন, সেই-সব নেতা মহোদয়গণ বুঝুন, আজ তাঁহাদের স্বপ্ন সফল হইবার শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। যাঁহাদের অর্থ আছে তাঁহাদেরও বুঝিবার এই সময়—তাঁহাদের টাকা কাজে খাটাইবার এমন সুযোগ আর জুটিবে না। আমরা ত গত কয় বৎসর ঠেকিয়া অনেক তত্ত্ব শিখিলাম এই নব প্রচেষ্টায় ঠেকিয়া শেখা তত্ত্বগুলি আমাদের প্রকৃত পথ চিনাইয়া দিবে। কারণ এগুলি আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। এই অশ্রুসিক্ত বেদনার দানগুলি আজ আমরা মাথায় করিয়া লইব। আবার আমরা বুকে আশা লইয়া চরিত্র নির্ম্মল করিয়া, কর্ম্মশক্তি ও নিপুণতার উপর দাঁড়াইয়া এই যে প্রাতর্ম্বিতা সূত্র অপেক্ষাকৃত অল্প বাধা-বিঘ্ন সমন্বিত কার্য্যের ক্ষেত্র আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহাতে ভগবানের আশীর্ব্বাদ মাথায় ধরিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতে নামিব। আবার আমাদের মরা গাঙে একটা বান ডাকিয়াছে। নাবিক, কর্ণধার, দাঁড়ী কেহই আজ বসিয়া থাকিও না। কুলললনাগণ আজ শঙ্খধ্বনি করুন। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণ আজ ভাণ্ডার খুলিয়া দিন, নেতৃগণ আবার মাতৈঃ বাণী উচ্চারণ করিয়া স্বদেশীর পুণ্যবোধন জুড়িয়া দিন। আর দেশজননীর সন্তানগণ তাঁহাদের দারিদ্র্যের পবিত্রতা ও গুরুত্ব স্মরণ করুন। এই মাহেন্দ্রযোগে যাত্রা করিতে হইবে, বিধাতা প্রসন্ন হইয়া এই দুঃখী জাতির প্রাণের ডাক শুনিবেন। আশা হয় এই শুভ মুহূর্ত্তে কার্য্যারম্ভ করিলে আর বিফলতার লাঞ্ছনা আসিবে না।

নাট্যসাহিত্যে অমরমঙ্গল

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

মহারাণা অমরসিংহ

(৬)

'দেবীর' যুদ্ধে পরাজয়ের পর দিল্লীশ্বরের অবশিষ্ট সেনা রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সকল সংবাদ দিল। সম্রাট সমস্ত শুনিয়া মানসিংহকে অপমানিত করিলেন। মানসিংহের দোষেই তাঁহার এই পরাভব। কারণ মানসিংহের পরামর্শে তিনি মেবার আক্রমণের অভিযান করিয়াছিলেন। এইভাবে অপমানিত হওয়াতে মানসিংহের কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল; তাহা ইতিহাস পাঠে সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু এই নাটকে মানসিংহের এই অবস্থা অতি মর্ম্মান্তিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। ধর্ম্মাধর্ম্মকে বাদ দিয়া কেবল রাজনীতি লইয়া মানসিংহের চরিত্র সমালোচনা করিলে বোধ হয় ঐতিহাসিকের চক্ষে কোনও দোষ পরিলক্ষিত না ও হইতে পারে। কিন্তু হিন্দুর চক্ষে রাজনীতি অপেক্ষা ধর্ম্মাধর্ম্ম অনেক বড়। এই জন্য মানসিংহের চরিত্রে স্বধর্ম্মের পরিপাক না দেখিতে পাইলে কেমন যেন সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত

ভ্রম সংশোধন

পূর্ব্ব প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদে অনেকগুলি অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে।
সেগুলি সংশোধন করিয়া দিলাম। আশা করি পাঠক!
সেগুলি মিলাইয়া পাঠ করিবেন।

	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি		অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি
১।	আদেশ	আদেশ	৪৭৬	২৮	১২।	সেজন্ত	নেজন্ত	৪৮২	৪
২।	প্রতাপকং	প্রতাপস্ত	ঐ	২৪	১৩।	প্রত্যাগ্রাহোদ	প্রত্যগ্রাহোদ	৪৮৩	২৫
৩।	কুলমিবং	কুলমবং	ঐ	২৫	১৪।	পুরপক্ষং	পুরপক্ষং	৪৮৪	২৩
৪।	লাহলদা	লাহলস্ত	৪৭৭	২৯	১৫।	নিধিস্তা	নিধিস্তা	৪৮৪	২৫
৫।	মো হরিঃ	মো হরি	৪৭৯	৪	১৬।	নাস্তং	নস্তেং	ঐ	ঐ
৬।	ঘীটান্	ঘীটান্	ঐ	১৭	১৭।	ভীষং	ভীমং	৪৮৫	২২
৭।	অনবাসরো	অনবসরো	৪৮০	২	১৮।	তৃপসিব	তৃপসিব	ঐ	২৪
৮।	কুলাজনা	কুলাজনা	ঐ	২১	১৯।	গীতং	গীতং	ঐ	২৪
৯।	তবিস্তার	তবিস্তারে	ঐ	২৩	২০।	হস্ত	হস্ত	৪৮৫	২৬
১০।	রসময়াঃ	রসময়া	৪৮০	২২	২১।	কাত্রগর্ব্বে	কাত্রগৌরবে	৪৮৫	১৮
১১।	ত্রাহ্	ত্রাহ্	৪৮১	২৫	২২।	সমুদ্ভত	সমুদ্ভল	৪৮৫	১৮

হয় না। এই কারণে এই নাটকের ষষ্ঠাঙ্কে মানসিংহের পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহজন্মে হয় ত পাপের ফলভোগ অনেকস্থলে না ও হইতে পারে; কিন্তু নাটকে চরিত্রের চিত্রণ ব্যাপদেশে পুণ্যবানের সহিত পাপীর সমফল দেখাইলে পুণ্যচরিত্রের প্রতি প্রেক্ষাবানের শ্রদ্ধা হইতে পারে না। এইজন্য নাটকে পাপীর প্রায়শ্চিত্তও দেখান আবশ্যক। এই কারণে মানসিংহের প্রায়শ্চিত্ত ব্যাপার এই নাটকের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ হইয়াছে। মানসিংহের চরিত্র বর্ণনা স্থলেই এই অংশ পাঠকবর্গের গোচর করিব।

সপ্তম অঙ্কেও মানসিংহের পূর্ব্ব প্রয়োগ নৈপুণ্য বেশ উপলব্ধি করা যায়। মহারাণা অমরসিংহের চণ্ডবংশীয় ও শক্তবংশীয় বীরেরা বিশেষ অনুগত ছিল। বলা বাহুল্য এই বংশদ্বয়ই একরূপ তাঁহার প্রধান ভরসা-স্থল ছিল। ইহাঁদেরই সাহায্যে তিনি যুদ্ধে জয়লাভের অনেকটা আশা করিতেন। এই উভয় বংশের যদি অন্তর্ভেদ-জন্মাইয়া দেওয়া যায় তবে অমরসিংহ যে অনেকটা লঘু হইবেন, তাহা মানসিংহ বুঝিতেন। এই জন্য ইহাদের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি গূঢ়চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চরেরা উভয়বংশের হৃদয়ঙ্গমে পরস্পরের দ্বেষ উৎপাদনের জন্য যত্ন করিয়া অনেকটা কৃত-কার্য্যও হইয়াছিল। এই কৃতকার্য্যতার ফল সপ্তমাঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রতি-রোধের উপায়ও বর্ণিত হইয়াছে। এই আত্মকলহের নিবারণ ব্যপদেশে অমরসিংহের রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় বড় মনোহর। বাস্তবিক এই নাটকে অনেকস্থলে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রয়োগ ও প্রতিসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা 'মুদ্রা-রাক্ষস' নাটকেরই অনু-রূপ। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে চাণক্য ও নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষসের মধ্যে যে সমস্ত প্রয়োগনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয় তাহা যেমন অপূর্ব্ব; এই নাটকেও তেমনি অমরসিংহ ও মানসিংহের প্রয়োগনৈপুণ্যও অপূর্ব্ব। অথচ পরস্পর বিভিন্ন। দুইখানা নাটক পড়িলেই তাহা বুঝা যায়। এই শ্রেণীর নাটক সংস্কৃত-সাহিত্যে বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পই দেখা যায়। ঐতিহাসিকের নাটক 'মুদ্রা-রাক্ষসের' ন্যায় এই 'অমর-মঙ্গল'ও যে সংস্কৃত-সাহিত্যের একটা গৌরবস্থল হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য ঘটনা-বৈচিত্র্যে মুদ্রা রাক্ষস অপেক্ষাও এই নাটকে আমরা উৎকর্ষ দেখিতে পাই। অন্য কথা যাউক এক্ষণে চণ্ডশক্তবংশের বিরোধের কথা বলা যাইতেছে।

সপ্তমাঙ্কের প্রথমেই ভগসিংহ বলিতে-ছেন,—

"সুসজ্জিতা বাহিনী। কিন্তু যাবদস্মাদনু-কূলং দেবাদেশং নাধিগচ্ছামি তাবন্ন মে সজ্জতি মনঃ সমরায়।

যতঃ—শক্তানাং প্রবল শৌর্য্য গুণানুরক্তা
মেবার রাজমুপযাতি রণে জয়শ্রীঃ।
কিন্তু,—সেনাগ্রভাগ পরিচালন গৌরবেণ
চণ্ডান্বয়ো ভবতি কীর্ত্তিবিশেষ ভাগী।"

অর্থাৎ "বাহিনী সুসজ্জিতা হইয়াছে, কিন্তু যতক্ষণ আমার অনুকূল রাজার আদেশ না পাইতেছি, ততক্ষণ সমরে আমার মন আসক্ত হইতেছে না। কারণ শক্ত বংশের প্রবল শৌর্য্যগুণে অনুরক্ত বিজয়লক্ষ্মী মেবার রাজের নিকট উপস্থিত হ'ন। কিন্তু সেনার অগ্রভাগের পরিচালনা-গৌরবে চণ্ড-বংশীয়েরাই কীর্ত্তিভাগী হন।" ইহাই শক্ত-তনয় ভগসিংহের অনয়। শালুম্বাপতি ও

বান্দাঠাকুর প্রভৃতি চণ্ডবংশীয়। শালুম্বাপতি মহারাণার সঙ্গে থাকিয়াই উপস্থিত রণচর্য্যা করেন, এজন্য কেবল বান্দাঠাকুর অধুনা সেনাগ্রভাগ পরিচালনা করেন, নচেৎ শালুম্বাপতির নেতৃত্বে বান্দাঠাকুর প্রভৃতি চণ্ডবংশীয়েরাই সেনাগ্রভাগ পরিচালনা করিতেন। এইজন্য উপস্থিত তপসিংহের বান্দাঠাকুরের সঙ্গেই বিরোধ। এই বিরোধের মূল মানসিংহের গুপ্তচর। তাহারাই তপসিংহকে বুঝাইয়াছে যে, "আপনাদের যেমন শৌর্য্যবীর্য্য আছে, তখন আপনাদিগেরই সেনাগ্রভাগের নেতৃত্বলাভ করাই উচিত।" তপসিংহও বুঝিয়াছেন 'ঠিক ত' আমি কিসে চণ্ডবংশীয় অপেক্ষা হীন যে সেনাগ্রনেতৃত্ব[১] পাইব না। এই অভিমানাগ্নি অল্পে অল্পে প্রধূমিত হইয়া আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। 'দেবীর' যুদ্ধের পর দিল্লীশ্বরের সেনার সঙ্গে আরও কতবার তপসিংহ যুদ্ধ করিয়া অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য দিল্লীশ্বর পর্য্যায়ক্রমে অমরসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বহুবার পরাজিত হইয়াছেন। বহুবারই শক্ত বংশের অশেষ শৌর্য্যবীর্য্য মহারাণা অনুভব করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বেও 'রণপুরের' যুদ্ধে তপসিংহের পুত্র 'পূর্ণমল্লের' আত্মোৎসর্গ সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া তপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, যদি সেনাগ্রনেতৃত্ব পাই, তবেই যুদ্ধে যাইব নচেৎ নহে। এদিকে চণ্ডবংশীয়েরাও তাহা ছাড়িবার পাত্র নহেন। কলহ শেষে স্বন্দযুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইল। চিতোর উদ্ধারের উদ্যোগের সময়ে এই বিরোধ মহারাণাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। কারণ, দিল্লীশ্বর এই সময়ে মানসিংহকে তেমন বিশ্বাস করেন না। মানসিংহের ঘন্নাভাবে চিতোর নগরের রক্ষার উপায় অনেকটা শিথিল। তিনি তৃতীয়াকে স্বসেনাপতিকে চিতোর নগরের রক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন—তাঁহার অভাবে সেনারা তাহাতে আর তত সাবহিত নহে। এদিকে দিল্লীশ্বর 'সাগরসিংহকে' চিতোর নগর শাসনের ভার দিয়াছিলেন। দেশদ্রোহী সাগরসিংহ প্রতাপ পক্ষ ত্যাগ করিয়া সম্রাটের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার এই আদর। অমরসিংহ বুঝিয়াছেন—"সাগরসিংহ কাপুরুষ, এবং তাঁহার চরের কৌশলে অধুনা অনেকটা সাগরসিংহের মত হইবার সম্ভাবনাও আছে। এই সময় চিতোর আক্রমণ করিলে জয় অনিবার্য্য। অতএব তিনি সৈন্য সজ্জিত করিয়া চিতোর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই অবসরে চণ্ডশাক্ত বংশের বিরোধ তাঁহার চিতোর আক্রমণের বাধা জন্মাইয়া দিল। তিনি সবই বুঝিলেন। মানসিংহের প্রয়োগ নৈপুণ্যও অবগত হইলেন। ভবিষ্যতে কি কি ঘটিবে—তাহা তিনি নখদর্পণে দেখিতে পাইলেন। এই বিরোধ প্রশমনের উপায়ও পর পর ভাবিয়া ঠিক করিলেন। পশ্চাৎ একলিঙ্গ নাথের পুরোহিত শৈলদেবকে ডাকিয়া যথাযোগ্য নিবেদনের সহিত—তাহাদের প্রবোধের নিমিত্ত পাঠাইলেন। তপসিংহ ও

১। সেনাগ্রনেতৃত্ব শব্দের অর্থ—সমগ্র সেনার অগ্রে থাকিয়া তাহাদের পরিচালনা।

২। 'তপসিংহের' ইতিহাসোক্ত নাম 'তপজী' 'জী' শব্দ গৌরবার্থক। কিন্তু তাঁহাদের কৌলিক উপাধি 'সিংহ' এজন্য গ্রন্থকার 'তপসিংহ' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ 'সাগরসিংহের' বেলাও বুঝিতে হইবে। 'সাগরজী' অমরসিংহের পিতৃব্য।

বাঘাঠাকুর তখন খড়্গোত্তোলন করিয়া পরস্পর যুদ্ধে উদ্যত। পুরোহিত দেখিলেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত,—তাড়াতাড়ি জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—

"ভোভোশ্চণ্ডশক্তকুলপ্রবীরৌ বিরম্যতাং
বিরম্যতাং।
অস্ত্রভৃদ্বেঃ পরিক্লেশহানয়ে ভবদায়ুধম্
ন তৎ ক্লেশকৃতে ভ্রাতৃনাশায়
বিনিযুজ্যতাম্"।

ব্রাহ্মণের আদেশে উভয়ে তখন যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন বটে, কিন্তু মনের কালিমা গেল না। তখন শৈলদেব নানারূপে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। ভ্রাতৃবিরোধ এই রূপেই হয়। তখন ব্রাহ্মণ মহারাণার শেষ আদেশ শুনাইলেন,—

"যৌপক্ষাবস্তলাদুর্গং সমমাক্রামতাং পৃথক্।
প্রাগন্তর্বিশতস্তত্র ভাব্যা সেনাগ্রনেতৃতা"।

অর্থাৎ "দুই পক্ষই এককালীন 'অস্তলা' * দুর্গ পৃথক্ ভাবে আক্রমণ করুক। তাহাতে যে পক্ষ অগ্রে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবে, সেই পক্ষেরই সেনাগ্রনেতৃতা হইবে।" এই কথা শুনিয়া ভগসিংহ ও বাঘাঠাকুর তাহাতেই সম্মত হইলেন, এবং সত্বর অস্তলা দুর্গ আক্রমণ জন্য ধাবিত হইলেন। মহারাণার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। এইরূপ ক্ষেত্রে দুর্গজয় অনিবার্য্য, অথচ সেনাগ্রনেতৃত্ব লইয়া আত্মকলহের শান্তিও অনিবার্য্য। তাই পুরোহিত মহাশয়ের মুখেই রাজার প্রশংসা শুনিতে পাই।—

"দিষ্ট্যা কিল অন্তঃক্ষোভ নিবারণায় পর-প্রয়োগেন পরোৎসাদনায় চ আনাতি প্রাপ্তকাল মাচরিতুং রাজা।" পরের প্রয়োগে পরকে বিনাশ করা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কাজ সন্দেহ নাই। এইখানেই সপ্তমাঙ্কের শেষ। চিতোর উদ্ধারের বৈচিত্র্য ক্রমেই দেখান হইতেছে।

(৭)

চণ্ডশক্তবংশীয়েরা 'অস্তলা' দুর্গ জয়ের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন ও মহারাণা চিতোর উদ্ধারের নিমিত্ত আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি গোপনে গোপনে চিতোর আক্রমণের পথ সমূহ স্বসৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করিলেন। কোথাও নূতন পথ প্রস্তুত করিলেন। চিতোর নগরের পাহাড়ের উপর প্রচ্ছন্ন ভাবে সৈন্য-সমাবেশিত করিতে লাগিলেন। পাহাড়ের উপর যে চিতোর দুর্গ ছিল, তাহার চারি পার্শ্বে বিভিন্ন ভাবে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। এমনি ভাবে সৈন্য সজ্জিত করিলেন যে, দুর্গ হইতে কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইলেও সৈন্যদের কিছুই অপকার হইবে না, অথচ সৈন্যেরাও দুর্গ আক্রমণ করিতে পারিবে। এইজন্য সমষ্টিভাবে সৈন্যসজ্জা হয় নাই, কোথায়ও মুষ্টিমেয় সৈন্য কোথাও বা বহুসৈন্য, কোনস্থলে নিবিড় সৈন্যব্যূহ, কোনস্থলে বিরল-সৈন্য-বাহিনী। যথাযোগ্য অস্ত্রশস্ত্রও তদনুসারে সজ্জিত হইল। দুর্গাধিপতি সাগর সিংহ কাপুরুষতা বশতঃ হউক অথবা রণচর্য্যায় আগ্রহ না থাকার জন্যই হউক, তিনি অমরসিংহের এই কার্য্য প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই। যে কারণেই হউক সাগরসিংহের কোনরূপ

* 'অস্তলা'—ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান বিশেষের নাম। ঐ স্থানে মেবারপতিদিগের 'অস্তলা' নামেই একটী দুর্গ ছিল। মিবীশ্বর প্রতাপসিংহের নিকট হইতে ঐ দুর্গ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত ঐ দুর্গ তাঁহার হস্তেই ছিল। রণনীতি নিপুণ অমরসিংহের কৌশলে ঐ দুর্গ আবার তাঁহার হস্তগত হয়।

P29472

উদ্যোগ দেখা গেল না। মানসিংহের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দিল্লীশ্বরও সাগরসিংহের উপর ভার দিয়া নিশ্চেষ্ট। এরূপ সুযোগ অমরসিংহ কি ত্যাগ করিতে পারেন ?

এদিকে মহারাণা অমরসিংহের গুরুদেব ভীমানন্দ অরণ্যবাস ত্যাগ করিয়া চিতোর উদ্ধারের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। ক্ষাত্র-তেজের সহিত ব্রাহ্মণ্যতেজ মিলিত হইল। ভীমানন্দ চিতোরেশ্বরী মন্দিরে রাজার দুর্দ্দৈব শান্তির ব্যবস্থা করিলেন। পুরোহিত শৈলদেব সাগরসিংহের প্রবোধের নিমিত্ত যে দুইজন চর প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাহারা সাগর সিংহের সভাপণ্ডিত হইয়া শিশোদ বংশের গৌরব কীর্ত্তন করিতে লাগিল, প্রতাপসিংহের চারিত্রালাপন, অমরসিংহের গুণগানও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। সদসদ্‌কার্য্যবিচার দ্বারা সাগরসিংহের চক্ষু উন্মীলনের চেষ্টাও চলিতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে অমরসিংহ চিতোর উদ্ধারের আয়োজন করিয়া একদিন শুভলগ্নে শালুম্বা-পতির সহিত চিতোর উদ্দেশে চলিলেন। তাঁহার বিশ্বাসী গূঢ়পুরুষ পথ দেখাইয়া চলিল। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, "মহা-রাণার এই যে গোপনে চিতোর আক্রমণের চেষ্টায় তাঁহার ধীরোদাত্ত চরিত্রের কি হানি হইতেছে না ?" কথা সত্য, কিন্তু দিল্লীশ্বরের সঙ্গে মহারাণার তুলনা করিলে এবিষয়ে কিছুই দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক দিকে দিল্লীশ্বরের অসীম সৈন্যবল, অসংখ্য নূতন নূতন অস্ত্র, বিপুল বাহিনী। অন্য দিকে মহারাণার মুষ্টিমেয় সৈন্য, সেই পুরাতন কালের অস্ত্রশস্ত্র, আর সৈন্য বাহিনীও অল্প। বিশেষতঃ এযুদ্ধও ধর্ম্ম যুদ্ধ নহে। একজন উৎপীড়িত, আর একজন উৎপীড়ক। এক-জন নিজের দেশ উদ্ধারের চেষ্টায় অক্লান্ত শ্রমে কাতর, অপর জন পরের দেশ কাড়িয়া লইবার জন্য ব্যাপৃত। অমিত বলের সঙ্গে অসম বলের অধর্ম্ম যুদ্ধে এইরূপ পন্থা অবলম্বন ব্যতীত উপায়ান্তর আছে কি ? বিশেষতঃ দিল্লীশ্বর আততায়ী। আততায়ীকে যে কোন উপায়ে বিনাশ করা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনভিপ্রেত নহে। তথাপি অমরসিংহের এই কার্য্যে আগ্রহ ছিল না, তিনি এজন্য সততই গ্লানি অনুভব করিতেন। কিন্তু তাঁহার গুরুদেব ভীমানন্দের আদেশেই তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে অপর একস্থলেও তাহা দেখাইয়াছি। বিশেষতঃ এই গুরু আদেশে কপটাচার দ্বারাও তাঁহার চারিত্র্য উৎকর্ষও ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গুরুচরণে তাঁহার সমস্তই উৎসর্গীকৃত। গুরুর আদেশই তাঁহার বেদবাণী। তিনি ইহাই জানেন—"যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" বাস্তবিক সুখভোগ নিমিত্ত তাঁহার এই দেশজয় নহে, বিলাসব্যসনের নিমিত্ত তাঁহার এ ঐশ্বর্য্য-কামনা নহে, আধিপত্য বিস্তারের জন্যও তাঁহার এই রাজত্ব নহে। তিনি ইহাই চান—পিতার শেষ আদেশ প্রতিপালিত হউক, মানুষেরা স্বধর্ম্মনিরত হউক, দেশচক্তিও সকলের অন্তরে বিরাজ করুক। এই উচ্চ আশা লইয়াই তাঁহার রণচর্য্যা, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠাই তাঁহার মহদুদ্দেশ্য। তথাপি তাঁহার গোপনে চিতোরোদ্ধারের প্রযত্নে অন্তরে যে একটা গভীর অশান্তি, ও একটা গুরুবেদনা বিরাজ করিতে ছিল—তাহা তাঁহার উক্তিতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

"রাজা (নিঃশ্বস্য) শালুম্বাপতে! স্বয়ম্ভু-ভবান্ পরবঞ্চনায় গৃহীতং বেশান্তরং ইদানী-মেব পরিত্যক্তবানস্মি।"

তিনি ছদ্মবেশে চিতোরে যাইতেছিলেন, যতদূর ছদ্মবেশের প্রয়োজন ছিল—ততদূর তিনি তাহাই পরিধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন—তাহাই শালুম্বাপতিকে বলিতেছিলেন। এই ভাবে তিনি যখন চিতোরের পথে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বড় মনোহর। তিনি বলিতেছেন,—

"মৎ পূর্ব্বপুরুষ পদাম্বুজ পাতপূতা
পন্থা চকাস্তি পদবীব দিবো মমৈষা।
যাবাশ্রিতস্য সহসা পরম প্রমোদাদ্
দুঃখং চিরাদুপচিতং বিলয়ং প্রযাতি॥"

অর্থাৎ "চিতোরের যে পন্থা আমার পূর্ব্ব পুরুষের পাদপদ্মস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, সেই পথ সম্মুখে বর্ত্তমান। স্বর্গ গমনের পদবীও বুঝি এইরূপ আনন্দদায়ক। যে পথে আরোহণ করাতে অতি আনন্দে আমার বহুদিন সঞ্চিত দুঃখরাশি বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে"। শাস্ত্রে আছে—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" চিতোর তাঁহার বংশের জন্মভূমি এজন্য তাঁহার চক্ষে চিতোরের পথও স্বর্গগমনের পথের ন্যায় আদরের হইয়াছে। এমনভাবে জন্মভূমির প্রতি আন্তরিক ভক্তিই তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ। তারপর যখন চিতোরে প্রবেশ করিলেন তখনকার অবস্থা আরও মনোহর।—

রাজা (সনৃত্যমিব) শালুম্বাপতে!

"ভবেতচ্চিতারপুরং, ভবেতচ্চিতোরপুরং"
"কিমেষা ভূঃ কিম্বা ত্রিদিবনগরী নৈতদুভয়ং
যদানন্দং সাদ্রং কমপি তনুতে কামরহিতং।
অপূর্ব্বেয়ং সৃষ্টিস্ত্রিভুবন বিধাতুঃ সুখময়ী
রজঃস্পর্শো যস্যা বপুষি পুলকং মে জনয়তি"।

অর্থাৎ রাজা আনন্দাতিশয্যে নৃত্য করিতে করিতে যেন শালুম্বাপতিকে বলিতেছেন, এই কি সেই চিতোর নগর! এই কি সেই চিতোর নগর!! ইহা কি পৃথিবীর একটা অংশ? অথবা স্বর্গপুরী? যেহেতু ইহা আমাকে অনির্ব্বচনীয় একটা মহা আনন্দ দিতেছে! তাই মনে হয় ইহা বিধাতার একটী অপূর্ব্ব সুখময়ী সৃষ্টি! যাহার ধূলি আমার শরীরে রোমাঞ্চ উৎপাদন করিতেছে।" এই বলিয়া মহারাণা চিতোরের ধূলিরাশি শরীরে মাখিতে লাগিলেন। এই শ্লোকের আর কি সমালোচনা করিব, মনে হয় এইরূপ সৌন্দর্য্যপূর্ণ শ্লোক অতি অল্পই দেখিয়াছি।

অদ্যাপি চিতোর অধিকৃত হয় নাই। তথাপি রাজা এই নগরে উপস্থিত হইয়া স্বপ্নোপম আনন্দ অনুভব করিতেছেন। নাজানি চিতোর উদ্ধার হইলে তাঁহার কিরূপ আনন্দ হইবে!

তারপর চিতোরেশ্বরী-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহারাণা "মাতশ্চিতোরেশ্বরি! মাতশ্চিতোরেশ্বরি!!

ত্বৎপাদপদ্মপরিসেবন কর্ম্মযোগ-
ভ্রষ্টং শিলোদকুলমুৎকটপাপশীর্ণং।
মাতঃ কৃপাময়ি! কৃপামৃত বর্ষণেন
স্বস্থং বিধায় পুনরুদ্গতং কুরুষ॥"

বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই নাটকের ছত্রে ছত্রে যেন হিন্দুত্ব ফুটিয়া বাহির হইতেছে। অধুনা অনেকজাতীয়—নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ নাটক হইতেই উৎকট বিদেশীয়ভাব অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে। আধুনিক অনেক নাটককারেরা বৈদেশিকভাবের সঙ্গে হিন্দুত্বের খিচুড়ী পাকাইয়া এমন একটা অপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টি করেন যে—তাহা দ্বারা প্রাচীন সমাজের আদর্শের সঙ্গে হিন্দুত্বের ধারণাও বদলাইয়া যায়। হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার

নিজস্ব উদার ভাব সম্পূর্ণই রাখিতে হইবে। নচেৎ সমাজ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। অন্যকথা যাউক অনন্তর ভীমানন্দ দেবীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া রাজাকে শান্তিসলিলে অভিষিক্ত করিলেন। মুখে বলিলেন—

"প্রতাপসিংহঃ স্বগৃহীতনামা
ব্রতং যদাতিষ্ঠত দেশবৃদ্ধ্যৈ।
ফলোন্মুখং তচ্চ তদাত্মজেঽদ্য
ন কর্ম্ম বৈধং বিফলত্বমেতি॥"

অর্থাৎ "মহাত্মা প্রতাপসিংহ দেশের মঙ্গলের জন্য যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আজ তাঁহার পুত্র অমরসিংহে ফলোন্মুখ হইল। বৈধকর্ম্ম কখনও বিফল হয় না"। পিতা কর্ম্ম করিলেন তাহার ফল পুত্র পাইল। বৈধকর্ম্মের এমনি গুণ। কর্ম্মবাদী হিন্দুর কাছে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহকাল নষ্ট হইলেও হিন্দুর সব ফুরায় না, ঐহিক ক্ষণভঙ্গুর দেহ নষ্ট হইলেও হিন্দুর আশা ভরসা সবই থাকে। হিন্দু মনে করেন—স্বদেহেই হউক, জন্মান্তরেই হউক, অথবা পুত্রদেহেই হউক বৈধ কর্ম্মের ফল ফলিবেই। তাই হিন্দু ইহকালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে বাঁধিতে চায় না। তাহার অনন্তপ্রসারিত উদারতা কালের দ্বারা পরিমাপিত হইতে পারে না। এইজন্য ভীমানন্দের এই কথায় বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

এমন সময়ে অমাত্যের সহিত সাগরসিংহ দেবীদর্শনে উপস্থিত হইলেন। মহারাণা প্রভৃতি সকলে অলক্ষে পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিলেন। সাগরসিংহের ভাবপর্য্যবেক্ষণই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সাগরসিংহ অমাত্যকে বলিতেছেন :—

"সর্ব্বস্মাদধিকং ধনং তদধিকো দিল্লীপতেরাদরঃ
তত্রোপাধিপদাগমো যদিপুনস্তচ্ছং পদং ব্রহ্মণঃ।
এবং মূঢ়ধিয়োগতো বহুতিথঃ কলোহয়ং
ভাগ্যক্রমে
যন্মিনং নো গণিতং কুলং, ন মহিমা, ধর্ম্মোন,
শৌর্য্যং নচ"।

অর্থাৎ "সর্ব্বাপেক্ষা অর্থ শ্রেষ্ঠ, তদাপেক্ষা দিল্লীপতির আদরও অধিক, তাহাতে যদি আবার উপাধি লাভ হয়, তবে ত ব্রহ্মলোকও তুচ্ছ, এইরূপ ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া দুর্ভাগ্যে আমার বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। সে সময়ে বংশের কথা মনে পড়ে নাই, চরিত্রমাহাত্ম্য মনে পড়ে নাই, ধর্ম্ম বা শৌর্য্যও মনে পড়ে নাই"। সাগরসিংহের চরিত্র বদলাইয়া গিয়াছে। অর্থলোলুপ, স্বদেশদ্রোহী, সে সাগরসিংহ আর নাই, এখন তাঁহার,—

রাজত্বং মে নৈব, দাস্যং যদেতৎ
রাজ্যং নেদং, কিন্তু পৈত্র্যং শ্মশানং।
রক্ষা নেয়ং, কিন্ত্বিয়ং প্রেতবৃত্তিঃ
মানো নায়ং, কিন্তু সর্ব্বস্বহানিঃ॥

চিতোরের রাজত্ব দাস্য বলিয়া বোধ হইতেছে, এই রাজ্য তাঁহার পৈতৃক শ্মশানের স্থান হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্যের শাসন প্রেতবৃত্তি, আর দিল্লীপতির আদর ভস্মার বলিয়া বোধ হইতেছে। এই স্বভাব পরিবর্ত্তনের মূল যে শৈলদেবের শিক্ষাদয় তাহা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি। বিশেষতঃ অমরসিংহের সৈন্যোদ্যোগ দর্শন, দিল্লীশ্বরের পুনঃ পুনঃ পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ, শিশোদকুলের বহু কীর্ত্তিস্থান অবলোকনও তাঁহার এই বৈরাগ্যের কারণ।

সাগরসিংহের সঙ্গে যে অমাত্য ছিল, সে দিল্লীশ্বরের প্রতি অতি অনুরক্ত, সাগরসিংহের এইরূপ অক্ষেপবাণী শুনিয়া সে বহু প্রকারেই তাহাকে প্রলোভিত করিয়া অমরসিংহের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিল। অমাত্যের প্রত্যেক কথার উত্তরে সাগরসিংহ

যে সমস্ত আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই শোকোদ্দীপক অথচ মধুর।

পাঠকের গোচরের জন্য আর একটী শ্লোক উদ্ধার করিলাম।

বর্ত্তন্তে বহবঃ সুমন্দমতয়ো যে পাপবৃত্তিং
শ্রিতাঃ
সর্ব্বেভ্যোঽহমেব নিন্দিততমো লজ্জা
ঘৃণা বর্জ্জিতঃ।
দত্তোদাস্তমুপাগতেন হি ময়া তস্যৈব
বৃদ্ধৌ প্রভো-
রম্বায়াঃ পরিধান মম্বর মহো! হর্ত্তুং
সমাকৃষ্যতে।

অর্থাৎ "পৃথিবীতে বহু বহু পাপ কার্য্যকারী অতি মন্দমতি মানবেরা আছে। লজ্জা ও ঘৃণা বর্জ্জিত আমার মত কিন্তু কেহই নাই। এইজন্য আমিই সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দিততম। আমিই ধন্যার দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই প্রভুরই উন্নতির জন্য জননীর পরিহিত বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত কাড়িতে চেষ্টা করিতেছি।"

পিতৃব্যের পাপাচরণের কথা মনে করিতে অমরসিংহের লজ্জাবোধ হইত। আজ সেই লজ্জা ক্ষোভ তাঁহার অন্তর হইতে দূর হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে প্রভার ভাব মনে উদিত হইতে লাগিল।

তারপর যখন সাগরসিংহ স্পষ্টতঃ অমাত্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, দিল্লীশ্বর প্রভু হইলেও আজ তাঁহার পক্ষ হইয়া তিনি যুদ্ধ করিবেন না। অমরসিংহের পক্ষই তাঁহার পক্ষ। বিশেষতঃ অমরসিংহ যখন চিতোর অবরোধ করিয়া স্বসৈন্যের সহিত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিতেছেন—তখন চিতোর তাঁহারই অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় সমরের আড়ম্বর বৃথা। তখন অমরসিংহ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাগরসিংহকে 'তাত' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। তখন অমরসিংহের আর পিতৃব্যের উপর কিছুমাত্র চিত্তগ্লানি নাই। বাস্তবিক সাগরসিংহ অনুতাপে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার পুত্র * তাঁহার পাপের ফলে যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যাহাদের দ্বারা শত শত কুলকামিনী অবমাননা ভয়ে প্রজ্বলিত বহ্নিতে প্রবেশ করিয়াছে, যাহাদের দ্বারা শত শত দেবমন্দির চূর্ণিত, দেবমূর্ত্তি বিলুণ্ঠিত, শত শত সৌধাবলি বিধ্বস্ত হইয়াছে, অধুনা তাহাদেরই তিনি দাস। এ অপেক্ষা তাঁহার পাপ আর কি অধিক হইবে! আজ তিনি তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। তখন তিনি বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া অমরসিংহকে ও শালুম্বাপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। এই অবসরে পূর্ব্বোক্ত অমাত্যও পলাইল। ভীমানন্দ তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত নির্জ্জন বাসের উপদেশ দিলেন। তখন সাগরসিংহ কৃতাঞ্জলি হইয়া ভীমানন্দকে বলিলেন, "গুরুদেব! আমার রাজ্যবন্ধন দূরীভূত হউক, এ রাজ্য অমরসিংহকে দান করিতেছি। তিনি গ্রহণ করুন, মণিকাঞ্চন সংযুক্ত হউক।

তখন অমরসিংহের চিত্তের অবস্থা অপূর্ব্ব।

"সূর্য্যবংশ সমুদ্ভূতঃ শ্রীপ্রতাপস্য নন্দনঃ।
প্রতিগ্রহ মহং দৈন্যং কথং স্বীকর্ত্তুমুৎসহে।"

অর্থাৎ "সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন এবং শ্রীপ্রতাপের পুত্র অমরসিংহ কিরূপে প্রতিগ্রহরূপ হীনতা স্বীকার করিবে?" যে কার্য্যে বংশের গৌরব বিশেষতঃ প্রতাপসিংহের কুল

* মহবৎ খাঁই সাগরসিংহের পুত্র। যবনধর্ম্ম গ্রহণের পর তাঁহার এই নাম হইয়াছে। ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার বিষয় জানা যায়।

হইবে, অমরসিংহ তাহা কিরূপে করিতে পারেন! অমরসিংহ বংশের মধ্যে বিশেষতঃ প্রতাপসিংহের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে? প্রত্যেক কার্য্যে অমরসিংহের মাহাত্ম্য ফুটিয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় গুরুদেবকে তিনি,—

"আপনারাই ক্ষাত্রকুলধর্ম্মের মীমাংসা জানেন, এ বিষয়ে আপনি যাহা বলিবেন তাহা করিব" ইহা বলিয়া হৃদয়ের সমস্ত কথাই প্রকাশ করিলেন। ভীমানন্দ তখন সাগরসিংহকে বলিলেন, "বৎস! প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম, অরই ক্ষত্রিয়োচিত, অতএব অমরসিংহ কিরূপে প্রতিগ্রহ করিবে?" তখন সাগরসিংহ অমরসিংহের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন।—

"কুলপ্রদীপেন কুলান্ধকারো
বৎস! ত্বয়াহং বিজিতঃ প্রকৃত্যা।
পুরপ্রবিষ্টস্য রণোদ্যতস্য
জানমিতে বীর্য্যজিতং ত্বমদ্য।
তৎ স্ববীর্য্য বিজিতমেতৎ প্রতিপদ্যতাং
বৎসশ্চিতোরাজ্যং।"

অর্থাৎ "হে বৎস! তুমি কুলপ্রদীপ! আর আমি কুলান্ধকার। তুমি প্রকৃতি দ্বারা আমাকে বিজিত করিয়াছ, বিশেষতঃ আজ যখন রণোদ্যত হইয়া পুরপ্রবিষ্ট হইয়াছ, তখন আমি তোমার বীর্য্য দ্বারাও পরাকৃত হইয়াছি। অতএব তোমার বীর্য্যজিত এই রাজ্য গ্রহণ কর।" এই ভাবে সাগরসিংহ পরাভব স্বীকার করিলে অমরসিংহ বলিলেন,—"তাত! ক্ষাত্রধর্ম্মগৌরবে আপনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছি অতএব ক্ষমা করুন!" এই বলিয়া একজন পার্শ্বচরকে ডাকিলেন, এবং তাহা দ্বারা চিতোর দুর্গের শীর্ষের সূর্য্যমণ্ডল চিহ্ন শিশোদকুলপতাকা স্থাপন করিতে সেনাপতিদিগকে আজ্ঞা করিলেন। এবং সর্ব্বত্র চিতোর উদ্ধারের মঙ্গল ঘোষিত করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। মঙ্গল মঙ্গলেরই অনুবর্ত্তী, ঠিক এই সময়ে অম্বলা দুর্গ জয় করিয়া—চণ্ডকুলবর রাজ দর্শন কামনায় উপস্থিত হইলেন। এই অম্বলা জয় করিতে উভয় বংশই যে বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে তাহা ইতিহাস বিদিত।

এমন সময়ে আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি হইল, পরক্ষণেই সকলে শুনিতে পাইল,—

"নতর্পিতোঽহমিন্দ্রেন স্বাসনার্দ্ধ প্রদায়িনা।
বৎস! ত্বয়া স্বপুত্রেন চিতোরোদ্ধারিণা যথা।"

অর্থাৎ "হে বৎস! তুমি চিতোর উদ্ধার করিয়া আমাকে যেরূপ আনন্দিত করিয়াছ, সেইরূপ আনন্দ ইন্দ্রদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বকীয় আসনের অর্দ্ধস্থান লাভ করিয়াও অনুভব করিতে পারি নাই।"

এই দৈববাণী শুনিয়া অমরসিংহের চিত্তের অবস্থা অনির্ব্বচনীয় হইল, তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না যে ইহা কি? অথচ হৃদয়ে প্রগাঢ় আনন্দ উপস্থিত হইল, যেন পিতার কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহাই বা কিরূপে সম্ভব?

ভীমানন্দ তখন বলিলেন,—"বৎস! অন্য আর কি? ইন্দ্রাসনার্দ্ধভোগী তোমার পিতা দিব্যবাক্যে ও দেবতারা দুন্দুভি ধ্বনি দ্বারা তোমার প্রশংসা করিতেছেন।" অমরসিংহের আর কোন সংশয় রহিল না।

হিন্দু জন্মান্তরবাদী, ইহলোকের মত পরলোকও হিন্দুর অবিশ্বাস্য নহে। স্বর্গ নরক সমস্তই হিন্দুর শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। দর্শনশাস্ত্রে আত্মাকে নিত্য বলে, ইহকালের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে আত্মাতে অদৃষ্ট সঞ্চিত থাকে।

অদৃষ্ট বা সংস্কার যাহাই হউক না কেন তাহা দ্বারা স্বর্গনরকভোগ হয়। আত্মাই দেবমূর্ত্তিতে স্বর্গভোগকারী, আত্মাই পাপমূর্ত্তিতে নরক-ভোগকারী। প্রতাপসিংহের আত্মা দেবত্ব প্রাপ্ত, অতএব তাঁহা দ্বারা এই দৈববাণী অসম্ভব নহে। দেবতারা ইচ্ছা করিলে পৃথিবীর ঘটনা অবগত হইতে পারেন ইচ্ছা করিলে কায়ব্যূহ অবলম্বন করিয়া যত্রতত্র প্রকাশিত হইতে পারেন। ইচ্ছা করিলে ভক্তের নিকট দিব্যমূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতেও পারেন। এই-জন্ত হিন্দুর সংসারে স্বর্গনরকের যোগ আছে। ইহকালের সঙ্গে পরকালের সম্বন্ধ আছে। মানুষ মরিয়া গেলেও এইজন্ত তাহার সব ফুরায় না। এই অনন্ত পারাবাহিক যোগই হিন্দুর হিন্দুত্বকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। এই অনন্ত পৌর্ব্বাপৌর্য্যই হিন্দুর সনাতনত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাই হিন্দু মরিয়া মরে না। মৃত্যুর পর অমৃত হিন্দুই পায়। এই জন্ত শাস্ত্রতে ভীমানন্দের মুখে পূর্ব্বকথা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হই না। তাই অমর-সিংহও তাহা বিশ্বাস করিলেন।

তারপর ভীমানন্দ বলিলেন,—

"বৎস! কিমিদানীং তে প্রিয়মুপহরামি?"

রাজা। ভগবন্ অতঃপরমপি প্রিয়মস্তি?

জাতং চিতোদ্ধরণং, সমগ্রা
মেবারভূঃ শত্রু করাদ্বিমুক্তা।
গুরুঃ প্রসন্নো ভগবান্নিতান্তং
স্বর্গাচ্চ তাতঃ বসুধং ব্যনক্তি।"

অমরসিংহের ইহা অপেক্ষা আর কি প্রিয় হইতে পারে! নাটকেরও উদ্দেশ্য শেষ। 'অমর মঙ্গল' এইরূপেই হইল। অমরসিংহের মঙ্গলের সঙ্গে নাটকেরও শেষ হইল। অন্য চরিত্র ক্রমেই দেখান হইতেছে।

বীরা ও দেবী

(৮)

এই রমণীদ্বয়ই মহারাণা অমরসিংহের চরিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। এই জন্ত এই দুইজনের চরিত্র এক সঙ্গে সমালোচনা করা যাইতেছে। যদিও বারাঙ্গনা বীরার সহিত দেবীর চরিত্র এক সঙ্গে সমালোচনার অযোগ্য, তথাপি রমণীহৃদয়ের অপূর্ব্ব রহস্য উভয়ত্রই সমান, এজন্ত পৃথক্‌ভাবে উভয়ের চরিত্র সমালোচনা করিলাম না। প্রথম অঙ্কেই আমরা বীরার সাক্ষাৎ পাই। তখন বীরার যে রূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার আভাস পাঠকবর্গের গোচর করা হইয়াছে। বারাঙ্গনা বীরা তখন মরুস্থানাধিপতি রাজসিংহের কন্যা পরিচয়ে উপস্থিতা। উদ্দেশ্য মহারাণার সর্ব্বনাশ। কি ভয়ানক নারী প্রকৃতি! মহারাজা মানসিংহের নিকট হইতে লক্ষ টাকা পুরস্কারের লোভে একজন মানুষের, বিশেষতঃ দেশের রাজার ও তাহার সঙ্গে তদ্দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠা নাই। এই রাক্ষসীমূর্ত্তির অভ্যন্তর তখন কেহ দেখিল না, মহারাণাও অকুণ্ঠিতচিত্তে ইহার কথায় বিশ্বাস করিলেন। বুঝি ইহার রূপের অনন্ত শিখায় দগ্ধ হইলেন। এই নারীর সঙ্গে তখন একটী বৃদ্ধা ও কতকগুলি রক্ষী ছিল। দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া এই নারী অমরসিংহের নাম করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। মহারাণার উপস্থিতির পূর্ব্বেই যদিও দস্যুদল বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু মহারাণীর বিদ্যমানতা কেহই বুঝিল না। এই একস্থলে উভয় নারীর হৃদয়ের রহস্য কি বিপরীত, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক দিকে বারাঙ্গনা বীরা রাজার সর্ব্বনাশ সাধন জন্ত মোহিনীমূর্ত্তিতে উপস্থিত। অন্য দিকে

মহারাণী গোপনে সুন্দর পুরুষের মূর্ত্তি ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজার রক্ষায় নিযুক্তা হইয়া দস্যুদল বিদলনে ব্যাপৃতা। উভয়ের ভাবই গুপ্ত, অথচ উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। অবশ্য মহারাণীও বীরার চরিত্র প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তিনি সন্দিগ্ধ চালিত হইয়াই ছদ্ম দস্যুদল সংহার করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে মনে সমরসিংহের চরিত্রে সন্দেহ ছিল বলিয়াই রাজার এই অনুসরণ। শুধু তিনি কেন রাজ্যের অনেক লোকই সমরসিংহকে সন্দেহ করিত। মহারাণা কেবল তাঁহাকে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতেন। যাহা হউক সমরসিংহের সঙ্গে এই ঘটনার বীরার যে যোগাযোগ ছিল, তাহা তখন কেহই বুঝিতে পারে নাই। গুপ্তচর এমন ভাবেই স্বকার্য্য উদ্ধার করে। এই ছদ্ম দস্যুদলের একটা ইতিহাস আছে—বীরা ও সমরসিংহ এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, যখন বীরা অমরসিংহের প্রায় নিকটস্থ হইবে, তখন তাহাকে যেন কতকগুলি যবন আক্রমণের অভিনয়ে আকুল করে। তাহা হইলে বীরার বিপদ্ সুস্পষ্ট হইবে, অথচ রাজাও তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু মহারাণীর কৌশলে ঘটনার একাংশ অন্যরূপ হইয়া গেল। নিরপরাধী যবন দল মারা পড়িল। একের অপরাধে অপরের বিনাশ-সংসর্গগুণেই হয়। যাহা হউক মহারাণীও অন্তরালে থাকিলেন। কেহই তাঁহার আগমন বা অন্তর্দ্ধান বুঝিল না। অমরসিংহও ভাবিয়া পাইল না যে যবনদল কিরূপে মারা পড়িল।

তারপর যখন বীরা মহারাণাকে দেখিল, তখন মনের মধ্যে একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সেই অবস্থায় মহারাণার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। এখনও ভয়ানক ছল। এখনও রাক্ষসী মূর্ত্তি!! মূর্চ্ছার পর যখন বীরার সহচারিণী সেই বৃদ্ধা মহারাণার নিকট বীরার মিথ্যা পরিচয় দিল, যখন বীরার অনুরাগের কথাও ধীরে ধীরে প্রকাশ করিল, তখন বীরা স্বগত বলিতেছে,—

"অম্মো গণিআ এ বি মে লজ্জা হোদি!" হায়! বেশ্যা আমি আমারও লজ্জা হইতেছে। এ লজ্জা বীরার কৃত্রিম নহে, পূর্ব্বরাগের পূর্ব্বাভাস মাত্র। এমনি করিয়াই বীরা মজিল। তারপর রাজা যখন দস্যুগণের আক্রমণ কাহিনী শুনিয়া বিমনা হইয়া পড়িলেন—তখন বীরার অবস্থা আরও মধুর! বীরা স্বগত বলিতেছে,—

"ভগ্গসো মে রূবদপ্পো, অধা সর্ব্বং শুণিঅ এবং বিআরকারণো উদাসীণো বিঅ অত্তভবং দীসদি" আমার রূপদর্প আজ ভগ্ন হইয়া গেল—আমার বৃত্তান্ত শুনিয়াও রাজা বিচারে বিমনা হইয়া উদাসীনপ্রায় রহিলেন! বীরার আশা ছিল, রাণা তাহার কথা শুনিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ঘটিয়া গেল অন্যরূপ। এ অবস্থায় বীরার ছল ত আছেই, কিন্তু পূর্ব্বরাগের আধিক্য ক্রমেই বাড়িতেছে। এই দ্বৈধাভাব বড় মধুর। তারপর রাজা যখন বলিলেন,—"আমি উপস্থিত নিয়মপরতন্ত্র, অতএব ইনি এক্ষণে অন্তঃপুরেই থাকুন।" তখনকার বীরার ভাব আরও মধুর। বীরা বলিতেছে—

"হজে! বলীঅংকুখু উক্কণ্ঠিদম্হি মহারাঅস্স ইত্যার্দ্ধোক্তে সভয় বৈলক্ষ্যং) রক্খিবগ্গস্স"। অর্থাৎ আমি মহারাজার নিমিত্ত বড় উৎকণ্ঠিত হইতেছি। না, না, রক্ষিবর্গের নিমিত্ত। প্রথমটাই তাহার হৃদয়ের কথা, অনুরাগের কথা। দ্বিতীয়টা ছল। অনুরাগই মুখ্য ছল

শোণ। এইভাবে বীরার অনুরাগ বাড়িয়া চলিল। তারপর দ্বিতীয়াহে যখন বীরাকে দেখা গেল, তখন তাহার রাক্ষসী মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। তার পরিবর্ত্তে অনুরাগ-মধুর একটী কুসুম কোমলা নারীমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এইভাবে হৃদয়বৃত্তির ক্রমবিকাশ দুইএক দিনে হয় নাই—অবশ্যই কিছু দিন লাগিয়াছিল! মহারাণীর সংসর্গই যে এই ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ তাহাতে সংশয় নাই। মহারাণীর উদার ও মধুর ব্যবহারে বীরা এমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে জীবনে সে কখন এমন শান্তি অনুভব করে নাই, বাস্তবিক মহারাণীর চরিত্র এমনি অপূর্ব্ব যে তিনি যে বিষয়টী ধরিতেন তাহাই সোণা করিয়া ফেলিতেন। 'পরশপাথরের' গুণটী মহারাণীতে সর্ব্বতোভাবেই বর্ত্তমান ছিল। এপর্য্যন্ত মহারাণীর মূর্ত্তি নয়নে পতিত হয় নাই —তথাপি কার্য্য দেখিয়া শ্রদ্ধাভক্তিতে পুলকিত হইতেছি। এই অঙ্কের প্রথমেই বীরার সহিত বৃদ্ধার ঝগড়া হইয়া গেল—বীরা স্পষ্টই বুঝাইয়া দিল, তাহা দ্বারা মহারাণার কোনই অপকার হইবে না। অনুরাগের খরস্রোতে লক্ষটাকার পুরস্কার ভাসিয়া গেল। লক্ষটাকা লাভ হইলে যে সুখ হয়, এবং একমাত্র বাঞ্ছিতকে কেবল ভালবাসিয়াই যে সুখ হয়, এই উভয় সুখের কত অন্তর! বীরা যে আজ অমর সিংহকে ভালবাসিয়াছে এই ভালবাসাই যে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য অপেক্ষা কত আদরের তাহা কি আর বুঝাইতে হইবে? প্রণয়ই হৃদয় প্রশস্ত করে, প্রণয়ই জীবনের গতি ফিরাইয়া দেয়। প্রণয়ের জন্য যে কত কত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধিত হয় তাহার কথা অনেকই ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই হৃদয়তত্ত্ব গ্রন্থকার সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

বৃদ্ধা ক্রোধে চলিয়া গেলে বীরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিলেন, সেই পুষ্পোদ্যানে একটা শিলাখণ্ড ছিল, অমরসিংহ সময়ে সময়ে সেখানে আসিয়া উপবেশন করিতেন। তখন সন্ধ্যাকাল। সান্ধ্য কুসুমগুলি চারিদিকে ছুটিয়া সৌরভ বিস্তার করিতেছে। মন্দ মন্দ সমীরণ ফুলগুলিকে, লতাগুলিকে গাছের কচি কচি পাতাগুলিকে লইয়া প্রণয়ের লুকোচুরি খেলা খেলিতেছে। প্রকৃতির সেই শান্ত মধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছবিটী বীরে ধীরে হৃদয়ের মধ্যে কেমন কোমলতায় কেমন অপূর্ব্বভাবের প্রবাহ ছড়াইতেছে। সেই শিলাখণ্ডের চতুর্দ্দিকে তখন কেবল নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। ধীরে ধীরে বীরা সেই শিলাখণ্ডের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, অমরসিংহ অধুনা বীরার আরাধ্য দেবতা। অমরসিংহের উপবেশন স্থান, অমরসিংহের স্পৃষ্টদ্রব্য, অমরসিংহের বাঞ্ছিত পদার্থ, এখন তাহার কত প্রিয়। সে সেই শিলাখণ্ডের প্রতি স্নিগ্ধচক্ষে আগ্রহভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার কত কথা মনে পড়িয়া গেল। অনুরাগে হৃদয়টা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সে বলিতে লাগিল,—

"এই নন্দন-কানন-সদৃশ দেবপূজার পুষ্পোদ্যানে ইন্দ্রাসন তুল্য এই শিলাতল। এখানে আর্য্যপুত্র বসিয়া থাকেন," (চারিদিকে দেখিয়া) এই প্রদেশ বিজন! তবে বার বার বলি, 'আর্য্যপুত্র এখানে বসিয়া থাকেন' আর্য্যপুত্র! আর্য্যপুত্র!! আর্য্যপুত্র!!! (চিন্তা করিয়া) হায় প্রমাদ ঘটিল, নিশ্চয় করিয়াছি আর এরূপ বলিব না। আবার পুনঃ পুনঃ সেইরূপ বলিতেছি। আমি বারাঙ্গনা, দেবতুল্য পবিত্র মহারাজকে পত্নীর যোগ্য আর্য্যপুত্র সম্বোধন করিবার আমি কে? অথবা বলিতেই

বা দোষ কি ? যা করিয়াছি, তা করিয়াছি, পুনর্ব্বার আর অকার্য্য করিব না, কাপট্যের দ্বারা আর্য্যপুত্রকে পতিত করিব না।"

এই অংশের কবিত্ব, এই অংশের হৃদয়ের উত্থান পতন বড় মনোহর। বাঙ্গালা অনুবাদ কবিত্বে হানি ঘটিলেও প্রাকৃতাংশ অনেকের দুর্ব্বোধ বলিয়া উদ্ধার করিলাম না। বিষবৃক্ষের কুন্দনন্দিনীর কথা কি পাঠকের মনে পড়ে ? সে পুষ্করিণীতীরে বসিয়া বারবার নগেন্দ্রদত্তের নাম জপ করিয়াও তৃপ্তির শেষ পায় নাই। এখানেও বীরার সেই দশা। 'আর্য্যপুত্র' সম্বোধনের লোভ সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। তবে কুন্দনন্দনীর সহিত বীরার চরিত্রের তফাৎ এই যে, কুন্দের কামনা বা লালসা ছিল। বীরার তাহা নাই। কুন্দের প্রণয়ে উৎকর্ষ নাই। বীরার তাহা আছে। নিষ্কামতাই বীরার প্রণয়ের একটী প্রবলগুণ। ক্রমেই তাহা দেখাইতেছি। বীরার যখন এই অবস্থা তখন মহারাণীর সখী সুবলার গীতধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। বীরা বুঝিল—মহারাণী এদিকে আসিতেছেন। তথাপি সে শিলাতলস্পর্শের লোভ ছাড়িতে পারিল না। শিলাতল স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইয়া সে বলিয়া উঠিল,—

"অয়ি দেব! শিলাতল! অদ্যতাবদপূর্ব্বঃ সুখদিবসোমে অপূর্ব্বং তেস্পর্শসুখং,

স্পৃষ্টং ময়া মসৃণ কোমলপুষ্পমাল্যং
স্পৃষ্টং ত্বয়ৈব সদৃশং বরবীরবক্ষঃ।
স্পৃষ্টশ্চ মন্দমলয়াচল গন্ধবাহো
নৈবংবিধং সুবিমলং সুখমাদধাতি॥

"হে দেব! শিলাতল! অদ্য আমার অপূর্ব্ব সুখের দিন, তোমার স্পর্শসুখ অতি অপূর্ব্ব, আমি মসৃণ ও কোমল পুষ্পমাল্য স্পর্শ করিয়াছি, তোমার ন্যায় দৃঢ় কঠিন ও প্রশস্ত শ্রেষ্ঠ বীরগণের বক্ষস্থলও স্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু এইরূপ সুবিমল সুখ কখনও অনুভব করি নাই।" বীরা তখন নয়ন নিমীলিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বীরা আর কিছু চায় না, অমরসিংহের ব্যবহৃত বস্তুই তাহার একমাত্র সুখের দ্রব্য। অমরসিংহের অনুগামিনী হইবার সাধ আর তাহার নাই। যে দিন হইতে সে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছে সেই দিন হইতেই সে নিজের সমস্তই বিসর্জ্জন করিয়াছে। বিলাস, ঐশ্বর্য্য, ভোগে তাহার আর প্রয়োজন নাই। ত্যাগই তাহার অবলম্বন। ত্যাগেই তাহার অনুরক্ত সুখ। মনে হয় এইরূপ বারাঙ্গনা চরিত্র আর কোথাও দেখি নাই। সাহিত্যের মধ্যে এই অংশই আমাদের চক্ষে নবীন।

সুবলার গান ক্রমেই নিকটতর হইতেছিল, তাহার সঙ্গীতে একটা অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, আমরা এজন্য তাহার উদ্ধারের লোভ ছাড়িতে পারিলাম না।

গীত

দেব সুধাকর! বিতর করং
দিন কর দুর্জ্জয় তিমির হরং।
ভজতু মহী হিম নির্ম্মল বস্ত্রং
মলিনং রুবং মুঞ্চতুতুষ্রং॥
তৃষ্ণা সুধোদক লালস হিমকং
কুমুদং সেবতু বিমলং অসিতং।
পেকৃথ চন্দ্রবীং গাঢ় পিপাসং
করেহি সন্তং মাকৃথু নিরাসং॥
দিঅরাও সিহি বিদিদো ভুবনে
ণমিপাদো মম অই তুহ চরণে॥

অর্থাৎ "হে দেব সুধাকর! তোমার কিরণ বিতরণ কর। দিনকর যে তিমির রাশি দূর করিতে পারেন না। তোমার কিরণই তাহা দূর করিয়া থাকে। পৃথিবী

হিম নির্ম্মল বর্ণ ধারণ করুক। তাহার মলিন রূপ অন্তর্হিত হউক। তোমার সুধোদয় দর্শনে কুমুদের হৃদয়ে লালসা জাগিয়া থাকে। সেই কুমুদ বিমল অমৃত ভোগ করুক। তুমি চকোরীকে দেখ, তাহার পিপাসা অতীব প্রগাঢ়, তাহাকে শান্ত কর, নিরাশ করিও না। পৃথিবীতে দ্বিজরাজ বলিয়াই তোমার খ্যাতি। তোমার চরণে আমার প্রণিপাত।"

এই গানে চন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া যেমন এক পক্ষের উক্তি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরসিংহকে সম্বোধন করিয়াও বীরা ও মহারাণী প্রভৃতির হৃদয়ের কথা বলা আছে। সুবলার উদ্দেশ্যও তাহাই। মহারাণী এই গানের মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া—স্বামীর গুণগান করিয়া উঠিলেন। এবং উদ্দেশ্যে প্রণিপাতও করিলেন। মহারাণীর এই স্বামী ভক্তিই প্রধান অবলম্বন। এইজন্য তাঁহার মুখ হইতে প্রথমেই স্বামী ভক্তির কথাই শুনিতে পাই। ইহাই তাঁহার হৃদয়ের স্থায়ী ভাব। মহারাণীর হৃদয়ের উদারতা আরও মহৎ। সুবলা বলিতেছেন,—"এই অপূর্ব্ব কুমুদের চরণে আমারও সতত প্রণিপাত, যে কুমুদ সুধাকরের নিকট হইতে চকোরীর জন্যও শান্তি কামনা করিয়া থাকে।" কবি সময়ের প্রসিদ্ধি আছে যে কুমুদ চন্দ্রের স্ত্রী। চন্দ্রোদয়ে কুমুদ বিকশিত হয়, ইহার প্রসিদ্ধির কারণ। সেই কুমুদ আজ চকোরীর জন্য সুধাকরের নিকট হইতেও শান্তি কামনা করিতেছে। সংসারে যে যাহাকে ভাল বাসে, সেই ভালবাসার পাত্রকে অপরে যদি আবার ভাল বাসে, তবে তাহার প্রতিহিংসার উদ্রেক হয়। এইজন্য সপত্নী বিদ্বেষ সংসারের একটী নিত্য ঘটনা। কোন প্রণয়িনী নারী সাধ করিয়া নিজের স্বামীকে সপত্নীর হাতে সঁপিয়া দিতে পারে! যে পারে সেই দেবী। মহারাণী বীরাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাই তিনিও যে দেবী, এবিষয়ে কি সন্দেহ আছে? এইজন্য সুবলা মহারাণীর চরণে বারবার প্রণামের কথা বলিতেছে। বীরাকে মহারাণা গ্রহণ করেন নাই, অদ্যাপি যে চিতোর উদ্ধার হয় নাই, এইজন্য মহারাণী সাতিশয় চিন্তিত। বীরার সেই প্রণয়োন্মাদিনী মূর্ত্তির শেষ অবস্থা কি হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। বলা বাহুল্য এপর্য্যন্তও মহারাণী বীরাকে বারাঙ্গনা বলিয়া জানেন না। সেইজন্য তাহার হৃদয় অবস্থা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন।

তারপর মহারাণী বীরাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "ভগিনি! আমাকে আলিঙ্গন কর। আজ তোমাকে ত সমস্ত দিন দেখিতে পাই নাই।"

বীরা (স্বগত) "হায়, কি স্নেহ, কি উদারতা, সপত্নী হইতে আসিয়াছি জানিয়াও আমাকে স্বকীয় আত্মার ন্যায় আদর করিতেছেন। আর কেবল কপটতায় ইহাঁকে বঞ্চিত করিতেছি। (প্রকাশ্যে) দেবি! আমার মত হতভাগ্য জন আপনার স্নেহের অযোগ্য।" বীরা কাঁদিয়া ফেলিল। এই ক্রন্দন দেখিয়া মহারাণী মনে করিলেন, যে মহারাণার সঙ্গে বীরার বিবাহে বিলম্ব ঘটিতেছে বলিয়াই সে ক্রন্দন করিতেছে। তিনি তখন সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন,—

"ভগিনি! তুমি উন্মত্তা হইও না। ভগবান্ একলিঙ্গনাথ ও ভগবতী চিতোরেশ্বরীর শরণাপন্ন হও, তোমার আশা পূর্ণ হইবে। ইহা বলিয়া তিনি বীরার ভবিষ্যতের সুখের সম্ভাবনার কথা বলিতে লাগিলেন,

বীরাকে কত আশ্বাস দিলেন। এবং তিনিও যে মহাদেবের নিকট এবিষয়ে প্রার্থনা করিবেন তাহাও বলিলেন।

কি স্নেহোজ্জ্বল সমবেদনাপূর্ণ করুণাময়ী মূর্ত্তি, একাধারে—স্নেহ, উদারতা ও ভক্তির উৎস যেন উথলিয়া পড়িতেছে। বীরার অবস্থা তখন বড় ভয়ানক। সে কোন দিনই আশা করে নাই যে, মহারাণার পরিণীতা স্ত্রী হইবে। মহারাণার পত্নীত্ব লাভ বারাঙ্গনার পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব তাহা সে জানে। তথাপি ভাল বাসিয়া সুখ, তাই সে ভাল বাসে! তাহার এই কামগন্ধহীন ভালবাসা বড়ই উদার বড়ই মধুর। তাহার এই প্রধান কষ্ট যে মহারাণী তাহার হৃদয়ের প্রকৃত কথা জানেন না। সেও অদ্যাপি জানাইতে পারে নাই। জানাইতে গিয়া মুখ কেমন আটকাইয়া যায়—বলি বলি করিয়াও বলা হয় না। মহারাণীর মুখে চিতোর আক্রমণের মন্ত্রণার কথা শুনিয়া তাহার চিত্ত আশঙ্কায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে যে মানসিংহের চর, মানসিংহের যে অনেক কাহিনী সে জানে, সমরসিংহকে সে চেনে। অমরসিংহ যে শত্রু কর্ত্তৃক অনেক স্থলে পরিচালিত তাহার তাহাও অজ্ঞাত নহে। চিতোর আক্রমণে মহারাণাকে উত্তেজিত করিবার জন্য সে আসিয়াছে। তাহাতে যে মহারাণার অমঙ্গল ঘটিবে, ইহাই তাহার ধারণা। সে তখন তাড়াতাড়ি বলিয়াফেলিল,—

"দেবি, আমার সুখে কাজ নাই, চিতোর আক্রমণের মন্ত্রণা হইতে মহারাণাকে ফেরাও, আমার জন্য মহারাণাকে বলবানের সহিত বিরোধ করিতে বারণ কর।"

দেবী। "অয়ি বিবাহ পরাঙ্মুখী। নিজের পরিণাম চিন্তা কর।"

বীরা। "দেবি! আমি বিবাহের অযোগ্যা। মহারাণা চিরকাল জীবিত থাকুন, আমি তাঁহাকে দেখিয়া জীবনধারণ করিব।"

মহারাণী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি এতটা ভাবেন নাই, তাই বলিতেছেন,—

অহিং ণ কামদুগ্ঘসন্তো ণ দেসো কবড্ডো ণ বা।
অপ্পা বিস্করিদো যেন পণণও সো সুহুল্লহো।

যেখানে কাম দুর্গন্ধ নাই, যেখানে দ্বেষ নাই, যেখানে কপটতা নাই, যেখানে কেবল আত্মার বিস্মৃতি, সেখানেই প্রকৃত প্রেম। এই প্রেম জগতে দুর্লভ।

বীরা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, স্বগত বলিল "কপটতা নাই, এই কথায় হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।" বীরার হৃদয়ের এই কপটতা তাহার বিশুদ্ধ প্রণয়ের কোনও হানি করে নাই। সে কপটতা দ্বারা মহারাণাকে ভুলাইতে চায় না, সে কাপট্য দ্বারা কাহার কোনও অনিষ্ট করিতেও চায় না। তবে যে সে নিজের প্রকৃত পরিচয় কাহাকেও দিতেছে না, তাহাতে তাহার একটু উদ্দেশ্যও ছিল, সে ভাবিতেছিল—তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলে তাহার সহচারিণী সেই বৃদ্ধার অনিষ্ট ঘটিবে। তবে যদি এখন দেখা যায় যে সেই বৃদ্ধার কোন ক্ষতি হইতেছে না অথচ মহারাণার ক্ষতি হইতেছে, তখন সে বৃদ্ধার ক্ষতি করিয়াও মহারাণার উপকার করিবে। উপস্থিত কাহারও ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, এজন্য সে নিজের প্রকৃত কথা বলিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু বলিবার জন্যই সে সতত উদ্যুক্ত, তথাপি এই কাপট্য বাহিরের চক্ষে দৃষ্ট, এইটুকু এখন তাহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা। তারপর মহারাণা অরিন্দমা বৃদ্ধার মুখে সমস্ত কথা শুনিলেন। মহারাণীরও তাহা অগোচর

থাকিল না। বীরার মনের মধ্যে যে অশান্তি ছিল তাহা কাটিয়া গেল। এই অবস্থায় প্রণয়ে যে সুখ, তাহা বীরা সম্পূর্ণ উপভোগ করিল। এই সন্ন্যাসিনী বীরার পরিচয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, বীরার এইরূপ অবস্থা মানসিংহ বা সমরসিংহ কেহই জানিতে পারে নাই। অগ্নিদগ্ধা সেই বৃদ্ধার মৃত্যু সকলে জানিতে পারিলেও, সে মহারাণাকে কিছু বলিয়াছিল কি না তাহাও কেহ জানিতে পারে নাই। সকলেই জানিত বীরা অমর-সিংহকে বিলাসী ও বাসনী করিয়া তুলিয়াছে। ইহার পর বীরা অন্তঃপুরেই থাকিয়া মহারাণীর সহযোগে মহারাণার অনেক কার্য্যে সহায়তা করিত। মহারাণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মেবার ও চিতোরের মঙ্গল কামনা করিত। নাটকের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে দ্বিতীয়াঙ্কের পর বীরার আর প্রবেশ না থাকিলেও অনেক ছোট ছোট কাজে তাহার সত্তা অনুভব করা যায়। বীরার চরিত্রের রমণীয়াবস্থাও বেশ লক্ষ্য করা যায়। মহারাণীর চরিত্রের অব-শিষ্ট অংশও বড় মনোহর। তৃতীয়াঙ্কে তিনি সামন্তদিগের আলস্যভঙ্গ ও মানসিংহের উত্তেজনার্থ পুরোহিত শৈলদেবকে নিযুক্ত করিতেছেন। আবার কতকগুলি শুকপক্ষীকে শিখাইয়া পড়াইয়া তাহা দ্বারা মানসিংহের সম্মুখে তাঁহারই নীচতা ঘোষণা করিতেছেন। কোথাও বা মহারাণী রাজাকে উৎসাহ দিতে-ছেন, কোথাও বা গুরু আজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া মহারাণার চিত্তগ্লানি দূর করিতেছেন।

আবার কোথাও বা রাজাকে যুদ্ধে যাইতে দেখিয়া স্বয়ং চক্ষের জলে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতেছেন, কোথাও পরক্ষণে নিজের দুর্ব্ব-লতার জন্য হৃদয় দৃঢ় করিতেছেন। কোথাও বা রাজাকে না বলিয়া কহিয়া যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য করিতেছেন। কোথাও বা নিজের সখীকে পুরুষবেশে সাজাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন। কোথাও বা মেবার ভূমির দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতেছেন কোথাও বা স্বকার্য্যেলজ্জিতা হইয়া দুর্ব্বলা কুসুমকোমলা বধূমূর্ত্তিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইতেছেন। কোথাও বা পুরুষবেশে ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন, কোথাও বা একলিঙ্গনাথের মন্দিরে রাজার মঙ্গল কামনা করিতেছেন। এইরূপ ভাবেই মহারাণীর চরিত্র চিত্রিত। আপদ্ধর্ম্ম অনুসারে স্ত্রীলোক পৌরুষ অবলম্বন করিতে পারে,—ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। পরন্তু নারীর উহা প্রকৃষ্ট ধর্ম্ম নহে। পূর্ব্ব প্রবন্ধেই তাহা বলিয়াছি। এইরূপ মহিষী পাইয়াছিলেন বলিয়াই মহারাণা ভাগ্যবান্! অধিক কি রাজা নিজেই বলিয়া-ছেন—

ত্বং রাজনীতি নিগমে মম শিক্ষয়িত্রী
শিষ্যাসি মে রণকলাসু কৃতশ্রমাস্ত্বং
সর্ব্বাপদি স্থিরমতিঃ স চিরোহসি মেত্বং
ত্বং গেহিনী সদৃশ দুঃখসুখা সখী চ॥

অর্থাৎ তুমি রাজনীতিশাস্ত্রে আমার শিক্ষয়িত্রী, রণকলাতে পরিশ্রম করিয়া তুমি আমার শিষ্যা স্থানীয়। আমার সর্ব্ববিধ বিপদে স্থির থাকিয়া পরামর্শ দ্বারা তুমি মন্ত্রী স্বরূপ হইয়াছ এবং তুমি গৃহিনী হইয়া সুখে সুখিনী দুঃখে দুঃখিনী সখীও হইয়াছ। এক-দিন মহারাজা অজও ইন্দুমতীকে বলিয়া-ছিলেন,—

"গৃহিনী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা—
হরতা ত্বাং বদ কিং নমেহতৎ॥
(রঘুবংশ—অষ্টম সর্গ)

হায় বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কবে এইরূপ রমণী বিরাজ করিবে?

শ্রীপঞ্চানন কাব্যতীর্থ।

চীনের ভাষা ও সাহিত্য

বিলাতে থাকিতে চীনের নাম শুনি নাই। লণ্ডনে চীনা ছাত্র বেশী নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রাচীন চীনের নিদর্শন কিছু কিছু দেখিয়াছি। এভিনবারার মিউজিয়ামে চীনা চিত্রশিল্পের একটা প্রদর্শনী হইতেছিল। সাধারণতঃ ইংরাজেরা চীনের সংবাদ বেশী রাখেন না।

কিন্তু নিউইয়র্কে আমাদের কলিকাতার চীনাবাজারের মত একটা চীনাটোলা আছে। পাড়ার নাম 'চীনাটাউন'। অবশ্য এই চীনা-বাজার দেখিয়া চীনের আসল আদব কায়দা সমাজ সভ্যতা বুঝা যায় না। কিন্তু বিদেশীয় লোকেরা নিউইয়র্কের চীনামহাল্লা দেখিয়া চীন দেখার সাধ মিটাইয়া থাকেন!

নিউইয়র্কে বিদেশীয় ছাত্রসমাজের অধিকাংশই চীনদেশীয়। জাপানী ও ফিলিপিনোর সংখ্যা বেশী নয়। ভারতীয় ছাত্রদের সংখ্যা অত্যল্প। কাজেই এশিয়াবাসী ছাত্রের কথা উঠিলে নিউইয়র্কের লোকেরা চীনা ছাত্রের মূর্তি স্মরণ করে।

আমেরিকায় চীন-তত্ত্ব

এখানকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। যতদূর জানি জার্মাণি ছাড়া চীন-তত্ত্ব বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখান হয় না। অবশ্য চীন জাপানের গুরু—সুতরাং জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন-তত্ত্ব-বিভাগ বিশেষরূপেই গঠিত হইয়া থাকে।

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা-বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ শিখান হয়,—

(১) লিখিত ভাষা, (২) কথিত ভাষা, (৩) চীন-প্রসঙ্গ। তৃতীয় বিষয় বৎসর বৎসর পরিবর্তিত হইয়া থাকে। "In general they will deal with the relations of China to Europe the history of Commerce in China the Social life and art of the Chinese, ancient and modern religion and folklore, the ethnography of Asia as represented in Chinese literature &c."

যাহারা চিনের ভাষা ও সাহিত্য পাঠ করিতে অনিচ্ছুক তাহারা এই উপায়ে প্রাচীন ও বর্ত্তমান চীনের সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, শিল্প, রাষ্ট্র ব্যবস্থা সকলই শিখিতে পারে।

এই সকল বিষয় দুই স্তরে শিখান হয়। প্রাথমিক স্তরে মোটা জ্ঞান প্রদান করা হইয়া থাকে। পরে উচ্চ অঙ্গের গবেষণা সুরু হয়। প্রকৃত মৌলিক অনুসন্ধানে প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ ইত্যাদি কার্যে যাঁহারা লিপ্ত হইতে চাহেন তাঁহাদের জন্য এই বিভাগ। আমেরিকার সকল বিশ্ব-বিদ্যালয়েই প্রাথমিক বিভাগের পর একটা "অনুসন্ধান" বিভাগ বা "পর্য্যালোচনাবিভাগ" আছে। সাধারণতঃ বি, এ, উপাধি পাইবার পর ছাত্রেরা এই বিভাগে স্বাধীন গবেষণায় অভ্যস্ত হয়। এই বিভাগকে Seminar বলে।

চীনতত্ত্বের "সেমিনার"-বিভাগে তিন প্রকার বিষয় আলোচিত হয়।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রশাসন বিষয়ক। "Based on the original Chinese literature in the shape of books, state papers, ancient and modern.

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক সাহিত্য-বিষয়ক। "Based on original Chinese texts in the ancient and mediæval history of China or Central Asia in Connexion with the discoveries made by modern explorers."

তৃতীয়তঃ, সাধারণ সভ্যতা-বিষয়ক—"Based on the Chinese literature or foreign works regarding the various branches of Chinese culture such as bronzes, stone sculptures, porcelain, hieroglyphics, calligraphy, pictorial art and objects of daily life."

অধ্যাপক হার্থ

জার্ম্মাণ অধ্যাপক ফ্রেডরিক হার্থ (Hirth) এই বিভাগের কর্ত্তা। ইনি ২৫ বৎসর চীনের নানা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছেন। এক্ষণে ইঁহার বয়স ৭৫ বৎসর। বৃদ্ধের গৃহে চীনা বস্তু সমূহের একটা নাতি ক্ষুদ্র মিউজিয়াম দেখিলাম। দ্বাদশ অয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বহুচিত্র ইঁহার সংগ্রহের অন্তর্গত। কতকগুলি ইনি কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশও করিয়াছেন—এখনও বহু চিত্র অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া চীনাভাষায় রচিত প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থ এবং ফরাসী ও জার্ম্মাণ পণ্ডিতগণের লিখিত চীন-বিষয়ক নানা গ্রন্থ একত্র দেখিতে পাইলাম।

আজকাল ইঁহার ছাত্র সংখ্যা বেশী নয়—সর্ব্বসমেত ১০।১২ জন মাত্র। ইনি বলিলেন "ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ বা দর্শনালোচনার জন্য কোন ছাত্র এখন পর্য্যন্ত চীনা-বিভাগে প্রবেশ করিল না। যে কয়জন ইয়াঙ্কি ছাত্র পাইয়াছি তাহারা হয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক অথবা ব্যবসাদারের পুত্র। চীনা ছাত্র এখানে প্রায়ই আসে না। জাপানী ছাত্র দুই একজন পাইয়াছি। একজন জাপানী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ল্যানম্যানের নিকট সংস্কৃত শিখিয়া আমার নিকট চীনা শিখিতে আসে। একণে সে জাপানের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে। বর্ত্তমানে একজন জাপানী ছাত্র পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য চীনের দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাধীন গবেষণা করিতেছে। তাহার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—পরীক্ষা করিতেছি। পি, এইচ, ডি উপাধির জন্য একজন চীনা ছাত্র চেষ্টা করিতেছে। চীনের শিক্ষা-ব্যবস্থা তাহার আলোচ্য বিষয়।"

চীনের ইতিহাস সম্বন্ধে আধুনিক কালে ইয়োরোপ আমেরিকা ও এশিয়ার পণ্ডিতগণ যে সমুদয় তথ্য উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন সেগুলি এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

হার্থ বলিলেন—"এ সম্বন্ধে একখানা তালিকা-গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে চীন সম্বন্ধে আধুনিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র আছে। ইহা ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত। নাম Bibliotheca Sinica (Second Edition) up to 1908 Edited by Henri Cordier. আর একখানা গ্রন্থ ইংরাজীতে লিখিত। নাম Notes on Chinese Literature লেখক Alexander Wylie.

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে চীনের সম্রাট সমগ্র সাম্রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলি সুশৃঙ্খলরূপে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল প্রকার চীনা-গ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত হয়। এই ইংরাজী গ্রন্থে সেই তালিকা হইতে উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই ফরাসী ও ইংরাজী গ্রন্থ যদি হাতে থাকিলে চীনের প্রাচীন ও আধুনিক সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মালমসলা পাইবার সুযোগ ঘটিবে।"

মূল্যবান চীনা গ্রন্থ

বলা বাহুল্য, হার্থ নানা গ্রন্থ প্রবন্ধ-পুস্তিকা লিখিয়াছেন। কিন্তু যত লিখিতে পারেন তাহার তুলনায় এখনও কিছুই বাহির হয় নাই বলিতে পারি। একখানা গ্রন্থ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। আমাদের মধ্যযুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বহু মূল্যবান্ উপকরণ পাওয়া যাইবে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আরবের মুসলমান জাতির সঙ্গে চীনের ব্যবসায় বাণিজ্য কিরূপ চলিত তাহার একটি সুবিস্তৃত সমসাময়িক গ্রন্থ আছে। গ্রন্থের নাম Chu-fan-chi or Description of Barbarous peoples, or Records of foreign nations অর্থাৎ বিদেশ প্রসঙ্গ) গ্রন্থের লেখক Chau Ju Kua। চীন সাম্রাজ্যের এক বন্দরে বাণিজ্য-সচিবের কর্ম্ম করিতেন। তিনি সওদাগরদিগের নিকট বিভিন্ন দেশ সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য পাইয়াছিলেন সেইগুলি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া Chau Ju Kua এই "বিদেশ-প্রসঙ্গ" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই মূল্যবান্ গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়া অধ্যাপক হার্থ এবং সুপণ্ডিত রকহিল অনুবাদ টীকা ও ভূমিকাসহ প্রকাশিত করিয়াছেন। পেট্রোগ্রাড নগরের Imperial Academy of Sciences হইতে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথম ভাগে বাণিজ্যসচিব নিম্নলিখিত দেশসমূহের ভৌগোলিক, সামাজিক ও আর্থিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (১) টং কিং (২) আনাম, (৩) পান্‌রাং (৪) কাম্বোজ (৫) মালয় উপদ্বীপ (৬) ব্রহ্মদেশ (৭) পূর্ব্ব সুমাত্রা, (৮) পশ্চিম যবদ্বীপ (৯) সিংহল (১০) যবদ্বীপ ১) মালাবার (১২) গুজরাত, (১৩) মালব (১৪) বোলরাট্ট, (১৫) বাগদাদ (১৬) আরব (১৭) মক্কা (১৮) জাঞ্জিবার (১৯) বর্ব্বর (২০) সোহর (?) (২১) সোমালিদেশ (২২) ওমান (২৩) কিশদ্বীপ (২৪) বাস্‌রা (২৫) গজনী (২৬) মোজল (২৭) এশিয়া মাইনার (২৮) দক্ষিণ স্পেন (২৯) মিশর (৩০) আলেকজান্দ্রিয়া (৩১) বের্বিও, (৩২) ফিলিপাইন দ্বীপ (৩৩) কর্ম্বোসা, (৩৪) কোরিয়া (৩৫) জাপান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ভাগে কর্পূর, গোলাপ জল, চন্দন, লবঙ্গ, জায়ফল, কস্তুরী, কাঁঠাল, সুপারি, নারিকেল, এলাচি, মুক্তা, গণ্ডারশৃঙ্গ, শুকপক্ষী ইত্যাদি বিবিধ পণ্যদ্রব্যের বিবরণ আছে।

ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় হার্থ বলিতেছেন :—

Such as it is, Chau Ju Kua's work must be regarded as a most Valuable source of information on the ethnology of the nations and tribes known through the sea-trade carried on by the Chinese and Mahomedan

traders in the Far East about the period at which it was written.

His notes to a certain extent are second hand information, but notwithstanding this, he has placed on record much original matters fact and information of great interest. The large percentage of clear and simple matter of fact data we find in his work, as compared with the improbable and incredible admixtures in all oriental authors of his time, gives him a prominent place among the mediœval authors on the ethnography of his time, a period particularly interesting to us, as it proceeds by about a century Marco Polo, and fills a gap in our knowledge of China's relations with the outside world extending from the Arab writers of the ninth and tenth centuries to the days of the great Venetian traveller."

মেগাস্থিনীস, মার্কোপোলো, বার্ণিয়ার, ট্যাভার্ণিয়ার ইত্যাদি ইয়োরোপীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ন্যায় এই চীনা ভৌগোলিক গ্রন্থ হইতে এশিয়ার ইতিহাস-সঙ্কলনে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাইবে।

হার্থের অনুমতি পাইয়া তাঁহার "অনুসন্ধান-" বিভাগে ছাত্র হইলাম। সর্ব্বসমেত ৬।৭ ঘণ্টা মাত্র তাঁহার শিক্ষত্ব গ্রহণ করা হইল। ভারতীয় ছাত্রেরা একণে জার্ম্মাণ ও ফরাসী ভাষা শিখিতেছে—ক্রমশঃ রুশ ও স্পেনিশ ধরিবে। তাহা না হইলে জগতের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে ভারতবাসী প্রয়োজনীয় রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিবে না এতদ্ব্যতীত অল্পকালের ভিতরেই আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলে পার্শী, চীনা ও জাপানী ভাষা শিখিবার আগ্রহও জন্মিবে। ইতিমধ্যে পার্শীভাষাজ্ঞ কেহ কেহ আমাদের দেশে দেখা দিয়াছেন। জাপানী জানা লোকও দুই চারিজন আছেন। কিন্তু চীনা ভাষাভিজ্ঞ ভারতবাসী নিতান্তই নগণ্য। আশা করা যায় আগামী দশ বৎসরের ভিতর এশিয়ার এই সমুদয় ভাষা আয়ত্ত করিয়া বহু লেখক সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইবেন।

এসিয়ার চীনা-সাহিত্য

চীনা-সাহিত্য জানা না থাকিলে এশিয়ার ইতিহাস বুঝা এক প্রকার অসম্ভব। হার্থ বলেন—"চীনা-সাহিত্য একমাত্র চীনদেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নরনারীর সাহিত্য নয়। ইহা জাপান, আনাম, মোগল দেশ ইত্যাদি এশিয়ার নানা প্রদেশের সাহিত্য—প্রকৃত প্রস্তাবে অর্দ্ধ এশিয়ায় ইহার প্রভাব। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য ইয়োরোপে যে স্থান অধিকার করে চীনা-সাহিত্য এশিয়ায় তাহা অপেক্ষা বিস্তৃততর স্থান অধিকার করে।"

চীনা সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কোন গ্রন্থ চীনা ভাষায় নাই। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই চীনা গ্রন্থনিচয়ের তালিকা ও সূচীপত্র প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। চীনের লোকেরা গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে ভাল বাসেন। অতি প্রাচীন যুগেও মধ্যবিত্ত এবং ধনী ব্যক্তিরা অবস্থানুসারে ক্ষুদ্র বৃহৎ লাইব্রেরী স্থাপন করিতেন। সম্রাটেরাও রাষ্ট্রকেন্দ্রে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সকল গ্রন্থশালার অন্তর্গত পুস্তকসমূহের নাম ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইত। এইরূপ তালিকা অনেক পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর একখানা তালিকা-গ্রন্থে চীনা সাহিত্যের নিম্নলিখিত বিভাগ ও শাখা বিবৃত হইয়াছে :—

(১) কন্‌ফিউসিয়াস এবং লেওট্‌জ এবং তাঁহাদের মতাবলম্বী দার্শনিকগণের চিন্তা-পদ্ধতি

(২) ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক

(৩) দার্শনিক—কন্‌ফিউসিয়াস এবং লেওট্‌জ—এই দুই জনের মতবাদের বহির্ভূত চিন্তাপদ্ধতি। এতদ্ব্যতীত কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সমর ইত্যাদি নানাবিধ বিদ্যা সংক্রান্ত সাহিত্য এই শাখার অন্তর্গত

(৪) কাব্য এবং অন্যান্য রচনা

খৃষ্টীয় একাদশশতাব্দীর একখানা তালিকা-গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা ৬৬ খণ্ডে বিভক্ত। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে পিকিংএর দরবার হইতে উহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একখানা তালিকা গ্রন্থে Chau Ju Kua প্রণীত 'বিদেশ-বৃত্তান্ত' উল্লিখিত হইয়াছে। চীনা-সাহিত্য সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তালিকা গ্রন্থ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কিউন-লাবএর আমলে সঙ্কলিত হয়।

অধ্যাপক হার্থ একদিন খৃষ্টপূর্ব্ব ষাদশ শতাব্দীর চীনা সভ্যতার বিবরণ প্রদান করিলেন। সেই সময়ে Chau রাজবংশের সূত্রপাত হয়। এই বংশ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করে। তখনও চীনে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্ম খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনের সমাজে প্রবেশ করে। হার্থের মতে "Chau রাজবংশের আমলে চীনের লোকেরা চীনের বাহিরে আসিত না—বহির্ব্বাণিজ্য বলিয়া কোন ব্যাপার ঘটিত না। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চীনের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না সন্দেহ।"

এই আমলের একখানা চীনা গ্রন্থের পরিচয় পাইলাম। নাম Cheouli। প্রবাদ এই যে প্রথম সম্রাট খৃষ্টপূর্ব্ব ষাদশ শতাব্দীতে চীন রাষ্ট্রের শাসনবিধি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থ রচনা করান। তাহা হইলে দেখিতেছি জগতের রাষ্ট্র-নীতি বিষয়ক সাহিত্যে এই চীনা গ্রন্থই সর্ব্বপ্রাচীন। আর একটা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় আছে। এই গ্রন্থে নাকি রাষ্ট্রীয় তথ্য ছাড়া বৈষয়িক ও শিল্পবিষয়ক নানা কথার আলোচনা আছে। ইহাতে ধাতু সংমিশ্রণ, অলঙ্কার গঠন ইত্যাদি কার্য্য সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ পাওয়া যায়। অর্থ-শাস্ত্র, শুক্রনীতি, আইনি আক্‌বরী ইত্যাদি গ্রন্থের সঙ্গে এই হিসাবে ইহার তুলনা হইতে পারে। গ্রন্থখানা ফরাসী পণ্ডিত Piot কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছে।

চীনাজাতির বিদেশ গমন

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি বিবেচনা করেন যে খৃষ্টীয় যুগের পূর্ব্বে চীনারা অন্যান্য এশিয়াবাসীর সঙ্গে আদৌ মিশিত না? ইহাদের লোক-সাহিত্য, দর্শনবাদ, শিল্প, কারুকার্য্য ইত্যাদিতে পারস্য বা ভারত-বর্ষের কোন প্রভাব পড়ে নাই?" ইনি বলিলেন—"না। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৮ সালে Chang Kieu নামক একব্যক্তি মধ্য এশিয়ায় বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। ইনি বাক্‌ট্রিয়া, পার্থিয়া, তুর্কীস্থান ইত্যাদি দেশ দেখিয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি চীনের বাহিরে আসিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। ইনি স্বদেশে ফিরিবার সময় কৃষি ও শিল্পের উপযোগী নানাবিধ নূতন দ্রব্য সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী চীনা-সাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে।"

হার্থ বলেন "জাতিতে জাতিতে ভাব-

বিনিময় ও কর্ম্ম-বিনিময় সপ্রমাণ করা বড় কঠিন। মনে করুন, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থশতাব্দী হইতে ও প্রাচীন চীনা-সাহিত্যে চন্দ্রের ভিতর শশকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোক-কল্পনার পরিচয় পাই। ইহা আবার খাঁটি সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখিতে পাই। চীনারা হিন্দুদের নিকট এই ধারণা গ্রহণ করিয়াছিল, না হিন্দুরা চীনাদের নিকট এই সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিল? অথচ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চীন ও ভারতের কোন বিষয়ে আদান প্রদানের কোনরূপ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় না। এইজন্যই বিশ্বাস করিতে হয়—এই সংস্কার চীনে ও হিন্দুস্থানে স্বতন্ত্রভাবে জন্মিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কোন বিষয়ে সাম্য দেখিলেই দুই দেশের বা সমাজের ভিতর লেন দেন ছিল বুঝা উচিত নয়।"

কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা

চীনা ভাষা শিখা বড় কঠিন। প্রথমতঃ, কথিত ভাষায় এবং লিখিত ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। চীনারা কথা বলিবার সময়ে যে ভাষা ব্যবহার করে গ্রন্থ লিখিবার সময়ে সেইভাষা ব্যবহার করে না। চীনের লিখিত ভাষা ও কথিত ভাষাকে দুইটি স্বতন্ত্র ভাষা বিবেচনা করা উচিত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Desultory Notes on the Government and people of China নামক গ্রন্থে ইংরাজ লেখক Meadows বলিতেছেন:—"When we learn French, in learing to speak it we at the same time learn to read it; but learning the best spoken Chinese and learing to read the written language, is like to speak the Parisian French and learning to read Latin. This is one cause of the great difficulty of learning the Chinese." কলিকাতায় কথিত বাঙ্গালা ভাষা আয়ত্ত করিয়া যেমন কোন লোক মান্দ্রাজের তেলুগু ভাষা লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে না, সেইরূপ চীনের মহাপণ্ডিত কথিত ভাষা আয়ত্ত করিয়াও কোন লোক চীনা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে না। তাহাকে লিখিত ও কথিত দুইটি ভাষা দুইবার দুই প্রয়াসে শিখিতে হয়।

গোলমাল এইখানেই চুকিয়া গেল না। লিখিতভাষার আবার নানা রীতি আছে। প্রত্যেক রীতি স্বতন্ত্র—এত স্বতন্ত্র ও পৃথক্ যে চীনা ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রীতিকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বিবেচনা করা উচিত। চীনের লিখিত ভাষায় প্রধানতঃ চারিটি রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চীনে চারিটি লিখিত ভাষা আছে বলিতে হইবে। তাহা ছাড়া প্রদেশ হিসাবে ভাষার তারতম্য উচ্চারণের তারতম্য ইত্যাদি আরও বহু প্রকার তারতম্য আছে। চীনাভাষার রীতিগুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে:—

(১) প্রাচীন রীতি—কন্‌ফিউসিয়াস এবং অন্যান্য দার্শনিকগণের ভাষায় এই রীতি অবলম্বিত। বিনা টীকায় ইহা বুঝা অসাধ্য। নিতান্ত সূত্রাকারে অল্প কথায় বক্তব্য সারিয়া দিবার চেষ্টা এই রীতির লক্ষণ।

(২) পণ্ডিতি রীতি—ছাত্রেরা পরীক্ষার সময়ে যে ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বোক্ত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার নাম পণ্ডিতি রীতি (Wen-chang or literary style.)

(৩) ব্যবসায়ী রীতি—সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য যথাসম্ভব সরল ও সহজ-

রূপে লিখিত হয়। রাষ্ট্রশাসন, বিচার, আইন, দলিল পত্র, ইত্যাদি এই ভাষায় লেখা হইয়া থাকে।

(৪) পরিচিত রীতি—সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। নভেল নাটক ইত্যাদি এই ভাষায় লিখিত হয়।

বলা বাহুল্য শিক্ষার্থী নিজের মতলব বুঝিয়া এই চারি রীতির মধ্যে এক বা একাধিক বাছিয়া লইবেন। প্রথমেই জানিয়া রাখা উচিত কোন এক রীতিতে সুদক্ষ হইলে অপর রীতি সম্বন্ধে কোন সাহায্য হইবে না। Meadows তাঁহার ইংরাজ পাঠকগণকে যাহা বলিতেছেন তাহা হইতে ভারতীয় পাঠকেরাও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন :—

"Missionaries may possibly find it useful to study the ancient style in order to acquaint themselves, with Chinese ethics in the original language. But every moment that Government servant or the merchant spends in the study of the ancient style is altogether misemployed.

মনুসংহিতা, রামায়ণ বা রঘুবংশ পাঠ করিয়া যেরূপ বৈদিক ভাষায় প্রবেশ করা যায় না সেইরূপ চীনের ব্যবসায়ী ভাষা শিখিয়া কন্‌ফিউসিয়াসের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আবার বৈদিক ভাষায় অধিকার থাকিলে কালিদাসী ভাষা আয়ত্ত হয় না। সেইরূপ কন্‌ফিউসিয়াসের ভাষা বুঝা থাকিলে রাষ্ট্রীয় ভাষা বুঝা যাইবে না। সুতরাং

"The first business of the foreign Government agent or merchant, who inteds studying the Chinese is to learn to speak, which can be best done by reading some work in the *familiar style* as a play or novel, with a good teacher, paying however still more attention to the language the uses in conversation than to that contained in the books. When the student is able to converse with some degree of ease, and can understand the explanations of his teacher he should commence reading the more easy compositions in the business style, as the proclamation of the Mandarins, contracts &c."

অধ্যাপক হার্থও এই কথা বলেন। ইঁহার প্রণীত Chinese Documentary style নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

হিন্দু ছাত্র।

জাফরাণের-চাষ

(সংকলিত "উদ্ভিদের-বিশ্বকোষ" নামক গ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য হইতে উদ্ধৃত)

(SPECIAL FOR GRIHASTHA)

ক্রোকাস CROCUS জাফরাণ।

N. O. IRIDEE.

আইরিস (Iris) অর্থাৎ দশবাইচণ্ডী পরিবার ভুক্ত উদ্ভিদ,

Iris Family.

ইহারা জাফরাণ জাতীয়, মূলজ উদ্ভিদ্ বিশেষ। ইহাদের মূল দেখিতে রসুনের মূলের ন্যায়। পাতাও দেখিতে প্রায় রসুনের পাতার ন্যায়। ইহাদের জন্মস্থান ইউরোপ। এসিয়ার কোন কোন স্থানও, কোন কোন জাতির জন্মভূমি। এসিয়ার পারস্য, আফ্‌গানিস্থান, কাশ্মীর ও বাহ্লীক (Bulkh) ও কোন কোন জাতির আদিম অধিবাস। ইহাদের ফুলের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। ইহাদের ফুলের বর্ণচাকচিক্য অতিশয় মনোমুগ্ধকর। পীত, লোহিত, নীল, বেগুনে, শ্বেত ও কমলা রং ভেদে ইহারা নানাবর্ণের হয়। নীল ও বেগুনে বর্ণের জাতি সত্বরেই নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। চান্‌কার ও রাস্তার ধারে, রকারিতে (Rockery) * ও উদ্যান শয্যায় (Garden bed), ইহারা অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। তৃণমণ্ডলে ও তৃণ-শয্যায় ইহাদের সৌন্দর্য্য পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। পাত্রেও ইহাদের চাষ হইতে পারে। জলপূর্ণ অগভীর গামলাতে বা পাত্রেও ইহাদের চাষ হয়।

কেবল যদুআশেও (Jadoo fibre)† ইহাদের চাষ হয়। উষ্ণতাবিহীন সবুজ-গৃহেও ইহাদের চাষ হইতে পারে। উদ্যানে ইহাদের চাষ করিলে, যে সময়ে ইহারা ফুল ধারণ করে সবুজগৃহে (Green house) চাষ করিলে উহার বহুদিন পূর্ব্বেই ইহারা পুষ্পিত হয়। ক্রোকাস ফুলের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত না হয়, জগতে এরূপ লোক দুর্লভ। সৌন্দর্য্যের জন্যই কেহ কেহ, ইহাদিগকে স্বর্গীয় পুষ্প (Paradise flower) নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়—ইহারা এদেশের নিম্নপ্রদেশে চাষের উপযোগী নহে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের চাষে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। নিম্ন প্রদেশে—শীতকালে সবুজগৃহে দুই এক জাতির চাষ হইতে পারে। কিন্তু উহাদের মূল বর্ষাকালে পচিয়া যায়। অন্য মূলের ন্যায় শুষ্ক করিয়া নিম্ন প্রদেশে উহাদিগকে রক্ষা করা যায় না। আমি হোলণ্ড (Holland) হইতে ক্রমে ২।৩ বার, ইহাদের মূল আনাইয়া নিজ বাগানে চাষ করিয়াছি। শীতকালে ইহারা ফুল ধারণ করিয়াছিল।

---

* কৃত্রিম পাহাড়কে রকারি (Rockery) কহে।

† প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে শৈবালবৎ (Moss-like) একরূপ পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাকে যদুআশ কহে। উহা উদ্ভিদের উপরই জন্মে।

কিন্তু আমি উহাদের মূল কোন সময়েই রক্ষা করিতে পারি নাই, গ্রীষ্মকালের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই উহারা মরিয়া গিয়াছে। মনসুন (Monsoon) নামক বাণিজ্য-বায়ু ইহাদের পরম বৈরী। এই বায়ুর উষ্ণতা দ্বারা, ইহাদের মূল সহজেই পচিয়া যায়। বর্ষাকালে কিছুতেই ইহাদিগকে নিম্নপ্রদেশে রক্ষা করা যায় না। পরীক্ষার্থ ক্রমে ২।৩ বার উহাদের মূল আমদানী করিয়াও আমি উহাদিগকে রক্ষা করিতে পারি নাই। নিম্নপ্রদেশে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, প্রতিবৎসরই শীতকালের আরম্ভে, বিদেশ হইতে ইহাদের মূল আমদানী করিতে হয়। শ্রাবণ বা ভাদ্রমাসে, ইহাদের মূল, ইউরোপ হইতে রওনা হইলে, আশ্বিন কি কার্ত্তিক মাসে উহা এদেশে পহুঁছে আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসেই নিম্নপ্রদেশে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। তাহা হইলে, অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত, ইহারা ক্রমে পুষ্প ধারণ করিয়া থাকে। তুষার-বিধৌত শীতপ্রধান স্থান ইহাদের চাষ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ইহাদের পরম বৈরী। নিম্নপ্রদেশে পাত্রে ইহাদের চাষ করাই সুবিধাজনক। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাবের কোন কোন স্থানে, কমায়ুন, দেরাদুন, মশৌরী, কার্শিওঙ্গ, শিলং, দার্জ্জিলিং ও নীলগিরির পাদদেশে, ইহাদের কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। এদেশের পাহাড়তলীতেও কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে। ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এবং সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই ইহারা জন্মিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে গৃহে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, যে স্থানে আলো ও পরিষ্কার বায়ু সুলভ, এরূপ স্থানে পাত্রসহ উহাদিগকে রাখিতে হয়। পাত্রে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, সময় সময় ইহাদিগকে প্রচুর পরিমাণ জল দিতে হয়। যে স্থানে ইহাদিগের চাষ করিতে হইবে, ঐ স্থান অতিশয় স্নিগ্ধ রাখার প্রয়োজন। ইউরোপে ঘাসযুক্ত স্থানেও ইহাদের চাষ হয়। ইহাদের মূলের উপরিভাগ, ঘাসের চাপড়ার নীচে অবস্থিত থাকিলে মূল স্নিগ্ধ থাকে। তদবস্থায় ইহাদের গাছ সত্বরে বর্দ্ধিত হয়। খোলা স্থানে ইহাদের চাষ করিতে হইলে, উদ্যান শয্যায় একত্রে বহুসংখ্যক মূল রোপণ করিতে হয়। সারি (row or line) করিয়াও ইহাদের মূল রোপণ করা যায়। এক হইতে ২।৩ সারি করিয়াও কেহ কেহ ইহাদের মূল রোপণ করিয়া থাকে। তিন ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে এবং দুই ইঞ্চি দূরে দূরে, ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। শীতপ্রধান দেশে, সেপ্টেম্বর মাসে ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। ইহাদের মূল তিন বৎসর পর্য্যন্ত একই স্থানে থাকিতে পারে। তিন বৎসর পরে ইহাদিগকে তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে হয়। একস্থানে ইহাদিগকে দীর্ঘকাল রাখিতে হইলে, সময় সময় ইহাদিগের গোড়ার মৃত্তিকা উঠাইয়া দিয়া, তদুপরি তরল-সার বা অনুরূপ সার ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন জাতি একস্থানেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। কোন কোন জাতি বর্ষার বারি-ধারা সহ্য করিতে অক্ষম। বারি-পাত দ্বারা উহাদের মূলের অপচয় হয়। এইরূপ জাতির মূলকে বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই উঠাইয়া ঘরে রক্ষা করিতে হয়। ইহাদের পাতা, সম্পূর্ণরূপে মরিবার পূর্ব্বে, মূল উঠাইতে হয় না। পাতা একেবারে মরিয়া গেলে, মূল উঠাইতে হয়। ইহাদের পাতা কখনই কাটিয়া

বা ছিঁড়িয়া ফেলিবে না। কাঁচা পাতা কাটিলে বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে, মূল শুকাইয়া পড়ে। সারবান দোআঁশ মৃত্তিকা ইহাদের চাষপক্ষে বিশেষ উপযোগী। উদ্ভিজসারই ইহাদের পক্ষে বিশেষ সার। ইহাদের চাষে একটী গুপ্তরহস্য আছে। ইহাদের মূলকে অধিক মৃত্তিকার নীচে রোপণ করিবে না। মূলের আকার ও বয়সানুসারে, এক ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চি মৃত্তিকার নীচে ইহাদের মূল রোপণ করা সঙ্গত নহে। তদপেক্ষায়, ইহারা আশানুরূপ সুন্দর ফুল প্রসব করিবে না। তাবা (shallow) রোপণ দ্বারা সুফল লাভ করা যায়। শীত-প্রধান দেশে জাতি অনুসারে, শ্রাবণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত, ইহাদের মূল রোপণ করিতে হয়। ইহারা প্রধানতঃ চারিটী জাতিতে বিভক্ত :—

১। সাধারণ জাতি। (২) শরৎকালোপযোগী জাতি। (৩) শীতকালোপযোগী জাতি। (৪) বসন্তকালোপযোগী জাতি। ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে, ভিন্ন ভিন্ন সময় রোপণ করিলে, বৎসরের অর্দ্ধভাগের অধিককাল ইহাদের ফুল লাভ করা যায়। সাধারণ জাতির মূল আগষ্ট মাসের প্রথমভাগে, শরৎকালোপযোগী জাতির মূল আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে, শীতকালোপযোগী জাতির মূল সেপ্টেম্বর হইতে অক্টোবর মাসে এবং বসন্তকালোপযোগী জাতির মূল, ফেব্রুয়ারী হইতে মার্চ্চ মাসের মধ্যে রোপণ করিলে, সমস্ত শরৎকাল, শীতকাল এবং বসন্তকাল ব্যাপিয়া ইহাদের ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সময় অন্য ফুল দুর্লভ, সেই সময় ইহারা প্রচুর পরিমাণে ফুল প্রদান করিয়া থাকে।

পার্শ্বাঙ্কুর (Side shoots or suckers) ও বীজ দ্বারা ইহাদের গাছ উৎপন্ন হয়। বীজোৎপন্ন গাছ তিন বৎসরের পূর্ব্বে ফুল ধরে না। মূলোৎপন্ন গাছ, যে বৎসর রোপণ করা যায় ঐ বৎসরেই ফুল ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের চাষপক্ষে বীজোৎপন্ন গাছ অপেক্ষা মূলোৎপন্ন গাছই বিশেষ অগ্রগণ্য।

চড়াজাতীয় পক্ষী ইহাদের ফুলের পরম-বৈরী। ইহারা চঞ্চুদ্বারা ইহাদের ফুল ছিঁড়িয়া ফেলে। ইন্দুর এবং শশকও ইহাদের কম বৈরী নহে। ইহারা ইহাদের মূল খাইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল রিপুর উপদ্রব নিবারণের উপায় সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য।

ইহাদের সাধারণ জাতি বিশেষ আদরণীয় নহে। কেন না ইহাদের ফুল অল্পকাল স্থায়ী। শরৎকালীয় জাতীয় ফুল, অতিশয় সুন্দর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। যখন অন্য ফুল দুষ্প্রাপ্য, তখন ইহাদের ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। শীতকালীয় জাতির ফুল, প্রায় শরৎ কালীয় জাতির অনুরূপ। বসন্তকালীয় জাতির ফুলের বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল এবং ফুলও দীর্ঘকাল স্থায়ী। উপরে ইহাদের চাষ প্রণালী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, উহা কেবল শীতপ্রধান দেশের জন্যই প্রয়োগ যোগ্য। এ দেশের নিম্নপ্রদেশে কদাচিৎ ইহাদের চাষ হইয়া থাকে। সৌখীন ব্যক্তি সখের জন্য নিম্নপ্রদেশে ইহাদের চাষ করিতে ইচ্ছা করিলে, শীত ঋতুর আরম্ভের পূর্ব্বেই আমদানীকৃত মূল টবে রোপণ করিবেন। মৃত্তিকা ও সার সম্বন্ধে উপরে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাই অবলম্বনীয়। ইহারা নানা জাতি। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটী উৎকৃষ্ট জাতির বিবরণ লিখিত হইল।

ক—সাধারণ জাতি
(Ordinary varieties.)

১। ক্লথ্-অব্-গোল্ড—Cloth of Gold.

ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ; বহির্ভাগ শিরালী বর্ণের বিস্তৃত রেখাঙ্কিত; ফুল ক্ষুদ্র।

২। লার্জ গোল্ডেন-ইওলো—Large Golden Yellow. ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ; বৃহৎ; বহু সংখ্যায় ফুল হয়; মূল অতি বৃহৎ।

৩। গোল্ডেন-ইওলো—Golden Yellow. ফুল স্বর্ণবর্ণ।

৪। এল্‌বিওন—Albion. ফুল শ্বেতবর্ণ; ভায়ওলেট বর্ণের রেখাঙ্কিত।

৫। বেরণ-ভন-ব্রুনো—Baron Von Brunow. ইহার ফুল বেগুনে বর্ণ বা গাঢ় নীলবর্ণ।

৬। কোরিগিও—Correggio ইহার ফুল নীলবর্ণ; পাপড়ির কিনারা শ্বেতবর্ণ।

৭। ডেভিড্‌-রিজিও—David Rizzio. ফুল গাঢ় বেগুনে বর্ণ।

৮। নি-প্লাস-আল্ট্রা—Ne-plus ultra. ফুল নীলবর্ণ; উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ।

৯। পার্পিউরিয়া গ্রেণ্ডিফ্লোরা—Purpurea Grandiflora. ফুল অতিশয় জাঁকাল বেগুনে বর্ণ।

১০। লা-মাজেষ্টিউস্‌—La Majestusse. ফুল শ্বেতবর্ণ। পদ্মরঙ্গের রেখাঙ্কিত।

১১। ক্যারোলাইন-চিস্‌হোলম্‌—Caroline-Chisholm. ফুল শ্বেতবর্ণ; দেখিতে বড়ই সুন্দর।

১২। মণ্টব্লাঙ্ক—Mont Blank ফুল শ্বেতবর্ণ।

১৩। কুইন ভিক্টোরিয়া—Queen Victoria. ফুল শ্বেতবর্ণ।

খ শরৎকালোপযোগী জাতি
(Autumn flowering varieties.)

১৪। স্পিসিওসাস্‌—Speciosus. ফুল বেগুনে বর্ণ, পাপড়ির শিরা গাঢ় বেগুনে বর্ণ, পরাগকোষ আবরকপত্র কমলা বর্ণ, ফুল বৃহৎ।

১৫। সিরোটিনাস—Serotinus. পাটলবর্ণ; বেগুনে বর্ণের ছায়াযুক্ত।

১৬। জোনেটাস্‌—Zonatus. ফুল সামান্য রূপ বেগুনেবর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ; তলদেশ কমলা রঙ্গে চিত্রিত।

১৭। লঙ্গিফ্লোরাস্‌—Longiflorus Syn. Odorus অতিশয় সুন্দর জাতি; ফুল সামান্যরূপে বেগুনেবর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ; স্ত্রীপরাগকোষ লালবর্ণ; সুগন্ধযুক্ত।

১৮। অষ্টিউরিকাস্‌—Asturicus. ফুল বেগুনেবর্ণ।

১৯। অষ্টিউরিকাস্‌ এট্রোপারপিউরিয়াস A. attropurpurius. ফুল গাঢ় বেগুনেবর্ণ; তলদেশ গাঢ় বেগুনেবর্ণের দাগযুক্ত।

২০। পালচেলাস্‌—Pulchellus. ফুল মলিন বেগুনেবর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ (Lavender Color).

২১। আইরিডি ফ্লোরাস্‌—Iridiflorus-Syn-Byzantinus. ইহার ফুল আইরিস (Iris) ফুলের আকার; উজ্জ্বল বেগুনেবর্ণ; মধ্যভাগ সামান্যরূপ বেগুনেবর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ (Lilac color).

২২। ক্রাইসেন্থাস—Chrysanthus. ফুল কমলাবর্ণবৎ পীতবর্ণ; পাপড়ি শিরালীবর্ণে চিত্রিত।

২৩। ফাস্কোটিঙ্কটাস্‌—Fusco-tinctus

২৪। বোরি—Boryi.

ফাস্কোটিঙ্কটাস্‌ ও বোরি এই উভয় জাতির ফুল শ্বেতবর্ণ গলদেশ কমলাবর্ণ।

২৫। ইম্পেরেটি—Imperati ইহার ফুল নীলাভ শ্বেতবর্ণ; বেগুনেবর্ণের দাগযুক্ত গলদেশ পীতবর্ণ; অতিশয় সুগন্ধযুক্ত;

জানুয়ারীমাসে ইহার ফুল হয়। ইহা অতিশয় সুন্দর জাতি, এদেশের নিম্নপ্রদেশে ইহার চাষ হইতে পারে। শীত ও বসন্তকালে ইহার ফুল হয়।

২৬। নেভাডেন্‌সিস্‌—Navadensis. ইহার ফুল সামান্যরূপে বেগুনেবর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ (Lilac color); বেগুনেবর্ণের রেখাঙ্কিত।

২৭ সাইবেরী—Siberi (Nevalis) ইহার ফুল ভায়ওলেট (Violet) বর্ণ; শীত ও বসন্তকালেও ইহার ফুল হয়। এই জাতিও নিম্নপ্রদেশে চাষের উপযোগী।

২৮। ক্লিউসি—Clusii. ইহার ফুল বেগুনে বর্ণ; গলদেশ সামান্যরূপে বেগুনেবর্ণের ছায়াযুক্ত বর্ণ (Lilac color) দ্বারা চিত্রিত; দাড়িযুক্ত।

জাফরাণ ২৯। ক্রোকাস্‌ সেটাইভাস

Crocus Sativus.

Saffron Crocus-Real Saffron আসল জাফ্‌রাণ।

ইহাই প্রকৃত জাফ্‌রাণ। উপরে যে সকল জাতির উল্লেখ করা হইয়াছে—উহারাও এই পরিবারভুক্ত বটে। উহাদের কোন কোন জাতির ফুলেও সুগন্ধ আছে। ঐ সকল জাতির গর্ভকেশর এই জাতির গর্ভকেশরের সহিত মিশ্রিত করিয়া, খাঁটী জাফ্‌রাণকে কৃত্রিম করা হয়। কখন কখন কুসুম্ভ (কুসুম-Bastard Saffron) ফুল দ্বারাও খাঁটী জাফ্‌রাণকে কৃত্রিম করা হয়। জাফ্‌রাণ নানাগুণসম্পন্ন। গুণের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে, ইহার নামের পরিচয় দেওয়াই সঙ্গত। সুতরাং অগ্রে আমি ইহার নামের পরিচয়ই দিতেছি।

ইহার সংস্কৃতনাম, কাশ্মীরক, কুঙ্কুম, বাহ্লীক, ও শোণিত।

"কাশ্মীরকং কুঙ্কুমঞ্চ
বাহ্লীকং শোণিতং বয়ং।"

বচনান্তর যথা :—

কুঙ্কুমং ঘৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্‌।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং
শোণিতাভিধম্‌।"

অর্থাৎ ইহার নাম কুঙ্কুম, ঘৃণ, রক্ত, কাশ্মীর পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক, এবং শোণিতবাচক শব্দ মাত্র। ইহার অন্য নাম কাশ্মীরজ ও সুরভি।

দেশ-ভেদে নাম ভেদ—ইহা ইংরাজী ভাষায় সেফ্রো (Saffron); ফরাসী ভাষায় সফ্‌রিকমাস বা সেফ্রান (Safran) ও সোফ্রাঁন (Sofran); ইটালীয় ভাষায় জাফারেনো (Zafferano); স্পেন ভাষায়, এজাফ্রান (Azafran); পর্টুগিজ ভাষায় একাফ্রাম (Acafram); ডেনিস, জর্ম্মান ও সুইডেনের ভাষায় সেফ্রান (Saffran); তুরস্ক ভাষায় জাফিরাণ (Zaferan); আরব ও পারস্য ভাষায় জাফরাণ (Zaffran) নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের নানাস্থানেও ইহা নানা নামে পরিচিত। হিন্দুস্থানে ইহা কেশর ও জাফ্‌রাণ; মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কেশর; কর্ণাটে কুঙ্কুম ও তৈলঙ্গে কুঙ্কুম্পুবু ইত্যাদি নামে পরিচিত।

দেশভেদে গুণভেদ :—

"কাশ্মীর দেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং বহ্নিবেষ্টিতং।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্‌।
বাহ্লীক দেশসম্ভূতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্‌।
কেতকী গন্ধসংযুক্ত মধ্যমং সূক্ষ্ম কেশরম্‌।
কুঙ্কুমং পারসীকেষন্যদ্‌গন্ধি তদীরিতম্‌।
ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণং তদধমং স্থূল কেশরম্‌।"

(শব্দকল্পদ্রুম ও রাজনিঘণ্টু)

অন্তার্থ :—কাশ্মীর দেশজাত কুঙ্কুমের কেশর সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধযুক্ত। ইহাই উৎকৃষ্ট জাতি। বাহ্লীক দেশজাত কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ, সূক্ষ্ম কেশর, ও কেতকী ফুলের গন্ধযুক্ত। ইহাই মধ্যম জাতি। পারস্য দেশজাত কুঙ্কুম মধুগন্ধযুক্ত ; স্থূল কেশর ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। ইহাই অধমজাতি।

দেশভেদে ইহার ফুলের বর্ণগত পার্থক্যও লক্ষিত হয়। শরৎ ও শীতকালে ইহার ফুল হয়। ইহার ফুল সাধারণতঃ ভায়ওলেট্‌বর্ণের ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপড়ি সকল বেগুনেবর্ণের ও পরাগ কেশর কমলাবর্ণের হয়। ইহার ফুল অতিশয় সুগন্ধযুক্ত। কখন কখন ইহার পরাগ কেশর গাঢ় লালবর্ণেরও হইয়া থাকে। এই বর্ণের কুঙ্কুমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

জলবায়ু ও ভূমির গুণের তারতম্যানুসারে, ইহার ফুলের ও পরাগ-কেশরেরও, বর্ণের পার্থক্য সংঘটিত হয়। এই পরাগকেশর সকল কুঙ্কুম। ইহাদিগকে শুষ্ক করিয়া রাখিলেই উহাই কুঙ্কুম হয়। খাঁটী কুঙ্কুমের বর্ণ উদয়াচলাবলম্বী সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণ। ইহার পরাগকেশর সকল প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। উহা পীতাভ লালবর্ণ ও কুঞ্চিত। কুঙ্কুমপুষ্প ষট্‌দল বিশিষ্ট এবং প্রতি পুষ্পেই ছয়টী কেশর থাকে। এতন্মধ্যে তিনটি ঘোর রক্তিম বর্ণ। উহাই খাঁটী জাফ্‌রাণ। অপর তিনটী কেশর বাসন্তীবর্ণের। ইহা নকল বা অপ্রকৃত জাফ্‌রাণ। ইহা প্রকৃত কেশর হইতে কিঞ্চিৎ স্থূল ও ক্ষুদ্র। ফুলের গঠন এদেশীয় ভূমি চম্পকের ন্যায়। এই সকল কেশরের পরাগরেণু (Pollen) অর্থাৎ ধূলিবৎ পদার্থ সকলই ইহার সুগন্ধের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ৩০০০। ৪০০০ হাজার ফুল হইতে অনধিক অর্দ্ধছটাক খাঁটী কুঙ্কুম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা অতিশয় মূল্যবান। খাঁটী কুঙ্কুমের মূল্য প্রতি তোলা ন্যূনাধিক ১০৲ টাকা। ইহাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আজকাল খাঁটী কুঙ্কুম অতিশয় দুর্লভ। ব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়াই আসল কুঙ্কুম ভেজাল হয়। অধুনা প্রতি তোলা ১৲ হইতে ১৷৹ টাকা মূল্যেও পাওয়া যায়। ইহা নিশ্চয়ই খাঁটী কুঙ্কুম নহে। কুঙ্কুম পুষ্পের কুঞ্চিত পুষ্পদলকেও কখন কখন খাঁটী কুঙ্কুমের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাকে ভেজাল করা হয়। নূতন সভ্যতার ফলে আজকাল এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। বিদেশীয় কুঙ্কুম মধ্যে ভেলেন্‌সিয়া (Valencia) নামক স্থানের কুঙ্কুমই উৎকৃষ্ট।

কুঙ্কুমের কৃত্রিমতা পরীক্ষা করিতে হইলে যাহার পরাগকেশর, পাকালেবুর ন্যায় গাঢ় পীতবর্ণ, উহাকেই খাঁটী কুঙ্কুম বলিয়া জানিবে। নিকৃষ্ট কুঙ্কুমের বর্ণ, পাতলা বা ফিকাভ পীতবর্ণ। চর্ব্বি ও তৈল মিশ্রিত কুঙ্কুম চক্‌চকে দেখায়। উহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। কুঙ্কুম ঔষধে ও পাদ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। কুঙ্কুম অতিশয় সুগন্ধ বলিয়াই খাদ্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। কুঙ্কুমগাছের মূল হইতে, তৃণবৎ যে পত্র বহির্গত হয়, তাহাও সুগন্ধি। গাভী উহা ভক্ষণ করিলে উহার দুগ্ধ কুঙ্কুমের গন্ধবিশিষ্ট হয়। মেষ, ছাগ ও হরিণাদি জন্তু উহা খাইলে, উহাদের মাংসও কুঙ্কুমের গন্ধবিশিষ্ট হয়। দেবগাভী সুরভী, ইহা খাইয়াই সুরভী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, অমৃত পান নিবন্ধন প্রজাপতির পরম পরিতৃপ্তি হওয়াতে, তাহার মুখ হইতে সুগন্ধ উদ্গার উদ্গীর্ণ হইয়াছিল। সেই উদ্গার প্রভাবে সুরভী গাভীর উৎপত্তি হয়। সুরভী কুঙ্কুম তৃণ ভক্ষণ

করিত, সেইজন্য উহার দুগ্ধও অতিশয় সুরভি অর্থাৎ সুগন্ধযুক্ত ছিল। দেবগণ সেইজন্যই এই গাভীকে সুরভী নাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই গাভীর দুগ্ধপান করিতেন।

পোলাও (পোলাউ), ব্যঞ্জনাদি ও কালিয়া-কোপ্তা প্রভৃতি সুগন্ধ ও বর্ণ সুন্দর করার জন্য, এদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ইহার ব্যবহার চলিতেছে। মুসলমান জাতি কর্ত্তৃকই, ইহা খাদ্য দ্রব্যে, অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মুসলমান সম্রাট ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ, সকল প্রকার ব্যঞ্জনে ও পোলাও প্রভৃতিতে ইহা ব্যবহার করিতেন এবং অদ্যাপি মুসলমান পরিবার মধ্যেই ইহার ব্যবহার অধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে। হিন্দুগণকর্ত্তৃকও, কখন কখন ইহা খাদ্য দ্রব্যের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা মুসলমান সম্রাটদের অতি প্রিয় দ্রব্য ছিল।

কুঙ্কুম তিক্ত, কটুস্বাদ ও স্নিগ্ধ। ইহা শিরোরোগ, ব্রণ, বমি ও ত্রিদোষহারক এবং বর্ণ প্রসাদক।

"কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্।

বচনান্তর যথা :—

"কুঙ্কুমং সুরভি তিক্তং কটুকং কাসবাত
কণ্ঠরুজাহরম্।
মূর্দ্ধশূল বিষদোষ নাশনম্ রোচনঞ্চ
তনুকান্তিকারকম্।"
(রাজনিঘণ্টু)

অর্থাৎ ইহা তিক্ত কটুস্বাদ বিশিষ্ট। ইহা কাস, বাত, কণ্ঠরোগ, মূর্দ্ধশূল, ও বিষদোষ নাশক, রোচক ও দেহের কান্তিবর্দ্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাঘাত, শিরোরোগ, রক্তদোষ, শ্লেষ্মাদোষ, ত্রিদোষ (বায়ু, পিত্ত ও কফ) বমন রোগ, শূল প্রভৃতি রোগেরও মহৌষধ।

নব্য মতে—ইহার রস সুস্নিগ্ধ ও মৃদুরেচক; অগ্রভাগ স্থূল ও তিন খণ্ডে বিভক্ত; সদ্‌গন্ধযুক্ত; পীত লোহিতবর্ণ; তিক্ত ও কষা স্বাদ। ইহা উত্তেজক ও বায়ু নাশক। কেহ কেহ ইহাকে রজোনিঃসারক বলিয়া বিবেচনা করেন। কৈশিক-নাড়ীর ক্রিয়া বর্দ্ধনপক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। ক্রমে অধিক দিন ইহা সেবন করিলে ঘর্ম্ম ও মূত্র পীতবর্ণ হয়।

ইহার জন্ম বিষয়ে জনপ্রবাদ

ইহা কথিত হয় যে, কাশ্মীরবাসী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভগবতীর উপাসক ছিলেন। তিনি এরূপ দরিদ্র ছিলেন যে, দিনান্তেও তাঁহার একবার আহারের সংস্থান হইত না। তিনি অতি ক্লেশে, পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। আবশ্যকীয় অর্থের অভাবে, তিনি তাঁহার দুইটী যুবতী কন্যার বিবাহ দিতে সক্ষম হন নাই। তজ্জন্য দুইটী কন্যাই বিবাহের উপযুক্তকাল অতিক্রম করিয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া দুঃখ বিমোচনের আশায়, অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবতীর উপাসনা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল এই ভাবে তাঁহার আরাধনা করিয়াও অভীপ্সিত বিষয়ে, কোন ফল লাভ না হওয়ায়, তিনি বিফল মনোরথ হইয়া, নিকটবর্ত্তী একটা জলাশয়ে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় জীবনকে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হন। এই সময়ে মহাবিদ্যারূপিণী এক দেবী তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ঠাকুর! তুমি কি জাননা যে, আত্মহত্যায় কি মহাপাপ সংঘটিত হয়? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হাঁ, তা জানি; কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্য লোক আর

জগতে কেহ নাই। অর্থাভাবে আমি আমার দুইটী যুবতি কন্যার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিতে অক্ষম। আমার পরিবার প্রতি-পালনেরও উপায় নাই। এই অবস্থায় আমার এই অকর্ম্মণ্য জীবনকে রক্ষা না করিয়া, উহার বিনাশ সাধন করিতেই সঙ্কল্প করিয়াছি। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ তুমি কে, আমায় পরিচয় দেও? মহাবিদ্যা অমিয়-মধুর বচনে বলিলেন, বৎস! আমি এই পর্ব্বতবাসিনী একজন সাধিকা। এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ধর এই কয়েকটী বীজ গ্রহণ কর, ইহা দ্বারাই তোমার দুঃখ দারিদ্র্য দূর হইবে। ব্রাহ্মণ সযত্নে ঐ কয়েকটী বীজ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন মাতঃ! ইহা দ্বারা কি করিব? তখন মহাবিদ্যা একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন, বাছা! তুমি এই বীজ কয়েকটাকে ঐ স্থানে রোপণ কর। উহা হইতে যে গাছ উৎপন্ন হইবে উহারা রত্ন প্রসব করিবে এবং উহা দ্বারাই তোমার সকল দুঃখ দূর হইবে। ইহাদের পরাগ কেশর বিক্রয় করিয়া, তুমি যে অর্থ পাইবে, উহাই তোমার জীবন যাপন পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তোমাকে যে ক্ষেত্র দেখাইলাম ঐ ক্ষেত্র ভিন্ন ভারতের আর কোন স্থানে উহা জন্মিবে না। এই কথা বলিতে বলিতে ষোড়শী অন্তর্দ্ধান হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদেশানুযায়ী প্রদর্শিত স্থানে, ঐ বীজ কয়েকটী রোপণ করিলেন। উহা হইতে কয়েকটী গাছ উৎপন্ন হইল। কালক্রমে উহারা পুষ্পিত হইল। ব্রাহ্মণ উহাদের ফুল হইতে পরাগ কেশর সংগ্রহ করিয়া উহা শুষ্ক করতঃ নিজ গৃহে সঞ্চিত রাখিলেন। উহার সৌরভে তাঁহার বাস-গৃহ আমোদিত হইল। প্রতিবাসিগণ হঠাৎ ব্রাহ্মণ-গৃহে, এরূপ সৌরভ বিস্তৃত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে স্থানীয় রাজা ও মহারাজাদের মহলে এই সংবাদ পঁহুছাইল। তাঁহারা কুঙ্কুমের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া, অতি উচ্চ মূল্যে উহা ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই উপায়ে অতি অল্প সময় মধ্যে ব্রাহ্মণ ধনকুবের হইয়া উঠিলেন; তাঁহার দারিদ্র্য ও চির দুঃখ দূর হইল।

কাশ্মীরান্তর্গত পম্পুরের নিকটবর্ত্তী ১০০। ১২৫ হাত উচ্চ এবং দুই কি আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ একটী ভূমিখণ্ডে জাফরাণের চাষ হয়। ভারতবর্ষের অন্যত্র ইহার চাষ হয় না। সম্ভবতঃ মহাবিদ্যা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যে স্থান দেখাইয়া ছিলেন, উহাই এই স্থান। অতি প্রাচীন সময়ে কাশ্মীর ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ হইত কি না বলা যায় না। কিন্তু পারস্য বাহ্লীক ও আফ্‌গানি স্থানে ইহার চাষ হওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধুনা ইউরোপেও ইহার চাষ হইতেছে। কাশ্মীর হইতেই ইহার বীজ ইউরোপে নীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নানা স্থানে, ফ্রান্সে, স্পেনে, সিসিলি দ্বীপে, সুইজলণ্ডে ও জর্ম্মাণীতেও, অধুনা ইহার চাষ হইতেছে। ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও অধুনা ইহার চাষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ইহা কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সর্ব্বপ্রথম ইউরোপবাসী অনেক ভ্রমণকারীকর্ত্তৃক কুঙ্কুম বীজ কাশ্মীর হইতে ইংলণ্ডে নীত হইয়াছিল। এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল-ণ্ডের নানাস্থানে ইহার চাষ আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড হইতেই ইহার বীজ ইউরোপের নানা স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইউরোপ-

জাত কুঙ্কুম গুণে, কাশ্মীর, পারস্য ও বাহ্লীক-জাত কুঙ্কুম অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অধিকন্তু ইউরোপজাত কুঙ্কুম সহিত প্রাণীর বসা ও অন্যান্য নানা পদার্থ মিশ্রিত করিয়া উহার ওজন বৃদ্ধি করা হয় বলিয়া, উহা খাদ্য দ্রব্যে ও ঔষধে ব্যবহারের অযোগ্য হয়। এই জন্য বিদেশজাত কুঙ্কুম ব্যবহার করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। ইহাতে নানাবিধ বস্তুর বসা মিশ্রিত থাকায়, হিন্দু বা মুসলমান কর্ত্তৃক ইহা ব্যবহার হইবার অযোগ্য। ঔষধে ইহা ব্যবহার করিলে ঐ ঔষধও ফলপ্রদ হয় না।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই খাদ্য দ্রব্য সুগন্ধ ও বর্ণ সুন্দর করার জন্য ইহার ব্যবহার হইতেছে। মুসলমানগণই ইহার ব্যবহার করিতে বিশেষ অভ্যস্ত। মুসলমান রাজত্বকালে কাশ্মীরজাত কুঙ্কুম বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিত না। সমস্ত কুঙ্কুম কেবল সম্রাট পরিবারের ব্যবহারেই ব্যয়িত হইত। কুঙ্কুমের ফসল সংগ্রহের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, উহা রক্ষার জন্য কোন প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হইতেন। সরকারের তত্ত্বাবধানেই, কাশ্মীরে ইহার চাষ হইত। কদাচিৎ অন্য লোকে ইহা পাইতে সক্ষম হইত। কুঙ্কুম যে সম্রাটদের অতি প্রিয় দ্রব্য ছিল, তাহা প্রমাণ করার জন্য আমি নিম্নে একটী কিংবদন্তির উল্লেখ করিতেছি।

দিল্লীর অধীশ্বর কোন এক সম্রাটের সময়, কিঙ্কর সেন নামে তাঁহার একজন মোসাহেব ছিলেন। ইনি জাতিতে হিন্দু ছিলেন। ইহাকে সম্রাট অতিশয় ভাল বাসিতেন। একদা তিনি সম্রাটের অজ্ঞাতসারে কোন একটী অসাধ্য কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। সম্রাট তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে লক্ষ বিঘা ভূমি জায়গীর দিয়া ছিলেন। জায়গীর-দানের সনদে লিখা ছিল, কিঙ্কর সেন ভারত সাম্রাজ্যের যে কোন স্থান হইতে, ইচ্ছামত একলক্ষ বিঘা ভূমি গ্রহণ করিতে পারিবে। সম্রাট এই সনদ খানি স্বহস্তে সাক্ষর করিয়া অনেক প্রধান মুসলমান অমাত্য দ্বারা, কিঙ্কর সেনের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া ছিলেন। অমাত্যকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে ঐ সনদে কেহ একটী অক্ষর সংযোগ বা উহার একটী অক্ষর কর্ত্তন করিলে, আদেশ অপরাধে তাহার হস্তচ্ছেদন দণ্ড হইবে। কিঙ্কর সেনকে সম্রাট বড় ভাল বাসিতেন বলিয়া, কিঙ্কর অন্যান্য কার্য্যকারকদের বিশেষতঃ মুসলমান কার্য্যকারকদের, চক্ষুঃ-শূল হইয়াছিলেন। বাদশাহের দরবারে তাঁহার প্রকৃত প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে অপদস্থ করার জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ চেষ্টাবান ছিলেন এবং সকল কার্য্যকারকই কিঙ্করকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিতেন। সুযোগ পাইলে কিঙ্কর সেনকে জব্দ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এবার তাহাদের সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথ পরিষ্কার হইল। যে অমাত্য, কিঙ্কর সেনকে সনদ দিতে গিয়াছিলেন তিনি মুসলমান। তিনি কিঙ্কর সেনের হস্তে সনদখানি অর্পণ করিয়া, ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিঙ্কর সনদখানি আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, উহার শেষ ভাগে "বেগরতক্-জাফ্রাণ" এই কয়েকটী কথা সংযোগ করিলেন। সনদবাহক অমাত্য ভাবিলেন এইবারেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং এই বারেই কিঙ্করকে বাদশাহের কার্য্য হইতে অবসর করাইবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। তখন তিনি তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান

করিয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় যাইয়া সম্রাটকে বলিলেন, খোদাবন্দ! কিঙ্করসেন সনদ জাল করিয়াছে। সম্রাট তখন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন তোমরা এখনই উহাকে ধৃত করিয়া আমার নিকট উপস্থিত কর। সম্রাটের আদেশ মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রতিপালিত হইল। কিঙ্কর সম্রাট-দরবারে বন্দীস্বরূপে আনীত হইলেন। সম্রাট, কিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি আমার স্বাক্ষরিত সনদ জাল করিয়াছ? সে বলিল, না বন্দেনেওয়াজ! আমি সনদ জাল করি নাই। যাহা করিয়াছি, তাহা হুজুরের হিতের জন্যই করিয়াছি—সেকথা পরে বুঝাইয়া দিব। এইক্ষণ আমার একটী প্রার্থনা, হুজুর আমাকে এক লক্ষ বিঘা ভূমি জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আমি উহা চাই। আমি আশা-করি, হুজুরের হুকুম নড়িবে না। সম্রাট বলিলেন নিশ্চয়ই নয়—সনদ জাল না করিয়া থাকিলে, তুমি তাহা পাইবে—আমার হুকুম কখনই নড়িবে না। কিঙ্কর বলিলেন, হুজুরের স্বাক্ষরিত সনদে সর্ত্ত আছে যে, ভারতসাম্রাজ্যের যে কোন স্থান হইতে নিজ ইচ্ছামত, আমি এক লক্ষ বিঘা ভূমি গ্রহণ করিতে পারিব। সম্রাট বলিলেন, হাঁ। কিঙ্কর তখন বলিলেন আমি, দিল্লীর তক্ত (সিংহাসন) যে স্থানে অবস্থিত আছে, ঐ স্থানও উহার তলস্থ ভূমি, রাজপ্রাসাদসহ পাইতে ইচ্ছা করি। তদ্ভিন্ন কাশ্মীরের বিস্তৃত জাফ্‌রাণ ক্ষেত্রখানিও আমি চাই। এই দুই স্থানের ভূমি বাদে যাহা বাকী থাকিবে, তাহা আমি অন্য স্থান হইতে লইব। সম্রাট, দিল্লীর তক্ত ও জাফ্‌রাণ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। কিঙ্কর বলিলেন, তাহা হইলে হুজুরের প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকে কৈ? সম্রাট বলিলেন, এই দুই স্থান ভিন্ন অন্যত্র হইতে তোমার প্রাপ্য ভূমি গ্রহণ কর। কিঙ্কর তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, হুজুর যে, এই দুই স্থান ত্যাগ করিবেন না তাহা আমি পূর্ব্বেই জানি এবং সেই জন্যই সনদখানিতে কয়েকটী কথা সংযোগ করিয়াছি। এই বলিয়া কিঙ্কর তখন ঐ সনদখানি সম্রাটের হাতে দিয়া বলিলেন, হুজুর উহা পাঠ করিয়া দেখুন, আমি উহা জাল করি নাই—হুজুরের হিতার্থে উহার শেষ ভাগে "বেগরতক্ত জাফ্‌রাণ" এই কয়েকটী কথা সংযোগ করিয়া দিল্লীরতক্ত ও জাফ্‌রাণ ক্ষেত্র বাদ রাখিয়াছি। উর্দ্দু ভাষায় "বেগর" শব্দের অর্থ বিনা (except) বা ছাড়া এবং "তক্ত" শব্দের অর্থ সিংহাসন। কিঙ্কর পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী কথা সনদে সংযোগ করিয়া, সম্রাটের দুইটী অতি প্রিয় স্থান ত্যাগ করায়, তিনি তৎপ্রতি আরও বিশেষ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে আরও এক লক্ষ বিঘা ভূমি জায়গীর দিলেন। এই জনপ্রবাদ দ্বারাও ইহাই উপলব্ধি হয় যে জাফ্‌রাণ সম্রাটদের বড় প্রিয় দ্রব্য ছিল।

কুঙ্কুম যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণাদি দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। দেবীপুরাণের নিম্নলিখিত উক্তি দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন হয়।

"কুঙ্কুমেন সমাদদ্ধে চন্দনেন বিলেপিতে।" তন্ত্রিন্ন শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মযামল তন্ত্রেও ইহার উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। দেহ সুগন্ধ করার জন্য পূর্ব্বে কুঙ্কুম গুলিয়া চন্দনের ন্যায় ব্যবহার করা হইত। আয়ুর্ব্বেদের ভূরি ভূরি স্থানে ইহার উল্লেখ আছে।

জাফ্‌রাণ গাছের সকল ফুলেই স্ত্রী (Pistil) ও পুং (Stamen) ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে না।

যে ফুলে এই উভয় ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে উহাকে দ্বিলিঙ্গপুষ্প (Hermaphrodite flower) কহে। অধিকাংশ গাছের ফুলেই এই উভয় লিঙ্গই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাল, জাফ্‌রাণ ও পেপে প্রভৃতি গাছের পুষ্পে কখন কখন উহার অভাব দৃষ্টিগোচর হয়। জাফ্‌রাণের কোন কোন গাছ বন্ধ্যা হয়। কোন কোন গাছের ফুলে কেবল পুং ইন্দ্রিয়ই বিদ্যমান থাকে। উহারা গর্ভধারণ করে না।

জাফ্‌রাণ গাছ দ্বিবিধ—ক্ষেত্রিয় ও আরণ্য। আরণ্য (Crocus Sativus Wrightiana ?) ও ক্ষেত্রিয় (Crocus Sativus) জাতির গাছে, দৃষ্টতঃ বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু আরণ্য জাতির পরাগসঙ্গম ভিন্ন, ক্ষেত্রিয় (আবাদি) জাতি গর্ভধারণ করে না সুতরাং একত্র বা নৈকট্যভাবে এই উভয় জাতিরই চাষ করিতে হয়। তাহা অসম্ভব হইলে স্ত্রী জাতীয় গাছের অনতিদূরে, পুং জাতীয় গাছের চাষ করিতে হয়। আরণ্যজাতিই পুং জাতি এবং ক্ষেত্রিয় বা আবাদি জাতিই স্ত্রী জাতি। ইহাদের পুংজাতির পুষ্প পরাগ বায়ু ও কীট পতঙ্গাদি দ্বারা স্ত্রী জাতির পরাগের সহিত সংযুক্ত হইলেই, উহাদের গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহা হইলেই শেষোক্ত জাতি গর্ভধারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়া দ্বারা পরাগ-সঙ্গম না হইলে, ইহার চাষে সুফল লাভ করা যায় না। কৃত্রিম উপায়েও পরাগসঙ্গম করাইয়া ইহার ফুলের গর্ভাধান কার্য্য সাধিত হইতে পারে। উহা ব্যয় ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার বটে। আজকাল, স্ত্রী ও পুং জাতির চাষ একত্রে বা ভিন্ন রূপেই করা হয়। একক্ষেত্রে স্ত্রী জাতির ও নিকটবর্ত্তী অপরক্ষেত্রে পুং জাতির চাষ করাই সুবিধা-জনক। কুঙ্কুমের চাষের গূঢ় রহস্য উপরে বর্ণিত হইল। ইহার চাষ সম্বন্ধে আরও ২।১ টী কথা বলিবার আছে।

পারস্য প্রদেশে কুঙ্কুমের চাষ হয়। কাশ্মীর, বাহ্লীক ও পারস্য দেশের নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী স্থান ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ হয় না। ইহার গূঢ় রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। সম্ভবতঃ মৃত্তিকার গুণের তারতম্যের উপরেই ইহার মূল ভিত্তি, নিহিত রহিয়াছে। যে ভূমি পীতাভ প্রস্তর কঙ্কর মিশ্রিত ও কঠিন উহাতেই কুঙ্কুমের চাষ হয়। সাধারণ পার্ব্বত্য ভূমির উচ্চতাপেক্ষা জাফ্‌রাণ ক্ষেত্র আরও অধিক উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। যাহাতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে না পারে এবং বর্ষেরে অন্ততঃ একবার যে ভূমি তুষার দ্বারা বিধৌত হয়, উহাই কুঙ্কুম চাষের পক্ষে বিশেষ উপ-যোগী। এরূপ স্থান, কাশ্মীর, পারস্য ও বাহ্লীক দেশে অনেক আছে। তথাপি সকল স্থানে ইহার চাষ হয় না। সুতরাং ভূমির ও জল বায়ুর উপরেই যে ইহার চাষ অনেকটা নির্ভর করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকে বলে, "হাতকে রাঙ্গ, হাতের সোণা" অর্থাৎ একই ভূমির এক অংশের এক হস্ত পরিমাণ স্থানে রাং ও অপর অংশের এক হস্ত পরিমাণ স্থানে সোণা উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে একই ভূমির ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন গুণ সম্পন্ন হইতে পারে। কাশ্মীরের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ কেন হইতে পারে না, তৎসম্বন্ধে কাশ্মীর-বাসীর অভিমত এই—তাহারা বলে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের জাফরাণ ক্ষেত্র জগদীশ্বরের লীলা-ক্ষেত্র বিশেষ। সুতরাং ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যত্র ইহার চাষ হইতে পারে না।

কুঙ্কুম ক্ষেত্রকে ৬ ফুট বিস্তৃত সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া, উহাতে আলি বা

সারি (Row or line) করিয়া কুঙ্কুম মূল রোপণ করিতে হয়। যাতায়াতের সুবিধার জন্য দুই হইতে তিনফুট পরিসর পথ রাখিতে হয়। প্রতি বৎসর কুঙ্কুম মূল রোপণের আবশ্যক হয় না। এক বৎসরের উপ্ত মূল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। উহা কখন কখন ১৫।২০ বৎসর পর্য্যন্তও স্থায়ী হইয়া থাকে। এবং প্রতি বৎসরই উহারা কুঙ্কুম প্রদান করিয়া থাকে। পরে উহার গাছ অকর্ম্মণ্য হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু উহার পুরাতন মূল হইতে নূতন গাছ বহির্গত হইয়া মৃতগাছের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। উহারাই ইহাদের ভাবী বংশধররূপে দাঁড়াইয়া পুনরায় কুঙ্কুম প্রদান করিয়া থাকে। কাজেই প্রতি বৎসরেই ইহার মূল রোপণ করার প্রায় আবশ্যকই হয় না। কোন্ সময়ে কুঙ্কুম বীজ সর্ব্বাদৌ কাশ্মীরে উপ্ত হইয়াছিল ইহা স্থির করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম যে মূল বা বীজ উপ্ত হইয়াছিল, উহা হইতেই বংশপরম্পরাক্রমে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। কুঙ্কুমের জমি হাল দ্বারা কর্ষণের আবশ্যক হয় না। উহাতে সার দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতিদেবী প্রথম সময়ে, উহাকে যে উপাদানে গঠন করিয়াছিলেন, উহারাই অদ্য পর্য্যন্তও কার্য্য করিতেছে। তিনি কুঙ্কুম ক্ষেত্রে অক্ষয় সারভাণ্ডার সঞ্চিত রাখিয়াছেন। সুতরাং উহাতে আর কোন সার দেওয়ার আদবে প্রয়োজনই নাই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, মাসে, মাঝে মাঝে কুঙ্কুম ক্ষেত্রের মৃত্তিকা উল্টাইয়া দেওয়া ভিন্ন, ইহার আর অন্য পাইট নাই। বর্ষাকালে কুঙ্কুম ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইতে না পারে এইজন্য উহাতে আবশ্যকমত পয়ঃ নির্গমন পথ রাখিতে হয়। যে চৌকায় কুঙ্কুম মূল রোপণ করিবে উহার চতুর্দ্দিক ঢালু হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কুঙ্কুম মূল বা বীজ প্রতি বৎসর রোপণ করিতে হয় না এবং প্রকৃতি-উপ্ত-মূল হইতেই ইহার বংশ-বিস্তার কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি তাহাই হয়, তবে ইহার নূতন চাষের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আমি বলিব, ইহার চাষের বিস্তৃতি প্রসার জন্য, কখন কখন নূতন ভূমিতেও ইহার চাষ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন একই ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ইহার চাষ না করিয়া, সময় সময় ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার চাষ করিলে, ফলন অধিক হয়, সেজন্যও নূতন ক্ষেত্রে ইহার চাষ করিবার প্রয়োজন হয়। একবার উপ্ত মূল হইতে, ক্রমে ১০।১২ বৎসর পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফলন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরে ক্রমেই ফলন কম হইতে থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে ক্রমে চারি হইতে ছয় ইঞ্চি দূরে সারি করিয়া প্রত্যেক সারিতে ৯ ইঞ্চি হইতে এক ফুট দূরে দূরে মূল রোপণ করিতে হয়। ১½ হইতে দুই ইঞ্চি মৃত্তিকার অধিক নীচে ইহার মূল রোপণ করিবে না। ভাষা-রোপণই ইহার চাষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। ইহার মূল রসুনের ন্যায়। উহা হইতেই কোরকসহ একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয়। উহার অগ্র-ভাগেই পুষ্পকোরক অবস্থিত থাকে। ইহা বিকসিত হইলেই, উহা হইতে কুঙ্কুম প্রাপ্ত হওয়া যায়। একটী মূল হইতে ক্রমে চারিটীর অধিক পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় না। কাজেই একটী গাছ হইতে চারিটীর অধিক ফুলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার গাছ ভূমির ৮।৯ ইঞ্চি উপরে উঠিয়া থাকে। পুষ্প-দণ্ড প্রায় একফুট উচ্চ হয়।

কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই কুঙ্কুম পুষ্প

বিকসিত হইতে আরম্ভ করে। তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুষ্পধারণকার্য্য শেষ হয়। বৎসরে একবারের অধিক ইহার ফুল হয় না। ইহার মূল হইতে প্রথম যে পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় উহার পুষ্প বিকসিত হওয়া মাত্রই উহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। উহাকে কর্ত্তন করার ৪।৫ দিন পরেই উহার মূল হইতে পুনরায় আর একটী পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয়। উহার ফল সংগ্রহ করিবার পরে ঐ মূল হইতে ক্রমে আরও দুইটী ফুল উৎপন্ন হয়, এইরূপে অল্প সময় মধ্যেই, প্রত্যেক মূল হইতে ক্রমে চারিটী ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুঙ্কুমপুষ্প বিকসিত হইলে, উহা পরম রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া থাকে। নিশি-সঞ্চিত শিশির বিন্দু উহাদের পুষ্পের গাত্রে সংলগ্ন থাকায়, অরুণোদয় কালে, উহারা যে শোভা ধারণ করে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন। আবার ইহাদের দেবারাধ্য সুরভি বা পরিমল বায়ু তাড়নায় ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া যে, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে তাহা অনুভব করা ধারণাশক্তির অতীত। ইহার পুষ্প বিকসিত হইতে আরম্ভ হইলেই, কৃষকগণ ক্ষেত্রে পাহারা দিতে আরম্ভ করে। প্রাতঃকালে ইহার ফুল প্রস্ফুটিত হয়। প্রাভাতিক মারুত হিল্লোল ইহার পুষ্পবিকাস কার্য্যের প্রধান সহায়। প্রভাত-সমীরণ প্রবাহ পুষ্পে পুষ্পে সংলগ্ন হইয়াই ইহার পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিয়া থাকে। নিশাপতি যেমন কুমুদিনীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—প্রভাত সমীরণও সেইরূপ কুঙ্কুম ফুলের প্রণয়-পিপাসু। প্রাভাতিক সমীরণের অভাবে কুঙ্কুম ফুল পূর্ণবিকাসপ্রাপ্ত হয় না। শিশির-সম্পাতও ইহার প্রস্ফোটন কার্য্যের সহায়।

এক সঙ্গে ইহার সমস্ত ফসল সংগ্রহ করা অসম্ভব। কেন না একই সময়ে ইহাদের সকল পুষ্প উদ্গত ও প্রস্ফুটিত হয় না। সেইজন্য যখন যে ফুলটী ফুটিবে, তখনই উহাকে সংগ্রহ করিতে হয়। ফুলটিকে তুলিয়া হস্ত দ্বারা ঝাড়িলেই পুষ্পদল সকল পৃথক্ হইয়া পতিত হয়। কিন্তু লোহিত ও পীত কেশর সকল পুষ্পকোষের সহিতই সংলগ্ন থাকে। লোহিতবর্ণের কেশরই প্রকৃত জাফ্রাণ। ইহাকে জলে ভিজাইয়া ঐ জল দ্বারা পীতবর্ণের কেশরকে রঞ্জাইয়া উহাকে ভেজাল করা হয়। প্রকৃত ও ভেজাল কুঙ্কুমের পরীক্ষা করিতে হইলে, একটী জলপূর্ণ পাত্রে উভয়কে নিক্ষেপ করিতে হয়। তাহা হইলে প্রকৃত কেশরগুলি জলে ডুবিয়া যায় ও অপ্রকৃত কেশরগুলি জলের উপরে ভাসিয়া থাকে। উহাদিগকে পরে পাত্র হইতে উঠাইয়া আতপ-তাপে পৃথক্‌রূপে উভয়কে শুষ্ক করিতে হয়। এই উপায়ে খাঁটী ও কৃত্রিম কুঙ্কুমকে পৃথক্ করা হয়। সদ্যগৃহীত কুঙ্কুমকে চুষ-কাগজের (Blotting paper) উপরে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া, তদুপরি কাগজ বা কাপড় ঢাকা দিয়া, তাহার উপরে কাষ্ঠের বা কাগজের ফলকের (Paste Board) চাপা দিয়া রাখিতে হয়। তাহার উপরে গুরু বা ভারী বস্তু স্থাপন করিতে হয়। তৎপর ২।৩ ঘণ্টা তীব্র সূর্য্যোত্তাপ ও তৎপর ১৮ হইতে ২৪ ঘণ্টা মৃদু সূর্য্যোত্তাপ প্রদান করিতে হয়। তাহা হইলেই উহা চটা বাঁধিয়া যায়। তৎপর উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পিষ্টকাকার করিতে হয়। এই আকারেই ইহা বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। খণ্ডীকৃত পিষ্টক গুলিকে তুলা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া কাষ্ঠ বা ধাতু নির্ম্মিত কৌটায় বা কাচ নির্ম্মিত বড় বোতলে রাখিতে হয়।

আমি ৪।৫ বৎসর হইল ১২টী জাফ্‌রাণ মূল কাশ্মীর হইতে আনাইয়া ছিলাম, আমি ডাক-যোগে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ১২টী মূল আনাইতে আমার প্রায় ১২৲ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল। ১২টী মূল মধ্যে মাত্র তিনটী বাঁচিয়াছিল। অবশিষ্ট ৯টীই পচিয়াগিয়াছিল। আশ্বিন মাসে আমি উহা আনাইয়াছিলাম। এই সঙ্গে, কাশ্মীরের কুঙ্কুম ক্ষেত্রের কিঞ্চিৎ মৃত্তিকাও আনাইয়াছিলাম। আমার বাগানের একটী স্নিগ্ধ স্থানে, উক্ত মৃত্তিকাতে এই তিনটী মূল রোপণ করিয়াছিলাম। উহা হইতে তিনটী গাছ উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার একটীতে পৌষ মাসে ২।৩ ফুলও হইয়াছিল। পরে গ্রীষ্মারম্ভেই তিনটী মূলই পচিয়া গিয়াছিল। নিম্নপ্রদেশে ইহার চাষের চেষ্টা বৃথা। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহার চাষ প্রবর্ত্তন করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। ইহার চাষে বিশেষ লাভও আছে।

এক বিঘা জমিতে প্রত্যেক ৬ ফুট বা ৪ হাত অন্তর অন্তর, তিন ফুট বা ২ হাত পরিসর পথ রাখিয়া, উহাকে আয়ত-ক্ষেত্রে বিভক্ত করিলে ৬ ফুট দীর্ঘ ও ৬ ফুট প্রস্থ ১৬৯টী বর্গক্ষেত্র পাওয়া যাইবে। উহার প্রত্যেক বর্গক্ষেত্র, ৬ ইঞ্চি অন্তর অন্তর সারি বা লাইন করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৩টী লাইন পাইবে। উহার প্রত্যেক লাইনে ৯ ইঞ্চি অন্তর অন্তর গাছ রোপণ করিলে ১০টী গাছ উপ্ত হইতে পারিবে। তাহা হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৩ × ১০ — ১৩০টী গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। এই হিসাবে ১৬৯টী ক্ষেত্রে ২১৯৭০টী গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক গাছ হইতে ৪টী ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে এক বিঘায় ২১৯৭০ × ৪ ৮৭৮৮০টী ফুল পাওয়া যাইবে। উহার প্রত্যেক ৪০০০ ফুল হইতে অর্দ্ধ ছটাক কুঙ্কুম পাইবে। তাহা হইলে ৮৭৮৮০ ফুল হইতে ন্যূনাধিক ১১ ছটাক খাঁটী কুঙ্কুম পাইবে। ৬৪ তোলায় সের ধরিলে ১১ ছটাকে ৪৪ তোলা খাঁটী কুঙ্কুম প্রাপ্ত হইবে। প্রতি-তোলা কুঙ্কুমের মূল্য ১০৲ টাকা হইলে, উহার মূল্য ৪৪০৲ টাকা হইবে। এতদ্ভিন্ন প্রায় ঐ পরিমাণ নিকৃষ্ট কুঙ্কুম পাইবে। উহার মূল্য প্রতি তোলা ৩৲ টাকা ধরিলেও ১৩২৲ টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ইহার চাষের ব্যয় অতি সামান্য, যাহা হউক ১৩২৲ টাকা চাষের ব্যয় বাবদ বাদ দিলেও প্রতি বিঘায় ৪৪০৲ টাকা লাভ হয়। ইহা সামান্য লাভ নহে। যে স্থানে সুবিধামত ইহার চাষ হইতে পারে সেই স্থানে ইহার চাষ করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়।

৩০। ক্রোকাস্-সেটাইভাস কাটরাইটি-য়ানা—Crocus Sativus Cartwrightiana ইহাই সম্ভবতঃ আরণ্য পুংজাতি, ইহার ফুল পীতবর্ণ, পরাগ-কেশর লালবর্ণ, ইহার পরাগগন্ধ, স্ত্রৈণিক বা আবাদী জাতির পরাগ-সঙ্গম হইলেই, উহার গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন হয়।

গ ও ঘ। শীত ও বসন্তকালের উপযোগী জাতি

৩১। ভার্সিকলার-ভায়ওলেসিয়া—Virsi-color Violacea. ইহার ফুল বৃহৎ; বেগুনে-বর্ণ মিশ্রিত ভায়ওলেটবর্ণ।

৩২। ষ্টেলেরিস—Stellaris. ফুল কমলা বর্ণের; পাপড়ি (Petal) শিয়ালী বর্ণের; নিম্ন প্রদেশে ইহার চাষ হইতে পারে।

৩৩। অরিয়াস্—Aureus. ইহার জন্ম স্থান হোলণ্ড (Holland) ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ।

৩৪। অরিয়াস্ সালফিউরিয়াস কন্কলার—A. Sulphureus Concolor. ইহার জন্মস্থানও হোলণ্ড। ইহার ফুল বৃহৎ; কোমল ও গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ।

৩৫। বাইফ্লোরাস্—Biflorus. ইহার জন্মস্থান স্কটলণ্ড। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; বাহিরের তিনটী পাপড়ি (outer petals) পাতলা-প্রীতবর্ণ (Buff color)

৩৬। বাইফ্লোরাস্ পুসিলাস্—B. Pusillus. ইহার জন্মস্থানও স্কটলণ্ড। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ; কণ্ঠদেশ (throat) কমলা বর্ণ।

৩৭। লিউটিয়াস—Luteus. ইহা বহু-সংখ্যক ফুল ধারণ করে। ফুল শ্বেতবর্ণ; নিম্নপ্রদেশে চাষের উপযোগী।

৩৮। ডেল্‌মেটিকাস্-নাইভিয়াস্—Dalmaticus-Niveus. Syn. Wildenovi ইহার ফুল নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ।

৩৯। ডেল্‌মেটিকাস্ ভায়ওলেসিয়াস্ D. Violaceus. ইহার ফুল দেখিতে প্রায় পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায়; ভায়ওলেট বর্ণের ছায়াযুক্ত।

৪০। এলাটাভিকাস্—Alatavicus. ইহা অতি সুন্দর জাতি। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ বাহিরের পাপড়ি কৃষ্ণবর্ণের ছায়াযুক্ত।

৪১। রেটিকিউলেটাস্-অরিয়াস্—Reticulatus-Aureus. ইহার ফুল গাঢ় পীতবর্ণ; বহির্ভাগ শিয়ালী বর্ণের দাগযুক্ত।

৪২। টোম্মাসিনিএনাস্—Tomma Semianus. ইহার ফুল মলিন নীলবর্ণ; ইহা অতি সুন্দর জাতি।

মন্তব্য—উপরে যে ৪২ জাতির বিবরণ লিখিত হইল উহা ভিন্ন ইহাদের আরও শতাধিক জাতি ইউরোপে দৃষ্টিগোচর হয়। বাহুল্য বিবেচনায় উহাদের বিবরণ পরিত্যক্ত হইল। উপরের লিখিত কয়েকটী জাতিই উৎকৃষ্ট।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

বর্ত্তমানের স্ত্রী-শিক্ষা ও আমাদের কর্ত্তব্য

স্নেহের বালিকাগণ,

যাঁহার অশেষ দয়ায়, স্নেহ করুণায়, সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে দেখিতে দেখিতে দিনের পর দিন মাসের পর মাস করিয়া একটী বৎসর চলিয়া গেল আইস সর্ব্বাগ্রে সকলে আমরা তাঁহার চরণে ভক্তিভরে প্রণত হই।

আর যাঁহার অর্চ্চনার জন্য সারাটী বৎসর ধরিয়া শুচি-শুদ্ধ-পূত-পবিত্রভাবে নানাস্থান হইতে জ্ঞানপুষ্প সংগ্রহ করিলাম, আইস সকলে তাঁহার পূজার জন্য সযত্নে ফুল-ডালা সাজাই।

আর যাঁর স্নেহ দয়ায়, মায়া মমতায়, কোমল কঠোরতায়, নিজেদের সুখে দুঃখে বিপদে আপদে হাসি ম্লানমুখে নূতন নূতন

ভাব ও কথা শিখিয়াছি, আইস সকলে তাঁহার স্নেহাশীষ যাচ্ঞা করি।

আর যাহাদের আর্থিক সাহায্যে ও সতত সযত্ন তত্ত্বাবধানে বিনা বাধায়, বিনা শঙ্কায় অন্যের গলগ্রহ না হইয়া নিজেদের ভাবে নিজেদের মতে নিজেদের আপন বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতে পারিলাম, আইস তাঁহাদিগকে সভক্তি সচন্দন পুষ্পমালা অর্পণ করি।

তারপর আইস সকলে নিজে নিজে বুঝে দেখি এ বৎসর আমরা ভাল মন্দ কি কি কাজ মনের মত করিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি। যদি কোথায়ও কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইয়া থাকে তাহার জন্য আইস সকলে সেই পরম কারুণিক করুণাময়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর যদি কিছু সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে তবে তাহার সুফল সেই বিশ্বনিয়ন্তার শ্রীচরণে সমর্পণ করিয়া যেন বলিতে পারি :—

সব কাজ মাঝ, সব দুঃখ লাজ,
তাঁহার চরণে আনিয়া তাই
ভাল হ'তে চাই চরণে তাঁহার
মানুষ হইতে তাঁহার ঠাঁই।

বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদের সমাজের উপযোগী কি না ?

তারপর আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে আমরা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি, যে ভাবে ভাবুক হইতেছি এবং যে কর্ম্মে কর্ম্মী হইতে যাইতেছি উহা আমাদের সমাজের উপযোগী কি না, উহা আমাদের মনের স্বাস্থ্য ও সরলতার পুষ্টি ও পরিপূর্ণতার দিকে কতদূর অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির উন্মুক্ত বায়ু, সুবিমল জল, স্বাভাবিক শীতোষ্ণতা যেমন আমাদিগকে বাহিরে শরীর গঠনে পলে পলে দিনে দিনে সাহায্য করিতেছে, আমাদের নীতি, আমাদের পাঠ্য, আমাদের উপদেশ, আমাদের শিক্ষা ও দীক্ষা সেইরূপ ভিতরে মনোরাজ্যে আমাদিগকে কতদূর বর্দ্ধিত করিতেছে ইহা আমাদের দেখিবার বুঝিবার ভাবিবার বিষয়।

মানুষ হইতে গেলে কি দরকার

মানুষ প্রথমে মানবের আবরণ লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে মাত্র—মানুষ মানুষ নামে পরিচিত হইতে গেলে—মনুষ্যত্বের আবশ্যক। এই মনুষ্যত্ব মানবের শারিরীক, মানসিক ও নৈতিক সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলনের সামঞ্জস্যের ফল। ইহা অর্থে ক্রয় করা যায় না কিম্বা সম্মানেও অর্জ্জন হয় না। ইহার জন্য সহজ সরল স্বাভাবিক শিক্ষার আবশ্যক। যেখানে কমিটী বা সরকারের নিয়ম অহরহ স্কন্ধে চাপান হয় সেইখানে যে ইহা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিবে তাহা নহে, কেবল মাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও ইহা সম্ভব নয়, বহুবিধ বিষয় পর্য্যালোচনা করিবার ব্যবস্থা করিলেও যে ইহা অগ্রসর হইবে তাহাও নহে—মানুষ যে বাড়ে সে "ন মেধয়া বা শ্রুতেন।" যেখানে নিভৃতে তপস্যা, যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শিক্ষিত হইতে পারি—যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভব, যেখানে শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করিয়া জ্ঞানের চর্চ্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেইখানেই সকলে বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্ব-প্রকৃতির আবির্ভাব সেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকসিত, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ ও আত্মবশ, ধর্ম্ম, নীতি বা উপদেশ শিক্ষা সেই খানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর যেখানে

পুঁথি ও মাষ্টার, আইন আর ব্যবস্থা, বেত আর বেতন, ইটের কোটা কাঠের বেঞ্চ চেয়ারের আসবাব সেখানে প্রকৃত শিক্ষার আশা অতি কম।

বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু

বিস্তারই প্রবৃত্তির সহজ গতির স্ফুরণ সম্ভব, এই গতির স্বাভাবিক অবস্থাই স্বাস্থ্য তা কি শারীরিক, কি মানসিক আর কি নৈতিক। তাই খোলা আকাশ, ও খোলা বাতাস, মানবের বড় উপকারী। যে জল স্থল আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রী ক্রোড়ে আমরা জন্মিয়াছি, তাহার সহিত যথার্থভাবে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। স্বচ্ছ নীলাকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্ম্মল জলাশয়, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, সুবিস্তৃত নদী, সুপ্রস্ত প্রান্তর, পক্ষীর কাকলি, অরণ্যের নির্জ্জনতা প্রভৃতি উহার দৃশ্য যেমন আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া নানারূপ বিচিত্রতার মধ্য দিয়া ক্রমশ জীবন বিস্তার করিতে সমর্থ হয় এরূপ আর কে? প্রকৃতির সন্তান প্রকৃতির ক্রোড়ে যেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এরূপ আর কোথায় সম্ভব। তাই যখন মন সতেজ, ও সবল, প্রবৃত্তি নির্ম্মল নবানুরিত, নূতন বিষয়ে স্বতঃই মন আগ্রহযুক্ত, আশা আকাঙ্ক্ষায় মন উদ্বেলিত, নিত্য নূতন নূতন উৎসাহে উৎসাহিত, তখন যাহাতে পাঠ্য বিষয়ে বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে সজীবতা আনয়ন করিতে হয়, যাহাতে শিক্ষাদানে হৃদয় ও মন উভয়ই গড়িয়া উঠিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে আর দেখিতে হইবে আমাদের শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মের ও সমাজের বিরোধ না ঘটে, সকলে যেন বিশিষ্ট না হইয়া সংশিষ্ট হয়, কাহারও যেন প্রবৃত্তির অকাল যৌবন বা বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনায় মনুষ্যত্বের মুকুল মুঞ্জরিত হইবার পূর্ব্বেই অকালে বর্জ্জিত বা শুষ্ক হইয়া না যায়। আর দেখিতে হইবে কিসে শিক্ষায় আনন্দ ও আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি ও ইচ্ছা নিজের অলক্ষিত ও অতর্কিত ভাবে আপনা আপনি বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিসে প্রাণশক্তি, ধারণাশক্তি ও চিন্তাশক্তি সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

শিক্ষার সময়—বাল্যকাল

তাহাদের হৃদয় যখন নবীন, কৌতূহল যখন সজীব, সমুদয় ইন্দ্রিয় শক্তি যখন সতেজ তখন যেন তাহারা প্রকৃতির সহিত খেলা করিতে পারে, স্নিগ্ধ সুনির্ম্মল প্রাতঃকালের অরুণোদয় যেন তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ম্ময় চম্পক অঙ্গুলির দ্বারা উদ্ঘাটিত করে, সূর্য্যাস্ত-দীপ্ত সৌম্য গভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে যেন নক্ষত্র খচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিতে সমর্থ হয়। তরুলতার শাখা পল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানা রস বিচিত্র গীতি নাট্যাভিনয় যেন তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে পারে। শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে শিক্ষিত, বায়ু হিল্লোলিত নানাবর্ণে চিত্রিত, দিগন্ত বিস্তৃত শস্য শ্যামল ক্ষেত্রের সফলতায় অপর্য্যাপ্ত বিস্তার তাহারা যেন স্বচক্ষে দেখিয়া ধন্য হইতে পারে। মন যখন গড়িতে থাকে, প্রাণে যখন আশার সঞ্চার হয়, তাহাদের চতুর্দ্দিকে তখন বিশ্ব প্রকৃতির এইরূপ একটী সজীব ছায়ার নিতান্ত আবশ্যক—নচেৎ মন উদার বা মহান্ হইতে পারে না; কল্পনা বা চিন্তাশক্তির উন্মেষ অসম্ভব। চিন্তা বা কল্পনা মানবের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান

সম্বল। ইহা একদিকে যেমন আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে—অন্যদিকে সেইরূপ ইহার সফলার্থে উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকে। সুচাষীর সুফলের আশা করিতে হইলে যেমন উপযুক্ত জমি, সুচাষ ও সুবীজের আবশ্যক, সেইরূপ যদি কেহ ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় আশান্বিত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে চিন্তা ও কল্পনা প্রসূত সাহিত্যই ইহার বীজ, সুন্দর সহজ প্রাপ্য পুস্তকালয় ইহার আধার আর শিক্ষার্থী ইহার ক্ষেত্র।

ভাষা ও ভাব শিক্ষা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন

অন্যদিকে, বাল্যকাল হইতে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি ভাব শিক্ষা হইতে পারে এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে, তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরাও বেশ সহজে মানুষের মত হইতে পারি। আর যদি তাহা না হয়, তবে যখন আমরা দেখিব যে, যে গৃহের মধ্যে আমাদিগকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বাস করিতে হইবে সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই, আমাদের পিতা মাতা, আমাদের সুহৃদ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নিকে তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না, আমাদের দৈনিক জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় নাই, আমাদের আকাশ ও পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত ও সুন্দর সন্ধ্যা তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই। উভয়ের মাঝখানে একটা মস্ত ব্যবধান থাকিয়া যায়; এ শিক্ষায় আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারে না; আমাদের জীবনের মূল যেখানে অবস্থিত সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে মাত্র। আমাদের গ্রন্থ-জগৎ এক প্রান্তে আর আমাদের বসতি-জগৎ অন্য প্রান্তে।

ইহার ফলে এই দাঁড়ায় যে উভয়ে উভয়ের প্রতি আরও বিরক্ত হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যার প্রতি প্রথম হইতেই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের পৃথকবিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। কাজেই আমরা একটী অসম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বিসহভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। ইহাতে সুখও পাই না স্বস্তিও থাকে না।

বর্ত্তমান শিক্ষা অসম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ করিবার উপায়

আমাদের এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য করিয়া যাহাতে শিক্ষা হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। ইহা করিতে গেলে আমাদিগকে আমাদের নিজেদের সাহিত্য ও সমাজের ধ্বজা উড়াইতে হইবে—জীবনকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতে হইবে—আমাদের সীতা সাবিত্রীর, বৈদ্যা চিন্তার, লক্ষ্মণা দময়ন্তীর, বেহুলা লহনা খুল্লনার মরম কথাগুলি বিশেষরূপে সম্ভাষ করিয়া তুলিতে হইবে—আমাদের মধ্যে যে খনা লীলাবতী জন্মগ্রহণ করিতে পারে—

আমাদের মধ্যে যে সাবিত্রী সাক্ষাৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আমাদের মধ্যে যে শান্তি, কমলমণি, সূর্য্যমুখির উদাহরণ বিরল নহে ইহা দেখাইতে হইবে। আমাদের স্ত্রী যে বিলাসিতার সামগ্রী নহেন, সখের জিনিষ নহেন, ভোগের পাত্র নহেন তাহা বুঝাইতে হইবে—তাঁহারা যে আমাদের মন্ত্রণায় মন্ত্রী, কার্য্যে দাসী, ধর্ম্মে পত্নী, ক্ষমায় ধরিত্রী, স্নেহে মাতা, শয়নে রম্ভা, এবং রঙ্গে সখী হইতে পারেন তাহাই কবি-শ্রেষ্ঠ আদর্শ নারী সীতার চরিত্রেই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

কার্য্যেষু মন্ত্রী, চরণেষু দাসী
ধর্ম্মেষু পত্নী ক্ষমায় ধরিত্রী
স্নেহেষু মাতা শয়নেষু রম্ভা
রঙ্গে সখী, লক্ষ্মণ, সা মে প্রিয়া।

বাস্তবিকপক্ষে যাহাদের দেবর ভাসুর, শ্বশুর শাশুড়ি, ননদ ভাজ, আত্মীয় স্বজন, অতিথি অভ্যাগত লইয়া সংসার করিতে হয় তাহাদের গৃহকর্ত্রীর মন অতি উদার ও মহান হওয়া আবশ্যক। তাহাদের ঘরের স্ত্রীলোকের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত তদ্ সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

রূপ কুল গোত্র বিশুদ্ধ যাহার
রূপসী বিদুষী নম্রা ঈর্ষা নাহি যার
মুখে প্রফুল্লতা বুকে করুণা আলয়
হস্তে পর সেবা বাক্য মধুরতা ময়
স্নেহে মাতা ভগ্নী সমা পতিপরায়ণা
নাহি মনে প্রগল্‌ভতা তর্কে অপ্রবণা
জ্ঞানে ধর্ম্মে অনালস্য জ্ঞানে আত্মসমা
(সর্ব্বজীব)
সেই নারী হতে পারে অতি কার্য্যক্ষমা।

স্ত্রীর কর্ত্তব্য

তারপর আমাদের ব্রত পার্ব্বণাদি যার মাসে তের পার্ব্বণ যে ধর্ম্মের একটা দিক, লোককে সুনীতি ও সদাচার পরায়ণ করিবার যে একটা মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা যে শরীরের সাবধানতা, তেজস্বিতা ও পটুতা জন্মাইবার পক্ষে বিশেষ উপকারী, ইহা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে।

রন্ধন-প্রণালী শিক্ষা, নিত্যনৈমিত্তিক গৃহের কার্য্যকলাপ সম্পাদন করা, সামান্য সামান্য আধিব্যাধিতে মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা, বিলাসিতার সঙ্কোচ যে আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের আর একটা দিক তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। এখানে যেন আমাদের অনর্থক অভিমান না আসে—আমরা যেন সর্ব্বদা মনে রাখি যে মানুষই বড়—কাজে ছোট বড় নাই—মনুষ্যত্ব রক্ষা করিয়া যে কাজই করা যায় তাহাতে অপমান নাই। দারিদ্র্য লজ্জাকর নহে, সেবা লজ্জাকর নহে, হাতের কাজ লজ্জাকর নহে। ঘর ঝাঁট দেওয়া, জল আনা, বাটনাবাটা, আত্মীয় অতিথি সকলের সেবাশেষে নিজে আহার করা, অন্যের চক্ষে অত্যাচার বা অপমানের হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান এই দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যতার সময়ে—ইহা গৃহলক্ষ্মীর উন্নত অধিকার;—ইহাতেই তাঁহার পুণ্য, ইহাতেই তাঁহার সম্মান, ইহাতেই তাঁহার আনন্দ। পুত্র কন্যাদিগকে স্বহস্তে নিজে লালন পালন করায় যে স্নেহ মমতা ভালবাসা দৃঢ় ও বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রোগ, শোক, দুঃখপূর্ণ এই পৃথিবীর মধ্যে নারীই আমাদের শান্তির আধার। তাই কবি বলিতেছেন :—

রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে
সান্ত্বনাজায়া।
আছে এই ধরাতলে রমণীর বুক।
এতদধিক রমণীর আছে কিবা সুখ।

বর্ত্তমানে নানাবিধ পরাধীনতার পেষণে দাসত্বের চাপে মান মর্য্যাদা সব চলিয়া গিয়াছে —বর্ত্তমানে সকলে হীনবীর্য্য হতমান। এখনও গৃহলক্ষ্মীদিগের সম্মানে আমরা সম্মানিত—এখনও হিন্দুর সতীত্ব ধর্ম্ম ও সন্তান-বাৎসল্য জগতে অতুলনীয়। সন্তান জননীর অনেক স্থলেই প্রতিকৃতি। মা যেমন ছেলেকে গড়িতে পারেন, মা যেমন ছেলেকে ঠিক পথে চালিত করিতে পারেন এমন আর কেহ নহে। বড় হইবার মত শক্তি ও প্রবৃত্তি যার আছে, মায়ের শিক্ষা, মায়ের উৎসাহ যেমন তার সেই বড় হইবার পথে সহায় হইতে পারে এমন আর কিছুই নয়। মা যার, হাসি মুখে উৎসাহ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া সম্মুখে দাঁড়ান সে যেমন সাহসে বুক বাঁধিয়া বিপদে ঝাঁপ দিতে পারে এমন আর কেহ পারে না। কাপুরুষতার গৃহে মাতার বিরাগ ও ধিক্কারের মত অপমান আর কিছুই নাই। সেই কারণ যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান এক সময়ে বলিয়াছিলেন "মা সন্তানকে যেমন গড়িবেন সন্তানও সেইরূপ হইবে—কারণ সন্তানের লালনপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষাদান বিষয়ে তিনিই সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।" হিন্দুকুলাচার্য্য শিবাজি, ফ্রান্সের অধীশ্বর নেপোলিয়ান, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি গ্যারিফিল্ড, ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্ডি ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল। তাই বলিতেছি আমাদের জননীকে কোমল কঠোর হইতে হইবে তাঁহারা একদিকে যেমন

স্নেহ বিহ্বল করুণা ছলছল
শিওরে জাগে কার আঁখিরে
শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে
অবশ রুগ তনু মলিন অনশনে
আত্মহারা সদা বিমুখী—নিজসুখে
তপ্ত তনু সম কহনা তরা বুক

চিত্তে চিহ্নিত হইয়াছেন, আবার অন্যদিকে রাজপুতকুলের গৌরব-মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্নেহ বিহ্বলা শোকাকুলা কর্ত্তব্য পরায়ণা ধাত্রী পান্নাকেও যেন ভুলিয়া না যান। সেই কর্ত্তব্য পরায়ণতার জলন্তছবি ধাত্রী বলিতেছেন :—

স্বার্থত্যাগ মহামন্ত্রে দীক্ষা আছে যার
কঠোর বীরের ধর্ম্ম পালে যেই জনে
আত্ম পরিজন স্নেহ তুচ্ছ তার কাছে
স্থির লক্ষ্য একমাত্র সফল সাধনে
ভীরুতা মমতা দূর নিকট সম্বন্ধ
কাপুরুষ ক্ষত্রচেতা সদা স্বার্থে অন্ধ।

বিধবাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষার আবশ্যকতা আছে কি না ?

তারপর বর্ত্তমানে আমাদের বিধবাদের শিক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। যাঁহারা মূর্ত্তিমতী শিক্ষা, যাঁহারা মূর্ত্তিমতী করুণা, যাঁহারা মূর্ত্তিমতী দয়া তাঁহাদের আবার নূতন করিয়া কি শিখাইতে হইবে ? যাঁহাদের জীবন সাধারণের হিতে, জগতের মঙ্গলে, প্রতিনিয়ত ব্যয়িত হইতেছে, তাঁহারাই যে জগতে কত শিক্ষা দিতেছেন তাহার খোঁজ আমরা রাখি না বলিয়া অনেক সময়ে আমরা ভ্রমে পতিত হই। জগতে যদি কেহ যথার্থ আত্ম বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, যদি পরের জন্য নিজকে কেহ বিলাইয়া দিতে পারিয়া থাকে তবে সে সেই হিন্দুর বিধবা। ইহাঁরাই মূর্ত্তিমতী ত্যাগ। আমাদের বিধবার নারী-প্রকৃতি অন্যান্য দেশের ন্যায় কখন পতিত থাকিয়া অনুর্ব্বরতা লাভ করে না, তাঁর কোল কখনও শূন্য থাকে না, বাহু দুইটী কখনও অকর্ম্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনও উদাসীন নয়। তিনি কখন জননী, কখন দুহিতা, কখন সখী। এই জন্য চিরদিনই তিনি

কোমল, সরল, স্নেহশীল ও সেবা-তৎপর। বাড়ীর শিশুরা তাঁরই চক্ষের সামনে জন্ম গ্রহণ করে, তাঁরই ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির পবিত্র বন্ধন, বাড়ীর পুরুষদের সঙ্গে স্নেহ ভক্তি পরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ, গৃহকার্য্যের ভার প্রায়ই তাঁর উপর। আবার ইহার মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুই একখানা পুরাণ পড়ারও অভ্যাস আছে, সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট ভাই ভগ্নিদিগকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথাচ্ছলে নানা শিক্ষা দেওয়াও স্নেহের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাই বলিতেছিলাম আমাদের সমাজ আমাদের বিধবাদিগের যে সুন্দর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন তদতিরিক্ত শিক্ষার আর আবশ্যক দেখি না।

নানাভাবে নানাপ্রকারে আমাদের জাতীয়ত্বের নদীনালা সব নিজত্ব হারাইতে বসিয়াছে। এখনও সেই নিভৃতে নিৰ্জ্জনে লোক কোলাহলের অন্তরালে সামান্যরূপ ভাবে আমাদের সমাজের যে প্রকৃত জাতিত্ব রক্ষিত আছে তাহা যেন আমাদের অভাগা চেষ্টায় নষ্ট না হয়। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে একমাত্র কাশীতেই শিবত্ব ঘটে, গোমুখীতেই গঙ্গা ছোটে, নন্দনেই পারিজাত ফোটে, আর পদ্মরাগের আকরেই পদ্মরাগ জন্মে। আর বর্ত্তমানে যদি কিছু একান্তই গড়িতে হয় তবে কবির ভাষায় এই অনুরোধ :—

জগদীশ!

গড়িতে বাসনা যদি তেমনি গড়িও,
সতীর সতীত্বে দেশ মঙ্গলে মাখিও,
পুনঃ দেবী অরুন্ধতী
লভিবে বশিষ্ঠ পতি,
রাম প্রাণা জানকিরে অনলে রক্ষিও;
লভিয়া অন্ধান্ধ পতি
অন্ধত্ব করিবে সতি,
গান্ধারীর নেত্র-পক্ষ বস্ত্রে আবরিও;
ত্যজিয়া নশ্বর বিত্ত
চাহিবে মৈত্রেয়ি চিত্ত
অমর অমৃত নিধি—তুমি প্রদানিও;
রাজ-সুখ ত্যজি ধনী
হবে চির সন্ন্যাসিনী
বুদ্ধভাষা গোপারে সে মন্ত্র শক্তি দিও
সাবিত্রী সতীত্বে তার পতি বাঁচাইও।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

নায়াগ্রা ঝোরা

(১) পুল্‌ম্যান্-কার

দুই সপ্তাহ মাত্র নিউইয়র্কে থাকার ইচ্ছা ছিল—থাকা হইল দুই মাস! সেইরূপ ইংলণ্ডে থাকিবার ইচ্ছা ছিল মাত্র ছয় সপ্তাহ—কিন্তু কাটাইয়াছি পুরা ছয় মাস। এই হিসাবে চলিলে পর্য্যটন-লীলা কোন দিন সমাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ।

দুই মাসের ভিতর নগর ছাড়াইয়া বেশী দূর কোন দিনই আসি নাই। এক দিন বোটানিক্যাল উদ্যানে অনেকক্ষণ কাটাইয়াছি—ইহা নগরের সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত। আর একদিন নগর হইতে প্রায় ১৫।২০ মাইল দূরে একজন উকীলের বাগান বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম।

বৃহৎ

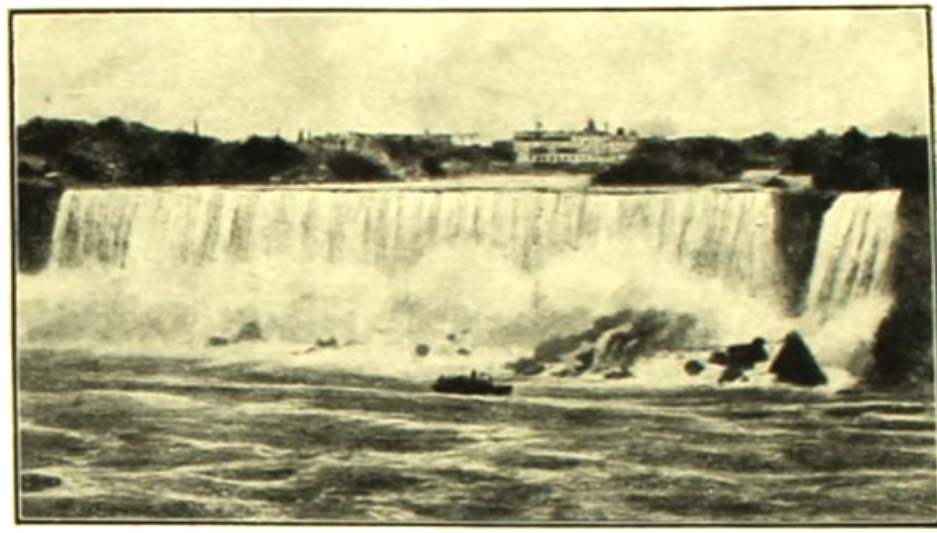

নায়াগ্রা-প্রপাত—(ক্যানাডার পার হইতে)

নায়াগ্রা-প্রবাহ

INDIA PRESS, Calcutta.

কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমেরিকার রেলগাড়ী দেখি নাই।

জগৎপ্রসিদ্ধ নায়াগ্রার জলপ্রপাত দেখিবার সুযোগ ঘটিল। কেরিটীমারে হাড্‌সন নদী পার হইলাম—বেশীক্ষণ লাগিল না। পরে রেল। আমেরিকার রেলযাত্রীদের আরাম সম্বন্ধে বহু গল্প শুনিয়াছি। একদিন একজন রুশ রুশিয়ার বৈষয়িক উন্নতির গল্প করিতে করিতে বলিতেছিলেন—"আর কি চাহেন মহাশয়? আমরা আমেরিকার "পুল্‌ম্যান-কার" পর্য্যন্ত রুশিয়ায় চালাইতেছি। ইয়োরোপের আর কোন দেশে পুলম্যান-কার এখনও প্রচলিত হয় নাই। রুশিয়া কি সত্য সত্যই পশ্চাৎপদ?" কাজেই গাড়ীতে চড়িবামাত্র পুল্‌ম্যানকারের মহিমা বুঝিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ছেলেবেলায় ষ্টীমারের ভিতর এঞ্জিনঘরে দেখিবার জন্য কে না ব্যস্ত হইয়াছে? পাড়াগাঁয়ের লোক প্রথম প্রথম রেলগাড়ী দেখিয়া কতই না বিস্মিত হয়! পুল্‌ম্যান-কার (Pullman Car) কি বস্তু তাহা জানিবার ইচ্ছাও কতকটা সেইরূপই দাঁড়াইল। পুল্‌ম্যান নামক এক ইয়াঙ্কি এইরূপ গাড়ী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এইজন্য গাড়ীর নাম পুলম্যান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কিছু বুঝা গেল না। অন্যান্য কামরার আসবাবপত্র যেরূপ এই পুল্‌ম্যান- কামরারও ঠিক তাহাই।

রাত্রি প্রায় আটটায় সময় গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীর ভিতর একজন সেবক বসিয়াছিল। বলা বাহুল্য সে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো। বুঝিলাম—মামুলি কামরাকে পুল্‌ম্যান কামরায় পরিণত করাই তাহার কার্য্য।

আমাদের দেশে রেলগাড়ীর ভিতরে উপরিভাগেও বিছানা পাতিয়া শুইবার ব্যবস্থা করা যায়। এইখানে দেখিলাম ঠিক সেই স্থানে চাবি দিয়া নিগ্রোসেবক একটা বাক্স খুলিল। তাহার মধ্যে বালিশ তোষক চাদর ইত্যাদি রহিয়াছে। এই বাক্সই আবার উপরিভাগের একটা খাটে পরিণত হইল। এদিকে নীচে যে সকল চেয়ারে আমরা সামনাসামনি বসিয়া আছি তাহার দুই একটা লইয়া এক একটা খাট তৈয়ারী হইতে থাকিল। এইরূপে কামরার দুই ধারে উপরিভাগে দুইটা এবং নিম্নভাগে দুইটা বিছানা প্রস্তুত করা যায়। প্রত্যেক বিছানাই সুবিস্তৃত ও সুপ্রশস্ত—কোনরূপ অসুবিধা ঘটিবার কারণ নাই।

এই বারটা বিছানাকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য মাথার ও পায়ের কাছে দুইটা করিয়া আস্‌গা কাঠের দেয়াল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। অধিকন্তু সম্মুখ দিকে মোটা কাপড়ের পরদা ঝুলিতে থাকে। ফলতঃ গাড়ীর ভিতর স্বতন্ত্র বারটা কুঠুরী তৈয়ারী করা যায়। সমস্ত রাত্রি বসিয়া সেবক পাহারা দেয়। সকাল হইবা মাত্র পুল্‌ম্যান-কারকে আবার যথাপূর্ব্বং তথাস্যং করা হয়।

কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স, সাহিত্যসম্মিলন, শিক্ষাসম্মিলন ইত্যাদি উপলক্ষ্যে আজ কাল ভারতবাসী নানাস্থানে বেড়াইতে যান। কংগ্রেস সম্মিলনাদির প্রবর্ত্তকেরা "ডেলিগেট"-দিগকে নিমন্ত্রণ করিবার সময়ে পত্রের ভিতর "বিশেষ দ্রষ্টব্য"ভাবে জানাইয়া দেন—"মহাশয়, আসিবার সময়ে মশারি বিছানা ইত্যাদি সঙ্গে আনিতে ভুলিবেন না।" বিছানা ও গামছা লইয়া চলাফেরা করা আমাদের একটা জাতিগত অভ্যাস।

ইয়োরোপ ও আমেরিকার কোথাও বিছানা বালিশ মশারি গামছা ইত্যাদি লইয়া চলা-

কেরা করিতে হয় না। সকল হোটেলেই লোকজনকে এই সমুদায় বস্তু জোগান হয়। এক কাপড়ে পর্য্যটন করিতে বাহির হইলেও বিশেষ কোন কষ্টভোগ করিতে হয় না। কোন কোন স্থানে স্নানাগারে ব্যবহার করিবার জন্য পোষাক এবং চটিজুতা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। কাজেই পর্য্যটকদিগের অনর্থক মোট বহিতে হয় না। একটা মস্ত সুবিধা সন্দেহ নাই—কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলেই নানাপ্রকার ছোঁয়াচে রোগ শরীরে প্রবেশ করিবার আশঙ্কা খুব বেশী।

এক বিষয়ে নিউইয়র্করাষ্ট্র অত্যন্ত কড়া নিয়ম করিয়াছেন। পাশ্চাত্য-সমাজে এক গ্লাসে হাজার লোক জলপান করে। আমাদের জাতিভেদের দেশে ইহা হইবার জো নাই—আমরা "স্পর্শ"-কল মানিয়া চলি। আমেরিকায় দেখিতেছি নিউইয়র্ক-সরকার আমাদের ছুঁৎমার্গই অবলম্বন করিবার জন্য আইনজারি করিয়াছেন। এই বিধানে একজন লোক যে গ্লাসে জল পান করিবে অপর কোন লোক সেই গ্লাসে জল পান করিতে পারিবে না। রেলগাড়ীতে এই জন্য কাগজের গ্লাস ব্যবহার করা হইয়া থাকে—প্রয়োজন হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বতন্ত্র গ্লাসে পিপাসা মিটাইয়া থাকে। জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে।

পর্য্যটকগণ আর এক কারণে এই সকল দেশে অনর্থক পরিশ্রম ও উদ্বেগ হইতে অব্যাহতি পায়। ইহাদিগকে বেশী মোট বহিতে হয় না। মালপত্র বহিবার জন্য বহু তারবাহক-সমিতি আছে। সাধারণতঃ সেগুলিকে Express Company or Transportation agencyইত্যাদি বলা হয়। গৃহ হইতে রওনা হইবার সময় কোন এক সমিতিকে টেলিফোনে বলিয়া দিলে তাহাদের লোক আসিয়া মাল লইয়া যায়। তাহারাই পর্য্যটকের কথামত যথাস্থানে এগুলি পাঠাইয়া দেয়। পর্য্যটক হয় ত একহাজার মাইল ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার হাতে সামান্য একটা হ্যাণ্ডব্যাগ পর্য্যন্ত না থাকিলেও ক্ষতি নাই। রাস্তায় যাহা কিছু প্রয়োজন সবই গাড়ীর ভিতর পাওয়া যাইবে এবং যথাস্থানে পৌঁছিয়া ভারবাহক সমিতির আফিসে টেলিফোন করিলে তাহারা মাল-গুলি নিজের নিকট দিয়া যাইবে। খরচ কিছু বেশী—কিন্তু আরাম যৎপরোনাস্তি। এদেশে রেলে বেড়াইবার সমান সুখ নাই। আমাদের দেশে রেলে যাইতে হইলে তিন সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতে দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। ব্যবসাদার জাতিরা সাংসারিক জীবনটাকে যথাসম্ভব সহজ করিয়া তুলিয়াছে।

যাহা হউক পুল্‌ম্যানকারও দেখা হইল—Express Company-এর সুবিধাও ভোগ করিলাম। ইহা এক প্রকার কলিযুগের চরম সুখ আর কি?

গাড়ী বেশ দ্রুত চলিতেছে। কিন্তু ভিতরে বসিয়া মনে হয় বেগ বড় বেশী নয়। কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল—গাড়ীর স্প্রিংগুলি খুব ভাল—এইজন্য ঝাঁকুনি অতি অল্প। অবশ্য ভারতবর্ষের অনেক গাড়ী আজকাল এইরূপই বটে।

সমস্ত রাত্রি বরফ পড়িতেছে—মাঠ ভরিয়া কেবল তুষার দেখিতে পাইতেছি। ষ্টেসনের নিকট যে সকল বাড়ীঘর দেখিতে পাইলাম সকলের ছাদ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভূমি প্রায়ই অসমতল এবং পার্ব্বত্য ও তরুহীন। শীতকালে সবুজ রং কোথাও নাই—ঘাস পাতা দেখিবার জো নাই। বিলাতেও

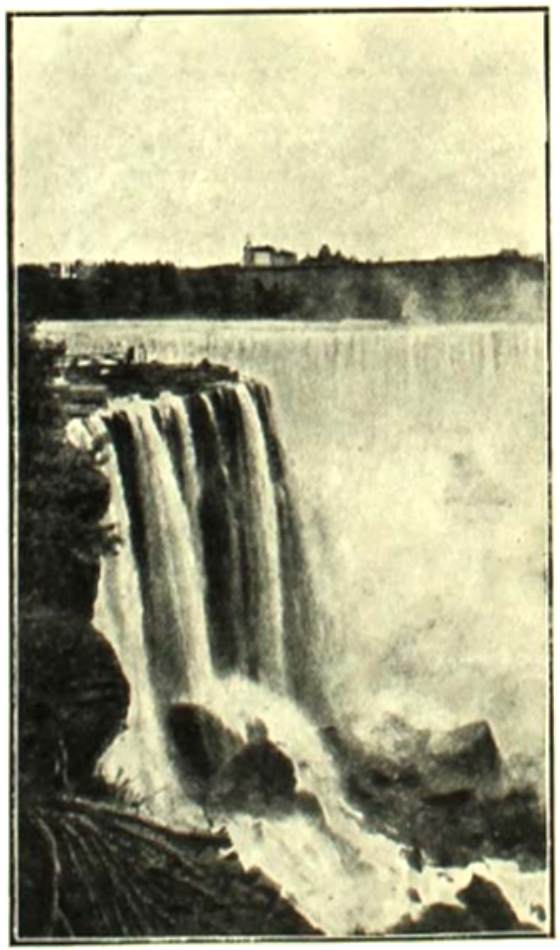

নায়াগ্রা-ঝোরা—ক্যানাডার কিনারা

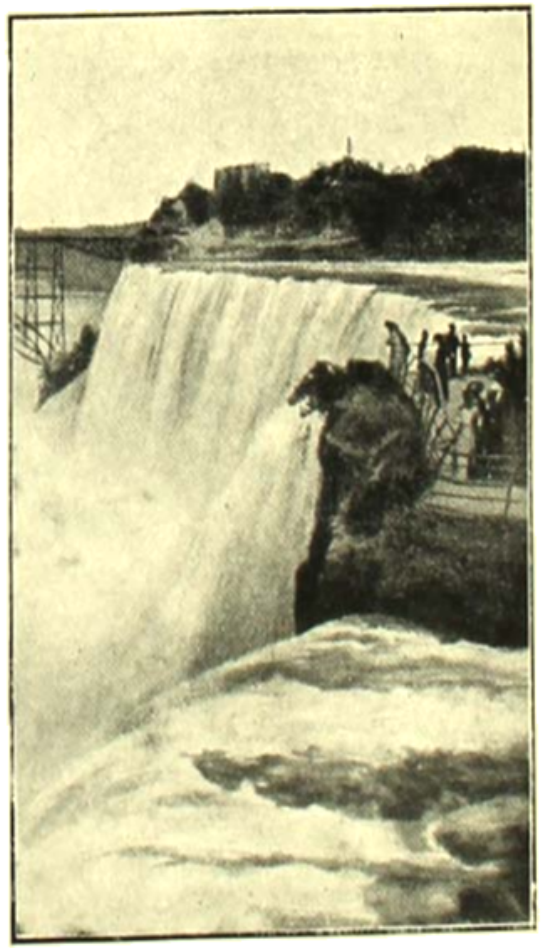

নায়াগ্রা-ঝোরা—যুক্তরাষ্ট্রের কিনারা

এই অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি। রেল রাস্তার ধারে যে দুই একটা নগর রাত্রে চোখে পড়িল—সবই নিউইয়র্কের ছাঁচে ঢালা—আয়তনে ক্ষুদ্র।

সাড়ে চারিশত মাইল নয় ঘণ্টায় আসিলাম। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ প্রায় ১৫ ঘণ্টার পথ—দূরত্ব একই।

কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রথম-শ্রেণীর ভাড়া ৪০৲। এখানে আরাম বেশী অথচ ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম। নিউ-ইয়র্ক হইতে নায়াগ্রা পর্য্যন্ত সাধারণ ভাড়া ২৪৲। তাহার উপর পুলম্যান কারে শুইবার জন্য ৮৲।

ঈরিহ্রদের উপর বাফেলো নগর। ভোরে এখানে গাড়ী বদলাইতে হইল। এক ঘণ্টার ভিতর নায়াগ্রা-প্রপাত-নগরে পৌঁছিলাম। রাস্তায় প্রায় ছয় ইঞ্চি গভীর বরফ পড়িয়াছে। চারিদিকে শ্বেতবর্ণ বালুকারাশির আবরণ বোধ হইতেছে। ইহা একপ্রকার বরফের মরুভূমি। মিশরের আসোয়ান ভূমি মনে পড়িল। সেখানে গরম—এখানে ঠাণ্ডা।

রাস্তায় চাকাওয়ালা গাড়ী চলিতেছে না। দেখিতেছি—বরফের উপর চলিবার জন্য নূতন এক প্রকার গাড়ীর ব্যবহার হয়। সোনাকার চাকার পরিবর্ত্তে সোজা কাঠ বা লোহার পাত রাস্তার উপর সমান্তরাল ভাবে ঘষিতে পারে। গাড়ী এই পাতের উপর বসান। ঘোড়া গাড়ী টানে—বরফের উপর দিয়া এই পাত অতি সহজে চলিতে পারে। এইরূপ গাড়ীকে Sledge (স্লেজ) বলে। প্রাথমিক ইংরাজী পাঠে এইরূপ গাড়ীর বিবরণ শুনা গিয়াছিল।

বরফ পড়ার দৃশ্য নিউইয়র্কেও কয়েক দিন দেখিয়াছি। কিন্তু যাহা বৃষ্টি নাই—এমন কি শীতও তত বেশী নয়—অথচ ফিন্ ফিন্ করিয়া তুলার গুঁড়ার মত শ্বেত বিন্দু আকাশ ছাইয়া ফেলে। বৃষ্টির সময়ে আকাশ যেরূপ মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকার দেখায়—তুষার পাতের সময়েও আকাশ খানিকটা কুয়াশাচ্ছন্ন বোধ হয়—দূরের জিনিষ দেখা যায় না। বৃষ্টি পড়ে টুপুর টাপুর—কিন্তু বরফ পড়ে নিঃশব্দে।

২। এক হাজার পাগ্‌লা ঝোরা

ভারতের ঝরণা

বাঙ্গালী ঝোরা নদী দেখিতে পায়—নদীর নৃত্য কখনও দেখে না। আমরা সমতল ভূমিতে বাস করি—ঝোরা, ঝরণা, জল-প্রপাত, falls ইত্যাদি আমাদের চোখে পড়ে না। রাঁচি হাজারিবাগ পুরুলিয়ার পাহাড়, সাহেবগঞ্জ রাজমহলের পাহাড় অথবা ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ব্রহ্মদেশের পাহাড়, গৌহাটী কামাখ্যা ও আসামিয়াদেশের পাহাড় এবং উড়্র-কলিঙ্গ উৎকলের পাহাড় বাঙ্গালার প্রাচীর স্বরূপ। বাঙ্গালী সাধারণতঃ বঙ্গদেশকে 'নদীমাতৃক' বলিয়া জানে—এই পাহাড়গুলির কথা বেশী মনে রাখে না। যাঁহারা কর্ম্ম বা ব্যবসার উপলক্ষ্যে বঙ্গের এই সমুদয় সীমান্ত প্রদেশে বাস করেন তাঁহারা বর্ষাকালে অন্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যতটিনী এবং জলপ্রপাত দেখিবার সুযোগ পান। মাঝে মাঝে দামোদরের বন্যা আসিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীকে জলপ্রপাত এবং স্রোতস্বতীর তাণ্ডবলীলা স্মরণ করাইয়া দেয়। আর যাঁহারা বাঙ্গালার নদী উপবন দীঘি দুর্গ ভ্রমণ করিয়া জন্মভূমির প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা বঙ্গের উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে মধ্যভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু ঝোরার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষের ভিতর বাঙ্গালাদেশের বাহিরে

অসংখ্য জলপ্রপাত আছে। দক্ষিণে কাবেরী-প্রপাত আজকাল জগৎপ্রসিদ্ধ। নগাধিরাজ হিমালয় ত কোটি কোটি ঝোরার জন্মদাতা। জব্বলপুরের মর্ম্মর শৈল, মহাভারতের অমর কণ্টক উপত্যকা এবং অগস্ত্যপালিত গিরিবর ভারতপ্রসিদ্ধ ঝরণার আশ্রয়স্থল। বাঙ্গালীর নিকট দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ের পাগ্‌লাঝোরাও সম্প্রতি সুপরিচিত। হিমালয়ের ঝরণা সম্বন্ধে আমাদের কবি গাহিতেছেন—

"নির্ঝরের ঝর ঝরে পত্রের মর্ম্মরে
শুনিবে স্বরগ গীত।"

নায়াগ্রা প্রপাত

নায়াগ্রা (Niagara) একটা নদীর নাম। ঈরি হ্রদ হইতে বাহির হইয়া এই স্রোতস্বতী অণ্টরিয়ো হ্রদে মিশিয়াছে। নদীর দৈর্ঘ্য ৩৬ মাইল মাত্র। এই পথ বহিয়া হ্রদ হইতে নদীকে ৩৩৬ ফিট নিম্নভাগে গড়াইতে হয়। কারণ ঈরি হ্রদের জলের উপরিভাগ সাধারণ সমতল ক্ষেত্র হইতে ৫৬৮ ফিট উর্দ্ধে এবং অণ্টরিয়ো হ্রদের জল মাত্র ২৩২ ফিট উর্দ্ধে। কাজেই নায়াগ্রা নদী বা নালা উচ্চতর জলের চৌবাচ্চা হইতে নিম্ন স্তরের চৌবাচ্চায় পড়িয়াছে। নিম্নে নামিবার সিঁড়ি পাঁচটা মাত্র ধাপে বিভক্ত :—

প্রথম ধাপ— ১৫ ফিট (ঈরি হইতে নিম্নে)
দ্বিতীয় ধাপ—৫৫ ফিট (নদীর মত ক্রমশঃ গড়ান—এই ভাবে ২২ মাইল)
তৃতীয় ধাপ—১৬১ ফিট (এইখানেই লম্ফন বা প্রপাত)
চতুর্থ ধাপ— ৯৮ ফিট } এই অংশ ১৪
পঞ্চম ধাপ— ৭ ফিট } মাইল।

যেখা যেন নায়াগ্রা নদীর তৃতীয় ধাপের নাম নায়াগ্রা প্রপাত (Niagara Falls)। বর্ত্তমানে এই প্রপাতের দুই ধারে দুইটি বর্দ্ধিষ্ণু নগর। একটি যুক্তরাষ্ট্রের অধীন—নিউইয়র্ক প্রদেশ-রাষ্ট্রের অন্তর্গত। অপরটি ক্যানাডা-রাষ্ট্রের অধীন। দুইয়ের নামই 'নায়াগ্রা প্রপাত নগর।' নায়াগ্রা নদী উৎপত্তি স্থান হইতে মোহনা পর্য্যন্ত ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের সীমা-রূপে নির্দ্দিষ্ট। যুক্তরাষ্ট্রে ও ইংলণ্ডে ১৮১৫ সালে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার ফলে ব্রিটিশ উপনিবেশ ক্যানাডা এবং স্বাধীন যুক্ত রাষ্ট্রের সীমা বিভাগ এইরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া-ছিল।

ক্যানাডার দিক হইতেও নায়াগ্রাপ্রপাত দেখিতে আসা যায়—বহুকাল পর্য্যন্ত লোকেরা ঐ অঞ্চল হইতেই দেখিতে আসিত—ফরাসী ঔপনিবেশিকেরা সপ্তদশ শতাব্দীতে ক্যানা-ডার দিক হইতেই এই প্রপাত আবিষ্কার করে।

যুক্তরাষ্ট্রের নায়াগ্রাপ্রপাত নগরের এক হোটেলে আড্ডা গাড়িয়াছি। স্লেজ্ (sledge) শকটে বরফের উপর দিয়া ঝোরা দেখিতে বাহির হইলাম। নগরের ভিতর নূতনত্ব কিছু নাই। চারিদিকে বরফের স্তূপ চূণের গাদা অথবা বালুকারাশির মত দেখা-ইতেছে। একটা ক্ষুদ্র সেতু পার হইয়া দ্বীপের ভিতরে আসিলাম। সেতুর নীচে ঝোরার এক অংশ। এখান হইতেই ঝরণার শব্দ শুনিতে পাইতেছি।

বরফের বাগান

দ্বীপের নাম Goat Island বা ছাগল দ্বীপ। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই দ্বীপে এক ব্যক্তি কতকগুলি ছাগল রাখিয়াছিল। লোকে বলে এই জন্য দ্বীপের নাম এইরূপ। জানুয়ারী মাসের শেষ—কোন গাছে একটাও পাতা নাই—অধিকন্তু যেসকল বৃক্ষ সারি দিয়া

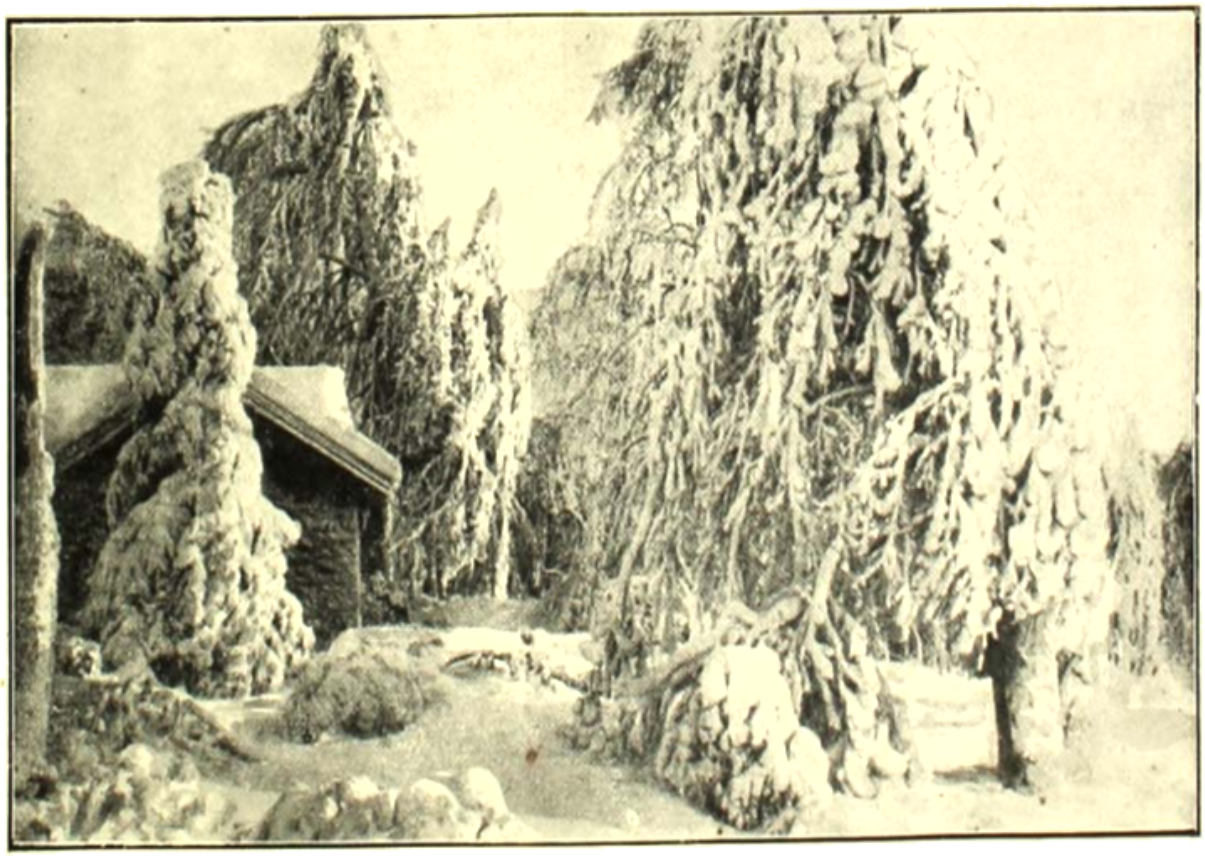

তুষারমণ্ডিত মেপ্‌ল্‌ বৃক্ষ

দাঁড়াইয়া আছে। ভারতবর্ষের যে কোন পর্ব্বত পৃষ্ঠে এইরূপ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যায়। শুনিলাম গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দ্বীপের দৃশ্য অতি মনোহর। এখন ইহার সর্ব্ব অঙ্গ বরফে ঢাকা। বৃক্ষগুলির শাখা প্রশাখা এবং শিরোদেশও তুষারাবৃত। জমা বরফের দ্বারা গাছের ডাল পালাগুলির উপর উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ পোষাক সৃষ্ট হইয়াছে। যেন চারিদিকে মসৃণ কাচের বাগান দেখিতেছি।

এই দ্বীপ আদিম ইণ্ডিয়ান্ জাতিসমূহের ধর্ম্মজীবনে বিশেষ আদরণীয় ছিল। এখানে তাহাদের উৎসব, মেলা, ধর্ম্মকর্ম্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইত। প্রকৃতির এই রম্য স্থানে সরল স্বভাব নরনারীগণ তাহাদের তীর্থক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছিল। ইণ্ডিয়ানদের স্বরণাপূজা আমাদের গঙ্গাপূজা এবং মিশরবাসীর নীল পূজার অনুরূপ। এই সকল অনুষ্ঠানের অনেকটা বাহ্যদৃশ্য সহজেই বুঝিতে পারি; কিন্তু ভিতরকার কথা একরূপ কি না গভীরভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

বিলাতী কবি পোপ ইণ্ডিয়ানদের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"And the poor Indian whose untutored mind
Sees God in clouds and hears him in the wind."

আজকালকার নৃতত্ত্ববিদেরা ইণ্ডিয়ান্‌দের সম্বন্ধে কিছু নূতন মত প্রচার করিতেছেন। অধ্যাপক হাডন তাঁহার The Soul of a Red Indian গ্রন্থে তথাকথিত অসভ্য ও "untutored" জাতির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সাক্ষ্য দিয়াছেন।

হাসল-দ্বীপ শীতকালে বরফের উদ্যানে পরিণত হয়। এই দৃশ্য সম্বন্ধে একজন কবি লিখিয়াছেন, যে প্রকৃতি

"Wasteful decks the branches bare
With icy diamonds rich and rare"

এই শ্বেত তুষারাবৃত বৃক্ষরাজির তল দিয়া দ্বীপের এক কোণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এখান হইতে সম্মুখে ক্যানাডার পার এবং অতি নিম্নে নায়াগ্রানদী দেখা গেল; নদীর অধিকাংশই জমিয়া গিয়াছে—বড় বড় বরফের চাপ জলের উপর দুধের সরের মত ভাসিতেছে; যেখানে বরফের স্তূপ নাই সেখানে নদীর স্রোত দেখিতে পাইতেছি। বরফের তল দিয়া জল দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝোরার পতন ও লম্ফনের আওয়াজ কাণে প্রবেশ করিতেছে; যেখানে দাঁড়াইয়া আছি তাহার এক হাত দূরেই নায়াগ্রা ১৬১ ফিট নীচে লাফাইয়া পড়িতেছে। বর্ষাকালে ২০০ পাম্পলাঝোরা একত্রিত হইলে যেরূপ গর্জ্জন ও জল-স্রোত হয় নায়াগ্রাপ্রপাতের এই দৃশ্য সেইরূপ। এখন শীতকাল—জল অনেকস্থলেই জমিয়া গিয়াছে—কাজেই সমগ্র প্রপাতের প্রভাব বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া উত্তালতরঙ্গ সিন্ধুর উন্মত্ত কোলাহল স্মরণ করিলাম। মনে হইল সাগরের উপর ভাসিতেছি এবং সমুদ্রে ঝড় বহিতেছে। নির্ঝরের সঙ্গীত যাহার কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে সে তাহা ভুলিতে পারিবে না। নায়াগ্রা প্রপাতের সঙ্গীতও চিরকাল মনে থাকিবে।

রামধনু

সাগর সঙ্গীতের কথা ভাবিতে ভাবিতে আর একটা সাগর দৃশ্য মনে পড়িল। তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ভিতর সূর্য্যরশ্মি রামধনু সৃষ্টি করে। সমুদ্রে আসিবার পূর্ব্বে রামধনু কেবলমাত্র মেঘাচ্ছন্ন আকাশেই দেখিয়া-

ছিলাম তাহাতে বসিয়া রামধনু সাগরবুকে অতি সন্নিকটে দেখিয়াছি। আর এইখানে আমার দশ হাত দূরে সুবিশাল সুস্পষ্ট রামধনু দেখিতেছি। ইহা কেবল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নয়। উর্দ্ধ স্থান হইতে বহু নিম্নে জল পড়িলে জল পতনের আকার parabola এর অনুরূপ হয়। নায়াগ্রাপ্রপাতেরও জল ১৬১ ফিট নীচে এই আকারে পড়িতেছে। পতনের সঙ্গে সঙ্গে জল-কণা কুয়াশা বা ধূমের ন্যায় আকাশে উঠিতেছে। এই কুয়াশার ভিতর সূর্য্যরশ্মি বিচিত্র রামধনু সৃষ্টি করিয়াছে। এই রামধনুর আকার parabolaএর মত।—নিম্নে ইহা নায়াগ্রা-নদীর জলের নিকট পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছিয়াছে —উর্দ্ধে সাধারণ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।

নির্ঝরের সঙ্গীত

বলা বাহুল্য নায়াগ্রা সম্বন্ধে গত ৩০০ বৎসরের ভিতর নানা লোকে নানা কথা লিখিয়াছেন। নায়াগ্রার গর্জ্জন সম্বন্ধে বিলাতী কবি গোল্ড্‌স্মিথের রচনায় পাই :—

And Niagara stuns with thundering sound."

বজ্র গর্জ্জনের সঙ্গে নায়াগ্রার তুলনা আদিম ইণ্ডিয়ানেরাও করিত। বস্তুত নায়াগ্রা শব্দ ইণ্ডিয়ান্ ভাষার এই অর্থই প্রকাশ করে। ইংরাজীতে এই শব্দের অর্থ The Thunderer of the Waters. আমাদের পরিভাষায় বজ্রায়ুধ ইন্দ্রদেব নায়াগ্রাস্বরূপ। প্রাচীন ইণ্ডিয়ানেরা প্রকৃতির এই রূপ দেখিয়া ভগবানকে এই মূর্ত্তিতে পূজা করিত। এই গর্জ্জন বা প্রপাতের নাম হইতে তাহারা নদীর নাম স্থানের নাম এবং নিজ জাতির নামও রাখিয়াছিল।

এই গর্জ্জন-সঙ্গীত সম্বন্ধে আর একজন কবি লিখিয়াছেন :—

"Deep calleth unto Deep, and what are we
That hear the question of the voice sublime ?
Oh ! What are all the notes that ever rung
From War's vain trumpet by thy thundering side !
Yea, what is all the riot man can make
In his short life to thy unceasing roar !
And yet, bold babbler, what art thou to Him
Who drown'd a world and heaped the waters far
Above its loftiest mountains ?—a light wave
That breaks and whispers of its Maker's might."

আর একটি ইয়াঙ্কি কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :—

"This is Jehovah's fullest organ strain !
I hear the liquid music, rolling, breaking
From the gigantic pipes the great refrain
Bursts on my ravished ear, high thoughts awaking !
The low sub-bass, uprising from the deep
Swells the great pæan as it rolls supernal—
Anon, hear, at one majestic sweep
The diapason of the keys eternal"

ইংরাজ সাহিত্যবীর ডিকেন্সও নায়াগ্রা-প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন :—

"Niagara was at once stamped upon my heart, an image of beauty to remain there, changeless and indelible, until its pulses ceased to beat forever. I think in every quiet season now, still do those waters roll and leap and roar and tumble all day long ; still are the rainbows spanning them a hundred feet below. Still, when the Sun is on them do they shine and glow like molten lead. Still, when the day is gloomy, do they fall like snow or seem to crumble away like the front of a great chalk cliff, or roll down the rocks like dense white smoke. But always does the mighty stream appear to die as it comes down, and always from its unfathomable grave arises that tremendous ghost of spray and mist which is never laid."

নায়াগ্রা মাহাত্ম্য বর্ণনায় ফুইডেন, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালী ইত্যাদি সকল দেশের কবি-পর্য্যটকগণই নিজ নিজ ক্ষমতা দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। চিত্রশিল্পেও নায়াগ্রা-ঝোরা অথবা এই ঝোরা সম্বন্ধে কল্পনা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এক ব্যক্তি বলিতেছেন—

"The painter is delighted with Niagara, with the varying forms that challenge his pencil, with the play of light that defies his brush. The light of heaven dances upon it in a thousand different hues. To paint the glories that come and go upon the falling, rushing waters, the artist must dip his brush in the rainbow, and when he has done his best, he will not be believed by those who have not seen his subject with their own eyes."

আর একজন চিত্রসমালোচক বলিতেছেন—

"When motion can be expressed by colour, there will be some hope of imparting a joint idea of it ; but until that can be done, Niagara must remain unportrayed."

এতক্ষণ পুরাপুরি যুক্তরাষ্ট্রের এলাকাধীন নায়াগ্রাপ্রপাত দেখিলাম। তাহার পর রেলে চড়িয়া বরফের বাগানের ভিতর দিয়া ছাগল-দ্বীপের আর এক কোণে আসিলাম। এখানকার দৃশ্যও সেইরূপ—সেই গর্জ্জন, সেই জলস্রোত, সেই উন্মাদনা, সেই কুয়াশা, সেই রামধনু। অপর পারে ক্যানাডা। এখানকার জলপ্রপাত প্রথমটার অপেক্ষা চারিগুণ বিস্তৃত। সুতরাং নির্ঝরের ঝর ঝর এখানে চতুর্গুণ। এই ঝোরার অধিকাংশই যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত—কিয়দংশ মাত্র ক্যানাডা-রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ১৮১৫ সালের সন্ধিতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

ছাগলদ্বীপের সমস্তই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পত্তি। এই দ্বীপের দ্বারা নায়াগ্রানদীর দুই শাখা বিভক্ত হইয়াছে—দুই শাখা হইতে দুইটা ঝোরা নির্গত হয়। নায়াগ্রা ঝোরা বলিলে এই দুইটা ঝোরা বুঝিতে হইবে—একটাকে

সাধারণতঃ আমেরিকান ফোরা অপরটাকে ক্যানাডিয়ান্ ফোরা বলে। কিন্তু ক্যানাডার রাষ্ট্রীয় অধিকার কেবলমাত্র একটার কিয়দংশে বিস্তৃত।

এই ছাগল দ্বীপ অর্টরিয়ো হ্রদ হইতে ১২ মাইল এবং ঈরি হ্রদ হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ছাগলদ্বীপের বক্ষ হইতে নায়াগ্রা নদী দুই শাখায় দুই ফোরারূপে ১৬১ ফিট খাড়া নিম্নে লাফাইয়া পড়ে। উদ্ভবনের পর দুই ফোরার জল একই gorge বা খালের ভিতর দিয়া অর্টরিয়োর দিকে চলিতে থাকে। এই গভীর খালের ভিতর দিয়া ১২ মাইল চলিলে নায়াগ্রানদীর অবসান হয়। এক ধারে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ পার্ব্বত্য কিনারা, অপর ধারে ক্যানাডার উচ্চ পার্ব্বত্য কিনারা। বস্তুতঃ যেন একটা পাথরের মেজে-বাঁধান নর্দ্দমার ভিতর দিয়া নায়াগ্রার জল প্রবাহিত বোধ হয়। নীলনদের কোন কোন অংশ এইরূপ।

ছাগলদ্বীপ ঘুরিয়া পুনরায় আমেরিকান ফোরার নিকটে আসিলাম। বুঝা গেল—গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দ্বীপটা সমস্তই একটা নন্দনকানন স্বরূপ। এখানে আমোদ প্রমোদ আহার বিহার ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়। প্রাচীন ইণ্ডিয়ানেরা এইখানে তাহাদের বার্ষিক ধর্ম্ম-মেলার অনুষ্ঠান করিত। ভারতবাসীরা এইরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যময় স্থানে তাহাদের তীর্থক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য নরনারীগণ এখানে হোটেল, রেস্তরাঁ, পার্ক, প্রমোদবন, নাচগৃহ ইত্যাদি স্থাপন করিয়া প্রকৃতিপূজা করে। প্রকৃতিপূজক মোটের উপর দুনিয়ার সকলেই—এক এক জাতি এক এক ভাবে।

করুণা-পূজা

একটা কাহিনী শুনিলাম। প্রাচীন ইণ্ডিয়ানেরা প্রতি বৎসর নায়াগ্রা-পূজার জন্য একটি করিয়া সুন্দরী বালিকাকে জলাঞ্জলি দিত। বালিকা উৎসাহের সহিত নানা আভরণে ভূষিত হইয়া নৌকারকে আরোহণ করিত। নৌকার ভিতর জনগণ নানাপ্রকার উদ্ভিদ্, পশু ও অন্যান্য দ্রব্য দেবতার জন্য নৈবেদ্যস্বরূপ রাখিয়া দিত। পরে সহাস্য-বদনে বালিকা নৌকা ছাড়িয়া আত্মবিসর্জ্জন করিত। গঙ্গাসাগরে শিশু ভাসান কি এই-রূপই এক ধর্ম্মানুষ্ঠান নয়? তাহা ছাড়া নর-বলি দানের কাহিনীও আমাদের ধর্ম্মসাহিত্যে পাইয়া থাকি। প্রকৃতিপূজারই ইহা অন্যবিধ অভিব্যক্তি।

একবার কোন প্রবীণ ইণ্ডিয়ানবীরের এক-মাত্র কন্যার বিসর্জ্জন স্থিরীকৃত হইল। বালিকাকে যথারীতি বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত করা হইতে লাগিল। পিতা বালিকাকে বিদায় দিল—এই বীরের পরিবারে বালিকা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। পিতা নিদারুণ শোক সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু কাহাকেও মনের ব্যথা প্রকাশ না করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। পরে বিসর্জ্জনের দিন ফোরার চতুর্দ্দিকে অগণিত নরনারী ধর্ম্মা-নুষ্ঠানে যোগ দিতে উপস্থিত। বালিকা নৌকা-রকে আত্মত্যাগের উদ্যোগ করিল। নৌকা ভাসিতে ভাসিতে সঙ্কটময় স্থানে উপস্থিত হইবে এমন সময়ে দেখা গেল আর একখানা তরণীও ঠিক সেই বিপজ্জনক জলপাতের সন্নিকটে আসিয়াছে। এই তরণীর আরোহী ও বালিকা পরস্পর পরস্পরকে একবার দেখিল—তাহার পর উভয়ই অতলস্পর্শ নদীর অভ্যন্তরে লুকাইয়া গেল।

নায়াগ্রা-ঝোরার কাল্পনিক মূর্ত্তি

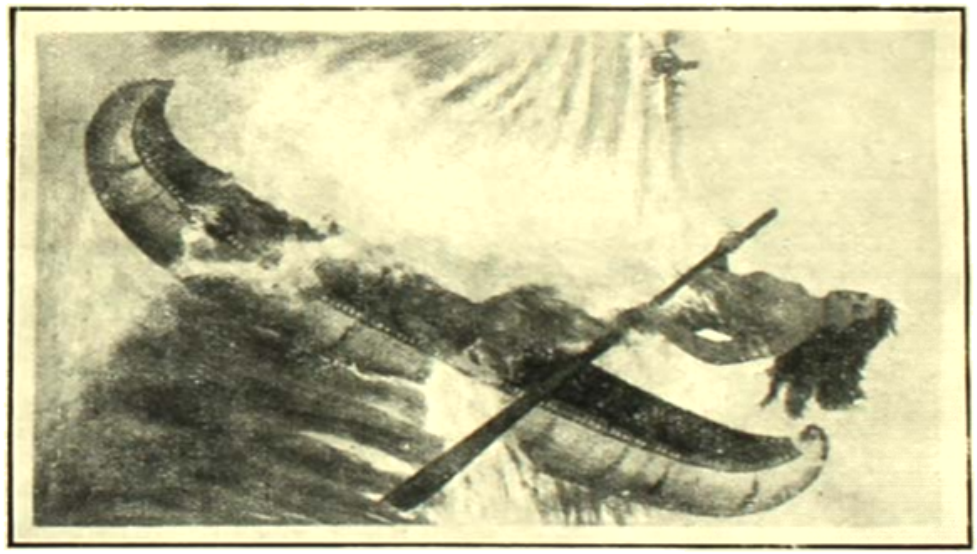

নায়াগ্রা-পূজা বা ইণ্ডিয়ান বালিকার দেহাস্থলি

এইরূপ বেদনামূলক আখ্যায়িকা প্রাচীন গ্রীক এবং কেল্টিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের Persens the Deliverer নামক ইংরাজী নাটক খানিকটা এই ধরণের কথাবস্তু লইয়া গঠিত।

এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আধুনিক চিত্রকর একটি ছবি আঁকিয়াছেন। আর একজন শিল্পীও নায়াগ্রার এইরূপ নররক্তপিপাসা এবং তাণ্ডবলীলার মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন।

ক্যানাডায় কয়েকঘণ্টা

ছাগলদ্বীপ প্রদক্ষিণ করিবার পর ষ্টেজ গাড়ী ছাড়িয়া দিলাম। এইবার মোটরে ক্যানাডাভিমুখে যাত্রা করা গেল। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্যানাডা যাইতে হইলে একটা বিরাট সেতু পার হইতে হয়। এই সেতু নায়াগ্রা-খালের উপর নির্ম্মিত—ইহাতে একটিও স্তম্ভ নাই। এই হিসাবে ইহা একটা দেখিবার জিনিষ। শুনিলাম দৈর্ঘ্যে ইহা প্রায় ১৩০০ ফিট। যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্যানাডায় কিম্বা ক্যানাডা হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া আসার জন্য এবং এই সেতু ব্যবহারের জন্য চুঙ্গি ও মাশুল দিতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পারেই কাষ্টম হাউসের কর্ম্মচারীরা মোটর ব্যবহারের জন্য ১৲ খাজনা লইয়া একটা টিকেট দিল। এই টিকেট দেখাইয়া ক্যানাডার পারের কর্ম্মচারিগণের নিকট মুক্তি পাইলাম।

ক্যানাডার পারে যাইয়া প্রথমে নদীর স্রোতের সঙ্গে ৩।৪ মাইল অগ্রসর হইলাম। এখানে নামিয়া জলের বেগ দেখিবার সুবিধা পাওয়া গেল। উঠা নামা বহু শ্রমসাধ্য বিবেচনা করিয়া এক কোম্পানী তড়িত চালিত গড়ান গাড়ী প্রস্তুত করিয়াছে। মার্সেলের মেরী-মন্দিরেও এইরূপ কল দেখিয়াছি। এক মিনিটে জলের নিকট উপস্থিত হইলাম। আসিয়াই মনে হইল—কালিম্পঙের পার্ব্বত্য পথ ও স্রোতস্বতী দার্জ্জিলিঙ্গ শৈলের অপরদিকে রঙ্গিত নদী যে পথে তিস্তা নদীর সঙ্গে মিলিতে অগ্রসর হইয়াছে সেই পথে স্রোতস্বতীর বেগ ও গর্জ্জন স্মরণে আসিল। নায়াগ্রা নদীর বেগ এইখানেই তাহার চরম সীমায় উপস্থিত। শুনিলাম একজন কাপ্তেন এইখানে সাঁতার দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন

নায়াগ্রার এই ঘূর্ণিপাক দেখিয়া ফিরিলাম। এক্ষণে নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে চলিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ পরে পুনরায় সেতুর নিকট আসিলাম। এখান হইতে অপর পারে যুক্তরাষ্ট্রের "আমেরিকান ঝোরা" সম্পূর্ণ দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ ভিক্টোরিয়া পার্কের ভিতর দিয়া "ক্যানাডিয়ান্ ঝোরা"র নিকটবর্ত্তী হইলাম। পথে একটা Electric Power House পড়িল। এই কারখানায় নায়াগ্রাপ্রপাতের বেগ ব্যবহার করিয়া তড়িদ্বেগ প্রস্তুত করা হয়। কারখানায় প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রহরীরা বলিল—"ইয়োরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে। এজন্য ইংরাজ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানেই এই সকল কারখানা এক্ষণে সৈন্য কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে। কোন লোকের প্রবেশাধিকার এক্ষণে নাই।" কাজেই জলের ক্ষমতাকে কি উপায়ে তড়িতের শক্তিতে পরিণত করা হয় তাহা বুঝিবার সুযোগ পাওয়া গেল না। নিউইয়র্কের কোন বড় তড়িতের কারখানায় বাষ্প হইতে তড়িৎ প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেখিয়াছি। এখানকার যন্ত্রাদি অবশ্য স্বতন্ত্র ধরণের সন্দেহ নাই।

অবশেষে ক্যানাডার পার হইতে ক্যানা-

ভিয়ান্ ঝোরা দেখিবার স্থানে উপস্থিত হইলাম। অপর পারে ছাগলদ্বীপ—এবং তাহার দুই ঝোরা।

এইখানে একটা কোম্পানী বিরাট ঝোরার তল ও পশ্চাৎভাগ হইতে ঝোরা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। দেখিবার জন্য উৎসুক হইলাম। কর্ম্মচারীরা নূতন একটা ওয়াটার-প্রুফ পরাইয়া দিল। ওয়াটারপ্রুফের একটা টুপিও মাথায় পরিলাম। পরে মাটির ভিতরে একটা সুড়ঙ্গে প্রায় ১০০ ফিট নামিলাম। অবশ্য হাঁটিতে হইল না—ইলেক্ট্রীসিটি চালিত উত্তোলন যন্ত্রে উঠা নামা সাধিত হয়। তাহার পর খানিকদূর হাঁটিয়া টানেলের ভিতর চলিতে লাগিলাম। অবশেষে এক-স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি—মাথার উপর এবং চোখের সম্মুখে ভয়ঙ্কর গর্জ্জনকারী জল-প্রপাত। জলবিন্দুসমূহে অন্ধকারময় কুয়াশা সৃষ্ট হইয়াছে—বলা বাহুল্য প্রপাতের অপর দিকে কিছুই দেখা যায় না।

প্রপাতের পর হইতে নায়াগ্রা নদীর দুই ধার অতিশয় উচ্চ—ক্যানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কিনারাই খাড়া ১৫০।১৮০ ফিট। সুতরাং নদী বহু নিম্নে। শুনিলাম নদীর গভীরতাও অত্যধিক। কোন কোন স্থানে জলের তলভাগ ১৫০ ফিট গভীর।

শক্তিকেন্দ্রের মাহাত্ম্য

আজকাল নায়াগ্রা ঝোরা প্রধানতঃ শিল্প-জগতে প্রসিদ্ধ। তড়িতের কারখানায় জলের বেগ ব্যবহৃত হইতে পারিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান মানব নায়াগ্রার নাম শুনিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা ভয় পাইয়াছেন জগতের কয়লা রাশি শীঘ্রই ফুরাইয়া আসিবে। তাহা হইলে জল সঞ্চয় করিয়া বাষ্প প্রস্তুত করা আর সম্ভবপর হইবে না। তখন জলের ক্ষমতাকে অন্য কোন ক্ষমতায় পরিণত করিবার আবশ্যকতা বিশেষরূপে বাড়িয়া যাইবে। নায়াগ্রা ঝোরার প্রচুর পরিমাণ তড়িতের শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। কাজেই ভবিষ্যৎ শিল্পজগতে নায়াগ্রা ঝোরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সহস্র কণ্ঠে হইতে থাকিবে। দূরদর্শী বৈজ্ঞা-নিকেরা এই কারণে প্রকৃতির এই শ্রীমান্ ও বিভূতিমান্ শক্তি-কেন্দ্রের উপাসনা প্রচার করিতেছেন।

৩। লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান

তীর্থস্থানের বকমারি

ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের পাণ্ডাদের কথা সকলেই জানেন। মিশরে অসংখ্য "গাইড" "ইণ্টারপ্রেটার" প্রদর্শক ইত্যাদির পাল্লায় পড়িয়াছি। নায়াগ্রাতেও 'তীর্থের কাকে'র সংখ্যা এবং দৌরাত্ম্য কম নয়। ধর্ম্মক্ষেত্রই হউক বা বিলাসক্ষেত্রই হউক—টুরিষ্ট বা পর্য্যটকের ভিড় যেখানে সেখানেই পাণ্ডা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পাণ্ডাদের ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তা, চালচাল, ভারতে, মিশরে ও ইয়াঙ্কিস্থানে সর্ব্বত্রই এক প্রকার।

তীর্থস্থান হইতে সকলেই নানাপ্রকার স্মারক দ্রব্য লইয়া আসে। শাক্ত বৈষ্ণব সকলেরই ইহা জানা আছে। খৃষ্টানেরাও প্যালে-ষ্টাইন হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে নানা পদার্থ সঙ্গে লইয়া যায়। মুসলমানেরা মক্কার "কাবা" হইতে জল লইয়া আসে। আর আধুনিক আদর্শের পর্য্যটকগণও তাঁহাদের প্রিয়স্থান হইতে কৃষিজাত শিল্পজাত অথবা প্রাকৃতিক বস্তুর নিদর্শন বহিয়া আনে। এইরূপে পর্য্যটক মাত্রেরই একটা করিয়া ছোট বা বড় মিউজি-য়াম সৃষ্ট হয়। আজকালকার ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক, প্রত্নতত্ত্ববিৎ, ভূতত্ত্ববিৎ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ তাঁহাদের তীর্থক্ষেত্র হইতে বিচিত্র

বস্তু সংগ্রহ করেন। মিশর, ইতালী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি যেন নব্যপণ্ডিতগণের পক্ষে এক ধরণের তীর্থক্ষেত্র। টুরিষ্টেরা এই সকল দেশ দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি Curio-shops, "স্থানীয় দ্রব্যভাণ্ডার"ও দেখিতে উৎসাহী হন। এই সকল দোকানের মালিকেরাও বিদেশীয় পর্য্যটক পাইলে আকাশের চাঁদ হাতে পায়। এই জন্য ইহারা পাণ্ডাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখে। সুতরাং একে পাণ্ডার উপদ্রব তাহার উপর স্থানীয় দ্রব্যভাণ্ডার ওয়ালাদের উপদ্রব—দুই প্রকার উপদ্রবই সকল তীর্থযাত্রী বা পর্য্যটকগণকে ভোগ করিতে হয়।

নায়াগ্রা নগরে পৌঁছিবামাত্রই পাণ্ডামূর্ত্তির সাক্ষাৎ হইল। প্রথমতঃ হোটেল নির্ব্বাচনের পালা। কিন্তু কুক কোম্পানীর টিকেটে পূর্ব্ব হইতে হোটেলের খরচ দিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহাতে হোটেলের নাম লেখা ছিল। কাজেই হোটেলের দালালেরা বেশী গণ্ডগোল করিতে পারিল না। হোটেলে প্রদর্শক ও পাণ্ডারা দলে দলে আসিতে লাগিল। হোটেলের ভিতরেই নায়াগ্রার স্থানীয় দ্রব্যসমূহের এক দোকানও দেখিলাম।

লোহিতাঙ্গ দ্রব্যভাণ্ডার

পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া এখানকার কয়েকটা দোকানের ভিতর প্রবেশ করা গেল। প্রধানতঃ লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ জাতির প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য এই সকল দোকানে বিক্রী করা হয়। তাহা ছাড়া নায়াগ্রানদীর অভ্যন্তরে নানাবিধ প্রস্তর ও ধাতু পাওয়া যায়। সেই সমুদয় উপকরণে খেলানার সামগ্রী, অলঙ্কার, মালা, হার, চুড়ী ইত্যাদি তৈয়ারী হয়। এই সমুদয় দ্রব্যও বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে। দোকানে প্রবেশ করিলেই বিক্রেতা (সাধারণতঃ বিক্রেত্রী) ছলে বলে কৌশলে কতকগুলি জিনিষ গছাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কোন দোকানে একবার ঢুকিলে অন্ততঃ দুই ঘণ্টার পূর্ব্বে বাহির হওয়া অসম্ভব।

নিউইয়র্কের মিউজিয়ামে লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ানদের পরিবার, সমাজ, শিল্প, যুদ্ধসজ্জা, গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার বস্তুই দেখিয়াছি। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও এই প্রকার দ্রব্যের সংগ্রহ যথেষ্ট। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে কয়েকদিন ইণ্ডিয়ান্-সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতাও শুনা গিয়াছে। অধ্যাপক বোয়াজ্ ইণ্ডিয়ান্ জাতিপুঞ্জের ভাষা, সাহিত্য, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণায় জগৎ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত লোহিতাঙ্গ নরনারীদিগের জীবনকথা কেবলমাত্র ল্যাবরেটরীতে অথবা নির্জ্জীব সংগ্রহালয়ে বুঝিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। নায়াগ্রায় আসিয়া রক্তমাংসের শরীরযুক্ত জীবন্ত ইণ্ডিয়ান্ নরনারীর আবেষ্টনের ভিতর পড়িয়াছি। এখানে একটা অভিনব মানব সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে বাস করিতেছি।

নিউইয়র্ক প্রদেশের এই অঞ্চল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইণ্ডিয়ান জাতিপুঞ্জের অধীন ছিল। এই অঞ্চলের নদী পর্ব্বত হ্রদ, নগর পল্লী ইত্যাদির নাম ইণ্ডিয়ান্ ভাষা হইতে গৃহীত। ঈরি, নায়াগ্রা, হিউরন, অণ্টারিয়ো ইত্যাদি সব ইণ্ডিয়ান ভাষার অন্তর্গত। ষোড়শশতাব্দীর অবসানকালে এখানে নানাবিধ আদিমজাতির কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। ফরাসীরা ক্যানাডা অঞ্চল হইতে অগ্রসর হইয়া ইণ্ডিয়ান্দের সম্মুখীন হয়। তখন ইয়োরোপের বিবাদ বিসম্বাদ আমেরিকার উপনিবেশ সমূহেও চলিত। এইজন্য

ফরাসী ও ইংরাজের দ্বন্দ্ব ক্যানাডায়ও অনুষ্ঠিত হইত। ফরাসী পরাজিত হইবার পর ইংরাজেরা ক্যানাডায় প্রভুত্বলাভ করে। কিন্তু ফরাসীই হউক, অথবা ইংরাজই হউক —সকলকেই ইণ্ডিয়ান্ জাতিপুঞ্জের সঙ্গে অস্ত্র-পরীক্ষা করিতে হইত। ইণ্ডিয়ানেরা বড় শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

পরে অষ্টাদশশতাব্দীর শেষপাদে ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামের ফলে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতালাভ করে। তখন হইতে একমাত্র ক্যানাডায় ইংরাজের আধিপত্য থাকিল। এই সময়েও ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। ইংরাজেরা ক্যানাডা হইতে এবং যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা দক্ষিণ দিক হইতে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। এদিকে ইংরাজে এবং যুক্তরাষ্ট্রেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। অবশেষে ১৮১৫ সালে সন্ধি স্থাপিত হয়। স্বাধীন ইণ্ডিয়ানেরা এক প্রকার লুপ্ত হইয়া যায়—অথবা ক্যানাডায় ও যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর reserved or protected বা সংরক্ষিত নরসমাজরূপে জীবনধারণ করিতেছে। কাজেই নায়াগ্রা অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমেরিকার আদিমনিবাসী-দিগের অস্থিমজ্জা এবং তপ্ত নিঃশ্বাসের আব্-হাওয়ায় বিচরণ করিতেছি। নায়গ্রাপ্রপাত, নায়াগ্রা নদী, ঈরি হ্রদ, অন্টরিয়ো হ্রদ ইত্যাদি সবই ইণ্ডিয়ান্ জীবনধারার সঙ্গে ওতপ্রোত-রূপে গ্রথিত।

সন্ধান পাইলাম—আমাদের এই নগরের ১০।১২ মাইল দূরে যুক্তরাষ্ট্রের এলাকায় একটি ইণ্ডিয়ান্ পল্লী সংরক্ষিত আছে। আজকাল ইণ্ডিয়ান্ প্রায় কোথাও দেখা যায় না—ইণ্ডিয়ান্ জাতির এই বিখ্যাত নায়াগ্রা কেন্দ্রেও একঘর ইণ্ডিয়ান্ নাই। লোক গণনায় প্রকাশ—যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রদেশে বর্ত্তমানে মাত্র ৫০,০০০ ইণ্ডিয়ান্ নরনারী বাস করিতেছে। যাহা হউক নায়াগ্রা অঞ্চলের এই সংরক্ষিত ইণ্ডিয়ান্ সমাজ দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

তুষারের হোলিখেলা

দিনরাত তুষার পড়িতেছে—তুষারের ঝড়ও বহিতেছে। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই শ্বেত তুলাসদৃশ বিন্দুসমূহের বিকীরণ। বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট, লোকজনের পোষাক রেলওয়ে, দোকান হোটেল, গাছপালা সবই শ্বেতবর্ণ। ক্রমশঃ মাঠের ভিতর আসিয়া পড়িলাম—বিরাট শ্বেত প্রান্তর—বরফের বালুকারাশি পাগলের মত উড়িয়া বেড়াই-তেছে—কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। আমরা ভারতবর্ষে লাল রঙের খেললীলা দেখিয়া থাকি। বসন্ত উৎসবের সময়ে লোক-জন, রাস্তা ঘাট, নদী পুষ্করিণী, কাপড় চোপড়, উঠান বাগান সবই লালে লাল হইয়া যায়। সেই সময়ে এমন কি "লাল ফুলে লাল অলি লাল মধু পায়।" আমরা আর কোন রঙের একাধিপত্য অন্য কোন ঋতুতে দেখি না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সময়েই রঙের বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। নায়াগ্রা অঞ্চলে এ কয়দিন ধরিয়া শ্বেতবর্ণের একাধিপত্য দেখিতেছি। বরফের হোলিখেলা সাজাইয়া প্রকৃতি এই ঋতুর অভিবাদন করিতেছে। সবুজ তৃণপত্র মণ্ডিত মখমল সদৃশ কানন প্রান্তরের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। শ্বেত তুষারের মসৃণ মরুভূমিও কম মনোহারিণী নয়।

বিংশশতাব্দীর লোহিতাঙ্গ

রেল গাড়ীতে প্রায় দুই ঘণ্টা চলিয়া ইণ্ডিয়ান্ পল্লীতে পঁহুছিলাম। একটি

পরিবারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম। "সে রামও নাই—সে অযোধ্যাও নাই।" ইণ্ডিয়ানের নিজস্ব কিছুই পাইলাম না। এমন কি চেহারা দেখিয়াও লোহিতাঙ্গ অথবা কোন প্রকার বিশেষত্ব বিশিষ্ট জাতির পরিচয় পাইলাম না। ইহাদিগকে ভারতবাসী বলিলেও ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

পরিবারের কর্ত্তা গৃহে ছিল না। তিনটি রমণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। বালিকা, বালিকার মাতা এবং তস্যাহপি মাতা। শুনিলাম সর্ব্বসমেত ৩৬৫ জন ইণ্ডিয়ান্ নর-নারী এই পল্লীতে বাস করে। ইহারা ১২টি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত—প্রত্যেক দলের একজন স্বতন্ত্র দলপতি। সকলেরই ভাষা এক। জাতির নাম টাক্কোরোরা। বিবাহ এই দশ দলের ভিতরেই আবদ্ধ। সকলেই ইংরাজী-ভাষা ব্যবহার করে—ইণ্ডিয়ান্ ভাষা শিখাইবার ব্যবস্থাও নাই। নগরের সাধারণ ইয়াঙ্কি স্কুলী মজুরেরা যে সকল কর্ম্ম করে এই পল্লীর লোকেরাও তাহাই করে। পুরাতন শিল্পের মধ্যে চামড়ার জুতা, ব্যাগ, বালিশ, জামা ইত্যাদি প্রস্তুত করা কিছু কিছু চলিয়া থাকে। কয়েক ঘর খৃষ্টান। পুরাতন দেবদেবীর পূজা এখনও চলিতেছে। উঠানে একটা কাষ্ঠপ্রতিমা দেখিলাম। নিম্নের অংশে পাপের প্রতিমূর্ত্তি—মধ্যম অংশে পাপ সংহারকের প্রতিমূর্ত্তি। এবং সর্ব্বোচ্চ অংশ পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি। এই পক্ষী টাক্কোরোরা জাতিকে স্বর্গে লইয়া যায়। ইহাই ইহাদের পরমারাধ্য দেবতা।

শ্রীপর্য্যটক।

নবনাগরিক সাহিত্য

সাহিত্যের অধিকার

সাহিত্যক্ষেত্রে এখন একটা মত বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে সাহিত্যে সকলের অধিকার নাই। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না, আমাদের আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের সহিত আমাদের লোকসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়া দূরে থাক ক্রমশঃ বরং অপরিচয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই নূতন মত অনুসারে দোষটা হইতেছে, অশিক্ষিত লোক সাধারণের, শিক্ষিত লোকের সাহিত্যের নহে। লোকসাধারণের স্বল্প বুদ্ধি ও স্বল্প জ্ঞানের যোগাযোগে যে আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই, ইহা এই নূতন মতাবলম্বীদিগের নিকট বরং গৌরবের বিষয়। লোকসাধারণের সহিত যোগাযোগে এ সাহিত্য গড়িয়া উঠিলে তাহা কখনও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হইত না। এবং বিশ্বমানবের নিকট তাহা মর্য্যাদা লাভও করিত না।

ইহারা লোকসাধারণকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিতেছেন, তোমাদের স্পর্দ্ধা ত কম নহে, তোমরা আমাদের সাহিত্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের না আছে বুদ্ধি না আছে জ্ঞান তোমাদের জন্য রূপকথা, উপকথা, যাত্রা আরবোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস রহিয়াছে; কাব্য-সাহিত্যে তোমাদের অনধিকার। কাব্য সাহিত্য ত কল্পনা জল্পনা নহে, যে তোমাদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। সাহিত্য আরও উচ্চ অঙ্গের, সাহিত্যকে

বুঝিতে যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের অনেক শিক্ষা ও সাধনা চাই।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সাহিত্য।

আমরা কৃতবিদ্য তোমরা মূর্খ আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, তোমরা শূদ্র শাস্ত্রের মত সাহিত্যে আমাদেরই কেবল অধিকার, তোমাদের অধিকার নাই।

আমরা অধিকার ভেদ মানি। আমরা ইহাও মানি সাধনার দ্বারা সকলেই উচ্চাধিকার লাভ করিতে পারে হিন্দু-সমাজ যখন সজীব ছিল তখন শূদ্রও সাধনার বলে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করিতে পারিত। বর্ত্তমান আলোচনায় সাহিত্যক্ষেত্রে যে অধিকার-ভেদের কথা উঠিয়াছে তাহা অন্য রকমের।

লোকসাধারণ শিক্ষালাভ করিতে পারিলেই যে নব্য কাব্য-সাহিত্য আয়ত্ত করিতে পারিবে তাহা নহে। শিক্ষা ও সাধনার বৈষম্যের উপর সাহিত্য চর্চ্চার বর্ত্তমান অধিকারভেদ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

অধিকারভেদের কারণ

বাংলা সাহিত্যে অধিকারভেদ কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে হইবে না। দেশের লোক বহুকাল হইতে এবিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৈয়ারী সাহিত্য। আমাদের সাহিত্যিকগণ,—ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত, যাঁহাদেরকে আমরা সচরাচর কৃতবিদ্য বলিয়া থাকি। দেশের অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের কৃতবিদ্যগণ এক দিকে যেমন ইংরাজী অথবা ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে সাহিত্যের রস ও শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, আর একদিকে লোকসাধারণের সহিত ভাববিনিময় ত্যাগ করিয়া সাহিত্যে বেশীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা Ivanhoe পাঠ করিয়া দুর্গেশনন্দিনী লিখিতে বসিলাম, Milton পড়িয়া মেঘনাদ বধ লিখিলাম। Shakespeare ও Moliere পড়িয়া আমরা নাটক লিখিতে লাগিলাম, Shelley পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র কবিতায় গা ঢালিয়া দিলাম। ইউরোপীয়নবিশ লেখক-দিগের হাতে পড়িয়া বাংলাসাহিত্য স্বাভাবিক ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর আদর্শ বাঙ্গালী লেখকদিগের রচিত সাহিত্যে বিদ্রূপের বিষয় হইল। সেই তখন হইতে ইংরাজীর অনুবাদ যেমন সাহিত্যে সাধুভাষা বলিয়া গৃহীত হইল, সেরূপ ইংরাজী আদর্শের নকল সভ্য বলিয়া সাহিত্যিক সমাজে গণ্য করিতে লাগিল।

সমাজ-তত্ত্বে নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য

বাঙ্গালী জাতির প্রাণ আছে। তাই ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী সাড়া দিয়াছে, একবারে জড় অচেতনের মত থাকে নাই। সাড়া পাওয়া গিয়াছে ঠিক, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সাড়া পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালীর দর্শন, সমাজ-তত্ত্ব, রাষ্ট্র-নীতি, ধর্ম্ম-তত্ত্বের ভিতর ইউরোপীয় ভাবসমূহ ও দেশের ইতি-হাসের ক্রমবিকাশলব্ধ ভাবসমূহের একটা সুন্দর সমন্বয় সাধিত হইতেছে। আমাদের দার্শনিকগণ, আমাদের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রতিকূল ভাবপ্রবাহের মধ্যে আমাদের জাতির জন্য একটা গন্তব্য পথ স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছেন। প্রতিকূল আদর্শের মধ্যে আমরা তাহাদের নিকট আমাদের আদর্শ কিছু জানিতে পাইয়াছি।

সাহিত্যে ইউরোপীয়-নবিশি

কিন্তু কাব্য-সাহিত্যে আমরা এখনও যথোচিত সাড়া দিই নাই। নূতন ও পুরাতনের সামঞ্জস্য আমরা গত কবিতায় কিছু করিয়াছি সত্য। কিন্তু গল্পে, উপন্যাসে, নাটক নভেলে আমরা শুধু নূতন লইয়া খেলা করিতেছি মাত্র। আমরা এখনও ইউরোপীয়-নবিশির আত্মশ্লাঘা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমরা এখনও অ্যানা ক্যারেনিনার (Anna Karenina) মোহে—'চোখের বালিতে' দেশের মনের সম্পূর্ণ বিরোধী নায়ক নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র আঁকিতেছি, "স্ত্রীর পত্রে" ও "নারীর মূল্যে" ইবসেন (Ibsen)এর মত প্রচার করিতেছি, এবং রেসারেক্‌সন্‌কে (Resurrection) বাঙ্গালী সমাজে আনয়ন করিতেছি। আলফান্সো ডডে (Alphonso Daudet) ও গিডো মোঁপাসা (Guyde Maupassant) বর্ত্তমান নব্য-সাহিত্যিক দলের গুরু হইয়াছেন।

অবান্তর সাহিত্য

ইঁহারা ভাবিতেছেন, ইঁহারা যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন তাহা আসল সত্য ও সুন্দর, তাহাতে সমাজের মিথ্যা আচার ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সমাজের কদর্য্য অনুশাসন সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রতিরোধ করে না। সেখানকার জীবন একেবারে স্বাধীন, বাধা বন্ধনহীন, নিত্য সরস, নবীন, সবুজ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহারা যাহা আঁকিতেছেন, তাহা ছবি মাত্র, জীবন নহে। তাহা শুধু স্বাধীনতা, শুধু বন্ধন-বিহীনতা, তাহা একটা mere abstraction, অলীক কল্পনা,—সমগ্র জীবনের সহিত তাহার যোগাযোগ নাই। একটা উবে গেলে গাছের মত যারা বিদেশী রস সিঞ্চনে [illegible] তারা সরস, সবুজ, নবনবোন্মেষশালী [illegible] সত্য কিন্তু দেশের মাটির [illegible] দেশের সমগ্র জীবনের সহিত তাহার যোগাযোগ না থাকাতে সে যেমন চিরজীবন বিফল থাকিয়া যায়, সেরূপ বর্ত্তমান নব্য-সাহিত্য আভিজাত্য দোষদুষ্ট হইয়া জাতীয় জীবনের নিকট নিষ্ফল হইতেছে।

আসল কথা হইতেছে কয়েকটা স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রতার অলীক কল্পনা abstractions লইয়া ছবি আঁকা যায়, কল্পনা কল্পনা করা যায়, কিন্তু তাহাদের লইয়া জীবন চলে না। জীবন মানেই যোগাযোগ। ফুল হঠাৎ আকাশে ফুটিয়া উঠে না, ফুলের সহিত গাছের পাতা, শাখা, প্রশাখা, মূল ও শিকড়ের সম্বন্ধ আছে। জীবনের সঙ্গে সেইরূপ সমাজ, ধর্ম্ম, ও ইতিহাসের যোগাযোগ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জীবন কখনই নিরিপ্ত হইয়া আপনাকে প্রকাশিত করে না। জীবনের প্রকাশ যোগাযোগের ভিতর দিয়া। মনুষ্য জীবনে এই যোগাযোগের অবলম্বন হইতেছে, জাতি বা সমাজ, ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ ও ক্রমবিকাশমান জাতি বা সমাজ।

বিদেশীয় সভ্যতার কয়েকটা abstractions মাত্র অবলম্বন করিয়া যেমন জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না, জীবনকে যেমন দেশেরই ইতিহাস ও দেশেরই সমাজকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিতে হয়, সেইরূপ সাহিত্য ও দেশের জীবনের সহিত যোগাযোগ ত্যাগ করিয়া বিদেশী জীবনকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিতে পারে না। আসল সাহিত্য জাগিয়া উঠে একটা সত্য, স্পষ্ট, concrete জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর

দিয়া। সেখানে শুধু কয়েকটা abstractions-এর লীলাখেলা, একটা পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গ সমন্বিত জীবনের প্রকাশ নাই, সেখানে সাহিত্যও লীলাময়, সদা-চঞ্চল, অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল। সেখানে সাহিত্য আমোদ দেয়, আনন্দ দেয় না, চমক লাগায়, প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে না।

সাহিত্যে abstractions বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা লইয়া সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আমাদের 'গোরা'। প্রত্যেক চরিত্র সেখানে মানুষ নহে, একটা ভাবের প্রচণ্ড অভিব্যক্তি। তাহাদের ভাব ও বক্তৃতার বিশ্লেষণের ধূমে মানুষগুলা ছায়াময় হইয়া গিয়াছে। এই "গোরা"ই হইতেছে নব-নাগরিক সাহিত্যের কল্পনার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

আভিজাত্য-দোষ

বর্ত্তমান নব নাগরিক সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ অনেকটা বলা যায় যে পাশ্চাত্য সভ্যতার কয়েকটা কল্পনা, সুতরাং তাহার পক্ষে অবাস্তব ভাব লইয়া উহা বিকাশ লাভ করিতেছে। এতকাল, আমরা শুনিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম, বাঙ্গালা সাহিত্যে কতকগুলি বিদেশীভাব আসিতেছে। বিভিন্ন আদর্শের সংঘর্ষের মধ্যে একপ্রকার ভাবের প্রতিপত্তি লাভ করা বিচিত্র নহে। এখন আমরা শুনিতেছি, আসল সভ্যভাব হইতেছে এইগুলাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সাহিত্য-তত্ত্বও জাগিয়া উঠিতেছে, যে সাহিত্যে এই সকল ভাবের প্রকাশ তাহা লোকসাধারণ আয়ত্ত করিতে পারিবে না। তাহাই উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, এবং তাহাতে লোকসাধারণের অধিকার নাই। লোকসাধারণ এই ভাবসমূহের সাধনা না করিলে এ সাহিত্য বুঝিবে না। চার আনায় যাহারা জানে না তাহাদের নিকট চার গুণগান করার মত taste create করিবার এই আয়োজন।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবনের বিরোধ

বর্ত্তমান নাগরিক সাহিত্য দেশের concrete বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে নাই। বিদেশী সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়া সে আপনার কল্পনার দ্বারা একটা অবাস্তব জীবন তৈয়ারী করিয়াছে। কল্পনার দ্বারা একটা খাপছাড়া অসামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন তৈয়ারী করিয়া সে তাহাকেই চরম সত্য বলিয়া বরণ করিয়াছে। আমাদের নাগরিক সাহিত্যে নাটক নভেলের কথাবার্ত্তা ভাই ঠিক যেন Drawing room, parlour এর table talk, বিলাতী ধরণের বাক্যালাপ, ঘটনাসমাবেশ বিলাতী ধরণের মত অপ্রত্যাশিত, full of surprises, চরিত্রগুলি একগুঁয়ে, স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক, পরিবার বা সমাজ-ধর্ম্মকে আপনার স্বার্থের মূল্য দ্বারা একবারে ক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের নাগরিক সাহিত্য নাগরিক জীবনের মত দেশের প্রকৃত ও সহজ জীবন হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া দেশের নিকট ক্রমশঃ অপরিচিত হইয়া উঠিতেছে। দেশের জীবনের সহিত সাহিত্যের এই বিয়োগ আমাদিগের নিকট আরও আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে, কারণ আমরা এতকালের পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আদর্শের দ্বন্দ্বের পর একটা সমন্বয় সাধনের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। নব্য-সাহিত্য এক্ষণে সে সমন্বয় সাধনের পথ ত্যাগ করিয়া বরং পশ্চিমমুখোপথ অবলম্বন করিয়াছে।

ইহার ফল একদিক হইতে দেখিতে গেলে মন্দ নহে। আমরা বিলাতী, ফরাসী,—জাপানী জীবনের আস্বাদ সাহিত্যের ভিতর দিয়া পাইয়া আরও ব্যাকুলভাবে জাতীয় জীবনকে বরণ করিতে শিক্ষা করিতেছি। অপরাপর সভ্যতাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে না অনুভব করিলে আমরা জাতীয় সভ্যতা ও সাধনার গৌরব বোধ হয় আয়ত্ত করিতে পারিতাম না।

সমাজ-সংস্কার নহে, ধর্ম্মের আন্দোলন নহে, নাগরিক সাহিত্যের বিদেশীয়তাই গৌণভাবে আমাদের দেশীয়তার পুষ্টিবিধান করিয়াছে।

বাস্তবিক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে নব-নাগরিক সাহিত্য যে ভাবসম্পদ লইয়া আপনাকে ঐশ্বর্য্যশালী মনে করিতেছে তাহার সহিত আমাদের মানসিক ও অধ্যাত্ম-জীবন কিছুতেই খাপ খায় না, তাহাদের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের ক্রমবিকাশলব্ধ অধ্যাত্মজীবনের বরং চরম বিরোধ রহিয়াছে। এই যে বিরোধ ইহার কারণ কেবল শিক্ষার তারতম্য নহে এই বিরোধের কারণ সভ্যতা ও সাধনার বিভিন্নতা। যে ভাব-সাধনা যে অধ্যাত্ম-শিক্ষা আমাদের চিন্তা ও কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও সমাজের ভিতর দিয়া ইতিহাসে আমাদের প্রাচীন সভ্যতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, যাহা বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনায়ত্ত লোক সাধারণের দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে এখনও সজীব রহিয়াছে, তাহাই এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এক্ষণে নিজে পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিয়া বর্ত্তমান জনসমাজকে আশ্রয় করিয়া আপনার স্বতন্ত্র অপূর্ব্ব বিকাশের সুযোগ খুঁজিতেছে।

অশিক্ষিত জনসমাজ ও জাতীয় সভ্যতা

লোকসাধারণের, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত জনসমাজের হৃদয়ে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ও সাধনা আপনাদের গৌরব অটুট রাখিয়াছে। সহরের আফিস, আদালতে, ইস্কুল কলেজে সে অনাদৃত, উপেক্ষিত, অপমানিত, নাগরিক জীবনের এক কোণে নির্ভয়ে নির্ব্বিবাদে থাকিবার স্থান সে পায় নাই, সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া সে পথে পথে ঘুরিয়া কত কাঁদিয়াছে, বৃথা আশাভরে আপন সন্তানের মুখোপরে চাহিয়া তীব্র উপহাসের মর্ম্মন্তুদ ব্যথা পাইয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু দেশের তথাকথিত অশিক্ষিত সমাজের বিরাট হৃদয়-সিংহাসনে তাহার স্থান ছিল। সেখানে কৃত্রিমতা নাই, পরমুখাপেক্ষিতা নাই, দাস-সুলভ দুর্ব্বলতা নাই, সেখানে আছে শুধু স্বাধীন জীবনের সরলতা ও সৌন্দর্য্য, সেখানে বাকচাতুরী নাই কূটনীতি নাই, আছে শুধু সহজভাব, সরল প্রকাশ, সেখানে শুধু শুষ্ক জ্ঞান নাই, জ্ঞানের সহিত হৃদয়ের যোগ আছে সেখানে দয়ামায়া কোমলতা আছে, প্রেম ও ভাবুকতা আছে। জাতীয় সভ্যতা সেইখানে আপনার স্থান পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেইখানে আমাদের জাতীয় সভ্যতা ইতিহাস-সঞ্চিত সমস্ত ভাব-সম্পদ লইয়া এখনও নীরবে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতেছে, শান্তির মধ্যে, সংযমের মধ্যে, সরলতার মধ্যে, সহজ ও স্বাধীন প্রেমময় জীবনের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির মধ্যে।

বাহিরের চিন্তা স্রোত হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের যে দোষ হইয়াছে তাহা আমি অস্বীকার করিতেছি না। একটা গোঁড়ামির ভাব, একটা সঙ্কীর্ণতা, আচারের একটা অন্ধ

অনুকরণ আমাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। আমাদের নাগরিক সাহিত্য পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে দীক্ষা লইয়া—এই সঙ্কীর্ণতা এই গোঁড়ামিকে যে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহা আশার বিষয়। বাস্তবিক এতকাল পরে পাশ্চাত্য সভ্যতার শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া ঘোর স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব-দোষ হইবে সন্দেহ নাই।

নকল ও আসল জীবন

কিন্তু আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট শিক্ষালাভ আমাদের নিজেদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ-সাধনের যেন এক উপায় মাত্র হয়। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দাসখত লিখিয়াদিয়াছেন। জাতির প্রকৃত বিশেষত্ব, দেশের আসল মনুষ্যত্ব তথাকথিত শিক্ষিতদিগের মধ্যে বিকাশলাভ করিতেছে না।

দেশের আসল জীবন,—সহজ, সরল, অকৃত্রিম জীবনই স্কুল কলেজের বাকবিতণ্ডা, আফিস আদালতের হাকিমী, আরিজুরী, drawing room, parlour, club-room এর ইয়ারকি, নাগরিক জীবনের হৃদয়হীনতার মধ্যে লোপ পাইয়াছে।

সেই আসল জীবনকে পাই আর এক জগতে,—সেখানে সে এখনও আমাদের পল্লবরা মাঠে, ছায়া ঢাকা খেয়া ঘাটে, বনে খেয়া ফুটিয়ে নিত্য নূতন রসের রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে, সেই সুন্দর রস-ভরপুর মধুর জীবন প্রাতঃকালের অবকাশের মধ্যে কত অল্প-সম্বল ভৈরবী গানে পথহারা পথিক পরাণ—তরুণ হৃদয়কে কাঁদাইতেছে, মধ্যাহ্নের কর্ম্ম ক্লান্তির আবেশে কত আউল কত গম্ভীরা কত বাউল কত প্রসাদীগানে সুধা-তৃষ্ণার অবসন্ন দিতেছে এবং কিন্তু মুখরিত বাজের নিস্তব্ধতার মধ্যে কত রামায়ণ, মহা-ভারত, ভাগবতের কত কাহিনী শুনাইয়া কত সুখ দুঃখের, আশা নিরাশার বিপদ সম্পদের বিহ্বলতা দূর করিতেছে।

আসল সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, এই আসল জীবনকে অবলম্বন করিয়া। নাগরিক জীবন নকল জীবন; তাই নাগরিক জীবন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শুধু নকল সাহিত্যেরই সৃষ্টি করিয়াছে।

অচলায়তন-সাহিত্য

ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। টেবিলে কেরাসিন আলো জ্বলিতেছে। সন্ধ্যা হইতে সকলে মিলিয়া গল্পগুজব করিতেছে। সিগারেটের ধূম, কেরাসিন আলোর তাপ, লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাস সকলে মিলিয়া ঘরটাকে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সাহিত্য চর্চ্চা এইরূপেই নাগরিক জীবনের বদ্ধ অচলায়তনের তাপ ও গ্লানি সঞ্চয় করিয়া দূষিত হইয়া পড়িতেছে। সমাজকে যেমন অচলায়তন করিয়া ফেলা অসহ্য হয় সেরূপ সাহিত্যকেও অচলায়তন করিয়া ফেলিলে তাহাও অসহ্য,—জীবন ও স্বাস্থ্য বিকাশের প্রধান অন্তরায়; কিন্তু বদ্ধ অচলায়তনের নব্য সাহিত্য এখন বলিতেছে, দরজা জানালা খুলিয়া কাজ নাই, দুরন্ত বাতাস আলো নিবাইয়া দিবে, বদ-রসিক অসমঞ্জসার পাড়ার লোক ঢুকিয়া ঘরের মজলিস একেবারে মাটী করিয়া দিবে। তাহার অহঙ্কার হইয়াছে, আসল সভ্য ও সৌন্দর্য্য খোলা আকাশ, বাতাস, মাঠ, ঘাট ত্যাগ করিয়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে,

এবং যতই এই অহঙ্কার বাড়িতেছে ততই সে আপনার বাহিরের ঐশ্বর্য আড়ম্বরের,—শিল্প চাতুরীর দিকে মন দিয়া আসল সত্য ও সৌন্দর্য্যের গৌরব খর্ব্ব করিতেছে। শুধু তাই নহে, অহঙ্কার-স্ফীত হইয়া সে বদ্ধ ঘরের তাপ ও গ্লানি সত্য ও সৌন্দর্য্য বলিয়া সকলকে পান করিতে বদ্ধ-পরিকর।

ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া দাও। বাহিরের মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে সমস্ত গ্লানি দূর হইবে। বদ্ধ চিত্তকে মুক্তি দিয়া সাহিত্য এখন বাহিরের বিশ্বজোড়া প্রাণ অনুভব করুক। সে যে তাহারি প্রাণ, তাহার যুগ যুগান্তকালের ইতিহাসের ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত প্রাণ, জাতির ক্রমবিকাশের সহিত যে তাহার শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায় যোগ রহিয়াছে। সাহিত্য এই যোগ অনুভব করুক। সাহিত্য আপনার বদ্ধ চিত্তকে জাতির সত্য ও সৌন্দর্য্যালোকে জাগ্রৎ চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করুক, তখন তাহার সমস্ত পাপ গ্লানি খোলা আলো বাতাসের পুণ্যস্পর্শে এক মুহূর্ত্তে বিলীন হইবে।

সাহিত্য—দেশী বিদেশী

বদ্ধঘরের পাপ ও গ্লানির মধ্যে সাহিত্য যে মাঝে মাঝে বাহিরের জাতীয় চৈতন্যের সহিত পরিচয় লাভ করে নাই তাহা নহে। প্রায়ই বিদেশীয় চৈতন্যপ্রভাবে দেশীয় চৈতন্য একেবারেই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বিলাতী ও দেশীয় চৈতন্য বেশ মিশিয়া একটা সুন্দর ও নূতন সৃষ্টিও হইয়াছে, আবার সময় সময় মেলামেশাটা সম্পূর্ণ হয় নাই তখন সামঞ্জস্য না হইয়া একটা খিচুড়ী হইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের উইলের মত অমন ঝোরালো বই আমাদের সাহিত্যে নাই বলিলেও চলে। অথচ ইহা একদম Romolaর বাঙ্গালী সংস্করণ। "গোরায়" আমরা বিদেশীয় nationalismএর স্বদেশী সংস্করণ দেখিতে পাই বটে কিন্তু ইহা যে স্পষ্ট বিদেশী তাহার প্রমাণ হিন্দুত্ব-প্রচারক গোরার আইরিশ জন্ম। মেঘনাদ বধে আমরা মিল্টনের সয়তানকে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া পূত করিয়া লইয়াছি; কুরুক্ষেত্রে, বৈবতকে আমরা কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে গড়ন নদীতে চুবাইয়া আনিয়াছি। এমন কি বেদব্যাস বৈপায়নকে শ্বেতদ্বীপ-তীর্থে পার্কার ও নিউম্যানের বক্তৃতা মুখস্ত করিয়া আসিতে হইয়াছে। 'বৃত্র-সংহারে' দেবগণের ঘটনা—Paradise lostএর infernal crewর বঙ্গে আগমন।

আবার বিদেশী ও দেশী ভাবের একত্র সমাবেশে খুব জোরালো লেখার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যথা—দুর্গেশনন্দিনী, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি, নৌকাডুবি ইত্যাদি। "দুর্গেশ-নন্দিনীর" আয়েষার পার্শ্বে আমাদের সূর্য্যমুখী, কমলমণি আছে। চোখেরবালির বিনোদিনীর পার্শ্বে আমাদের আশা আছে। নৌকাডুবির হেমনলিনীর পার্শ্বে আমাদের কমলা আছে।

আবার আমাদের নিখুঁত দেশীভাবের সৃষ্টিও আছে। রবীন্দ্রবাবুর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' ও রাজর্ষিতে তাহা কিছু পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর ছোট গল্প, 'দিদি', 'সমাপ্তি,' 'কাবুলওয়ালা,' 'ছুটি,' 'প্রত্যাবর্ত্তন,' 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতিতে তাহা lyricএর শক্তি ও সৌন্দর্য্য লইয়া অতি সুন্দরভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে। নাটকের মধ্যে আমাদের লীলাবতীর পার্শ্বে নীলদর্পণ আছে, আমাদের প্রফুল্ল, বলিদান, পরপারে আছে। আমাদের স্বর্ণলতা আছে, পল্লি-

কানন আছে, শুভবিবাহ, ক্রয়তারা আছে। আমাদের দিদি আছে। আমাদের বিন্দুর ছেলে, বিভুদাদা, ছোটকাকী আছে। আছে, কিন্তু বেশী নাই।

নিখুঁত দেশীভাবের বইয়ের মধ্যে প্রায় সবেতেই মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত সমাজের চিত্র; চিত্রপট খুব ছোট, দেশের শ্রমজীবিগণ একবারেই বাদ পড়িয়াছে। যাহাদের লইয়া দেশ তাহাদের সহজ ও স্বাধীনজীবন আমাদের এই কৃত্রিম হাতে গড়া পোষাকী সাহিত্যে কি করিয়া থাকিতে পারে?

বহুকাল ধরিয়া টেবিল, চেয়ার, আরাম-কেদারা আশ্রয় করিয়া আমরা Scott, George Eliot পড়িয়া উপন্যাস লিখিতেছিলাম, Byron ও Tennyson পড়িয়া কাব্য লিখিতেছিলাম, Moliere, Sheridan পড়িয়া নাটক লিখিতেছিলাম। আজ এখনও আমরা Scott, Byron ও Shelleyর যুগ অতিক্রম করিয়া Tolstoy ও Ibsen পড়িয়া নভেল তৈয়ারী করিতেছি, গল্পে "Dauded ও Maupassantকে" ফুটাইয়া তুলিতেছি। "Materlink ও Strindburgএর" শিষ্য হইয়াছি। নাটক লিখিতে যাইয়া আমরা একবারে মোগল বাদশাহের দরবারে যাইয়া হাজির, আমাদের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ নাই, যেন ভাল মন্দ সুখ দুঃখ যাহা কিছু সবই ছিল সেই ঐতিহাসিক যুগে,—পাঠান ও মোগল রাজত্বের সময়ে। এমন কি পাঠান মোগল চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়াও আমরা ঐতিহাসিক ভাব রাখিতে পারি নাই। যেমন সাজাহান চিত্রিত করিতে যাইয়া আমরা King Learকে আমদানী করিয়াছি। এতই আমাদের বিদেশীর মোহ। তাই আমাদের আসল সাহিত্য বেশী জন্ম লয় নাই।

শাক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সার্ব্বজনীনতা

প্রায় চার শতাব্দী হইল একবার আমাদের এই দেশে, বাধা বন্ধন, কৃত্রিমতার মধ্যে পরাধীনতার পাপে দুষিত বদ্ধ জীবনের মধ্যে, এমন একটা ভাবুকতার ঢেউ উঠিয়াছিল যাহা উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাধারণ, অসাধারণ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের হৃদয় তোলপাড় করিয়া একটা জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে আন্দোলনে অধিকারভেদ, জাতিজাত্য ছিল না, সকলের অধিকার, সকলের মনুষ্যত্বের গৌরব অটুট ছিল। সে আন্দোলন একই সঙ্গে ধর্ম্মের পরোক্ষবাদ, সাহিত্যের সৌন্দর্য্য, ও সমাজের স্বাধীনতাকে আশ্রয় করিয়াছিল। সমস্ত কৃত্রিমতা সমস্ত পরাধীনতার মধ্যে তাহা একটা সরল, মুক্ত ও সুন্দর জীবনের সৃষ্টি করিয়া আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর মন প্রাণকে গঠন করিয়া আসিতেছে। সেই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার মূল হইতে বাঙ্গালী আজও তাহার সাধনার শক্তি সঞ্চয় করিতেছে। তখন বাঙ্গালীর সাহিত্যের সহিত জাতীয় সাধনার কার্য্যকরণ যোগ ছিল। সাহিত্য একটা অবাস্তব খাপ-ছাড়া সৃষ্টি ছিল না। একটা concrete অধ্যাত্ম জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে সাহিত্যে অধিকারভেদ ছিল না, কারণ সে সাহিত্য যে মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, মনুষ্যত্বে সকলের অধিকার, কাহারও অনধিকার নাই। সে সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল শুধু ব্রাহ্মণ নহে, হীন কামার, দোকানদার, চাষী, ধোপা পর্য্যন্ত। ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের সঙ্গে রজকিনী রামীও সে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ধর্ম্মের

ভাবুকতা, সমাজের বাধাবন্ধনবিহীনতার মত সে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য একটা সত্য অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা লইয়া সমগ্র জাতির হৃদয় আন্দোলিত করিয়াছিল এবং তাহাকে মুক্ত জীবনের পরিচয় দিয়াছিল। সে মুক্ত জীবনের মনমুগ্ধকর বাঁশীর সুরে সমগ্র জাতীয় হৃদয় আকুল আবেগে পাগলিনী রাধার মত ছুটিয়াছিল।

স্বদেশাত্মা ও সাহিত্য-শক্তি

আজ এই দুর্দ্দিত জীবনের পাপপঙ্কের মধ্যে, এই বাধাবন্ধন, কৃত্রিমতার মধ্যে,—সেই সহজ-সরল মুক্ত জাতীয় জীবন প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও স্বাধীনতার দিক দিয়া আমাদিগের সাহিত্যকে বন্ধন হইতে মুক্তি দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। আমাদের জাতীয় হৃদয়-যমুনার তীরে আমাদের স্বদেশাত্মা সেই পরম মোহন সাজে সাজিয়া তমালতলে দাঁড়াইয়া আছেন। সেই মনপ্রাণ পাগল করা বাঁশী বাজিয়াছে। আমার জাতীয় জীবনের নিখিল-রসাত্মিকা চিত্তময়ী সাহিত্যকে আর কেহ ঘরে বন্ধ রাখিতে পারিবে না, জাতি কুল, মান অভিমান, লজ্জা ভয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া সে সেই গোচারণ মাঠের রাখাল, খেয়াঘাটের মাঝি, তমালতলের বংশীধারীর দিকে ছুটিবেই,—বিশ্ব-প্রাসিনী শক্তির লীলা দেখাইয়া ছুটিবেই শ্রীমঙ্গে নিখিল সৌন্দর্য্যের সুষমা ধরিয়া, অন্তরে পরম জ্ঞানের অগাধ আনন্দ লইয়া, হৃদয়ে অসীম প্রেমের অবাধ উচ্ছ্বাস লইয়া। সেই গোচারণ মাঠই যে আমার জাতীয় জীবন দেবতার ক্রীড়াভূমি, সেই তমাল ছায়াই যে আমার চিরকিশোরের বিলাসক্ষেত্র, আর সেই কল্লোলিনী যমুনার লীলা লহরী আমার চিরলীলামঞ্চের নিত্য-তরঙ্গিত ভাবস্রোত। আমার লোক-ললামভূতা, নিখিল জ্ঞান-প্রেম-সৌন্দর্য্যময়ী সাহিত্য-স্বরূপিণী ভাবাত্মিকা আরাধিতা শ্রীরাধিকা যখন সেই বংশীধারীর চরণে আত্মনিবেদন করিবে, তখন সে জানিবে যে তিনি শুধু রাধিকাহৃদিবল্লভ নহেন, এমন কি গোপী-জন-বল্লভও নহেন, তিনি জগন্মোহন, নিখিল-মনমোহন। তিনি শুধু তমালতলে, গরুচরা মাঠে, খেয়াঘাটে থাকেন না, নিখিল বিশ্বের হৃদয় দ্বারকায় তাঁহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত, নিখিল বিশ্ববাসীর অন্তরে ধর্ম্ম-কুরুক্ষেত্রের তিনিই অধিনায়ক।

যিনি গোপগৃহে জাত রাখাল বংশীধারী, তিনিই মথুরার রাজা, তিনিই যুগে যুগে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের সংস্থাপক। বঙ্গের ভাব-ময়ী রাধা তাঁহার হৃদয়-সঙ্গিনী, পাশ্চাত্য কল্পনা রঙ্গময়ী কুব্জা তাঁহার চিত্তবিনোদনের সেবিকা মাত্র।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

সমাজ ও সেবা*

১। প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

ভারতীয় সমাজ বহুদিন তৃষিত চাতকের ন্যায় উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে; গত দশ বৎসর যাবত শুরু শুরু রবে মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতেছে এবং স্থানে স্থানে অল্প-বিস্তর পরিবর্ষণও হইতেছে। ভারতের সর্ব্বত্রই

* প্রেমাঙ্কুরের মাসিক সভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

এক নবজাগরণ লক্ষীভূত হইতেছে ; যাঁহারা জীবনে কোন দিন দেশের কথা, সমাজের কথা, পরার্থের কথা স্বপ্নেও আলোচনা করেন নাই, তাঁহারাও আজ সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য উৎকণ্ঠা ও আগ্রহ দেখাইতেছেন। এই দেশময় উদ্দীপনা ও সমবেদনা বড়ই আশাপ্রদ। এই উদ্দীপনার ফলে দেশে ছোট বড়, মাঝারী নানারকমের দেশহিতকর সভা সমিতির অনুষ্ঠান হইতেছে। সমাজদেহের যে কোন স্থানের বেদনা যেন সকলেই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং অনুভব করিয়া তাহার প্রতীকারের অভিলাষে নানাবিধ হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেছে। এই সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান সমাজের সেবার ভাব, এই আত্মসেবার গণ্ডী অতিক্রমকারী পরোপকারের প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিস্তার বিকাশ এবং সফলতা লাভ করুক। দেশের ও সমাজের কথা ভাবিবার রুচি এবং অবকাশ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা এই কয় বৎসর এই নব ভাব ও নব অনুষ্ঠানসমূহের প্রকৃতি, পরিচালন পদ্ধতি এবং পরিণতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন এ বিষয়ে যে যে কথা আমার চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ হইলে জ্ঞানবৃদ্ধ দেশের কাজে ঘুণধরিত-মগ্ন সমাজসেবকদিগের কোন কাজে আসিবে না সত্য, কিন্তু আমারই মত সমাজের সেবাকার্য্যে শিক্ষানবীসগণের সমাজ ও স্বদেশ বিষয়ক চিন্তার কথঞ্চিৎ সহায়ক হইতে পারে এই আশাতেই এসব কথা লেখা। সুধীগণ সর্ব্বত্রই গুণগ্রাহী এবং দোষ-ত্যাগী, আশা তাঁহারা চপলতাজনিত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

২। বিষয়

সমাজ ও সেবা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, সেবা কি, সেবাকার্য্যের অধিকারী কে, সমাজের সঙ্গে সেবার কি সম্পর্ক, সমাজের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির কি কর্ত্তব্য, বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে সেবার প্রয়োজন আছে কি না, থাকিলে তাহার উপযুক্ত বিধান হইতেছে কি না, আমাদের সমাজে সেবার প্রকৃত অধিকারী, প্রকৃত সেবকের অভাব অথবা প্রাচুর্য্য, বর্ত্তমানে কোন্ ভাবের সেবার নিতান্ত প্রয়োজন, কি কি উপায়ে এই সেবাকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এই সমস্ত বিষয়ের বিশদরূপে আলোচনার দরকার। এই সকল গুরু বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার সময় বা স্থান এই নহে, এবং তাহার উপযোগী শক্তিও আমার নাই। আমি মোটের উপর এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

৩। সেবার সংজ্ঞা

এক কথায় বলিতে গেলে পরের অভাব পূরণের চেষ্টা সেবা। নিজের অভাব পূরণের চেষ্টাকে আত্মসেবাই বলা হইয়া থাকে। এই আত্মসেবা নরের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য, তথাপি যাহারা শুধু আত্মসেবাতে নিযুক্ত তাহাদিগকে লোকে স্বার্থপর এবং অন্যান্য প্রকৃতিকটু বিশেষণে বিশেষিত করিয়া থাকে। সামর্থ্য সত্ত্বেও যে লোক শুধু আত্মসেবাতেই স্বীয় সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া থাকে, পরের কথা সমাজের কথা ক্ষণতরে বিন্দুমাত্রও মনে করে না তাহাদের প্রতি স্বার্থপর বিশেষণ অযথার্থ বটে কিন্তু অন্যত্র আত্মসেবাকেও সমাজসেবার প্রধান অঙ্গ মনে করা উচিত। যে লোক নিজে শক্তি অথবা সুযোগের অভাববশতঃ সমাজের কোনরূপ অভাব দূর করিতে পারে না, সে যদি নিজের অভাবসমূহ নিজেই পূরণ

করিতে পারে, যদি তাহাকে নিজের অভাব-মোচনার্থে সাহায্য প্রার্থনার জন্য সমাজের দ্বারস্থ হইতে না হয়, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সে সমাজেরই সেবা করিতেছে। আমার অভাব যদি আমি নিজেই পূরণ করিতে পারি, সমাজকে যদি আমার জন্য বিব্রত হইতে না হয়, তবে সমাজ অন্য দিকে অন্য লোকের উপকার করিবার অবসর পাইবে। সমাজ কোন ব্যক্তি বিশেষ নহে; তাহার নিজের কোন অভাব নাই; পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ; আমার অভাবেই সমাজের অভাব; আমার প্রতিবেশীর অভাবও সমাজেরই অভাব। যদি আমি আমার অভাব মোচনে সক্ষম হই, তবে আমার দ্বারা সমাজের সেই পরিমাণ অভাব দূর হইল, আমি সমাজের ততটুকু সেবা করিলাম। পক্ষান্তরে সমাজও অভাবগ্রস্ত আমার প্রতিবেশীর হিতসাধনে অধিকতর সুবিধা পাইবে। আত্ম-সেবার দ্বারা সমাজের যে সেবা হয় অনেকেই তাহা স্বীকার পাইতে চাহেন না, তাহার মূল্য এক কাণাকড়িও দিতে চাহেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে পরসেবার মধ্যে প্রাণ ও মনের তৃপ্তিকর উদার ও মহৎ ভাব আছে, আমার চক্ষে সাধারণতঃ তাহা দ্বারাই মুগ্ধ হই কিন্তু সমাজের চক্ষে আত্মসেবারও যে উপযোগিতা পরসেবা অপেক্ষা কম নহে, তাহারও যে অন্য দিক্ আছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। সেবা অর্থে সাধারণতঃ আমরা যাহাই বুঝি সমাজের সেবার কথা বলিতে গেলে পর-সেবার সঙ্গে আত্মসেবাকে তুল্যস্থান দিতে হইবেই, শক্ত্যনুসারে উভয়ই কর্ত্তব্য।

৪। সেবার প্রয়োজন

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি নিজ নিজ অভাবমোচনে সক্ষম হইত, এবং সেই অভাব-মোচনে সচেষ্ট থাকিত তাহা হইলে সেবা—অর্থাৎ পরসেবার কোনই প্রয়োজন হইত না। সাধু সন্ন্যাসীগণের অভাব কম, যাহা আছে, তাহাও পূরণ করিতে তাঁহাদের অন্যের সাহায্য লইতে হয় না, তাই তাঁহারা কোন সমাজের গণ্ডীর ভিতর থাকেন না। কিন্তু জনসাধারণের সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য হইতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায় কোন ব্যক্তি একা নিজের সমস্ত অভাব পূরণ করিতে সক্ষম নহে। বহুলোকে যে একত্র এক সমাজবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে তাহার অনেক কারণ আছে। সমাজ গঠনের মূলে যে শুধু মানবের আত্মবিলাসই বর্ত্তমান্ তাহা নহে; পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অভাব দূরীকৃত হইবে এই আশা যে সমাজ-বন্ধনের এক প্রধান গ্রন্থি তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। সমাজ প্রথম গঠিত হইবার সময়ে তাহার প্রতিষ্ঠাতাগণ বাস্তবিকই যে এইরূপ পরস্পরের সাহায্য করিবার সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া সমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারা যে প্রকৃতই Social contract সহি করিয়াছিলেন এমন কথা বলা অন্যায়। কিন্তু ঐরূপ কোন চুক্তি না থাকিলেও, তাহারা যে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকার সুবিধা এবং উপকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—মানুষ একা আত্মরক্ষা, বলবানের উৎপীড়ন, এবং স্বীয় বহুবিধ অভাবের কোনটাই যে মোচন করিতে পারে না, পরন্তু সমাজের সঙ্ঘ হইলে সমাজের সহায়তায়, পরস্পরের সাহচর্য্যে এই সমস্ত অভাবই নিবারণের সম্ভাবনা আছে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই যে তাঁহারা নরের সহজ স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ ও সীমাবদ্ধ করিয়াও সমাজের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে দ্বিমত হইতে

পারি না। আহার বিহার, শিক্ষা সভ্যতা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই মানুষ তাহার নিজের অসম্পূর্ণতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়া থাকে; আমরা সমাজের ক্রোড়ে আছি বলিয়াই মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মত সেই সকল অভাব অনেক সময়েই অনুভব করি না। সেটি সমাজের গুণ, আমাদের গুণ নহে। সমাজের বন্ধন বড়ই বিচিত্র। যে দ্যূত সমিতিতে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির হইতে শকুনি ও দুঃশাসন; বেদবেদাঙ্গপুরাণ স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে হীনবৃত্তি দস্যু, তস্কর ও বারবনিতারও স্থান আছে, তাহা কোন্ বিচিত্র নিয়মে, কি ভাবে সামঞ্জস্যের সহ পরিচালিত হইতে পারে তাহা ভাবিয়া স্থির করা সহজ নহে। বর্ত্তমানে আমার সে ভাবনার দরকারও নাই। আমি এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চাই যে মানুষ প্রথম যে সমাজের বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিয়াছিল তাহার বহুবিধ কারণের মধ্যে এই একটি প্রধান কারণ যে সে বুঝিয়াছিল যে যদিও সমাজে প্রবেশ করিলে তাহার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে, তথাপি ঐ স্বাধীনতার কিয়দংশ ত্যাগ করিয়াও বাকীটুকু যাহাতে ভালরূপে সম্ভোগ করা যায়, একা থাকিলে সে সব অভাব পূরণের মোটেই সম্ভব নাই—তাহারও যাহাতে অনায়াসে সঙ্কুলান হইতে পারে, সে জন্য সমাজের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া দরকার; সেখানে স্বাধীনতার হিসাবে যেটুকু ক্ষতি; সমাজের প্রবল আশ্রয় এবং অন্যোন্যের সহায়তায় অন্যদিকে তেমন তাহার অনেকগুণ লাভ। লোকে একটা বিশেষ লাভ না দেখিয়া স্বীয় স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করিতে চাহে না। এখানে সমাজ তাহার রক্ষণাবেক্ষণের এবং অভাব মোচনের ভার লইবে এই আশাতেই মানুষ প্রথমতঃ সমাজে প্রবেশে অভিলাষী হইয়াছিল। এই হিসাবে সমাজের পরস্পরের অভাব মোচন আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্য। অর্থাৎ সমাজের সেবা আমরা যেটুকু করি সেটুকু যে নিতান্তই পরহিতৈষণা প্রবৃত্তির দ্বারা প্ররোচিত হইয়া সমাজের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ করিয়া থাকি তাহা সত্য নহে; সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আছে তাহা বিস্মৃত হইয়াই ঐরূপ সমাজসেবাকে আমরা "অনুগ্রহ" মনে করি। সমাজের প্রতি আমাদের যে ঐ কর্ত্তব্য আছে তাহা আমরা ভুলিয়া যাই, অথবা আত্মসেবাতে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য এতই ব্যয়িত হয় যে আমরা সেই কর্ত্তব্য সাধনে যত্নশীল হইতে পারি না। সমাজ যদি কড়ায় গণ্ডায় আমাদের নিকট হইতে তাহার পাওনা বুঝিয়া লইত তবে অনেককেই বিপদ্ গণিতে হইত। কিন্তু বড়র অনেক সহে। সমাজ অতি বৃহৎ, আমরা তুলনায় তৃণাদপি ক্ষুদ্র। সমাজের যতটা সহ্য হয় আমাদের তাহার শতাংশও সহ্য হয় না। সমাজ দয়া করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া দেয় বলিয়াই যে তাহার প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই তাহা মনে করা নিতান্তই অন্যায়।

৫। সমাজ, সেবা এবং মানবের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্ক

বনবিহারী সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতির সঙ্গে বিচরণশীল, স্বেচ্ছাচারী, পরস্পরের হিংসারত মানবগণকে এক সুদৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিয়াই কি সমাজ চুপ করিয়া বসিয়া আছে? যে সুখ সুবিধার আশায় বিভিন্ন প্রকৃতির নরগণ পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বার্থ লইয়াও সমাজের নিকট বাঁধা পড়িতে গেল, সমাজ তাহাদের সেই আশা পূরণের জন্য কি চেষ্টা করিয়াছে?

ফলের দ্বারাই বৃক্ষকে জানা যায়। যে বনস্পতি বহু সহস্র বৎসর শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক বহু যোজন ভূমিতে ছায়া দান করিতেছে, যাহার ঘনসন্নিবিষ্ট পল্লবরাজির মধ্যে, বহু দূর দেশ হইতে দিক্ দিগন্ত হইতে নানা জাতির, নানা বর্ণের বিহঙ্গম আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে যে উক্ত আশ্রয় প্রদানের উপযুক্ত শক্তি বর্ত্তমান তাহা কাহাকেও চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সমাজরূপ বনস্পতিও বহু সহস্র বৎসরের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে। যাহারা লাভের আশায় স্বীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়াও সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাত সমাজে রহিয়াই গেল, পরন্তু তাহাদের পরবর্ত্তী জনগণ সকলেই সমাজের কঠোর শাসন মাথায় পাতিয়া লইয়া তাহার ভিতরে বাস করিতে লাগিল। সমাজ যদি তাহাদের আশার অনুরূপ তাহাদিগকে আশ্রয় দান এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে অক্ষম হইত তাহা হইলে এতদিন এই সমাজ-গৃহের এক খানা ইষ্টকও দেখা যাইত না, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি যথাভীষ্ট দিকে চলিয়া যাইত। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে নরগণ সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে নাই, কিসে সমাজের নিকট হইতে ষোল আনা কাজ আদায় করিয়া লইতে পারিবে সে বিষয়েই তাহারা পূর্ব্বাপর বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের সে চেষ্টা বহু পরিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছে। সমাজের নিকট হইতে কাজ আদায়ের অর্থ সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেকের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য গ্রহণ করা। আমার একার সাহায্যে যে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার সম্ভব নাই, সমাজের সকলের সাহায্যে তাহা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। এইটিই সমাজের বিশেষত্ব, এই খানেই সমাজের উপদেশ। ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজের নিকট কতকগুলি বিষয় দাবী করিবার অধিকারী, সমাজ তাহা দিতে না পারিলে সমাজের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সমাজ সে সকল দাবী পূরণ করিবার জন্য, অন্য লোকে অথবা অন্য সমাজে যাইবে না, যাহাদের দ্বারা সমাজ গঠিত, সমাজের উপর যাহাদের দাবী আছে সমাজ তাহাদের নিকট হইতেই ট্যাক্স তুলিবে, তাহাদের নিকট হইতেই প্রকারান্তরে কিছু কিছু আদায় করিয়া নিজের শক্তি সঞ্চয় করিবে। সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে অল্প অল্প করিয়া যাহা আদায় করে তাহাই সমষ্টিতে সমাজশক্তিরূপে প্রকাশ পায়; তাহারই জোরে সমাজ পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির দাবী ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে সমর্থ হয়। এই আদান প্রদানের উপরই সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সমাজের উপর মানুষের যে সকল দাবী তাহাকে তাহার সামাজিক অধিকার, আর মানুষের উপর সমষ্টিরূপে সমাজের যে দাবী তাহাকে মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যাইতে পারে। আগেই বলিয়াছি সমাজ বৃহৎ, আমরা ক্ষুদ্র। বৃহত্তের উদারতা অনেক বেশী; তাই সমাজ যাহা প্রতিজনের নিকট হইতে দাবী করিয়া লইবার অধিকারী, তাহা সে তেমন জোর জবরদস্তি করিয়া ত নেই-ই না, বরং যখনই তাহা নরের নিকট হইতে স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত হয় তখনই তাহাকে সেবা বলিয়া আখ্যাত করে। অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহারই নামান্তর সেবা। তাহা হইলে এতক্ষণ যত কথা বলিলাম তাহার সারতত্ত্ব এই দাঁড়াইল যে সমাজে ঢুকিবার সময়েই

আমরা পরস্পরের অভাব নিবারণ করিব, এই আশা এবং প্রকারান্তরে অঙ্গীকার করিয়াই সমাজবদ্ধ হইয়াছিলাম; সেই অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টাই হইল সেবা, এবং যে প্রকারেই হউক যখন সেবা আমাদের অঙ্গীকারের বিষয়, তখন তাহা কর্ত্তব্যও বটে। সামাজিক কর্ত্তব্য ও সেবার নামে ভিন্ন অন্যত্র প্রভেদ নাই। সমষ্টি ভাবে যাহাকে সমাজ বলি তাহার সঙ্গে মানবের সঙ্গে সেবার এবং সেবার সঙ্গে সমাজের এই যে পরস্পর সম্পর্ক ইহাই সমাজ-বন্ধনের মূল। এই সম্পর্ক ভুলিয়া গেলে অনেক কথারই সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং সমাজেও বিশৃঙ্খলতার উদয় হয়।

৬। প্রাচীনকালের সামাজিক ব্যবস্থা

সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সমাজের যে কর্ত্তব্য আছে তাহা প্রাচীন হিন্দু সমাজে বিশেষরূপে বিদিত ছিল। তখন রাজাই ছিলেন সমাজের নায়ক; সমাজের নিকট ব্যক্তিবিশেষের যে দাবী তাহা রাজার নিকটই করিতে হইত এবং তিনি তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন। রাজা সমাজ-সংহতির কর্ত্তা এবং মুখপাত্র ছিলেন। কিন্তু রাজা একক সকলের নিকট হইতে সমাজসেবা সম্যকরূপে আদায় করিতে না পারেন, এবং রাজপরিবর্ত্তনে সমাজের স্থিতির ব্যাঘাতক কোন বিশৃঙ্খলা না হয়; বিভিন্ন নরপতির পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ সমাজের কোনরূপ অনিষ্ট না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাচীন সমাজের পরিচালকগণ ধীর মনে চিন্তাপূর্ব্বক সমাজে বহুবিধ সুনিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ফলে সমাজের প্রধান প্রধান কাজ যেন স্বতঃ পরিচালিত হইয়া সম্পন্ন হইত। সামাজিক বিধান অনুসারে অধ্যাপনা বিদ্যানের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং সমাজস্থ অর্থশালী ব্যক্তিগণ ক্রিয়া কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ উপলক্ষে সেই সকল পণ্ডিতের সম্মাননা এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিতেন। সেইরূপ ধর্ম্ম-ব্যবসায়িগণেরও বৃত্তির অভাব হইত না। বর্ত্তমানকালে মুখ্যতঃ রাজসরকার হইতেই পণ্ডিত ও ধর্ম্মযাজকগণের বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়া থাকে; কিন্তু তখন সমাজ নিজেই এসমস্তের ব্যবস্থা করিতেন। এ ব্যবস্থার ফলাফল সকলেই অনুভব করিয়া থাকি। ভারতবর্ষে যেরূপ রাজপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে সমাজ যদি নিজে স্বীয় অভাব পূরণের ব্যবস্থা না করিত তবে এত-দিনে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ও প্রাচীন ধর্ম্ম-চর্চ্চা একবারেই বিলুপ্ত হইত। ইহা ছাড়া অভাবগ্রস্ত নরনারীর সহায়তা করা সকলেই নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। তাই অতিথি দীন দরিদ্র কাহারও দ্বারস্থ হইলে কখন নিরাশ হইয়া ফিরিত না। এইরূপে নানাভাবে নানাকাজে সমাজ নিজের অভাব দূর করিয়া লইত। তখন স্বীয় অভাব মোচনের শক্তি ও প্রবৃত্তি দুইই সমাজমধ্যে বর্ত্তমান ছিল।

৭। বর্ত্তমান্ সমাজের অবস্থা

সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। এখন সখেদে প্রশ্ন করিতে হয় "যদুপতেঃ ক্বগতা মধুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তর-কোশলা"? জগতের সকল পদার্থই পরিবর্ত্তনশীল; কালবশে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। আমাদের সমাজপ্রতিষ্ঠার পর কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল

প্রভাবে আর্য্য সমাজের অবস্থা যে বিশেষ-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। তবে কবি প্রৌঢ়োক্তি আছে "ভবতি বিজ্ঞতমোঃ ক্রমশো জনঃ" সে হিসাবে সমাজের পরিবর্ত্তন ক্রমেই উন্নতিমুখী হওয়া উচিত, এবং তাহা হইলেই বিশেষ আনন্দের কথা হইত। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে আমাদের সামাজিক পরিবর্ত্তনাদি বিপরীত দিকেই হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে সমাজে অভাব অনেক কম ছিল। জন প্রবাহের প্রধান অভাব যাহা, যাহার জন্য বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাতিতে জাতিতে সমাজে সমাজে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, দ্বেষা-দ্বেষি, দ্বন্দ্ব কলহ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হইতেছে, সেই অন্নাভাব মোটেই ছিল না। অন্ন-সংস্থানের প্রশ্নই সামাজিক সমস্ত সমস্যার মূল স্বরূপ, ইহার সমাধান করিতে পারিলেই সহজে সমাজের অন্যান্য অভাব দূরীকৃত করা যাইতে পারে। প্রাচীন সমাজে অন্যান্য অভাব যে অল্প বিস্তর ছিল না এমন নহে, কিন্তু সামাজিক বিধান অনুসারে, ব্যক্তি বিশেষে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সেবাকার্য্য অনুষ্ঠান করিত তাহাতেই অনেকস্থলে সে অভাব দূর হইত। তখন দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুখকর যানবাহন ও রাজবর্ত্ম প্রভৃতির এমন সুব্যবস্থা না থাকাতে বহুলোক একত্র হইয়া সমাজসেবার অনুষ্ঠান করিবার সুবিধা পাইত না সত্য কিন্তু তাহার বড় প্রয়োজনও তখন অনুভূত হইত না। পৃথক্‌ভাবে সমর্থ সামাজিকগণ যেটুকু সমাজের সেবা করিতেন তাহারই অভাব প্রতীকারে সক্ষম ছিল। সমাজের অভাব মোচন করিবার সামর্থ্য এবং রুচি দুইই তখন সমাজের মধ্যে ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইয়াছে। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে অভাবেরও বৃদ্ধি হইতেছে অথচ তাহার প্রতীকারের উপায় তেমন সুলভ নহে। আমরা সাধারণতঃ কৃষিব্যবসায়ী, অন্য কোন ব্যবসাতে পৃথিবীর কোন জাতির সঙ্গে আমরা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছি না, সে কারণ এবং অন্যান্য নানা-বিধ কারণে আমরা দরিদ্রতার আধার হইয়াছি। সাধারণতঃ সমাজের দুই রকম অভাব দেখা যায় (১) মানসিক অভাব অর্থাৎ শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক (২) দৈহিক অভাব অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, ভেষজ, পানীয় প্রভৃতি বিষয়ক। ভাল করিয়া দেখিতে গেলে এই দুই শ্রেণীর অভাব প্রতীকারই অর্থ সাপেক্ষ। শুধু অর্থ থাকিলেই যে এই সকল অভাব দূরীভূত হয় তাহা নহে, কিন্তু অর্থের অভাব হইলে অন্যান্য উপকরণ সত্ত্বেও এই সকল অভাব মোচন হইতে পারে না; যাঁহারা ভালরূপ প্রণিধান পূর্ব্বক আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অভাব ও অভিযোগের কথা আলোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে আমাদের মধ্যে ২য় শ্রেণীর সর্ব্বরকম অভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান, আর শিক্ষা নীতি প্রভৃতি বিষয়ক অভাবও যথেষ্ট আছে। এই সকল ব্যাধি কেবল এক, দুই বা দশজনের মধ্যে আবদ্ধ নহে, ইহা ভীষণ লোকক্ষয়কর মহামারীর মত সমাজের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে, এবং ইহার আশু উপশমের কোন চিহ্নও বর্ত্তমানে লক্ষিত হইতেছে না। এই যে সমগ্রসমাজ-ব্যাপী বহুবিধ অভাব ইহা প্রাচীন সমাজে ছিল না, এবং ইহার প্রতীকারের ব্যবস্থারও প্রয়োজন তখন হয় নাই, প্রাচীন সেবাপদ্ধতি আর এ সকল অভাব মোচনে যথেষ্ট নহে। ব্যক্তি বিশেষের অনুষ্ঠিত সেবাকার্য্য সর্ব্বকালেই

সমাজের হিতসাধক এবং আবশ্যক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তি একক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বেচ্ছানুযায়ী সেবার কাজ চলিতেছে না, অন্য প্রতীকারের চেষ্টা এবং অনুষ্ঠানের অত্যন্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

৮। সেবার দুই ভাব

সমাজের যে অভাবের কথা বলিতেছি তাহার স্বরূপ একটু ভাল করিয়া নির্ণয় করা প্রয়োজন। তৎপূর্বে সেবা সম্বন্ধেই একটি ছোট কথা বলিয়া রাখি। আমাদের দেশে প্রবচন আছে "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।" ভিক্ষা এবং দান দুইটি শব্দই প্রকারান্তরে এক জিনিষের পরিচায়ক। আমি যদি দরিদ্রকে কিছু দান করি, লোকে বলিবে আমি দান করিলাম, দরিদ্র বলিবে সে ভিক্ষা পাইল। ভিক্ষায় যদি নৈব নৈব হয় তবে দানেও তথৈব চ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ভিক্ষার হিসাবে অথবা দানের হিসাবে যে কাজটা করা হয় তাহাতে দান পাত্রের অভাব সম্যক্ মোচন হয় না। কর্তব্যসম্পাদন উপলক্ষে আমি যে অর্থব্যয় করি লোকে তাহাকে দান বলে না; যেমন পিতামাতা ও পরিবারবর্গের প্রতিপালনের যে ব্যয় তাহা দান নহে; পরন্তু পরের অভাবমোচনের জন্য যদি কিছু ব্যয় করি তবেই তাহা দান বলিয়া অভিহিত হইবে। আর পূর্বেই বলিয়াছি দানের দ্বারা কদাচিৎ কোন কার্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়; ফলে আংশিক অভাবের পূরণেই প্রবৃত্ত। কিন্তু কর্তব্যবোধে যে কার্য করা হয় তাহা সাধ্যের অতীত না হইলে প্রায়ই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। দয়া মানবজাতির স্বাভাবিক বৃত্তি, দান তাহার ফল। সেই বৃত্তিবশতঃ প্রত্যেক সমাজেই প্রতিযুগে বহুতর লোক সদাব্রতের পরিচয় দিয়া সমাজের অভাব মোচনের চেষ্টা করিয়াছিল; তাহাদের দানের সুফল ফলিয়াছে; কিন্তু সমাজের অভাব তাহাতে একেবারে দূরীভূত হয় নাই, সে দানের দ্বারা অভাবের মূল উৎপাটিত হয় নাই। দানের প্রকৃতি ও কর্তব্যের প্রকৃতি বিভিন্ন। যদি সমাজের অভাব দূর করা আমাদের কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, তবে ২।১টি সমাজসেবক সমিতিকে সময়ে সময়ে কিছু অর্থ সাহায্য অর্থাৎ দরিদ্রকে দুই দশ টাকা দান করিয়াই আমরা নিরস্ত থাকিতে পারি না; সেই দানের দ্বারা সমাজের অভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইবে না বুঝিতে পারিয়া উক্ত অভাবমোচনের অন্যপন্থা দেখিয়া থাকি। সেই জন্যই আমি বিশেষভাবে এই কথাটি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, যে সমাজের সেবা করা, সমাজের অভাবমোচনের চেষ্টা আমাদের অন্যতম কর্তব্য। পরিবার প্রতিপালন করিলে লোকে যত প্রশংসা না করে সমাজের একটু সেবা করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রশংসা করে; এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে সমাজসেবা আমার কর্তব্য ছিল না তথাপি সম্পন্ন করিয়াছি একারণই লোকে আমার প্রশংসা করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবার প্রতিপালন যেরূপ কর্তব্য, সমাজের অভাবমোচনও সেইরূপই; প্রভেদের মধ্যে এই আমার পরিবার প্রতিপালনের ভার প্রধানতঃ একা আমার প্রতিই ন্যস্ত থাকে, কিন্তু সমাজের অভাবমোচনের ভার আমার মত সমর্থ অন্যান্য সকলেরই প্রতি অর্পিত থাকে। সমর্থ বলিবার কারণ এই যে নিজের অভাব মোচনে অক্ষম সে আবার কিরূপে সমাজের সেবা করিবে, তাহার দুঃখ দূর করাই সমাজের কর্তব্য। দশের কথা বলিয়া সমাজের

কাজ অনেক সময়েই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজের অভাব এখন এরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে এখন আর ইহাকে কোনরূপেই উপেক্ষা করা চলে না। এখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন; এবং যদি সকলে নিজের কর্ত্তব্য বোধে সমাজের সেবায় অগ্রসর হন, তবেই সমাজ পুনর্জ্জীবিত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

৯। সেবার শক্তি ও প্রবৃত্তি

শুধু ধর্ম্মসিদ্ধান্ত করিলেই ধর্ম্ম সাধন হয় না; তাহার জন্য প্রবৃত্তি, শক্তি ও অভ্যাস চাই। সমাজের সেবা করা কর্ত্তব্য কিন্তু আমার সে প্রবৃত্তি নাই, অথবা প্রবৃত্তি থাকিলেও সেবা করিবার শক্তি আমার নাই; এরূপক্ষেত্রে আমার নিকট হইতে কোন কাজই পাওয়া যাইবে না। এই তিনটি একত্র হইলেও সমাজের সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করিতে হইলে শিক্ষা (training) এবং অভ্যাসের প্রয়োজন। যাহাদের কাজ করিবার সামর্থ্য আছে তাহারাও নূতন কাজে ব্রতী হইয়া সহসা আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারে না। কাজে প্রবিষ্ট হইয়া কিছু দিন শিক্ষানবিশী করিলেই তবে সে কার্য্যের জন্য উপযুক্ত হওয়া যায়। এই শক্তি ও অভ্যাসের কথা পরে আবার আলোচনা করিব। বর্ত্তমানে অভাবের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা দেখা যাউক।

১০। অভাবের স্বরূপ

এখানে একজন দরিদ্রের ছেলে, তাহার পরিবারের পোষ্য বেশী, সে একাই উপার্জ্জনশীল; সে কারণ তাহার প্রতিনিয়তই অর্থাভাব; সেখানে একজন অন্নের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নাই, অপর একজন রুগ্ন তাহার শুশ্রূষা এবং পথ্য যোগাইবার লোক নাই, অমুক গ্রামে চিকিৎসক নাই, লোক সকল অচিকিৎসায় মারা যায়; এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার অত্যন্ত অভাব, কথঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিলে তাহারা অবসর সময় আনন্দে কাটাইতে পারে, এইরূপ নানাবিধ অভাব অল্প বিস্তর সকল সমাজেই আছে। কিন্তু সমাজের পৌনে ষোল আনা লোকের অর্থাভাব ও অন্ন কষ্ট; যুবকবৃন্দ উপযুক্ত লেখাপড়া শিখিয়া ও নিজের অভাব পূরণের অনুরূপ কার্য্য পায় না, এমন কি তাহাদের শিক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহাও উপার্জ্জন করিতে পারে না এইরূপ সমাজের মূলঘাতী অভাবের কথা অতি অল্প সমাজেই শুনিতে পাওয়া যায়; দুঃখের বিষয় সেই অল্পসংখ্যার মধ্যে আমাদের সমাজই প্রধান। বলিতে লোকের অন্নগত প্রাণ, সেই অন্নকষ্ট এরূপ বহুবিস্তৃত হইলে লোকসমাজের বাঁচিবার পথ কই। পূর্ব্বে পূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছি অর্থ ও যশের অভিলাষী হইয়া বিদ্যা অনুশীলন করা উচিত নহে, পরন্তু জ্ঞানার্জ্জনে যে বিমল আনন্দ আছে তাহারই জন্য বিদ্যাভ্যাস করা উচিত; এখন আমাদিগকে সে উপদেশ দিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না; কারণ বিদ্যায় যখন অর্থ উপার্জ্জন হয় না, তখন জ্ঞানানন্দের জন্যই আমরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছি, একথা অপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু শুধু মিষ্টি কথায় পেট ভরে না। আমরা চকোর নহি যে চন্দ্রালোক পান করিয়া জীবনধারণ করিব; কবি নহি যে কাব্যরসে বিভোর থাকিব। জ্ঞানার্জ্জনের আনন্দ মনের বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু দেহ তাহাতে বুঝ মানে কই? লোকে জীবন

করিয়া যে বিসর্জ্জন করিল তাহাতে যদি উদরান্নের সংস্থান না হয় তবে সে বিদ্যায়ও ধিক্ জীবনেও ধিক্। এখন এই অন্নকষ্ট দূরীকরণের প্রশ্নই আমাদের সমাজের প্রধান সমস্যা; দেশের লোকদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত রাখা তাহারই আনুষঙ্গিক সমস্যা। এই দুইটি সমস্যা বিভিন্ন নহে, একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বাহিরের লোকে আমাদের অবস্থা দেখিয়া দুইটা ধিক্কার অথবা উপদেশ দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমরা যাহারা সমাজের মধ্যে আছি, যাহারা সমাজের এই অভাব প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপলে অনুভব করিতেছি, তাহারাত নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। আমরা বুঝি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে "মহতী বিনষ্টিঃ"। অতএব ইহারই প্রতিকার চেষ্টা হইতেছে সমাজের প্রকৃত সেবা।

১১। প্রথম শ্রেণীর অভাব

আমাদের সমাজের এই প্রধান অভাবের প্রকৃতি, বিস্তৃতি ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, এতদ্ব্যতীত সমাজের যে সকল অভাব রহিয়াছে, যাহার কথা এই অভাবের কথারই অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিলাম, এবং যাহার পরিমাণ উপেক্ষণীয় না হইলেও এই অভাবের তুলনায় সামান্য, তাহার কথাটা আগে শেষ করা উচিত। সাধারণতঃ সেই সকল অভাবপূরণের চেষ্টাকেই সমাজের সেবা বলা যায়, বর্ত্তমানের মত গুরুতর সমস্যা ও অভাব পূর্ব্বে আমাদের আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি না জানি না। এই ছোট খাট অভাবের কথা বলিলাম, তাহারাও নিতান্ত ছোট নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সকল অভাব মোচনে সহায়তা পাইবে আশা করিয়াই মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে, সমাজও সেই সকল অভাবের প্রতিকারের যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছে। এই অভাবগুলি সাধারণতঃ বহুবিস্তৃত নহে। এখানে আজ ৫ জনের অন্নাভাব, ওখানে ১০ জনের শুশ্রূষার প্রয়োজন, এ গ্রামে জলকষ্ট, পুষ্করিণী খনিত না হইলে চলে না; কয়েকটী দরিদ্র ছাত্রের অশন, বসন, পুস্তকাদির মূল্য চলে না, তাহার জন্য সমাজের সমর্থ পাঁচ জনের কিছু করা কর্ত্তব্য; এক শ্রেণীর লোকের মনের বিকাশ হইবার মোটেই সুযোগ নাই তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে সে সমুদয় দেওয়া দরকার, প্রভৃতি নানাবিধ অভাব সর্ব্ব সমাজেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের সমাজের মূলেই যখন অভাব তখন এ সব অভাবও পূর্ণ মাত্রাতেই আছে। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের বদান্যতা ও পরহিতৈষণা দ্বারা এই সব অভাব অনেক সময়েই অন্ততঃ পক্ষে আংশিকভাবে প্রশমিত হইয়া থাকে। এ সম্পর্কে আমাদের এই প্রশংসাটুকু করিতেই হইবে যে পরের দুঃখে, পরের দুরবস্থা দর্শনে আমাদের সমাজের অনেকেই সাধ্যানুরূপ তাহা মোচনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের সাধ্য বড়ই কম। ব্যক্তি বিশেষের পৃথক্‌ভাবে সেবার দ্বারা যতটুকু অভাব দূর হইতে পারে তাহা আমাদের সমাজে পূর্ব্বাপর হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ সম্যক্ ঘোচে নাই। যেখানে একার শক্তি নিষ্ফল হইয়াছে, সেখানে দশজনের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি কিছু কিছু পতিত হইয়াছে।

সমাজের সেবাকার্য্যে উৎসাহী ব্যক্তিগণের উদ্যোগে দেশের নানা স্থানে এই উদ্দেশ্য সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হই-

তেছে। কোথাও দরিদ্রকে অন্নদানের জন্য দরিদ্রভাণ্ডার, কোথাও সেবা সমিতি, আবার অন্তজ নিম্নশ্রেণী এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সভা, সমিতি এবং সম্মিলনী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা সকলেই নানা ভাবে সমাজের সেবা করিতেছেন, সমাজের পূর্ব্বোক্ত বহুবিধ অভাবের মোচনে প্রয়াস পাইতেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেবাশ্রমসমূহের কার্য্য বিশেষ সুফলপ্রসূ হইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা নগরীতে Depressed classes mission নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের দেশের যে সব শ্রেণীর লোকের ভিতর শিক্ষার আলোক মোটেই প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে বিনা ব্যয়ে শিক্ষা-বিস্তার করা। নমঃশূদ্র, চামার প্রভৃতি অন্তজ জাতির শিক্ষার সুবিধার জন্য ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও যশোহর জেলায় এই সমিতি কর্ত্তৃক অনেক মাইনর ও প্রাইমারি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-গণের উদ্দেশ্য অতীব সৎ, তাঁহাদের সাধু প্রযত্ন সফল হউক। তাঁহাদের সমিতির নাম সম্বন্ধে আমার একটু খট্‌কা আছে, Depressed শব্দটা বাস্তবিকই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলিয়া বোধ হয় না। এক অর্থে আমরা সকলেই depressed; অন্য কোন অর্থে নমঃশূদ্র, মুচী প্রভৃতিকে depressed বলা সঙ্গত কি না তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। সমিতির কার্য্যফল সম্বন্ধেও একটি কথা বারম্বার আমার মন হইতে বাহির হইতে চাহিতেছে; আপনারা কি বলিবেন এই আশঙ্কায় কথাটি বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। অভাব বোধ মানুষের অবস্থা এবং মানসিক উন্নতির উপর নির্ভর করে, একজন রাজপুত্রের যে জিনিষ না হইলে অভাব বোধ হয়, আমার তাহাতে হয় না। যে বিষয়ে আমি অধিক আশা পোষণ করি তাহা পূরণ না হইলে মনে বিষম বেদনা লাগে, এবং অভাবটি যেন মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া উঠিতে চাহে। যে বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা অথবা আশা আমার মনে নাই তাহার অভাব বোধ করি না। এই সমিতির অধ্যক্ষগণ লেখাপড়া শিখাইয়া অন্তজ জাতির লোকের মনে নূতন আশা, নব আকাঙ্ক্ষা পাঠাইয়া দিতেছেন; তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার কোন ব্যবস্থা করিতেছেন কি? যে আশা পূরণ করিবার ক্ষমতা মিশনের নাই, অথচ যাহা পূর্ণ হইবার অন্য সুবিধাও দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ আশা একজনের মনে জাগাইয়া দেওয়াতে তাহার উপকার কি অপকার হইবে সে কথাটা ভাবিবার বিষয়। ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সহচররূপে ইহাদের মনে যে নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হইবে মিশন যদি তাহারও পূরণের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তবেই তাহাদের এই সেবা-কার্য্য সেই শ্রেণীর লোকের প্রকৃত হিতকর হইবে।

মাসাধিক কাল পূর্ব্বে এই কলিকাতা সহরে Bengal Social Service League নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। নামেই বুঝা-যাইতেছে যে সমাজের সেবার বিধান করাই এ সমিতির উদ্দেশ্য। অবশ্য যে কোন রূপ সমিতিই গঠিত হউক তাহার উদ্দেশ্য সমাজের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না; তবে কোন কোন সভা শুধু সমাজের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির চেষ্টা করে, আর কোন সভা বা আর্থিক এবং দৈহিক অভাব পূরণে নিযুক্ত থাকে।

বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতিকেই সমাজের সেবাকার্য্যে নিরত বলা হইয়া থাকে। এই নব প্রতিষ্ঠিত Leagueও উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর সমিতি বিশেষ ইহার উদ্বোধনের দিন অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ও সেবা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। লীগের উৎসাহী সম্পাদক ডাঃ বিনেন্দ্রনাথ মিত্র লিগের কার্য্যে Co-operation অর্থাৎ পরস্পর সাহচর্য্যের প্রার্থনা করিয়া আমাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের দ্বারা কি ভাবে তাঁহাদের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের সহায়তা হইতে পারে তাহা জানিতে চাহিয়া আমরা তাঁহার নিকট যে পত্র লিখিয়াছি তাহার উত্তর পাই নাই। সম্ভবতঃ তাঁহারা কি ভাবে সমাজের সেবায় প্রবৃত্ত হইবেন, কি ভাবে লীগের কার্য্য আরম্ভ করিবেন তাহা এখনও ঠিক করিতে পারেন নাই। এই লীগের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নিকট আমাদের একটি নিবেদন আছে লীগের দ্বারা বাস্তবিকই যদি সমাজের প্রকৃত উপকার সাধন করিতে হয় তবে লীগকে শুধু ব্রাহ্মসমাজের লোকের মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না; প্রাচীন সমাজের লোক যাহাতে অধিক সংখ্যায় লীগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং লীগের কার্য্যভার গ্রহণ করে সে বিষয়ে এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণের বিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত। লীগের নিকট সমাজ অনেক আশা করে বলিয়াই আমার মনের এই কথাটি এখানে প্রকাশ করিলাম।

সমাজ সেবায় প্রবৃত্ত অন্যান্য সমিতির কথা বলিতে যাইয়া যদি একটি সভা এবং তাহার প্রতিষ্ঠাতার কথা কিছুই না বলি তবে আমার পক্ষে বড়ই গর্হিত হয়। আবার তাহার প্রশংসা করিতে গেলে এরূপ আত্মপ্রশংসাই করা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমাজের উন্নতি ও অভাব মোচন যে সমিতির বিষয় নহে তাহার অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। দেবালয় সমিতিরও যাহা উদ্দেশ্য তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। তবে সম্ভবতঃ আপনাদের অনেকেরই বিশ্বাস এ সমিতিটি বুঝি সামাজিকগণের মানসিক আনন্দবিধানের জন্যই স্থাপিত, সমাজের অন্য কোন অভাব মোচন বুঝি ইহার কার্য্য নহে। আমরা সময়ে সময়ে আমাদের কার্য্যের যে বিবরণী সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া থাকি তাহা হইতে এরূপ ধারণা আপনাদের হওয়া উচিত নহে। সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর সেবা অর্থাৎ দরিদ্র লোকের অর্থ, বস্ত্র, ভক্ষ, পানীয় ও অন্যান্য দৈহিক অভাব পূরণ এবং রুগ্ন ব্যক্তির সেবার বন্দোবস্ত করাও আমাদের সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। একথা একটু ভালরূপে প্রকাশ করিতে হইলে কার্য্য ছাড়িয়া কর্ত্তাতে যাইতে হয়; দেবালয় সমিতির কথা ছাড়িয়া তাহার প্রতিষ্ঠাতার নিকট যাইতে হয়; প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মকর্ত্তা একই। "সেবাব্রত" উপাধি প্রতিষ্ঠাতার নিকট ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু উপাধি তাহাকে পাইয়া অন্বর্থক হইয়াছে। দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় সারাজীবন সমাজের সেবায় ব্রতী আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া অনুমান হয় যেন সমাজের সেবাই তাঁহার একমাত্র কাজ। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে দুঃস্থ লোকের সহায়তার বিধান আছে এবং প্রতি বৎসরে দান হিসাবে যথাসম্ভব অর্থ দেবালয় তহবিল হইতে ব্যয় হইয়া থাকে। এমন কি এখনও তাঁহার মনের ভাব যে দেশের দরিদ্র ছাত্রগণের পুস্তকাদি ও পরীক্ষার ফিস্ প্রভৃতির সঙ্কুলান করে বছর বছর দেবালয়

হইতে অন্ততঃ ৫০০৲ খরচ হওয়া উচিত। আমি পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি আমাদের সমাজের প্রত্যেক অভাবই এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যে সেবক যত বড়ই শক্তিশালী লোক হউন তাঁহার একার চেষ্টায় এখন আর সমাজ-সেবা সম্যক্‌রূপে চলিতে পারে না। আমাদের সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সমাজের সেবা-কল্পে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব এই কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন; কিন্তু কাজ কতটুকু হইতেছে? সমাজের অভাবের তুলনায় তাঁহার এই সর্ব্বস্ব অকিঞ্চিৎকর তাঁহার এই শক্তি অতি সামান্য। তবে তাঁহার এই কার্য্যের, (সকল সেবা কার্য্যেরই) অন্য একটি দিক্ আছে। দেশের সেবা কার্য্যে উৎসাহী লোকগণ তাহার উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের সহায়তা করিবেন এবং সমাজের অন্যান্য অভাব মোচনের জন্য নব নব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ব্যক্তিগত হিসাবে তিনি যদি দেখিয়া যাইতে পারেন যে তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য দেশের লোক উৎসাহ দেখাইতেছেন, শুধু মৌখিক উৎসাহ নহে সর্ব্বরূপে সহায়তা করিতেছেন, তবেই তাঁহার সেবাকার্য্য সফল হইল বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন। আশা করি সে পরিতৃপ্তি, সে সন্তোষ তিনি লাভ করিবেন। এই সব অভাব মোচনের জন্য আরও অনেক সভা সমিতি আছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনুষ্ঠিত হওয়ার আবশ্যক একথা কাহাকেই বোধ হয় বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এ বিষয়ে আরও উৎসাহ আরও উদ্যোগ এবং আরও তৎপরতার প্রয়োজন।

১২। ২য় শ্রেণীর অভাব :—

এই ত গেল সমাজের অভাবের এক দিক্। এই সব অভাব একেবারে কোন সমাজ হইতেই দূর হয় না। যেমন বিশেষ সতর্ক লোকেরও শরীরে রোগ প্রবেশ করে, সেইরূপ খুব উন্নতিশীল সমাজের মধ্যেও এই সকল অভাব আছে। যে মানব দ্বারা সমাজ গঠিত সেই মানবের প্রকৃতিতেই এই সকল অভাবের মূল রহিয়া গিয়াছে। এ গুলির দূরীকরণের চেষ্টা প্রতি সমাজেই হইতেছে; তথাপি এ সকল একেবারে নির্ম্মূল হইবার নহে। না হইলেও সমাজের স্থিতি বিষয়ে ইহারা একান্ত অন্তরায় নহে। কিন্তু আমি অদ্য যে অভাবের কথা আলোচনা করিব তাহা সমাজের মূলচ্ছেদকারী, তাহার নিরাকরণ না হইলে সমাজের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই ভীষণ ব্যাধির প্রতীকার যে সহজ নহে তাহা অনুমান করিতে বেশী বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে এই অরকষ্ট অতি ভীষণভাবে ও ভীম বিক্রমে আমাদের সমাজের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোকের কার্য্যাভাবও তাহারই সহচররূপে প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে। সমাজের এইরূপ অবস্থার কারণ এবং তাহার উচ্ছেদ সাধনার উপায় চিন্তন প্রত্যেক ভাবুক লোকেরই কর্ত্তব্য। জনসংখ্যার বৃদ্ধি একটি কারণ বটে, কিন্তু তাহাই মুখ্য কারণ নহে। দেশের অরকষ্ট সত্য, কিন্তু খাদ্যশস্যের অত্যন্তাভাব নহে, কারণ বড় দুর্ভিক্ষের বৎসর ছাড়া আমাদের দেশের অন্নেই দেশের লোকের উদর পূরণ হইতেছে। দেশে অন্নের অভাব নহে সত্য কিন্তু অন্ন, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী বড়ই

দুর্ম্মূল্য হইয়াছে ; লোকে এত মূল্য দ্বারা নিজের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য কিনিতে পারিতেছে না ; তাই লোকের এত কষ্ট। দ্রব্যজাত দুর্ম্মূল্য হইলেই লোকের কষ্ট হয় না, মূল্যের অনুরূপ অর্থাগম হইলে বর্দ্ধিত-হারে জিনিষ কিনিতেও কষ্ট হয় না যেমন ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দুর্ম্মূল্যতার সঙ্গে লোকের আয়ের হার বৃদ্ধি পাওয়াতে সেখানকার লোকে আমাদের মত অন্নের কষ্ট উপলব্ধি করে না। অতএব আমাদের সমাজের অভাব পূরণের ২টি পন্থা দেখা যাইতেছে (১) দুর্ম্মূল্যতার নিবারণ (২) লোকের উপযুক্ত অর্থাগমের উপায় নির্দ্ধারণ। দুর্ম্মূল্যতা নিবারণ আমাদের হাতের কাজ নহে। ইহা দুই রকমে সম্ভব হইতে পারে (১) রাজবিধির দ্বারা জিনিষের মূল্য নির্দ্ধারিত হওয়া (২) ক্রেতার সংখ্যা কমান এই দুইই গবর্ণমেণ্টের হাত। তাহা ছাড়া গবর্ণমেণ্ট এই দুই বিধান করিলেই যে সমাজের অভাব সম্যক্‌রূপে নিবারিত হইবে তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ বাণিজ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ প্রতিবন্ধক স্থাপন করা অবাধ বাণিজ্যের রীতি নহে। দুর্ম্মূল্যতা হ্রাস করিবার অন্য কোন পন্থা দেখা যাইতেছে না।

১৩। অর্থাগমের উপায়—

(১) চাকুরী :—

দুর্ম্মূল্যতা যদি এইরূপই থাকিয়া যায়, অথচ লোকের তদনুরূপ অর্থাগম না হয় তবে সমাজের দুঃখের সীমা থাকিবে না। যেরূপ দেখা যায় তাহাতে দ্রব্যের মূল্য ক্রমে বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। সুতরাং এখন সমাজের এই অভাব পূরণের একমাত্র পথ হইতেছে দেশের লোকের ঘরে যাহাতে উপযুক্ত অর্থের সমাগম হয় তাহার উপায় করা। সাধারণতঃ দুই উপায়ে লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে (১) চাকুরী (ইহার মধ্যে চিকিৎসা, এবং আইন ব্যবসায়ও ধরা হইতেছে)। (২) ব্যবসা। চাকুরীর প্রথম এবং শেষ দুই অবস্থাই আমরা দেখিয়াছি। আগে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া যে কার্য্য লোকে হেলাচ প্রাপ্ত হইত তাহা আজকাল শিক্ষিত লোকে বহু উমেদারি করিয়াও পায় না। এ কথাটা সমাজের কাহারই অবিদিত নাই। তাহার কারণও বেশী ঘুরে নহে। চাকুরীর সংখ্যা অতি অল্পই বাড়িয়াছে, কিন্তু কার্য্য প্রার্থীর সংখ্যা গত ১০ বৎসরেই অনেক বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অথবা, সওদাগরী আফিস প্রভৃতি যাহা আছে তাহাতে আর বেশী লোক প্রতিপালন করিতে পারে না। এখন এই সব বেকার লোকদিগকে কর্ম্ম জুটাইয়া দেওয়া সম্পূর্ণরূপেই সমাজের উপর পড়িয়াছে এই সকলের চাকুরী যোটান এবং সমাজের অন্ন সংস্থান দুই এখন নির্ভর করিতেছে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর, দেশীয় শিল্পের উন্নতির উপর।

১৪। (২) ব্যবসা :—

ব্যবসা দুই রকম (১) পরের জিনিষ কিনিয়া বেচা (২) নিজে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া পরের নিকট বিক্রয় করা। প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায় আমরা নিতান্ত অপরিপক্ক নহি ; তাহা না হইলে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে আমেরিকা, জার্ম্মাণি, জাপান, সুইডেন প্রভৃতি বহু দূর দেশের এত জিনিষ বিকাইত না। সেই সব দেশের লোকে আমাদের পল্লীগ্রামে জিনিষ বিক্রয় করিতে আসে না। আমরাই তাহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া দেশের সর্ব্বত্র তাহাদের জিনিষ বিক্রয় করিয়া থাকি। এতাবের ব্যবসাতে

দেশের অভাব ঘুচিবার হইলে অনেকদিন পূর্ব্বেই ঘুচিত। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি তাহাতে উল্টা ফলই ফলিতেছে। অতএব সমাজের বর্ত্তমান অভাব মোচনের প্রকৃত পথ মাত্র একটি, সেটি দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিধান এবং বহুল প্রচলন। এক একটি সরকার বাহাদুরেরও যেমন কর্ত্তব্য, আমাদেরও তেমন কর্ত্তব্য। আমরা অনেক সময়ে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হইতে অনেক কাজের আশা করি বটে—কিন্তু প্রকৃত কার্য্যটা সমাজের ভিতর হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে। Lord Hardinge নিজেই বলিয়াছেন The true reform must come from the Society. আমাদেরও তাহাই বিশ্বাস। দেশের শিল্পের যদি উন্নতি হয়, দেশের ব্যবসার হাওয়া ফিরিবে; দেশে অনেক কল, কারখানা ও আফিস বসিবে; শিক্ষিত অশিক্ষিত বহুতর লোকের কার্য্য ঘুটিবে। তাহারা দেখিবে যে তাহাদের কার্য্যের দ্বারা দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরও অন্নসংস্থান হইতেছে। তাহা হইলে লোকের মনে উৎসাহ ও প্রফুল্লতা বাড়িবে; নূতন নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে লোকে সাহসী হইবে। এই একটি কার্য্যেই সমাজের অন্নাভাব, অর্থাভাব, এবং কার্য্যাভাব ঘুচিতে পারে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইহা ব্যতীত সফলতার অন্য পথ দেখা যায় না। এই কার্য্যের প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃত সেবা। এবং সমাজের সেবা যদি আমাদের কর্ত্তব্য হয়, তবে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই আমাদের সকলের কর্ত্তব্য।

১৫। শিল্পের উন্নতি

(১) অতীতে :—

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইলেই সমাজের সেবা করা হয় না। কর্ত্তব্য সাধনের চেষ্টাই প্রকৃত সেবা। আমি কথাটি অতি সহজে বলিলাম, কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ নহে। গত ১০ বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। নানাবিধ কারণে সে সব চেষ্টার অধিকাংশই তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। তাহার মধ্যে দুটি কারণ খুবই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। (১) কোন স্থানে দেশের দশ জনে একত্র হইয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া কোন একটি শিল্পের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অব্যবসায়ীর হস্তে কার্য্যভার ন্যস্ত হওয়াতে কার্য্যটি পণ্ড হইয়াছে অর্থেরও অপব্যবহার হইয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি এসব কার্য্যে শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন। (২) আবার কোন কোন স্থানে কার্য্যভার ব্যবসায়ীর হাতেই পড়িয়াছে, কিন্তু সে অসংযত চরিত্র হওয়াতে পরের টাকা হাতে পাইয়া নিজের স্বার্থে মত্ত হইয়া দেশের কার্য্যটি নষ্ট করিয়াছে; তাহার হয়ত মনে হয় নাই যে নিজের সামান্য স্বার্থ সংসাধন করিতে যাইয়া সে দেশের ও সমাজের কত বড় অনিষ্ট করিতেছে। এবং এই দুইটি উপকরণ যেখানে একত্র হইয়াছে সেখানে ত কথাই নাই; একেবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে। এইরূপ এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া দেশের উন্নতির অনেক কাজকেই আসিতে হইয়াছে, এবং তাহার কোনটিই প্রায় অক্ষত দেহে আসিতে পারে নাই। সরকার বাহাদুরও তখনকার

এই সব কার্য্যে উপযুক্তরূপ উৎসাহ দেন নাই। কিন্তু এই সব বাধা বিঘ্ন, এবং উন্নতির পরিপন্থী বহুবিধ ব্যাপার পথ অবরোধ করিয়া আছে বলিয়াই দেশের ও সমাজের বাঁচিবার যাহা একমাত্র পথ সেটিকে আমরা কি পরিহার করিব। যাহাকে ত্যাগ করার অর্থ অবশ্যম্ভাবী বিনাশ, তাহা যতই দুঃসাধ্য হউক, তাহার পথ যতই বিপৎসঙ্কুল হউক, তাহাকেই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহাই আমাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিবে। বার বার যেখানে বিফল মনোরথ হইয়াছি সেইখানেই আবার শক্তিপ্রয়োগ করিতে হইবে—কবির কথায় বলিতে হয়—

"বন্ধ দুয়ার দেখবি বলে,
অম্নি কি তুই আস্‌বি চলে ?
(তোরে) বারে বারে ঠেল্‌তে হবে
হয় ত দুয়ার টলবে না,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।"

১৬। (২) বর্ত্তমানে :—

এখন অবস্থারও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। একের যাহা অনিষ্টকর অপরের তাহাতে উপকার হইতে পারে। প্রাণিগণ নিশ্বাসের সঙ্গে যে দূষিত বায়ু ত্যাগ করে (carbonic acid gas, অঙ্গারবান) তাহাই বাকি—বড় বড় বনস্পতি, লতা, গুল্ম প্রভৃতির জীবনের প্রধান উপাদান। বর্ত্তমানে ইয়োরোপ খণ্ডে সর্ব্বজন ত্রাসকর যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে তাহার কথা ভাবিতেও মন অবসাদে পূর্ণ হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে উভয় সেনার মধ্যে অর্জ্জুনের রথ স্থাপিত হইলে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত সৈন্যের সংখ্যা দেখিয়া এবং পরিচয় লইয়াই বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ একটি প্রান্তরে আবদ্ধ ছিল এবং মাত্র অষ্টাদশদিন স্থায়ী হইয়াছিল; সৈন্যক্ষয় ব্যতীত দেশের অন্য লোকের অর্থাৎ (civil population)এর তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় নাই। য়ুরোপের বর্ত্তমান্ যুদ্ধে কত গ্রাম নগর সমভূমি হইতেছে, কত পরিবারের নাম ও চিহ্ন পর্য্যন্ত ধরণী হইতে বিলুপ্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই যুদ্ধের পৃথিবীব্যাপী অশুভ ফল আমরা এই দূরদেশে বসিয়াই ভোগ করিতেছি। কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যেরই ভাল মন্দ দুইটি দিক্ আছে। কেহ কেহ মনে করেন এই যুদ্ধের ফলে পরিণামে ইয়োরোপের উপকার হইবে। ইয়োরোপের যাহাই হউক, ভারতের কিছু উপকার হইবার যে সম্ভব ছিল সে বিষয়ে অনেকেই নিঃসন্দেহ। এই যুদ্ধের পূর্ণসুফল জাপান ও আমেরিকা পাইতেছে; আমাদেরও কিছু পাইবার কথা ছিল। আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের সুবর্ণসুযোগ এই বটে। বিদেশীয় সুনিপুণ শিল্পিদিগকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া ভারতীয় শিল্পের উদ্ধার বা উন্নতিসাধন করা অতি দুঃসাধ্য। আবার গবর্ণমেণ্টও যে অবাধ বাণিজ্যের গতি প্রতিরুদ্ধ করিবেন এমন বোধ হয় না। এই যুদ্ধের জন্য প্রকৃত প্রস্তাবে অবাধ বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যে সব দেশের পণ্যে আমাদের সহর, বন্দর, হাট মাঠ, পল্লীগ্রাম ছাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের দ্রব্যজাত এখন আর এদেশে আসে না। বাজারে পণ্যের অপ্রাচুর্য্য হইলে ক্রেতা ভাল মন্দ বিচার না করিয়া জিনিষ কিনিতে বাধ্য হয়। নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পের পক্ষে সে অবস্থা বিশেষ হিতকর। কারণ প্রথম অবস্থায় অনভিজ্ঞ ভারতীয় শিল্পিগণ সুনিপুণ বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের মত অল্প মূল্যে সুদৃশ্য দ্রব্যজাত সরবরাহ করিতে পারিবে এ আশা করা যায়

না। এখন সেই সকল বিদেশীয় দ্রব্য বাজারে নাই, কাজেই আমাদের দ্রব্য অপকৃষ্ট হইলেও বিক্রয় হইয়া যাইবে। পরে আমাদের কারিকরগণ উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিলে অন্যান্য দেশের ব্যবসায়িগণের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে এরূপ আশা অসঙ্গত নহে।

১৭। সমাজসেবার প্রকৃত অধিকারী :—

তাই বলিতেছিলাম দেশের শিল্প বাণিজ্য উদ্ধারের এই সুসময়। কিন্তু যে সুবাতাস আমাদের দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহার সুবিধা আমরা কোনরূপেই কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। এই বাতাসে পাল খাটাইয়া হাল ঠিক রাখিতে পারে এমন শক্তিশালী লোক কি আমাদের সমাজে কেহই নাই। সমাজের এই দুর্ব্বলতা, শক্তিহীনতা বড়ই নৈরাশ্যপ্রদ। পূর্ব্বেও শক্তির কথা আভাসে বলিয়াছি। সমাজে সেবার প্রয়োজন আছে বুঝি, সে সেবা যে কর্ত্তব্য তাহাও বুঝি, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্তিও আছে, কিন্তু সেবার অনুরূপ শক্তি কই। কবি বলিয়াছেন—

"আপনি অবল হ'লি, তবে
বলদিবি তুই কারে!
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া—
ভেঙ্গে পড়িস্ নারে।"

দুর্ব্বলতা সমস্ত দুঃখের আকর। জানি না সমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহারা এই শক্তি সঞ্চয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন কিনা। শক্তির মূলে শিক্ষা (training) এবং চরিত্র গঠন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি কিরূপে অব্যবসায়ী ও অগঠিত চরিত্র লোক দ্বারা সমাজের কাণ্ড পণ্ড হইয়াছে—শক্তির এইরূপ অভাব থাকিলে ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে। এবং এই কারণেই সমাজ সেবায় আমার প্রবৃত্তি থাকিলেও লোকে সহসা আমাকে বিশ্বাস করিতে চাহে না; সমাজের সেবার অনুরূপ সামর্থ্য আমার আছে কি না, আমার চরিত্রবলও তদনুরূপ কি না এ বিষয়ে স্বভাবতঃই তাহাদের মনে সন্দেহ হইতে পারে। আমাদের চরিত্র যেরূপ গঠিত হইবে, সমাজের প্রকৃতিও সেইরূপ হইবে। প্রতি ব্যক্তির চরিত্রবলই সমাজের প্রকৃত শক্তি। শিক্ষা সে শক্তির উন্মেষক। শিক্ষা এবং চরিত্র যেখানে সম্মিলিত সেইখানেই মণিকাঞ্চন সংযোগ হইয়াছে; সেইরূপ লোকই সমাজ সেবার প্রকৃত অধিকারী; তাহাকেই বিশ্বাস করিয়া সমাজের অথবা দেশের কার্য্যের গুরুভার অর্পণ করা যাইতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, সদ্বৃত্ত ও সাধু চরিত্র ছিলেন তাহার দোহাই দিয়া এখনকার কার্য্য উদ্ধার হইবে না। তাহা সগৌরবে স্মরণ করিবার বিষয় বটে কিন্তু শুধু তাহারই জোরে আর এখন মস্তক রক্ষা করা যাইবে না। আমাদের নিজেদের চরিত্র সুগঠিত না হইলে সমাজসেবা চলিবে না; সমাজের অভাব দূরীভূত হইবে না।

১৮। ব্যক্তিগত চরিত্রবিকাশের প্রয়োজন

আমি ধান ভানিতে আসিয়া এ শিবের গীত কেন গাহিলাম; সমাজসেবার কথা বলিতে আসিয়া ব্যক্তিগত চরিত্রের কথা কেন বলিলাম, পরার্থের কথা আলোচনা করিতে আসিয়া যাহা প্রকৃষ্ট আত্মসেবা, শ্রেষ্ঠ আত্মোন্নতি তাহার কথা কেন উল্লেখ করিলাম তাহা আমি নিজে ভাল বুঝাইয়া বলিতে পারি-

না। তবে একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আত্ম-সেবাও সমাজসেবারই একটি প্রধান অঙ্গ। Prof. Lomesbury ইংরেজি ভাষার ইতিহাস লিখিতে যাইয়া যাহা বলিয়াছেন এইখানে সেটুকু আপনাদিগকে শুনাইয়া দিতে চাই :—

"No speech can do more than express the ideas of those who employ it at the time. It can not live upon past meaning or upon the past conceptions of the greatmen that have been recorded in it, any more than the race which uses it can live upon its past glory or its past achievements. We, therefore, may rest assured that if it ever attain to universal sovereignty, it will do so because the ideas of the men who speak it are fit to become the ruling ideas of the world, and the men themselves are strong enough to carry them over the world ; and *that*, in the last analysis, depends, like every thing else, upon the development of the individual, depends not upon the territory we buy or steal, not upon the gold we mine, or the grain we grow, but upon the *men* we produce."

অধ্যাপক পাকা হাতে নিজের ভাষায় যাহা লিখিয়াছেন অনুবাদ করিলে তাহার ভাব ও ভাষার কিরূপ সদ্গতি আছে তাহা বোধ যাইবে না, তথাপি বাঙ্গালা প্রবন্ধে ইংরাজি লেখা উদ্ধৃত করিয়া তাহার অনুবাদ দেওয়া অন্যায়; সেইজন্য ইহার তাৎপর্য্য লিখিয়া দিলাম :—

"কোন ভাষাই ভবিষ্যদ্ভাবী লোকে বর্ত্তমানে যে ভাব পোষণ করে তাহারই অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই করিতে পারে না। যেমন কোন জাতি অতীতকালে অর্জ্জিত যশঃ, অথবা অনুষ্ঠিত মহৎ কার্য্যের বলে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, ভাষাও সেইরূপ অতীতকালে তাহাতে যে সব মহৎ ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে শুধু তাহারই জোরে মাথা বাঁচাইতে পারে না। যাহারা আমাদের ভাষায় কথা বলে তাহাদের ভাব যদি সর্ব্বদেশে প্রচলনের উপযোগী হয়, এবং তাহারা যদি সেই ভাব সর্ব্বদেশে প্রচার করিবার মত শক্তিশালী হয়, তবেই কেবল আমাদের ভাষা বিশ্বজগতের ভাষা হইতে পারিবে। এ কথাও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রকৃত প্রস্তাবে অন্য সমস্ত জিনিষের মত, এই ভাষার উন্নতি ও ব্যক্তিগত চরিত্রবিকাশের উপর নির্ভর করে। আমরা যে রাজ্য ক্রয় বা অপহরণ করি, খনি হইতে যে স্বর্ণ আহরণ করি, অথবা যে শস্য আমরা উৎপন্ন করি ইহার কোনটির উপরই ভাষার উন্নতি নির্ভর করে না, পরন্তু আমরা যে মানুষ উৎপন্ন করি ইহা তাহারই উপর নির্ভর করে।" উক্ত অধ্যাপক ভাষার উন্নতির কথা বলিতে যাইয়া এই কথা বলিয়াছেন। ভাষার উন্নতি সমাজোন্নতির এক অংশ মাত্র, তাহার সম্পর্কেই যদি ব্যক্তিগত মনুষ্যত্ব বিকাশের কথা প্রয়োজ্য হয়, তবে সমাজের উন্নতির কথা, প্রকৃত সমাজসেবার কথা বলিতে গেলে এই কথা যে সহস্রগুণে প্রযোজ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজের অন্তর্গত প্রতি ব্যক্তির

চরিত্রগঠনের সঙ্গে সমাজের উন্নতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সকল অঙ্গ সুস্থ না থাকিলে যেমন দেহের অকল্যাণ, সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছোট, বড় কাহারও চরিত্র অগঠিত থাকিলে সমাজেরও সেইরূপ অকল্যাণ। আমরা যদি প্রকৃত মানুষ হইতে পারি তবেই আমাদের সমাজ বিশ্বমানবসমাজে মস্তক তুলিতে পারিবে, তবেই তাহার অভাব মোচন হইবে।

১৯। উপসংহার

সমাজের অভাব ও উন্নতির কথা এক ঘণ্টায় কি এক দিনে শেষ করিবার নহে। জন্ম হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক; যাঁহারা জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সম্পর্ক আরও দীর্ঘ। উপযুক্ত জ্ঞানের উন্মেষ কাল হইতে এই নশ্বর দেহের পতনের সময় পর্য্যন্ত, সমাজের অভাব, সমাজের উন্নতি, সমাজের স্থায়িত্ব সাধনে সযত্নে মনন চিন্তন ও ধ্যান করিবার বিষয়। আমার অপেক্ষা শক্তিমান্ লোকে এই সব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া প্রকৃত সমাজ-সেবার আয়োজন করিয়া দিবেন এই ভরসায় এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ পাঠ। ইহাতে সংক্ষেপে আমাদের সমাজের অভাব, অভিযোগ এবং তাহার প্রতিকারের কথা বলিলাম। আমাদের সমাজের শক্তির অভাব, চরিত্রগঠনের অভাব, শিল্প বাণিজ্যের অভাব, সর্ব্বোপরি অন্নাভাবের কথা বলিলাম। এই এতগুলি গুরুতর অভাব একা পূরণ করিতে পারে এমন লোক আমাদের কোন কোন সমাজেই নাই; অথচ ইহাদিগকে দূর করিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই। আমাদের সমাজের সঙ্গে কেবলমাত্র গ্রীস ও রোমক সমাজের তুলনা চলে। তাহাদের উভয় সমাজেরই উন্নতি, অবনতি ও পুনরুত্থান এই বিবিধ অবস্থা আমরা দেখিলাম! তাই আমারও ভরসা হয় যে আমাদের এই সমাজেরও পুনরুত্থান হইবে, এই সমাজও পুনরায় হাসিবে। কে যেন বারম্বার আমার কাণে এই আশার বাণী শুনাইয়া যাইতেছে শক্তির অভাব, মানুষের অভাব, অর্থের অভাব, শিল্পের অভাব এই সমস্ত অভাবই পূরণ করিতে হইবে। এই অভাব সমূহের নিরাকরণের উপযোগী অনুষ্ঠানের এই সময়। এ শুভ মুহূর্ত্ত চলিয়া গেলে অনুতাপের অনেক সময় পাওয়া যাইবে, কিন্তু এ সুযোগ আর আসিবে না; যে সুবাতাস বহিয়া যাইতেছে তাহা আর ফিরিবে না। এই অভাব একটি একটি করিয়া পৃথক্‌ভাবে পূরণ করা যাইবে না; সকল গুলিই এককালে দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের লোককে সমাজের সেবা-কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে; সমাজসেবার উপযোগী শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের উন্নতি সাধিতে হইবে, অর্থাভাবের অপগমের চেষ্টা দেখিতে হইবে। আগে শক্তিসঞ্চিত হউক পরে কার্য্যে হাত দিব একথা বলিয়া বসিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না। শক্তি আপনি হয় না; কর্ম্মই শক্তি আনয়ন করে; কর্ম্মই শক্তি বৃদ্ধি করে। শিশু যেমন বার বার পড়িয়া উঠিয়া, উঠিয়া পড়িয়া হাঁটিতে শিখে, সুবর্ণ যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শোধিত হয়, লোকও তেমনি কার্য্যের মধ্যে পড়িয়াই, বার বার স্খলিত পদ হইয়াও শক্তিমান্, চরিত্রবান ও কার্য্যক্ষম হয়। সমাজের হিতৈষিগণের নিকট তাই নিবেদন এই শুভক্ষণ ছাড়িয়া দিলে সমাজের ভবিষ্যৎ আশার আলো নির্ব্বাপিত হইবে—এখনই সমাজের প্রকৃত

অভাবমোচনে তাঁহারা অগ্রসর হউন—বিধাতা আপনি আসিয়া তাঁহাদের সহায় হইবেন!

"আর কি ভাবিস মাঝি বসে?
এই বাতাসে পাল তুলে দে,'
চল সর কসে।"

শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
এম্ এ, বি এল।

মফঃস্বলের বাণী

বর্ত্তমান অন্নসমস্যা ও তাহার প্রতীকার

আজ এই জীবনমরণ-যুদ্ধের যুগে, আজ এই বিভীষিকাময়ী অন্নচিন্তার দিনে চারিদিক অন্ধকার সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—পথ কোথায়? দীন-দরিদ্র ভারতবর্ষে বিদ্যাবুদ্ধি প্রতিভা সব থাকিলেও দারিদ্র্যের অন্ধকারে সমুদায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে—পেটে অন্ন নাই, দেহমন অবসন্ন; এই অবসাদের ভাব দেখিয়া নানা ব্যাধি অক্টোপসে দেহমস্তিষ্কের ক্ষীণ-শক্তি অর্গল ভগ্ন করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতেছে—এ সমস্যা, এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি?

পূর্ব্বে ভারতবর্ষে রোগ ছিলনা তাহা নহে, পূর্ব্বের লোক বর্ত্তমান যুগের মানুষ অপেক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই অধিকতর কৃতী ছিলেন তাহাও নহে; তবে কোন কোন বিষয়ে সে কাল ও এ কালের জীবন যাত্রা প্রণালীতে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেকালের লোক অনেকটা আত্মনির্ভরশীল ছিলেন আর আমরা পরনির্ভরতাকেই সভ্যতা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আমাদের সর্দ্দি হইল, অগ্নিমান্দ্য হইল, মাথা ধরিল, অমনই ডাক্তারের ডাক পড়িল। সাধারণ জামা নাই, দর্জ্জির প্রয়োজন। তরকারী নাই, বাজারে লোক না পাঠাইলে উপায় নাই; পাচক ব্রাহ্মণের অসুখ করিয়াছে, সুতরাং একাদশী। রজক বিলম্ব করিতেছে, বাধ্য হইয়া মলিন বস্ত্রই পরিধান করিতে হইতেছে (অবশ্য আমরা বড় বড় সহরের কথা বলিতেছি না)। কিন্তু সে কালের লোক এবিষয়ে অনেকটা স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন। যাঁহাদিগকে সংসার করিয়া খাইতে হইত তাঁহারা প্রায় সকলেই জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী-প্রয়োজনীয় বিদ্যা কিছু কিছু শিখিতেন। সেকালের গৃহিণীদিগকে কথায় কথায় বৈদ্য ডাকাইতে হইত না। সামান্য অসুখ বিসুখে কেহই বৈদ্য ডাকিতে যাইত-না, সহজ শিশুচিকিৎসায় প্রাচীনাগণই বৈদ্যের কার্য্য করিতেন। গৃহিণীগণই পল্লীগ্রামে অবস্থানুসারে দাসদাসীদ্বারা বা স্বয়ং বস্ত্র পরিষ্করণ রন্ধন প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেও মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ স্বহস্তে সংসারের বহু কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন—তাহাতে তাঁহারা অপমান বোধ করেন না। আর আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলেও বাজার হইতে দুইটি জিনিষ আনিতে অপমান বোধ করিয়া থাকি।

এই অর্থাভাবের দিনে, এই জীবন যুদ্ধের যুগে আর মানের বোঝা লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবেনা—এখনও আমরা নির্ভরতায় অভ্যস্ত না হইলে পরমুখপ্রেক্ষিতার ফল আমাদিগকে হাতে হাতে পাইতে হইবে। আজ আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় কৃষি ও গৃহশিল্পের কথা উল্লেখ করিব।

সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য কার্য্য—খাওয়া পরা এবং দেহরক্ষা বা চিকিৎসা। সকল সাংসারিকেরই যে স্থসম্পত্তি থাকিবে এমন নহে, কিন্তু বাসবাটী ও তৎসংলগ্ন এক আধটুকু জমি অধিকাংশেরই আছে; অথচ আমরা সে সমুদায়ের প্রতি লক্ষ্য-হীন। বিলাতে গ্লাডষ্টোনও শারীরিক পরিশ্রম করিতেন; কিন্তু আমরা বাজে গল্প প্রভৃতিতে অবসর সময় কাটাইয়া থাকি, তথাপি আমরা এক আধটুকু শারীরিক পরিশ্রম করিয়া যে দুই চারিটি তরী তরকারী উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিব সে দিকে আমাদের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। শারীরিক পরিশ্রমে যে ব্যায়ামের কার্য্যও করা হয়, আমাদের ক্ষীণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহাও যে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ তৎপ্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপশূন্য।

দ্বিতীয়তঃ যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে তাহাতে মোটা মুটি সহজ-সাধ্য গৃহচিকিৎসা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে তদ্বিষয়ে আমরা কেহই লক্ষ্য করি না। দেশীয় গাছ গাছড়া অনেক মুষ্টিযোগে ব্যবহৃত হয়। আমরা সে সমুদায়ের নামও জানিনা; জানিলেও খুঁজিয়া আনিবার পরিশ্রমের আমাদের অবকাশ নাই। আমরা বাগানে দুই চারিটি গন্ধহীন পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকি। কিন্তু মোটা মুটি প্রয়োজনীয় ভেষজাদির সংগ্রহেও যে অনেক উপকার হইতে পারে তাহা কয়জনে লক্ষ্য করিয়া থাকি?

আজ কাল বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতিতে সীবন বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এটিও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, কিন্তু আমাদের বালিকারা সেলাই প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্যেরই বহুল শিক্ষা করে; জামা, জ্যাকেট, সেমিজ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্প কমই শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই রংপুর অঞ্চলে পূর্ব্বে গৃহস্থগণ পোকা পুষিয়া এণ্ডী সূতা প্রস্তুত করিত ও তাহার দ্বারা স্বয়ং অথবা তাঁতীর দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া লইত। এই সমুদায় পোকা পুষিতে তাহাদিগকে সামান্য কিছু জমিতে এরণ্ড বা (ভেরেণ্ডার) আবাদ করিতে হইত। ইহাতে তিন দিকে লাভ দাঁড়াইত—এণ্ডীর সূতা প্রস্তুত হইত, রেড়ীর তৈল হইত এবং তাম্রকূট সেবনের সুন্দর কয়লা প্রস্তুত হইত। কিন্তু পাটের কল্যাণে এ সমুদায় শিল্প উঠিয়া গিয়াছে। গৃহস্থগণ অনেকে কেবল মাত্র পাটেরই আবাদ করায় নগদ টাকা পাইতেছে বটে, কিন্তু জীবন যাত্রার প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই আমাদিগকে পরমুখপ্রেক্ষী হইতে হইতেছে। আমাদের ভাবিয়া দেখিবার এইরূপ অনেক বিষয় আছে, কিন্তু আজ আমরা এই-কয়েকটি ক্ষুদ্র গৃহশিল্প ও কৃষির প্রতিই দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

রংপুর দিকপ্রকাশ

২। বঙ্গের আয় ব্যয়

১৯১৫—১৬সালে বঙ্গদেশের আয় ৬৫৮০৭০০০ টাকা ও ব্যয় ৬৫৮২৯০০০ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যই বাঙ্গালীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়।

১৯১৪-১৫ সালে শিক্ষার জন্য ১৪৫৪৩০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল, কিন্তু ৮৫২৩০০০ টাকার বেশী খরচ করা হয় নাই। আগামী বৎসরের জন্য ১০৫৬২০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কত টাকা ব্যয় হইবে তাহা এখন বলা যায় না।

আগামী বর্ষে নিম্নলিখিত নূতন কার্য্যের জন্য টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিলজফির আসিষ্ট্যাণ্ট প্রফেসার ৪৬০০ বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্সিপালের বৃত্তি বেতন ২৪০০ ইন্স্পেক্ট্রেস ও আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেকট্রেসদের চাকরাণী ৩০৪০ বালিকাদের উর্দ্দু পাঠ্য পুস্তকের প্রণয়নের জন্য পুরস্কার ২০০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত একদা দান ১ লক্ষ ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত দানের মধ্য হইতে একদা দান ৪ লক্ষ (এই টাকা কোন কার্য্যে ব্যয় হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।)

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকা হইতে কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট ও বেকার হোষ্টেলের জন্য ৪ লক্ষ, হোষ্টেলের জন্য কলিকাতা ইউনিভার্সিটিকে দান ১০ লক্ষ ডাউহিল ইউরোপীয়ান স্কুলের বর্দ্ধন শ্রেণীর জন্য ১৬৮০।

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকা ১৯১৪-১৫ সালে নিম্নলিখিত কার্য্যে একদা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। একদা খরচ ১৩৪০০০ কলিকাতা ও ঢাকা ভিন্ন অন্য স্থানের হোষ্টেল ৮১০০০ ভারত গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য একদা দান ১৪১৩০০০ টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪১০০০ কলিকাতার হোষ্টেল ২৪১০০০ ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত টাকা প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যয় হইবার সম্ভাবনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫০০০, ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ৫৫২০০০; নিম্ন শিক্ষা ৯৩৬০০০ মধ্য বাঙ্গালা সাহায্যকৃত স্কুল ১২৮০০০ স্ত্রীশিক্ষা ১০০০০ প্রতি বৎসর ব্যয় ৬০০০০।

বঙ্গদেশে শিল্পশিক্ষাদানের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব অনেক দিন হইতে শুনা যাইতেছে কিন্তু আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ না দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে আগামী বৎসরে ঐ কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ করা হইবে না। ১৯১৪-১৫ সালে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যে টাকা ব্যয় করা হইবে :—

ত্রিস্রোতের পয়ঃপ্রণালী ৪০০০ বদোহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা ১৪১৫ নারায়ণগঞ্জে পানীয় জল ১ লাখ মুন্সিগঞ্জে জলের কল বৃদ্ধি ৭২০০ চট্টগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি ২০০০০ বহরমপুরের জলের কলের উন্নতি ৪০০০০ রাজবাড়ীর পয়ঃপ্রণালী ২৬৩৯, বারইপুরের পয়ঃপ্রণালী ৪২৫০ হুগলীর জলের কল ৫০০০০ কুষ্টিয়ার পয়ঃপ্রণালী ৩৪৫০ ইংলিসবাজারে পানীয় জল ৪০০০০ বাকরগঞ্জ পানীয় জল৪০০০ উত্তর বারাকপুরে পাকা নর্দ্দমা৪০০০ ঢাকা সহর পরিষ্কার ৭৫০০ উত্তর পাড়ায় পানীয় জল ৪৪৮১৫ পানিহাটিতে নর্দ্দমা ৭২৪৬ উত্তর হুগলীর নর্দ্দমা ১০৪৩৩ আসানসোলে পানীয় জল ৬২০০০ গাইবান্ধার উন্নতি ৮০০০ কলিকাতার উপকণ্ঠের নর্দ্দমা ৪২০১৭ চাঁদপুরে পানীয় জল ৬০০০০ সিউড়ির নর্দ্দমা ১১৫০০ বাগের খাল ও যমুনার উন্নতির জন্য অরিপের ব্যয় ৬০০।

ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য টাকা মঞ্জুর করা উচিত ছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ হয় নাই।

বীরভূম বার্ত্তা

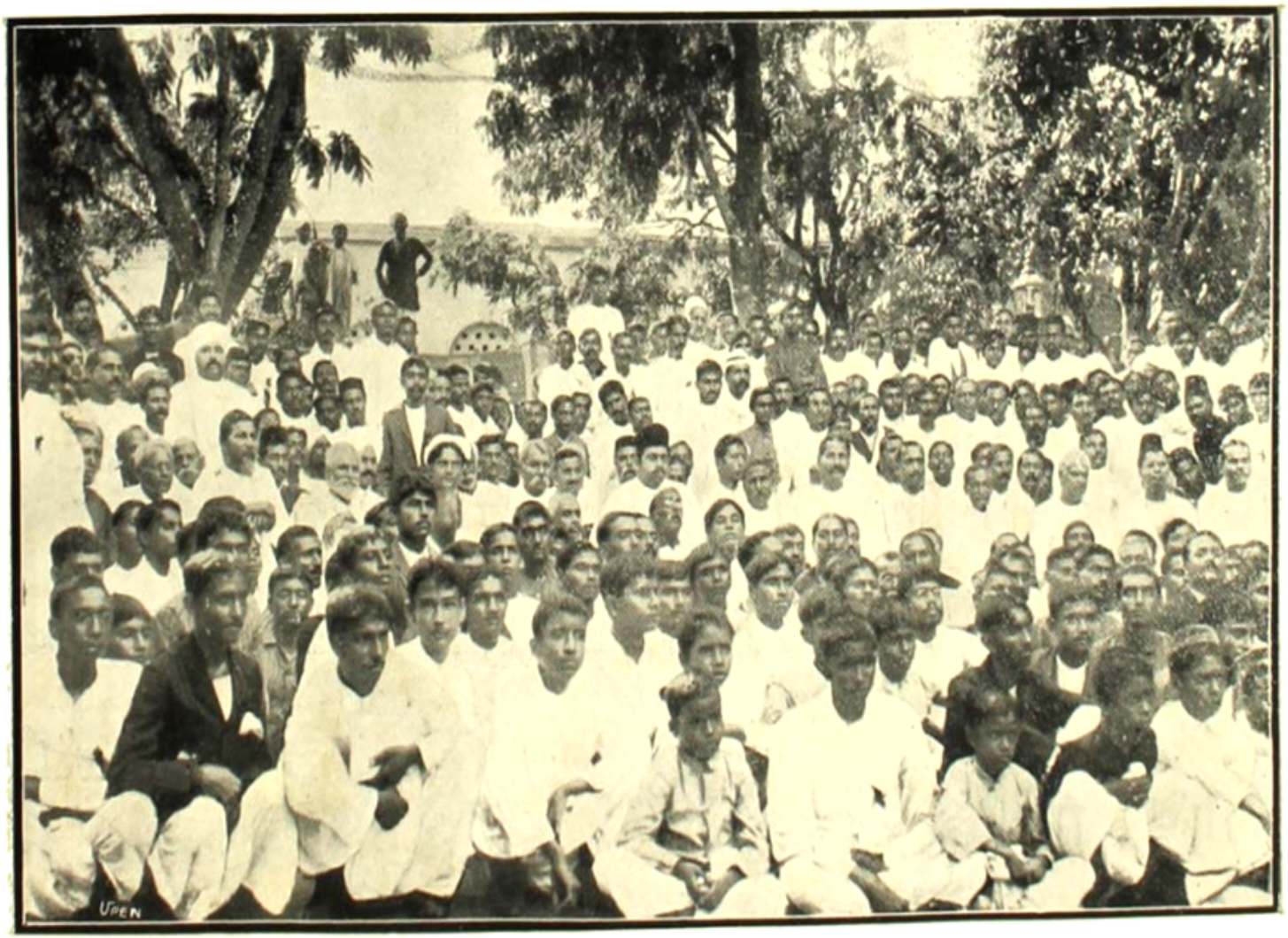

বর্দ্ধমান অষ্টম বঙ্গীয়-সাহিত্যসম্মিলনে সমবেত
সাহিত্যিকবৃন্দ

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৬ষ্ঠ খণ্ড ৬ষ্ঠ বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২	অষ্টম সংখ্যা।

আলোচনা

১। অন্ধ্র প্রচেষ্টা

জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্বিশেষে অন্ধ্রগণের উন্নতি সাধনই অন্ধ্র-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সাধারণের এক ইতিহাস, কিংবদন্তী এক ভাষা ও সাহিত্যের উপর ইহাঁদের মিলনের ভিত্তি স্থাপিত। এই আন্দোলনটি সমস্ত জাতিকে আপন প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া বর্ত্তমানের স্বকীয় দীনতা প্রমাণ করিয়া দেয়। প্রধান প্রধান সহরগুলিতে দেশীয় প্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃবর্গ বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া সাধারণের উন্নতিকল্পে কতকগুলি পন্থার সমালোচনা করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট উপায় নির্দ্ধারণের

পর তাঁহারা পরস্পরের সাহায্যে ও প্রয়োজন হইলে সরকারের আনুকূল্যে সেইগুলি কার্যে পরিণত করেন।

অন্ধ্রগণের আর একটি নাম তিলেঙ্গ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর ও মধ্যভাগে ১১টি জেলাতে, নিজামরাজ্যের পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে ও মহীশূরে ইহাদের বাসস্থান। আন্ধ্রগণ ইতিহাসে এক প্রাচীন জাতি বলিয়া বিখ্যাত।

অন্ধ্রদিগের শিক্ষা

বহুশতাব্দীর অবস্থাবিপর্য্যয়ে ইহাদের ইতিহাসে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আপনাদের প্রাচীন গৌরব বিস্মৃত হইয়া এখন ইহাঁরা বৃটিশশাসিত অন্য জাতিদিগের তুলনায় নগণ্য। তিলেঙ্গরা শিক্ষা ও বাণিজ্যে, অবস্থা বা প্রতিপত্তিতে সকলের পিছনে পড়িয়া আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে শিক্ষিত পুরুষদিগের সংখ্যা হিসাবে তিলেঙ্গপ্রদেশের সর্ব্বোত্তম স্থানটি পর্য্যন্ত তামিলদিগের সর্ব্বনিম্নতন প্রদেশ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন। নিম্নের এই তালিকা হইতে তাহা বেশ অনুমান করা যায়।

	মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী	তিলেঙ্গ
আর্ট কলেজ	৩০	৮
ব্যবহারিক বিদ্যার কলেজ	৪	০
সেকেণ্ডারি বিদ্যালয়	৭৫৬ (৪১টি বালিকার জন্য)	১৭৮ (৫টি বালিকার জন্য)
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৪৮৪ (১২১১৭ বালিকার জন্য)	১১৫৫৩ (৪২৯টি বালিকার জন্য)
টেক্‌নিক্যাল ও ইনডাষ্ট্রিয়াল	৫০	৯
কলেজের ছাত্র	৩৭৮২	৪২৪
আর্ট গ্রাজুয়েট	১১৭৯৪	২০০০
উকিল	২৩৫০	৩৪০
এল, এম, এস ডাক্তার	২৮৪	১২০
এম্ বি	১২০	৪
এঞ্জিনিয়ার	১১২	৮

সমস্ত জনসংখ্যার অনুপাতানুসারে শেষোক্ত ৪টি বিষয়ে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যথাক্রমে ৪২৪০, ৮৯০, ১৫০ ও ৪৬ হওয়া উচিত ছিল।

২। শিল্প বাণিজ্য সরকারী চাকুরী ও জাতীয় আন্দোলন প্রভৃতি

বাণিজ্য ব্যাপারে দৃষ্ট হয় যে দক্ষিণ-বিভাগের জেলাগুলি অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা শিল্প ও ব্যবসায়ের বৈচিত্র্য হিসাবে অনেক উন্নত। এখানে অনেকগুলি কল ও কারখানা স্থাপিত আছে। তিলেঙ্গ প্রদেশে ৩১১টি কারখানার মধ্যে অনেকগুলিতেই চাল ও তুলার কাজ হয়। কিন্তু দক্ষিণ-ভাগের ৫০২টি কারখানাতে চর্ম্মপ্রস্তুতকরণ, রঞ্জনক্রিয়া,

তাম্রাক বিশুদ্ধকরণ, অস্থি চূর্ণকরণ ও স্বর্ণসূত্র-গঠন প্রভৃতি কার্য্য চলে।

সরকারী কার্য্যবিভাগে তিলেঙ্গরা অনেকের পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। নিজেদের জেলা-গুলিতে তাঁহারা কেবলমাত্র নিম্নতন কর্ম্ম-চারীর কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। রাওবাহাদুর বীরসালিঙ্গম পান্টালু প্রমুখ কয়েকটি নেতৃ-স্থানীয় লোকবৃন্দ বিশেষ ধন্যবাদার্হ কারণ তাঁহারা সংবাদপত্র পত্রিকাপ্রকাশন ও সরল তিলেঙ্গভাষায় পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা লোক-শিক্ষার বিস্তার ও সাধারণের একমত গঠনের প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রায় সমস্ত তিলেঙ্গ-প্রদেশে এখন প্রতিবৎসর জেলাগুলিতে রাজ-নৈতিক ও সামাজিক সম্মিলনীগুলির অধি-বেশন হইয়া আসিতেছে। হনুমন্তরাও প্রভৃতির নেতৃত্বাধীনে একদল উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান যুবক জাতীয় উপায়ে অন্ধ্রগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'অন্ধ্রজাতীয় কলা-শালা' সংস্থাপিত করিয়াছে। কতিপয় পুস্তক-প্রচারিণী সম্প্রদায় মাদ্রাজের বিজ্ঞান-চন্দ্রিকা, মসলিপত্তনের অন্ধ্রভাষা বিবর্দ্ধনী, তাম্বুরুর অন্ধ্রপ্রচারিণী গ্রন্থমালা—অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রয়োজনীয় পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিলেঙ্গ ভাষার উন্নতি কল্পে পরিচালিত অন্ধ্র-ভাষা-পরিষদ, পিঠাপুরে জমিদার ও বেঙ্কট-গিরির মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক শব্দের একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাহাতে দেশীয় ভাষার সাহায্যে নব্যযুগের উচ্চভাব ও আদর্শের শিক্ষাবিধান হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। তিলেঙ্গ 'এন্‌সাইক্লো-পিডিয়া' সংকলন ও সম্পাদন দ্বারা লক্ষ্মণ রাও এক দুরূহ কার্য্যের সমাপন করিয়াছেন। তিলেঙ্গ ভাষায় সংবাদ পত্র পরিচালন ক্রিয়া বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। অন্ধ্র-পত্রিকা নামে যে প্রথম দৈনিক পত্রিকা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে তাহা এখন সাধারণের আদরের সামগ্রী।

আন্দোলনের কার্য্যক্ষেত্র

ব্যক্তিবিশেষের এইরূপ প্রয়াস সমস্ত তিলেঙ্গজাতির সত্বর উন্নতিসাধনকল্পে প্রচুর নহে। সাধারণের সুখ ও উন্নতি-বর্দ্ধনের জন্য দেশময় একটি প্রতিনিধিস্থানীয় ও সুনিয়ন্ত্রিত সম্প্রদায় স্থাপন অতীব আবশ্যক। অন্ধ্র আন্দোলনের ফলে প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্র-সম্মিলনী ও তাহার স্থায়ী সদস্যগণ এইরূপ সম্প্রদায়ের কার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে সমস্ত তিলেঙ্গ জাতির উৎকর্ষ-সাধন ইঁহাদের উপর সবিশেষ নির্ভর করি-তেছে। ১৯১৩ ও ১৪ সালে বাপাতলা ও বেজওয়াদা সহরে সম্মিলনীর অধিবেশন-গুলিতে যেরূপ অধিকসংখ্যক ও প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ হইয়াছিল তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে আন্দোলনটি সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে।

অন্ধ্র আন্দোলনের কার্য্যতালিকার মধ্যে দুইটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা, দ্বিতীয় তিলেঙ্গপ্রদেশগুলিকে লইয়া একটি বিভিন্ন বিভাগ গঠন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিলেঙ্গরা শিক্ষায় অনেকের পিছনে পড়িয়া আছে ও এই বিষয়ে তাহাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তাহাদের গ্রাজুয়েটের সংখ্যাও স্বল্পমাত্র অল্প।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহার বিভিন্ন বিভাগে সমুচিত মনোযোগ প্রদর্শন ও প্রকৃষ্ট পরি-চালন এখন দুরূহ হইয়াছে।

তিলেঙ্গ প্রদেশের মধ্যস্থলে একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ছাত্রবর্গের শিক্ষার অনেক সুবিধা ঘটিবে এবং জনসাধারণের মনকে উচ্চশিক্ষা বা আদর্শের প্রতি প্রকৃত পরিমাণে সচেষ্ট ও সজাগ রাখিবে। শিক্ষা সম্বন্ধে লোক যে সকল অভাব অভিযোগের উত্থাপন করিবে সেইগুলির দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা সহজ হইবে এবং আশা করা যায় বর্তমানের দোষগুলির নিরাকরণ এই উপায়ে শীঘ্রই সংসাধিত হইবে। তিলেঙ্গভাষার প্রতি এখন যেরূপ একটা ঔদাসীন্য দৃষ্ট হয় তাহা অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইবে। তখন উহার প্রতি সমধিক যত্ন প্রদর্শন বশতঃ ভাষা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়া সাধারণের পাঠ্য পুস্তকে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে। ঢাকা ও বাঁকিপুরের জন্য এক এক স্বতন্ত্র বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। নাগপুর ও রেঙ্গুনে ঐরূপ স্থাপনার প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের বিচারাধীনে আছে। সমস্ত অন্ধ্রজাতি সংখ্যায় ২ কোটি ২০ লক্ষ এবং ৪০০০০ বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া বাস করে। ইহাদের পক্ষ হইতে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং আশা করি সরকার বাহাদুর তাহা সমর্থন করিবেন।

সমস্ত প্রেসিডেন্সীর রাজকার্য্যাবলী তিলেঙ্গ প্রদেশের বহির্ভূত মাদ্রাজে সাধিত হইয়া থাকে সুতরাং রাজধানীর মধ্যস্থলে যে সকল সভ্যতার উপকরণের সমাবেশ হয় তিলেঙ্গরা তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। শক্তি বা প্রতিপত্তির ক্ষেত্রস্থলে আপনাদের লোকের অনটন বশতঃ তাহাদের উন্নতির যথেষ্ট বাধা হইতেছে। ৫০ বৎসর পূর্বে যে জাতি আপনাদের উৎকর্ষসাধনে অগ্রগামী তাহাদের সহিত একত্র বসবাস হেতু তিলেঙ্গদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় এবং এই অসমান প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা স্বীয় উন্নতিসাধন করিতে বিশেষ সমর্থ হয় না। তিলেঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য অনেকটা পূর্ণ বলিতে হইবে এবং তাহারা প্রকৃত জাতীয়ভাবে আপন ইতিহাস ও আদর্শ অনুযায়ী উহার উৎকর্ষ বিধানে সমুৎসুক।

যে সমস্ত প্রদেশগুলি এখন ইহাদের বাস-স্থান তাহা জাতি, ভাষা বা ভৌগলিক সীমা অনুসারে বিভিন্ন নহে, কেবল শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এইরূপে বিভক্ত। ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশগুলির অনিয়মিত বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন এবং তাহাদের পুনর্বি-ভাগের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন। মনে হয় এই পুনর্বিভাগ ব্যাপারে ভাষানুযায়ী ভাগকরণই বিশেষ সুবিধাজনক।

অন্ধ্রগণ সংখ্যায় হিন্দী, বাঙ্গলা বা বিহারী-ভাষী লোকের পরেই অব্যবহিত স্থান অধিকার করে। তামিল মালেয়ালী, ক্যানা-রিজ, মারাঠী বা পাঞ্জাবী অপেক্ষা ইহারা সংখ্যায় অধিক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ১ কোটী ৫৭ লক্ষ অন্ধ্রের বাস। ইহার মধ্যে ১ কোটী ৩০ লক্ষ উত্তর ও মধ্যভাগে ১১টি জেলাতে বাস করে। এই স্থানের পরিমাণ ৭ কোটি ৭০ লক্ষ বর্গমাইল এবং সমস্ত প্রেসিডেন্সীর অর্দ্ধেক কর এই স্থান হইতে আদায় হয়। এই অবস্থায় ইহাকে লইয়া একটি বিশেষ প্রদেশ সংগঠন করা অন্যায় নহে। মধ্যভারতের তিলেঙ্গগুলিকে লইয়া উত্তরভাগের সহিত জুড়িয়া দিলে একটি বড় প্রদেশ হইবে। অথবা বর্তমান অবস্থায় ইহাকে একটি ছোট প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বাঙ্গালীর ইহাতে অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। অন্ত্রদিগের মধ্যে এই আত্মোন্নতির চেষ্টা সম্বন্ধে বঙ্গদেশের লোক কিছুই জানেন না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের এইসব প্রচেষ্টাগুলির ভিতরের কথা বুঝিতে হইবে এবং ভারতীয় সভ্যতার আত্মা কিরূপভাবে আমাদের মধ্যে তাঁহার শক্তি ও প্রকাশ ফুটাইয়া তুলিতেছেন আমাদের ভাবুকগণকে একবার সে কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জনসাধারণ তাঁহাদের দেশটা কতবড় এবং কতদিকে কত কাজের ও কর্ম্মীর দরকার, কতখানি ত্যাগ, উৎসাহ ও চরিত্রবল চাই তাহার পরিচয় লাভ করিতে চান তবে এই সব প্রচেষ্টা সম্বন্ধে তাঁহাদের অবহিত হওয়া আবশ্যক।

* *
*

৩। বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালাদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে, আর এই রোগ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে যে সকল স্থানে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধও ছিল না এক্ষণে সেই সকল স্থান এই রোগে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রভৃতি কিছু পূর্ব্বে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া খ্যাত ছিল, আজ সেখানে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রাদুর্ভাব।

চিকিৎসাতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ বলেন যে, যে সকল রোগে বঙ্গদেশের অধিবাসীরা ভোগে ও মরে, তাহার প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ দেশ হইতে দূর করা যায়। বিজ্ঞানে উন্নত ইয়োরোপ আজ ব্যাধির বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে। মধ্যযুগের কুষ্ঠরোগ এখন ইয়োরোপ হইতে বিতাড়িত। জার্ম্মাণীতে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টায় বসন্তরোগ বহুপরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে। স্বাস্থ্যজ্ঞানের সাহায্যে মানবের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে; মারাত্মক রোগসমূহ তাহাদের ভীষণতা ত্যাগ করিতেছে।

ম্যালেরিয়াকেও এইরূপে দেশ হইতে তাড়ান যায়। অনেকেই জানেন পানামা খালের নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বে এই রোগ অতিশয় প্রবল ছিল। মজুরেরা খাল কাটিতে গিয়া অনেকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু অধুনা ঐ প্রদেশের স্বাস্থ্য পৃথিবীর অন্যান্য স্বাস্থ্যকর স্থান অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ১৯০১খৃঃ অঃ ইটালীতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৩,০০০ ম্যালেরিয়া রোগী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু ১৯০৮ খৃঃ অঃ ঐ রোগে মাত্র ৩,৪৭৭ লোক মরিয়াছে।

কিন্তু বঙ্গদেশে ম্যালেরিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মাঝে মাঝে কিছু কম দেখা যায় বটে কিন্তু গড়ে হিসাব করিলে মৃত্যুসংখ্যার বৃদ্ধি বই হ্রাস দেখা যায় না। এদেশে বৎসরে যত লোক মরে তাহার প্রায় শতকরা ৭২ জন ম্যালেরিয়া রোগী। মালদহ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এই তিন জেলাতেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ঢাকা, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় এইরোগ মারাত্মক না হইলেও লোকের রক্ত দূষিত করিয়া মানুষকে উদ্ভিদে পরিণত করিয়াছে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের দৌরাত্ম্য শিশুগণের উপরে সমধিক। কত সহস্র বঙ্গীয় শিশু মনুষ্যত্ব বিকাশের পূর্ব্বে অকালে প্রাণ হারাইতেছে! ম্যালেরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোকগণ বলিষ্ঠ সন্তান প্রসব করিতে পারেন না। অধিকন্তু গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলে

গর্ভস্থ শিশুর সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। ম্যালেরিয়ার আনুষঙ্গিক রোগগুলি, যথা, প্লীহা, রক্তহীনতা প্রভৃতি বাঙ্গালীকে নিস্তেজ, স্ফূর্তিহীন ও অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে।

শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজাণু প্রবেশ করিলে রক্তের লাল কণিকাগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ফলে লোকে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। মশকই প্রধানতঃ ম্যালেরিয়ার বীজাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এনোফিলিস জাতীয় মশকের দংশনই ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ। সুতরাং মশকের বিনাশ ও উহার আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করা—এই দুই উপায়ে এই রোগ অনেক পরিমাণে তাড়ান যায়।

জল বহুক্ষণ একস্থানে বদ্ধাবস্থায় থাকিলে তাহাতে মশক জন্মে। অল্প পরিসর স্রোতহীন নদী, সঙ্কীর্ণ পুষ্করিণী, নালা, কূপ প্রভৃতি স্থানে মশকের আড্ডা। এইখানেই মশকেরা প্রত্যহ ডিম পাড়ে এবং প্রত্যহই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। বর্ষার জল গ্রামের মধ্যে স্থানে স্থানে জমিয়া থাকে। তাহা বাহির করিয়া দিবার সুবন্দোবস্ত নাই। জল নিকাশের অভাবে ম্যালেরিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রাম্য পুকুরগুলি অপরিষ্কার। জলে যে আগাছা জন্মে তাহা মশককুলের আশ্রয়স্থল। অধিকন্তু পুকুরের চারিপার্শ্বে যে মহলা জমিয়া থাকে তাহা বর্ষাকালে জলে ধুইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়া জ্বরের আর একটী কারণ দেশে অন্নাভাব। লোকে পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। সুতরাং রোগের বীজাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার রক্তের যে ক্ষমতা আছে, তাহা কমিয়া যায়। স্বাস্থ্যের মুখ্য নিয়মগুলি অবহেলা করাও বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রাবল্যের আর একটী কারণ।

কিন্তু এই রোগের আক্রমণ হইতে লোককে বাঁচান যাইতে পারে। যে ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার গ্রামগুলিকে শ্মশান করিয়া ফেলিয়াছে, যাহার দৌরাত্ম্যে আমাদের পল্লীসমাজ আজ প্রাণহীন, যে ব্যাধির অত্যাচারে বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ জাতি তাহার প্রতিকার আছে, মানুষের চেষ্টায় তাহার নিবারণ সম্ভবপর—ইহা একটা মস্ত আশার কথা। কিন্তু এখন আমাদের পল্লীসমাজ ধ্বংসের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। যাঁহাদের পয়সা আছে তাঁহারা সহরে গিয়া বাস আরম্ভ করিয়াছেন। জমিদার কলিকাতায় থাকেন, পল্লীর হতভাগ্য প্রজাগণ বছরে বছরে খাজনা যোগায়। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, গাছ প্রতিষ্ঠা, উৎসবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কর্ম্মে পল্লীর লোকদিগকে খাওয়ান একেবারেই চুকিয়া গিয়াছে। এখন ধনাঢ্য ও জমিদারগণের আমোদ আহ্লাদ, ক্রিয়া কর্ম্ম সহরে, এবং সহরে বন্ধুরাই এই সকলের ভাগ পাইয়া থাকে। এমন নিষ্ঠুর, নির্ম্মম উপেক্ষায় গ্রামগুলি যে উচ্ছন্ন যাইবে, পল্লীর দীন দরিদ্র প্রজাকুল যে অসহায় হইয়া পড়িবে তাহা মোটেই বিচিত্র নহে। আমাদের এই সব পাপে পল্লীর প্রাচুর্য্য, প্রফুল্লতা, তেজ, জীবনীশক্তি সবই ব্যাধি অভাব ও মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে একে একে বলি প্রদত্ত হইতেছে। এই যে কলিকাতার এত কাছে নভেম্বর ডিসেম্বর দুই মাসে নদীয়া জেলায় তেইশ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মরিল, তাহাতে সহর-সর্ব্বস্ব, সহর-মুখো বাঙ্গালী কি একবার পরিণামের কথা ভাবিয়া দেখিবেন না? কিসে এই শমনের নির্ম্মম দূত ম্যালেরিয়ার কবল হইতে এখন এই অভাগা দেশের মুমূর্ষু লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচাইতে পারা যায় তাহা না

ভাবিলে আত্মহত্যা ও স্বজাতিহত্যার দুরপনেয় পাপে বাঙ্গালীকে চিরকাল কলঙ্কিত থাকিতে হইবে। যে কয়টী প্রতিকারের উপায় আমরা কাজে পরিণত করিয়া উঠিতে পারি আজ তাহারই উল্লেখ করিব। ইহাতে বহু অর্থ, উৎসাহ ও শ্রমের আবশ্যক। কিন্তু আর ত বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আর যাহার দ্বারা এত লোককে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার অপেক্ষা মহত্তর ও পবিত্রতর ব্রত বোধ হয় বর্ত্তমানে আমাদের আর কিছুই নাই।

আমাদের দেশ নদীমাতৃক এবং দেবমাতৃক। বর্ষায় মেঘ অশ্রান্ত বর্ষণে বাঙ্গালাদেশ জলে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে রেলের যুগের আগে জল নিকাশ নদ নদী খাল খালের দ্বারা হইত। এখন বর্ষার উপচিত জলরাশি আটকাইয়া থাকে। অনেক স্থলে রেলে জলের নিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, এবং অনেকগুলি নদী পলি পড়িয়া জলনিকাশের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন বদ্ধজল নিকাশের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে মশকের প্রকোপ অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে। বৃষ্টির জল যেখানে জমিয়া থাকে, সেই সব স্থান ম্যালেরিয়ার বিষদন্তকারী মশকের আবাস স্থান হইয়া উঠে। আমাদের দেশে জঙ্গলা আগাছা প্রভৃতি বেশ বাড়িয়া উঠে। বর্ষাকালে এই সব আগাছা পচিয়া মশকবংশের শ্রীবৃদ্ধির বেশ সহায়তা করে। সুতরাং সর্ব্বতোপ্রযত্নে এইসব পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। যে জল পরিষ্কার থাকে তাহাতে মশকগণ সাধারণতঃ ডিম পাড়ে না; এবং পরিষ্কার পুকুরে মশকগণ ডিম পাড়িলে মৎস্যকুল তাহা খাইয়া ফেলে। যে সব বদ্ধ জলে মশা জন্মে তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে কেরোসিন তেল ঢালিয়া কেহ কেহ দেখিয়াছেন উহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই দীন হীন দেশে কেরোসিন তেল ঢালিয়া মশকধ্বংসের প্রস্তাব বোধ হয় নিষ্ঠুর উপহাস। পল্লীগ্রামে মাটীর ঘর করিবার সময় গর্ত্ত করা হয়। বর্ষাকালে ঐ গর্ত্তগুলি ছোট বড় ডোবায় পরিণত হয়। এইরূপ প্রথা স্বাস্থ্যের একান্ত প্রতিকূল। যত শীঘ্র সম্ভব ঐ গর্ত্তগুলি বুজাইয়া দেওয়া উচিত। মশারি ব্যবহার করিলে মশকের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যেখানে দুই বেলা পেট ভরিয়া ভাত জুটে না, সেখানে মশারির কথা বলা একটা বিড়ম্বনা মাত্র। বাটীর চারিপার্শ্ব পরিষ্কার রাখিলে, গৃহগুলি পরিচ্ছন্ন, হাওয়া খেলিবার উপযোগী এবং জিনিষ পত্রে ঠাসাঠাসি না করিলে মশার প্রকোপ কম হয়। আর লোকে যদি ভাল করিয়া খাইতে পায় তাহা হইলে ম্যালেরিয়ায় বৎসরে এত লোক মরিতে পায় না।

ডাক্তারেরা বলেন কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দেহ। সিন্‌কোনা আবিষ্কারের পর হইতে ম্যালেরিয়া কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশের লোক এমন কি কয়েকজন ডাক্তারেও কুইনাইন ব্যবহারে ভয় পান। বহু সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ ডাক্তারের মতে এরূপ ভীতি অমূলক। তাঁহারা বলেন, যাহারা ম্যালেরিয়ারোগী তাহাদের সপ্তাহে অন্ততঃ ১০ গ্রেণ কুইনাইন খাওয়া উচিত। পুষ্টিকর খাদ্য, উন্মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নিয়মিত ব্যায়াম, জল নিকাশের বন্দোবস্ত, মশকাদি নিবারণের উপায় প্রভৃতি সাধারণতঃ ম্যালেরিয়া নিবারণ বা উপশমনের পন্থা

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ম্যালেরিয়ার বাস্তুভিটা বাঙ্গালার অধিবাসিগণ এগুলি শুনিয়া আসিতেছেন। একবার ইহাদের কতগুলি কাজে লাগাইতে পারেন তৎসম্বন্ধে মনোযোগী হউন। আমরা দেখিতে পাই মানুষের চেষ্টা বিজ্ঞানের তথ্যগুলি কাজে লাগাইয়া অন্য দেশে ম্যালেরিয়াকে নিবৃত্ত করিয়াছে। সুতরাং ম্যালেরিয়ার প্রতিকার আছে, চেষ্টা করিলে ম্যালেরিয়া তাড়ান যায়। তবে তাহাতে বহু অর্থব্যয় ও চেষ্টার প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী উভয়েই সচেষ্ট না হইলে এই দুরূহ কার্য্য সম্ভব হইবে না। কিন্তু আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। মরণের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লড়াই না করিলে আমরা ক্রমে উজাড় হইয়া যাইব। তাই গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী আজ বাঙ্গালীর প্রাণ-কয়কর ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন করুন। নচেৎ সোণার বাঙ্গালা শ্মশান হইতে বেশী বিলম্ব লাগিবে না।

৪। সফলতার প্রয়োজন

ভাণ্ডারে অনেক রত্ন রহিয়াছে কিন্তু দুয়ারে চাবি দেওয়া, সুতরাং সেগুলি কাজে লাগিতেছে না। আমাদের অবস্থা এখন সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। অর্থ বা যোগ্যতা আমাদের দেশে একান্ত দুর্লভ নয়। ব্যাঙ্কে সামান্য সুদে বাঙ্গালীর লক্ষ লক্ষ টাকা রহিয়াছে। আর গবর্ণমেণ্টের বড় বড় পদগুলি ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর উপর কাজের ভার। আমাদের রমেশ দত্ত, রমেশ মিত্র, কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় পদে অন্য কাহারও অপেক্ষা কম যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। ইংরেজের প্রথম আমলে ব্যবসা বাণিজ্য মুৎসুদ্দিগিরি প্রভৃতিও বাঙ্গালীর এক চেটিয়া ছিল। এখনও কঠোর প্রতিযোগিতার দিনে রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ পাল, সীতানাথ রায়ের মত লোক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর শক্তি সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এই দারুণ জীবিকা-সঙ্কটের যুগেও প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন বলিয়া টিকিয়া আছেন। বাঙ্গালীর অর্থ আছে, বাঙ্গালীর যোগ্যতা আছে, তবে কেন বাঙ্গালী চাকরী ছাড়া অন্য কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না? চারিদিকে কেন লোকসানের পর লোকসান্ আসিয়া বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে? তাহার কারণ উপর্য্যুপরি বিফলতা। বহু কারবারে একলা এবং জোট বাঁধিয়া আমরা লোকসান্ দিয়াছি। এত লোকসানের পরেও উৎসাহ এবং টাকা না হওয়া বিচিত্র নহে। কেন এমন বারংবার বিফলতা আসিয়া আমাদের চেষ্টা পণ্ড করে, তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। বাঙ্গালীর প্রাণের দরজায় চাবি পড়িয়া গিয়াছে। তাহার উৎসাহের দ্বার তাই রুদ্ধ এবং অর্থ, কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার ও ব্যাঙ্কের মধ্যে আরাম শয্যা খুঁজিয়া লইয়াছে। আর একটা কথা, এই দরিদ্র দেশে অসংখ্য অভাবগ্রস্ত লোক সুদে টাকা ধার করেন, সুতরাং তেজারতি একটা মস্ত লাভজনক ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। যে ধার করে দেনার দায়ে তাহার ভিটা মাটি বিকাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি ধার দেন তাঁহার টাকা ও সুদে আসলে মোটা হইয়া ঘরে ফিরে। বাঙ্গালায় তাই মহাজনেরা ফাঁপিয়া উঠিতেছেন এবং এই কারণেই জেলায় জেলায় "লোন অফিস"-

গুলি বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে কিন্তু তেজারতিতে একের লাভ দশের লোকসানের উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন বেশ গুছাইয়া উঠিতেছেন আর দশজন সেই সঙ্গে তলাইয়া যাইতেছে। ব্যবসায়ের লাভ কিন্তু দশের কড়ি ভবিয়া একের ঘরে জমা করে না। যাহারা খাটে তাহারা পারিশ্রমিক পাইয়া দু পয়সার মুখ দেখিতে পায়, এবং ধনীও লাভবান হন। ক্রেতারা ত মাল কিনিতেই। তাহাদের অভাব তাহাদিগকে মিটাইতেই হইত। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান তাই আজ ব্যবসাকেই মুখ্য করিয়াছে, অন্য সব ইহার কাছে গৌণ। মানুষের অভাব চিরকাল থাকিবে সুতরাং মালের কাটতি পৃথিবীতে কমিবে না। কিন্তু এই ব্যবসায়ে আমরা বাঙ্গালী জাতি উদাসীন এবং বারংবার বিফল মনোরথ। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়িয়া কেবল মাত্র চাকুরীজীবী হইয়া থাকিলে আমরা আর বাঁচিতে পারিব না। এখন সব দিক দিয়াই দেখিবার বিষয় কি করিলে ব্যবসায়ের দিকে আমাদের উৎসাহ ও চেষ্টার স্রোত ফিরিতে পারে। অভাবের নিষ্ঠুর আঘাতে আমরা আজ কাল এ বিষয়টা কিছু কিছু বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদেরই চোখের সামনে মাড়-ওয়ারী,ভাটীয়া, গুজরাটী, কাবুলীওয়ালা প্রভৃতি কেমন বিস্তর টাকা উপায় করিতেছে। তাহারা ও বাঙ্গালীর মত শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং আধুনিক জ্ঞানে অগ্রসর নহে। আমরা চেষ্টা পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি। বাঙ্গালী আজ এই বিশ্বাসটী আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মূলধন জুটিতেছে না, আমাদের নিজেদের ব্যবসা বিষয়ে যোগ্যতায় আমরা নিজেরাই অবিশ্বাসী। এই দারুণ অবস্থার প্রতিকার—সফলতা।

যদি বাঙ্গালীর কাজগুলি বেশ সফল হইয়া উঠিতে থাকে, যাঁহারা কোনও কারবারে হাত দিয়াছেন তাঁহারা যদি আজ প্রকৃতই লাভ দেখাইতে পারেন তবেই লোকের প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে। এখন আমাদের দেশে যোগ্যতা, অধ্যবসায় ও চরিত্র বলের পরিচয়—সিদ্ধির চিত্তর দিয়া। সকলেই গুছাইয়া উঠিতেছে, বাঙ্গালী একবার গুছাইয়া উঠিবার পরিচয় প্রদান করুক, তখন লোকে টাকা বাহির করিবে এবং বাঙ্গালীর ব্যবসা বুদ্ধি এবং কার্য্যতৎপরতা বিশ্বাস করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। সুতরাং ব্যবসাক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্ণধারগণ প্রাণপণ করিয়া হাড়ভাঙ্গা খাটিয়া কারগুলি সফল করুন। একবার তাঁহারা আমাদের উপর্য্যুপরি বিফলতায় অবসন্ন ও নৈরাশ্যে নির্জ্জীব হৃদয়ে সিদ্ধির আনন্দ জাগাইয়া তুলুন। আমরা তখন দেখিব সাফল্যের আনন্দ, সার্থকতার আশা কেমন সংক্রামক হইয়া উঠিবে; দুইটা সফল চেষ্টা আর দশটার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে। তখন বাস্তবিক দেখিব "Nothing succeeds like success." কাজে সফলতা আনয়ন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সফলতারই প্রয়োজন, কারণ সিদ্ধিই আশা আনন্দ বিশ্বাস ও শক্তি জাগাইয়া তোলে। আজ তাই বহু বিফলতার অবসাদ ও অপবাদের মধ্যে বাঁচিবার অমৃত বীজ সাফল্য, আর ভবিষ্যতের আশা সিদ্ধি!

• •
•

৫। শিশুপাঠ্য পুস্তক

আজকাল বেশীভাগ ভূতের গল্প, আজগুবি কাহিনী, হাসিখুসির কথা লইয়াই ছেলেদের জন্য বই লেখা হইতেছে। ইহাতে ভূতপ্রেত

সম্বন্ধে নানা রকম বিশ্বাস ছেলেদের মনে ধীরে ধীরে গাঁথিয়া যাইতেছে ছেলেরা প্রায়ই কিছু শেখে না। তাহাদের কল্পনা-শক্তিও যে এই ধরণের গল্পের বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না। কেন না কার্য্যকরী কল্পনা জাগাইবার মত লিপি-চাতুর্য্য খুব কম কিন্তু সাহিত্য লেখকদিগের মধ্যেই দেখা যায়। কথার ছলে নীতি-শিক্ষা, কোন বড় লোকের জীবনের কাহিনী, তাঁহার বড় বড় কাজ কিছুই ছেলেরা জানিতে পায় না। নানা রকমের বই বাহির হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি প্রায় সবই এক ধরণের। অনেক স্থলেই ছেলেদের হাসাইয়া, তরল আমোদের কথায় তাহাদের চমকাইয়া পুস্তকের কাটতি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর শিশুদের বুঝিবার ভাষা এখনও ঠিক গড়িয়া উঠে নাই। ছবি দেখিয়াই প্রায় তাহারা ভুলিয়া যায়। 'লোজেনজ্' (লেবেনচুস্) বেশ মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু উহাতে শরীরের পুষ্টি হয় না। আমাদের শিশুপাঠ্য সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথাটী বেশ খাটে। নানারকম রংদার ছবি, আমোদের কথা ছেলেদের মাতাইয়া তুলিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে সার কত-টুকু? শিশুদের হৃদয়ের বৃত্তির কোমল কুঁড়ি-গুলি ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে তাহারা কতটা সাহায্য করে? Child is the father of the man—ছেলেরা ত চিরদিন ছেলে থাকিবে না, বড় হইয়া নানা দায়িত্বপূর্ণ কঠোর কাজ, জীবন অন্নসমস্যার সমাধান তাহাদেরই ত করিতে হইবে। সকল জাতির ভবিষ্যতের ভরসা তাদের শিশুগণ। আমা-দেরও ভবিষ্যতের আশা আমাদের শিশুরা। সুতরাং শিশুদের শিক্ষাবিষয়ে আমাদের আর অমনোযোগী থাকা শোভা পায় না। ইংরাজেরা তাঁহাদের ছেলেদের জন্য কেমন সুন্দর, সরল বই লেখেন! Told to the children series' 'Tales for the Bairns series' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী কি চমৎকার! কত কথাই না ইংরাজদের ছেলেরা এই সব বই পড়িয়া শেখে! ভবিষ্যৎ-জীবনে সেগুলি অনেক কাজে লাগে। আমাদেরও এইরকম শিশুপাঠ্য সাহিত্যের প্রচারের জন্য চেষ্টা না করিলে চলিবে না। এ কাজটা সুসম্পন্ন হইলে আমাদের প্রভূত কল্যাণ হইবে। পৃথিবীর নানা বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথা সরল চলিত ভাষায় লেখা চাই। মহাপুরুষ, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীরদের কথা, জীবনী ও কাজ দেশের ছেলেদের শিশু-পাঠ্য পুস্তকের ভিতর দিয়া জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে বড় বিষয়ের অবতারণা করিয়া—অবশ্য একহাত জিনিসের দশহাত টিপ্পনী বাদ দিয়া বালকদিগকে নানা বিষয়ের জ্ঞান দিতে হইবে। ইহার সঙ্গে হাসি ও আমো-দের বই পড়িলে ক্ষতি হইবে না। এখন যাঁহারা বই লিখিতেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ এই জিনিসটি ধরিয়াছেন এবং খানকতক সুপাঠ্য পুস্তকও বাজারে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। একদল হৃদয়বান্ সুশিক্ষিত লোক এই কাজের ভার গ্রহণ করুন, ইহা একটা বড় কল্যাণের কাজ ভাবিয়া তাঁহারা শিশুদের বুঝিবার ভাষায় শিশুদের মনোজ্ঞ ও হিতকর বই লিখিবার ব্রত লইয়া কাজে হাত দিন।

৬। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন ও সভাপতি শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের বক্তৃতা

প্রতি বৎসরেই বাঙ্গালাদেশে কোন না কোন জেলায় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া থাকে। দেশে যখন একটা উৎসাহ জাগিয়া উঠে, তখনই সম্মিলনে প্রতিনিধি ও দর্শকের সংখ্যা খুব বাড়িয়া যায়। "স্বদেশী"র যুগে তাই কনফারেন্সের বৈঠকগুলি বেশ জমিয়াছিল। কিন্তু এখন আবার কনফারেন্সে ভাঁটা লাগিয়াছে। ইহার কারণ আমাদের দেশের লোক অবসাদ ও নৈরাশ্যে আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতেছে। যাঁহারা কতক বছর আগে প্রাদেশিক সম্মিলনে গিয়া তর্ক, বিরোধ, কোলাহল করিতে কোমর বাঁধিয়াছিলেন, কনফারেন্সকে প্রকৃত জাতীয় কল্যাণের পথে চালাইতে হইবে বলিয়া যাঁহারা সে সময় অসহিষ্ণু ও ক্ষমাশূন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই আজ কনফারেন্সের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন।

এতকাল প্রায়ই সভাপতির অভিভাষণ গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা এবং গবর্ণমেণ্টের কাছে 'ইহা দাও' 'উহা দাও' প্রভৃতিতেই ভুড়িয়া থাকিত। দেশের লোকের কি কি করিবার আছে, আত্ম-শক্তির স্ফুরণের উপায় কোন্ গুলি এবং বৎসর ব্যাপিয়া দেশের নেতারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া কোন্ কাজগুলি করিবার সঙ্কল্প করেন এবং কি করিয়াই বা সেই সঙ্কল্প সুসিদ্ধ হইতে পারে—এই সব বিষয়ে সভাপতি মহাশয়েরা অনেক সময়েই গম্ভীর থাকিয়া যাইতেন। এবার কিন্তু মতিলাল ঘোষ মহাশয় সে অপবাদ দূর করিয়াছেন। তিনি দেশের সেবার মাথার চুল পাকাইয়া তাঁহার কর্ম্মবহুল সুদীর্ঘ জীবনে যে শিক্ষাগুলি লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণনগরের অধিবেশনে সেইগুলি বেশ সুস্পষ্ট, সরস ও নির্ভীকভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এবারকার বৈঠক সুতরাং একদিক হইতে বেশ কাজের হইয়াছে। আমরা চিরকাল কি বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিব? কর্ত্তব্যগুলি পরে করিয়া দিবে আমরা টিপ্পনী ও করতালি দিয়াই কি নিজেদের কাজের পালা শেষ করিব? এই বাহিরের দিকে চোখ রাখিয়া আমাদের ভিতরের খোঁজ হারাইয়া ফেলিতেছি। দেশে জল নাই, পল্লীর লোকেরা দূষিত জল পান করিয়া ভুগিতেছে, আমরা তাহার একমাত্র প্রতীকার বুঝিয়াছি, খবরের কাগজে আন্দোলন ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের নিকট দরখাস্ত। পল্লীর অসংখ্য অসহায়, নিরন্ন নরনারী নির্ম্মম জীবিকা-সংগ্রামে অবসন্ন হইয়া দিন দিন মরিতেছে, যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও ত গাছপালার মত কোন মতে কায়ক্লেশে টিকিয়া আছে। আমরা সহর হইতে—দল বাঁধিয়া সম্মিলনের বৈঠকে প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন, অনুমোদন ও নির্দ্ধারণ করিব, সেই উপলক্ষে বেশ বক্তৃতা (তাহার অধিকাংশই ইংরাজীতে) দিব, তারপর যে যাহার ঘরে ফিরিয়া ভাল মানুষের মত নিজে নিজের জীবিকা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খাটিব—এমন করিয়া স্বদেশসেবার বিড়ম্বনা আর কতদিন চলিবে? আর ইহাতেই বা কি করিয়া লোকের উৎসাহ, অনুরাগ ও আত্মোৎসর্গ জাগিবে? কনফারেন্স 'টনের' চারার মত চিরদিনই কি দেশের মাটী হইতে আপনাকে এমনই করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখিবে? বাঙ্গালী জাতির কর্ত্তব্য ও বক্তব্য বুঝাইবার ভার যাঁহাদের উপর

সেই সভাপতি মহাশয়েরা ইংরাজীতে তাঁহাদের কথাগুলি বলিবেন, সুবিজ্ঞ এবং সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ও বাগ্মী মহোদয়েরা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন, সম্মিলনের নির্দ্ধারণগুলি ইংরাজী ভাষায় লেখা হইবে, সুতরাং "বঙ্গীয়" প্রাদেশিক সম্মিলন "বঙ্গীয়" জনসাধারণের নিকট 'পরের মত' ঠেকিবে, তাহাদের প্রাণকে গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ইহা বোধ হয় বিচিত্র নয়। কংগ্রেসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা আসেন, কাজে কাজেই সেখানে ইংরাজি অপরিহার্য্য কিন্তু বাঙ্গালীর সম্মিলনে আসল কথাগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বলা হইলে তাহাতে অধিক কাজ হয়। অন্ততঃ সভাপতির অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ কয়েক হাজার ছাপাইয়া জেলায় জেলায় সাধারণ লোকের মধ্যে বিলাইবার ব্যবস্থা করিলে কনফারেন্সের সহিত দেশবাসীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িবে।

মতিবাবু এবার গোড়াতেই বলিয়াছেন, "আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য নিজেদের ঘর সামলান। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আত্মনির্ভরতা—এই দুই উপায়ে আমরা নিজেদের দুর্দ্দশা দূর করিতে পারি। রাষ্ট্রীয় আন্দোলন এখন দরকারী, কারণ আসল ক্ষমতা কিছুই আমাদের হাতে নাই। কিন্তু মুখ্যতঃ আমাদের চেষ্টা নিজেদের ঘর নিজেরা সামলাইয়া লইবার দিকে নিয়োগ করিতে হইবে। আমরা নিজেরাই আমাদের দুঃখ অভাব সৃষ্টি করি। মাদক-দ্রব্য পরিহার, মামলাবাজী ত্যাগ এবং বিদেশী জিনিষ বর্জ্জন দ্বারা নিজেদের প্রচুর কল্যাণ নিজেরাই করিতে পারি। যখন কোন বিদেশী—জিনিষ আমরা ব্যবহার করি তখন মনে পড়া উচিত আমরা কিরূপ অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছি। ম্যানচেষ্টার কাপড় না পাঠাইলে, লিভারপুল লবণ না যোগাইলে আমাদিগকে বিবস্ত্র থাকিতে ও আলোণা খাইতে হইত। ইহা অপেক্ষা হীনতার বিষয় আর কি হইতে পারে? আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কিন্তু কি করিয়া কৃষির উন্নতি করা সম্ভব সে জ্ঞান তাহাদের আদৌ নাই। আমাদের শিল্পী ও উৎপাদনকারীরা (manufacturers) লোপ পাইতেছে। কারণ কি করিয়া তাহাদের পুরাতন কৌশল ও নৈপুণ্য বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব এবং কিরূপে নূতন প্রণালীর আয়ত্ত করিতে পারিবে—এসব তাহারা কিছুই জানে না। হাজার হাজার লোক স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি না জানিয়া নানারকম রোগে ভুগিয়া মরিতেছে। এই সরল স্বাস্থ্যতত্ত্বগুলি বুঝাইয়া ইহাদের অনেককে অকাল-মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায়। কোথায় সেই কল্যাণকর্ম্মীর দল যাঁহারা আমাদের এই জনসমষ্টিকে বুঝাইবেন কি করিয়া ইহারা আত্মহিত ও প্রতিবেশীদের হিতসাধন করিতে পারে? খৃষ্টানদেশে ধর্ম্মযাজকদের কাছে গিয়া লোকে অনেক ভাল বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এই অভাগাদেশে এমন কেহই নাই যিনি ইহাদের মঙ্গলের জন্য উপদেশ কিংবা দুঃসময়ে সাহায্যের জন্য হাতখানি বাড়াইয়া দেন।"

তারপর সভাপতি মহাশয় ঘর সামলাইবার জন্য একটী plan of work কার্য্যপ্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। মফঃস্বলের প্রত্যেক জেলা হইতে এক বা ততোধিক প্রতিনিধি এবং কলিকাতার ২৫।৩০ জন নেতৃস্থানীয় লোক লইয়া বাঙ্গালাদেশে সাধারণ হিতকর বিষয়গুলির তত্ত্বাবধানের জন্য একটী কেন্দ্র-সমিতির

গঠন করা তাঁহার অভিমত। এই সমিতি প্রতি জেলায় একজন অথবা দুইজন বেতনভোগী কর্ম্মী নিয়োগ করিবেন। বিচক্ষণ দেশভক্ত এবং কার্য্যে কুশলী লোক বাছিয়া এই কর্ম্মের ভার দিতে হইবে। প্রতি জেলার কর্ম্মীর বেতন সেই জেলাই দিবেন।

অতঃপর ঘোষ মহাশয় দেশের এই নব জাগ্রত জাতীয়ভাব (nationalism) সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। এই পবিত্র ভাবটীকে জীবন্ত ও পরিপুষ্ট রাখা প্রত্যেকেরই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ঘোষ মহাশয় প্রতি জেলাকে নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন :—

১। স্বদেশী অর্থাৎ স্বদেশপ্রেমের বিস্তার; ত্যাগ স্বীকার করিয়াও ভারতজাত পণ্যের ব্যবহার; স্বদেশীয় শিল্পের উৎসাহ ও পরিপুষ্টি এবং কৃষির উন্নতি।

২। জনসাধারণের মধ্যে পুস্তিকাপ্রচার বক্তৃতা ও সভাসমিতি দ্বারা শিক্ষার বিস্তার।

৩। সালিশি সভা স্থাপন করিয়া যতদূর সম্ভব আত্মকলহের নিবৃত্তি এবং অবৈতনিক বা বেতনভোগী প্রচারক নিয়োগ করিয়া জাতীয় ভাব বিস্তার।

৪। যতদূর সম্ভব জাতীয় ধারায় সাধারণ ও বৈষয়িক শিক্ষার বিস্তার।

৫। স্বাস্থ্যবিষয়ক উন্নতি।

৬। মিতব্যয়ীভাবে জীবন যাপনের শিক্ষা।

৭। বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী সমাজ-সংস্কার।

৮। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন।

সভাপতি মহাশয় তারপর তাঁহার দেশবাসীদিগকে নির্ভীকভাবে গভর্ণমেণ্টের ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন এবং অন্যায় ও ত্রুটির বিরুদ্ধে সাহসের সহিত, বিদ্বেষ ও অসাধুতা মন হইতে দূর করিয়া, প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন এই পঞ্চকোশ, মাতৃভূমির অক্লান্ত সেবক বাঙ্গালার বর্ত্তমান ও অতীতের, অর্থাৎ ষাট সত্তর বৎসর পূর্ব্বের, যে করুণ চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের হৃদয় বিচলিত করিবে। ষাঠ বছর আগে জাতির সার বলিতে যাঁহাদিগকে বুঝায় তাঁহারা পল্লীতে বাস করিতেন। সুসভ্য জীবন যাপনের উপযোগী সব রকম উপকরণের ব্যবস্থা পল্লীতে ছিল। যেদিন ম্যালেরিয়া বাঙ্গালায় তাহার করালমূর্ত্তি প্রকাশ করিল, তাহার পর হইতে এই ষাঠ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী এই ভীষণ নরমেধ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া আসিতেছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারা ত জীবন্মৃত। একবার ম্যালেরিয়া আক্রান্ত গ্রামে গিয়া দেখ, চারিদিকে অতীত সমৃদ্ধির বিবিধ সম্ভার বিক্ষিপ্ত, পূর্ব্বেকার অভ্রভেদী সৌধ এখন শৃগাল কুক্কুরের আবাসস্থল। এইরূপ লক্ষ্মীর ভিটায় অলক্ষ্মীর রাজত্ব ত চারিদিকে। ঘোষ মহাশয় সভয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন "তবে কি পৃথিবীর বক্ষ হইতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব লোপ পাইবে? বাঙ্গালীর নাম কি মুছিয়া যাইবে? গ্রীকেরাও ত এই ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন গিয়াছিল।" আজ যদি আমরা ম্যালেরিয়ার এই করাল গ্রাস হইতে বাঁচিবার চেষ্টা না করি তবে আমাদের জাতি ত সুনিশ্চিত মৃত্যুর মহাপ্রস্থানে চলিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের কাগজ পত্রে দেখা যায় সাধারণতঃ প্রতি বৎসর ১৩ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ায় মরে। গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জেলাসমূহে লোক সংখ্যা কমি-

যাছে। মৃত্যুর হার জন্মের হারের উপরে উঠিয়াছে। নদীয়া জেলায় গত বৎসর আশী হাজার লোক ম্যালেরিয়াধ ও জ্বরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আর বর্ত্তমান বৎসরে নভেম্বর ও ডিসেম্বর এই দুই মাসে জ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা ২৪ হাজার। সভাপতি মহাশয় বাষ্পাকুল কণ্ঠে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ম্যালেরিয়ার বৃদ্ধির একটা মস্ত কারণ দেশবাসীর দারিদ্র্য। দেশের জল নিকাশের বন্দোবস্তের কথাও তিনি বিশদভাবে বলিয়াছেন। ভিজা মাটীতে বাস করিয়া দেশের লোক স্বাস্থ্য হারাইতেছে। সুতরাং ইহার প্রতীকার আবশ্যক দেশের লোক ভাল খাইতে, ভাল পরিতে ও শুষ্ক জমিতে বাস করিতে পাইলে ম্যালেরিয়া কমিবে—ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। তিনি বলিয়াছেন "আগে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় করিয়া লোকদের বাঁচাও তারপর শিক্ষা দিও।" শিক্ষায় স্বাস্থ্যরক্ষার সহায়তা করিতে পারে। কিন্তু শিক্ষার জন্য বিলম্ব করা চলে, বাঁচিবার বন্দোবস্ত করিতে আর বিলম্ব সহিবে না। ইহার জন্য রোড্‌সেস পাবলিক ওয়ার্কসেস এবং চৌকিদারী খাজনা হইতে অর্থ লইয়া, প্রাদেশিক ও ভারত-গভর্ণমেণ্টের তহবিলের এক অংশ ব্যয় করিয়া এই ম্যালেরিয়া তাড়াইয়া বাঁচিবার পথ না করিলে চলিবে না।

শিক্ষাসম্বন্ধে মন্তিবাবু কয়েকটী বেশ খাঁটী কথা বলিয়াছেন। পাঠ্য ও শৃঙ্খলার চাপে ছেলেরা নিস্তেজ ও আনন্দহীন হইয়া পড়িতেছে। দুর্ব্বল, রক্তহীন, শিক্ষা মাষ্টার সন্তানগণ সারহীন খাদ্যে ক্ষুধা মিটাইয়া এই রোগের পীঠস্থানে দুরুহ পাঠ্যক্রমের চাপে ক'দিন বাঁচিবে? তাহাদের জীবন স্ফূর্ত্তিহীন এবং শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। সভাপতি মহাশয় ছাত্রদিগের এই নিদারুণ স্বাস্থ্যহীনতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য কয়েকজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এবং সরকারী ও বেসরকারী সকল লইয়া একটী "কমিটি" গঠন করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। জাতির ভবিষ্যৎ এই ছাত্রদিগকে বাঁচাইতে হইবে, তাহাদের শক্তি ও আনন্দের জন্য বন্দোবস্ত না করিলে আজ সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যেখানে বিশুদ্ধ বায়ু সুপ্রচুর সেইরূপ উন্মুক্ত স্থানে বিদ্যালয় (open air schools) এবং স্বাস্থ্যনিবাস (sanatoria) স্থাপন তাঁহার মতে একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে, রুগ্ন ছাত্রগণ পরীক্ষান্তে স্বাস্থ্যনিবাসে গিয়া বাস করিয়া শরীর সবল ও সুস্থ করিতে পারিবে। ঘোষ মহাশয় বলেন শৃঙ্খলার (discipline) নামে অতিরিক্ত কড়াকড়ি করা হইতেছে। এই কঠোরতা কমান নিতান্তই আবশ্যক। ইহা আমাদের ছাত্রদের বুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিকূল।

ডিষ্ট্রীক্ট আডমিনিষ্ট্রেশন্ কমিটির মন্তব্যে বর্ত্তমান জেলাগুলিকে ভাঙ্গিয়া আরও কতকগুলি নূতন জেলা সৃষ্টি সম্বন্ধে যে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সভাপতি মহাশয় এক একটী করিয়া তাহার বেশ সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। প্রথমতঃ এই জেলাভঙ্গ ব্যাপারে নিরন্ন প্রজার নিকট হইতে আরও কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সাধারণের সমবেত শক্তি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে (further weakening of popular strength)। এতদিন ধরিয়া যাহাদের মধ্যে ঐক্য ও প্রতিবেশীত্বের ভাব বেশ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, এতকাল যাহারা এক স্বার্থ ও সুখ

দুঃখের ভিতর দিয়া পরস্পরের জন্য মমতা-বোধ করিয়াছে, বেলাভঙ্গের পর তাহাদের এই বহুকালের ঘনিষ্ঠতা চিরদিনের জন্য লোপ পাইবে।

অতঃপর তিনি স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে বিশদ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের "লোকাল সেল্‌ফ গভর্ণমেণ্ট" সম্বন্ধে মন্তব্য বাহির হইয়াছে এবং সেই বিষয়ে দেশের সংবাদপত্র সমূহের বিস্তারিত আলোচনা হইতেছে। সুতরাং আমরা সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার অনুবাদে ক্ষান্ত হইলাম।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় আবেগভরে যুবকদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেক সারবান উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যুবক-গণ! তোমাদিগকে কি স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে দেশের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে? আমরা যাহা বলিতেছি তোমা-দিগকেই ত সেগুলি কাজে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে এই কথাটী মনে রাখিও তোমাদের জাতিকে শক্তিমান্ করিতে হইলে তোমাদের আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। তোমরা নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখ। কোনও জাতি নিজের চেষ্টাতেই বড় হইতে পারে (Nations are by themselves made)। একদল ত্যাগী উৎসাহশীল কর্ম্মীর আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

একদল লোক যাও যাহারা দেশের লোককে বুঝাইবে তাহারা যেন মামলাবাজি ছাড়ে, বিদেশী জিনিস যথাসাধ্য পরিহার করে এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের মত সরলভাবে জীবনযাপন করিতে শিখে। তোমাদের নিকট ইহাতে কি খুব বেশী দাবী করা হইল? তোমাদের কর্ত্তব্য দুরূহ কিন্তু তোমরা হতাশ হইলে চলিবে না। তোমাদের দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে আমাদের মধ্যে বেশ শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে। তোমরা যদি আজ এই বহুবিস্তৃত দেশাত্মবোধ সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া কাজে লাগাইতে পার তবে তোমাদের জাতি আবার শক্তিমান হইয়া উঠিবেই উঠিবে। তোমরা কদাচ আইন ভাঙ্গিও না। প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের ধর্ম্ম তোমরা কাজে ফুটাইয়া তোল ভগবান তোমাদের পথ মঙ্গল-ময় করিবেন। এই হতভাগ্য জাতির শক্তি সঞ্চারের জন্য তোমাদের পবিত্র চেষ্টা জয়যুক্ত হইবে। পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানগণের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এবং তাঁহার করুণায় আমাদের জাতি রক্ষা পাউক।"

আমরা মোটামুটি ঘোষ মহাশয়ের কথা-গুলি অনুবাদ করিয়া দিলাম। যে মুক্তকণ্ঠে বেদনায় তিনি স্বজাতির অবনতি, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের অধোগতির শোচনীয় কাহিনী বিবৃত করিয়া-ছেন, তাঁহার দেশবাসীরা একবার এই বেদ-নায় অংশভাগী হইতে শিখুন। একজন খাঁটি স্বদেশসেবক আজ আমাদের যুবকদিগকে আত্মনির্ভরশীল হইতে, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে আহ্বান করিয়াছেন। এই মুমূর্ষু জাতির রক্ষার পথ তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়া-ছেন। ত্যাগ, সঙ্কল্প, চরিত্রবল ও পরিশ্রম ব্যতীত, আজ কিছুই হইবে না। যাঁহারা বক্তৃতা করিতে ও বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ত ঘরে ফিরিয়াছেন। এখন এই সুদীর্ঘ বৎসরটা তাঁহারা দেশের লোকের সহিত মিলিয়া এই অসংখ্য কর্ম্মের কয়টা করিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করুন। কর্ত্তব্য যখন সুস্পষ্ট, কাজ যখন চারিদিকেই,

তখন আর আলস্য ও স্বার্থপরতায় ডুবিয়া থাকিলে কি করিয়া চলিবে? কনফারেন্স ততদিন এইরূপ নির্জ্জীব এবং সখের জিনিষ থাকিবে, যতকাল আমরা কর্ম্মবিমুখ আলোচনা ও ত্যাগকুণ্ঠ আন্দোলন লইয়া সন্তুষ্ট রহিব। বাঙ্গালী যে মরিতে বসিয়াছে, অন্নের কাঙ্গাল, স্বাস্থ্যহীন নিরানন্দ পল্লীসমাজ যে শ্মশান বহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, তাহাও এখন বুঝিতে বাকি নাই। তবে আর এই নিদারুণ নিশ্চেষ্টতা কেন? আগামী বৎসরে সম্মিলনের অধিবেশনের পূর্ব্বেই কিছু কাজ করা হউক। যখন আগামী বৈঠকে সভাপতি মহাশয় আশ্বস্তকণ্ঠে আমাদের অনুষ্ঠিত কাজগুলি ঘোষণা করিবেন, তখন বাস্তবিকই দেশে আশার ও আনন্দের রোল পড়িয়া যাইবে। অদৃশ্য নবীন হৃদয়ে সেদিন সঙ্কল্পের ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে।

নাট্যসাহিত্যের বর্ত্তমান গতি

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হইতে চলিল এদেশে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক অবলম্বন করিয়া বঙ্গনাট্যশালার দ্রষ্টাগণ দর্শকের সম্মুখে প্রথম উপস্থিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে মহানগরী কলিকাতায় দুই একটী সখের থিয়েটারেও অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি বঙ্গদেশের নাট্যশালার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিব না। প্রায় ৪২ কি ৪৩ বৎসরের মধ্যে সাধারণ নাট্যশালাকে আশ্রয় করিয়া নাট্যসাহিত্য কিরূপে স্ফূর্ত্তি হইয়া পূর্ণতরুতে পরিণত হইয়াছে, বিচিত্র-শাখা-প্রশাখা-ফল-পত্র-পুষ্প-বিশোভিত সে তরু কেমন নয়নাভিরাম এবং অধুনা তাহার কিরূপ পরিণতি, এই প্রবন্ধে তাহারই কথঞ্চিৎ আভাষ দিবার চেষ্টা করিব।

ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়া তাহারই অনুকরণে এদেশে যে সাধারণ নাট্যশালার সৃষ্টি, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে হিন্দু নৃপতিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সূত্রধর নির্ম্মিত কিরূপ নাট্যমঞ্চে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হইত, বহুবর্ষসঞ্চিত অন্ধকারের অন্তরালে সে চিত্র ডুবিয়া গিয়াছিল। মহামুনি ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্রে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে তাহার পরিচয় উল্লেখ থাকিলেও, বর্ত্তমান নাট্যমঞ্চ সে সকল সূত্রনির্দ্দেশের কোন সাহায্যই গ্রহণ করে নাই। নাট্যমঞ্চ সম্বন্ধে যাহা, নাটক সম্বন্ধেও সেকথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে নাট্যকার বলিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, প্রায়শঃ তাঁহারা সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর শাসনাধীন হইয়া তাঁহাদিগের নাটক প্রণয়ন করেন নাই। ইংরাজী থিয়েটারের অনুকরণে যেমন বাঙ্গালা নাট্যশালার জন্ম, বাঙ্গালার নাটকও সেইরূপ প্রধানতঃ ইংরাজী নাটকের অনুকরণে রচিত। আবার, ইংরাজী নাটকের উপর গ্রীসীয় নাট্য-অলঙ্কারের বিশেষ প্রভাব বলিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্যেও ইরাজী ও গ্রীসীয় নাট্যসূত্রের প্রভাব সমভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সেই নিমিত্তই theatre, scene, stage-manager, proscenium, auditorium, enter, exit প্রভৃতি ইংরাজী ও লাটীন পরিভাষাগুলি সহজ ও সরলভাবে যেমন বাঙ্গালা ভাষার অন্তর্ভূক্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, তেমনি drama, plot, action, tragedy, comedy, climax প্রভৃতি ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের শব্দগুলিও বাঙ্গালাভাষার অন্তর্গত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা নাটকের দোষগুণ বিচারে আমরা আর 'মুখং' 'প্রতিমুখং', 'গর্ভং' এসব কিছুই দেখি না, দেখি—introduction, complexity of plot, development, climax, catastrophe ইত্যাদি। ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য যেরূপ ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া আজ দিগ্‌দিগন্তে তাহার বিমল ছটা বিকীর্ণ করিতেছে, ইংরাজী থিয়েটার ও নাটকের

প্রভাবও তেমনি বাঙ্গালা নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছে।

বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে, তাহার কতকটা পূর্ব্বাভাষ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। যথাসম্ভব সংক্ষেপেই আমরা সে কথার অবতারণা করিতেছি।

প্রথম এদেশে যখন নাট্যশালা স্থাপিত হইল, তখন অভিনয়োপযোগী নাটকের সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ই বাঙ্গালার আদিম নাট্যকার। সংস্কৃত নাট্যসূত্রের আদর্শেই তাঁহার প্রথম নাটক "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" রচিত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-রচিত নাটক তখনকার সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইল না। পণ্ডিত রামনারায়ণ কিম্বা তাঁহার পথাবলম্বী আর যাঁহারা এ সময়ে নাটক লিখিলেন, তাঁহাদের রচিত নাটকমাত্রেরই পরিণতি প্রায় একরূপই হইল। তখন বাঙ্গালায় নূতন romanceএর রাজ্য। সে সময়ে নায়িকার মুখে "আর্য্যপুত্র" উক্তি শ্রুতিকটু বলিয়া বোধ হইতেছে। সুতরাং বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠক নূতন ধরণের নাটকীয় রসাস্বাদনের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিলেন। এই সময়েই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের অভ্যুদয়। সাধারণের রুচি বুঝিয়া ইঁহারাই নাট্যসাহিত্যের স্রোত ফিরাইবার প্রথম চেষ্টা করিলেন। কাব্যে মধুসূদন দত্তের আসন অতি উচ্চ হইলেও, নাটকে দীনবন্ধুর ন্যায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইল না। এই নিমিত্তই বঙ্গনাট্যশালার অষ্টাগ্রে "নীলদর্পণ"কেই নাট্যবাণীর চরণে প্রথম অঞ্জলি প্রদান করেন। তাহার পরে তাঁহারা অতি আগ্রহে মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী", "শর্ম্মিষ্ঠা", "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া" প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনের অভিনয় করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য, বাঙ্গালার যে নাট্যমন্দিরাধিষ্ঠিত নাট্যবাণীর বীণার ঝঙ্কারে আজ বাঙ্গালার সাহিত্যকানন মুখরিত, সে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনে প্রথম ইষ্টক প্রোথিত করেন—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আজ বহু-বিচিত্র-চিত্রণটাদি-সজ্জিত বৈদ্যুতিক-আলোকমালায় বিভূষিত নয়নাভিরাম নাট্যপীঠে যে নাটক, গীতিনাট্য, প্রহসন, farce, pantomime, burlesque প্রভৃতির সম্মিলিত ও অসম্মিলিত, মধুর ও কর্কশ, শ্রাব্য ও অশ্রাব্য, সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যের সমন্বয়োত্থিত কোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া—এই দুই মহাপুরুষকেই আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে—আর গর্ব্বে ও আনন্দে স্বতঃই এ হৃদয় আপ্লুত হয়।

নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই, নাট্যশালার প্রথম যুগে অভিনীত হইল—নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, লীলাবতী. জামাই বারিক, কমলে কামিনী, বিয়ে পাগলা বুড়ো, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া ইত্যাদি। এই সময়ে অপ্রথিতনামা অনেক নাট্যকারের নাটক গীতিনাট্যও অভিনয়ার্থ বহু রঙ্গমঞ্চে স্থান পাইয়াছিল। অধুনা যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এইস্থানে "গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার" খোলা হয়। তাহার প্রথম রঙ্গনীতে অভিনীত হইয়াছিল—"কাম্য-কানন।"

বহু নাট্যশালার নিজস্ব নাট্যকার তখন কেহ ছিলেন না। প্রয়োজনমত নাটকাদি

লিখিয়া কে তাহার পরিপোষণ করিবেন? সুতরাং দীনবন্ধু ও মাইকেলের লিখিত সমস্ত নাটক অভিনয়ের পর দর্শকের চিত্তবিনোদনার্থ নূতন গ্রন্থের অভাব হইতে লাগিল। বাহিরের অনেকেই নাট্যবাণীর পূজার নিমিত্ত আপন আপন সাধ্যমত নাট্যপুষ্পাঞ্জলি লইয়া নাট্যশালায় অবতীর্ণ হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, প্রথিত-যশা কবি স্বর্গীয় মনোমোহন বসু, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক প্রবীণ নাট্যকার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, কবিকবি সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার, স্বর্গীয় হরলাল রায়, বাঙ্গালার আদিম নাট্যকার ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন, স্বর্গীয় শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি অনেকেরই নাটক এই সময়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে (গ্রেট ন্যাশন্যাল ও বেঙ্গল থিয়েটারে) অভিনীত হইতে লাগিল। নাট্যশালার সেবকগণও পরের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন না। বঙ্গ নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ tragedian ৺মহেন্দ্রলাল বসু একখানি নাটক রচনা করেন ও তাহা গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়। সে নাটকের নাম "চিতোর রাজসতী পদ্মিনী।" ইহাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় উপেন্দ্র নাথ দাসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁহার প্রণীত শরৎসরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটক দর্শক সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়।

আমরা উপরে যে সকল নাট্যকারের নাম উল্লেখ করিলাম, ইহাঁদের অনেকেরই রচিত নাটক দর্শকের হৃদয়ে অধিক দিন স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইল না। ইহাঁদের অনেকেই সখের খাতিরে নাট্যকার হইয়াছিলেন। মস্তিষ্ক হইতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন, কৃতবিদ্য হইলেও, সে সাধনা বা একাগ্রতা তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই ছিল না। তাঁহারা কার্য্যস্রোতে নাট্যশালা হইতে বিভিন্নপথে তাঁহাদের উদ্যম চালিত করিয়াছিলেন। ৺মনোমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয় একনিষ্ঠভাবে নাট্যবাণীর পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মনোমোহন বসু সু-নাট্যকার বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এখনও সাহিত্য সাধনায় ব্রতী থাকিয়া সৎসাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করুন, আমরা তাঁহার নিকট এখনও অনেক আশা করি।

এইরূপে বঙ্গের নাট্যশালা ধীরে ধীরে আপন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে লাগিল এবং দর্শকের সংখ্যাও দিনদিন বৃদ্ধি হইতে চলিল। সঙ্গে সঙ্গে নাট্যসম্প্রদায়ও নূতন নাটকের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাঁহারা নূতন নাট্যকারের জন্য নাট্যশালার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু নবাগত কোন নাট্যকারই তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইলেন না নাটকের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নাট্যসম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসাবলী নাটকাকারে গ্রথিত করিয়া দর্শকসম্মুখে উপস্থিত করিলেন। দর্শকও নূতন রসের আস্বাদন পাইয়া মাতিয়া উঠিল। এই সময়ই বঙ্গীয় নাট্যশালার এক স্মরণীয় দিন। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী," "কপালকুণ্ডলা," "মৃণালিনী," "আনন্দমঠ," "বিষবৃক্ষ" ও রমেশচন্দ্রের "মাধবীকঙ্কণ" প্রভৃতি বঙ্গরঙ্গমঞ্চে

যথার্থই এক যুগান্তর উপস্থিত করিল। কিন্তু কাল চলিষ্ণু! কোন বিশেষ সৌন্দর্য্য বা মাধুর্য্যের বেষ্টনে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে কালিদাস ও সেক্সপীয়রের পর আর নাট্যকারের প্রয়োজন হইত না। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসাবলী নাটকাকারে দর্শকের হৃদয়ে নূতন নূতন রসের ধারা বর্ষণ করিল বটে, কিন্তু তাহাতে দর্শকের নাট্যরসপিপাসা মিটিল না। বরং তাহার অভিনয় দর্শন-লালসা উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। নাট্য-শালা ধীরপাদবিক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে; যাহা অস্ফুট ছিল, তাহা একটী জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আর, 'সধের থিয়েটার' 'হেলার অন্নছত্রে' পূজা গ্রহণে সে বিগ্রহমূর্ত্তি পরিতৃপ্ত নহে। কোন্ প্রতিভাবান্ লেখক কবে তাঁহার সময় বুঝিয়া গ্রন্থ লিখিবেন, আর সেই অনতিপ্রেত পুষ্পে নাট্যবাণীর পূজা হইবে, ইহাতে আর তাঁহার মন উঠে না। ত্রিসন্ধ্যা পূজা পাইবার বাসনা তাঁহার জাগিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার একজন নিজস্ব পুরোহিতের প্রয়োজন। বাঙ্গালার নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তখনও নট। নটের প্রতিভায় তিনি নাট্যভারতীর মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া, অন্তরচিত নাটকের ভাষায় কণ্ঠ মিলাইয়া, মাকে আমার প্রবুদ্ধ করিতেছেন। যে প্রতিভা উত্তরকালে তাঁহাকে বাঙ্গালার নাট্যাচার্য্যের শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল, সে প্রতিভা তাঁহাতে তখনও আমরা দেখি নাই—গিরিশচন্দ্র তখনও নট-কবি বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে সাহসী হয়েন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি নিজে dramatise করিয়া দিতেছেন, প্রয়োজন হইলে অন্যের লিখিত নাটক কাটিয়া ছাঁটিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া লইতেছেন। অলক্ষ্যে নাট্যবাণী যে তাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল ললাটে চন্দনের টীকা পরাইয়া তাঁহাকেই তাঁহার পূজক বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু তখনকার নাট্যশালার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তায় গিরিশচন্দ্র যে কাতর হইয়াছেন, তাহা তাঁহার লেখনী হইতে আমরা বুঝিতে পারি। নাট্যশালায় তখন গীতিনাট্যেরই প্রাবল্য; দীনবন্ধু, মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি পুস্তক ব্যতীত আর যাহা অভিনীত হয়, তাহা তত রুচিকর নহে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদ-বধ" নাটকাকারে গ্রথিত করিলেন, এবং তাহার প্রথম অভিনয়-রাত্রে প্রস্তাবনায় "নটের নিবেদন" বলিয়া লিখিলেন :—

সবিনয়ে কহে ভৃত্য নহে বারাঙ্গনা নৃত্য
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গর্জ্জন।
রুপুরুষ্ নাহি আর, ঝঞ্ঝণের ঝনৎকার
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনি পতন।

নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" নাটকাকারে অভিনীত হইল। নট গিরিশচন্দ্র এইরূপে নাট্যভারতীর পূজার পুষ্প সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রয়োজনে, অভাবে, নাট্যশিল্পের প্রতি অনুরাগবশে গিরিশচন্দ্র নাট্যকারের লেখনী ধরিলেন। সভয়-কম্পিতকক্ষে তিনি নাট্যবাণীর চরণে প্রথম অঞ্জলি দিলেন—একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য—"আগমনীর" একনিষ্ঠ সাধকের সে পূজা মা গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দ্রের নটজীবনে এক শুভ সূচনার সূত্রপাত হইল। কিন্তু বণীর নিভৃত নিকুঞ্জে অন্যের অলক্ষ্যে বহুবর্ষে আত্মগোপন করিয়া গিরিশচন্দ্র যে

ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহার সিদ্ধি কেবলমাত্র "আগমনী" বা "অকাল-বোধনে" পর্য্যবসিত হইবার নহে। গিরিশচন্দ্র নাটক লিখিলেন। তাঁহার প্রথম নাটক—"রাবণবধ।" বাঙ্গালাদেশের নাট্যসাহিত্যের এই দ্বিতীয় যুগের অবতারণা।

ইহার পর হইতেই বঙ্গীয় নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে নাট্যসাহিত্য এতদিন আশ্রয়চ্যুতা লতার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যকাননে বহু তরু কণ্টকের অন্তরালে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহা মনোমত আশ্রয় লাভ করিয়া অপূর্ব্ব শোভা-সম্পদে শ্রীময়ী হইয়া উঠিল। অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন নাট্যজগৎ নবারুণ-আলোকরেখায় উদ্ভাসিত দেখিয়া সকলেই পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নাট্যকলত সুকবি স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়, বেঙ্গল থিয়েটারের সুযোগ্য অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, পরলোকগত অতুলকৃষ্ণ মিত্র, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ৺কেদারনাথ চৌধুরী, প্রবীণ নট ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—নাট্যশালার পক্ষ হইতে নাট্যরচনায় মনোনিবেশ করিলেন—যাঁহারা রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, এমন নাট্যকারের রচিত নাটকাদির অভিনয় যে একেবারে বন্ধ হইয়া গেল তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহারও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। তবে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের "রাজা ও রাণী" বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে যে অভিনব রসের অবতারণা করিয়াছিল, তেমনটি আর দেখিলাম না—ইহা নাট্যসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, সন্দেহ নাই।

সকল দেশেই যেমন হইয়াছে, আমাদের দেশেও তেমনই সেইরূপ সর্ব্বপ্রথমে নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক নাটকের প্রভাব বিস্তারিত হয়। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দর্শক নিত্য নূতন রসের প্রয়াসী। পৌরাণিক নাটক দিন কতক দর্শকের পক্ষ হইতে খুবই আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইল। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দর্শনে অবসন্ন হইয়া দর্শক আবার সুর ধরিলেন—"নূতন চাই!" দর্শক চাহেন "নূতন," কিন্তু তাঁহার মনোমত "নূতন" যে কি, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। অভিনয়-দর্শনমুগ্ধ দর্শক কতকটা শিশুপ্রকৃতি। ছেলে কাঁদে, আবদার করে; কিসে যে সে শান্ত হইবে তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া জননী নানাবিধ খেলানা তাহার সম্মুখে ধরেন। শিশু তাহার যেটি পছন্দ হয় সেইটি লয়; যাহা পড়িয়া থাকে, তাহার দিকে আর ফিরিয়াও চাহে না। দর্শকের মনও কতকটা ঐ শিশুর মনের ন্যায়। কোন্ ধরণের কোন্ রসের নাটক যে তাঁহার মনঃপূত হইবে, বিচক্ষণ নাট্যকারকে সেইটি অনুমান করিয়া ধরিতে হয়। যে নাট্যকার প্রতিভাবলে দর্শকের আকাঙ্ক্ষা বুঝিয়া মানব-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে এমন নাটক প্রণয়ন করিতে পারেন, তিনিই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হয়েন। দর্শকের রুচি বুঝিবার অসাধারণ ক্ষমতা গিরিশচন্দ্রের যেরূপ ছিল, আজও পর্য্যন্ত অন্য কোন নাট্যকারের সেরূপ ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। এবং এই জন্যই মনে হয় তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠাশালী নাট্যকার আজও পর্য্যন্ত কেহ হয়েন নাই। গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা বিভিন্নমুখী ছিল। যখনই যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, দর্শকের রুচি ও দেশের "হাওয়া" বুঝিয়া তিনি নাট্য-

জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, প্রচলিত স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন।

যখন পৌরাণিক নাটক দেখিয়া দর্শক অবসন্ন, গিরিশচন্দ্র "চৈতন্যলীলা" লিখিয়া বঙ্গদেশে এক অভিনব ভক্তিরসের উদ্রেষণ করিলেন। দিন কতক এই ধরণের নাটক খুবই সতেজে দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে লাগিল। "বিল্বমঙ্গল," "বুদ্ধদেব," কবিবর রামকৃষ্ণ রায়ের "প্রহ্লাদচরিত্র" প্রভৃতি নাটক এই সুরেরই প্রতিধ্বনি। এইরূপেই বঙ্গনাট্যসাহিত্য পৌরাণিক, ধর্ম্মমূলক, গার্হস্থ্য, সামাজিক, ঐতিহাসিক, Romantic গীতিনাট্য সমাজচিত্র, নক্সা, প্রহসন প্রভৃতি নাটক ও খণ্ডনাটকের প্রবর্ত্তনা। এই সময়েই সর্ব্বরসাবতারণায় যেমন গিরিশচন্দ্র, তেমনই সাময়িক সমাজ-চিত্রে শ্রদ্ধেয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাট্যসাহিত্যের বহু সম্পদ্ বাড়াইতে লাগিলেন। নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িল। আমরা বাহির হইতে বহু নাট্যকারের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে নাট্যকাররূপে পাইলাম। তাঁহার "প্রতাপাদিত্যকে" দর্শক সাদরে বরণ করিয়া লইল।

বাঙ্গালায় ঐতিহাসিক নাটকের যুগ আসিল। আমরা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট শুনিয়াছি, ক্ষীরোদ বাবুর প্রতাপাদিত্য নাটকের অভিনয় দেখিয়াই তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক লিখিবার বাসনা বলবতী হয়। বাহির হইতে সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকাররূপে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালাদেশে "স্বদেশীর" প্রথম উচ্ছ্বাস। দর্শকের হৃদয় এখন অন্য কোন ভাব গ্রহণে প্রস্তুত নহে। ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ে রঙ্গালয়ে দর্শকের স্থান সংকুলান হয় না। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া নাট্যসাহিত্যের স্রোত ফিরাইলেন। প্রতিভাবান্ লেখকের লেখনীপ্রসূত নাটকে নাট্যসাহিত্যের খুবই শ্রীবৃদ্ধি হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবনতির পথও প্রশস্ত হইল। ঐতিহাসিক নাটকে দর্শক অতি সহজে আকৃষ্ট হইবেন দেখিয়া অনেক নবীন নাট্যকার ঐতিহাসিক নাটক লইয়া আসরে নামিলেন। অনেকেই "কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইলেন!" প্রতাপাদিত্য, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, ছত্রপতি, রাণাপ্রতাপের অনুকরণে উত্তেজক বক্তৃতাপূর্ণ বহু "নাটক না-মিষ্টি" হাই-পাস, অবান্তর কাল্পনিক গল্প ও ঘটনা পরিপূর্ণ গ্রন্থ এক একটা ঐতিহাসিক নামের ধ্বজা স্কন্ধে করিয়া রঙ্গমঞ্চে দেখা দিল। বাঙ্গালায় নাট্যকার হওয়া অতি সুলভ হইয়া পড়িল। আজ এই সব উদীয়মান বহু নাট্যকারের রচিত নাটকের ভারে নিষ্পেষণে এবং অত্যাচারে নাট্যসাহিত্য কিরূপ জর্জ্জরিত এবং এই নিষ্পেষণক্রিয়া যেরূপ প্রবলভাবে চলিতেছে, তাহাতে সুকুমার নাট্যশিল্পের মৃত্যুদিন যে অদূর ভবিষ্যতে আগতপ্রায়, সেই সম্বন্ধেই দুই একটী কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কথাটা একটু খুলিয়া বলি। পৃথিবীতে যত প্রকার কলাবিদ্যা আছে তন্মধ্যে নাটক লেখা যে সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন, ইহা শিক্ষিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন। নাট্যকারকে বিশ্বস্রষ্টার ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভগবান্ বিশ্বকবি, নাট্যকার তাঁহারই আশীর্ব্বাদে জগতের কবি। তিনি ভাবজগতে মহাভাবকে আশ্রয় করিয়া ভাব-

মত্ত নরনারীর সৃষ্টি করেন। এই নিমিত্তই সকল শিল্পীর আসনের উপর নাট্যকারের আসন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যশোলুব্ধ মানবের সহজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের বাসনা এত প্রবল, যে মানুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে নাট্যকারের দায়িত্ব কি তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। এটা যে আমাদের দেশেই নূতন, তাহা নহে। সকল দেশেই এইরূপ যশের-কাঙাল-মানুষের সংখ্যাই অধিক। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় বাঙ্গালার সাহিত্যগগনে যখন তাঁহার অক্ষুণ্ণ খ্যাতিকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল, সে সময়েও আমরা অনেক যশোলুব্ধকেই ঔপন্যাসিকের মূর্ত্তিতে ধূমকেতুর ন্যায় সাহিত্য-গগনে উঠিতে দেখিয়াছিলাম। সেই সব ধূমকেতুর শতমুখীর ন্যায় পুচ্ছবিস্তার দেখিয়া কোথলা বঙ্গবাণী সন্ত্রস্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। নাট্যসাহিত্যগগনে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পর আমরা অনেক ধূমকেতুর উদয় দেখিয়াছি। কালের ফুৎকারে অনেককে বিলীন হইতে দেখিলাম; অনেকে এখনও পুচ্ছবিস্তারে নাট্যভারতীকে বিভীষিকা দেখাইতে নিরস্ত নহেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র সময়োপযোগী নাটকাদি লিখিয়া রঙ্গমঞ্চে নূতন নূতন স্রোতের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। যখন রামায়ণ মহাভারতের আখ্যানাবলী অবলম্বনে দৃশ্যকাব্য খুবই সমারোহে অভিনীত হইতেছে, তখনও এইরূপ অনেক যশোলুব্ধ নাট্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের নামোল্লেখের কোন প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর কেহ নাই। যখন "বুদ্ধদেব" "চৈতন্য" প্রভৃতির প্রভাব, তখনও এই অনুকরণপ্রিয় নাট্যকারের দল আসর পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সামাজিক নাটক "প্রফুল্ল" প্রভৃতি অভিনীত হয়, তখন দিনকতকের জন্য ইহারা "গা-ঢাকা" হইয়াছিলেন। "আবু-হোসেন" হইতে যখন আবার গীতিনাট্যের দিন আসিল, তখন অনেকেই আবার নূতন করিয়া কলম কাটিলেন। "ঠাকুর চন্দ্রশেখরের" অভিনয়ের পর যখন পুনরায় বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস নাটকাকারে অভিনয় করিবার সুর বাজিয়া উঠিল, তখন আর বাহিরের নহে, নাট্যশালার অধ্যক্ষ ও সত্ত্বাধিকারিগণ অর্থ লাভের আশায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর "আদ্যশ্রাদ্ধ" আরম্ভ করিলেন। বহুপূর্ব্বে গ্রেট ন্যাশন্যাল প্রভৃতি থিয়েটারে বঙ্কিম-চন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। ইদানীং আবার তাহার নূতন সংস্করণ হইল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের দেখাদেখি বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণ-কান্তের উইল," "সীতারাম" প্রভৃতি উপন্যাসের নাটকাকারে গঠন হইল। সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্কিমচন্দ্র তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহার "ভ্রমর" 'শ্রী,' "জয়ন্তী"র দুর্দ্দশা দেখিয়া বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হইত সন্দেহ নাই। অবান্তর হইলেও, একটী কথা এখানে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

কোন এক রঙ্গমঞ্চে "সীতারাম" নাটক অভিনীত হয়। পঞ্চমাঙ্কে দেখিলাম ত্রিশূল-ধারিণী "জয়ন্তী"র বিবাহ হইতেছে; পাত্র—সীতারামের সেনাপতি "মৃগয়" বা মেনা-হাতী। এই থিয়েটারের অধ্যক্ষকে কথা-প্রসঙ্গে বলিতে শুনিয়াছি, "দেখলেম একটা মেয়ে ত্রিশূল ঘাড়ে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়;

ত্রিসংসারে তার কেউ নাই ; কি করি, তার বিয়ে দিয়ে দিলেম !" "সীতারাম" সম্বন্ধেও তাহা, "কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রভৃতি অনেক নাটকেই এইরূপ বিবাহ চলিতে লাগিল। দর্শক এখানে মিষ্টান্ন পাইয়াই সুখী ! তাঁহারা নাটকের রস উপভোগ করা অপেক্ষা, অর্দ্ধসুক্ত বা অর্দ্ধহীন হইলেও মজা দেখিয়াই মসগুল ! নাট্যশালার ঘরে বাহিরে নাট্যকারের উৎপাত সবেগে চলিতে লাগিল এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও পর্য্যন্ত সে বেগ প্রশমিত হয় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নাটক লেখা সুলভ হইয়াছে। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি প্রতিভাবান্ লেখকগণের গ্রন্থে যে যে অংশ দর্শককে মাতাইয়া তুলে, সেই সেই অংশের অনুকরণ করিয়া দুই একস্থলে সেই সব ঘটনা, অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, যথাযথ "চুরী" করিয়া অনেকেই নিজেদের রচিত নাটক সাজাইতে প্রয়াসী হইলেন। তাঁহাদের কথা—মহাশয়, নাটকের নাটকত্ব যাহা হয় হউক, দেখুন, জমাট সিন্ আছে কি না !"

কৃষ্ণকে দীনবন্ধু নীলদর্পণে "ক্ষেত্র মণির" উদ্ধারের দৃশ্য লিখিয়াছিলেন, কৃষ্ণকে বঙ্কিমচন্দ্রের "বিমলা" মুসলমান সৈনিককে রঙ্গরসে ভুলাইয়া গড়মান্দারণের দুর্গকক্ষে পলাইবার সুযোগ করিয়াছিল, কৃষ্ণকে "আয়েষা" বলিয়াছিল "এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর", কৃষ্ণকে গিরিশচন্দ্র বিষমঙ্গলে "পাগলিনীর" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কৃষ্ণকে "পশুপতি" পাগল হইয়া জলন্ত মন্দিরমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল,—আর কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক নাটকের যুগে "প্রতাপাদিত্য", "সিরাজ", "রাণাপ্রতাপ" প্রভৃতি, দেশের জন্য নাট্যমঞ্চে বক্তৃতা করিয়া গলা ভাঙ্গিয়াছিল !! এই সমস্ত ঘটনাই আজ কাল দেখি যিনিই নাটক লেখেন তিনিই নির্ব্বিবাদে স্বচ্ছন্দচিত্তে এবং সুস্থ শরীরে তাঁহার নাটকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এবং দর্শকগণের ঘন করতালির মধ্যে তাঁহাদের লজ্জাহীন মস্তক তুলিয়া সগর্ব্বে "নাট্যকার" বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না !

স্থল বিশেষে ইহার উপর "রং" ফলাইতেও অর্ব্বাচীন নাট্যকার পশ্চাৎপদ নহেন। একটু চোখ চাহিয়া দেখিলেই অনেক নাটকেই দেখিবেন, কত আলুলায়িত কেশা আরক্ত নয়না ঘনঘোর চীৎকার পরায়ণা অথচ নৃত্যশীলা নায়িকা পিস্তল হস্তে নায়কের উদ্ধারের জন্য রঙ্গমঞ্চে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে ! প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্বামী পুত্র দেবরের সম্মুখেই উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে এই "বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর"। বিষমঙ্গলের "পাগলিনীর" যায় পাগলিনীর হাট বসিয়া গিয়াছে ! "পশুপতির" মত পাগল দর্শককে পর্য্যন্ত পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক নায়িকাকে চন্দ্রকরোদ্ভাসিত গঙ্গাবক্ষে সাঁতার দেওয়াইয়াছেন, অনুকরণপ্রিয় নাট্যকার রবিকরোজ্জ্বল পূর্ণিমারজনীতে হিমালয়-সাগরে নায়ক-নায়িকাকে torpedoয় চড়াইয়া, বহু বক্তৃতার পর নায়িকাকে zeppelinএ করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিতেছেন। গিরিশ বাবুর মুখে একবার শুনিয়াছিলাম কে একজন Milton এর Paradise Lost অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে দিয়াছিল। তাহার প্রস্তাবনায় লেখাছিল, "অনেক স্থলে মিলের অনুরোধে ভাবের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।" অধুনা নাট্যমঞ্চেও অনেক সময় আমরা

পরনার খাতিরে এই "মিলের অনুরোধে ভাবের পরিবর্ত্তন" দেখিতে পাই।

এই হীন অনুকরণে অধুনা নাট্যসাহিত্য অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং দিন দিন শ্রীহীন ও মলিন হইয়া পড়িতেছে। নাটকের action কাহাকে বলে সে জ্ঞান এই নবীন নাট্যকারদিগের মধ্যে অনেকেরই নাই। ডুবী মারা, বিষ খাওয়া, উচ্চ হইতে পতনে মৃত্যু বা রেলওয়ে সংঘর্ষণ এবং ডিটেক্‌টিভের কার্য্যাবলীই—এখন অধিকাংশ নাটকে action বলিয়াই প্রচলিত। মানুষের হৃদয় বলিয়া যে একটা বস্তু আছে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ঘটনার আঘাতে সেই হৃদয়ের যে প্রতিঘাত হয়, নাট্যোল্লিখিত চরিত্রের কার্য্যকলাপে তাহারই বিকাশকে যে dramatic action বলে, সে কথা আধুনিক অনেক নাট্যকার বুঝেন না বা বুঝিতে চেষ্টা করেন না। Accident এবং Incident ই এখন Actionএর স্থান অধিকার করিয়াছে। কিসে নাটক জমে, ইহাই নাট্যকারের লক্ষ্য—তা "মিলের অনুরোধে ভাবের পরিবর্ত্তন" হয় হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই!

আমরা বর্ত্তমান নবীন নাট্যকারদের গ্রন্থে কোন উচ্চ কল্পনা, কোন মহৎ ভাব, কোন নূতন সৌন্দর্য্য বা কোন নূতন রসের অবতারণা—কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। অথচ দেখিতেছি দিন দিন নাট্যকারের সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে তাঁহাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে পথ চলা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আজ দর্শক অপেক্ষা নাট্যকারের সংখ্যা অধিক। অজাতশ্মশ্রু বালক স্কুলের অঙ্ক কষিবার খাতায় পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখিয়া দেখাইতে আসেন। পথে ঘাটে মাঠে নাট্যকার—উকীল নাট্যকার, ডাক্তার নাট্যকার, কেরাণী নাট্যকার, বাবু নাট্যকার, মোসাহেব নাট্যকার, রমণী নাট্যকার—বাঙ্গালা দেশটা যেন নাট্যকারের কারখানা! অধুনা যিনিই রঙ্গভূমির সংস্রবে আছেন, তিনিই আমাদের একখার সাক্ষ্য দিবেন। কেন এমন হইল? আমরা বাঙ্গালী-জাতি ভাবপ্রবণ জাতি। কার্য্য করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা আমাদের ভাবিবার ক্ষমতা অধিক। সেই নিমিত্তই আমরা কাজ করি কম, ভাবের ঘোরে কথা কহি বেশী। আমাদের সকল কার্য্যেই এই ভাবের প্রাবল্য। এই ভাবের প্রাবল্যে আমরা অধিকার অনধিকার কিছুই দেখি না। ইঞ্জিনিয়ার হইয়া ডাক্তারকে ডাক্তারি সম্বন্ধে উপদেশ দিই—উকীল হইয়া চাষের কথা কহি আর লাঙ্গল ফেলিয়া কাব্য লিখি! এই কারণেই ঘরে ঘরে নাট্যকার—আর এই-রূপ অনধিকারী নাট্যকারের রচিত নাট্য-আবর্জ্জনায় নাট্য-সাহিত্য জর্জ্জরিত!

আরও গভীর দুঃখের বিষয়, উপযুক্ত প্রতিভা ও উচ্চ সাধনার অভাবে, ঘর এবং বাহির, উভয়েরই ক্রমশঃ সমান অবস্থা হইতেছে। শুধু যে বাহিরের নাট্যকার চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছেন তাহা নহে,—থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট আমরাও উচ্চ আদর্শ হইতে অবনতির নিম্নস্তরে পড়িয়া নাটক ও নাট্যশালার দুর্দ্দশার পরিচয় দিতেছি! নাট্যসাহিত্যের এই হীনতার জন্য কে দায়ী?

বর্ত্তমান সমাজের আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা, সভ্যতা, মনুষ্যত্ব, বর্ব্বরতার প্রভাব নাটক ও নাট্যশালায় সর্ব্বদা সকলদেশেই প্রতিভাত হয় বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নাট্যশালা

ও নাট্য-সাহিত্যের এই হীনতার জন্য আমরা যেমন দায়ী—দর্শকও তেমনি যে আংশিক ভাবে দায়ী নহেন তাহা বলা যায় না। আপনারা হীন সাহিত্যের প্রশ্রয় দেন বলিয়াই তো হীন সাহিত্য রঙ্গমঞ্চে স্থান পায়! আপনারা কুৎসিত রঙ্গরসে আমোদ উপভোগ করেন বলিয়াই তো আমরা নির্ব্বিকার ভাবে —মানুষে কল্পনা করিতেও ভয় পায়—এমন কুৎসিতভাবপূর্ণ নাটক গীতিনাট্যের অভিনয় করিতে সাহসী হই—আর আমাদের হতবৃত সেই নাট্যদর্পণে আপনাদের হৃদয়ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিয়া আপনারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন!

নাট্যসাহিত্যের এই দুর্দ্দিনার দিনে, বহু তরল ও কুৎসিত ভাবপূর্ণ নাটক গীতিনাট্য প্রহসন,—পুস্তকের নামোচ্চারণ করিতে লজ্জা হয়—এমন সব জঘন্য গ্রন্থের প্রাবল্যের মধ্যে শেক্সপীয়র—মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি মহাসাধকগণের সংপূজিত নাট্যবাণীর অধুনা-আবর্জ্জনা-মণ্ডিত-মন্দিরের প্রতি যখন চাহিয়া দেখি—তখন স্বতঃই মনে হয়—মা! যদি তেমন প্রতিভাবান্ ভক্ত একনিষ্ঠ সাধকের একান্তই অভাব, তখন আর কেন? ও পবিত্র মন্দিরের দ্বার অর্গল-বদ্ধ কর! যাহা দেশের ও সমাজের কল্যাণ-কর না হইয়া বহু অকল্যাণের আকর হইয়া পড়িতেছে—শুদ্ধমাত্র ব্যবসার খাতিরে সে নাট্যসাহিত্য বা নাট্যশালার অস্তিত্বের আর প্রয়োজন কি? যখন সমাজ আবার উচ্চ আদর্শে উচ্চতর আসনে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিবে—যখন মহাকালের আবাহনে আবার প্রতিভাবান্ নাট্যকার নাট্যশিল্পের উন্নতি-কল্পে তাঁহার অক্ষয় লেখনী ধারণ করিবেন—যখন নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট আমরাও মহা-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অকপটচিত্তে সমাজ ও দেশের কল্যাণকামনায় তোমার চরণকমলে সভক্তি অঞ্জলি দিতে পারিব—তখন যেন তোমার মন্দিরদ্বার পুনরুন্মুক্ত হয়।

বর্ত্তমান নাট্যসাহিত্যের অবস্থা কি, সমালোচকের স্পর্দ্ধা লইয়া আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই নাই। যেমন দেখিয়াছি ও দেখিতেছি তাহারই আভাষ দিবার চেষ্টা করিলাম মাত্র। তবে একটী কথা না বলিয়া উপসংহার করিতে পারিলাম না। দেশে বঙ্গসাহিত্যের সকলদিকেই একটা উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মাসে মাসে বহুচিত্র-বিশোভিত নূতন "মাসিকের" সৃষ্টি হইতেছে। বাঙ্গালার কবি, জগতের বরণীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেছেন। চারি-দিকেই সাহিত্য-সম্মিলন, সাহিত্য-পরিষদ্, পূর্ণিমা-মিলন, সাহিত্য-সঙ্গত, সাহিত্য-সভা প্রভৃতির ঘটা; বঙ্গভাষার ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুতর তত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষা প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়—ক্ষোভের বিষয়—লজ্জার বিষয়—নাট্যসাহিত্যের প্রতি দেশের কোন কৃতবিদ্যেরই লক্ষ্য নাই! দীনবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি বাণীর বরপুত্রগণের উচ্চ সাধনার ফলে যে নাট্যসাহিত্য অল্পদিনের মধ্যেই নয়ন-সুশোভন তরুতে পরিণত হইয়াছিল, হীন-কল্পনাজীবী অনুকরণপ্রিয় পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খের প্রগল্‌ভতা-কণ্টকে আচ্ছন্ন হইয়া সে তরু যে ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া পড়িতেছে, তাহা বর্ত্তমান বঙ্গসাহি-ত্যিকগণ কেহ দেখিয়াও দেখিতেছেন না। কেন? নটনটী স্থণার পাত্র হইতে পারে, নাট্যসাহিত্য তো উপেক্ষণীয় নহে। কেন

আপনারা নাট্যশালায় হীন সাহিত্যের প্রশ্রয় দেন? প্রয়োজন বুঝিলে কেন প্রতিবাদ করেন না? কিসের 'খাতির'? কিসের সঙ্কোচ? আর, আপনারাই বা বাণীর কেমন সেবক? যাহা সৎ—তাহাকে আদর করুন; যাহা অসৎ—নির্ম্মম ভাবে তাহার উচ্ছেদ করুন; তবেইতো নাট্যসাহিত্যে আবর্জ্জনা বিদূরিত হইবে, নচেৎ আর আশা কোথায়? আর, সে সৎসাহস যদি আপনাদের না থাকে, তাহা হইলে বৃথা আমরা অরণ্যে রোদন করিয়া মরিলাম—বুঝিলাম—নাট্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতি আর ভগবানের অভিপ্রেত নয়!!

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কদলীর চাষ

(সংকলিত উদ্ভিদের বিশ্বকোষের পাণ্ডুলেখ্য হইতে উদ্ধৃত।)

N. O. Musaceæ or Scitamineæ

কদলীর জন্মভূমি গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। অন্য দেশে (শীত প্রধান দেশে) ইহা কদাচিৎ জন্মিয়া থাকে। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে উচ্চ ক্রান্তিরেখার বহির্ভূত দেশেও ইহার চাষ হইতেছে। এই সকল দেশে ইহার চাষ করিতে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ও শ্রমব্যয়ের প্রয়োজন হয়। ফলতঃ ঐ সকল দেশে ইহার চাষ ফলবতী হয় না। এবং ইহার ফলও গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত কদলীর ন্যায় সুস্বাদ হয় না। শীতপ্রধান দেশজাত কদলী স্বভাবতঃ পানসে আস্বাদ হয়। তবে শীতপ্রধান দেশেও সখের হিসাবে কেবল অর্থশালী লোকেরাই ইহার চাষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। বিলাতের কিউগার্ডেন নামক রাজকীয় উদ্যানে, প্রবীণ উদ্ভিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বহুবার ইহার চাষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা বহু চেষ্টায় ও অর্থ ব্যয়ে সময় সময় কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। গড় পড়তায় হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে প্রত্যেকটী কলা ৫৲ টাকা হিসাবে মূল্য ধরিয়াও লাভ হওয়া দূরে থাকুক, ইহার চাষের ৵০ আনা খরচও সঙ্কুলান হয় নাই। এসিয়ার ও আমেরিকার কোন কোন স্থান ইহার আদিম অধিবাস। জন্মভূমিতে ইহার চাষের বিশেষ যত্নের আবশ্যক হয় না। ভারতবর্ষ, সিংহল, মালদ্বীপ, লাক্কাদ্বীপ, জাভা প্রভৃতি ভারত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ; পিনাং ও সিঙ্গাপুর প্রভৃতি ঔপনিবেশিক দ্বীপ সমূহ; মরিশস দ্বীপ এবং আমেরিকার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য উষ্ণপ্রধান স্থানে সফলতার সহিত ইহার চাষ হইয়া থাকে। যে স্থানের বায়ু আর্দ্র অথচ উষ্ণ; ভূমি সরস ও লঘু দোআঁশ, বালুকা ও সামান্য পরিমাণে লৌহ ও লবণ মিশ্রিত সেই স্থানই কলার চাষ পক্ষে উপযোগী, লাল দোআঁশ ও দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকাতেও কলার চাষ হইতে পারে। ঐরূপ মৃত্তিকায় কলার চাষ করিতে হইলে সার সংযোগে মৃত্তিকার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ উচ্চ বা ভিটী জমিই ইহার চাষ

পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে স্থানে বর্ষার জল দাঁড়ায় সে স্থানে সকল জাতির চাষ হইতে পারে না। ঐরূপ স্থানেও কোন কোন জাতির চাষ হইতে পারে।

উক্ত কোটীমণ্ডলের লবণাম্বুপূর্ণ বারিধির বক্ষস্থলস্থ, দ্বীপসমূহে কলার চাষ সফলতার সহিত হইয়া থাকে। নারিকেলের চাষের ন্যায় কলার চাষেও সমুদ্রবায়ু অনুকূল। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রও কলার চাষ হয় না। নিরেট বালি, কঙ্কর ও কর্দ্দমময় ভূমি ইহার চাষ পক্ষে উপযোগী নহে। কোন কোন জাতীয় কলা সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই জন্মে। জঙ্গল-ভাঙ্গা নূতন জমি কলার চাষ পক্ষে উপযোগী। উত্তর ভারতবর্ষে সফলতার সহিত ইহার চাষ হইতে পারে না। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই ইহার চাষ পক্ষে উপযোগী। বঙ্গদেশ দাক্ষিণাত্য ও কোঙ্কন (কঙ্কন) প্রদেশের সর্ব্বত্র ইহার চাষ হইয়া থাকে। সমুদ্র বা নদীপরস্থ চর ভূমিতে, ও সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহে কদলী গাছ বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে ২।৩ হাজার ফুটের অধিক উচ্চ স্থানে ইহার চাষ হয় না। বন্যজাতি ৪০০০।৫০০০ ফুট উচ্চ পাহাড়েও জন্মে। কিন্তু উহার ফল অকর্ম্মণ্য। উচ্চ ভূমি,—যাহাতে বর্ষার জল দাঁড়াইতে সক্ষম হয় না,—উহাতেই কলার চাষ হইয়া থাকে। কদলী বাগান হইতে যাহাতে সহজে আবশ্যকতাতিরিক্ত জল নির্গমন হইতে পারে তাহার জন্য জল নির্গমন পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানা স্থানে কদলী নানা নামে পরিচিত। আমি ইহার চাষ প্রণালী লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ইহার বিভিন্ন নামের পরিচয় দিতেছি। পাশ্চাত্য প্রদেশে ও আমেরিকায় সাধারণতঃ ইহা বেনানা (Banana) নামে পরিচিত। এদেশে ও আধুনিক সমাজে কেহ কেহ ইহারই অনুকরণ করিতে বিশেষ প্রিয়। কিন্তু এই নামটি আমার বিবেচনায় ঠিক নহে। কদলী নামই এই জাতির সাধারণ নাম। বেনানা এই সাধারণ জাতির অন্তর্ভূত একটী জাতি বিশেষ। ইহার জন্মস্থান আমেরিকা। এসিয়াজাত কদলী হইতে ইহা আকৃতি ও গঠনে ভিন্নরূপ। মুসাএন্‌সেটি (Musa Ensette) নামক একজাতি আমেরিকার কলা বেনানা জাতির অন্তর্ভূত; ইহাও গঠন ও আকৃতিতে এসিয়াজাত কলা হইতে ভিন্নরূপ। কলার ইংরাজী নাম প্লেনটেইন (Plantain) এই নামটী লেটিন ভাষায় প্লেণ্টেগো (Plantago) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম মুসা (Musa). কদলীর সাধারণ নাম মুসা সেপিএণ্টাম্‌ (Musa Sapientam) ইহা ফ্রেঞ্চ (French) ভাষায় প্লেনটেইন (Plantaine) স্পেন ভাষায় প্লেণ্টেন (Planten) এবং পর্টুগিজ (Portugese) ভাষায় চেণ্টাজেম্‌ (Chantagem) জর্ম্মণ ভাষায় উইজেরিচ (Wegerich) ও পিসাং (Pisang); ইটালীয় ভাষায় প্লেণ্টেগাইন্‌ (Plantaggine) ধাতু হইতে উদ্ভূত। ফরাসী ভাষায় বেনেন্‌ (Bannane) ধাতু হইতে বেনানা (Bannana) শব্দ সাধিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে বেনানা ও প্লেণ্টেইন একই পরিবারভুক্ত গাছ হইলেও একই জিনিষ নহে। উভয়ের গুণ ও স্বভাব এক সন্দেহ নাই। বেনানার পাতা, মোচা ও ফল ভারতবর্ষীয় কলার মোচা ও ফল অপেক্ষা আকারে ভিন্ন ধরণের। বেনানার পত্র এদেশীয় কলার পত্র অপেক্ষা লম্বা ও বিস্তৃত; ফলের কাঁদিও ভিন্ন ধরণের।

উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ মিঃ রক্সবার্গের মতেও, বেনানা একটী পৃথক্ জাতীয় কদলী। সুতরাং ইহা কদলীর সাধারণ নাম নহে। ভারতবর্ষে কলার ফল কদলী নামেই অভিহিত হয়। স্থানবিশেষে ইহা কেলা ও কলা নামেও পরিচিত। ইহার অন্য নাম রম্ভা। "ক" শব্দের অর্থ বায়ু দল শব্দের অর্থ ভেদ বা দলন করা সুতরাং যাহা বায়ু কর্ত্তৃক দলিত হয় তাহাই কদল। স্ত্রীলিঙ্গে ইহার নাম হইয়াছে কদলিকা বা কদলী। শীতবীর্য্যত্ব হেতু ইহা বায়ু রোগ দলন করে বলিয়াও ইহার কদলী নাম হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার অন্য নাম অম্বুসারা, নিঃসারা, দীর্ঘপত্রা, স্বাদুফলা, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, বারণা, মোচা ও অংশুমতীফলা।

"রম্ভাথ্যা কদলী মোচা"

(রত্নমালা)

অন্য বচন।

"কদলী বারণা মোচাম্বু সারাংশুমতী ফলা।"

সাধারণতঃ কলাগাছের নাম কদল ও ফলের নাম কদলী। ইহার পুষ্পের নাম কদলী পুষ্প। পুষ্প, ফল ও পুষ্পাবরক পত্র (Spadix or Spathe) সহ সমগ্র পদার্থটীকে মোচা বা থোড় কহে। ইহার মূলকে মোথা কহে। পার্শ্বাঙ্কুরকে পোয়া বা ডেউর কহে। মূলসংযুক্ত চঞ্চুকে চোখ বা গেড় কহে। পত্রকে কলার পাত কহে। কাণ্ডাবরক পদার্থকে খোল কহে। পুষ্পদণ্ডকে কদলীকাণ্ড, কাঁজাল বা ডাদাইল কহে। ফলের প্রত্যেক গুচ্ছকে কাঁদা (Cluster) কহে। সমস্ত ফলগুচ্ছকে ছড়ি, ছড়া বা কান্দী (Bunch) কহে।

দেশভেদে নামভেদ। হিন্দীতে ইহাকে কেলা, কেরা, সবেজ ও কেলাপেড়; তৈলঙ্গ ভাষায় অরটিচেট্টু, বুরগচেট্টু, চক্রাকেলি ও দোংড়তোগে; মহারাষ্ট্র ভাষায় কেল ও সোনকেল; গুজরাটী ভাষায় কেলা; কর্ণাটী ভাষায় মরবালেকাই; তামিল ভাষায় তালা, বাঠেট ও পাষম ত্রণপিণসী; আসামী ভাষায় কল; ব্রহ্মদেশী ভাষায় হপাপি; লুসাই ভাষায় বাহ্লা; পালি ভাষায় তল ও তলম পল; ফারসী ভাষায় মবেজ, মাং ও মোজ; আরবী ভাষায় তনা; ও সিংহলী ভাষায় কেহেল কহে।

ব্যবহার

কলা যে কি পদার্থ তাহার বিস্তৃত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর নিকটই ইহা সুপরিচিত। ফলের মধ্যে কোন ফলই ইহার সমকক্ষ হইতে পারে না। ইহা সর্ব্বদাই এবং সকল ঋতুতেই সুলভ। কলাগাছের মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত সকলাংশই মানবজাতির নিকট ব্যবহার্য্য। ইহার ফল অতিশয় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ইহাতে শ্বেতসার ও নাইট্রোজেনের (Nitrogen—যবক্ষারজান) ভাগ অধিক থাকায় ইহা পুষ্টিকর। এক পাউণ্ড (আধসের) কলার শস্যে তিন পাউণ্ড মাংসের অপেক্ষাও পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমন কি দুগ্ধের পরিবর্ত্তে শিশুগণকে ইহা খাওয়াইলে ইহা দ্বারাই দুগ্ধের কার্য্য সাধিত হয়। কেহ কেহ বলেন ইহা অধিক পরিমাণে খাইলে উদরে কৃমির উৎপত্তি হয়। কিন্তু আমি এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে অক্ষম। ইহার মোচা তরকারীতে ব্যবহার হয়। ইহা ভাজাও খাওয়া যায়। ইহার ভাজা ও তরকারী উৎকৃষ্ট খাদ্য। মোচাখণ্ড অতিশয় সুস্বাদু জিনিষ। ইহার কতকগুলি জাতির অপক্ক ফলও তরকারীতে ব্যবহার হয়।

উহারা আনাজী (সবজী বা তরকারী) কলা বা কাঁচাকলা নামে পরিচিত। পক্ক অবস্থায়ও ইহাদিগকে খাওয়া যায় কিন্তু ঐ অবস্থায় তত সুখাদ্য হয় না। পক্ক কাঁচাকলার অম্বল শর্করা সংযোগে উৎকৃষ্ট খাদ্য। কাঁচাকলা ভিন্ন অন্য কলার ফল, অতি ক্ষুদ্রাবস্থায় তরকারীতে ব্যবহার হয়। ইহার ঘন্টও সুখাদ্য। কলার গাছ পুষ্পিত হইলে উহাকে কাটিয়া উহার কাণ্ডাবরণকে অর্থাৎ খোলাকে পৃথক্ করিয়া ফেলিলে উহার ভিতরে যে কোমল পদার্থ পাওয়া যায় উহাকে কদলী কাণ্ড, কাঁজাল বা ভাদাইল কহে। উহা ডাইলে ও তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। উহাও সুখাদ্য। উহার ঘন্টও সুখাদ্য। কদলী গাছের প্রকৃত কাণ্ড নাই। ইহার খোল-সমষ্টিই কাণ্ডের কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত কাণ্ড অন্তর্ভৌম। ইহা পুষ্পিত হইবার সময় যে একটী পুষ্পদণ্ডসহ বহির্গত হয় উহাই কাঁজাল বা কদলীদণ্ড। ইহা অন্তর্ভৌম কাণ্ড হইতে বহির্গত হয়। ইহার মূল, পাতা, খোল ও ফলের বাকল পুড়িয়া যে ভস্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাই কলার ক্ষার। রজকেরা বস্ত্রপরিষ্কার কার্য্যে ইহা ব্যবহার করে। এইরূপ সাজিমাটী দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। ইহা সোডা ও সাবান অপেক্ষা বস্ত্রপরিষ্কার কার্য্যে হীন নহে। ইহার মূল বা অন্তর্ভৌম অংশও খাওয়া যায়। বিহারের ভয়ানক দুর্ভিক্ষ সময়ে বহু লোক ইহার মূলকে সিদ্ধ করিয়া খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। যে পুকুরের বা জলাশয়ের মৎস্য চাটারোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কদলী গাছের খোল ও কাণ্ড কাটিয়া উহাতে ছড়াইয়া দিলে চাটা রোগ দূর হয়। ইহার পাতা ভোজনপাত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দোকানী, পসারিগণ ইহার পাতা দ্বারা গুড়, চিনি ও লবণ ইত্যাদি বান্ধিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক এদেশকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে এদেশবাসী বালক বালিকাগণ কাগজের পরিবর্ত্তে কলার পাতে লিখিত। শিক্ষাকালে প্রথম ভূমিতে, তৎপর কলার পাতে ও তৎপর কাগজেই লিখিয়া হাতের লেখা সুন্দর করিত। আধুনিক স্কুল কলেজের বালক-গণকে হস্তলিপির জন্য যে সকল কপিবুক খরিদ করিতে হয়, তাহা প্রাচীন সময়ের লোকে চিনিত না। অথচ তাঁহাদের হাতের লেখা যেরূপ সুন্দর হইত আধুনিক যুবকদের লেখা কদাপি তদ্রূপ সুন্দর হয় না। কলার পাত ছিল প্রাচীন কালের বালক বালিকা-গণের বাল্য সহচর। কলার পাতায় ঘান ও খোলাখাপরা দিয়া লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। গ্রাম্য শিক্ষকগণ ও ছেলেপিলেদের অভিভাবকগণ কলার পাতায় অক্ষর খাড়িয়া দিয়া লেখার কার্য্য ও হস্তলিপি সুন্দর করার কার্য্য শিক্ষা দিতেন। বালক বালিকাগণ ঐ লেখার উপর মক্স * করিয়া লিখা শিখিত। হস্তলিপি সুন্দর করার জন্য তাহারা বালক বালিকাগণকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী শিক্ষা দিতেন।

"সমান সমশিরানি ঘনানি বিরলানিচ।
অক্ষর কৃত মাত্রেন যেন মুক্তা কলানি চ।"

অর্থাৎ লিখিত অক্ষরগুলি সমান, সমশির, ঘন অথচ বিরল হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ হস্তাক্ষর সুন্দর হয় না। এই শ্লোকের

* অক্ষরের উপর দিয়া কলম ঘুরাইয়া লেখা অভ্যাস করার নাম মক্স।

কার্য্য তখন কলার পাতায়ই সাধিত হইত।

কলার মূল ঘারাও সার প্রস্তুত হয়। ইহার মূল মৃত্তিকাতে পচিলে কঠিন মাটীর আঁশ ভাঙ্গিয়া উহা শিথিল হয় এবং উহা মৃত্তিকাতে পচিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হইলে সারের কার্য্য সাধিত হয়। নূতন বাগানে উপ্ত শিশু গাছ পালার পক্ষে কলা গাছের ছায়া বিশেষ উপকারী। প্রথম কলা বাগান করিয়া তৎপরে উহাতে ফল বাগান করিতে হয়। ২।৩ বৎসরে কলাবাগান নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় মধ্যে শিশু গাছগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তখন কলাগাছগুলি উপড়াইয়া নির্ম্মূল করিলে ফল-বাগানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। কলা গাছের ছায়া ঘারা ফলগাছগুলি সূর্য্যের প্রখর কিরণ হইতে রক্ষিত হওয়ায় অতি তেজের সহিত বর্দ্ধিত হয়। অন্তরূপেও ছায়ার কার্য্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু কলাবাগান করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করিলে বিবিধ লাভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কলা বাগানের আয় ও দ্বিতীয়তঃ শিশু গাছ-গুলিকে রক্ষা করা এই উভয় অভিপ্রায়ই সাধিত হইয়া থাকে। হস্তীর প্রধান খাদ্য কলাগাছ। কোন কোন স্থানে হস্তীর আহারের জন্য বহু কলাগাছের চাষও হইয়া থাকে।

পাকা ও কাঁচা অবস্থায় কলার ফল খাওয়া যায়। অর্দ্ধপক্ক কলার শস্য হইতে একরূপ ময়দা প্রস্তুত হয়। উহার রুটী, পিঠা ও পুডিং (Pudding) অতি সুখাদ্য। দুগ্ধ, ময়দা, ডিম্ব ও চিনি সংযোগে পুডিং প্রস্তুত হয়। কলার পিঠা মধ্যে পাতপিঠা ও কলার বড়া অতিশয় সুখাদ্য। কলা ইউরোপবাসীদেরও অতি প্রিয় দ্রব্য। সেইজন্য ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রামপালের, হুগলী জেলার বৈদ্যবাটীর বেসিনের, বোম্বের ও মাদ্রাজের উৎকৃষ্ট জাতীয় কলা অধুনা তাহাদেরই ভোগ্য। সাহেবমহলে কলার বিশেষ আদর হওয়ায় আজকাল ইহা একরূপ দুর্লভ। ১০ বৎসর পূর্ব্বে কলার যে দর ছিল, তাহা আজকাল চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে রামপালের যে একটী কলা ৩৫ পয়সায় বিক্রয় হইত, এইক্ষণ উহার মূল্য সময়ানুসারে অন্যূন ৵০ এক আনা হইতে ৶০ দুই আনা হয়। কলার চাষে যেরূপ লাভ, আর কিছুতেই এরূপ লাভ নাই।

হিন্দু জাতি কলাগাছ ও ইহার ফলকে একটী পবিত্র দ্রব্য বলিয়া মনে করে। সকল প্রকার ধর্ম্ম ও মাঙ্গলিক কার্য্যে তাহারা ইহার ফল ব্যবহার করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া ও দেবদেবীর পূজায়ও তাহারা ইহার ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহার খোল ও ফল ভিন্ন শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া হইতে পারে না। যাত্রা-কালে সম্মুখে কদলী বৃক্ষ ও আম্রপল্লবযুক্ত জলপূর্ণ ঘট দর্শন করিলে অভীপ্সিত কার্য্য সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মূলে তাহারা বিবাহ ও যাত্রা প্রভৃতি কার্য্যে কলাগাছের ব্যবহার করিয়া থাকে। আধুনিক জনসমাজে কোন উচ্চদরের সাহেব সুবা বা বড়লোক কোন স্থানে পদার্পণ করিলে কদলী গাছ রোপণ করিয়া পথ ঘাট সাজান হয়। ইহা আগমনকারীর মঙ্গল কামনায় করা হইয়া থাকে। যে সকল ফল অতিশয় সুখাদু ও প্রিয়, হিন্দুগণ পূর্ব্ব পুরুষের ও দেবোদ্দেশে উহা উৎসর্গ করিয়া থাকে। ইহা হিন্দুদের স্মরণাতীত কালের রীতি। আম্র ও নারিকেল প্রভৃতি ফলও এই জন্যই

ধর্ম্ম ও ইষ্ট কার্য্য ও দেব দেবীর পূজায় উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে। কলার মাইজ (ভগা) স্ত্রীলোকদের ব্রত বিবাহাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বিবাহ সময়েও উহার ব্যবহার হয়। বিবাহ যাত্রাকালে, বরের হস্তে দর্পণ (কাগজ নির্ম্মিত) ও কলার মাইজ রাখিতে হয়। দুর্গোৎসব পূজায় নব পত্রিকায় কলার ছোট গাছের ব্যবহার হয়।

যাত্রাকালে কদলী ফল দর্শন নিষিদ্ধ। হিন্দুদের বিশ্বাস যে যাত্রাকালে কদলী ফল দর্শন ও উহা ভক্ষণ করিলে যাত্রার বিরুদ্ধ ফল বা অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। সেইজন্য সাধারণ কথায় লোকে বলে যাত্রার ফল, কলা খাওয়া বা রম্ভা ভক্ষণ তুল্য হয়। অধুনা কদলী সূত্র হইতে বস্ত্র বয়নের চেষ্টা হইতেছে। কোন কোন জাতীয় কলার খোল হইতে উৎকৃষ্ট সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। কদলী সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়নের চেষ্টা ফলবতী হইলে এদেশের একটি মহতী উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। এক সময় এই কার্য্যের দিকে দেশের লোকের বিশেষ ঝোঁক পড়িয়াছিল। এইক্ষণ সে চেষ্টা ও আন্দোলন প্রায় থামিয়া গিয়াছে।

কোন কোন জাতীয় কদলীর খোল হইতে উৎকৃষ্ট রশি বা রজ্জু প্রস্তুত হইয়া থাকে। ম্যানিলা (Manilla Hemp plant Musa Paradisiaca var Textilis.) কদলীর রজ্জু কলিকাতায় এবং সমুদ্র ও বড় বড় নদীর তীরবর্ত্তী অন্য সহরে জাহাজ ও নৌকা বাঁধার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। উহা এদেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টন ম্যানিলা রজ্জু ফিলিপাইন দ্বীপ হইতে এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। এদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। ভারতবাসী চিরকালই সুষুপ্ত থাকিবে। তাহাদের ঘুমের ঘোর কখনই দূর হইবে না। একবার উৎসাহের সহিত জাগ্রত হইলে এই ব্যবসায় দ্বারাও তাহারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারে।

অর্দ্ধ পক্ক কদলীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। তৎপর যাঁতায় পিষিয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট ময়দা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা ছাঁকিয়া লইলেই পরিষ্কার ময়দা উৎপন্ন হয়। এই ময়দা অতিশয় সুস্বাদু। এই ময়দার সহিত দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া পিষ্টক প্রস্তুত হয়। সুপক্ক কদলী শস্যকে চালায় চালিয়া উহা দ্বারাও পিষ্টক প্রস্তুত হইতে পারে। সত্যপীরের পূজায় চাউলের গুঁড়া বা ময়দা, দুগ্ধ, চিনি ও সুপক্ক কলাসহ মিশ্রিত করিয়া একরূপ গোলা (প্রসাদ) প্রস্তুত করা হয়। উহাই পূজায় প্রদত্ত হয়। কদলী ফল সুপক্ক বা অপক্ক অবস্থাতেও নানা আকারে খাওয়া যায়। ইহার ফল মনুষ্য ভিন্ন পশু, পক্ষীও খাইতে ভালবাসে। ইহার পুষ্পমধু অতিশয় উপাদেয় দ্রব্য। পদ্ম মধু, কমলা মধু, ও সরিষা ফুলের মধুর ন্যায় ইহাও সর্ব্বজন আদরণীয়।

কলার পিঠা মুখরোচক দ্রব্য ও অতিশয় সুস্বাদু। কয়েক বৎসর অতীত হইল কলিকাতা হাইকোর্টের বারিষ্টার শ্রীযুক্ত সি, এফ, বেরো সাহেব কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়াছিলেন তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমি তাঁহাকে কলার বড়া ও পাতপিঠা খাওয়াইয়াছিলাম। তিনি উহা খাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন এবং

তিনি কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করার সময় তথায় খাওয়ার জন্য কতকগুলি পিঠা চাহিয়া নিয়াছিলেন।

এই অত্যাবশ্যকীয় ফলের ব্যবহারিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভূমিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কেননা অধুনা ইহা সমগ্র পৃথিবীতে পরিচিত। ইহার সমকক্ষরূপে দাঁড়াইতে পারে পৃথিবীতে এরূপ আর কোন ফল নাই। শীত প্রধান দেশে ইহা জন্মে না। শীত ঋতুতে এদেশেও ইহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টী সাধিত হয় না। শীতকালে ইহা বিলম্বে পরিপক্ক হয়। এই সময় ইহার শস্যও শৈত্যাধিক্য হেতু কঠিন হয় এবং স্বাদেরও ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে। শৈত্য দ্বারা কঠিনতা লাভ করে বলিয়াই ফলের স্বাদের বিকৃতি ঘটে। গ্রীষ্মকালে ইহার গাছ ও ফল পূর্ণ বিকাশ লাভ করে ও গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল হয়। এই সময়ের ফল অতি সুস্থ ও সুস্বাদু হয়। শীতকালের ফলাপেক্ষা গ্রীষ্ম কালের ফলই উৎকৃষ্ট।

গাছের সুস্থতা ও ভূমির অবস্থা বিবেচনায় কলা গাছ, রোপণের পরবর্ত্তী নয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে ফলিত হয়। গুস্‌বেরী (Gooseberry) ষ্ট্রবেরী (Straberry) প্রভৃতি কতকগুলি গুল্মজাতীয় গাছ ও আনারস প্রভৃতি গাছ ভিন্ন অন্য কোন গাছই এত অল্প সময়ে ফল ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। প্রথমোক্ত দুই জাতীয় গাছ এদেশের নিম্নপ্রদেশে কদাচিৎ জন্মিয়া থাকে। এদেশে লাভের হিসাবে উহাদের চাষ হওয়া অসম্ভব। পার্ব্বত্য প্রদেশে সামান্য পরিমাণে সখের জন্য উহাদের চাষ হইয়া থাকে। তথায়ও উহাদের ফল বাজারে উঠিবার যোগ্য হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে কদলীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। গ্রাম্য ও বন্য। বন্য কদলীকে গিরিকদলী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাই পার্ব্বত্য কদলী। ইহার নাম বহুবীজা ও গজবল্লভা। কোন কোন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকার ইহাকে কদলী ও কাষ্ঠ-কদলী এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ইহার সুবর্ণ মোচা নামটীও দিয়াছেন। আঠিয়া, ভীম আঠিয়া, ছাগল আঠিয়া, কের কের আঠিয়া প্রভৃতির মোচা ঈষৎ সুবর্ণ বর্ণ। সম্ভবতঃ ইহারাই সুবর্ণ জাতীয় কদলী। তদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মাণিক্য, মর্ত্ত, অমৃত ও চম্পক কদলীর নামোল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয়। জাতি বা কবরি, গোমা ও আমনা মুগুর কলাই সম্ভবতঃ মাণিক্য কদলী। ইহা কোন কোন স্থানে অমৃতমান নামে পরিচিত। দেব ও ইষ্ট কার্য্যে ইহাদেরও ব্যবহার হয়। ঔষধার্থও ইহাদের ব্যবহার হইয়া থাকে। মর্ত্তমান কলাই মর্ত্ত, অমৃতমানকে অমৃত ও চাঁপা কলাকে চম্পক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আঠিয়া, ভীম আঠিয়া ও ছাগল আঠিয়া ও কের কের কলা কাষ্ঠকদলী মধ্যে পরিগণিত। প্রত্যেক জাতির বিস্তৃত বিবরণ নানা জাতি কদলীর লিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আয়ুর্ব্বেদে ঔষধার্থ কলার কন্দ, মূল, পুষ্প, পত্র ও ফল প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে কদলী পুষ্প অর্থে কলার ফুল, মোচা অর্থে থোড় (ফল ও ফুল সমষ্টি) কদলী কন্দ (কদলী মূল) অর্থে সেড় এবং কদলী কাণ্ড অর্থে মূল সম্ভূত পুষ্পদণ্ড বা নালকে বুঝায়। উহা এদেশে ডাঁদালি বা কাঁজাল নামে পরিচিত।

কাঁচা কলা মধুর রস, শীত বীর্য্য, বিষ্টম্ভী,

কফঘ্ন, গুরু ও স্নিগ্ধকারক। ইহা রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বাতনাশক। পাকা কলা মধুর রস, শীত বীর্য্য, মধুর বিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, রুচিকারক ও মাংসবর্দ্ধক। ইহা ক্ষুধা তৃষ্ণা, চক্ষুরোগ ও প্রমেহ নাশক। মাণিকা, মর্ত্ত (মর্ত্তমান) অমৃত, চম্পক (চাঁপা) ও জাতিভেদে কদলী অনেক প্রকার। এই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বাহুল্যরূপে অবস্থিতি করে। ইহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘু।

"মোচা ফলং স্বাদুশীতং বিষ্টম্ভী কফকৃৎ গুরু।
স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃড় দাহক্ষত ক্ষয় সমীর জিৎ॥
পক্কং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহনম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণা নেত্ররুক্ মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ॥"

"মাণিক্য মর্ত্তামৃত চম্পকাখ্যা ভেদাঃ কদল্যা
বহু বোহ পিসন্তি।
উক্তা গুণাস্তে খলিকা ভবন্তি
নির্দ্দোষতাসাল্লঘুতাচ তেষাম্॥"

কদলী পুষ্প—ইহা স্নিগ্ধ, মধুর কষায়-রস, গুরু, শীতবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত রক্তপিত্ত ও ক্ষত নিবারক।

"কদল্যা কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাত পিত্ত হরং শীতং রক্ত পিত্ত ক্ষত প্রণুৎ॥"

কদলী কন্দ (মূল) ইহাকে হিন্দুস্থানে কেরাকন্দ ও তৈলঙ্গে অরটি ছুংপ কহে। ইহা শীতল বলকর, কেশ্য, অম্লপিত্ত নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহনাশক, মধুর রস ও রুচিকারক।

"শীতলঃ কদলী কন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্ল
পিত্তজিৎ।
বহ্নি কৃদ্দাহহারীচ মধুর রুচিকারকঃ।"

কদলী দণ্ড থোড় বা মোচা

ইহা শীতবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং যোনিদোষ, অর্শঃনাশক ও রক্তপিত্ত নাশক।

"যোনিদোষ হরোদণ্ডঃ কাদলোঽহ সুন্দরং
অয়েৎ।
রক্তপিত্ত হরঃ শীতঃ সুরুচ্যোঽগ্নি প্রবর্দ্ধনঃ।"

কলার ফলের বল্কল, খোল মূল ও পাতার ভস্ম অতিশয় তেজস্কর ও অলৌকা নাশক। অলৌকার মুখে এই ক্ষার (ভস্ম) চূণ সহ প্রয়োগ করিলে উহা মরিয়া যায়। কৃষকগণ অলৌকা পূর্ণ ক্ষেত্রে চাষ বা উহা রোপণ কালে এই ভস্ম চূণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পদ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত স্থান লেপন করিয়া থাকে। কখন কখন হলুদ ও চূণ বাটীয়া উহাও প্রয়োগ করিয়া থাকে। কলা ফলের বল্কল পুড়িয়া ঐ ভস্ম গাত্রে লাগাইলে ক্ষত উৎপন্ন হয়।

আবার উহার দ্বারা পচা ক্ষত পরিষ্কার হইয়া সুস্থ হয়। এই ভস্ম দ্বারা গুল দেওয়ার কার্য্য সাধিত হয়। উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দ্বারাও গুল * দেওয়া হয়। ঋষি অর্থাৎ মুনিগণ অশৌচ সময়ে অর্থাৎ পিতামাতার মৃত্যুর পরে একাদশ দিন, কলার খোলজাত জল সেবন করিয়া থাকে। ইহাকে তাহারা পবিত্র জল বলিয়া মনে করে। মুনি, ঋষি প্রভৃতি তপস্বিগণও এই জল পান করিতেন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াতে কলার খোলের ডোঙ্গা ও পাত্রাদি ব্যবহৃত হয় ইহা দ্বারা ভোজন পাত্রও প্রস্তুত হয়। পর্ব্বোপলক্ষে খোলের ডিঙ্গী (নৌকা) প্রস্তুত করিয়া উহাতে দীপ রাখিয়া জলে ভাসান হয়। খোল নির্ম্মিত ভোজন পাত্র হিন্দুগণ পবিত্র বলিয়া মনে

* রস ও ঘাতের শীড়ায় উত্তপ্ত লৌহখণ্ড দ্বারায় পায়ের ও হাতের অংশে বিশেষে পোড়াইয়া যে ক্ষত উৎপন্ন করা হয়, উহাকে গুল কহে।

করে। লক্ষ্মীপূজার সময় খোলের বেড় (শস্যাধার) প্রস্তুত করিয়া উহাতে ধান্য রক্ষিত হয়। শুষ্ক খোল ও পাতা দ্বারা দরিদ্রদিগের কুটীর প্রস্তুত হয়। কলা গাছের সখোল কাণ্ডদ্বারা ভুরা (Raft) প্রস্তুত হয়। কলার মূলের ভস্ম হইতে একরূপ ক্ষার লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীনকালে মুনিঋষিগণ লবণের পরিবর্ত্তে ইহাই ব্যবহার করিতেন। অদ্যাপি আসামবাসিগণ কেহ কেহ লবণের পরিবর্ত্তে ইহাই ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ক্ষার জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়।

"কারোদক সাধিতং ব্যঞ্জনমস্ত্রিকাম
রূপাদৌ।"

(আয়ুর্ব্বেদ টীকাকার বিজয় রক্ষিত।)

কদলীবৃক্ষ, উহার ফল, ফুল, খোল ও মূলের ব্যবহারিতা সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল তদতিরিক্ত আরও কতকগুলি কথা বক্তব্য থাকিলেও বাহুল্য বিবেচনায় উহা পরিত্যক্ত হইল। কখন কখন কলা গাছ হইতে একাদিক্রমে ২।৩টী মোচাও বহির্গত হইয়া থাকে। কখনও বা কাণ্ডের গাত্র হইতেও ২।৩টী থোড় বহির্গত হয়। এরূপ হইলে এদেশীয় লোকে উহাকে অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া আশঙ্কা করে। এইরূপ গাছকে তাহারা কাটিয়া ফেলে। কখন কখন ফলদণ্ডের অগ্রভাগ হইতে যমজ থোড়ও বহির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন ততোধিক থোড়ও বহির্গত হয়। আবার এই যমজ থোড়ের ফলদণ্ডের উপরেও নিম্নেও থোড় জন্মিয়া থাকে। উহা অমঙ্গলের চিহ্নজ্ঞাপক। পশুখাদ্যের অভাবের সময় কলার মোচা ও গাছ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খৈল ও লবণ সংযোগে পশুকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা পশু খাদ্যের অভাব অনেকাংশে পূরণ হয়।

ভূমি প্রস্তুত প্রণালী

কলা রোপণ করিতে হইলে, তাহা কি প্রকারের চাষ্যা প্রয়োজন এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ উপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এইক্ষণ উহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রথমতঃ ভারী কোদালী দ্বারা কলার ভূমিকে এক হাত পরিমাণ গভীর করিয়া কোপ্‌লাইয়া লইবে। তৎপর কোদালির কোপে উৎপন্ন ঢিলগুলি শুষ্ক হইলে মুগুর দ্বারা পিটাইয়া উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দিবে। তৎপর ক্রমে উহাতে তিনবার চাষ ও মই দিয়া ঢিলগুলিকে চূর্ণীকৃত ও পুনঃ পুনঃ মই দিয়া উহাকে সমতল করিবে। জঙ্গল, ঢিল, বাপরা খোলা বা কোনরূপ কঠিন পদার্থ মৃত্তিকাতে থাকিলে উহাকে বাছিয়া ফেলিবে। মৃত্তিকা চূর্ণীকৃত করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। কলা চাষের ভূমি বিশেষ সরস থাকা আবশ্যক। মৃত্তিকা বিশেষ চূর্ণিকৃত হইলে উহাতে কৈশিক আকর্ষণের (Capillary attraction) কার্য্য অব্যাহতরূপে চলিয়া থাকে। তাহা হইলে মৃত্তিকা সরস থাকে। এইজন্য মৃত্তিকাকে যতদূর সম্ভব চূর্ণ করিবে। যে মৃত্তিকায় পূর্ব্বোল্লিখিত উপাদানের অভাব আছে, উহাতে নূতন মাটী, নদী বা বিলজাত পলিমাটী, পুষ্করিণী কি খাল বা তদ্রূপ জলাশয়ের কর্দ্দম মাটী কিয়ৎপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ভূমি প্রস্তুত করিলে কলার চাষে বিশেষ সফলতা লাভ করা যায়। যে ভূমিতে কলার চাষ করিতে হইবে মাঘ মাস হইতেই উহা প্রস্তুত করিতে হইবে। বৈশাখ মাসের প্রথম বৃষ্টিপাতের সময়ই কলার ডেউয় রোপণের প্রশস্ত সময়।

রোপণ কাল

বৈশাখ মাসই কলা রোপণের প্রশস্ত সময়। কেহ কেহ বলেন আশ্বিন কার্ত্তিক মাসই কলা রোপণের উৎকৃষ্ট সময়। কিন্তু আমার মতে উহা ভ্রান্তিমূলক। কেননা আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে কলার গাছ রোপণ করার অব্যবহিত পরেই এদেশে শীতকাল আরম্ভ হয়। শীতকাল কলা গাছের পরম বৈরী, সুতরাং এই সময় গাছ রোপণ করিলে উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। সমস্ত শীতকাল ইহারা দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে। কখন কখন শৈত্যাধিক্য প্রযুক্ত উহা মরিয়াও যায়। বাঁচিয়া থাকিলে পুনরায় গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল না আসা পর্য্যন্ত আর উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাজেই এই সময় গাছ লাগান আর না লাগান সমান কথা। জ্যৈষ্ঠ মাসেও গাছ রোপণ করা যায়। বর্ষাকালে গাছ রোপণ করিলে উহার মূল বর্ষাধিক্য প্রযুক্ত অনেক সময় পচিয়া যায়। কাজেই গাছও মরিয়া যায়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছ রোপণ করিলে ২।৩ সপ্তাহ মধ্যে উহা লাগিয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ে দীর্ঘকালব্যাপী বর্ষার আগমন হওয়ায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত গাছ গুলি অচিরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্ষা কালই উহাদের স্ফূর্ত্তির সময়। এবিষয়ে দেশ-প্রচলিত কতকগুলি বচন আছে। উহা খনার বচন নামে কথিত হয়।

"ফাগুনে এঁটে, পোত কেটে।
বেঁধে যাবে কাঁকড়ি ঝাড়।
কলা বৈতে ভাঙ্গিবে ঘাড়।"

খনার মতে ফাল্গুন মাসে কলার তেউর পোতা সঙ্গত। তাহা হইলে কলার চাষের বিশেষ সফলতা লাভ হয়। বাস্তবিক ফাল্গুন চৈত্র মাসেও কলার গাছ পোতা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সময়ে উক্ত গাছ পরবর্ত্তী বৈশাখের বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

"ডাক দিয়ে বলে রাবণ,
ফলে কলা আষাঢ় শ্রাবণ,
কলা তলায় যাবিনে,
ফল তার কভু পাবিনে,
লেগে যাবে ঘুঁয়ে
কলা পড়বে শুইয়ে।"

অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলার তেউর রোপণ করিলে ফলকে আর কলা গাছের তলায় যাইতে হইবে না। তাহার ফলও পাওয়া যায় না। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলা গাছ পুতিলে উহাতে ঘুঁইয়ে অর্থাৎ ঘুঁইপোকা (Earth worm) বা কেউচে পোকা লাগিবে। কেউচে পোকায় গাছের মূল ও খোল খাইয়া ফেলিবে। তখন গাছ সকল শুইয়া পড়িবে অর্থাৎ মৃত্তিকাশায়ী হইবে। সুতরাং খনার মতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলা গাছ রোপণ নিষিদ্ধ।

"ফাগুনে রুইলে কলা,
তবে হয় মাস কলা"

অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে কলাগাছ রোপণ করিলে উহা মাস কলা হয় অর্থাৎ উহাতে প্রতিমাসেই ফল হয়।

"ভাদ্রমাসে রুইয়ে কলা,
সবংশে মৈল রাবণ শালা।"

খনার মতে ভাদ্র মাসেও কলাগাছ রোপণ নিষিদ্ধ। বর্ষাধিক্য প্রযুক্ত উহাতেও ঘুঁইয়ে (কেউচে) লাগে। রাবণ, ভাদ্রমাসে কলাগাছ রোপণ করিয়া সবংশে নিপাত হইয়াছেন।

মূলতঃ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই কয়েক মাস কলাগাছ

রোপণ পক্ষে উপযোগী নহে। একই ক্ষেত্রের সকল স্থানে একই সময়ে কলাগাছ রোপণ না করিয়া ফাল্গুন হইতে বৈশাখমাস পর্য্যন্ত ক্রমে রোপণ করিলে ক্রমে ফল লাভ করা যায়। ব্যবসায়ী কৃষকের পক্ষে এইরূপ রোপণই সঙ্গত। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসেও এইরূপ রোপণ চলে।

সার প্রদান প্রণালী

এদেশে কলা গাছের বৃদ্ধির ও তেজস্বিতা লাভের জন্য কদাচিৎ সার প্রদানের প্রয়োজন হয়। কলা গাছ সহজে ভূমি হইতে আপন খাদ্য প্রাপ্ত হয়। বঙ্গদেশে ইহার জন্য স্বতন্ত্র সারের প্রয়োজনই হয় না। নূতন মাটীর সহিত পাতার সার প্রয়োগ করিলে কলা গাছের আংশিক উপকার সাধিত হয়। ঘাসের পচা মূল মিশ্রিত দোয়াশ (Turfy loam) মৃত্তিকাই কলা গাছের পক্ষে বিশেষ সার। গাছের গোড়া হইতে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি মৃত্তিকা খুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। গৃহীত মৃত্তিকার স্থান উপরের লিখিত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। তৎপর উহার উপরে মৃত্তিকার চাপ দিয়া ঢাকিয়া দিবে। বায়বীয় ক্রিয়া দ্বারা ঐ উভয় মৃত্তিকা, সার মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এইরূপে যে মৃত্তিকা প্রদত্ত হইল উহা সর্ব্বদা আলগা থাকা প্রয়োজন। উহা যদি কঠিনতা লাভ করে তাহা হইলে উহা ব্যবহারে ফল লাভ করা যায় না। উহা আলগা থাকিলে কলা গাছের গোড়ার তলস্থ মৃত্তিকার বায়ু, আলো ও উত্তাপ সহজে প্রবেশ করিতে পারে। অধিকন্তু ঐ মৃত্তিকা আলগা থাকিলে উহা বায়ুস্থিত উদ্ভিদ্ খাদ্য সহজে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। ঐ মৃত্তিকা আলগা থাকিলে ঐ সকল স্বাভাবিক খাদ্য সহজে ঐ মৃত্তিকায় প্রবেশ করিয়া কলা গাছের মূল কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। কলা গাছের গোড়ার মৃত্তিকা সময় সময় এইরূপে পরিবর্ত্তন করা ভিন্ন উহাতে আর কোন সার দিবার প্রয়োজন হয় না। তিন মাস পরে পরে এইরূপে মৃত্তিকা পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই ক্রিয়ার দ্বারা কলা গাছ বায়ু ও ভূমি হইতে উহাদের খাদ্য সহজে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। ইহার দ্বারা কলা গাছের মূল হইতে অতি সরল ও সুস্থ শিকড় সকল সত্বরই বহির্গত হয় এবং উহারা ভূমির চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকে। ঐ সকল মূল কলা গাছের খাদ্য ভূমির নিম্নস্থ ও উপরিস্থ স্তর হইতে সংগ্রহ করিয়া উহার বৃদ্ধি ও পুষ্টিতা সম্পাদন করিয়া থাকে। কলা গাছ স্বভাবতঃই রসাল (succulent)। কলা গাছকে ২।৩ বৎসরের অধিক কাল এক স্থানে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে। রসালত্ব হেতু উহারা সত্বরে মৃত্তিকার সারভাগ তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়া মৃত্তিকাকে অচিরে নিঃস্ব করিয়া ফেলে। সুতরাং ইহাদিগকে দীর্ঘকাল এক স্থানে রাখিলে উহারা ক্রমে ক্ষয় পাইয়া মরিতে থাকিবে। উহাদের মূল সম্ভূত ডেউড় হইতে যে গাছ উৎপন্ন হইবে উহারা আর উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না। ইহার কারণ এই যে ইহারা দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকায় উহাদের বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য যে সকল উপাদানের আবশ্যক, তাহার অভাব হইয়া পড়ে। ইহারা মৃত্তিকার সারভাগ পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করায়, মৃত্তিকা অতিশয় নিঃস্ব ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ভবিষ্যতের জন্য কিছুই অবশেষ থাকে না। পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা পরিবর্ত্তন করিয়া কিয়ৎকালের জন্য উহাদের সুস্থতা রক্ষা করা যায়। কিন্তু এই

রূপে অধিক দিন মৃত্তিকা সচল সবল ও সুস্থ রাখা যায় না। এই জন্য প্রত্যেক দুই তিন বৎসর পরে পরে কলার চাষের নূতন ক্ষেত্র ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়। যাঁহার এরূপ ক্ষেত্র নাই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পুরাতন ক্ষেত্রই ব্যবহার করিতে হয়। পুরাতন ক্ষেত্রে ইহার চাষ করিতে হইলে, পুরাতন গাছ গুলিকে কোদালি দ্বারা সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে। তৎপরে যে সকল স্থান হইতে ঐ গাছগুলিকে উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে। ঐ স্থান নূতন মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করিতে হইবে। তৎপরে যে ভাবে কলার চাষের মৃত্তিকা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে ঐরূপে ঐ ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ফসল উঠিয়া গেলেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। যে স্থান হইতে গাছ সকল উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে ঐস্থান ভিন্ন, ঐ ক্ষেত্রের অন্যত্র নূতন গাছ রোপণ করাই সঙ্গত। কলাগাছের মূল ও শিকড় পচিয়া মৃত্তিকার উৎকর্ষ সাধন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা কলার চাষের পক্ষে উপযোগী হয় না। অন্য ফসলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে। ঐরূপ মৃত্তিকাতে আদা, হলুদ ও মাঠজ ফসল ভালরূপ জন্মিতে পারে। একস্থানে দীর্ঘকাল কলার চাষ করিলে উহা কেউচে ও নানারূপ কীটের আবাস ভূমি হয়। সেই জন্য ঐ ভূমি পুনরায় কলার চাষ পক্ষে উপযোগী হয় না। ঐ ক্ষেত্রকে সেই জন্য দীর্ঘকাল পতিত রাখিয়া তৎপরে উহাতে কলার বা অন্য ফসলের চাষ করিতে হয়। কলাক্ষেত্র কীটের আবাস ভূমি হইলে উহাতে কলার চাষ হইতে পারে না। কলা গাছের মূল ও খোল কীট কর্ত্তৃক দংশিত হইলে ঐ সকল গাছ অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সেই জন্য ২।৩ বৎসর পরে পরে নূতন ভূমিতে কলার চাষের প্রয়োজন হয়। ঐরূপ ভূমিতে উক্ত কলাগাছ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে পারে না, পারিবারিক ব্যবহারের জন্য একই ভূমি দীর্ঘকাল কলার চাষ জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু লাভের জন্য কলার চাষ করিতে হইলে প্রত্যেক ২।৩ বৎসর পরে নূতন ভূমিতে কলার চাষ করিতে হয়।

কদলী ক্ষেত্রের নূতন মাটীই প্রধান সার। এই জন্য প্রতি বৎসরেই উহাতে নূতন মাটী ফেলিতে হয়। প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এবং সমস্ত ক্ষেত্রে অন্ততঃ একফুট মৃত্তিকা দিতে পারিলে ভাল হয়।

"গোবে গোবর কলায় মাটী
আঙ্গুলা নারিকেলের শিকড় কাটি।"

খনার মতে সুপারী গাছে কাঁচা গোবর ও কলাগাছে নূতন মাটী দিতে হয়। নারিকেল গাছ ফল ধারণ না করা পর্য্যন্ত উহার শিকড় কাটিতে হয়। খনার মতেও কলাগাছে নূতন মাটী ভিন্ন অন্য সার প্রদানের ব্যবস্থা নাই।

কলাগাছে পুরাতন গোবরের সার ব্যবহার নিষিদ্ধ। গোমূত্র মিশ্রিত তরুণ গোবর সময় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোমূত্রে সোরার ভাগ থাকায় উহা কলাগাছের পক্ষে উপযোগী হয়। তরুণ গোবর ব্যবহারে ফলের মিষ্টতাও আংশিক বৃদ্ধি হয়। অল্প সমূত্র গোবর গুলিয়া গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত ব্যবহার করা যায়। পচা বা অর্দ্ধ পচা গোবর কলাগাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে কখন কখন বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদবস্থায় কলাগাছ কেউচে প্রভৃতি কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কেউচে কলাগাছের পরম বৈরী। শুষ্ক গোবর চূর্ণ করিয়াও কলাগাছের গোড়ায় ব্যবহার করা

যাইতে পারে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তিন বিঘা ভূমিতে ২০০ পাউণ্ড সালফেট্ অব্ পোটাস (Sulphate of potash) ২৫০ পাউণ্ড সালফেট্ অব্ এমোনিয়া (Sulphate of ammonia) এবং ৪৫০ পাউণ্ড সুপার্ ফস্ফেট (Super phosphate) মিশ্রিত করিয়া ঐ সার ব্যবহার করা হয়। এদেশে এই সারের আদৌ প্রয়োজন হয় না। কার্শিয়ার বলেন, গোশালা জাত সার, খৈল, অস্থিসার, মনুষ্য বিষ্ঠা ও তরল সার কলার চাষের উপযোগী সার। খৈল সার একরূপ মন্দ নহে। উহা তেজস্বী সার। উহাদ্বারা কীট দূর হইয়া গাছের তেজস্বীতা ও ফলের স্বাদ বৃদ্ধি হয়। আমি অস্থিসার ও মনুষ্য বিষ্ঠা ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অস্থিসার দ্বারা বিলম্বে ফল লাভ হয়। উহাদ্বারা ফলের উৎকর্ষ ও স্বাদ বৃদ্ধি হইতে পারে সন্দেহ নাই। কলাগাছ অল্প সময়ে ফল ধারণ করে। অস্থিসার, ভূমিতে প্রয়োগ করিলে উহা পচিতে ২।৩ বৎসর লাগিয়া থাকে। কলার গাছ ২।৩ বৎসরের অধিক একস্থানে রাখা সঙ্গত নহে। অস্থিসার পচিতে পচিতে অন্য স্থানে কলার চাষ করার আবশ্যক হয়। কৃত্রিম উপায়ে অস্থিসারকে পচান যাইতে পারে। উহা ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার। মনুষ্য বিষ্ঠা কীটাদির আবাস ভূমি হয়। সুতরাং উহা কলা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। মনুষ্য বিষ্ঠা ও অস্থিসার দ্বারা ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি হইতে পারে সন্দেহ নাই। একবারে ক্ষয়-প্রাপ্ত মনুষ্য বিষ্ঠা, গো বিষ্ঠা ও ঘোটক বিষ্ঠা, গাছের গোড়ার মৃত্তিকায় মিশাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। সামান্য পরিমাণে চুণ ও উদ্ভিদ্‌ভস্ম কলাগাছের গোড়ার মৃত্তিকার সহিত ব্যবহার করিলে কীটের উপদ্রব কম হয়। অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে গাছের অপকার সাধিত হয়।

রোপণ প্রণালী

কদলী ক্ষেত্রকে প্রতি আট হাত অন্তর কেইল (Row or line) করিয়া বিভাগ করিবে। প্রত্যেক কেইলের উপরে আট হাত অন্তর অন্তর একটী গাছ রোপণ করিবে। এক ছোবার গাছের পাতা অন্য ছোবার পাতার সহিত না লাগিতে পারে তদ্রূপ ভাবে গাছ রোপণ করিবে। আট হাত অন্তর অন্তর খুপি করিবে। প্রত্যেক খুপি এক হাত হইতে দেড় হাত খাই ও তৎপরিমাণ পরিসর হওয়া প্রয়োজন। কার্শিয়ার বলেন গর্ত্তের পরিসর ৩ ফুট বা ২ ফুট হওয়া প্রয়োজন। গাছের উচ্চতা ও গোড়ার বেড়ের হিসাবে গর্ত্তের পরিমাণ ধার্য্য হয়। ৩ ফুট পরিসরের গর্ত্তের কদাপি প্রয়োজন হয়। কলার ডেউর অন্ততঃ দেড় হইতে দুই হাত উচ্চ হওয়া প্রয়োজন। ৪।৫ ফুট উচ্চ গাছও রোপণ করা যাইতে পারে। প্রত্যেক খুপিতে একটী করিয়া গাছ রোপণ করিবে।

খনার মতে।

"আট হাত অন্তর, এক হাত খাই।
কলা রুইও চাষা ভাই।
রুইয়ে কলা কেটোনা পাত।"
কলায় যোগাবে কাপড় আর ভাত॥"

গাছ রোপণ করিয়া উহার মূলকে মাটী দিয়া চাকিয়া দিবে। হাতে বা পায়ের চাপে ঐ মৃত্তিকাকে দৃঢ়ভাবে আটিবে। গাছটী যেন সহজ চোটে নড়িতে না পারে। গাছের গোড়ার গর্ত্তের ২।৩ ইঞ্চি স্থান খালি রাখিবে। উহাতে জল দিবে। জল বসিয়া গেলে খালি স্থান ঘাস মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা ঢাকিয়া

দিবে। হাতে বা পায়ের চাপে ঐ মৃত্তিকাকে দৃঢ়ভাবে আটিবে। গাছটী যেন সহজে নড়িতে না পারে। অনাবৃষ্টির সময় মাঝে মাঝে জল দিবে। ঐ সময় বৃষ্টিপাত হইলে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। ক্ষুদ্র গাছ রোপণ করিলে উহার উপরে কিছুকালের জন্য সামান্য ছায়া করিয়া দিবে। গাছ লাগিয়া গেলে আর ছায়ার প্রয়োজন হয় না। সকল জাতীয় কলার জন্য ছায়ার প্রয়োজন হয় না। এটে বা বীচে কলা, কাঁচাকলা ও কবরি বা জাত কলার গাছের জন্য ছায়ার আদৌ প্রয়োজন হয় না। খোলা জায়গায় ইহারা বিশেষ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে। সবরি বা অমৃতসাগর, অগ্নীশ্বর, মর্ত্তমান, কাবুলী ও চাঁপা জাতীয় কলা গাছের জন্য আংশিক ছায়ার প্রয়োজন হয়। কতকগুলি জাতি ছায়ায় আদৌ হয় না। কদলী ক্ষেত্রে বায়ু, আলো ও উত্তাপ অধিক পরিমাণে প্রবেশের পথ পরিষ্কার রাখিতে হয়। উহাতে আলোকের, বায়ুর ও উত্তাপের অভাব হইলে গাছগুলি বলবান হইতে পারে না। সুতরাং উহারা সুফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। আলো, উত্তাপ ও বায়ুর অভাব হইলে ঐ ক্ষেত্রে মশক ও বাদুড় প্রভৃতির উৎপাত হয়। কেহ কেহ ৬ ফুট হইতে ৮ ফুট অন্তরে অন্তরে কলা গাছ রোপণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমি এই মতের পক্ষপাতী নহি। চারি হাত বা ৬ ফুট অন্তর অন্তর কলা গাছ রোপণ করিলে কলা ক্ষেত্র অন্ধকার হইবে। সুতরাং উহাতে বাদুড় ও মশার উৎপাত হইবে। মশা কলার ফল ও পাতার পরম বৈরী। মশক-দংষ্ট্র কলা পাকিলেও কঠিন থাকে। উহার ফল পুষ্টিতা লাভ করিতে পারে না। বাদুড় উহার কাঁচা ও পাকা ফলের বৈরী। বাদুড় কাঁচাকলা ও মোচাও চুষিয়া খায়। বাদুড় চোষা ফল একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়। এদেশের লোকে বলে :—

"বামুণ চোষা তামাক, কায়েত চোষা গ্রাম ও বাদুড় চোষা কলা" সার শূন্য হয়। অর্থাৎ যে গ্রামে কায়স্থ কার্য্যকারক প্রবেশ করে সে গ্রামের প্রজাগণের আর সার থাকে না। তাহারা প্রজাগণকে চুষিয়া খায়। তাম্রকূট সেবী ব্রাহ্মণ তামাক খাইলে উহাতে আর সার থাকে না, অন্য কেহ উহা চুষিয়া কিছুই পান না। বাদুড় কলা চুষিলেও উহাতে কিছু থাকে না। নিকটে নিকটে কলা গাছ রোপণ করার আরও একটী দোষ আছে। এক ঝোপের গাছের পাতা অন্য ঝোপে লাগিলে প্রত্যেক গাছে কীটাদি বৈরী সহজেই যাতায়াত করিতে পারে। ঐরূপ ক্ষেত্রে আদা, হলুদ প্রভৃতি উপ-ফসলের (Catch crop) চাষ করিলে উহা হইতে কলা ক্ষেত্রের একটী আয় হইতে পারে। সুতরাং কোন রূপেই কলা গাছ ঘন করিয়া রোপণ করিতে নাই। কিন্তু কাবুলি প্রভৃতি কতকগুলি খর্ব্বাকৃতি কলাগাছ ৪ হইতে ৬ হাত অন্তর অন্তর রোপণ করা যাইতে পারে। উদ্যানে এবং মাঠেও কলার চাষ হইতে পারে সুতরাং উহারা মাঠজ (field crop) ও উদ্যানজ (garden crop) ফসল মধ্যে পরিগণিত। পূর্ব্বোক্ত রূপে কলার গাছ রোপণ করার পরে ২।৩ সপ্তাহ মধ্যেই উহারা লাগিয়া যায়। উহারা বায়ু ও ভূমি হইতে নিজ নিজ আহার্য্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভূমিতে সার দিতে হইলে পরে ক্রমে উহা প্রয়োগ করিতে হয়।

রোপণের পরে ২।১ মাস মধ্যেই উক্ত

গাছের গোড়া হইতে অসংখ্য তেউড় বাহির হইতে থাকে। ২।৩টী সুস্থ তেউড় রাখিয়া দুর্ব্বল তেউড় গুলিকে তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে হয়। নচেৎ অনেক গাছ একত্র রাখিলে উহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উহাদের ফল আকারে ও স্বাদে নিম্ন হয়।

কলা ক্ষেত্রের স্থান নির্ণয়

সাধারণ ভূমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি কলার চাষের পক্ষে উপযোগী। বাকুচির বরজের জন্য যেরূপ উচ্চ ভূমির প্রয়োজন হয় কলার চাষেও তদ্রূপ উচ্চ ভূমিই উপযোগী। ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে বা উহা সর্ব্বদা স্যাঁত-সেঁতে থাকিলে উহাতে কলার চাষ হয় না। যে স্থানে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ু সমান ভাবে প্রবেশ করিতে পারে সেরূপ স্থানও কলার চাষের উপযোগী নহে। কেননা কলাগাছ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বায়ুর তাড়নায় উহারা সহজেই দলিত হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য ঐরূপ স্থানে কলার চাষ করিতে হইলে কলা ক্ষেতের চতুর্দ্দিকে ৪।৫ ফুট উচ্চ ও দৃঢ় বেড়া দিতে হয়। এই বেড়া এরূপ দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন যে বায়ুর বেগ সহজে উহা ভেদ করিয়া কদলী গাছে না লাগিতে পারে। ইঙ্গা (Inga) প্রভৃতি দৃঢ় গুল্ম জাতীয় গাছের বেড়াই উৎকৃষ্ট। ঐ বেড়া গাছকে অতি-ক্রম করিয়া উহার উপরে উঠিতে না পারে তাহার উপায় করিবে। সময় সময় ঐ বেড়াকে ছাঁটিয়া দিতে হয়। আবার গাছের মাথায় ও গোড়ায় বায়ু ও আলো প্রবেশের পথ পরিষ্কার থাকাও প্রয়োজন। কলা ক্ষেতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক সর্ব্বদা খোলা থাকা প্রয়োজন। উত্তর ও পশ্চিম দিক্ খোলা না থাকিলেও চলে। কলা ক্ষেত হইতে অনায়াসে আবশ্যকাতিরিক্ত জল নিষ্কাসনের পথ সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিবে। কলাক্ষেত্রের মৃত্তিকা সরস থাকা প্রয়োজন। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে থাকিলে গাছের অপকার সাধিত হয়।

বীজ নির্ব্বাচন

বীজ ও তেউড় পার্শ্বাঙ্কুর দ্বারা কলাগাছের বংশবৃদ্ধি হয়। খাস বীজ (Seed proper) জাত গাছ উৎকৃষ্ট ফল ধারণ করে না। উৎকৃষ্ট জাতীয় কলার বীজ কদাচিত হয়। কোন কোন বনজাতির বীজ হয়। উহারা জঙ্গলী, এটে বা বিচা কলা নামে পরিচিত। উহাদের বীজোৎপন্ন গাছেও উৎকৃষ্ট ফল হয় না। উৎকৃষ্ট ফললাভের আশা করিলে পার্শ্বাঙ্কুর রোপণ করাই সঙ্গত। ফলের জন্য বীজজাত গাছ কদাপি উপ্ত হয়। পার্শ্বাঙ্কুর বাছিয়া লইতে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বহু-দর্শিতার প্রয়োজন। অনেক সময় কৃষক উহা ঠিক করিতে না পারিয়া যেমন তেমন তেউড় উঠাইয়া উহাই রোপণ করিয়া থাকে। উহাতে ফললাভ হওয়া দূরে থাকুক শ্রম ও অর্থব্যয় বিফল হয়। তেউড়ের বয়স ও সুস্থতা বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে উত্তোলন করিতে হইবে। যদি একই বয়সের তেউড় রোপণ করা যায় তবে প্রথম বর্ষে সকল তেউড়ই একই সময়ে ফল প্রসব করিবে। ভিন্ন বয়সের তেউড় রোপণ করিলে উহারা বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময় ফল প্রসব করিবে। যে তেউড় কম উহাকে কখনই রোপণ করিবে না। কেউচে বা অন্য কীট কর্ত্তৃক আক্রান্ত তেউড় রোপণ একেবারে নিষিদ্ধ। যে গাছ * ঝুলিয়া গিয়াছে উহার তেউড়

* বেতনসাহের ন্যায় কলাগাছও ঝুলারোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কলাগাছ এই রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহার পাতা ক্রমে হলুদবিমিশ্রিত বেতবর্ণ ধারণ করিয়া পরে মরিয়া যায়। কোন কোনার এই রোগ দৃষ্ট হইলে তাহাকে সমূলে উৎপাটন করিবে।

হইতে উৎপন্ন গাছও মুলিয়া যাইবে। অতি সতেজ ও সুস্থ গাছের সতেজ ও সুস্থ তেউড় রোপণার্থ গ্রহণ করিবে। যে গাছ হইতে তেউড় গ্রহণ করিতে হইবে, উহার চতুর্দ্দিক কোদাল দ্বারা কোপাইয়া অতি সতর্কতার সহিত তেউড় উঠাইবে। তেউড়গুলির মূল ঈষৎ তির্য্যকভাবে কাটিয়া লইবে। তীক্ষ্ণধার খন্তি, দা বা ছুরি দ্বারা উহাদিগকে কাটিবে। যে তেউড়ের পাদদেশ বিস্তৃত ও উপরিভাগ ক্রমে সরু উহারাই রোপণ পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যাহার পাদদেশ হইতে উপরিভাগ পর্য্যন্ত সকল স্থানই একরূপ ব্যাসবিশিষ্ট উহা নিকৃষ্ট। ২।৩ ফুট হইতে ৪।৫ ফুট উচ্চ তেউড়ই রোপণযোগ্য। এতাধিক উচ্চ তেউড় রোপণোপযোগী নহে। কিন্তু অনেকে বয়ঃপ্রাপ্ত ৮।১০ ফুট উচ্চ গাছও রোপণ করিয়া থাকে। উহারা সুফল প্রদান করে না। রোপণের পরে গাছ লাগিয়া গেলেই উহারা ফল প্রসব করিয়া থাকে। ঐ ফল অতিশয় নিকৃষ্ট হয়। মধ্যমাকৃতি তেউড়ই রোপণপক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্ষুদ্র তেউড়ও একরূপ মন্দ নহে। কিন্তু উহারা বিলম্বে ফলধারণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ রোপণের পরবর্ত্তী ছয় হইতে ৯ মাস মধ্যে কলাগাছ পুষ্পিত হয়। তৎপর জাতিভেদে ৩ হইতে ৬ মাস মধ্যে উহাদের ফল পরিপক্ক হয়। ক্ষুদ্র তেউড় প্রায় এক বৎসর পরে ফল প্রসব করে সুতরাং গাছ রোপণের পরে, উহাদের ফল উৎপন্ন ও পরিপক্ক হইতে ১৫ হইতে ১৮ মাস লাগিয়া থাকে। এই জন্য তেউড় রোপণের পূর্ব্বে উহাদের বয়সের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। বড় অর্থাৎ অধিক বয়সের তেউড় অতি নিকৃষ্ট। কোন কোন সময় ঐ রূপ তেউড় গর্ভবতী থাকে। ঐ অবস্থায় উহাকে রোপণ করিলে উহার ফল অতি নিকৃষ্ট হইবে। ক্ষুদ্র বা মাঝারি তেউড় রোপণ করিতে হইলে তেউড় উঠাইয়া উহার মূলের শিকড়গুলিকে কাটিয়া ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। উহাতে পচা দাগ থাকিলে ছুরি দ্বারা উহা কাটিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। তৎপর তরুণ গোবর জলে মিশাইয়া ঐ ক্ষত স্থান ধৌত করিবে। উদ্ভিদ ভস্ম বা ঘুটের ছাই ঘষিয়া দিলেও চলে অধিক বয়সের গাছ রোপণ করিতে হইলেও উপরোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়। ঐরূপ গাছের মাথার পাতার অগ্রভাগের কতকাংশ কাটিয়া দিতে হয়। তৎপর ৩।৪ দিন ছায়া-যুক্ত স্থানে উহাদিগকে রাখিয়া তৎপর রোপণ করিতে হয়। ক্ষুদ্র ও মধ্যমাকার তেউড়কেও ২।৩ দিন ঐ অবস্থায় রাখিয়া তৎপর রোপণ করিতে হয়। সদ্য গৃহীত তেউড় রোপণ বিধেয় নহে। উঠাইবার পরে উহা ২।৩ দিন ছায়ায় রাখিলে উহার ক্ষত স্থান উত্তাপে আংশিক শুষ্ক হয়। তৎপর উহাকে রোপণ করিতে হয়। সদ্য সদ্য উহাকে রোপণ করিলে মৃত্তিকার রস ও জল দ্বারায় ক্ষত স্থান পচিবার সম্ভাবনা। এইজন্য ২।৩ দিন উহাকে উত্তাপে রাখিয়া দুর্ব্বল ও শুষ্ক করিতে হয়। তৎপর রোপণ করিলে উহা দ্বিগুণ বেগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র তেউড়কে ঐরূপে শুষ্ক করিয়া কলাতের গুঁড়া দ্বারা বাক্স পূর্ণ করতঃ উহার মধ্যে ঐ সকল তেউড় প্যাক করিয়া বহু দূর দেশেও পাঠান যায়। ঐ অবস্থায় ১।০ মাস কাল থাকিলেও উহারা নষ্ট হয় না। বাক্স মধ্যেই উহাদের শিকড় বহির্গত হইয়া থাকে। এইরূপে ছালায় পুরিয়াও ইহাদিগকে দূর দেশে পাঠান যায়। প্যাকিং বাক্সের স্থানে

স্থানে ছিদ্র করিয়া তাহের সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট জাল দ্বারা উহা বন্ধ করিয়া দিতে হয়। উহা দ্বারা বায়ু উত্তাপ ও আলো প্রবেশ করিলেই তেউড় সকল সজীব থাকে। আমি সিংহল, সিঙ্গাপুর ও নরিস্ দ্বীপ হইতে এই ভাবে প্যাক করা গাছ প্রাপ্ত হইয়াছি।

কলাগাছ রোপণের একটি সঙ্কেত আছে। তেউড়ের মোথার নিম্ন অংশ সামান্য পরিমাণে তলারদিকে কাটিয়া দিবে। এক দিক তির্য্যকভাবে কাটিবে। সকল তেউড়েরই তীর্য্যকভাবে কর্ত্তিত অংশ এক মুখে বা এক দিকে রাখিয়া রোপণ করিবে। তির্য্যক অংশ যে দিকে থাকিবে কলার ছড়িও সেই মুখে নামিবে। সাধারণতঃ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব মুখে তির্য্যকভাবে কর্ত্তিত অংশ রাখিয়া তেউড় রোপণ করা হয়। কলার ছড়িও তাহা হইলে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে অবনত হইয়া নামে। তেউড়ের মূলের এক দিক কাটিয়া দিলে উহা ঐ দিকে ঈষৎ হেলিয়া যায়, এই কারণে এবং আলোর প্রভাবেই সম্ভবতঃ এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

কলার চাষের আরও একটী উন্নত প্রণালী আছে। ঠিক একই বয়স ও উচ্চতা বিশিষ্ট তেউড় গ্রহণ করিবে। গর্ত্তের গভীরতা পরিমাণ অপেক্ষা সামান্য উচ্চ তেউড় গ্রহণ করিবে। উহাদিগকে এক দিকে কিঞ্চিৎ হেলাইয়া রোপণ করিবে। যখন গাছগুলি ভূমি হইতে এক কি দেড় হাত উচ্চ হইয়াছে তখন ভূমির উপরিস্থ কিয়দংশ কাটিয়া দাও। তৎপর কর্ত্তিত অংশকে কাঠের হাতুড়ি দ্বারাও পিটাইয়া দাও। তৎপর উহা হইতে একটি নূতন গাছ পুনরায় বাহির হইবে। ইহাকেও পুনরায় ঐরূপ কাটিয়া দিবে এবং পূর্ব্বোক্তরূপে পিটাইয়া দিবে। এইরূপে ২৩ বার ঐ গাছটীকে কাটিয়া ও পিটাইয়া দিলে পরে যে গাছ বাহির হইবে উহা পর্ব্বাকৃতি হইবে। তাহা হইলে উক্ত তেউড় হইতে অতি সুস্থ ও সতেজ গাছ উৎপন্ন হইবে। উহা বায়ু দলিত হইবে না। অধিকন্তু অতি সুস্থ, বৃহৎ ও পুষ্ট ফল ধারণ করিবে। সাধারণ ভাবে কলাগাছ রোপণ করিলে উহা অতিশয় উচ্চ হয়। ঐরূপ গাছ সহজে বায়ুকর্ত্তৃক দলিত হয়।

গ্রীষ্মকালই কলার বৃদ্ধির পক্ষে প্রশস্ত। সাধারণতঃ এই সময়েই ইহারা পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া থাকে। এই সময়েই নিম্নবঙ্গে ঝড়ের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং কদলীগাছ সকল এই সময়েই বায়ুকর্ত্তৃক দলিত হইবার সম্ভাবনা অধিক। কলাগাছ বায়ুকর্ত্তৃক দলিত হইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। এই জন্য কলার চাষে উপরোক্ত প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়। এই প্রণালীতে গাছ রোপণ করিলে একই সময় সকল গাছ হইতে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। একই সময়ে ফল হইলে বারমাস এই রূপে উত্ত গাছ হইতে ফল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তথাপি লাভের হিসাবে এই প্রণালী মন্দ নহে। এই প্রণালীতে গাছ রোপণ করিলেও উহাদের ফল একই দিকে অবনত হইয়া নামে। এই সকল গাছ হইতে যে সকল নূতন পার্শ্বাঙ্কুর বাহির হইবে, উহাদের তিনটীর অধিক গাছ ঐ ঝোরায় রাখিবে না। অপর তেউড় গুলিকে তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করিবে। ফলিত গাছটীকে সমূলে উৎপাটন করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা উহার স্থান পূরণ করিবে।

কলার গাছ খাসী করা সম্বন্ধে এদেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কলার গাছ

খাসী করিতে হইলে একটী সুস্থ ও সবল তেউড়কে সমানে লম্বালম্বিভাবে চারি ভাগে কাটিতে হইবে। তৎপর তাহাদিগকে পুনরায় একত্র করিয়া সুতা দ্বারা মূল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কষিয়া বাঁধিতে হইবে। তৎপর উহাকে যথাস্থানে রোপণ করিবে। এই গাছ হইতে একটী অতি বৃহৎ কাঁদি উৎপন্ন হইবে। ইহার কলাও অতি বৃহৎ হইবে। আমি এই প্রণালী অবলম্বনে ইহার চাষ করিয়া দেখি নাই এবং অন্য কাহাকেও ইহা পরীক্ষা করিতে দেখি নাই। উপরোক্ত প্রণালীতে অরাসন্ধ্য উৎপত্তি একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়।

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার রামপাল নামক স্থানে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে কলা গাছকে মাটীর দুই কি আড়াই হাত উপরে তির্য্যক ভাবে কাটিয়া দেয়। এইরূপে ২।৩ মাস অন্তর অন্তর দুই তিন বার কাটা হয়। প্রথমতঃ শ্রাবণ কি ভাদ্র তৎপর কার্ত্তিক ও তৎপর মাঘ ফাল্গুন মাসে কাটা হয়। দ্বিতীয় বার প্রথম বারের ৪।৬ অঙ্গুলী, তৃতীয় বার দ্বিতীয় বারের ৪।৬ অঙ্গুলী উপরে কাটা হয়। এই গাছকে তৎপর ভূমি হইতে উঠাইয়া যথা স্থানে রোপণ করা হয়। এই প্রণালীতে গাছ ছেদন করাকে খাসী করা বলে।

বোম্বাই সহরের নিকটবর্ত্তী বেসিন নামক স্থানের কৃষকগণ এরূপ ভাবে কলার তেউড় রোপণ করিয়া থাকে, যে প্রথম লাইনের গাছগুলির কাঁদি যেদিকে হেলিয়া পড়িবে দ্বিতীয় লাইনের গাছ সকলের কাঁদিও ঐ দিকেই হেলিবে অর্থাৎ উভয় লাইনের গাছের কাঁদি উভয় লাইনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে পড়িবে। বাহির হইতে দেখিলে, দেখা যাইবে যে উভয় লাইনের কাঁদি সকল পরস্পর বীপর্য্যস্ত ভাবে এক স্থানেই অবস্থিত আছে। এই প্রণালীর গূঢ় রহস্য সকলে জানে না। তেউড় রোপণ কালে প্রথম লাইনের গাছের প্রথম পাতা ও দ্বিতীয় লাইনের গাছের প্রথম পাতা পরস্পর বিপর্য্যস্ত ভাবে রাখিয়া রোপণ করিতে হয়। তেউড়ের মোথার কর্ত্তিত স্থানও পরস্পর বিপর্য্যস্ত ভাবে রোপণ করিতে হয়। প্রথম পাতাটী যেদিকে আছে মূলের অংশ কাটিতে সেই দিকই কাটিতে হয়। এই প্রণালীতে কলার চাষের গুপ্ত রহস্য আমি উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করি নাই। এই প্রণালীতে ইহার চাষও করি নাই। তবে অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

কলার কলম করা বিষয়েও একটী জনপ্রবাদ এদেশে প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন এক গাছের এক কাঁদি হইতে দুই জাতি কলা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। সমান বয়সের সমান উচ্চ দুই জাতির দুইটী কলার তেউড় গ্রহণ কর। তৎপর উভয় তেউড়কে সমান দুই ভাগে লম্বালম্বি ভাবে কর্ত্তন কর। পরে দুই জাতির প্রত্যেকটীর অর্দ্ধভাগকে একত্র করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সুতা বা রশি দ্বারা মূল হইতে মাথা পর্য্যন্ত জড়াইয়া বাঁধ। তৎপর উহাকে যথাস্থানে রোপণ কর। কালে এই দুই ভাগ একত্র জোড়া লাগিয়া যাইবে। এবং উহারা একটী গাছে পরিণত হইবে। ইহা একটী কাঁদি প্রসব করিবে। এই কাঁদি হইতে দুই জাতি কলা প্রাপ্ত হইবে। এই গল্পটীর মূলে কোন ভিত্তি নাই। কলা, তাল, খেজুর, ঘাস, বাঁশ, সুপারি নারিকেল প্রভৃতি গাছের ন্যায় একদল বীজ (Monocotyledon) উদ্ভিদ। তাল, খেজুর প্রভৃতি উদ্ভিদের কলম হয় না।

সুতরাং কলারও কলম হইতে পারে না। দ্বিদল বীজ (Dicotyledon) উদ্ভিদের কলম হয়। আমি এরূপে কলা গাছের কলম করিতে চেষ্টা করি নাই, এবং অন্যকেও করিতে দেখি নাই। এদেশে কেন, সুসভ্য ইউরোপেও এরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুহ।

সাধক কবি নবাই ময়রা *

শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক" নামক বঙ্গভাষার লেখকগণের চরিতাভিধানে বর্দ্ধমান জেলার খেয়ার গ্রাম নিবাসী নবাই ময়রা নামক অনেক সঙ্গীত রচয়িতার নাম উল্লিখিত আছে। অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল, যে উক্ত কবির বিস্তৃত জীবনী ও সমগ্র গীতাবলী সংগ্রহ করিব। খেয়ার আমাদের গ্রাম হইতে এক ক্রোশ মাত্র ব্যবধান। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুযোগ ও অবকাশ অভাবে উক্ত সংগ্রহ কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই। খেয়ার গ্রামে এখন কোন লোক জীবিত নাই, যিনি নবাই সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ বলিতে পারেন। তবে শুনিয়াছি মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেড পণ্ডিত আমার সতীর্থ খেয়ার নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়ের সাহায্যে কবির জীবনী যৎকিঞ্চিত সংগ্রহ করিয়াছি; তাহা সমগ্র বঙ্গের বিদগ্ধমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। যদি সুযোগ ও সুবিধা হয় তবে আশা করি এই জীবনী সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইব।

একদিন ছিল যখন বঙ্গের হাটে মাঠে সর্ব্বত্র ভক্তির পবিত্রধারা প্রবাহিত হইত। এক দিকে বৈষ্ণব কবিগণের কান্ত কোমল পদাবলী, অন্যদিকে রাম প্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক কবিগণের শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত বঙ্গের প্রতি পল্লী-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয় ভক্তির অমৃত রসে সিঞ্চিত করিয়াছিল। সাধক কবিগণ বালকের মত সরল ভাষায় জগজ্জননীর নিকট তাঁহাদের যত কিছু আদর অভিমান ও প্রার্থনা জানাইতেন। তাঁহাদের রচনায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বা মনস্তত্ত্বের কোন জটিল আলোচনা থাকিত না; কিন্তু তাঁহাদের পদাবলী হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃ উৎসারিত। নবাইও জগৎমাতার ভক্ত আবদেরে ছেলে। তিনিও বালকোচিত সরল ভাষায় মায়ের নিকট আপনার আদর অভিমান জানাইতেন। তাঁহাদের রচনা সরল, ভাষা প্রাঞ্জল এবং কবিত্ব উজ্জ্বল। তাঁহার সঙ্গীত কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবি যেরূপ বলিয়াছেন, আমরাও নবাই সম্বন্ধে সেইরূপ বলিতে পারি :—

"উজ্জ্বল কবিত্ব-ভাষায় সাহিত্যভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে উভয়ে অধীন যেন।

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত।

সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে
ভরা।
যেই পশে কাণে সেই লাগে প্রাণে শুনামাত্র
আত্মহারা।"

নবাই ময়রা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সাহেবগঞ্জ থানার অধীন খেরার গ্রামে সন ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাটীতে ৺চণ্ডীদেবীর নিত্য পূজা হইত। নবাই বাল্যকাল হইতে ৺চণ্ডীদেবীর পরম ভক্ত ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রায়ই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া স্বরচিত শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত গান করিতে করিতে আত্ম-হারা হইয়া যাইতেন। বাটীতে তাঁহার পত্নী ও শ্যামাসুন্দরী নাম্নী এক বিধবা ভাগিনেয়ী ছাড়া আর কেহ ছিল না। সন্তানাদি হয় নাই। অবস্থাও তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। সেইজন্য প্রথমাবস্থায় তিনি মাসিক তিন টাকা মাত্র বেতনে মালডাঙ্গার হাটে গঙ্গাময়রার দোকানে চাকরী করিতেন। একদিন ছিয়ান করিবার সময় তিনি স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত গানটী গাহিতে গাহিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন এবং তাহাতে ছিয়ান নষ্ট হইয়া যায়। গানটী সমস্ত পাওয়া যায় নাই। যতটা পাওয়া গিয়াছে তাহাই উদ্ধৃত হইল।

"গুরুদত্ত গুড় লয়ে ভিয়েন কর মন ময়রা
হ'য়ে।
সন্দেশ তৈয়ারী হলে ভেট দিবি শমনে
লয়ে॥

* *
* * * * * * *
* * * * * *

রসনারে বাবড়া করি ভক্তিপাদ দাও উঠায়ে॥
খেরার গ্রামে বসতবাটী, গুড় চিনিনে
ময়রা বটি,
নবাইচন্দ্র কহে খাঁটি, সন্দেশ হয় কি হেথায়
রয়ে॥"

ছিয়ান নষ্ট হওয়ায় তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। প্রভুর নিকট ভৎর্সিত হইয়া নবাই চাকরী পরিত্যাগ করিয়া বাটী ফিরিয়া যান; এবং অনন্যকর্ম্মা হইয়া একাগ্র-চিত্তে চণ্ডীর সেবায় নিযুক্ত হন। নবাইয়ের ভক্তির গুণে দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হন। দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া নবাই একটী চণ্ডীর দল গঠন করেন; এবং দেবীর কৃপা-বলে সঙ্গীত রচনায় তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মে। তিনি যে সকল গান রচনা করিতেন তাহা গ্রামের প্রধান অধ্যাপক ও সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সংশোধন করিয়া লইতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার রচনা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি এক প্রকার নিরক্ষর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদা তিনি "মন মানসে জপনা, কামারি অজনা" এই গানটি রচনা করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট সংশোধনার্থ লইয়া যাইলে, সার্ব্বভৌম মহাশয় সেই গানের ভাব মাধুর্য্য ও শব্দ প্রয়োগ-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "নবাই তুমি লেখাপড়া শিখ নাই; 'কামারি অজনা' প্রভৃতি কথা তুমি কি প্রকারে প্রয়োগ করিলে?" উত্তরে নবাই বলেন "আমি মূর্খ, নিজে কিছুই জানি না, মা আমার জিহ্বাগ্রে আসীন হইয়া আমাকে যাহা বলান আমি তাহাই বলি।" তদবধি সার্ব্বভৌম মহাশয় আর তাঁহার রচিত গানের কোন সংশোধন করেন নাই। খেরার গ্রামের বিখ্যাত রায় বংশোদ্ভব ৺বৈদ্যনাথ রায় মহাশয় নবাইএর সহিত একত্র সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন এবং সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীর গায়ক ৺রাজনারায়ণ স্বর্ণকার ও খেরার

নিবাসী ৺শ্রীধর তন্তুবায় তাঁহার দলের সর্দ্দার প্রধান দোহার ছিলেন ১২৪১ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তিনি আত্মীয়বর্গকে নিজের বিছানা হইতে সরিয়া যাইতে বলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন "ঐ দেখ মা আমায় ডাকিতেছেন। তোমরা সরিয়া যাও আর আমার বিলম্ব নাই।" তৎপরক্ষণেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

তাঁহার সম্পূর্ণ নাম নবকিশোর মোদক, কিন্তু নবাই নামেই তিনি বিখ্যাত। নিম্নে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান সম্পূর্ণ এবং কয়েকটি আংশিক উদ্ধৃত হইল।

(১)

মন মানসে অপনা কামারি অঞ্জনা।
অপরে একান্তে দিনান্তে নিশান্তে
প্রাণান্তে তোরে কৃতান্তে ছোঁবেনা।
যে পদে রাতুল, হয় স্থূল মূল,
তারে কভু মন ভুলোনা।
শ্যামাপদ লাগি যে হয় চিন্তাকুল,
শ্যামা সে কিঙ্করে হন সানুকূল,
অনায়াসে তারে কালী কুলানকূল,
কভু প্রতিকূল থাকেনা।
দেখ্‌ছো ত মন এই ত সংসার,
সকলি অসার, কালীপদ সার,
হুঁসার অনুসারে চলনা।
(তবে) দূরে যাবে তোমার মনের মালিন্য,
মনেরই মানস হইবে পূর্ণ,
হর মনমোহিনী হইলে প্রসন্ন,
নবের দৈন্য দশা রবে না।"

(২)

একদিন তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্যামাসুন্দরী তাহার নাম দিয়া একটী গান রচনা করিতে অনুরোধ করায় তিনি নিম্নলিখিত গানটী রচনা করেন।

"শ্যামা আমার কেমন মেয়ে দেখ্‌দেখি মন
বিচার করে।
এমন মেয়ে না হলে কি হরের মন ভুলাতে
পারে।
মহাযোগী মৃত্যুঞ্জয়, তার মন হরাত কঠিন হয়,
অন্য মেয়ের কর্ম্ম নয়, মদন যারে শঙ্কা করে।
অপরূপ হের নয়নে, এমন নাহি আর ত্রিভুবনে,
বিবসনা বিবসনে, ভক্তজনের মন হরে।"

(৩)

"যে জন পাষাণের মেয়ে তার হৃদে কি
দয়া থাকে!
দয়াহীনা না হ'লে কি লাথি মারে
নাথের বুকে।
মা মা বলে যত ডাক, শুনতে পেয়ে
শোনেনাক,
সবাই এমনি লাথি খেকো তবু মা মা
বলে ডাকে।"

(৪)

জানি গো জানি গো শ্যামা তুমি যেমন
দয়াময়ী।
তুমি কারে হাসাও কারে কাঁদাও মা
তোমার ব্যবসা অই।
পঞ্চামৃত দাও মা কারে, রাখ স্বর্ণময়ী পুরে,
কারো ভাগ্যে দিনান্তরে পায়না দুটো চোঁয়া
খই।
পেতে একটা মায়া ছলা, নবাইকে করেছ
ভোলা,
আছে এক শমনের জ্বালা, তাই তোমারই
শরণ লই।"

(৫)

শোন মা আমার দুঃখ তারা।
আমার ঘর সোজা নয় ঘরতি ঘরা॥
ঘরে সঙ্গে ঘর করি মা, শোন বলি মা তার
কাজের ধারা।
যারে চর্ব্ব্য চোষ্য করে যোগাই, সে না বলে
তারার তারা॥
দারওয়ান আছে ছয় জন, সদাই তারা দেয়
পাহারা,
চোরা ছেড়ে দেয় করতে চুরি, সাধু দেখে
দেয় মা তাড়া॥
নবাই বলে তার হ'লো মা এ ঘরে বসতি
করা,
এরা ছয় জন চোরে যুক্তি ক'রে লুটলে
আমার ধনের ভরা॥

(৬)

আর কত দিন দীনের অধীন ক'রে মা
আমায় রাখিবে।
দয়াময়ী এ দীন বলে কবে গো তোর
মনে হবে॥
অজ্ঞান বালকের মত হ'য়ে থাকি মা সতত,
দেহি দেহি জ্ঞানামৃত তোমারই আশ্রিত
শিবে॥
কুদিনে অজ্ঞানে গেল চিরদিন,
যায় না কুদিন, হয় না সুদিন,
আসিছে বিষম কুদিন, সেদিন কেমনে
যাবে।
আমি তোমা আমার নই,
সতত পরবশে রই,
নবায়েরে ব্রহ্মময়ী পরবশ কবে ঘুচাবে॥"

(৭)

শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বাঙ্গালাদেশে চির প্রসিদ্ধ। কিন্তু যিনি প্রকৃত কবি ও প্রকৃত ভক্ত তিনি সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতার অতীত। নবাইও প্রকৃত কবি ও প্রকৃত ভক্ত। তাঁহার মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা দোষ ছিল না। যদিও তিনি জগৎ-স্রষ্টার মাতৃভাবের সাধক ছিলেন, তথাপি পুরুষ-প্রকৃতি, শিব-শক্তি কালী-কৃষ্ণ সমস্তই তাঁহার নিকট অভিন্ন ছিল। নিম্নলিখিত গানটি তাহার উদাহরণ।

"হৃদয় রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে
লয়ে॥
নরকর কটিবেড়া, ত্যজে পর মা পীতধড়া,
মস্তকেতে মোহন চূড়া, মুক্তবেণী লুকাইয়ে॥
ত্যজে নর-মুণ্ডমালা, গলে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হও মা কালা, (দাঁড়াও) চরণে
চরণ থুয়ে॥
হৃদ্‌মাঝারে কাল শশী, ওরূপ দেখ্‌তে
বড় ভালবাসি,
ত্যজে অসি নে মা বাঁশী
নবাই প্রতি সদয় হয়ে॥"

উল্লিখিত গানটী বাঘনা পাড়ার গোস্বামীদের বাটীতে নবাই গান করেন।

(৮)

নিম্নলিখিত গানটীতে নবাইএর ব্রহ্মজ্ঞান ও অদ্বৈত বোধ সম্পূর্ণ পরিস্ফুট।

কালী কে জানে তোমায় গো,
কে জানে তোমার অন্ত অনন্তরূপিণী।
তুমি মহাবিদ্যা, অনাদ্যা আরাধ্যা,
ভববন্ধের বন্ধন হারিণী তারিণী॥
সারদা বরদা শুভদায়িনী,
মানদা পুরদা, যশোদা নন্দিনী,
জ্ঞানদা, অন্নদা, কামাখ্যার কামিনী,
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হৃদিবিলাসিনী॥
শমন ভবন গমন বারিণী,
পূজন পালন নির্ব্বাণ কারিণী,
সাকারা, আকারা, তুমি নিরাকারা,
নবাইএর তার হর জননী॥"

নবাই এর মৃত্যুর পর যতদিন তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্যামাসুন্দরী জীবিত ছিলেন, ততদিন ৺চণ্ডী দেবীর পূজা যথারীতি নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যুর পর নবাইএর একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আসিয়া তাঁহার বাটীতে কিছুদিন বাস করিয়া ছিলেন। সেই সময়ে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া কিছুদিন খেরার গ্রামে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। তিনিই নবাইএর আরাধ্যা চণ্ডী দেবীকে লইয়া অন্তর্হিত হন। এখন নবাইএর বাসস্থান শূন্য ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

শ্রীকামিনীনাথ রায়।

বিবাহ বিধি

(নিবেদন পত্র)

মাননীয় শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ মহাশয় আমার 'বিবাহ-বিধি' শীর্ষক প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়াছেন ;—বিষয়ের সত্যতা নির্ণয় জন্য বাদ প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মত পোষণ করিয়া আলোচনা করিলে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। মহর্ষি পুনর্ব্বসু সে কারণেই বলিয়াছেন, 'তত্ত্বং হি দুষ্প্রাপ্যং পক্ষ সংশ্রয়াৎ।' কারণ সাম্প্রদায়িক মত পোষণ করিলে স্বপক্ষ রাখিয়া বিচার করিতে হয়, ফলে 'পক্ষান্তং নৈবগচ্ছন্তি তিলপীড়কবদ্গতৌ।' তিলপীড়ক—পীড়ন যন্ত্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিলেও তাহার সেই একই স্থানে গতি হয়, সেই প্রকার পক্ষসংশ্রয়ীও আপন মতে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রকৃত তত্ত্ব স্থির করিতে পারে না। সুতরাং অন্ধ পীড়ক বাদ প্রতিবাদ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত চিন্তা না করিলে, সাম্প্রদায়িক অন্ধতা দূর না হইলে, বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানের প্রকাশ হইবে না।

সমালোচক মহাশয় আমাকে পক্ষাশ্রয়ী বিবেচনা করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত ক্ষুদ্র নিবন্ধে একটী আর্ষ মতের ব্যাখ্যা ব্যতীত নিজের ব্যক্তিগত মতে যাহা বলিয়াছি, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন ও আচার বিহারের সুব্যবস্থা না করিয়া কন্যাবস্থায় কন্যা-সম্প্রদানে অথবা বর্ষিয়সী নারীর বিবাহ দানে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, ইত্যাদি, তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক গন্ধ নাই, বরং শাস্ত্র-নির্দ্দেশ মত ব্রহ্মচর্য্য আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধের একটি মীমাংসা হইতে পারে।

অবশ্য আমার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যায় ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে যে আমার কোন ভুল হইয়াছে—অন্ততঃ সমালোচনা পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধটী আরও একটু বিস্তৃত হইলে সুখবোধ্য হইত স্বীকার করি, তবে সমালোচক মহাশয় যে ইহাতে সুশ্রুতের 'শ্রুতিবিরোধ ভাব' এবং আমার বহুবিধ ন্যায়শাস্ত্রবিরোধি যুক্তি তর্কের অবতারণা লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষপাতীত্ব দোষ জন্য মনে হয়। উভয় প্রবন্ধের নিম্নের অংশটুকু আলোচনা করিলে অভিজ্ঞ পাঠক তাহা বুঝিতে

পারিবেন। আমি মূল প্রবন্ধের ২য় আলোচ্যে বলিয়াছি ...সম্পূর্ণ ধাতু-অবয়ব-সম্পন্না ষোড়শী রমণীই গর্ভাধানের উপযুক্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি নারীর ষোড়শ বর্ষে গর্ভাধান বিধি সাধারণ বিধান বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে কারণ যদি কোন নারীর স্বাভাবিক আর্ত্তব বাহুল্য বশতঃ ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বেই আর্ত্তব এবং গর্ভাশয়াদির পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় অর্থাৎ আহার বিহার হইতে (১) দেহের পূর্ণতা সাধন এবং প্রতিমাসে উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ আর্ত্তবের প্রবর্ত্তন হয় তাহা হইলে সে রমণী ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বেও গর্ভাধান যোগ্যা হবেন এই কথাটি বুঝাইবার জন্য সুশ্রুতে পূর্ব্বোক্ত গর্ভাধান কাল নির্দ্দেশক শ্লোকের শেষে উল্লেখ হইয়াছে,—

"তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ।"(২)

যে রমণীর দেহ এবং ধাতু পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ষোড়শ বর্ষ প্রাপ্তি না হইলেও অত্যন্ত বালা বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"

(গৃহস্থ ফাল্গুন সংখ্যা ৪৪৭ পৃষ্ঠা)

কিন্তু সমালোচক মহাশয় আমার পক্ষ হইতে পাঠকবর্গকে বুঝাইতেছেন,—"ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে বালিকার গর্ভাশয়াদির সম্পূর্ণ পোষণ হয় না এবং তাহাদের শ্রেষ্ঠতম রজঃ-ধাতুর পরিপোষণ হয় না; সুতরাং তাহার অগ্রে গর্ভাধান হওয়া উচিত নহে।"

অতএব স্থির হইল যে আর্য্য মহিলার সুনাম এবং পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত যাদশ বর্ষ বয়সেই তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু ষোড়শ বর্ষের অগ্রে কদাপি তাহাদের গর্ভাধান হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।"

(গৃহস্থ, চৈত্র, ৫৬৪ পৃঃ)

বিজ্ঞ সমালোচক মহাশয় আমার প্রবন্ধের (উদ্ধৃত) মূল অংশের সহিত চিহ্নিত অংশ গুলির যথার্থভাব রাখিয়া সমালোচনা করিয়াছেন কি? মাত্র ভাব পরিবর্ত্তন নহে, ইহার উপর সুতীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"এইমত রাজর্ষি সুশ্রুতের হউক না হউক, প্রবন্ধ লেখকের বটে।" (গৃহস্থ—৫৬৪ পৃঃ)

অভিজ্ঞ পাঠক বিবেচনা করিবেন, এই মত প্রবন্ধ লেখকের নিজের কি মাননীয় সমালোচক মহাশয়ের স্বকল্পিত। তিনি আরও এক স্থানে এই ভাবে বলিয়াছেন—"কিন্তু বালিকা সকলেই সাধারণ অসাধারণ দ্বাদশ বর্ষে বিবাহ ও ষোড়শবর্ষে গর্ভগ্রহণ করিবে।

(গৃহস্থ—৫৬৩ পৃঃ)

---

(১) 'বিহার হইতে' এই অংশ মুদ্রাকর প্রমাদে মূল প্রবন্ধে বাদ পড়িয়াছে। এইরূপ 'নরমজনা' স্থলে 'নরমজলা', 'সম্প্রাপ্তঃ' স্থলে 'সম্প্রাপ্ত' ছাপা হইয়াছে, লেখোক্তটি সমালোচক মহাশয়ও 'মুদ্রাকর প্রমাদ' স্বীকার করিয়াছেন।

(২) মূল প্রবন্ধে উনষোড়শ বর্ষীয়া, ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ প্রদানকালে তাহার এই শেষ চরণের কোন অনুবাদ দিই নাই বলিয়া ভাবতীভূষণ মহাশয় অনুযোগ করিয়াছেন, পূর্ণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া সেই স্থানের আবশ্যক মত তিন চরণের অনুবাদ দিয়া শেষ চরণটির ব্যবহার স্থানে (এই স্থানেই ব্যবহার হইয়াছে) অনুবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু বোধ হয় এই স্থানে শেষ চরণটির মর্ম্ম গ্রহণে কোন পাঠকের ক্লেশ হয় নাই। সমালোচক মহাশয় উক্ত শ্লোকের ও অপর একটি অংশের অনুবাদ "(বেশ ভাল না হইলেও) যথার্থ বাহি বলিয়াই বলিয়া লইয়াছি" বলিয়া উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সুশ্রুত সংহিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত হই নাই, সত্ত্বেও ভাষানভিজ্ঞ পাঠকের অর্থবোধ জন্য যে মর্ম্মানুবাদ দিয়াছি, তাহা যথার্থবাহি হইলেই যথেষ্ট।

এই সকল ইচ্ছাকৃত ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া পাঠকের সন্দেহ উৎপাদন করা তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ জন্য মনে হয় না কি ?

আমি মূল প্রবন্ধে বলিয়াছি,"··· স্ত্রী-পুরুষের যৌবন কালে বিবাহ বিধি আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রায়, কেবল নারীর বিপত্তি নিবারণ ও পবিত্রতা সম্বিধান জন্য যৌবনারম্ভের প্রাক্‌কালে বিবাহ কাল নির্দ্দেশ হইয়াছে ; কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তাহাদের দেহ, ধাতু সম্পূর্ণ না হইলে গর্ভাধান যোগ্যা হইবে না

(৪৪৮ পৃঃ)

এই সকল অংশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমালোচক মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"যদি কোন ব্যক্তি কবিরাজ মহাশয়ের কথামত (?) পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সে অথবা তৎপূর্ব্বে দ্বাদশ বর্ষ বয়স্কা কোন কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে, বিবাহের পর মাসে মাসে যখন স্ত্রীর রজোদর্শন ঘটিবে, তখন স্বামীর কর্ত্তব্য কি হইবে ? ষোড়শ বর্ষ বয়সের আগে ত তিনি স্ত্রীর গর্ভাধান করিতে পারেন না। তবে কি তিনি চারি বৎসর পর্য্যন্ত রজস্বলা স্ত্রীর নিকটস্থ হইবেন না ? তাহা হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুজ্ঞা অবহেলার নিমিত্ত পারলৌকিক পাপের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীর অবস্থা কি হইবে ?

'বিবাহরূপ'—মন্ত্রসংস্কার হইলেই কি তাহার 'স্বভাব-সুলভ কামনার' পরিপূরণ হইবে ? অথবা স্বামী ধর্ম্ম ও লোক উভয়ই নিশ্চিত অসময়ে স্ত্রীর সমীপস্থ হইয়া বৃথা নিজের ও স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করতঃ ধর্ম্মহীন ও দুর্ব্বল হইবে ?" (গৃহস্থ, ৫৬৪ পৃষ্ঠা)

বয়ঃ প্রবর্ত্তমানা নারীর যে কাল পর্য্যন্ত ধাতুর ও দেহের পূর্ণতাসাধন না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত দম্পতির ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বনীয়। (৩) যদিও সুশ্রুতে ষোড়শ বর্ষীয়া নারী গর্ভাধান যোগ্যা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহা সাধারণ বিধান বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ষোড়শ বর্ষে যদি কোন নারীর দেহ ধাতু পূর্ণতা না পায়, তবে বয়স পাইলেও সে রমণী গর্ভাধানের উপযুক্তা হইবে না, কারণ বাল্য-যৌবনাদি যে আমাদের একমাত্র বয়স সাপেক্ষ নহে বরং দেহের অবস্থা সাপেক্ষ তাহা মূল প্রবন্ধে সবিশেষ বলিয়াছি। চরক সংহিতার গুরুকার সে কারণেই বয়ঃক্রমে গর্ভাধান কাল নির্দ্দেশ না করিয়া দেহের অবস্থা হিসাবে—পরিণত-দেহ-ধাতু পুরুষের সহিত শুদ্ধ শোণিত দেহ গর্ভাশয়া রমণীর গর্ভাধান কল্যাণপ্রদ ও অভিষ্টানুরূপ সুসন্তান লাভের জন্য প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সুশ্রুতেরই ন্যায় অতিবালা স্ত্রী গর্ভাধানের অযোগ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (চরক, শারীরস্থান, অতিস্ত্রীয় নামক ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) । চরকসংহিতার মত হইতে সুশ্রুতের এই বর্ষ নির্দ্দেশ সাধারণ ভাবে উল্লেখ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এখন যদি কোন রমণী ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বে দেহ ও ধাতু পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহাকে অত্যন্ত বালা বলিয়া সন্দেহের কোন কারণ থাকে কি ? আর শারীর তত্ত্বে অসাধারণ পণ্ডিত সুশ্রুত কি একথা বুঝিতেন না ?

সুতরাং চতুর্দ্দশ বর্ষই হউক, ষোড়শ বর্ষই হউক কিম্বা অষ্টাদশ বর্ষই হউক দেহ-ধাতু পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত দম্পতির মিলন হিতকর

(৩) ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন জন্য এইকালে দম্পতির সাক্ষাৎ ও পত্রালাপও হিতকর নহে। এ সম্বন্ধে ১৩১৮, অগ্রহায়ণের 'উপাসনা' পত্রিকায় 'বাল্যতত্ত্ব' প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছি

নহে। অবশ্য এ ব্যবস্থা স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের বিরোধি হইতে পারে, কিন্তু যদি ইহা শারীরধর্মের অনুকূল হয়, তবে এই সকল বেদানুমত সুশ্রুতাদি ঋষিগণের বিধান মানিয়া স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারা যায় কি না, আমি এ উত্তর দিতে অসমর্থ হইলেও ইহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে সমাজে বর্ত্তমান কালে যে বিবাহ ও গর্ভাধান বিধি প্রচলিত আছে বা সমালোচক মহাশয় যে বিধানের প্রচলন জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহার অপেক্ষা অধিক পাপগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা নাই। এখন রজঃপ্রবর্ত্তনের পর কামনা স্বভাব সুলভ হইলে বিবাহরূপ 'মন্ত্রসংস্কারে' কামনার পূরণ হয় কি না এবং না হইলে ষোড়শ বর্ষিয়া বালিকার বিবাহ দানের সার্থকতা কোথায় দেখা যাউক।

বিবাহরূপ মন্ত্রসংস্কারে কামনার পূরণ হয় না সত্য, কিন্তু কখন কোন রমণীর দেহ-ধাতু পূর্ণ হইবে বা যৌবনকালীন কামনার উদ্রেক হইবে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সুশ্রুতে উল্লেখ হইয়াছে, "নারীণাং রজসি চোপচীয়মানে শনৈঃ শনৈঃ স্তনগর্ত্তাশয় যোনিবুদ্ধির্ভবতি।"

(সূত্রস্থান ১৪ অঃ)

সুতরাং নারীর আর্ত্তব প্রবর্ত্তনের পর হইতে যৌবনের লক্ষণ সমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ হইতে থাকে এবং এই যৌবন হইতেই কামনার উদ্রেক হয়। তবে যৌবনের প্রকাশ যে ভাবে হয় কামনার প্রবর্ত্তনও সেই পরিমাণে হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য প্রারব্ধ যৌবনের ক্ষুদ্র কামনা দমন করা ক্লেশকর নহে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের অভাব থাকিলে, (বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের ন্যায় যৌবনের প্রিয়পাঠ্য প্রণয় মূলক উপন্যাস পাঠে ও বিবাহিতা সখি-সম্মিলনে জ্ঞাত রহস্য বালার) ক্ষুদ্র কামনার অভিবৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব নহে। তাহার পর যে আহার বিহারের সম্পদ হইতে আমাদের দেহ ও ধাতু সমূহের উৎপত্তি পুষ্টি প্রভৃতি সম্পাদিত হয় তাহার উৎকর্ষতায় এবং পিতামাতার ধাতু সম্বন্ধে (অধিকাংশের দৃষ্টান্ত হইতে নির্দ্দিষ্ট) ষোড়শ বর্ষের পূর্ব্বেও নারীর যৌবনের পূর্ণতা সাধন হইয়া থাকে। অবশ্য আর্ত্তব প্রবর্ত্তনের পরমুহূর্ত্ত হইতেই কামনার সঞ্চার অথবা সম্বরেই তাহার অতি বৃদ্ধি হয় না সত্য, কিন্তু যৌবন ধর্ম্ম কাহার উপর কত দিনে কত খানি প্রকাশ পাইবে তাহাও জানিবার উপায় নাই।

এই উপায়ে নির্দ্দিষ্ট কালেই হউক আর অনির্দ্দিষ্ট কালে হউক প্রাপ্ত যৌবনা বালার দুর্দ্দমনীয় কামনা উপস্থিত হইয়া বিপত্তির কারণ উপস্থিত হইলে বিবাহিত-দম্পতির তাহা নিবারণের উপায় আছে। যৌবনের প্রভাবে যে দুর্দ্দমনীয় বাসনার উদ্রেক হইয়া দম্পতির মিলন আবশ্যক হইতেছে, সে মিলনে—'অসময়ে স্ত্রীর সমীপস্থ হইয়া বৃথা নিজের ও স্ত্রীর ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করতঃ ধর্ম্মহীন ও দুর্ব্বল হইবার কোন কারণ আছে কি? বরং ইহা হইতে স্বামীধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষা করা হয় বলিতে পারা যায়। শারীর-তত্ত্বে অভিজ্ঞ চরক-সুশ্রুতাদি মনীষিগণ যে অতিবালা রমণীকে গর্ভাধানের অযোগ্যা বলিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কোন আশঙ্কাও নাই।

এখন যে রজোধাতুর বিকাশের পর নারীর এই প্রকার বিপত্তির সম্ভাবনা হইতেছে, যে বিপত্তি হইতে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হইয়া কুলনাশের কারণ হইতে পারে, তাহা

নিবারণের জন্য বিশেষরূপে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করিয়া সম্ভবতঃ সুশ্রুতকার রজোদর্শনের পূর্ব্বকালে দ্বাদশ বর্ষেই নারীর বিবাহ জন্য প্রশস্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (৪)

সমালোচক মহাশয় দ্বাদশবর্ষে বিবাহিতা নারীর রজোদর্শনের পর ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত স্বামীসম্মিলনের অভাবে 'স্ত্রীর অবস্থা কি হইবে' ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন, কিন্তু অবিবাহিতা যুবতীর কি উপায়ে অভীষ্ট পূরণ হইতে পারে, সেই চিন্তা করাই তাঁহার উচিত ছিল।

অবশ্য তিনি একটি কথা বলিয়াছেন, "যে বালিকা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বিধিমত পালন করিয়া পরা এবং অপরা বিদ্যার আরাধনায় রত থাকিবেন, জলদরিশিখারূপিণী তেজস্বিনী সেই শক্তিমতীর হৃদয়ে ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য কদাপি জন্মিতে পারে না।" (৬৬৭ পৃষ্ঠা) কথাটা সত্য, কিন্তু পরা অপরা বিদ্যায় রত হওয়া যে কতদূর সহজসাধ্য, ক'জনের পক্ষে সম্ভবপর, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আর যে বীর—

"……কুসুমাদপোহপি
সহাযমেকং মধুমেব লব্ধা।
কুর্য্যাৎ হরস্যাপি পিণাক পাণেঃ
ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে।"

বলিয়া দর্পপ্রকাশ করে, যাহার—প্রশস্ত, জ্ঞানীর—নির্ম্মল, বৃদ্ধের—শান্ত, তাপসের—শুষ্ক-হৃদয়েও যাহার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহার সুতীক্ষ্ণ সায়কের আঘাতে যুবক যুবতীর সুকোমল তরুণহৃদয়ের কোন আশঙ্কা নাই বলিলে বিশ্বাস করা যায় কি?

বাল্যবিবাহের অনুকূলে ও প্রতিকূলে এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশের মধ্যেই অনেক সারবান কথা আছে বুঝিয়াছি। আবার উভয়পক্ষের বলিবার বিষয় যেমন আছে, প্রতিবাদের বিষয়ও সেইপ্রকার রহিয়াছে। এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার অভাবে আমার মত অনেকেই এতদুভয়ের কোনটি শ্রেষ্ঠ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, সে কারণ স্থির সিদ্ধান্তও কিছু হয় নাই।

বর্ত্তমানকালের হিন্দুসমাজের বিবাহবিধানে স্মৃতি-পুরাণের গৌরী, রোহিণী-দান দৃষ্টান্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, পরিণতা যুবতীর বিবাহও প্রচলিত নাই বলিতে পারা যায়। সুতরাং এত আন্দোলনেও দুইটি প্রবল মতের একটিরও বিধি প্রচলন হয় নাই। এখন যাহা প্রচলিত আছে, তাহা মনু ও সুশ্রুতের সহিত অনেকটা সাদৃশ থাকিলেও, তাহার প্রতিষ্ঠা লোকের ব্যক্তিগত সুবিধার উপর। সুশ্রুতোক্ত বিবাহ-বিধানে উভয় সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত বিবাহকালের অনেকটা সামঞ্জস্য রাখিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা পরিণত দেহধাতু মিলন কামনা করেন, শরীরতত্ত্বজ্ঞ সুশ্রুত ঋষির গর্ভাধান বিধানে তাঁহাদের উদ্দেশ্য

(৪) যদিও সুশ্রুতে দ্বাদশ বর্ষে স্ত্রীজাতির বিবাহকাল নির্দ্দেশ হইয়াছে, তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে একমাত্র দ্বাদশ বর্ষেই সকল কন্যার বিবাহ দান সকলক্ষেত্রে সম্ভব পর হইতে পারে না। অর্থ, বিপদ, সম্পদ, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে কিছু সময়ের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। তবে আমার কথা এই সুশ্রুতোক্ত বিবাহ বিধানের সামান্য পরিবর্ত্তনে পাশী হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অধিক পরিবর্ত্তনে বিপদের আশঙ্কা আছে বলিয়া মনে হয়।

সাধিত হইতে পারে, আর যাহারা দুইবছর কন্যার বিবাহদান শাস্ত্রবিরুদ্ধ মনে করেন, তাঁহাদেরও আপত্তি থাকে না, অথচ বর্ত্তমান-কালে দেশে প্রায় সুশ্রুতোক্ত বিবাহকালই প্রচলিত রহিয়াছে, কেবল রেতধাতু পোষণের গর্ভাধানবিধি প্রচলনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সকল সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কার্য্যকলতায় ভেদনীতি অপেক্ষা সন্ধিনীতি অধিক ফলদায়ক, সুতরাং কার্য্যসিদ্ধি জন্য সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টি অপেক্ষা যাহাতে উভয় সম্প্রদায় একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারেন, সেই উপায় অবলম্বন করাই সামাজিকগণের প্রধান কর্ত্তব্যস্থল হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, দেশে শিক্ষার—জ্ঞানের প্রচার হইলে বিবাহকালের সামান্য অগ্রগমনে কোন ক্ষতির কারণ হইবে না, কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মিলনে লাভ অধিক হইবে। তবে যদি কেহ দ্বাদশ, ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া প্রারব্ধযৌবনা বিবাহিতা বালাকে ব্রহ্মচর্য্যের অন্তরায়স্বরূপ মনে করেন, তবে অবিবাহিত, আত্ম-সুখান্বেষী, বিলাসী, যুবক যুবতীর অবাধ মিলনেই বা কি আশা করিতে পারা যায়?

যে ধাতুহীনতা দোষ নিবারণ জন্য যৌবন-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করা হয়, ব্রহ্মচর্য্যের অভাব থাকিলে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও তাহা হইতে যেমন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই, সেই প্রকার পরিণত বয়সেও সংযম-অভাব, পোষক খাদ্যাভাব, ব্যাধি প্রভৃতি হইতে ধাতুর দুর্ব্বলতা আসিয়া থাকে, সুতরাং যৌবন বিবাহ প্রচলিত হইলেই যে দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না। বাল্য বিবাহই হউক আর যৌবন বিবাহই হউক চির দিনই ব্রহ্মচর্য্যের, সংযমের আবশ্যকতা রহিয়াছে। মহর্ষি অত্রিদেব 'ব্রহ্মচর্য্য মনুষ্যানাং' বলিয়া একমাত্র ইহাকেই আয়ুর বা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালনরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি একথা সর্ব্ববাদি সম্মত সত্যরূপে স্বীকৃত হয়, তবে বিবাহ কাল লইয়া মতান্তর সৃষ্টি করা অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ও গর্ভাধান যথানিয়মে যাহাতে প্রচলিত হয় সেই চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

মাননীয় সমালোচক মহাশয় যে যুক্তি অবলম্বনে সুশ্রুতের 'ষোড়শবর্ষাং পত্নীমাবহেৎ' স্থলে 'দ্বাদশ বর্ষাং' কাটিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাও আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না। স্মৃতির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই যদি পরবর্ত্তী কালে কোন ধুরন্ধর কর্ত্তৃক ইহা পরিবর্ত্তিত হইত, তবে পরবর্ত্তী গর্ভাধান কাল নির্দ্দেশক শ্লোকের 'ঊনষোড়শ-বর্ষায়াং' স্থলে 'ঊনদ্বাদশবর্ষায়াং' পাঠ দেখিতে পাইতাম। কারণ বিবাহ কালের ন্যায় স্মৃতির মতে গর্ভাধান কালও অন্ত পশ্চাদপদ না থাকিয়া অগ্রসর হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

তাহার পর সমালোচক মহাশয়(৫৬৩পৃষ্ঠায়) ৭ সংখ্যক টিপ্পনীতে যে সকল দেশী বিদেশী সম্মানিত চিকিৎসকগণের মতোল্লেখ পূর্ব্বক বহুদিন জাত বাল্যবিবাহকে এদেশে বালিকা বয়সে রজোদর্শনের কারণ স্থির করিয়া দেশ-গত জল বায়ুকে তাহার দায়ীমুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও আমি সমর্থন-যোগ্য মনে করিতে পারিলাম না। তিনি নিজেও সুশ্রুতকে বৈদিক-কালের লোক এবং তাঁহার সময়ে বেদানুমত যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৫৬৪পৃঃ)। তাঁহার মতেই আমরা বলিতে পারি যে যদি তৎকালে বহুদিন জাত এমনকি অল্প

দিন জাত বালা বিবাহ প্রচলিত না ছিল, তবে সুশ্রুতকার সে সময়ে দ্বাদশবর্ষের উর্দ্ধ হইতেই নারীর রজঃপ্রবর্ত্তন হয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেন? (৫)

২য়। তাপবহুল ঔষধ পথ্য সহায়ে বর্ত্তমান কালেও স্ত্রীপুরুষের রজঃ প্রবর্দ্ধন, সেই প্রকার শৈত্য, স্বয়ম্ল পথ্য ও ক্ষেত্রজে প্রবুদ্ধ আর্ত্তবের সমতা আনয়ন করিয়া যখন ধাতুর সাম্যভাব পাইয়া থাকি তখন কি প্রকারে স্বীকার করা যায় যে দেশগত তাপ, জল, বায়ু প্রভৃতি ইহার কারণ হইতে পারে না। মাত্র আর্ত্তব কেন, দেশগত তাপ, জল, বায়ু প্রভৃতি হইতে খাদ্য-পানীয় বিভিন্নতা সম্পাদিত হইয়া বিভিন্ন দেশবাসীর বল, বর্ণ, আকৃতি, প্রকৃতিরও যে বিশিষ্টভাব আনয়ন করে, ইহার প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়া থাকি।

পরিশেষে নিবেদন,—আমি ভেদ নীতির সমর্থন করিতে পারি নাই; পা রাখিয়া মাথা অগ্রসর হইতে পারে না কিম্বা 'পা' ও মাথাকে বাদ দিয়া যাইতে পারিবে না। চিরদিন যদি পদে ও মস্তকে বিরোধ থাকে, তবে কেহই অগ্রসর হইতে পারে না। আমরাও যদি একমত হইতে না পারি, তবে আমাদের সাফল্য লাভ হইবে কি না কে বলিতে পারে?

আয়ুর্ব্বেদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা জন্য শারীর শাস্ত্র হইতে দম্পতির মিলন সম্বন্ধে যাহা তত্ত্বাতত্ত্ব বুঝিয়াছি, তাহার সাহায্যে, যদি দেশের সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন মীমাংসা হয়, সেই উদ্দেশ্যে বেদানুমত, আর্য্য-ঋষির মতের ব্যাখ্যা করিয়াছি, কোন নূতন মতের প্রচার করি নাই। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল কথা বলিতে পারি নাই, এবারেও যে সকল কথা সুস্পষ্ট বলা হইল, তাহা নহে। চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে চিন্তার অবকাশ ও মীমাংসার ভার দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

শ্রীজীবনকালী রায় বৈদ্যরত্ন।

বিংশশতাব্দীর চিত্রশিল্প

নব্য চিন্তাপদ্ধতি

জগতের চিন্তামণ্ডলে একটা নূতন আদর্শ ও লক্ষ্য বিগত দশ বার বৎসরের ভিতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফ্রান্সে মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক জীবন আদৃত হইতেছে। ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনে মস্তিষ্কের কচকচানি বেশী—হৃদয়ের স্থান অল্প ছিল—ফরাসীরা এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন। কাজেই সনাতন পূজাপাঠ ব্রতানুষ্ঠান ইত্যাদির পুনঃ প্রবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। আয়র্লাণ্ডে গেলিক আন্দোলনের দ্বারা প্রাচীন কেল্টিক রীতি নীতি এবং চিন্তা-প্রবাহ নূতন আকারে দেখা দিতেছে। এদিকে ইংলাণ্ড, আমেরিকা, আর্ম্মাণি ইত্যাদি দেশে

---

(৫) "রসাদেব স্ত্রিয়া রক্তং রজঃ সঞ্জং প্রবর্ত্ততে। তদর্ধাৎ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্"
সুশ্রুত, শারীরস্থান ১৪শ অধ্যায়

শিল্প ও বাণিজ্যের চরম উন্নতির আনুষঙ্গিক কুফল সমূহের প্রতিবাদ স্বরূপ নানা প্রকার বৈষয়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। বড় বড় ফ্যাক্টরী, "ট্রাষ্ট" সাম্রাজ্য-নীতি, শ্রমজীবি-দলন, স্ত্রী-নির্য্যাতন, পরিবার-সঙ্কট, নীতি-বিভ্রাট, চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্বলোপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে আজকাল সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিষৎ বা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। মানুষ উনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র মানবসভ্যতাকে নির্জ্জীব কলের নিয়মে পরিচালিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সরস প্রাণবান্ মানবকে যথার্থ সজীব পদার্থের ন্যায় বিবেচনা করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বিজ্ঞান মহলেও খানিকটা এইভাব দেখিতেছি। আমাদের অধ্যাপক বসু মহাশয় ধাতু ও উদ্ভিদের জীবনে মানবপ্রাণের অনুরূপ লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই আবিষ্কারসমূহ দুনিয়ার সকল বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়েই আলোচিতও হইতেছে। কোথায় সমগ্র মানবসমাজকে জীবন-হীন যন্ত্রের ন্যায় বিবেচনা করা হইতেছিল—আর কোথায় তথাকথিত অচেতন বস্তু সমূহই সচেতন প্রমাণিত হইতেছে! হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, তাকইন, হাক্স্‌লে, হিকেল, কম্‌তে ইত্যাদির "একান্ত পক্ষং জগতঃ প্রতুষ্কং" আর থাকিতেছে না। বার্গসোঁ দর্শনে জড়-বাদের স্থানে Doctrine of *Elan* বা প্রাণ-বাদ প্রচার করিতেছেন। কাবো মেটার-লিঙ্ক অদৃষ্ট জগতের বার্ত্তা আনিতেছেন। টলষ্টয়ের সাহিত্যে এখনও ইয়োরোপের বহু নরনারী শান্তি পাইয়া থাকে। ধর্ম্ম-তত্ত্বে অরকেন অতি প্রাকৃতের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। বেদান্ত, গীতা, উপনিষৎ, বিবেকানন্দপ্রভাব, ঋষিকবি-সমাদর, "গীতা-ঞ্জলি", "Sadhana", "Songs of Kabir" ইত্যাদিও এই নব্য চিন্তাসঙ্ঘের বিশেষ লক্ষণ। প্রথমতঃ, এই উপায়ে ভারতপ্রভাব ছড়াইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয়তঃ, নূতন চোখে নূতন ধরণে জগতের সমস্যা মীমাংসিত হইতেছে। বীটশে ইয়োরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে কার্লাইলের তিরস্কার তীব্রভাবে প্রয়োগ করিতেছিলেন। তিনি জগৎকে নূতন আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। দেখিতেছি সত্য সত্যই বিংশশতাব্দীতে তাঁহার মতানু-যায়ী Transvaluation of values বা "নবযুগোপযোগী নবজীবনে"র সূত্রপাত হইতেছে।

নব্য জগতের সুকুমার-শিল্পমহলেও এই নূতন দৃষ্টি, নূতন তত্ত্ব দেখিতেছি। কি চিত্রকর, কি চিত্র-সমালোচক উভয়েই উনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধের শিল্প-পদ্ধতি বর্জ্জন করিতেছেন। চিত্রাঙ্কনের বাহ্যরীতি, টেক্‌নিক, রংফলান ইত্যাদি মাত্রই আজকাল লোকের আদরণীয় বস্তু নয়। সর্ব্বত্রই "Expression" শিল্পকর্ম্মের অন্তঃকরণ, চিত্রের প্রাণ ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাহিরের আবরণ ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়াসই আদৃত হইতে চলিয়াছে। যন্ত্রের পরিবর্ত্তে জীবন, বাহ্যের পরিবর্ত্তে অন্তর, দেহের পরিবর্ত্তে আত্মা,—ইহাই নব্য শিল্পের লক্ষ্য। বার্গসোঁর Intuition বা "অন্তর্দৃষ্টি"-তত্ত্ব এবং অরকেনের Life's Basis বা অধ্যাত্মতত্ত্ব সুকুমার শিল্পের গঠনেও আজকাল প্রভাবশালী।

আদিম শিল্পের গৌরবপ্রচার

সমালোচক এবং ঐতিহাসিকেরা এক্ষণে

প্রাচীন ও আদিম শিল্পকর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। মিশর, চীন, জাপান এবং ভারতবর্ষ এই চারি দেশের পুরাতন চিত্র-সম্পদ ও ভাস্কর্য্যগুলি সৌন্দর্য্যের খনি বলিয়া প্রশংসিত হইতেছে। এমন কি যাহা যত প্রাচীন তাহাই যেন তত সরল সুন্দর ও সজীবরূপে প্রমাণিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি অনুকরণ করিবার প্রয়াসও শিল্পিমহলে দেখিতে পাইতেছি। যে সমুদয় বস্তু বাহ্য টেকনিকের নিয়মে কথাকার, কুৎসিত বা বীভৎস পরিগণিত ছিল সেই গুলিই অন্তঃসৌন্দর্য্য সজীবতা এবং সহৃদয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বিবেচিত হইতেছে। প্রাচীন কেল্টিক আদর্শের পুনঃ পরিবর্ত্তন, নবীন ভারত-বর্ষে অতীত জীবনের মর্য্যাদা কীর্ত্তন, ফ্রান্সের Catholic Revival ইত্যাদি যেরূপ, বর্ত্তমান শিল্পজগতে Primitive Artএর গুণ-সমাদরও সেইরূপ। বাঁধাবাঁধি ছাড়াইয়া যন্ত্র-চালিত জীবনযাপন ত্যাগ করিয়া, কলের দাসত্ব এবং মাপজোকের দাসত্ব ছাড়াইয়া শিল্পীরা স্বাধীন প্রতিবিধির আবহাওয়ায় আসিতে চাহিতেছেন। এই জন্যই অকৃত্রিম আদিম নরনারীর হৃদয়-প্রসূত সাহিত্য ও কলা বিংশশতাব্দীতে আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

চিত্রশিল্পে ভাবুকতা

প্রাচীন কলাপদ্ধতি অবশ্য এই নবযুগে সেই মিশরীয় বা ভারতীয় কায়দায়ই অনুসৃত হইতেছে না। বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত জ্ঞানভাণ্ডারে যে সমুদয় রত্ন সঞ্চিত হইয়াছে সেগুলি বর্জ্জিত হইতেছে না। বরং দুনিয়ার সকল সম্পদই যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়ের সাহায্যেই প্রাচীন ধরণে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিতে পাই। সমা-লোচকেরা বলিতেছেন—"ভাব ফুটাইবার জন্য বাহ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি নিতান্ত প্রাকৃতিক জীবজন্তুর অনুকরণে আঁকিবার বা গড়িবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহা আঁকিতেছ তাহা তোমার চিত্তে যেরূপ ভাব উৎপন্ন করে তুমি সেইরূপ আঁকিবে। ফটোগ্রাফে ছবি তুলিলে উদ্ভিদ্, জীবজন্তু, নরনারী, বাড়ীঘর ইত্যাদি যেরূপ দেখায়, চিত্রকরের শিল্পে অথবা স্থপতির কার্য্যেও এই সমুদয় বস্তু সেইরূপই দেখাইবে কি? কখনই না। যদি দেখায় তবে বুঝিতে হইবে—এখানে পাকা ওস্তাদের হাত নাই। বস্তুগুলি দেখিবার পর শিল্পীর চিত্তে যে ধারণা থাকে সেই ধারণা ফুটাইতে পারাই প্রকৃত কারিগরী। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে একই গৃহ, একই ব্যক্তি, একই উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন দেখাইবে।" ইহার নাম Post-Impressionism অর্থাৎ "বস্তু দেখিবার (Impression) পর (Post) ধারণাগুলি চিত্রে বা স্থাপত্যে স্থায়ী করিবার রীতি। ইহা ভাববাদ বা আদর্শবাদ। যেরূপ দেখিতেছি সেইরূপই আঁকিতেছি—এই নিয়মকে Im-pressionism অর্থাৎ "দেখা অনুসারে আঁকা" বলে। ইহা জড়বাদ—naturalism বা materialism. আমাদের নবীন জগতে Post-Impressionismএর প্রভাব চলি-তেছে। প্রাচীন ও আদিম শিল্পের সৌন্দর্য্য সমালোচনা করিলে আধুনিক Post-Impressionism-তত্ত্বের কোন কোন প্রমাণ পাওয়া যাইবে এইজন্য আজকালকার শিল্পী-দের যাঁহারা Post-Impressionist তাঁহারা প্রাচীন শিল্পের সমাদরকর্ত্তা। বলা বাহুল্য এই Post-Impressionist বা Symbo-list দলকে "ভাবুক" বা Idealist দল বলা চলিতে পারে। এই হিসাবে নব্যভারতের

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত শিল্পিসম্প্রদায় নবীন জগতের অন্যান্য শিল্পিসম্প্রদায়ের সহোদর। ফ্রান্সে এবং ইংল্যণ্ডে "ভাবুক" শিল্পীরাই যুবক ভারতের চিত্রাবলী সমাদর করিতেছেন। ইঁহারাই আবার প্রাচীন ভারত ও মিশরের সুকুমার শিল্পের কীর্ত্তি গাহিয়া থাকেন। দেখা যাইতেছে জগতের নূতনতম চিন্তাপদ্ধতি শেষ পর্য্যন্ত প্রাচীনতম চিন্তাপদ্ধতিরই ধারা বহন করিবে। এই জন্যই কি সর্ব্বত্র Back to the land, Back to the village, Back to the family ইত্যাদি রব উঠিয়াছে?

জার্ম্মাণ চিত্রকর ক্যাণ্ডিন্স্কি

মিউনিকের জার্ম্মাণ চিত্রকর ক্যাণ্ডিন্স্কি (Kandinski) এইরূপ ভাবুক দলের অন্তর্গত। তিনি এই দলের আদর্শও এক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদও The Art of spiritual Harmony প্রচারিত হইয়াছে। অনুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক বলিতেছেন :—

The tradition of which true Post-Impressionism is the modern expression has been kept alive down the ages of European art by the scattered and until lately neglected painters. But not since the time of the so-called Byrantines, not since the period of which Giotto and his school were the final splendid blossoming, has the "Symbolist" ideal in art held general sway over the "Naturalist." The Primitive Italians like their predecessors the primitive Greeks, and in turn, their predecessors the Egyptians, sought to express the inner feeling rather than the outer reality.

This ideal tended to be lost in the naturalistic revival of the renaissance which derived its inspiration solely from those periods of Greek and Roman art which were preoccupied with the expression of external reality. Although the all-embracing genius of Michel Angelo kept the "Symbolist" tradition alive it is the work of Erl Greco that merits the complete title of "Symbolist." From Greco springs Goya and the Spanish influence on Daumier and Manet. When it is remembered that in the meantime Rembrandt and his contemporaries, notably Bronwer left their mark on French art in the work of Delacroix, Decamps and Courbet, the way will be seen clearly open to Cezanne and Ganginn".

Cezanne এবং Gauginn এই দুইজন ফরাসী শিল্পী নব্য ভাবুক দলের প্রবর্ত্তক। জার্ম্মাণ ক্যান্ডিন্স্কি স্পেনের পিকাস্সো (Picasso) এবং ফ্রান্সের Matisse ইঁহাদের শিষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সকলের সম্বন্ধে The Art of spiritual Harmony গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দলের অন্তর্গত এক চিত্রকর নিজেদের আদর্শ প্রচার করিতেছেন। কাজেই এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, নব্য শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে বুঝা যায়। সূচীপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

উদীয়মান চিত্র-শিল্পী

ম্যাক্‌স ওয়েবার

A. About General Æsthetic
Introduction
The Movement of the Triangle
Spiritual Revolution
The Pyramid
B. About Painting
The Psychological working of Colour
The Language of Form and Colour

3. Theory
4. Art and Artists
5. Conclusion

রুশ চিত্রকর ম্যাক্‌স ওয়েবার

নিউ ইয়র্কের এক সাহিত্য-বৈঠকে কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী শিল্পী, কবি, গায়ক ইত্যাদির সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন মেক্সিকোর অধিবাসী। ইনি প্রাচীন মেক্সিকোর ভাস্কর্য্যের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকার্য্যের তুলনা করিয়া উভয়েরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইনি Post-Impressionism বা ভাবুকতার পক্ষপাতী। ইনি ভারতের নবীন চিত্রাবলী দেখেন নাই—প্রাচীন বস্তুসমূহ দেখিয়াছেন। ইহাঁর বিবেচনায় সেই সমুদয়ে কারিগরদিগের যথার্থ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই আদর্শেই বর্ত্তমান কালেও চিত্রাঙ্কন ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা উচিত। প্রাচীন মেক্সিকোর সুকুমার শিল্পও এইরূপ ভাবময়। মানবজাতির শৈশবাবস্থাই কি উন্নত শিল্পের যুগ? As Civilisation advances poetry almost always necessarily declines স্পেন্সরের এই কথায় খানিকটা সত্য আছে কি?

এই মেক্সিকোবাসী চিত্রসমালোচক ব্যতীত একজন রুশ যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি বাল্যকালাবধি আমেরিকায় বাস করিতেছেন—একজন দরিদ্র তন্তুবায়ের পুত্র। সাধারণ বিদ্যালিক্ষা বেশী ঘটে নাই। কিন্তু নিজে টাকা রোজগার করিয়া তাহার দ্বারা চিত্রবিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়াছেন। পরে ৩।৪ বৎসর ফ্রান্সে থাকিয়া নব্য ভাবুকমণ্ডলের আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। ইনি Matisseএর অন্যতম প্রধান শিষ্য। সুতরাং ইহাঁর সঙ্গে কথা বলিয়া নব্য চিত্রশিল্পের মূল প্রস্রবনের সন্ধান পাইলাম।

রুশ চিত্রকরের নাম ম্যাক্‌স ওয়েবার। ইহাঁর স্বহস্তে রচিত কার্য্যাবলী দেখিবার সুযোগ ঘটিল। সাধারণ অঙ্কনপদ্ধতি এবং নবীনদলের রচনারীতির পার্থক্য বুঝিয়া লইলাম। The Art of Spiritual Harmony গ্রন্থের ভূমিকায় অনুবাদক নব্য শিল্পপদ্ধতির প্রবর্ত্তকদ্বয়ের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়াছেন :—

"The ultimate and internal significance of what they painted counted for more than the significance which is momentary and external.

Cezanne saw in a tree, a heap of apples, a human face, a group of bathing men or women, something more abiding than either photography or impressionist painting could present. He painted the treeness of the tree. • • • He did not scruple to sacrifice accuracy of form to the inner need".

• • • Gangin also sacrifices conventional form to inner expression, but his art tends ever towards the spiritual towards that profounder emphasis which cannot be expressed in natural objects nor in words • • •. He was much nearer a complete rejection of representation than was Cezanne".

আমাদের দেশে অবনীন্দ্রনাথও এই মত প্রচার করিতেছেন এবং এই আদর্শে চিত্র আঁকিতেছেন। এই রীতিকে ভারতীয় অথবা প্রাচ্য অথবা হিন্দু রীতি বলা চলে না—কারণ সমগ্র জগতেই ভাবুকমহলে এই রীতি অনুসৃত হইতেছে। প্রাচীন কালের ভারতীয়, মিশরীয়, চীনীয়, গ্রীক ইত্যাদিতে জাতিগত শিল্পপদ্ধতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমানকালে ভাববিনিময় এত সত্বর ও দ্রুত সাধিত হইতেছে যে "জাতীয়" শব্দ সাহিত্যে এবং শিল্পে প্রয়োগ করা নিতান্তই কঠিন। আজকাল দুনিয়ার সকল ভাবুকই এক গোত্রের অন্তর্গত—ইহাদিগকে ভারতীয়, জার্মাণ বা জাপানীরূপে বর্ণনা করা অসঙ্গত এবং নিষ্প্রয়োজন।

ভাবুকতাময় শিল্পের পরিচয়

ম্যাক্স্‌ওয়েবার একজন চূড়ান্ত ভাবুক। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মনে করুন, আপনাকে Columbia Universityএর চিত্র আঁকিতে হইবে। আপনি কি বাড়ীঘরগুলি আঁকিবেন না।" ইনি বলিলেন—"সে কথা এখন আমি বলিব কি করিয়া? যখন ছবি আঁকিতে বসিব তখন আমার মাথায় কোন্ ভাব আসিবে তাহা কি আমি বলিতে পারি? আচ্ছা বাড়ীঘর আঁকার একটা নিদর্শন দেখাইতেছি।" এই বলিয়া রুশ ভাবুক আমার হাতে একটা চিত্র দিলেন। দেখিলাম কতকগুলি অপরিষ্কার অন্ধকারময় ঘেঁষাঘেঁষি গৃহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গৃহগুলিকে স্পষ্টরূপে চিনিতে পারা যায় না। মনে হইল যেন ভূমিকম্পে নগর ধ্বংস হইয়া গেলে পর অট্টালিকাসমূহ যেরূপ দেখায় সেইরূপই ধ্বংসস্তূপ দেখিতেছি। একটার উপর যেন আর একটা চাপিয়া পড়িয়াছে—সবই অস্পষ্ট—ঘোঁয়াটে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহা কি?" চিত্রকর বলিলেন—"ইহাই আমার নিউইয়র্ক। এই মহানগরীকে আমি Over-crowdingএর নরক বিবেচনা করি। রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, লোকজনের ভিড় ইত্যাদির প্রভাবে এখানে ফাঁকা হাওয়া, স্বচ্ছন্দ গতিবিধি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্বাধীনতা ইত্যাদি কিছুই পাইবেন না। কিন্তু Impressionist দলের চিত্রকর হইলে ২৫ তলা প্রাসাদ দেখিতাম, রেলপথ দেখিতাম, মোটরকার দেখিতাম, অজস্র জনতাপ্রবাহ দেখিতাম। আপনিও ফটোগ্রাফের ছবিতে যেরূপ নগরদৃশ্য দেখিয়াছেন আমার এই রচনায়ও তাহাই দেখিতেন। কিন্তু আমি idealist—আমি ভাবের খেলায় মত্ত—আমার নিকট ইট কাঠ লোহা লক্কড় অতিশয় নগণ্য। আমি নগরের inner meaning বা জীবন ও গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহি।"

ইহার ব্যাখ্যা শুনিবামাত্র আমি রবীন্দ্রনাথের—

"হায়রে রাজধানী পাষাণকায়া
বিরাট মুষ্টিতলে ঘাসিছে মূঢ়বলে
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া।"

ইত্যাদি বিবরণ ইংরাজীতে আওড়াইয়া

ওয়েবারের চিত্রাঙ্কন

India Press, Calcutta.

দিলাম। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া ইনি "গীতাঞ্জলি" দেখিতে চাহিলেন এবং বলিলেন "আমার একজন ইংরাজ বন্ধু এই বড়দিনের উপলক্ষে গ্রন্থখানি উপহার পাঠাইয়াছেন। এই বন্ধুটি আমাদিগের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার আনুকূল্যেই বিলাতে এবং আমেরিকায় আমার কিছু প্রতিপত্তিও জন্মিয়াছে।" এই বন্ধু কর্তৃক প্রকাশিত Men of Mark নামক গ্রন্থে আধুনিক ইংরাজী ভাষাভাষী ২৫।৩০ জন চিন্তাবীরের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বার্ণার্ডশ, হীট্‌স্, ওয়েল্‌স্ ইত্যাদির সঙ্গে যুবক ওয়েবার স্থান পাইয়াছেন।

ওয়েবারের সাহিত্যসেবা

ওয়েবার কবিতা রচনা করেন—কতকগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। রচনারীতি এবং আলোচিত বিষয় উভয়ই নূতন ধরণের। কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই ইংরাজ বন্ধুই "Cubist Poems" নাম দিয়া এইগুলি বিলাতে ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রকাশক ভূমিকায় লিখিতেছেন—

"He came in touch with Matisse, and became one of his first pupils. Erl Greco, Cezanne, Henri Rousseau, and Picasso, are the painters with whose work he is most in sympathy but best of all he likes to study the art of primitive peoples, the sculptures of Egypt and Assyria, the great simple things that have come down to us in store from the past".

মেক্সিকোবাসী চিত্র-সমালোচকের ন্যায় রুশ ওয়েবারও প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইনিও যুবক ভারতের চিন্তাধারার সন্ধান পান নাই। ইনি বলিলেন "ফ্রান্সে গিমে Guimet নামক মিউজিয়ামে অসংখ্য ভারতীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছি। সেগুলির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না-হইয়া থাকা যায় না। নটরাজ, অবলোকিতেশ্বর, কিন্নর, যক্ষ, বুদ্ধ ইত্যাদি গড়িতে অসাধারণ ক্ষমতা আবশ্যক। প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা সকলেই idealist, symbolist or post-impressionist. তাঁহারা লম্বা আঙুল, বা বড় চোখ অথবা প্রশস্ত হাত গড়িতে লজ্জা বোধ করিতেন না। Anatomyএর নিয়ম মানিলেই কি উৎকৃষ্ট কারিগর হওয়া যায়? আমি যেখানে কোন ব্যক্তির আবেগময় দৃষ্টি বুঝাইতে চাহি সেখানে তাহার অন্যান্য সকল অঙ্গ ভুলিয়া চোখের আকৃতিতেই সকল যত্ন প্রয়োগ করিব। সাধারণ লোকের চোখের যে মাপ আমার চিত্রে অঙ্কিত ব্যক্তির চোখে হয়ত সে মাপ দেখিতে পাইবেন না। এইরূপ অস্বাভাবিকতাই অনেক সময়ে যথার্থ স্বাভাবিকতা নহে কি?"

ওয়েবার গদ্য রচনাও করিয়াছেন। দশ বারটা প্রবন্ধ ইনি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। সকলগুলি সুকুমার শিল্পবিষয়ক! ইংরাজী ভাষায় লিখিত। রবীন্দ্রনাথের "Sadhana" গ্রন্থের যে সুর এই প্রবন্ধাবলীর সুরও সেইরূপ। ইংরাজী সাহিত্যে এইরূপ ভাবুকতাময় প্রবন্ধ অতি বিরল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে চিত্র সমালোচনা বিষয়ক সাহিত্যে ইহা একটা নবযুগ আনিবে। আধুনিক চিন্তাজগতেও একটা নবীন শক্তির আবির্ভাব হইবে। লেখকের চিন্তাশক্তি অতি গভীর—এরূপ সূক্ষ্মদর্শীর রচনায় নব্য দর্শনবাদের উদ্ভব হয়। লিখিবার কৌশল, ভাষা প্রয়োগ, শব্দ পারিপাট্য সবই নিজস্ব—মামুলি কথায়

চর্চ্চিত চর্ব্বণ একটুকুও নাই। বাস্তবিক পক্ষে ওয়েবার পুঁথিগত বিদ্যার ধারই ধারেন না। তাহার উপর ইঁহার মাতৃভাষা রুশ—জীবনে কখনও ইংরাজী সাহিত্য আলোচনা করিবার অবসর হয় নাই। বয়স ৩১ বৎসর মাত্র। কাজেই নিজ হৃদয়ের উৎস হইতে ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

ওয়েবারের ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ হয় তাহা দেখিবার আগ্রহ থাকিয়া গেল। ইঁহার এক-জন আমেরিকান বন্ধুর নিকট লিখিলাম :—

In him I have found a genious—a thinker of the first grade who is sure to conquer. • • • Altogether I am disposed to think that I have come across a man who is likely to be hailed in the next half a generation as one of the prophets and seers of the 20th cent. He has a distinctive message of his own which will revolutionise western philosophy of life and makes him a kindred spirit to the Hindu."

ওয়েবারের গদ্যরচনার পাণ্ডুলিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

The fourth Dimension from a plastic point of view.

In plastic art, I believe, there is a fourth dimension, which may be described as the conciousness of a great and overwhelming sense of space—magnitude in all directions at one time and is brought Into existence through the three known measurements. It not a physical entity or a mathematical hypothesis nor an optical illusion. It is real and can be perceived and felt. It exists outside and the presence of objects, and the space that envelopes a tree, a tower, a mountain or any solid or the intervals between objects or volume of matter if receptively beheld. It is somewhat similar to colour and depth in musical sound. It arouses imagination and stirs emotion. It is the immensity of all things. It is the ideal measurement, and therefore as great as the ideal, preceptive or imaginative faculties of the creator, architect sculptor, or painter.

Two objects may be of like measurements, yet not appear to be of the same size, not because of some optical illusion but because of a greater or less perception of this so-called fourth dimension, the dimension of infinity. Archaic and the best Assyrian, Egyptian or Greek sculpture as well as paintings by Erl Greco and Cezanne and other masters are splendid examples of plastic art possessing this rare quality • • • A form at its extremity still continues reaching out into space If it

is imbued with intensity or energy. The ideal dimension is dependent for its existence upon the three material dimensions and is created entirely through plastic means coloured and constructed matter in space and light. Life and its visions can only be realised and made possible through matter. The ideal is thus embodied in and revealed through the real."

কিছুকাল হইল ওয়েবারের কতকগুলি চিত্র আধুনিকশিল্পী ক্যান্‌ডিন্‌স্কির কার্য্যের সঙ্গে লণ্ডনের এক চিত্রকর-সমিতির উদ্যোগে প্রদর্শিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নিউইয়র্কে ইহাঁর চিত্রাবলীর একটা প্রদর্শনী খোলা হইবে। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ওয়েবার একটা সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকা পাঠ শুনিয়াই বিশেষত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। Art-consciousness নামক এক প্রবন্ধের ইহা কিয়দংশ। নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

To claim that there is anything new in art would be a very assuming and vain task. It is the alternation of genuine art epochs and principles and the juxtaposition thereof, that makes for a newness of the old. Inherence, the non-beginning and the non-ending of the allness of all, contains in its incessant evolution, the new, and the new of the old. What we find makes for quality in the works of the ancient, that generations after us, will look for in what we may be chosen or gifted to create. Spirituality knows no art movements or cults or means, nor can manifestos and harangue satisfy the crave of the spirit. Spiritual truth or logic, is most severe and virile and infinitely more comprehensive and satisfying than merely products of intellectual and metaphysical vagaries.

It is expression of the essence of spirituality, of joy of revelation, brought to earth, brought to the senses by means of fitting concrete art forms that we find nourish the human spirit and ornate human aesthetic fancy. It is plastic proof of spiritual aesthetic belief and personal research. Expression it must be as it always was of the essence of spiritual tactility and inspiration. Art can not come through means of conscious frozen sophistication. To calculate is to bar infinity. To intellectualize is to smother the breath of fancy, of hope, of the more found only in the infinite as revealed through contemplation and expression thereof.

The art consciousness in us is the balmy whisper of the gods that stir in us emotion and ardor. With

such emotion Giotto painted and built, with such emotion Bach wrote his concertos, with such emotion Paganini played. With such emotion the human spirit creates out of a chaos of matter, organized forms consistent and balanced that teem with spiritual conviction of, and for all time.

Calculation and vaunted manifestoes arrive at their own nothingness and futility. A true art consciousness and the expression thereof binds infinity afore with infinity after. It has inestimable spiritual worth. It rages not, it boasts not, it invites not futile controversy. It is an indescribable inner placid vision and light that urges and guides true creation. It is the life spell between breath and breath, between pulse and pluse, between age and age.

There are other Parthenons, other Ravenna mosaics, other ancient Hindu Sculpture, other Persian rugs and tiles, and Chinese Kakemonos and other Yukatan sculpture images to come. But they will be born as in the great past, only of the poetry, of healthy purposeful human spirit.

MAX WEBER.

ওয়েবারের কবিতা রচনার একটা নিদর্শন প্রদত্ত হইতেছে :—

THE DOME.

What a dome silence makes,
What music, what words are in it,
For what it echoes is not all of now.
All the music and all the words are there.
For when I speak or when I sing
My own and other echoes blended I hear.
With the sound and color of my voice
Time to time I bind
Strange is the echo, but real is the echo,
And why fright at one's own echo-self ?
Though I call not and the space-dome silent be.
My echo, my tone-self, is there—
In space beyond with infinite echos it waits.
With whatever word or vision silence I imprint,
That my echo-self sends back to me.
My echo here
Is myself of everywhere—
My echo everywhere.

ইহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শ্রীচিত্রসমালোচক।

* From Art Consciousness—one of a Series of Essays on Art recently written by Mr. Weber.

'পীরিতি'

মানুষ তখনও আদিম অসভ্যতার অবস্থা অতিক্রম করে নাই, তখনও সে বর্ব্বর পশু কিন্তু তবু সেই সময়ে এমন এক অতুল সম্পদ্ তা'র ছিল যে জন্য তার অত ত্রুটি সত্ত্বেও সে পশু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল—যে জন্য তার আর পশুর মধ্যে ব্যবধান এক পারাবারের। সে সম্পদের নাম সহানুভূতি, পরের জন্য ভাব্‌বার সামর্থ্য। হাজার অসভ্য হাজার বর্ব্বর সে হ'ক না কেন, তবুও সে মানুষ, সে তারই মতন আর একজন মানুষের জন্য ভাবিতে পারে—যতই ক্ষণিক সে ভাবনা হ'ক না কেন, আর এইটুকু থাকে বলিয়াই সে মানুষ—পশু নহে। এই সহানুভূতি দেখিয়ে দেয় যে তার হৃদয় আছে। তারপর মানুষ যতই অগ্রসর হয় ততই সে বোঝে এই সহানুভূতি কত বড়। তার সমাজ, তার ধর্ম্ম, তার শিক্ষা সবই এই সহানুভূতির বৌলতেই সম্ভব হইয়াছে। মানুষ যদি পরের জন্য ভাবিতে না পারিত, সকলেই যদি স্ব স্ব প্রধান হইয়া থাকিত, সবাই যদি আপনার আপনার নিয়াই ব্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে সে কি কখনও তার আদিম পশুত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া সভ্যতার, জ্ঞানের, ধর্ম্মের এত উচ্চ শিখরে আজ অধিরূঢ় হইতে পারিত? কোথায় আদিমকালের সেই অসভ্য মানুষ, যে জানে না কে তার ভাই, কে তার পিতা, কে তার পুত্র, যে তারই মতন আর একজন মানুষকে দেখিলে বুঝিত না, তারই মতন সে একজন, যে কেবল কিসে তার নিজের সুবিধা হইবে তাহাই ভাবিত; যে আর একজন এসে পাছে তার নিজের সুবিধাটুকুর উপর হাত দেয়—সেই হিংসায় অস্থির হইয়া কেবল বিরোধেই মত্ত থাকিত; আর কোথায় বুদ্ধ, চৈতন্য, ঈশা, যাদের জীবনের ব্রত ছিল পরার্থসাধন। এই যে পরিণতি, মানুষ এই যে তার নিজের স্বার্থকে বলি দিয়া পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে—পশুত্ব ছাড়িয়া যে মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে, কিসে তাহা সম্ভব হইল? এই পরিণতির কারণ মানুষ চিরকালই হৃদয়-সম্পন্ন, সেই আদিম সময় হইতেই সে সহানুভূতি-সম্পদের অধিকারী। তখন তার হৃদয় মোহমুক্ত, জড়তাসম্পন্ন ছিল বলিয়া তার আচরণ পশুসদৃশ ছিল। মোহাচ্ছন্ন হইলেও আদিম মানুষ মাঝে মাঝে চকিতের মত তার এই অতুল সম্পদের আলোক দেখিতে পাইত। সময়ে সময়ে অসভ্য মানুষও সহানুভূতি-কোমল স্পর্শে আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য ভাবিত। যখন তার সহচর তার পার্শ্বে রোগের যন্ত্রণায়, বা ক্ষুধা তৃষ্ণার তাড়নায় অভিভূত হইয়া তার পানে করুণদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, তখন বোধ হয় সে হাজার অসভ্য হাজার কঠিন হইলেও আপনার কথা ভুলিয়া তার সহচরের যন্ত্রণার উপশমের প্রয়াস পাইত। যার হৃদয় আছে, তার কাছে বাধা বিপত্তি কিছুই নহে—তার হৃদয় সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও বাহির হইবেই। পরের জন্য ভাবনা, পরার্থে নিজের সুবিধাকে উৎসর্গ করা মানুষের যে ধর্ম্ম। আত্মবিস্মৃত হ'ক না সে, তবু যেটা তার ধর্ম্ম—যা নিয়ে তার মনুষ্যত্ব—মানুষের পরের জন্য

ভাববার এমন সহজ প্রবৃত্তি চিরকাল কি অবরুদ্ধ থাকিতে পারে? একসময়ে মানুষের সহানুভূতির উৎস সকল বাধা, সকল ব্যতিক্রম দূরে সরাইয়া আপনার পথ যে করিয়া লইবেই লইবে। তাই মানুষ আজ এত মহৎ, তাই সে তার আদিম অসভ্যতার যুগ অতিক্রম করিতে পারিয়াছে—তার পশুত্বকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে। আচ্ছা, পশুর মধ্যে কি সহানুভূতি নাই, আমরা দেখিতে পাই এমন অনেক পশু পক্ষী আছে যারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে, যারা স্ব স্ব দলের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারে, সহানুভূতি বিনা ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পশুর মধ্যে যদি সহানুভূতি থাকেই, তবে আর মানুষের এত বড়াই কিসে? সত্য বটে—পশু, পক্ষী দলবদ্ধ হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য অনেক সময়ে সাধন করে। কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, তাহারা কেবল এক অন্ধ সহজ বৃত্তি (বা Instinct) এর তাড়নাতেই—দলবদ্ধ হয়। আমরা যাহাকে সহানুভূতি বলি, বোধ হয় তাহাদের সে রকম স্পষ্ট পরের জন্য ভাব্‌বার ক্ষমতা নাই। তারা বোধ হয় অন্ধবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই একজোটে সম্মিলিত হইতে পারে। আর এই বৃত্তির কোন ক্রম বা পরিণতি নাই, চিরকালই তারা একই রকমে চলে, তাই মনে হয় তারা অন্ধ বৃত্তি পরিচালিত হইয়া দলবদ্ধ হয়। মানুষের পক্ষে কিন্তু সে কথা খাটে না। তাহাদের এই সহানুভূতির আবার পরিণতি লক্ষিত হয়। জীব সহজেই স্বার্থসেবী। The law of self-preservation is the rule—স্বার্থের জন্যই জীব জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। নিজের জন্য জীব সহজে ভাবিতে পারে বলেই সে জীবন-সংগ্রামে পরাভূত না হইয়া বাঁচিয়া থাকে। প্রকৃতি জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবার ভার জীবের নিজের হাতেই অর্পণ করিয়াছেন, তাই জীবের জীবন-সংগ্রাম—তাই স্বার্থ-সাধনে তার উৎসুক্য—তাই সে অহর্নিশি আপনার লইয়াই ব্যস্ত। আর প্রকৃতপক্ষে নিজের ভাবনা যেমন ক'রে সে ভাবিতে পারে —অন্যে কি তেমন করিয়া পারে? প্রকৃতির কি সুন্দর সংরক্ষণ-প্রণালী—তিনি যে জীবের অন্নদান করিয়াছেন—কেমন সুন্দর ভাবেও সহজ উপায়ে তার সংরক্ষণ-সাধন করিতেছেন। নিজেকে রক্ষা করার ইচ্ছা জীবের সহজ বৃত্তি (instinct)—তার প্রাণের ধর্ম্ম। প্রাণের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে—জীব এই সহজ বৃত্তির দাস—সে অন্ধভাবে এই বৃত্তির অনুগামী হয়, কাহারও শিক্ষার অপেক্ষা করে না। কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না—'জীব, নিজরক্ষণে তুমি ইহা কর'। সে নিজেই জানে প্রাণের প্রতি স্পন্দনে সে 'অনুভব' করে তার কি করা উচিত। যেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে সেই খানেই প্রাণধারণ করবার জন্য এই ব্যাকুলতা দেখা যায়। প্রকৃতি জীবকে জন্ম দিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, কিসে তার মঙ্গল হয় তিনি তারও সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবকে শুধু জীবনধারণের এষণা দিয়াই বিরত হ'ন নাই—তিনি ইহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, জীব এই এষণার বশবর্ত্তী হইয়া জীবন ধারণের উপায়ও বাহির করিয়া লইতে পারিবে। তাই দেখি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেমন স্বচ্ছন্দে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে—কেমন আপন মনে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেছে—কেমন বিনা আয়াসে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পুরাইবার উপায়

বাহির করিয়া লইতেছে। কে বলে প্রকৃতি অন্ধ জড় শক্তিপুঞ্জ মাত্র—এত দেখিয়াও প্রকৃতির কার্য্যকলাপের পশ্চাতে অন্ধশক্তির দ্বারা ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যের সন্ধান যে না পায়, সে নিজেই অন্ধ। সে যাহা হউক আমরা দেখিতে পাই, জীবের জীবন-সংগ্রামের মূলে এই প্রাণের এষণাই প্রবল—একমাত্র স্বার্থ ভাবনাই এক্ষণে কার্য্যকরী—ইহাই তার অস্থি-মজ্জাগত। তাই আমাদের মনে হয়, ক্ষুদ্র পশু পক্ষী যে দলবদ্ধ হয়, তাহার মূলেও এই অন্নবৃত্তি—তাহার মূলেও তার স্বার্থ-সাধনের প্রয়াস। প্রকৃতি কি শুধু জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে তার বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। প্রাণের একটা লক্ষণ—সে থাকিতে চায়, সে চায়—তার অস্তিত্বকে যতদিন সম্ভব ধরিয়া রাখিতে। ইহার মূলেও সেই একই এষণা—জীবের বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা ইহা সাধ্য নহে। প্রকৃতি যেন ইহা বুঝিয়াই ব্যবস্থা করিলেন জাতির অভিব্যক্তির। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা যাহা সম্ভাবিত হয় না, ব্যক্তির সমষ্টি জাতির দ্বারা তাহা সম্ভাবিত হয়। একজন যাহা ধরিয়া রাখিতে পারে না, তার জাতিত্বের ভিতর দিয়া সে তাহাকে ধরিয়া রাখে। ব্যক্তি-বিশেষের লোপ অনিবার্য্য বটে; কিন্তু জাতির যে বিশেষত্ব তার ত বিনাশ নাই—সে যে চিরন্তন। প্রকৃতিদেবীর উদ্দেশ্য ত জীবের উচ্ছেদসাধন নয়, তিনি যে জীবের চিরন্তন অস্তিত্ব দেখিতে চাহেন, তাই তিনি বিধান করিলেন সন্তান যতদিন নিজের জীবন-প্রবাহ বাঁচাইয়া রাখিতে অশক্ত ততদিন পর্য্যন্ত প্রসূতি আপনার যা যথা সর্ব্বস্ব—সেই স্বার্থের ভাবনা ছাড়িয়া সন্তানের লালন পালন করিবে। তখন যদি নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হয় জীব, তখন তাহাও করিতে পশ্চাৎপদ নহে। প্রকৃতির নিয়ম, জীবের সাধ্য কি সে নিয়মের ব্যভিচার করে। এই নিয়মের প্রভাবেই যে জাতির জাতিত্ব বজায় থাকে। এই নিয়মের জোরেই ত প্রকৃতিদেবী প্রাণের দ্বারা চিরকাল সজাগ রাখিতে পারেন। ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তি যদি চিরন্তন জাতির জন্য আপনাকে উৎসর্গ না করিতে পারিত—প্রকৃতির উদ্দেশ্য ত তাহা হইলে সংসাধিত হইত না। প্রকৃতি জীবগণকে এই মায়ার দ্বারা পরাভূত করিলেন। জীব বুঝিল না, জানিল না তবুও সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই প্রকৃতির আদেশ পালন করিয়া গেল—প্রকৃতির উদ্দেশ্য সাধন করিল। ব্যক্তি মরিল, কিন্তু জাতি চিরকালের জন্য বাঁচিয়া রহিল—জাতিত্বের মধ্য দিয়া প্রাণের স্পন্দন চিরন্তন ভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। Nature does not can for the individuals, she has set upon to preserve the race; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য তিনি ব্যক্তির দ্বারাই করাইতেছেন। ব্যক্তি তার জাতির জন্য। পরিচালিত হইয়া আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে এই অন্ধ প্রকৃতিদত্ত বৃত্তি লইয়াই জীব দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারে। ইহাতে জীবের কোন হাত নাই। জীব এমন ভাবেই চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাদের মধ্যে এই একই নিয়ম বরাবরই দেখা যাইতেছে—এ নিয়মের ব্যভিচার নাই, ব্যতিক্রম নাই। মধুমক্ষিকার মৌচাক নির্ম্মাণের কারিকুরি চিরকাল সর্ব্বত্রই একই ভাবে চলিয়া আসিতেছে—তার কোন পরিবর্ত্তন নাই, কোন ক্রম বা পরিণতি নাই। যন্ত্র যেমন সমান ভাবে একই রকম কাজ

করিয়া যায়, মৌমাছি বা পশু পক্ষীর ব্যবহারও প্রায় সেই রকম। তাই মনে হয়, পশু পক্ষী দলবদ্ধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি বলে কোন জিনিষ আছে কি, না সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে একথা মোটেই খাটে না। সত্য বটে, মানুষও প্রকৃতির হাতে গড়া, কিন্তু মানুষ যে তাঁর সেরা সৃষ্টি—জড়ে প্রাণে যেমন তফাৎ অনেক, চেতনা ও প্রাণেও তেমনি তফাৎ অনেক। যে প্রাণের স্পন্দন জড়ে নাই, সেই প্রাণের স্পন্দন জীবে আছে বলিয়াই জীব জড়ের অনেক উচ্চে—কিন্তু পশু পক্ষীকে আবার যে চেতনার অভাব সেই চেতনার অভিব্যক্তি মানুষে হয় বলিয়া মানুষের অমন সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখরে। অবশ্য কেহ কেহ বলেন, এই চেতনা সর্ব্বত্রই আছে—a spirit which sleep in the stone, dreams in the animals, awakes in man। কিন্তু ইহা সকলেই স্বীকার করেন যে, পূর্ণ চেতনার মানুষই কেবল অধিকারী। এই জন্য মানুষে পশুতে প্রভেদ অনেক। পশু যেন যন্ত্রবৎ তার কাজগুলি একইভাবে করিয়া যায়—তার কার্য্যপ্রণালীর পূর্ব্ব পশ্চাৎ নাই—কোন তারতম্য নাই। পশুজীবনের কোন পরিণতি আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু মানব ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে—উন্নত হইতে আরও উন্নত হইতেছে। তার কার্য্যপ্রণালী যুগে যুগে, দেশে দেশে বদ্‌লাইয়া যাইতেছে। এই যে পরিবর্ত্তন, এই যে পরিণতি, ইহা বিরামের পরিচয় দেয়? ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে মানুষের instinct বা অন্তর্বৃত্তি ছাড়া জীবনসংগ্রামে সহায়তা করিবার আরও একটা জিনিষ আছে, সেটা তার নিজেকে বুঝিবার বা জানিবার ক্ষমতা। অবশ্য ইহা বলা অবৈধ যে মানুষের মধ্যে instinct বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু তার instinctকে বাধা হইয়া তার চেতনাশক্তি বা বুঝিবার ক্ষমতার কাছে খর্ব্ব হইতে হয়। মানুষের এই জানিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, মানুষ বৃত্তি বা instinctএর দ্বারা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয় না। মানুষ একটা নিজস্ব বজায় রাখিতে পারে। প্রকৃতি বা nature তাদের যা দেয় পশু পক্ষী তাই লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, প্রকৃতি নিজ ইচ্ছায় তাদের যতটুকু যুগিয়ে দেয়, তারা তার বেশী আর কিছু আশা করে না। কিন্তু মানব প্রকৃতির উপর যেন একটা দাবী করিয়া বসে—মানব প্রকৃতির কাছে তার সুবিধা-মতন উপকরণ জোরের সঙ্গে আদায় করিয়া লয়। প্রকৃতি তাঁর এই তেজী সন্তানের সকল আব্দার নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হ'ন। মানবের এই প্রতিপত্তির মূল হচ্ছে—তার 'জ্ঞান'। মানব অন্ধভাবে তার বৃত্তির অনুসরণ করে না, সে আগে তার পরিচয় লয়, জানিয়া লয় তার উপর সে কতটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে।

এই জ্ঞানশক্তির দ্বারা মানুষ জানিতে পারে যে, স্বার্থবৃত্তি অবলম্বন যদিও সে না করিয়া থাকিতে পারে না, তথাপি পরের জন্যও সে না ভেবে থাকতে পারে না। এই জ্ঞানই সহানুভূতি। জীব যাহা অন্ধভাবে করে, মানুষ তাহাই জানিয়া শুনিয়া করিতে পারে বলিয়াই তার শ্রেষ্ঠত্ব। চেতনসম্পন্ন বলিয়া সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। প্রথম প্রথম অবশ্য তার চেতনা মোহমুক্ত ছিল। যখন সে মোহাচ্ছন্ন ছিল তখন সে পশুর মতনই ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন তার জড়ভাব দূর হইল তখন

সে দেখিল নিজের জন্ত ভাবিয়াই তার মনুষ্যত্ব পর্য্যবসিত হয় না, পরের জন্তও তাহাকে ভাবতে হ'বে। স্বার্থসাধন যেমন তার ধর্ম্ম, পরার্থ-সাধনও সেইরূপ তার ধর্ম্ম। সে যে মানুষ, আপনার ভাবনা ভেবেই তার ক্ষান্ত হওয়া ত কোন রকমে উচিত নয়, পরের জন্তও ত তার না ভাবিলে চলিবে না। পরের জন্তও যে তাকে ভাবিতেই হইবে—ঐ যে অন্ধ পঙ্গু পথে বসিয়া হাহাকার করিতেছে, কই, তাকে দেখিয়া আমি ত স্থির থাকিতে পারি না—তার জন্ত সহানুভূতিতে যে আমার হৃদয় স্বতঃই গলিয়া যায়—তার জন্ত আমাকে মুহূর্ত্তের জন্তও যে ভাবিতেই হয়। পরের জন্ত ভাব্‌বার প্রবৃত্তি যে আমার 'আমিত্বের' সঙ্গে মিশিয়া আছে। আর এই সহানুভূতি আছে বলিয়াই, আমি আমার ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বিরাট মনুষ্যত্বের সঙ্গে আপনাকে মিশাইতে পারি। আমার ক্ষুদ্রত্ব ছাড়িয়া মহত্ত্ব লাভ করিতে পারি। স্বার্থসাধন, সে ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার—অন্ধ-বৃত্তি পরিচালিত হইয়া জীবমাত্রেই ত স্বার্থের দাস। ক্ষুদ্র স্বার্থসাধন করিবার জন্ত ত কোন যত্নের দরকার হয় না, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ সকলেই তো সহজেই স্বার্থের জন্ত যত্নবান। স্বার্থসাধন যদি তোমার লক্ষ্য, তবে তুমি পশু না হইয়া মানুষ হইলে কেন? তবে তুমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে কেন? চিৎশক্তিসম্পন্ন হইলে কেন? না, মানুষের উদ্দেশ্য ত এত ক্ষুদ্র নয়, সে যে অমৃতের সন্তান—তার সাধনা যে অতি মহান্। সে কি আপনার ভাবনা ভাবিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে, সে কি ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমার মধ্যে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? তাই পরের জন্ত মানুষের সহানুভূতি, সেই জন্তই সে পরের জন্ত ভাবে—আর শুধু তাই নয়, পরের জন্ত ভাবিয়া সে সুখ অনুভব করে।

কিন্তু মানুষ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারে না, সহানুভূতির দ্বারা সে স্বার্থকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে না। সহানুভূতির মধ্যেও সে স্বার্থের একটু সাড়া পায়। তখনও তার স্বার্থকে সে আগে রাখে। তখনও সে পরের সহিত আপনার অবস্থার তারতম্য করে—তখনও সে আপনাকেই সামনে রাখে, আপনার ভাল অবস্থার সহিত অপরের হীনতর অবস্থার তুলনা করিয়াই পরের জন্ত ভাবে। সহানুভূতিতে মানুষের পরার্থপরতার সম্পূর্ণ সিদ্ধি হয় না। এই রকম অসম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগে মানুষের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। সে চায় স্বার্থের সীমা সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করিতে। আর এই আকাঙ্ক্ষার প্রয়োচনা দ্বারাই মানুষ ভাল-বাসিতে পারে। ভালবাসাতেই মানুষ স্বার্থ-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখে।

ভালবাসার স্থান সহানুভূতির অনেক উপরে—অবশ্য ক্রম হিসাবে আগে সহানুভূতি তারপর ভালবাসা। সহানুভূতির ভিতর দিয়াই—'পীরিতি'র বিকাশ, কিন্তু সহানুভূতিতে যাহা সম্ভব হয় না, পীরিতিতে তাহা সম্ভব হয়—পীরিতিতেই কেবল পরের জন্ত ভাবনা, আপনাকে ভুলিয়া—পরের জন্ত ব্যস্ত হওয়া সম্ভবপর হয়। সহানুভূতিতে যেটুকু স্বার্থ থাকে, ভালবাসাতে সেটুকুও থাকে না। মানুষ যাকে ভালবাসে তাহার জন্ত সে নিজের সমস্ত স্বার্থটুকু উৎসর্গ করে। ভালবাসার মধ্যে আর 'আপন' 'পর' জ্ঞান থাকে না—আমি আর তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। তখন একাকার ভাব—আমিই সে, সেই আমি, এই ভাব হয়। ইহাই ত পরার্থ-

পরভাব চুড়ান্ত। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ আমি তোমাকে প্রকৃতরূপে ভালবাসি না। যতক্ষণ আমি তোমাকে আপনার মত না দেখি, ততক্ষণ আমি তোমাকে ভালবাসি না। কেবল যখন 'আপন' 'পর' ভাব একেবারে তিরোহিত হয়, তখনই ভালবাসার উদ্ভব সম্ভব হয়। আর এই ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় বলিয়াই ভালবাসার সার্থকতা—তার এত আদর।

মানুষ তার নিজের ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে তৃপ্তি পায় না—কেবল নিজের স্বার্থ ভাবিয়া তার সাধ মিটে না। তার সাধ অনেক, তার আশা অফুরন্ত। সে চায় তার ক্ষুদ্রত্বকে, ব্যক্তিত্বকে ছাপাইয়া তার সীমা বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া বিরাটের সহিত সংযুক্ত হইতে। তার যে আত্মা আছে—অ'র সে আত্মা যে বিরাট। তার আত্মা ক্ষুদ্র স্বার্থসাধন করিয়াই ত তৃপ্ত হইতে পারে না। আত্মা যে বিরাটের মধ্যে তুমার মধ্যে বিলীন হইবার জন্য সদাই কাঁদাল। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষাই যে আত্মার যথাসর্ব্বস্ব। 'সোহম্' 'তত্ত্বমসি'—এই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি' শুধু কথার কথা নহে।

এই যে তীব্র মিলনের আকাঙ্ক্ষা, ইহার সম্পূরণ ভালবাসার ভিতর দিয়াই সম্ভব হয়। যে ভালবাসে, সে নিজের স্বার্থ ভুলিয়া যায়। যাকে ভালবাসে, তার জন্য সে নিজের সব সুখ অঞ্জলি দিয়াই পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। পরার্থই তখন তার স্বার্থ। তখন সে পরেতেই আপনাকে দেখিতে পায়, পরের সুখ দুঃখ তার নিজেরই সুখ দুঃখ। ভালবাসিয়া মানুষ ভালবাসার পাত্রের মধ্যে তার আমিত্বের প্রসার দেখে। তার 'অহং' আর তার ভালবাসার পাত্রের 'অহং' এর সঙ্গে একাত্ম। "The lover loses himself in the loved." এমন স্বার্থজয় কি আর কোন উপায়ে সম্ভব হয়! ভালবাসা ভিন্ন এমন একাকার ভাব কি আর কিছুতেই হয়?

যতক্ষণ স্বার্থের কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে, যতদিন আমি তুমির মধ্যে এইটুকুও ব্যবধান থাকিবে—ততদিন আমার এমন স্বার্থত্যাগ অসম্পূর্ণ—ততদিন আমার ভালবাসা অসম্পূর্ণ। মানুষ ভালবাসে বটে—কিন্তু এই প্রকৃত ভালবাসা অনেক সাধনা করিয়া তবে সে পায়। অনেক জন্মের তপস্যার ফলে তবে সে ভালবাসিবার অধিকার পায়। মানুষ যে অহং কে বাদ দিয়াও বাদ দিতে পারে না। সময়ে অসময়ে তাহার এই অবাধ্য অহং ভাবটি সজাগ হইয়া তাহাকে বিব্রত করিতে ছাড়ে না। এই 'অহং' ভাবটিকে একেবারে দূরীকৃত করা বহু সাধনা-সাপেক্ষ। অথবা সাধনা করিয়া তবে মানুষ স্বার্থকে একেবারে নির্জ্জল করিতে পারে। যতদিন না এই স্বার্থের একান্ত উচ্ছেদ হয়, ততদিন ভালবাসা প্রকৃত নহে ততদিন ভালবাসা স্বার্থপরতারই সমান।

'পীরিতি পীরিতি সব জন কহে
পীরিতি সাধন কথা।'

সবার মুখেই পীরিতি ভালবাসার কথা লেগেই আছে। ইয়ারকিতে ঠাট্টাতে সব সময়েই আমরা পীরিতের কথা বলি। যেন পীরিতি খেলা ধূলারই জিনিষ। কিন্তু কবি আমাদের সাবধান করিয়া দিতেছেন, তিনি বলিতেছেন—

'বিরিখের ফল নহেকো পীরিতি
নাহি মিলে যথা তথা।'

পীরিতি কি মুখের কথা, পীরিতি কি খেলার জিনিষ, পীরিতি যে সাধনা। মনে করিলেই কি ভালবাসা যায়, মনে করিলেই কি পীরিতি

পাওয়া যায়, না দেওয়া যায়। পীরিতি যে বহু আয়াসসাধ্য। কত জনমের তপস্যাফলে মানুষ ভালবাসিবার ক্ষমতা লাভ করে, তার কি ঠিক আছে? সে ভালবাসার জন্য মানুষ আপনাকে বলি দিতে পারে, সে ভালবাসার জন্য মানুষ পরকে আপন করিতে পারে, সে ভালবাসা কি বিনা সাধনায়, বিনা আয়াসে লাভ করিতে পারে?

'পীরিতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে;
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলয়ে তারে।'

যে পীরিতির নাম আত্মবলিদান, যে ভালবাসার সাধনা আত্মনিবেদন, সে ভালবাসা কি সহজে লাভ করা যায়, সে ভালবাসা কি কথার কথা? সাধে কি বলি আসল ভালবাসা ঘোর তপস্যাসাধ্য, মনে করিলেই পাওয়া যায় না।

'পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস
দুঁহু ঘুচাঞে এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আস।

ভালবাসতে চাও, তোমার যা যথা সর্ব্বস্ব তোমার যা বড় আপনার, যাকে নিয়ে তুমি অহোরাত্র ব্যস্ত থাক একটুও সঙ্কুচিত হ'তে দেখলে তুমি মরমে মরিয়া যাও, সেই যে তোমার স্বার্থ—সেই যে তোমার তুমি তাকে পরের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হ'বে। যতদিন পরকে পর মনে করিবে, যতদিন পরের চেয়ে আপনার স্বার্থকে বড় মনে করিবে, যতদিন নিজের স্বার্থকে পরের মধ্যে ডুবিয়ে না দিতে পারিবে, ততদিন তুমি যথার্থ ভালবাসতে পার না—ততদিন তোমার পীরিতির আশা নাই। স্বার্থত্যাগ করা কি কম কথা? বিনা সাধনায় কি স্বার্থকে বলি দেওয়া যায়? ভালবাসবে কি, আগে সাধনা কর নিজের ভাবনাকে ছাড়বার চেষ্টা কর পরের জন্য আত্মসমর্পণ করিতে শিখ, তবে ত তুমি ভালবাসতে পারবে? পীরিতি কি কথার কথা?

পীরিতি সাধনা—পীরিতি যোগ। ভালবাসার পাত্রের সহিত যুক্ত হওয়ার নাম পীরিতি। পীরিতি শুধু সাধনা নয়—মহান সাধনা। পীরিতির মধ্য দিয়াই—মানুষ ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারে—জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইতে পারে—ক্ষুদ্র বিরাটে লীন হইতে পারে। এই পীরিতিই সোহং বাক্যের সার্থকতা। যতদিন সামান্যমাত্রও ব্যবধান তাঁহাতে আমাতে থাকিবে ততদিন 'আমিই তিনি' এ ভাব আমার মনে স্থান পাইতে পারে না। যদি তাঁহাকে পাইতে চাও, যদি তাঁহাতে বিলীন হইতে চাও—তাহা হইলে তোমার হৃদয়ের সমস্ত কোমল বৃত্তিগুলিকে জাগাইয়া তাঁহার দিকে প্রবাহিত কর। সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে ভালবাস। প্রেমিকের হৃদয় লইয়া প্রেমের কুসুমাঞ্জলি তাঁহাকে নিবেদন কর। নায়িকার মতন তোমার 'যা কিছু আছে' সমস্তই তাঁহাকে নিবেদন কর। প্রেমের মধুর রসে সিক্তিত হইয়া তোমার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার জন্য উৎসর্গ কর; আপনাকে ভুলিয়া যাও। এমন ভাবে না হইলে কি আর ভগবানকে পাওয়া যায়। আর কোন ভাবে ভগবানকে আমরা এমন আপনার করিতে পারি না। তাঁহার সহিত একাত্মভূত হইবার—এমন প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। পীরিতির মধ্য দিয়াই সম্যক্‌ভাবে মানুষ ভগবানকে পায়। মানুষের সহিত ভগবানের মিলন হয়—শ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল মিলন হয়।

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু।

শিক্ষা-পদ্ধতি *

প্রথম অধ্যায়

প্রথম প্রস্তাব

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপিতা জগদীশ্বর মানবজাতির জ্ঞানোন্নতি ও আত্মোন্নতিবিধানসংকল্পে তাহাদিগকে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি কয়টী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় মন এবং উহার বৃত্তিনিচয় দ্বারা পরিশোভিত করিয়াছেন। এই সকল ইন্দ্রিয়ের যথাবিধি চালনা দ্বারা মানবগণ সর্ব্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে। উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যব্যাপারঘটিত ভাবরাশি মানব মনে স্বতঃই পর্য্যায়ক্রমে উদিত ও বিলুপ্ত হয়। এই ভাবরাশি প্রকাশের নামই ভাষা; এই ভাষা দ্বিবিধ ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক। যখন ভাষা বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকাশিত হয় তখন বায়ুর ঘাতপ্রতিঘাতে কতকগুলি শব্দমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাকেই ধ্বন্যাত্মক ভাষা আর যখন ঐ ভাবরাশি কোনরূপ চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করা যায়, তখন তাহাকে বর্ণাত্মক ভাষা বলে। এই দ্বিবিধ ভাষাই মনুষ্যজাতির আত্মোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির মুখ্য হেতু। অতএব এই দ্বিবিধ ভাষায় পরিশুদ্ধ জ্ঞানার্জ্জনের নামই শিক্ষা।

এই শিক্ষাদান-কার্য্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

১। (ক) শ্রবণেন্দ্রিয় ও বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দের প্রতিধ্বনি শুনিয়া যথারীতি উচ্চারণ।

(খ) কর্ণের সাহায্যে শব্দের ধ্বনি শুনিয়া হস্তের সাহায্যে লেখা।

(গ) কর্ণের সাহায্যে শব্দের ধ্বনি শুনিয়া চক্ষুর সাহায্যে অধ্যয়ন। উল্লিখিত উদ্দেশ্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিশুগণের মনোবৃত্তিবিকাশের জন্য চক্ষু কর্ণ বাগ্‌যন্ত্র ও হস্তের প্রকৃতি শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়।

২। যখন শিশুগণ লিখিত ভাষা পাঠ করে, তখন ঐ ভাষার মর্ম্ম বুঝিতে পারে কি না। যদি না পারে, তবে সহজ প্রশ্ন দ্বারা ভাষার বোধ জন্মাইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং ঐ মর্ম্ম বুঝিলে উহা নিজের কথায় প্রকাশ করিতে পারে কি না। না পারিলে, খণ্ড প্রশ্ন দ্বারা সেই ভাবটী তাহাদের নিজের কথায় বলাইবার চেষ্টা করা উচিত। তদনন্তর লেখা অভ্যস্ত হইলে, ঐ ভাবগুলি তাহাদের নিজের কথায় লিখিতে পারে কি না। যদি না পারে তবে, তাহাদিগকে সহজ কথায় ভাবগুলি বলিয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা লেখান উচিত এবং লিখিত বিষয়গুলি সংশোধন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে বালকদিগের রচনাশক্তি ও ভাষাবোধ জন্মে।

---

* কাশীর আলো বেঙ্গলী স্কুলের শিক্ষাপরিষদে পঠিত।

৩। যখন বালকগণ অঙ্ক কষিতে আরম্ভ করে তখন অঙ্ককষার উদ্দেশ্যটী বুঝাইয়া দিয়া তাহারা যে অঙ্ক শিক্ষা করে তাহা কিরূপে দৈনিক ব্যবহারে প্রয়োগ করা যায় এবং উহা দ্বারা সাংসারিক কার্য্যে কিরূপ সুবিধা ঘটে তদ্রূপ বিষয়গুলি যাহাতে বালকগণের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয় তদর্থে যত্নবান্ থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

৪। বিজ্ঞান ভূগোল ও ইতিহাসাদি যে যে বিষয় সাংসারিক কার্য্যে আবশ্যক তাহাতে বালকগণের যাহাতে দৃঢ়সংস্কার জন্মে তদনুরূপ শিক্ষা।

৫। ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বালকগণের প্রত্যক্ষজ্ঞান অনুমেয়জ্ঞান যুক্তি-প্রদর্শনশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয় তদনুরূপ শিক্ষা।

৬। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বালকগণের যাহাতে মনোনিবেশশক্তি সুশৃঙ্খলা প্রবৃত্তি ও উন্নতির ইচ্ছা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় তদনুযায়ী শিক্ষা।

৭। যে যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে বালকগণের যাহাতে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় তদনুরূপ শিক্ষা।

৮। বিদ্যালয়ে যেরূপ ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে ঐ শিক্ষা দ্বারা বালকগণের পরিশ্রমের ক্ষতিপূরণ হইয়া দৈহিক উন্নতি সাধিত হয় কি না। যে যে নীতি শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা তাহারা দৈনিক ব্যবহারে অথবা যথাসময়ে কার্য্যে প্রয়োগ করে কি না। তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ব্যায়াম ও নীতির সফলতা সম্পাদিত হয় তদনুরূপ রীতির অনুসরণ করা আবশ্যক।

মন্তব্য—উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের জন্য মনোবৃত্তির বিকাশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। এই বৃত্তির সম্যক্ বিকাশ-সাধন জন্য জ্ঞানতৃষ্ণা ও জ্ঞানার্জ্জনশক্তি বালকদিগের মনে যথেষ্টভাবে উদ্রিক্ত করিতে পারিলে, বালকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাহাদের দর্শনজনিত জ্ঞানের বিচার কার্য্য-কারণাদি নির্ণয় ও চিন্তাশক্তির উন্মেষ করিতে চেষ্টা করে এবং তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হয়। তখন প্রত্যেক কার্য্যে মনোবৃত্তির চারিটী ক্ষমতা বা অধিকার জন্মে। প্রথম ক্রিয়াশীলতা, দ্বিতীয় দূরদর্শনশক্তি, তৃতীয় অভিনিবেশ, চতুর্থ স্মৃতি।

২য় প্রস্তাব

লেখাপড়ায় জ্ঞানলাভ করিতে হইলে চক্ষু, কর্ণ, বাগ্‌যন্ত্র ও হস্তের শিক্ষা অতিশয় প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষা প্রধানতঃ চারিটী শক্তির উপর নির্ভর করে।

শব্দের ধ্বনি শুনিয়া তাহা মুখে বলা অর্থাৎ উচ্চারণ করা।

২। লিখিত বর্ণ বা শব্দ দেখিয়া তাহার উচ্চারণ করা অর্থাৎ পড়া।

৩। আদর্শ দেখিয়া নকল করা বা আদর্শ লেখা।

৪। অন্যোচ্চারিত শব্দ বা বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া লেখা অর্থাৎ শ্রুতলেখা। এই চারিটী শক্তি প্রথমোক্ত চারিটী ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। নিম্নলিখিতরূপে ইন্দ্রিয়গণের সংস্কার ও সম্বন্ধ নিরূপিত হয়:—

(১) পুনঃ পুনঃ কোন বর্ণের ধ্বনি শুনিলে উহার সহিত বর্ণের পরিচয় জন্মে এবং যখনই আমরা ঐ ধ্বনিটি শুনিতে পাই তাহা চিনিতে পারি। ইহাতে ধ্বনির সহিত বর্ণের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং এই শক্তি দ্বারা আমরা স্বর শুনিয়া লোক চিনিতে পারি।

(৫) উল্লিখিত পরিচিত ধ্বনি বার বার উচ্চারণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে উচ্চারণ ক্ষমতা জন্মে, ইহাই বাগ্‌যন্ত্রের শিক্ষা। ইহাতে ধ্বনির সহিত উচ্চারণ ক্ষমতার অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত বাগ্‌যন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; ইহাতে আমরা শব্দের ধ্বনি শুনিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। শিশুগণ এইরূপেই কথা বলিতে শিখে।

(৩) যুগপৎ বর্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে বর্ণের আকৃতির সহিত দর্শনশক্তির পরিচয় হয়; ইহাতেই চক্ষুর শিক্ষা হয় ও বর্ণের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই প্রণালীতেই বর্ণজ্ঞান জন্মে।

(৪) বর্ণের আকৃতির সহিত পরিচয় হইলে পূর্ব্বোল্লিখিত উচ্চারণ ক্ষমতার সাহায্যে আকৃতি দেখিয়া তাহা উচ্চারণ করিতে পারা যায়; ইহাতে আকৃতি দেখিলেই ধ্বনি স্মরণ হয় ও তাহা উচ্চারণ করিতে পারা যায়। ইহাতে আকৃতির বা দর্শন-শক্তির সহিত বাগ্‌যন্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

(৫) লিখিত অক্ষরে হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে বা বর্ণের প্রতিরূপ দেখিয়া লেখার চেষ্টা করিতে করিতে লেখার ক্ষমতা জন্মে, ইহাই হস্তের শিক্ষা। ইহাতে দর্শনশক্তির সহিত অঙ্গুলি-প্রয়োগ-শক্তির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত হস্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহাতেই আদর্শলিপি শিক্ষা হয়।

(৬) বর্ণের ধ্বনি শুনিয়া আকৃতির অনুভব অথবা আকৃতি দেখিয়া বা স্মরণ করিয়া তাহা লেখার ক্ষমতা জন্মিলে বর্ণের সহিত হস্তের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহাতে হস্তলিপি অভ্যাস হইয়া থাকে।

মন্তব্য—অতএব উল্লিখিত শিক্ষায় যিনি যত নিপুণ তিনিই লেখা পড়ায় তত পারদর্শী হন ইহাই অনুমিত হয়।

৩য় প্রস্তাব

শিক্ষা দেওয়া প্রণালী

১ম, অসংযুক্ত বর্ণ শিক্ষা

অ, আ, ক, খ ইত্যাদির বর্ণগুলির ৪ ৫ টী বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ ফলকে (ব্ল্যাক্‌বোর্ডে) লিখিয়া শিক্ষক অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া উচ্চারণ করিবেন ও ছাত্রগণ তৎপশ্চাৎ উচ্চারণ করিবে। উচ্চারণকালে শিক্ষক তাহাদের উচ্চারণ শুনিবেন ও আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিয়া দিবেন। বর্ণগুলি প্রথম পর্য্যায়ক্রমে তদনন্তর বিপর্য্যস্তভাবে ও তৎপর পর্য্যায়-ভঙ্গক্রমে নির্দ্দেশ করিবেন। তৎপর প্রত্যেক ছাত্র দ্বারা বর্ণগুলি প্রথম পর্য্যায়ক্রমে তৎপর বিপর্য্যস্তভাবে ও তদনন্তর পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে পড়াইবেন। আবশ্যকস্থলে সংশোধন করিবেন। উল্লিখিত প্রণালীতে সকল ছাত্রের পড়া শেষ হইলে ১ম বালক বোর্ডের নিকট দাঁড়াইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অক্ষরগুলি উচ্চারণ করিবে ও অবশিষ্ট ছাত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চারণ করিবে। শিক্ষক-মহাশয় আবশ্যক স্থলে উচ্চারণ সংশোধন করিবেন। এইরূপে সমস্ত বর্ণ অভ্যাস হইলে তাহাদিগকে মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে দিবেন। কাষ্ঠ ফলকে বা একখণ্ড কাগজে ছিদ্র করিয়া তদ্দ্বারা বর্ণপরিচয় হইল কি না পরীক্ষা করিবেন। কোন ছাত্র কোন বর্ণ প্রকৃতভাবে নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে ক্রমশঃ পরবর্ত্তী ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে বালক কৃতকার্য্য হইবে তাহাকে উক্ত বালকের স্থান অধিকার করিতে দিবেন। (তেঁতুল বীজের দ্বারা অক্ষর রচনা করিয়া বালকদিগকে বর্ণশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।)

২য়, শব্দপাঠ

শিক্ষক মহাশয় প্রথমতঃ একটী বর্ণ বোর্ডে লিখিবেন ও ছাত্রকে পাঠ করিতে দিবেন তদনন্তর উহার পৃষ্ঠে আর একটী অক্ষর লিখিবেন এবং পাঠ করিতে দিবেন পরে উভয় বর্ণ একত্রে উচ্চারণ করিতে বলিবেন। যতদূর সম্ভব ছাত্রদ্বারা বলাইতে চেষ্টা করিবেন। পরে নিজে উচ্চারণ করিয়া ছাত্রদিগকে পশ্চাৎ উচ্চারণ করিতে দিবেন। এই প্রকারে ২টী ২বর্ণ বোর্ডে লিখিয়া এক একটী ছাত্রদ্বারা তাহা উচ্চারণ করাইবেন। এরূপে শব্দগুলি অভ্যস্ত হইলে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথম পর্য্যায়ক্রমে তৎপর পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে তদনন্তর বিপর্য্যস্তভাবে পড়িতে দিবেন। কোনও বালক পড়িতে না পারিলে ক্রমশঃ পরবর্ত্তী ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে বালক বলিতে পারিবে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত বালকের স্থান অধিকার করিতে দিবেন। এরূপ অভ্যাসের পর ছাত্রদিগকে তাহাদের মুদ্রিত পুস্তকে কয়েকটী শব্দ পাঠ করিতে দিবেন। প্রথম বালক ভুল করিলে পরবর্ত্তী বালকগণকে ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিয়া যে বালক বলিতে পারিবে তাহাকে প্রথম বালকের স্থান অধিকার করিতে দিবেন। পরে শিক্ষকমহাশয় প্রত্যেক বালককে নিকটে আনিয়া শব্দগুলি পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে পড়িতে দিবেন। পড়িতে না পারিলে পর পর ছাত্রগণ দ্বারা সংশোধন করাইবেন। যে বালক সংশোধন করিবে সেই বালক প্রথম বালকের স্থান অধিকার করিবে। (মিত্রাক্ষরে লিখিত বর্ণমালা পড়ান কর্ত্তব্য নহে তাহাতে বালকগণ মুখস্থ করিয়া ফেলে, প্রকৃত বর্ণজ্ঞান জন্মে না।) এরূপে বর্ণমালার দুই অক্ষর যুক্ত শব্দগুলি অভ্যস্ত হইলে তিন অক্ষর ও চারি অক্ষরের শব্দ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত অক্ষর অথবা অক্ষরযুক্ত কার্ড দ্বারা ক্রীড়াচ্ছলে বালকদিগকে শব্দ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

৩য়, বর্ণ বা অক্ষর লিখন

শিক্ষক কয়েকটী অক্ষর বোর্ডে বা শ্লেটে লিখিয়া বালকদিগকে খড়ী বা পেন্সিল দ্বারা তাহার উপর হাত ঘুরাইতে বলিবেন। বালকগণ ক্রমশঃ আদর্শ লেখার উপর হাত ঘুরাইবে। প্রতি অক্ষরের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যায়ক্রমে ঘুরাইতে পারে কি না লক্ষ্য রাখিয়া যে স্থানে ভুল করে তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন। এরূপে কিছুদিন হাত ঘুরান অভ্যাস হইলে আদর্শ দেখিয়া লিখিতে দিবেন। যে যে স্থানে অক্ষরগুলি অঙ্গহীন হয় তাহা দেখাইয়া দিবেন উল্লিখিত পদ্ধতিক্রমে সমস্ত অক্ষর শিক্ষা হইলে কয়েকটী দুই অক্ষরের কথা লিখিয়া দিয়া বালকদিগকে লিখিতে দিবেন। এই প্রকারে দুই অক্ষরের শব্দ লিখিতে শিক্ষা দিয়া তদনন্তর তিন চারি বা পাঁচ অক্ষরের কথাগুলি লিখিতে দিবেন ও আবশ্যক স্থলে সংশোধন করিয়া দিবেন। লেখা অভ্যাস করাইবার সময় শিক্ষক মহাশয় এই কয়েকটী কথা বালকদিগকে বুঝাইয়া দিবেন যে অক্ষরগুলি সমান, খাড়া রেখাগুলি সমান্তরাল, মাত্রাগুলি সমান ও পঙ্‌ক্তিগুলি সমান ও সমদূরবর্ত্তী হওয়া আবশ্যক। বালকদিগের লেখা সংশোধন করিয়া দিয়া তাহা পুনর্ব্বার তাহাদিগকে লিখিতে দিবেন। এরূপে বার বার লিখাইয়া ও সংশোধন করিয়া দিয়া লেখার অভ্যাস জন্মিলে ক্রমশঃ আদর্শ পরিবর্ত্তন করিয়া অপরাপর শব্দ লিখিতে শিক্ষা দিবেন লেখার প্রণালী ঠিক হইলে পাঠ্য পুস্তকের ফলা ও আকারাদি সংযোগযুক্ত সমস্ত শব্দ লিখাইবেন।

৪র্থ, স্বরসংযোগ শিক্ষা

শিক্ষক বোর্ডে "আ" ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে কিরূপ হয় তাহা ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দিয়া তৎপর কয়েকটী আকারযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ লিখিয়া তাহা ছাত্রদিগকে পড়িতে দিবেন। তাহারা 'ক'এ আকারে 'কা' ইত্যাদিরূপে পাঠ করিবে, সমস্ত অক্ষর আকার সংযোগে পাঠ করা অভ্যস্ত হইলে তখন বর্ণবিন্যাস ভিন্ন কেবল 'কা' 'খা' ইত্যাদিরূপে পড়িতে দিবেন। সমস্ত বর্ণ আকার সংযোগে পঠিত হইলে পর্য্যায়ভঙ্গ-ক্রমে ও বিপর্য্যস্তভাবে পড়িতে দিয়া আবশ্যক স্থলে সংশোধন করাইবেন। কোনও বালক ভুল করিলে যে বালক সংশোধন করিবে সে প্রথম বালকের স্থান অধিকার করিবে। এই প্রকারে আকার সংযোগ শিক্ষা দেওয়ার পর ইকার, ঈকার, উকার ইত্যাদির সংযোগও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সমস্ত স্বরসংযোগ শিক্ষা হইলে পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক স্বরসংযোগ শিক্ষা দেওয়ার পর ঐ সংযোগের কতকগুলি শব্দ তৃতীয়স্তরে উল্লিখিত নিয়মানুসারে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। স্বরসংযোগ শিক্ষা দেওয়ার সময় যে যে ব্যঞ্জনবর্ণ উকারাদি স্বরবর্ণ সংযোগে ভিন্নরূপ ধারণ করে তাহা বালক-দিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বালকগণ ব, ঙ, ন, ণ, শ, ষ, স, ই, ঈ, উ ও ঊ স্থানে অধিক ভুল করিয়া থাকে সুতরাং এই সকল স্থলে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

৫ম, সংযুক্তবর্ণ

(১) ফলা শিক্ষা

যে সকল ফলা সহজে উচ্চারণ করা যায় না কিংবা ভাষায় ব্যবহার নাই সেগুলি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বর্ণমালায় লিখিত ফলাগুলিই শিক্ষা দেওয়া উচিত, এতদ্ভিন্ন ফলা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

'য'কার অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে তাহাকে 'য'ফলা বলে। এই 'য'কার অন্য বর্ণে যুক্ত হইলে কিরূপ আকার ধারণ করে তাহা দেখাইয়া দিবেন। বোর্ডে 'য'ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি লিখিয়া একটী বালকদ্বারা 'ক্য' 'খ্য' ইত্যাদিরূপে বর্ণবিন্যাসক্রমে পড়াইবেন ও অপর ছাত্রগণ তাহার অনুসরণ করিবে। এরূপে আর্য্যাসহ সমস্ত ব্যঞ্জনবর্ণে 'য'ফলা যোগ অভ্যাস হইলে পর্য্যায়ভঙ্গক্রমে ও বিপর্য্যস্তভাবে পড়িতে দিবেন। কোনও বালক ভুল করিলে যে বালক সংশোধন করিবে সে প্রথমোক্ত বালকের স্থান অধিকার করিবে। তদনন্তর 'য'ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরসংযোগের নিয়মানুসারে স্বরসংযোগ শিক্ষা দিতে হইবে। প্রত্যেক স্বরসংযোগের পর ঐ সংযোগের কতকগুলি শব্দ পড়িতে ও লিখিতে দেওয়া আবশ্যক। এই প্রকার 'য'ফলার সংস্কার জন্মিলে অন্যান্য ফলা ক্রমানুযায়ী উল্লিখিত প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(২) অন্যান্য সংযুক্ত বর্ণ

যেমন ক্ক, ক্ত, ফলা অর্থাৎ ঙ, ঞ, ন, ণ, ম এই কয়টী বর্ণান্ত বর্ণের সহিত স্বস্ব বর্গের বর্ণ যোগ, শ, ষ, স, দ ইত্যাদির সহিত বর্গীয় বর্ণের যোগ দ্বিত্ব ভাবাপন্ন বর্ণ ও অন্যান্য সংযুক্ত বর্ণ যেমন ক্ক, চ্ছ, ক্ত ইত্যাদি উল্লিখিত নিয়মে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। যে সকল বর্ণ ফলাযোগে ভিন্নরূপ ধারণ করে সেগুলি বিশেষ ভাবে দেখাইয়া শিক্ষা না দিলে বালক-দিগের সংস্কার জন্মে না। ফলা যুক্ত শব্দ শিক্ষা দেওয়ার সময় বর্ণবিশ্লেষ করিয়া বুঝা-ইয়া না দিলে বালকগণ বুঝিতে পারে না। যে যে সংযোগে যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা

বিশেষরূপে বুঝাইয়া বালকদিগের দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ লিখাইয়া তাহাদের মনে সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

মন্তব্য—বর্ণ হইতে ফলা পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রতি বর্ণ ও প্রতি শব্দের উচ্চারণ প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তদভাবে বালকেরা পড়িবার সময় যথারীতি উচ্চারণ করিতে পারে না ও প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয় না।

ষষ্ঠ, প্রবন্ধ পাঠ

প্রবন্ধ পড়িবার সময় ছাত্রগণ যাহা পড়ে তাহার উচ্চারণ যথাযথভাবে হয় কি না পাঠের স্বর ছেদশূন্য স্থানে ভঙ্গ হয় কি না দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন্ ইত্যাদি বিরাম চিহ্নগুলি যথাস্থানে দেওয়া হয় কি না প্রশ্নাত্মক, ক্রোধাত্মক, আশ্চর্য্যবোধক, খেদ-সূচক ইত্যাদি বাক্যগুলি পড়িবার সময় যথারীতি অভিঘাত হয় কি না ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া পড়াইতে পারিলে প্রবন্ধপাঠে উৎকৃষ্ট জ্ঞান জন্মে।

সপ্তম, পদ্যময় ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ পাঠ

পদ্যময় প্রবন্ধ পাঠের সময় যতি ঠিক পড়ে কি না, চিহ্নের অপব্যবহার হয় কি না লক্ষ্য রাখিয়া পড়ান আবশ্যক। বিশেষতঃ পদ্য পড়ার কালে প্রথমে ছন্দের সহিত পরিচয় জন্মাইয়া কোন্ ছন্দ কিরূপে পড়িতে হয় তাহার স্বর মিলাইয়া শিক্ষা দিলে পদ্য পাঠে বিশেষ জ্ঞান জন্মে। উচ্চসাহিত্য শিক্ষা দেওয়ার সময় ছন্দ অলঙ্কার ও রস ইত্যাদি কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যক হইয়া থাকে।

চতুর্থ প্রস্তাব

সাহিত্য

সাহিত্যশিক্ষা দ্বারা প্রধানতঃ পাঁচটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ১ম, ভাষাবোধ অর্থাৎ লিখিত ভাষা পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য বা উদ্দিষ্টভাব বুঝিবার ক্ষমতা লাভ। ২য়, রচনাশক্তি অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভাষাতে নিজ মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা। ৩য়, বিষয়-জ্ঞান-লাভ অর্থাৎ নানা বিষয়-সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ করিয়া সেই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ, পরীক্ষা, আলোচনা বা চিন্তাদ্বারা তৎসম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ। ৪র্থঃ, মনোবৃত্তির বিকাশ অর্থাৎ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ, অনুমান, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধীয় নানাবিধ মানসিক গুণ বা ক্ষমতালাভ ৫ম, জ্ঞানতৃষ্ণার উদ্রেক অর্থাৎ শিক্ষণীয় প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা দ্বারা তৎসম্বন্ধে কৌতূহল বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বিষয়াপেক্ষা ইহাতে অধিক সুখানুভব করিবার অভ্যাস।

উল্লিখিত ১ম ও ২য় উদ্দেশ্য অর্থাৎ ভাষা-বোধ ও রচনাশক্তিই সাধারণতঃ সাহিত্য-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হয়। ফলতঃ ভাষাজ্ঞান লাভই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু সাহিত্যশিক্ষা উপলক্ষে যে সকল পদ্য ও পদ্যময় প্রবন্ধ পাঠ করিতে হয়, তাহাতে নানাবিষয়ে ছাত্রগণের সাধারণ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই হেতু নানাবিষয়ে জ্ঞানলাভ করাও সাহিত্যশিক্ষার অন্যতর উদ্দেশ্য। অতএব যাহাতে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিষয়ের শিক্ষা হইতে পারে তৎপ্রতি শিক্ষকগণের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ যে স্থলে প্রাথমিক বিজ্ঞান অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানার্জ্জন না হয় সেস্থলে সাহিত্যশিক্ষা উপলক্ষেই ছাত্র-

গণের বিষয়জ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে এবং এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই মনোবৃত্তির বিকাশ ও জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা বলবতী হয়।

সাহিত্য শিক্ষা কয়েকটী বিভিন্ন অংশে বিভক্ত

১ম, অধ্যয়ন।—প্রবন্ধ পাঠ করিতে করিতে বিশুদ্ধরূপে পড়িবার জ্ঞান জন্মে তাহাতে বিশুদ্ধরূপে উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারা যায়।

২য়, শব্দার্থ শিক্ষা,—শব্দার্থ শিক্ষার দ্বারা শব্দের তদ্বোধ্য বস্তু, নাম, স্থান, জাতি বা ভাবের সহিত পরিচয় হয়। তাহাতে প্রবন্ধ পাঠে শব্দ পড়িবা মাত্রই তদ্বোধ্য বস্তু নাম ভাব ইত্যাদি স্বতঃই মনে উপস্থিত হয়। অতএব শব্দার্থ শিক্ষা দেওয়ার সময় যথাসম্ভব শব্দের তদ্বোধ্য জিনিসের সহিত পরিচয় জন্মাইয়া দিতে পারিলে উহা ছাত্রগণের স্মৃতিতে বদ্ধমূল হয়।

৩য়, ব্যাখ্যা, অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য্যবোধ। ব্যাখ্যা শিক্ষা দ্বারা লেখকের প্রবন্ধের ভাব গ্রহণ হয় এবং উপযুক্ত শব্দের ব্যবহার দ্বারা বাক্য রচনা করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবার শক্তি জন্মে।

৪র্থ, বিষয়জ্ঞান শিক্ষা অর্থাৎ প্রবন্ধ বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। এই শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রবন্ধটী যে বিষয়ঘটিত হয় সেই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানঘটিত প্রবন্ধ পড়াইবার সময় ছাত্রগণ-দ্বারা যথাসম্ভব দৃশ্যপদার্থ ও প্রাকৃতিক ঘটনার বিবরণ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ পরীক্ষা ও আলোচনা করাইয়া তাহাদের মনে দৃঢ়সংস্কার জন্মাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। ইতিবৃত্ত, নীতি, উপন্যাস প্রভৃতি ঘটিত প্রবন্ধ শিক্ষা দেওয়ার সময়ে তদ্বর্ণিত বিবরণ ও তাহাদের কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ প্রদর্শনপূর্ব্বক তদন্তর্গত উপদেশ ও মনোহর চিত্রগুলি ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলে উৎকৃষ্ট হয়। এরূপ শিক্ষায় জ্ঞানোন্নতি, মনোবৃত্তির বিকাশ ও তদ্দ্বারা স্বকীয় চেষ্টায় জ্ঞানোপার্জ্জনের ক্ষমতা ও জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হয়। ইহাতে সাহিত্যশিক্ষার ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়।

৫ম, ব্যাকরণ—সাহিত্যশিক্ষার আর এক অঙ্গ ব্যাকরণ। যে যে রীতিতে বর্ণ মিলিত হইয়া শব্দ রচিত হয় ও শব্দ যোজনা দ্বারা বাক্য রচনা হয় সেই সমস্ত রীতিই ব্যাকরণের নিয়ম বলিয়া কথিত হয়। কবিতা রচনার নিয়ম অর্থাৎ ছন্দোনির্ণয় এবং অলঙ্কার শাস্ত্রও ব্যাকরণের শাখাস্বরূপ। ব্যাকরণ শিক্ষা দ্বারা ভাষাবোধ সম্বন্ধে সাহায্য হয় আর ব্যাকরণের নিয়ম সম্বন্ধে সম্যক্ সংস্কার না থাকিলে বিশুদ্ধ রচনার ক্ষমতা জন্মে না। এইজন্য প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা আবশ্যক। (ব্যাকরণ শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।)

৬ষ্ঠ, রচনা:—সাহিত্য-শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য রচনা প্রণালী জানাও বিশেষ দরকার, শব্দার্থ জ্ঞান ও বাক্যের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি জন্মিলেই অথবা ব্যাকরণের নিয়মগুলি আয়ত্ত থাকিলেই বিশুদ্ধ প্রবন্ধ লিখিতে পারা যায় এমন নহে। তজ্জন্য বহুল অভ্যাসের আবশ্যক। উৎকৃষ্ট রচনা পাঠ করিয়া তদনুরূপ ভাষাতে মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বারংবার রচনা করিলে এবং সেই সমস্ত রচনা সংশোধনের পর সংশোধিত অংশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পুনঃ পুনঃ রচনার অভ্যাস করিলে

পরিশুদ্ধ প্রবন্ধ লিখার ক্ষমতা জন্মে। এরূপ শিক্ষায় সাহিত্যশিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

৭ম, শ্রুতলিপি ও আদর্শলিপি শিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার অবশিষ্ট অঙ্গ। এ সম্বন্ধে নিম্নশিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই গ্রহণীয়।

সাহিত্যশিক্ষার যে যে অঙ্গের উল্লেখ করা হইল তন্মধ্যে শ্রুতলিপি আদর্শলিপি ও পাঠ শ্রবণ ও দর্শনশক্তির সহিত বাগ্‌যন্ত্রের ও হস্ত চালনাশক্তির সংযোগ স্থাপনের উপর নির্ভর করে। ইহা নিম্নশিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে, সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে এই সমস্ত অভ্যাস করান আবশ্যক। শব্দার্থ শিক্ষা ও বাক্যের তাৎপর্য্যবোধের ক্ষমতালাভের জন্য মনোমধ্যে শব্দের ও বাক্যের সহিত তদ্বোধ্য বিষয়গুলির এরূপ দৃঢ়সংযোগ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক যে ভাষা-পাঠ করিলেই তদ্বোধ্য ভাব আপনা হইতে মনোমধ্যে উদিত হয় অথবা ভাব মনে উদিত হইলে তাহা প্রকাশ করিয়া উপযুক্ত ভাষা বিনা চেষ্টাতেই স্মৃতিতে উপস্থিত হয়। এই সম্বন্ধে মনের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব মনোমধ্যে একসঙ্গে উপনীত হইলে তাহাদের মধ্যে এমন সংযোগ স্থাপিত হয় যে একটী ভাব মনে উদিত হইলে অন্যান্যগুলি বিনা চেষ্টাতেই মনে উপস্থিত হয়। যে স্মৃতিদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহাকে ভাবসংযোগ স্মৃতি বলা যায়। এই স্মৃতির বলে শব্দার্থ ও বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। এই শিক্ষা দানের জন্য শব্দ ও বাক্য এবং তদ্‌বোধ্য বিষয় পুনঃ পুনঃ ছাত্রগণের মনে যুগপৎ উপস্থিত করান একান্ত আবশ্যক। যেমন লিখন ও পঠন বর্ণ বা শব্দের ধ্বনি ও আকৃতির সহিত বাগ্‌যন্ত্রের ও হস্তচালনাশক্তির সংযোগ স্থাপনের উপর নির্ভর করে সেইরূপ শব্দার্থ ও বাক্যার্থ শিক্ষা শব্দের বা বাক্যের ধ্বনি ও আকৃতির সহিত তদ্বোধ্য মনোগত ভাবের সম্পর্কস্থাপনের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ ভাবসংযোগস্মৃতির উপর নির্ভর করে। এজন্য কেবল শব্দ বা বাক্যের অর্থশিক্ষা দেওয়ার সময় তদ্বোধ্য ভাব ভালরূপে বুঝাইয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা দ্বারা আলোচনা করান আবশ্যক। কোনও শব্দের অর্থস্বরূপ একটী প্রতিশব্দ বা কোনও বাক্যের তাৎপর্য্য স্বরূপ আর একটী প্রতিবাক্য বলিয়া দিয়া মুখস্থ করাইলে উচিতশিক্ষা হয় না। কারণ তদ্দ্বারা শব্দের বা বাক্যের বোধ্যবিষয়ের সহিত ছাত্রগণের পরিচয় হয় না।

কেবল বারম্বার উচ্চারণ দ্বারা দুইটী শব্দের বা বাক্যের ধ্বনির সহিত সংযোগস্থাপিত হয়। ইহাতে শাব্দিক স্মৃতির কার্য্য হয় অর্থাৎ একটী শব্দ মনে হইলে তাহার প্রতি-শব্দ কিংবা একটী বাক্য মনে হইলে তাহার প্রতিবাক্য মনে হয় কিন্তু তদ্বোধ্য বিষয় মনে হয় না সুতরাং এরূপ শিক্ষাতে বিষয়-জ্ঞান জন্মে না। ছাত্রগণ প্রবন্ধ পাঠ দ্বারা তিন প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে পারে (১) প্রবন্ধে উল্লিখিত পদার্থসমূহের রূপ শব্দ গন্ধ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ অথবা বর্ণিত দৃশ্য বা ঘটনাসমূহের প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন বর্ণনা দ্বারা সম্যক্ উপলব্ধ হইতে পারে না এইরূপ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের অভ্যাস-মূলক স্মৃতির উপর নির্ভর করে। এই জ্ঞান-লাভ এবং মনোমধ্যে ইহার স্থায়ী স্মৃতি নিবদ্ধ করিবার জন্য বারংবার বর্ণিত বিষয়গুলির প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা আবশ্যক। পদার্থ ও ঘটনার স্বরূপ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রদিগকে

মুখস্থ করাইলে কোন ফল হয় না। কারণ বর্ণনা মুখস্থ করাইলে বাগ্‌যন্ত্রের অভ্যাস দ্বারা শব্দের সংযোগ মাত্র স্থাপন করা যায় তাহাতে বর্ণিত বিষয়ের ভাব নিবদ্ধ হয় না এবং বিষয়-জ্ঞান জন্মে না। বিষয়ের সহিত পরিচয়ের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষা প্রয়োজনীয়। যে স্থলে প্রত্যক্ষ বা পরীক্ষা অসম্ভব সে স্থলে প্রতিমূর্তি ইত্যাদি প্রদর্শন করান এবং বহুবিধ চেষ্টার দ্বারা বিষয়টী বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ—কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান অর্থাৎ কোন স্থান বা সময়ের সহিত ঘটনার বা ব্যক্তির সম্বন্ধ বা ঘটনার সহিত পদার্থের গুণের সম্পর্ক ইত্যাদি জ্ঞান। যেমন শব্দের সহিত অর্থের বা পদার্থের সহিত নামের সম্বন্ধ কোন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ সংস্থাপিত নহে সেইরূপ কোনও সময়ে কোন্ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন বা কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ের সংযোগ কার্য্যকারণাদি কোন নৈসর্গিক সম্বন্ধমূলক নহে। কেবল ঘটনা বশতঃ এই সকল বিষয়ের সংযোগ হয়। সুতরাং পদার্থ শিক্ষার ন্যায় পরস্পর সংযুক্ত বিষয়গুলি যুগপৎ ছাত্রগণের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহাতে ভাবগুলি ছাত্রগণের মনে এরূপ ভাবে সংস্থাপিত হয় যে একটী ভাব মনে হইলে অপর ভাবগুলি আপনা আপনি মনে উপনীত হয় ও বদ্ধমূল হয় এ শিক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও আলোচনাই প্রধান উপায়।

তৃতীয়তঃ—পঠিত প্রবন্ধের এবং তৎসংসৃষ্ট বা তদানুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের কার্য্যকারণ সাদৃশ্য প্রভৃতি নৈসর্গিক সম্বন্ধ ঘটিত জ্ঞান কোন বিষয় সম্বন্ধে কেন এমন হয়? ইহার ফল কি? এরূপ কোথায় দেখা যায়? কি কি কারণে একটী বিষয় আর একটী বিষয়ের অনুরূপ বা বিপরীত ইত্যাদি জিজ্ঞাসামূলক জ্ঞানই এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। যে মানসিক বৃত্তি দ্বারা এই সকল জ্ঞান উদ্ভাবন করা যায় তাহাকেই যুক্তিপ্রয়োগশক্তি, বিবেচনাশক্তি কিংবা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি বলা যায়। এই বুদ্ধিবৃত্তির যত বেশী পরিচালনা করা যায় তত অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং তদ্দ্বারা তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শন ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, যে বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির যত বেশী অভ্যাস সেই বিষয়েই উহার প্রখরতা বেশী হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপলক্ষেই হউক বা সাংসারিক কার্য্যকলাপেই হউক যাহার বুদ্ধিবৃত্তি অধিক পরিচালিত হয় তাহারই যুক্তিপ্রয়োগদ্বারা কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ উদ্ভাবন করিবার ক্ষমতা ফলাফল জ্ঞান বা অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান অধিক হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার শিক্ষার স্থল উপস্থিত হইলে বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা ছাত্র-গণদ্বারা কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ উদ্ভাবন করাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কোন বিষয়ে কার্য্যকারণাদি সম্বন্ধ একবার জানিতে পারিলে যে শক্তিদ্বারা তাহা মনে দৃঢ় নিবিষ্ট হয় তাহাকে ভাব-সম্বন্ধ-স্মৃতি বলে। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা দ্বারা যে সকল কার্য্যকারণাদি নৈসর্গিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম হয় তদ্বিষয়ক স্মৃতিই স্থায়ী হয়। যদি কোনও বিষয়ের নৈসর্গিক সম্বন্ধসূচক জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যদ্বারা আয়ত্ত না হয় তবে ভাব-সম্বন্ধ-স্মৃতির কার্য্য হয় না। এই এই কারণ বশতঃ এই এই ঘটনা ঘটে, ঐতিহাসিক বিবরণের ন্যায় বারংবার আলোচনা দ্বারা ভাবসংযোগ-স্মৃতির বিষয়ীভূত করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহাতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ

জ্ঞান জন্মে না সুতরাং ঐ জ্ঞান সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হয় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে তিন প্রকার স্মৃতির কার্য্যই দেখিতে পাওয়া যায়। ১ম শাব্দিকস্মৃতি ইহা দ্বারা কোন বিষয়জ্ঞাপক শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করিতে পারা যায়। ২য়, ভাবসংযোগস্মৃতি ইহাদ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধ কতগুলি ভাব ইতিহাস শিক্ষার ন্যায় মুখস্থ করা যায়। ৩য়, ভাব-সম্বন্ধগত স্মৃতিঃ—বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগদ্বারা কোন বিষয়সংক্রান্ত কার্য্যকারণাদি-সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ করিয়া বিষয়টী এই ভাব-সম্বন্ধগত স্মৃতির বিষয়ীভূত করিয়া লওয়া যায়। উল্লিখিত তিন প্রকার স্মৃতির মধ্যে শাব্দিক স্মৃতির কার্য্য নিতান্ত বাহ্য তাহাতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। ভাবসংযোগ স্মৃতির কার্য্য শাব্দিকস্মৃতির কার্য্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কারণ তাহাতে ভাবগুলির সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য হয় না বলিয়া প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। ভাবসম্বন্ধগত স্মৃতির সাহায্যে যে শিক্ষা হয় তাহাই প্রকৃত-জ্ঞান। তাহা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হয় ও সম্যক্‌রূপে প্রকৃতিগত হইয়া যায়। ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ও জ্ঞান অর্জ্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র রায়

তাজমহল

তাজমহল আগরা নগরের অদূরবর্ত্তী যমুনা নদীতীরস্থ এক অপূর্ব্ব সমাধি মন্দির। দিল্লীর পঞ্চম মোগলসম্রাট সাহজাহাঁ, স্বীয় প্রিয়তমা মহিষীর স্মৃতিরক্ষার জন্য এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার ন্যায় নয়নাভিরাম, সুষমা হর্ম্ম্য পৃথিবীতে আর নাই। একাল পর্য্যন্ত যতপ্রকার সুদৃশ্য সমাধি-সৌধে এই বিশাল বসুধাবক্ষ বিশোভিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই তাজমহলই যে সর্ব্ব-প্রধান—পৃথিবীর সপ্তদশ আশ্চর্য্যের (Seventeen Wonders) একতম বলিয়া পরিগণিত, সমগ্র সৌধের বরণীয়, শীর্ষস্থানীয় ও মুকুটমণি-রূপে সর্ব্বত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাহা সম্পূর্ণ অসংশয়িতরূপেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আমরা গৃহস্থের সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে, তাজমহলের আমূল ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করিতেছি।

তাজের নামতত্ত্ব

যে মহীয়সী মহিলার সমাধি ও স্মৃতিরক্ষা কল্পে তাজমহল নির্ম্মিত হয়, তিনি ভুবনসুন্দরী নুরজাহানের দ্বিতীয় ভ্রাতা, 'আসফ খাঁ' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ মন্ত্রবর মির্জ্জা আবুল-হোসেনের কন্যা। তাঁহার আদি অর্থাৎ মাতা-পিতৃদত্ত নাম ছিল 'আর্জ্জমন্দবানু' কিন্তু সময়ে সময়ে তিনি 'খুসিদা' ও 'নবাব আলিয়া বেগম' নামেও অভিহিতা হইতেন। অবশেষে সম্রাট সাহজাহাঁর পত্নীপদ লাভ করায়, তাঁহার উক্ত তিন নামই ক্রমে ক্রমে রহিত হইয়া যায় এবং তিনি প্রথমে 'মমতাজ-ই-জিমানী' ও পরে 'মমতাজ-ই-মহল' নামে পরিচিতা ও প্রসিদ্ধা হইয়া উঠেন আর তাঁহার শেষ নামের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বা শেষাংশ লইয়াই, এই অপূর্ব্ব অট্টালিকার 'তাজমহল' নাম প্রখ্যাত হইয়া উঠে। শুনা যায়, আর্জ্জমন্দবানু আরো আসাল খাঁ নামা এক বিখ্যাত আমীরকে

পতিত্বে বরণ করেন এবং তাঁহার সহবাসসুখে পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে থাকেন কিন্তু একবার কোনও 'নবোজা' কি 'গোস-রোজ' উৎসব উপলক্ষে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রাসাদদুর্গে, আগরার 'লাল কেল্লা'য় আহূত হইয়া, স্বামীর অনভিমতে সাহজাদা খরমের নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও তাঁহার আলয়ে রাত্রিবাস করায়, স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন এবং পরিশেষে খরমের দ্বারা সসমাদরে পরিগৃহীতা ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীরূপে পরিগণিতা হইয়া উঠেন। সেই ঘটনার অব্যবহিত পরে জামাল খাঁ সংসারধর্ম্মে বীতস্পৃহ হইয়া দেশত্যাগী হন এবং আর্জ্জমন্দবানু যুবরাজের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া, পরমসুখে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে থাকেন। অতঃপর সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, খরম 'সাহাবুদ্দীন মহম্মদ সাহজহাঁ' নাম ধারণ পূর্ব্বক দিল্লীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং পত্নী আর্জ্জমন্দবানুকে পট্টমহিষী পদে অভিষিক্ত ও 'মমতাজ-ই-মহল' নামে পরিচিত করিয়া, তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করেন। সম্রাট মমতাজকে বড় ভাল বাসিতেন, আপনার প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ করিতেন এবং অহরহঃই তাঁহার চিত্ত-বিনোদনে, প্রীতিবিধানে নিরত থাকিতেন। এই মমতাজের গর্ভেই তাঁহার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দারা, সুজা, আরঙ্গজেব ও মোরাদ নামক পুত্র চতুষ্টয় এবং জাঁহানারা, রোশনারা ও গার্জ্জিনা নাম্নী তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মমতাজ নুরজাহানের ন্যায় রূপবতী, বুদ্ধিমতী ও চতুরা ছিলেন না বটে কিন্তু তাঁহার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবতী ছিলেন। অনন্যসাধারণ পাতিব্রত্যই তাহার মূল কারণ। তিনি স্বামিভক্তির সাক্ষাৎ আদর্শস্বরূপিণী ছিলেন। কিসে সম্রাটের মনস্তুষ্টিবিধান, আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, কিসে তাঁহার অভাব অসুবিধা নিবারণ করিয়া জীবনের সুখশান্তি বাড়াইয়া দিবেন, তাহাই যেন তাঁহার একমাত্র প্রাণের কামনা ও জীবনের ব্রতস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে শোকে, সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়েই স্বামীর সাহচর্য্য ও অনুবর্ত্তন করিতেন এবং তাঁহার জন্য, তাঁহার সুখ সাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠা বা দ্বিধাবোধ করিতেন না। সেই সুদুর্ল্লভ পতিপরায়ণতাগুণেই সম্রাট সাহজহাঁ তাঁহার একান্ত অনুরাগী ও বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন আর সেই অনুরাগ ও বশ্যতাবশতঃই এই জগদ্বিখ্যাত সমাধিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার নামেই ইহার এই 'তাজমহল' নাম করণ। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, 'মমতাজ-ই-মহল' নাম হইতে 'তাজমহল' নামের উদ্ভব হইলেও, যে আগরা নগরে ইহার অবস্থান, সে নগরের বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম পল্লীর অধিবাসীরা ইহাকে 'তাজমহল' নামে অভিহিত করে না!—'তাজ-কা-রৌজা' বা সংক্ষেপতঃ 'রৌজা' বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যেখানে, যে নামেই উল্লিখিত হউক না কেন, ইহার 'তাজমহল' নামই যে প্রসিদ্ধ ভুবন-বিশ্রুত, তাহা কাহারও রহিত বা অস্বীকার করিবার শক্তি নাই।

তাজনির্ম্মাণের কারণ

কারণই কার্য্যোৎপত্তির মূল। কারণ ব্যতীত সংসারের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না—ইহাই জগতের নিয়ম, বিশ্বসৃষ্টির চিরন্তন নীতি। তবে কারণ যেমন, তাহার কার্য্যও তদনুরূপ। সামান্য কারণ হইতে অসামান্য বা মহৎ কার্য্যের সমুৎপত্তি যেন

কেমন একটু বিসদৃশ, অসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে, সংসারের তাবৎ কার্য্যেই প্রায় এভাব, এই বিসদৃশ রীতি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রতম কারণ হইতে বৃহত্তম কার্য্যের উৎপত্তি, সামান্য সামান্য বিষয় হইতে প্রধান প্রধান বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া প্রভৃতি যেন সংসারের নিত্যঘটনা মধ্যেই পরিগণিত। অধুনাতন সভ্যসমাজের প্রধান আবিষ্ক্রিয়াসমূহ—সময় নির্ণায়কযন্ত্র, বাষ্পীয়পোত বা শকট, মাধ্যাকর্ষণ, দূরদর্শনযন্ত্র প্রভৃতিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল আর যে সমাধি সম্রাটের, তাজমহলের প্রসঙ্গ লইয়া আজ আমরা আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণের সমীপস্থ হইয়াছি, তাহাও সেইরূপ এক তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, নগণ্য কারণপ্রসূত। সামান্য ব্যসন বিশেষের অমৃতময় ফল ভিন্ন কিছুই নহে। একদা সম্রাট সাহজহাঁ মহিষী মমতাজের সহিত তাসক্রীড়া (সম্ভবতঃ 'বিস্তি' খেলা) করিতে করিতে পরাস্ত হন এবং তাঁহার ক্রীড়া-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে পুরস্কার দানে, তাঁহার কোনও প্রার্থনা পরিপূরণে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মমতাজ প্রথমতঃ তাহাতে অসম্মত হন—সম্রাটের স্নেহমমত্ব ব্যতীত এসংসারে তাঁহার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই বলিয়া, পুরস্কার-গ্রহণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন কিন্তু পরিশেষে স্বামীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠেন,—"একান্তই যদি আমার প্রার্থনা পূরণ আপনার অভিপ্রেত হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন ব্যবস্থা করুন, যাহাতে আমার নাম চিরস্মরণীয় হয়। আমি মরিয়া গেলেও লোকে যেন আমার কথা ভুলিয়া না যায়।"

রাণীর প্রার্থনা শুনিয়া সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—"বেশ কথা আমি তাহাতে প্রস্তুত আছি কিন্তু কিসে, কি করিলে সেরূপ হইতে পারে, তুমি তাহার একটা উপায় বলিয়া দাও।"

মমতাজ পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমি স্ত্রীলোক, আমি আবার আপনাকে কি উপায় বলিয়া দিব? আপনি নিজে যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করুন। আমাকে প্রার্থনা করিতে বলিলেন, আমি প্রার্থনা করিয়াই নিরস্ত হইলাম।"

সম্রাট্ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন এবং বহুক্ষণ নীরবে কত কি চিন্তা করিয়া শেষে বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা তাহাই হইবে, আমিই তাহার ব্যবস্থা করিব। কি করিব জান—তোমার সমাধির জন্য এমন এক অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সৌধের প্রতিষ্ঠা করিব, পৃথিবীতেও যাহার সমকক্ষ বা দ্বিতীয় থাকিবে না। সেই সমাধি-সূত্রে তোমার নাম অক্ষয় হইবে, তুমি সংসারে চিরস্মরণীয়, অমর হইয়া থাকিবে।"

সম্রাটের কথা শুনিয়া মহিষীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বামীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া, ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"নাথ আমার ভাগ্যে সে সুখ কি ঘটিবে? আমি ইহসংসার হইতে অপসৃত হইলে, আমার কথা কি আর সম্রাটের স্মরণ থাকিবে? তখন হয়ত—"

"প্রিয়তমে—" মমতাজের কথায় বাধা দিয়া, দৃঢ়তাসূচক মধুর বাক্যে সাহজহাঁ উত্তর করিলেন,—"প্রিয়তমে, আমার ভালবাসার প্রতি এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে? প্রাণাধিকে, জীবন থাকিতে আমি কি তোমাকে ভুলিতে পারি? তোমার

প্রতি আমার যে ভালবাসা তাহা অকৃত্রিম, সে ভালবাসার স্বার্থের সংস্রব নাই। তাহা পরম পবিত্র, যেমন অপরিমেয়, তেমনই অবিনশ্বর, সামান্য পার্থিব বিচ্ছেদে, তোমার মৃত্যুতে তাহা কি কখনও অপনীত হইতে পারে? ভগবান না করুন, তোমার মৃত্যুর পরেও যদি আমাকে এই পৃথিবীতে থাকিতে হয়, তাহা হইলে, তুমি নিশ্চিত জানিও—আমি দারান্তর পরিগ্রহ করিব না। যত দিন জীবিত থাকিব, তোমার প্রেমময়ী মূর্ত্তিরই পূজা করিব। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, কখনই এ কথার অন্যথা হইবে না। আর সমাধি-মন্দিরের কথা, তাহা তোমার জীবদ্দশাতেই সমাধা হইয়া যাইবে। তোমার সংশয় ভঞ্জনের জন্য, আগামী কল্য হইতেই তাহার সূত্রপাত করিব। ইতোমধ্যে যদি আমার মৃত্যু না হয়, ভগবান যদি আর কিছুকাল আমাকে এই পৃথিবীতে থাকিতে দেন, তাহা হইলে স্বচক্ষেই তুমি তোমার সেই অপূর্ব্ব সমাধি মন্দির দেখিয়া যাইতে পারিবে।"

মমতাজ আনন্দে আত্মহারা, বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং কল্পনা বলে স্বীয় নেত্র সমক্ষেই যেন সেই ভাবী সমাধি সৌধের বিচিত্র সৌন্দর্য্য-শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

সাহজহাঁ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিলেন না। মমতাজের নিকটে যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেই রূপই করিলেন—তাহার পর দিবস হইতেই সমাধি নির্ম্মাণের সূত্রপাত, আরম্ভ করিয়া দিলেন। সামান্য কারণ হইতে তুচ্ছ তাঁসক্রীড়া হইতেই এক মহৎ কার্য্যের সূচনা হইল—জগতের অদ্বিতীয় সমাধি-সৌধের, তাজ মন্দিরের গঠন আরম্ভ হইল! কিন্তু মহিষী মমতাজের মনের ইচ্ছা, প্রাণের কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি নিজ সমাধি মন্দিরের পরিসমাপ্তি দেখিতে পাইলেন না। তাজের প্রায় অর্দ্ধাংশের নির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতেই, তাঁহার জীবন-নাটকের অভিনয় সাঙ্গ হইল। কালের আহ্বান আসিল। মহিষী আপনার শেষ সন্তান মার্জ্জিনা বেগমকে প্রসব করিয়া সূতিকা-গৃহেই মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য অনেক চেষ্টা হইল, অর্থব্যয় ও পরিচর্য্যা প্রভৃতির দ্বারা যাহা হইতে পারে তার কোনও ত্রুটি হইল না কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। মমতাজ বাঁচিলেন না। সম্রাট্ তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য, সাশ্রুনেত্রে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মহিষী ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত খানি ধারণ করিয়া, নিজের বক্ষোপরি স্থাপন করিলেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে, জড়িতস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"প্রাণেশ্বর, আজ আমার শেষ দিন। আজ আমার সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই ত আপনাকে বলিয়াছিলাম—এবার আর আমার নিস্তার নাই, যখন গর্ভের মধ্যে সন্তানের রোদনধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, তখন শীঘ্রই আমাকে এ সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। জাহাঁপনা, আজ আমার সেই গমনের দিন। এখনই আমার জীবনলীলার অবসান হইবে। এ জীবনে আর আপনাকে দেখিতে পাইব না।" মমতাজ কাঁদিয়া ফেলিলেন; তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

"মহিষি!—" অশ্রুমোচন করিতে করিতে সম্রাট্ বলিলেন,—"মহিষি, প্রিয়তমে, সত্যই কি তুমি আমাকে ছাড়িয়া চলিলে?

তোমার ত এখনও মরিবার সময় হয় নাই। তোমার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, এখনও যে অনেক অফলবতী রহিয়াছে, মহিষি ?"

"না, জাহাপনা, আমার কোনও সাধ বাসনাই আর অপূর্ণ নাই"—দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বাষ্প-গদ্গদ-কণ্ঠে মমতাজ উত্তর দিলেন,—"আপনার পবিত্র সহবাসে আমি যে সুখভোগের অধিকারীণী হইয়াছিলাম, তাহা কয়জন স্ত্রীলোকের ভাগ্যে সংঘটিত হয় ? তবে আর অধিক দিন ভগবান আমাকে তাহা ভোগ করিতে দিলেন না, এই যা' দুঃখ কিন্তু সে দুঃখও দুঃখ বলিয়া বোধ করিব না, যদি এখন, এই অন্তিমকালে আবার আপনার মুখে সেই প্রতিশ্রুতির কথাগুলি শুনিতে পাই।"

সম্রাট্ রাণীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কাতর ভাবে বলিয়া উঠিলেন, —"প্রাণেশ্বরি, কেন বৃথা সন্দেহ করিয়া ক্লেশ পাইতেছ ? আমি বহুবার শপথ করিয়া যাহা বলিয়াছি জীবন থাকিতে কখনই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না। তোমার তৃপ্তির জন্য আবার বলিতেছি—এজীবনে আর আমি বিবাহ করিব না, সতত তোমার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিব।"

মমতাজের অশ্রুসিক্ত বদন মণ্ডল সহসা দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎকাল সপ্রেম দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কম্পিত কণ্ঠে ভগ্নস্বরে উত্তর করিলেন,—"না, জাহাপনা, আর আমি সে সন্দেহ করিতেছি না। আমি ভাবিতেছি—" মমতাজ আর কথা কহিতে পারিলেন না। এতক্ষণ উত্তেজনা-সহকারে সম্রাটের সহিত বাক্যালাপ করিয়া, মহিষী ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, এখন সেই ক্লান্তি বর্দ্ধিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল। তিনি ম্লানমুখে অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহিষীর মৃত্যুকাল সমাগত দর্শনে, সম্রাটের শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল কিন্তু তিনি বহুকষ্টে সে ভাব সংবরণ করিয়া, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—সমাধির কথা ?—তোমার সমাধি মন্দিরের কথা ভাবিতেছ ? তাহাতে আর ভাবনার বিষয় কি আছে মহিষি ? যখন তোমার সমক্ষে, ঈশ্বরের নাম গ্রহণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আর তাহার নির্ম্মাণকার্য্যও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন আর তাহার সমাপ্তির সম্বন্ধে কি সন্দেহ থাকিতে পারে ? অনর্থক সন্দেহ করিয়া কেন কষ্ট পাইতেছ ? মমতাজ, প্রাণেশ্বরি, নিরুদ্বেগ হও। আমার কোনও কথাই মিথ্যা বা নিষ্ফল হইবে না। আমি নিশ্চিতই তোমার সমাধি মন্দির সম্পূর্ণ করিব।"

মমতাজ এতক্ষণ যাহা শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন, তাহা শুনিলেন। তাঁহার চঞ্চল হৃদয় স্থির হইল। মৃত্যু-কালিমা-মলিন শীর্ণ মুখমণ্ডল সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সমস্ত শরীরে সজীবতার তাড়িত শক্তি পরিভ্রমণ করিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখকমলে কালের ভীষণ ছায়া নিপতিত হইল। তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন এবং অতিকষ্টে অস্পষ্ট ভগ্ন স্বরে,—"নাথ, আমার সমাধির কথা যেন ভুলিবেন না—"এই কথা কয়েকটী উচ্চারণ

করিয়াই নীরব হইলেন। তাঁহার খঞ্জন-তুল্য চঞ্চল নয়নযুগল মুহূর্ত্ত মধ্যেই অচঞ্চল ও চিরদিনের মত নিমীলিত হইয়া গেল! স্বামীর দক্ষিণ হস্ত খানি দৃঢ়রূপে বক্ষে ধারণ করিয়া সাধ্বী মমতাজ, ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রাণহীন দেহ শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল!

মমতাজ চলিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাঁহার স্বামীর প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নিজের যে মোহিনী-মূর্ত্তিখানি অঙ্কিত করিয়া গেলেন, কস্মিন্-কালেও আর তাহা অপনীত হইল না। সম্রাট্ স্বীয় প্রতিজ্ঞা-বাক্যের সহিত তাঁহার সেই প্রেমময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া চির দিনই বিপত্নীক রহিলেন এবং অনন্যমনা, অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাজ নির্ম্মাণেই আত্ম-নিয়োগ করিলেন। বহুবর্ষের প্রাণপণ যত্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয়ে অবশেষে তাঁহার আশা ফলবতী হইল, তাজমহলের নির্ম্মাণ শেষ হইয়া গেল। মহিষী মমতাজ মরিয়াও অমর হইয়া রহিলেন!

তাজের অবস্থিতি স্থান

আগ্রানগর হইতে একক্রোশ এবং 'লাল কেল্লা' হইতে কিঞ্চিদূন দেড়ক্রোশ দূরে, যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে, এক প্রাচীর পরি-বেষ্টিত প্রকাণ্ড উদ্যান মধ্যে তাজমহল অব-স্থিত। প্রাচীর সুন্দর ও মূল্যবান লোহিত প্রস্তরে (Sand stone) গঠিত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ১,৮৬০ এক হাজার আট শত বাইট ফুট বা ১,২৪০ এক হাজার দুইশত চল্লিশ হস্ত দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে ১,০০০ এক হাজার ফুট বা কিঞ্চিদূন ৬৬৭ ছয়শত সাতষট্টি হস্ত বিস্তৃত। সেই বিশাল পাষাণ প্রাচীরের চারিকোণে চারিটী অত্যুচ্চ চূড়া (Turrets) এবং তিন দিকে তিনটী উচ্চ তোরণ বিরাজ-মান, আর অপর দিকে নীল নীরদময়ী কালিন্দী কুলকুল নাদে প্রাচীরমূল চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। তোরণ তিনটীর মধ্যে যেটী সর্ব্বোচ্চ সুবিশাল ও অতীব সুদর্শন সেইটীই তাজ প্রবেশের প্রধান ও প্রশস্ত পথ। উহার উপরিভাগে 'সারাসেনিক' (Saracenic) আদর্শে, প্রাচীন আরবীয় ভাস্করশিল্পের অবিকল অনুকরণে গঠিত এক সুদৃশ্য সূক্ষ্মাগ্র খিলান ও ক্ষুদ্র স্তম্ভ সমন্বিত চারিটী সুরম্য স্তম্ভগৃহ (Kiosk)আর তদুপরি ষড়বিংশ সংখ্যক সুর-চিত সুবর্ণ কলস শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সংরক্ষিত। সেই স্তম্ভগৃহ ও কলস সমন্বিত বিরাট তোরণ সপ্তবিধ ভাস্কর-শিল্পের, অপূর্ব্ব কারুকৌশ-লের এক বিচিত্র নিদর্শন। যেমন মনোহর, নেত্র তৃপ্তিকর, তেমনই অভ্রভেদী—তোরণ-মূলে দণ্ডায়মান থাকিয়া শীর্ষদেশে দৃষ্টিপাত করিলে মস্তক বিঘূর্ণিত হয় এবং মস্তকের আবরণ, শিরস্ত্রাণ বা পাগড়ী স্খলিত ও ভূপতিত হইয়া থাকে। সেই উচ্চ, বৃহদা-কার তোরণ এক সুপরিসর সমুন্নত প্রস্তর বেদীর উপরে সংস্থাপিত। লোহিত প্রস্তর-রোচিত সোপান শ্রেণী অতিক্রম করিয়া সেই বেদীর মধ্যস্থলে, সমচতুষ্কোণ মার্জ্জিত প্রস্তর টাইলে সমাবৃত তোরণ মধ্যে উপস্থিত হইলে সম্মুখভাগে এক ঘন সন্নিবিষ্ট শ্যামল বিটপি-রাজি সমাচ্ছন্ন, নন্দননিন্দিত প্রকাণ্ড উদ্যান নয়নপথে পতিত হয়। তোরণ-মূল হইতে অসংখ্য সরল প্রস্তর-পথ ইতস্ততঃ প্রসারিত হইয়া সেই উদ্যানটীকে বহু চতুষ্কে, সমচতু-ষ্কোণ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। সেই সকল উদ্যান-খণ্ড আবার নানা জাতীয় অগ-ণিত দৃষ্টিরম্য তরুগুল্মে সমাকীর্ণ, ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু বিচিত্র ও পুষ্পিত লতা পাদপে পরি-

শোভিত। দেখিলে মুগপৎ নয়ন ও মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

কতকগুলি সুগঠিত, দীর্ঘ ও অনুচ্চ প্রস্তর সোপানযোগে উদ্যানতলে অবতরণ করিলে, প্রথমেই দুইটী সরল ও সমাবয়ব প্রস্তর-পথ দৃষ্টিগোচর হয়। পথ দুইটী দুইশ্রেণী সমোচ্চ-সমশীর্ষ 'সাইপ্রেস্' (Sypress) তরুর মধ্য দিয়া, সম্পূর্ণ সমান্তরভাবে উদ্যানমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সেই ছায়াশীতল ও ঈষৎ অন্ধকারময় পথদ্বয়ের মধ্যস্থলে নির্ম্মল জল-পূর্ণ ও বহু জলজ উদ্ভিদ সমাকীর্ণ এক অপরিসর, অগভীর দীর্ঘ খাত। খাতমধ্যে ত্রিংশতী সংখ্যক কৃত্রিম প্রস্রবণ, নিয়ত সলিল উদ্গিরণ করিয়া সেই বিশাল উদ্যানের শৈত্যবিধান করিতেছে! প্রস্রবণ তলে শ্বেত ও লোহিত বর্ণের অগণিত চিনীয় মৎস্য দলে দলে ভ্রমণ ও ক্রীড়া করিয়া, সেই পথচারী পথিকদিগের নয়নমন মোহিত করিয়া দিতেছে। সেই বিচিত্র মৎস্য-সমাকুল খাতসহ প্রস্তরপথ দুইটী যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, তাহার পুরো-ভাগে, উদ্যানের ঠিক মধ্যস্থলে তুষার শুভ্র এক বৃহদাকার মর্ম্মর বেদী আর তদুপরি এক কমনীয়কান্তি, চারু দর্শন সুরম্য শ্বেত উৎস, অবিরত ঝরঝর শব্দে বারি বমন করিয়া, সেই দুগ্ধধবল শুভ্রবেদীর উপরে অসংখ্য মণি-মরকতাদির সৃষ্টি করিতেছে! সেই মনোহর মর্ম্মর-উৎসের সম্মুখভাগেই ভুবনবিশ্রুত তাজসৌধ দণ্ডায়মান।

তাজের বেদী

প্রথমেই তাজের লোহিত-প্রস্তর-গঠিত প্রথম অর্থাৎ ভূবিন্যস্ত বেদী বা আসন। উহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬৪ নয়শত চৌষট্টি ফুট ৬ ছয় ইঞ্চি অর্থাৎ কিকিদূন ৬৪৩ ছয়শত তেতাল্লিশ হস্ত, ৪৮০ চারিশত আশী ফুট বা ৩২০ তিন-শত কুড়ি হস্ত এবং আঠার ফুট বা ১২ দ্বাদশ হস্ত মাত্র। কয়েকটী দীর্ঘ, অনুচ্চ সোপান অবলম্বনে বেদীর উপরে আরোহণ করিতে হয়। বেদীর উপরিভাগ সমতল এবং শ্বেত ও লোহিত বর্ণের প্রস্তরফলকে সমাবৃত। উহার চারিকোণে চারিটী স্তম্ভ—সম্মুখের দুইটী মস্‌জিদের তুল্য আর পশ্চাতের দুইটী রথের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। চারিটী স্তম্ভই রক্ত প্রস্তরে রচিত, কেবল শেষের দুইটীর শিরোভাগ শুভ্র মর্ম্মরে বিমণ্ডিত। সেই স্তম্ভচতুষ্টয়-সমন্বিত ও শ্বেতরক্ত টাইল সমাবৃত সমতল বেদীর উপরিভাগে, মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার তাজের দ্বিতীয় বেদী —অষ্টাদশ ফুট বা দ্বাদশ হস্ত উচ্চ এবং ৩১৩ তিনশত ত্রয়োদশ ফুট সমচতুষ্কোণ অর্থাৎ প্রত্যেক পার্শ্ব কিকিদূন ২০৯ দুইশত নয় হস্ত পরিসর, সমস্তই সুচিক্কণ মসৃণ শুভ্র মর্ম্মরে মণ্ডিত সেই বেদীর চারি কোণ কর্ত্তিত আর কর্ত্তিত অংশে চারিটী বিচিত্র কারুকার্য্য সমন্বিত সুদৃশ্য, দীর্ঘ স্তম্ভ বা 'মিনার'। প্রত্যেকটীই হিমকুন্দসুশুভ্র শ্বেত মর্ম্মরে সংরচিত, ত্রিতল ও অষ্টভুজ গম্বুজ-বিশিষ্ট এবং ১৫০ একশত পঞ্চাশ ফুট বা শত হস্ত উচ্চ—মধ্যে সর্পবৎ সোপান-শ্রেণী, বক্রাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। স্তম্ভশীর্ষ অপরূপ শিল্পনৈপুণ্যময়, বিচিত্র-দর্শন মনোহর মর্ম্মর যবনিকা বা জালতি (Lattice-work) বিশেষের দ্বারা সমাবৃত। সেই স্তম্ভ যবনিকা-যুক্ত আকাশভেদী স্তম্ভচতুষ্টয়ের মধ্যে, দ্বিতীয় বেদীর সম্পূর্ণ মধ্যদেশে শ্বেতকায়, বিশাল ও নয়নাভিরাম তাজমন্দির বিরাজ মান।

তাজের আকৃতি

তাজমন্দির অষ্টকোণ ও অষ্টভিত্তি সমন্বিত।

আটটী ভিত্তির চারিটী বৃহৎ ও চারিটী ক্ষুদ্র। বৃহৎ ভিত্তিত্রয়ের সমচতুষ্কোণ অর্থাৎ প্রত্যেকটী ১৮৬ একশত ছিয়াশী ফুট বা ১২৪ একশত চব্বিশ হস্ত পরিসর। প্রত্যেক ভিত্তির উভয় পার্শ্বে ও মধ্যে দুই দুইটী শিল্পকৌশলময় মর্ম্মরদণ্ড বা ক্ষুদ্র গম্বুজযুক্ত সূক্ষ্ম স্তম্ভ ভিত্তি গাত্র আশ্রয় করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে, মধ্যস্থ স্তম্ভদ্বয়ের ব্যবধানে এক একটী প্রকাণ্ড প্রবেশ-পথ বা বৃহদাকার দ্বার। সে দ্বার উন্মুক্ত নহে, রুদ্ধ, শুভ্র মর্ম্মর-রচিত আচ্ছাদনী বা আফ্‌রি বিশেষের দ্বারা সমাবৃত। একটী মাত্র প্রবেশ পথ কেবল রুদ্ধ নহে—সম্মুখবর্ত্তী ভিত্তিগাত্রস্থ বিশাল প্রবেশদ্বারের নিম্নের কিয়দংশ মাত্র উন্মুক্ত কিন্তু সেই মুক্ত পথ আবার এরূপ অপরিসর ও অনুচ্চ যে একজন দীর্ঘাকৃতি লোকের পক্ষে অনায়াসে অর্থাৎ মস্তক অবনত না করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এরূপ বিরাটকায় সমাধি সৌধের প্রবেশ-পথ কেন যে এরূপ ক্ষুদ্রাকারে গঠিত হইয়াছে, আর তদ্দ্বারা সমগ্র প্রাসাদের গাম্ভীর্য্য, সৌন্দর্য্য-গৌরব খর্ব্ব করা হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে। অনেকে অনুমান করেন, তাজের ভাবী সম্ভ্রম-সংরক্ষণই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্রাট বুঝিয়াছিলেন, চিরদিন কখনই মোগলপ্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিবে না। এমন এক সময় নিশ্চিতই আসিবে, যখন, কি হিন্দু কি মুসলমান, সকলেই তাঁহার বংশীয়দিগের শাসন অমান্য করিবে—মস্তক নত করিয়া, সেলাম দিয়া, তাজের সম্মাননা রক্ষায় অগ্রসর হইবে না। কিন্তু দ্বারপথ অনুচ্চ হইলে, সে আশঙ্কা তিরোহিত হইবে, তাজ প্রবেশের সময়ে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলকেই, মস্তক অবনত করিয়া, তাজের মর্য্যাদা রক্ষায় বাধ্য হইতে হইবে। এই সামান্য কারণেই যে তাজের শোভা নষ্ট করা হইয়াছে, কেবল সেলাম আপ্রাপ্তির আশঙ্কায় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধিসৌধের এরূপ অঙ্গহানি করা হইয়াছে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না এবং উহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্যই উহার অপর কোনও বিশেষ কারণ ছিল, নানাকারণে এখন আর তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

তাজের সেই ক্ষুদ্র দ্বারপথ আবার আবরণ বা কবাট শূন্য সুতরাং উহার উন্মুক্ত কিন্তু প্রথম হইতেই যে সেইরূপ ছিল, তাজগৃহ সদা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখিবার অভিপ্রায়েই যে ইহার দ্বারে কবাট সন্নিবদ্ধ করা হয় নাই, তাহা কখনই সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয় না। শুনা যায়, এক সময়ে এই ক্ষুদ্র দ্বার সুন্দর দুই খানি রৌপ্য কবাটে সজ্জিত থাকিত। সেই কবাটদ্বয় আবার দশ সহস্র স্থূল রজত কীলকে (শুলমেষের অনুরূপ প্রেক্ বিশেষে) দৃঢ়ীভূত করা হইয়াছিল আর তদুপরি অর্থাৎ প্রত্যেক কীলকের উপরিভাগে এক একটী স্বর্ণমুদ্রা, পাতসাহী মোহর নিবদ্ধ ছিল। যেমন অপরূপ সমাধি মন্দির, তেমনই বিচিত্র তাহার দ্বারাবরণ! শ্বেত মর্ম্মর মন্দিরে মর্ম্মর কবাট বোধ হয় সেরূপ সুশোভন হইত না, তাই এই মোহর মণ্ডিত রজত প্রেক সমাকীর্ণ রজত কবাটের সংগঠন! কিন্তু সেই অপূর্ব্ব কবাট দুই খানি কিরূপে যে তাজের অঙ্গ ভ্রষ্ট বা বিনষ্ট হইল, তাহা কাহারও বিদিত নহে। অনুমান হয়, মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় কোনও দস্যুকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও স্থানান্তরিত হইয়া থাকিবে।

প্রাগুক্ত দ্বার চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীর উপরিভাগে একটী করিয়া সুন্দর খিলান। সেই খিলানের শীর্ষদেশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া, তাজের উপরিভাগে গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। খিলানের নিম্নে—দ্বারপথের উভয় দিকে এক একটী এবং উপরে ও নিম্নে দুই দুইটী বৃহদাকার কুলঙ্গীর মত স্থান (Niche) বা বাতায়ন। দ্বারপথের ন্যায় সেই বাতায়ন-পথও মুক্ত নহে—কারু কৌশলময় সূক্ষ্ম যবনিকা বা জাফরির দ্বারা সমাচ্ছাদিত। তাজগর্ভে প্রয়োজনানুরূপ বায়ু ও আলোক প্রবেশের সহায়তা করাই উহাদিগের প্রধান কার্য্য, ক্ষুদ্রভিত্তি চতুষ্টয় বৃহৎ ভিত্তি গুলিরই অনুরূপ। তবে উহারা কৃত্রিম দ্বারপথ-পরিশূন্য—উহাদিগের উপরিভাগে দ্বারের যবনিকারুদ্ধ কোনও প্রতিরূপই পরিদৃষ্ট হয় না।

অতঃপর তাজের শীর্ষদেশ বা ছাদ। ছাদ পূর্ব্ববর্ণিত আটটী ভিত্তির উপরে সংরক্ষিত। ক্ষুদ্র ভিত্তির উপরিভাগে অর্থাৎ ছাদের উপরে, তাজের প্রত্যেক কোণে আট আটটী স্তম্ভ সমন্বিত এক একটী ক্ষুদ্র গম্বুজ সেই ক্ষুদ্র গম্বুজ চারিটীর সম্পূর্ণ মধ্যভাগে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও খিলানযুক্ত শূন্যগর্ভ বিরাট গম্বুজ বা 'ডোম'। উহার পরিধি ১৪০ একশত চল্লিশ হাত, ব্যাস কিঞ্চিদধিক ৪৬।০ সাড়ে ছয়চল্লিশ হাত এবং উচ্চতা ৮০ অশীতি হস্তের ন্যূন নহে! উহার গঠন বর্ত্তুলের তুল্য—গোলকের তৃতীয়াংশ পরিত্যাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, অবিকল তাহারই অনুরূপ। সেই বিশাল গম্বুজের উপরে বৃহদাকার স্বর্ণকলস, কলসের উপরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আর একটী কলস আর সেই কলসের উপরিভাগে সূক্ষ্মাগ্র শূল স্বর্ণদণ্ডোপরি অর্দ্ধচন্দ্রের (Crescent) সুবর্ণময়ী সুবিমল মূর্ত্তি বিরাজিত—মৃত্তিকা হইতে অন্যূন ২৭৫ দুইশত পঁচাত্তর ফুট বা কিঞ্চিদধিক ১৮৩ একশত তিরাশী হাত উচ্চে নীলাকাশে ভাসমান! দেখিলে মনে হয়, যেন সপ্তমীর চন্দ্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য আকাশভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে! সেই অর্দ্ধচন্দ্রবিশোভিত প্রধান গম্বুজের মধ্যদেশ; খিলানের শীর্ষভাগ সুরম্য মর্ম্মরজাল বা যবনিকায় সংবেষ্টিত সেই যবনিকা যেমন সুঠাম, সুগঠন, তেমনই নয়নরঞ্জন, চিত্তবিনোদন—অতুলনীয় কারুকৌশলের অসাধারণ স্থাপত্যশিল্পের অদ্বিতীয় নিদর্শন। এ জগতে তাহার সদৃশ নাই, উপমা নাই—এই বিশাল পৃথ্বীমণ্ডলের কোথাও কোনও হর্ম্ম্যেই তাহার অনুরূপ বা সমকক্ষ মর্ম্মর-যবনিকা পরিলক্ষিত হয় না। সেই সুশোভন যবনিকাময় সুরচিত গম্বুজ, স্বর্ণকলস ও সুবর্ণময়ী চন্দ্রমূর্ত্তি সমন্বিত হিমকুন্দ ক্ষীরশুভ্র অদ্বিতীয় সমাধি-গর্ভে, ভাগ্যবতী মমতাজ তাঁহার ভাগ্যবান স্বামীর দক্ষিণ পার্শ্বে অনন্ত নিদ্রায় শায়িত রহিয়াছেন।

তাজের বহিঃ প্রকোষ্ঠ

ক্ষুদ্র দ্বারপথে তাজমন্দিরে প্রবেশ করিলে প্রথমেই দুইটী সমাধি বেদী এবং তৎপরে স্ফটিক-স্বচ্ছ গৃহ-প্রাকার বা মর্ম্মরভিত্তি আর পরিশেষে অর্দ্ধবর্ত্তুলাকার খিলানময় বিশাল ছাদগর্ভ নয়নপথে পতিত হয়। বেদীদ্বয় পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে অবস্থিত এবং চতুর্দ্দিক উচ্চ ও অষ্টকোণ বেষ্টনী বা জাফরি বিশেষের দ্বারা পরিবেষ্টিত। বেষ্টনী শ্বেতমর্ম্মর গঠিত এবং নানা শিল্পনৈপুণ্যময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রে, কুসুম ও কুসুম মাল্যাদির জীবন্ত প্রতিরূপ পরম্পরায় পরিশোভিত। দুইটী সমাধি-বেদীই চতুষ্কোণ—নিম্নদেশ হইতে ক্রমশঃ অপরিসর স্তরে স্তরে থাকে থাকে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহাদের

একটী বৃহৎ ও লোহিতাভ এবং অন্যটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও শুভ্রধবল। একটীর উপরে 'কলসদান' ও অপরটীর উপরে 'তক্তি' সংরক্ষিত। কিন্তু দুইটীই অসংখ্য মণিমাণিক্যে মণ্ডিত, বিবিধ বর্ণের দুর্লভ ও দুর্মূল্য প্রস্তরের প্রতিরূপে—পত্র, পল্লব ও ফুল মালার মনোহর সজীব চিত্রে সমলঙ্কৃত। ক্ষুদ্র বেদীতেই মণিরত্নের আতিশয্য—হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি রত্নাবলীর বিচিত্র সমাবেশ। অতি সুশোভন, মনোমোহন দৃশ্য! যে বেদীর উপরে 'কলসদান' বিদ্যমান, সেইটী পাতসাহ সাহজহাঁর আর যেটীতে 'তক্তি' বিরাজমান সেইটী মহিষী মমতাজ-ই-জীমানীর সমাধি। তাজমহল মমতাজের সমাধির জন্য বিনির্ম্মিত হইলেও, সম্রাট সাহজহাঁকেও পরিশেষে ইহার মধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল। সম্রাটের ইচ্ছাক্রমে এইরূপ হইয়াছিল কি তাঁহার কোনও পুত্র, পৌত্র বা অনুচর ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে তাজগর্ভে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর পার্শ্বে, সমাধি দিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে লিখিত নাই। যাহা হউক, সেই সমাধিগৃহের চারি কোণে চারিটী সমাবয়ব—২৩ ছাব্বিশ ফুট ৮আট ইঞ্চি বা কিঞ্চিদূন ১৮ আঠার হাত আয়তনের দ্বিতল কক্ষ অবস্থিত। কক্ষগুলি বেদীগৃহের সহিত সংযুক্ত। উহাদিগের প্রত্যেকটীর মধ্য দিয়া, বেদীগৃহে ও অন্য নানাদিকে, নানা পথ চলিয়া গিয়াছে। চারিটী কক্ষই গম্বুজের তুল্য আকৃতিবিশিষ্ট কিন্তু অতীব শোভন দৃশ্য। উহাদিগের অভ্যন্তর-ভাগে, ভিত্তিগাত্রাদিতে শ্বেত-প্রস্তর-রচিত পাত্র শ্রেণী আর তদুপরি নানাবর্ণের ও আকারের মহার্ঘ্য মণিমুক্তাদি খচিত, স্বাভাবিক আকার ও বর্ণ সমন্বিত কুসুমস্তবক ও পত্র, পল্লব প্রভৃতির সুন্দর প্রতিকৃতি সকল শোভা পাইতেছে। ফলতঃ তাজের এই বহিঃ-প্রকোষ্ঠের প্রত্যেক অংশ—কি সমাধি-বেদী, কি ভিত্তি-দেহ, কি বর্ত্তুলাকার ছাদ-মধ্য ও মনোহর মর্ম্মর যবনিকাযুক্ত খিলান শীর্ষ, সর্ব্বত্রই কারুকার্য্যময় প্রতিরূপ, উৎকীর্ণ চিত্রাবলী ও রঞ্জিত প্রস্তর খচিত প্রতিমূর্ত্তি (Mosaics) সমূহে সমাচ্ছন্ন। স্থাপত্য শিল্পের, সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যের সেরূপ নয়নমনোমোহন জীবন্ত ছবি জগতে দুর্লভ, কল্পনার পরীরাজ্যে কি স্বর্গেও সেরূপ আছে কি না সন্দেহের বিষয়।

তাজের অন্তঃপ্রকোষ্ঠ বা গর্ভ-গৃহ

উপরে যে সমাধি বেদীর বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা প্রকৃত নহে, কৃত্রিম অর্থাৎ উহার অভ্য-ন্তরে মহিষী মমতাজ বা তাঁহার প্রিয়তম স্বামী, সম্রাট সাহজহাঁ সমাহিত নহেন। উভয় সমাধি বেদীই শূন্যগর্ভ (Cenotaph)—মূল সমাধি-বেদীর অবিকল প্রতিরূপ বা ছায়া মাত্র। বহিঃপ্রকোষ্ঠের নিম্নতলে, বেদীদ্বয়ের সমসূত্রপাতে, নিম্নে আর যে দুইটী সমাধি বেদী আছে, তাহাই প্রকৃত বা সগর্ভ। তাজ মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রবেশপথও মর্ম্মরময় সমাধি-বৃত্তি, এই উভয়ের মধ্যস্থলে যে গহ্বর বা সুড়ঙ্গাকার পথ আছে, সেই পথের সাহায্যেই সেই সগর্ভ বেদীগৃহে প্রবেশ করিতে হয়। সমাধি শ্বেত মর্ম্মরময়ী অবতরণিকা বা সোপানাবলী অবলম্বনে সেই গহ্বর তলে অব-তীর্ণ হইলে, একটী অষ্টকোণ প্রকোষ্ঠ মধ্যে, উপরিতনের বেদীর সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দুইটী বেদী দৃষ্টিপথে পতিত হয়। সেই বেদী কক্ষ বা তাজের গর্ভগৃহ অধুনা অন্ধতমসাচ্ছন্ন—আলো-কের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই আর সেখানে নিরাপদে গমনাগমন ও সমাধি দর্শন সম্ভবপর হয় না। পূর্ব্বে অবশ্যই আলোকের কোনও সুব্যবস্থা ছিল—সম্ভবতঃ উপরের কোনও রন্ধ্র

বা ছিদ্র পথে উহার অভ্যন্তরে বহিরালোক লইয়া যাওয়া হইত অথবা গৃহমধ্যস্থ কি অন্যকোন স্ফটিকময় বাতায়ন বা দর্পণাদিতে কৌশলক্রমে সূর্য্যকিরণ পাতিত ও প্রতিফলিত করিয়া তদ্দ্বারা সমস্ত সমাধি-কক্ষ উদ্ভাসিত করা হইত! কালক্রমে সেই ব্যবস্থা রহিত হওয়ায় অথবা কোনও কারণবশতঃ আলোক প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা কি স্ফটিকময় বাতায়নাদির স্থানচ্যুতি সংঘটিত হওয়ায়, সে গৃহ এখন অন্ধকারময় ও ভীষণ ব্যাল, বৃশ্চিক, মূষিক, তৈলপায়িকা, প্রভৃতি প্রাণীর আবাস-ভূমিরূপে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে!

অনেকে আবার ঐ দ্বিতীয় সমাধিকেও অকৃত্রিম বলিয়া বোধ করে না। তাঁহারা বলেন,—'দ্বিতীয় সমাধিবেদীও অপ্রকৃত, শূন্যগর্ভ। উহার নিম্নে অর্থাৎ দ্বিতীয় গর্ভগৃহে যে দুইটী বেদী বিদ্যমান আছে, তাহাই প্রকৃত আর তাহারই অভ্যন্তরে, দুই সুবর্ণময় শবাধার বা কাফিন মধ্যে সপত্নীক সাহজহাঁ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন।' যাঁহারা এই মতের সমর্থন-কারী, তাঁহাদের যুক্তি এই যে, 'যদি দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে সম্রাট দম্পতীর স্বর্ণ শবাধার সমাহিত থাকিত, তাহা হইলে দস্যুরা অনায়াসে বা অল্পায়াসেই তাহা উত্তোলন ও আত্মসাৎ করিতে পারিত, কিন্তু তৃতীয় প্রকোষ্ঠ হইতে সে কার্য্য তাজের উৎপাটন ব্যতীত সম্ভবপর নহে।' তাজের এই অংশের পরিদর্শন কালে তত্রত্য রক্ষকের নিকটে আমরা ইহারই অনুরূপ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং দ্বিতীয় কক্ষের নিম্নে তৃতীয় কক্ষ বাস্তবিকই আছে কি না, জানিবার জন্য চেষ্টাও করিয়াছিলাম কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাজনিম্নে, গভীর অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে সর্পাদি হিংস্রপ্রাণীর এবং ভূত,প্রেত, পিশাচ ও রাক্ষসাদি অপদেবতার ভয় আছে বলিয়া, কেহই আমাদিগকে তাহার মধ্যে লইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই। কথিত আছে, তাজের তৃতীয় প্রকোষ্ঠ বা দ্বিতীয় গর্ভ-গৃহের নিম্নে মার্ব্বেল মণ্ডিত সোপান-সমন্বিত এক দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ বিদ্যমান আছে। সেই পথ মৃত্তিকার মধ্য দিয়া অন্যূন দেড় ক্রোশ পথ অতিক্রমপূর্ব্বক লাল কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তত্রত্য এক সুপরিসর স্বার্ব ভিত্তির ভিতর দিয়া 'মতি মসজিদ' নামা প্রসিদ্ধ প্রাসাদ মধ্যে গিয়া উন্মুক্ত হইয়াছে! শুনা যায় সম্রাটের অসূর্য্যম্পশ্যরূপা মহিষী ও অপরাপর অন্তঃপুরিকাগণ, অন্যের অলক্ষ্যে, এই পথে তাজমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতেন এবং তাজ দর্শন ও সময়ে সময়ে সুড়ঙ্গ মধ্যে, সম্রাটের সহিত, ধাবন কুর্দ্দনাদি করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন।

তাজের কারুকার্য্য

তাজের কারুকার্য্য অসাধারণ, একরূপ অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ণ-বৈচিত্র্যময়—নীল, পীত, হরিৎ, লোহিতাদি বর্ণের—নানা বিভিন্ন প্রস্তরের সাহায্যে, ভারত ও আরবদেশীয় স্থাপত্য শিল্পের, হিন্দু ও মুসলমান ভাস্কর্য্যের পরস্পর সম্মিলনে ফল ফুল, পত্র-পল্লব, লতা-গুল্মের অসংখ্য সজীব-চিত্রে এরূপ পরিপাটীরূপে, এমন নৈপুণ্য-সহকারে ও সন্তর্পণে তাজ রচিত, তাজের ভিত্তিগাত্র, বৃত্তি, যবনিকা ও ছাদ প্রভৃতি চিত্রিত করা হইয়াছে যে, দেখিলে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়। ফুলের যে পর্ণ, যে কেশরটি যে ভাবের, যে বর্ণের, পত্র বা পল্লবের যে শিরা কি যে বৃন্তটী যেরূপ, যেমন বর্ণবিশিষ্ট, ঠিক সেই ভাবের, সেই বর্ণের প্রস্তর পরম্পরার সাহায্যে তাহাকে অবিকল

সেইরূপে, সেইরূপ স্বাভাবিক ভাবেই গঠন করা হইয়াছে। সামান্য একটী কচু জাতীয় গুল্ম কি একটী ক্ষুদ্র ফলের প্রতিরূপ গঠন করিতে এত বিভিন্ন আকারের ও বর্ণের প্রস্তরাবলীর প্রয়োজন হইয়াছে যে, তাহার সংখ্যা নিরূপণই একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। তাজের প্রত্যেক মর্ম্মরফলকই প্রায় এইরূপ—এইরূপ প্রতিকৃতিপুঞ্জে, প্রস্তর সমাবেশে, চুনি, পান্না, এসব, অকীক প্রভৃতি মূল্যবান ও দুর্লভ মণি সংযোগে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন। সেই প্রস্তর সন্নিবেশক্রিয়া আবার এমন নিখুঁতরূপে, একপ দক্ষতা-সহকারে সংসাধিত, প্রস্তররাজি এমন সুন্দর-ভাবে সন্নিবদ্ধ, বিনিবেশিত, পরস্পর সুসংলগ্ন ও পরিমার্জ্জিত যে, বিশেষভাবে নিরীক্ষণ কি হস্তাবমর্ষণেও তাহাদের মিলনস্থল বিনির্ণয় কি উচ্চনীচতা অনুভব সম্ভবপর হয় না প্রতি-কৃতিগুলিকে কোনওক্রমেই কৃত্রিম বা প্রস্তর-রচিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। দেখিলে মনে হয়, যেন কোনও সুচতুর চিত্রকর তাজের ক্ষীরশুভ্র নির্ম্মল দেহে, তুলিকার দ্বারা, বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে, অতি সাবধানে, নিপুণ হস্তে, নানা আকারের ও বর্ণের বিবিধ প্রতিরূপ-সমূহ চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে! চিত্রণ ব্যতীত প্রস্তর সন্নিবেশের কি খোদকারীর দ্বারা কি অপর কোনও কৌশলে যে সেরূপ স্বাভাবিক চিত্র, জীবন্তমূর্ত্তিসমূহ অঙ্কিত হইতে পারে, তাহা চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বরঞ্চ সেই সকল কৃত্রিম, অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলিকে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম, অভিনব ও স্বভাবজ বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে আর বোধ হয়—কেহ যেন সজীব ফলফুল, শাখা-পল্লব ও লতা গুল্মাদি নিকটবর্ত্তী বন হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, এইমাত্র তাজগাত্রে বিনিবেশিত করিয়া গিয়াছে!

তাজের অভ্যন্তরস্থ, ভিত্তি-দেহ, সমাধি-বেদী, বৃত্তি বেষ্টনী, অন্তর্ব্বলিকা ও বর্ত্তুলাকার গৃহশীর্ষ প্রভৃতির শিল্প-চাতুর্য্য আবার আর এক অসাধারণ ব্যাপার—চাকচিক্যময় মসৃণ মর্ম্মর শিল্পের সহিত মণি চুণি পান্নাদি রত্ন-রাশির অপরূপ সংমিশ্রণ! সেই শিল্পরচনা—তাজের অন্তর্ভিত্তির সেই কমনীয় কান্তি বিচিত্র চিত্রাবলী, বহিঃভিত্তির প্রতিরূপ সমূহের কিঞ্চিৎ অনুরূপ হইলেও, তাহা অপেক্ষা বহু-গুণে গরীয়ান, বহুলাংশে মহান্ ও গাম্ভীর্য্যময় এবং মণিমরকতাদির সম্মিলন-সৌষ্ঠবে শত সহস্র গুণাধিক চিত্তাকর্ষক ও নয়ন রঞ্জন। উহাদিগের মধ্যে একরূপ আবার এক কৌশলময় বিচিত্র চারুচিত্র বিরাজমান যে, দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয় আর শত মুখে তাহার গৌরব কীর্ত্তন না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না সে চিত্র প্রচ্ছন্ন, গোলাকার গম্বুজ গর্ভে, অগণিত উৎকীর্ণ চিত্রের কৌশল-ময়ী শিল্পরচনার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত, যেন অতি সাবধানে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে! বিশেষ মনঃসংযোগসহকারে দেখিবার আন্ত-রিক ইচ্ছা হৃদয়ে লইয়া, যত্ন না করিলে কিছুতেই তাহা নয়নাদর্শে প্রতিবিম্বিত হয় না। উহা তাজেরই প্রতিকৃতি—আমূলাগ্র বিশাল তাজমন্দিরের এক নিখুঁত বিরাট চিত্র! তাজের অংশবিশেষের মধ্যে, উহারই এক অবিকল প্রকাণ্ড প্রতিরূপ উৎকীর্ণ করা বড় সাধারণ শক্তির পরিচায়ক নহে। ধন্য সেই শিল্পী আর ধন্য তাহার শিল্পচাতুর্য্যে এবং শতধন্য সেই ভাগ্যবতী সম্রাজ্ঞী মমতাজকে, যাঁহার সমাধিশীর্ষে এমন কারু কৌশলময় অপূর্ব্ব চিত্র স্থান পাইয়াছে!

তাজগাত্রের লিপি ও নির্ম্মাণের সময়

তাজদেহে, তাজের তোরণপথ, ভিত্তিগাত্র,

সমাধিবক্ষ প্রভৃতি নানাস্থানে নানালিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল লিপি পারসিক ভাষার 'তুম্‌খা' নামক বর্ণমালার সাহায্যে বিলিখিত—পাঠ করিলে তাজমহল সম্বন্ধে অনেক অপরিজ্ঞাত বিবরণ ও তৎসহ নীতি ধর্ম্মাদি সংক্রান্ত বহু উপদেশাদি অবগত হওয়া যাইতে পারে। পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সকল লিপি ভাষান্তরিত করিয়াছেন,—হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রাচ্য এবং ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি প্রতীচ্য মনীষীরা নানা ভাষায় তাহা অনুবাদিত করিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত অনুবাদের মধ্যে যেগুলি তাজমহল সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয়, আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য, মাত্র সেই গুলিরই সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ সংকলিত ও নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি।

প্রথমেই তাজোদ্যানের পরিবেষ্টক প্রাচীর-সংলগ্ন উচ্চ তোরণগাত্রের লিপি। এই লিপিই সকল লিপির পুরোবর্ত্তী। ইহাই প্রথমে তাজদর্শনার্থীর নয়নপথে পতিত হয়। এই লিপির প্রথমাংশেই এই কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে—"হে সরলমনা নির্ম্মলহৃদয় পান্থ! এই শান্ত রসাস্পদ স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ কর।" অতঃপর কয়েক পঙ্‌ক্তির পরে, নিম্নলিখিত কথা কয়েকটীর দ্বারা উক্ত লিপির উপসংহার করা হইয়াছে,—"১০৪৭ হিজরা সালে (খৃষ্টাব্দের ১৬৩৮ বর্ষে) তাজের নির্ম্মাণ সমাধা হইল।" প্রাগুক্ত লিপি ব্যতীত তাজের বহির্ভাগে আর কোন কথাই লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে তোরণ অতিক্রম করিয়া তাজের বেদীর উপরে উপস্থিত হইলে দুই এক স্থলে দুই এক কথা উৎকীর্ণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তাজের ভূবিন্যস্ত বা লোহিত বেদীর সম্মুখবর্ত্তী দুই কোণে যে মসজিদতুল্য গৃহ আছে, তাহারই অন্তর্ভাগের অর্থাৎ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ গৃহের পশ্চিম পার্শ্বের খিলানে লিখিত আছে,—"১০৪৬ হিজরা শাকে (১৬২৮ খৃষ্টাব্দে) তাজের এই অংশের গঠন শেষ হয়।" তারপর তাজমন্দিরের উপরিস্থ, তারপথের ত্রিপার্শ্বস্থ 'সুরা' বা কোরাণের 'বয়াত' অর্থাৎ শিক্ষামূলক পদাবলী সমূহ। পদাবলীগুলি পারস্য ভাষার রীত্যনুযায়ী দক্ষিণ হইতে বামদিকে প্রসারিত—প্রবেশপথের দক্ষিণ পার্শ্বের নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সরল রেখাক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং তথা হইতে সরলভাবে খিলানের উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে গিয়া বামপার্শ্ব অবলম্বন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নিম্নে আসিয়া শেষ হইয়াছে। উহার অক্ষরগুলি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে গঠিত, অতীব সুগঠন ও বৃহদাকার। দেখিলে মনে হয়, কে যেন গাঢ় কৃষ্ণমসীযোগে, স্থূল লেখনীর দ্বারা এই মাত্র বয়াতগুলি লিখিয়া গিয়াছে।

পদাবলী ব্যতীত আরও কত কথা কত স্থানে লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই লিপিগুলির মধ্যে সম্রাট ও মহিষীর শূন্যগর্ভ সমাধি দেহের লিপিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহজহাঁর সমাধি বেদীর উপরে এই বচনটী লিখিত আছে,—"পাতসাহ গাজী সাহজহাঁ অধুনা 'খুল' ও 'রিদউন' নামা স্বর্গীয় রাজ্যদ্বয়ের অধিবাসীরূপে গণ্য হইয়া, নক্ষত্র খচিত বিমান-আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি এই সমাধি অভ্যন্তরে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন। বিগত ১০৭৬ হিজরা সালের (১৬৬৮ খৃষ্টাব্দের) রজব মাসের ২৬শে তারিখে সম্রাট

দেহত্যাগ করেন।" মহিষীর সমাধি-লিপির অনুবাদ এইরূপ—"মমতাজ-ই-মহল উপাধি-ধারিণী বেগম আর্জমন্দবানু স্বীয় প্রিয়পতি পাতসাহ সাহজহানসহ এই সমাধিগর্ভে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত আছেন। হিজরা সালের ১০৪০ অব্দে (১৬২২ খৃষ্টাব্দে) তিনি ইহ-সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করেন।" এই লিপিগুলি ভিন্ন তাজগৃহের দ্বারপথে, বামপার্শ্বে হিজরা শাকের ১০৪৮ বর্ষ (১৬৩০ খৃষ্টাব্দ) এবং আর এক স্থানে—"১০৪০ হিজরায় তাজ-মহলের নির্ম্মাণ শেষ হইল" এই বচন উৎকীর্ণ আছে।

উপরি লিখিত লিপিগুলি পাঠ করিলে সহজেই মনে হয়—১০৪০ হিজরা শাকে, ইংরাজী ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মমতাজের মৃত্যু হয় আর সেই সময়েই তাঁহার সমাধিমন্দিরের, তাজমহলের নির্ম্মাণ শেষ হইয়া যায়। কিন্তু তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর বা বিশ্বাস্য হইতে পারে না। যেহেতু ইহা একরূপ অসংশয়িতরূপেই স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে যে, মহিষী মমতাজ নিজ সমাধিমন্দিরের শেষ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তাজমহলের গঠন আরব্ধ হইলেও, মৃত্যুর সময়ে ইহার বহুলাংশেরই নির্ম্মাণ অসম্পূর্ণ ছিল। সূতিকাগৃহে মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা মমতাজ স্বামীর হস্তধারণ পূর্ব্বক বার বার তাজের পরিসমাপ্তির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সম্রাটও তাঁহাকে তৎসম্বন্ধে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর সময়ে তাজ শেষ হইয়া থাকিলে, তাঁহার তথাবিধ মিনতির কোনও প্রয়োজনই থাকিত না। সুতরাং ১০৪০ হিজরা অব্দ তাজ সমাপ্তির তারিখ নহে। অপিচু ইহার অংশ-বিশেষেরই সমাধার সময় মাত্র। বোধ হয় অনুবাদের ইতরবিশেষে কি অপর কোনও কারণবশতঃ এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিয়াছে—১০৪০ হিজরা সালকে তাজের সমাপ্তির সময় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কাহারও মতে—১০৪৯ (১৬৩১ খৃষ্টাব্দ) হইতে ১০৬৬ হিজরা শাকের (১৬৪৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে সপ্তদশ-বর্ষে তাজমহলের গঠন সমাধা হয়। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন—১০৪৮ হিজরায় বা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে তাজের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয় এবং পূর্ণ সপ্তদশ বর্ষে অর্থাৎ ১০৬৭ হিজরা সালে বা ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ শেষ হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি—হিজরা শাকের ১০৪৩ বর্ষে বা ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া ১০৬৬ হিজরায় অর্থাৎ ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ দ্বাবিংশতি বৎসরে তাজমহল সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তবে এই উভয় তারিখ, আরম্ভ ও সমাপ্তির সময় তাজমহলের কোনও স্থানে অঙ্কিত আছে কি না, তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই।

তাজের শিল্পিগণ

কথিত আছে—তাজ মহলের নির্ম্মাণ-কার্য্যে বিংশতি সহস্র শিল্পী নিযুক্ত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, মোট শিল্পীর সংখ্যা বিংশতি সহস্র হইলেও, নির্ম্মাণ কার্য্যের সহায়তা করে—উপকরণ-সংগ্রহ, বহন ও তাহা কার্য্যোপ-যোগী করিবার জন্য, আরও কয়েক সহস্র লোকের নিয়োগ করা হইয়াছিল। সেই শিল্পিকুলের প্রধান ছিলেন তিন ব্যক্তি—ঈশা মহম্মদ, আরমদ খাঁ (মতান্তরে আমানত খাঁ) ও মহম্মদ হানিফ। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় যথাক্রমে সিরাজ ও বোগ্‌দাদ হইতে আসিয়াছিলেন। ঈশা মহম্মদ সম্ভবতঃ এই ভারতবর্ষেরই অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা বেতন পাইতেন প্রত্যেকে মাসিক এক সহস্র

মুদ্রা। উৎকল, বারাণসী, দিল্লী, পঞ্চনদ, পারস্য ও তুরস্ক হইতে যে সকল হিন্দু, মুসলমান শিল্পী আনীত হন, তাঁহাদের বেতন ছিল মাসে একশত হইতে পঞ্চশত মুদ্রা পর্য্যন্ত এতদ্ব্যতীত আগ্রা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের এবং বাঙ্গালা বেহার প্রভৃতি দূরবর্ত্তী দেশের বহু ভূমিবৃত্তিভোগী নিপুণ হিন্দু মুসলমান শিল্পীকেও সামান্য বেতনে বা বিনা বেতনে (বেগারে) কার্য্য করিতে হইয়াছিল। পাতসাহের আদেশক্রমে অনেক ভারতীয় ভাস্কর কেবল ভরণপোষণের ব্যয় গ্রহণে এবং কতকগুলি লোক আবার বেতন বা আহারাদির কোন ব্যয় না লইয়াই কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু য়ুরোপ, আফ্রিকা কি আমেরিকা মহাদেশের কোনও শিল্পী এই বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত দুইজন প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয়কে তাজের প্রধান শিল্পী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শিল্পিদ্বয়ের একজন ভিনিস নগরবাসী ইটালীয় নাম 'জেরোনিমো ভেরোনেস্' (Geronimo Verrones) এবং অন্য ব্যক্তি ফরাসী, নাম 'অষ্টিন-ডি-বোরডো' (Austin De Bordeaux)। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাজের পরিকল্পনা (plan) ও ব্যয়ের পরিমাণাদির নির্দ্ধারণ এবং শেষোক্ত ব্যক্তি লোহিত প্রস্তরের উপরে শ্বেত প্রস্তরের বা বিভিন্ন বর্ণরাজির সন্নিবেশক্রিয়া (Inlaying) নির্ব্বাহ করেন। যখন তাজের নির্ম্মাণকার্য্য সমাহিত হইতেছিল, তখন 'ফাদার-দে-কাষ্ট্রো' (Father Da Castro) নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী পাদ্রে লাহোরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি নাকি ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতাগত, প্রসিদ্ধ 'ফাদার মানরিক' (Father Manrique) কে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। যাঁহারা অষ্টিনকে তাজের প্রধান শিল্পিকুলের একতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও অনেকটা এইরূপ,—'তাজের গঠন কালেই যখন অষ্টিন সম্রাট সাহজহাঁর রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি যে সেই কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। সেরূপ একজন নিপুণ শিল্পীকে নিকটে পাইয়াও যে সম্রাট তাঁহার সহায়তা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই অযৌক্তিক। সুতরাং তাজ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে অষ্টিনের নিয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। আর এক কথা—তাজের শিল্প কলার মধ্যে 'টিউলিপ' (Tulip) নামা যে ইটালীয় পুষ্পের প্রতিরূপ পরিদৃষ্ট হয় তাহা অষ্টিনেরই হস্ত-প্রসূত। য়ুরোপীয় শিল্পী ব্যতীত য়ুরোপীয় ফুলের প্রতিকৃতি আর কে অঙ্কিত করিবে?' *

উপরে ভেরোনেস্ ও অষ্টিন সম্বন্ধে, পাশ্চাত্য মনীষীদিগের যে অভিমতের উল্লেখ করা হইল, তাহা কতদূর সমীচীন, নিরূপণ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। তাজের ভিত্তিগাত্রে শিল্পিগণের যে নাম তালিকা উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে অষ্টিন কি ভেরোনেস্

* কোনও কোনও ইংরাজী গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে যে তাজের শ্বেত প্রস্তর ফলকের উপরে গ্রেসীয় কবি অর্‌ফিয়সের (the Thracian poet Orphens who had the power of moving even inanimate objects by his music) যে প্রতিরূপ অঙ্কিত আছে, তাহা অষ্টিনেরই মূর্ত্তি। অষ্টিন, কবি অর্‌ফিয়সের নামে নিজেরই প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাজের কোনও অংশেই আমরা সেই প্রতিরূপ দেখিতে পাই নাই।

কাহারও নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। তাজের নির্ম্মাণ কার্য্যে অবশ্য অনেক হিন্দু-শিল্পীও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ ২।১ জনও যে প্রধান ছিলেন না, এমন হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদিগের নামও ত উক্ত তালিকা মধ্যে স্থান পায় নাই। তবে কি ভিন্ন জাতি ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমান সমাধি মন্দিরে, হিন্দু শিল্পীর ন্যায়, খৃষ্টান শিল্পী ভেরোনেস্ ও অষ্টিনের নাম অঙ্কিত হয় নাই? না, তাজের বিশাল দেহের কোনও এক স্থানে পৃথকভাবে হিন্দু ও খৃষ্টান শিল্পীদিগের নাম তালিকা উৎকীর্ণ আছে? এ সকল বিষয়ের সন্ধান বা মীমাংসা হওয়া একান্ত আবশ্যক—হিন্দু ও খৃষ্টান শিল্পীদিগের নামের সহিত হিন্দু শিল্পকলার কোনও বিশেষ নিদর্শন তাজদেহে উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় কি না তাহার অনুসন্ধানও বিশেষ প্রয়োজনীয়। তারপর টিউলিপ ফুলের কথা। তাজের প্রথম সমাধি বেদীর বৃত্তি বেষ্টনীর শিল্প কৌশলময়ী চিত্রাবলীর মধ্যে যে পুষ্প বিশেষের প্রতিরূপকে, য়ুরোপীয় শিল্পের নিদর্শন টিউলিপ বলিয়া স্থির করা হয়, তাহা প্রকৃত টিউলিপ কি না তাহাতে অনেকেরই সংশয় আছে। আমরা টিউলিপ ফুল কখনও দেখি নাই, বলিতে পারি না সেই প্রতিরূপ ঠিক টিউলিপের প্রতিরূপ কি না, তবে যাঁহারা ইটালীতে গিয়া টিউলিপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই নাকি উহাকে টিউলিপের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন না অথবা কেহ কেহ বিশ্বাস করিলেও অষ্টিন বা ভেরোনেস্‌কে তাজের শিল্পী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন,—'এ দেশীয় শিল্পীরা শিল্প বিদ্যায়, য়ুরোপীয় শিল্পী অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন বা ন্যূন নহেন, বরং অনেক স্থলেই তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হইয়া থাকে। সেরূপস্থলে, সম্রাট সাহজহাঁ কেন একজন বৈদেশীক শিল্পীকে তাজ নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিবেন? বিশেষতঃ প্রাচ্য শিল্পীদিগের প্রতীচ্যের ইটালী প্রভৃতি দেশেও যে গতি-বিধি ছিল না, এমন নহে। সুতরাং সেখান হইতে টিউলিপ ফুল দেখিয়া আসিয়া, তাঁহারা যে এখানে, তাজের এই সমাধিবৃত্তির মধ্যে তাহার অনুরূপ বা অবিকল প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? অতএব ঐ ফুল যদি টিউলিপই হয় তবে তাহা এদেশীয় শিল্পীদিগেরই হস্ত-প্রসূত।'

তাজ নির্ম্মাণের কাল ও ব্যয়ের পরিমাণ

তাজের নির্ম্মাণ কাল ও ব্যয়ের পরিমাণ—এই উভয় বিষয়েই মত-বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন,—তাজের গঠন সমাধা করিতে সপ্তদশবর্ষ অতীত হইয়াছিল। কেহ ঐ সময়কে বিংশতি কেহ বা দ্বাবিংশতি এবং কেহ কেহ আবার ত্রিংশবর্ষ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুবিখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক 'তাভার্নিয়ে' তাজের নির্ম্মাণ দেখে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বপ্রণীত ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন,—'বিংশতি সহস্র শিল্পী অহোরাত্র কার্য্য করিয়া দ্বাবিংশতি বর্ষে তাজের গঠন শেষ করিয়াছিল।' সময়ের ন্যায় ব্যয় বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রচলিত দেখা যায়। কাহারও মতে, তাজনির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয় পরিমাণ ৩০০০০০০ ত্রিশলক্ষ টাকা। কাহারও মতে, ৯৯,৯৯,৯৯৯ নিরেনব্বই লক্ষ নিরেনব্বই হাজার নয়শত নিরেনব্বই। কেহ বলেন, ২,০০,০০,০০০ দুই কোটী মুদ্রাব্যয়ে তাজের

নির্ম্মাণ সমাধা হইয়াছিল। কোনও কোনও লোক আবার তাহাতে আপত্তি দর্শাইয়া বলিয়া গিয়াছেন, সমগ্র নির্ম্মাণ-ব্যয় ৩,১৭,৩৮,০২৪তিন কোটী সতের লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চব্বিশ টাকার অধিক নহে। কোনও লোক আবার মোট ব্যয় ৪,০০,০০,০০০ চারিকোটী মুদ্রা বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে, বহু বিশেষজ্ঞের, অভিজ্ঞ ঐতিহাসিকের অভ্রান্ত বর্ণনা হইতে পরিজ্ঞাত হইয়াছি, তাজের নির্ম্মাণ কার্য্যে যে সময় ও অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ যথাক্রমে দ্বাবিংশতিবর্ষ এবং কিঞ্চিদধিক চারিকোটী মুদ্রা অর্থাৎ ৪,১৪,১৮,৮২৬ চারিকোটী চৌদ্দলক্ষ আঠার হাজার আটশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র!

তাজের উপাদান ও তাহার মূল্যাদি

তাজসৌধের প্রধান বা মূল উপাদান লোহিত প্রস্তর (Sand stone)। তদ্ব্যতীত শ্বেত, পীত, নীল, হরিৎ, পিঙ্গল ও ভায়লেট প্রভৃতি নানা বর্ণের প্রস্তর এবং মণি, মুক্তা, প্রবাল ও হীরকাদি রত্নরাজিও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত সামন্ত নৃপতি, হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ ঐ সকল উপাদান সংগ্রহ বিষয়ে প্রাণপণে সম্রাটের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং নিজেরাও বহুতর প্রস্তরাদি উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজার নিকট হইতে, বার্ষিক রাজস্বের বিনিময়ে ও রাজ-দর্শনী (নজরান্) উপলক্ষ্যে এবং প্রভূত অর্থব্যয়ে দূরদেশ হইতেও অনেক প্রস্তর ও মণিমরকতাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। আগরার নিকটবর্ত্তী কতেপুর সিক্রী নামক স্থান হইতে ১,১৪,০০০ একলক্ষ চতুর্দ্দশ সহস্র শকট পূর্ণ লোহিত প্রস্তর আনীত হয়। পঞ্জাব প্রদেশ হইতে 'জবর জদ' ও সূর্য্যকান্তমণি, বুন্দেল খণ্ড হইতে বজ্রমণি বা হীরক, লঙ্কাদ্বীপ হইতে নীলকান্তমণি বা নীলা ও 'সংসেতারা' নামক মণি, তিব্বত দেশ হইতে 'ফেরোজ' ও নীলকান্ত মণি, লোহিতসাগর ও আরবদেশ হইতে বিদ্রুম, বোগ্‌দাদ হইতে পদ্মরাগ মণি, পারস্য হইতে 'জমালীয়া' ও 'সোলেমানী দানা' বা 'তজবী,' টীবাট দেশ হইতে 'এসব' নামক প্রস্তর, জয়পুর হইতে শুভ্র মর্ম্মর, চতুরাক্ষ বা চারখোগিরি হইতে কৃষ্ণমর্ম্মর, নর্ম্মদা প্রদেশ হইতে পীত মর্ম্মর এবং চীন দেশ হইতে স্বচ্ছ মর্ম্মর, আনীত হইয়াছিল, সেই সকল শুশোভন ও দুর্লভ প্রস্তর সংগ্রহ করিতে জলের ন্যায় রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। পীত, কৃষ্ণ ও স্বচ্ছ মর্ম্মরের প্রতি বর্গগজে যথাক্রমে ৪০৲, ৯০৲ ও ৫৭০ চল্লিশ, নব্বই ও পাঁচশ' সত্তর টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল! তা'ছাড়া 'জাসপার' (Jasper), কর্ণেলিয়ান (Carnelian) আমিথিষ্ট (Amethyst), আগেট (Agate), ল্যাপিস্‌লেজুলী (Lapislazuli) ও হীরা, চুনি, পান্না, পোকরাজ প্রভৃতি রত্নের জন্যও প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ফলতঃ তাজমহলে যত অধিক মূল্যের প্রস্তরাবলী, মহার্ঘ্য মণিরত্নাদি বিনিবেশিত হইয়াছিল, এক মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাত্মা মহম্মদের মদিনাস্থ সমাধি ব্যতীত, পৃথিবীর আর কোথাও, কোনও সমাধি-মন্দিরেই সেরূপ হয় নাই।* কিন্তু

* মহম্মদের সমাধিগাত্রে যে হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি রত্নরাজি সন্নিবদ্ধ আছে, মাত্র তাহাদেরই মূল্য ২০,০০,০০০ বিংশতি লক্ষ পাউণ্ড বা ৩,০০,০০,০০০ তিন কোটী টাকা! কিন্তু তাজ নির্ম্মাণের সমগ্র ব্যয়ের পরিমাণ চারিকোটী মুদ্রারও বেশ অধিক নহে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে তাজের সে রতন-ভূষণ এখন আর নাই—তাজের গৌরব স্বরূপ প্রায় সমস্ত দুর্লভ ও দুর্মূল্য মণিমাণিক্যাদিই অধুনা ইহার অঙ্গচ্যুত, অর্থ-পিশাচ দস্যু তস্করাদি কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত ও অপহৃত। সম্রাট দম্পতির প্রথম প্রকোষ্ঠস্থ সমাধিবেদী দুইটীই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ঐ বেদীদ্বয়ের উপরে হস্তার্পণ করিলে, স্থানে স্থানে যে গভীর ও গোলাকার গহ্বর সমূহ অনুভূত হয়, সেই গুলিই মহা-মূল্য মণি মরকতাদির স্থান—উহাদিগের অভ্যন্তরেই বৃহদাকার ও জ্যোতিষ্মান প্রস্তর-নিচয় সন্নিবেশিত ছিল। শুনা যায়, তাজের প্রতি কক্ষেই, স্থূল স্বর্ণ শৃঙ্খল যোগে এক একটী মণিময় দীপ লম্বিত থাকিত। সেই দীপের অপূর্ব্ব গুণপ্রভাবে কক্ষমধ্যে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর অনুভব হইত আর রাত্রিতে উহাদের সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্ফটিক-স্বচ্ছ গৃহ-প্রাকারাদিতে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত তাজ-মহল উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত। সেই অদ্ভুত গুণসম্পন্ন বিচিত্র দীপ আর তৎসহ সেই স্থূল স্বর্ণ শৃঙ্খলও দস্যুরা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তাজ শ্রীহীন হয় নাই, গঠনগুণে ভূষণহীন হইয়াও পূর্ব্ববৎ নভূষণ অনিন্দ্যসুন্দর রূপেই বিরাজমান রহিয়াছে! তবে সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টিতে তাজের সৌন্দর্য্য-সুষমা ও গৌরব-গরিমা যে বহুপরি-মাণেই খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে, তাহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

তাজবিষয়ক প্রবাদ

তাজমহল সম্বন্ধে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অনেক জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই সকল প্রবাদ সংখ্যায় এত অধিক যে, তদ্দ্বারা অনায়াসেই একখানি ক্ষুদ্রাকার পুস্তক প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কিন্তু সে সকল প্রবাদ মাত্র তাহার মূলে যে কোনও সত্য নিহিত আছে, বোধ হয় না। সুতরাং এ প্রবন্ধে তাহাদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন তবে পাঠকগণের প্রীতির জন্য মাত্র অর্থব্যয়-মূলক প্রবাদটীই এস্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

তাজের নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে সম্রাট সাহজহাঁ শিল্পি-নির্ব্বাচন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি সমাগত শিল্পী-দিগকে যমুনা-তীরে সমবেত করিয়া, তাহা-দিগের সমক্ষে স্বর্ণমুদ্রা স্তূপীকৃত করেন এবং তাহাদিগকে দেখাইয়া সেই মুদ্রারাশি আধার-পূর্ণ (তোড়াবন্দী) করিয়া যমুনায় নিক্ষেপ করিতে ভৃত্যদিগকে আদেশ দেন। তদনুসারে ভৃত্যেরা, সহস্র সহস্র আধারে সেই মোহর পূর্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। যে সকল শিল্পী সেই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ক্ষুব্ধ হইল—যাহাদিগের মুখে বিষাদ রেখা বা দুঃখের চিহ্ন প্রস্ফুটিত হইল, সম্রাট তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং যাহারা অক্ষুণ্ণ রহিল, বৃথা মোহররাশি নষ্ট হইতেছে দেখিয়াও, বিষাদের ভাব দেখাইল না বা দুঃখ প্রকাশ করিল না, তাহাদিগকেই তাজ নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিলেন। কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসার সাহসী না হইলেও, সম্রাট নিজেই নিজকার্য্যের 'কৈফিয়ত' দিলেন। তিনি উপস্থিত লোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"যাহারা তুচ্ছ অর্থের প্রতি আসক্ত নহে; অজস্র অর্থের অপব্যয় দেখিয়াও ক্লেশ বোধ করে না, তাহারাই তাজ নির্ম্মাণের যোগ্য—তাহারাই সময় ও ব্যয় বাহুল্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কেবল তাজের মনোহারিত্বের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই কাজ করিতে সমর্থ। আর যাহারা

জনের ন্যায় অর্থ ও সময় ব্যয় দেখিয়া কাতর হয়, তাজনির্ম্মাণ তাহাদের কার্য্য নহে। তাহাদের হস্তে বহুমূল্য মণি রত্নাদির ভারার্পণও করা যাইতে পারে না।" ইহা একটী প্রবাদ মাত্র। তাজ নির্ম্মাণের সময় ও ব্যয়াধিক্য হইতেই সম্ভবতঃ এই প্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে। তবে ইহার মূলে যে সম্রাট সাহজহাঁর মুক্ত হস্ততার প্রমাণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

তাজের অভিনবত্ব

এই পৃথিবীতে সুগঠন ও সুদৃশ্য সমাধি-সৌধের, স্মৃতিমন্দিরের অভাব নাই বটে, কিন্তু তাজমহলের ন্যায় অদ্বিতীয়, অনিন্দ্যসুন্দর, নেত্র-রসায়ণ ও চিত্ত বিনোদন সমাধি-ভবন আর একটীও নাই। তদুপরি ইহাতে আবার এমন কতকগুলি অভিনবত্ব, বৈচিত্র্য বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহার নিকটে সংসারের তাবৎ সৌধকেই পরাভব স্বীকার করিতে, নত মস্তক হইতে হইয়াছে। তাজের বর্ণ-পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া বড়ই অদ্ভুত, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহা অনেক সময়ে স্বাভাবিক শ্বেতমূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিলেও, সময়ে সময়ে ভিন্নরূপে, বিভিন্ন আকারে ও বর্ণে প্রতিভাত হইয়া থাকে! তাজ প্রভাতে, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে নীলাভ, সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পরে ঈষৎ লোহিতবর্ণ এবং উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে পীতবর্ণ ধারণ করে! মেঘহীন রাত্রি বিশেষতঃ রজতশুভ্র কৌমুদী-ধারা বিধৌত নির্ম্মল শারদ নিশাই তাজদর্শনের প্রকৃত ও প্রধান সময়। তখন ইহা যেরূপ প্রকাণ্ডমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীর সহিত যেরূপ মনোমদ বিচিত্র শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে, সেরূপ আর কোনও সময়েই নহে। কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন তাজ বৃহত্তর বটে কিন্তু চন্দ্রালোক-মণ্ডিতের ন্যায় মনোহর নহে। আকাশ মেঘাবৃত হইলেও, তাজের মনোহারিত্ব নষ্ট হয় না বরং আর এক অভিনব অপরূপ নীললোহিত মনোজ্ঞ মূর্ত্তিতেই দৃশ্যমান হইয়া উঠে! কৃত্রিম আলোকমালায় বিশেষতঃ নীলালোকে বিমণ্ডিত হইলে, তাজ শতগুণে শোভমান, শ্রীসম্পন্ন ও প্রিয়দর্শন হইয়া থাকে!

তাজের স্বর-মুখরতা বা বিচিত্র-ধ্বনি-উৎপাদনশীলতা অতীব চিত্তাকর্ষক। তাজের অভ্যন্তরে মৃদুস্বরে কথোপকথন করিলেও তাহার শব্দ সমুদ্ভূত হয়। উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলে কি গান গাহিলে, সমস্ত মন্দির শব্দায়মান, মুখরিত হইয়া উঠে আর বর্ত্তুলাকার চাদমধ্য, সুমার্জ্জিত গৃহতল ও ভাস্কর্য্যময় সুমসৃণ ভিত্তিগাত্রাদিতে বারবার সেই শব্দ প্রতিহত হইয়া, অসংখ্য সুমধুর ও বহুক্ষণ স্থায়ী প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে! তখন বহির্দ্দেশ হইতে শ্রবণ করিলে মনে হয়, যেন শত শত লোক গৃহাভ্যন্তরে এক সঙ্গে কলরব করিতেছে! বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে, তাজ মধ্যে নানাবিধ বিচিত্র শব্দ সমুৎপন্ন হয়—মর্ম্মর-যবনিকা প্রভৃতির অপরিসর ব্যবধান পথে বায়ু প্রবিষ্ট ও নানা সরল ও তির্য্যক্ পথে নানা গতিতে, নানাদিকে গমনাগমন করায়, নানা শ্রুতিসুখকর, সুমধুর শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে! সময়ে সময়ে বায়ুর প্রকৃতি ও গমন-পথের ভিন্নতা অনুসারে 'হারমোনিয়মের' শ্রবণরঞ্জন মধুর ধ্বনিও উৎপন্ন হইতে শুনা যায়!

তাজের আর এক অভিনবত্ব বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। নগরের যে কোনও প্রাসাদ চূড়া, যে কোনও উচ্চ অট্টালিকা, দূরত্ব কি নিকটত্ব, স্থান হইতেই দৃষ্ট হউক না, তাজ প্রায় সমভাবেই নয়নাদর্শে প্রতিবিম্বিত হয়,—

সমদূরবর্ত্তী ও সমাবয়ব সম্পন্ন বলিয়াই অনুভূত হইয়া থাকে। চারি ক্রোশ দূর হইতে দর্শন করিলেও, মনে হয় যেন রশিমাত্র দূরে অবস্থিত। তবে নিকট হইতে অর্থাৎ এক রশি বা অশীতি হস্তের মধ্যে থাকিয়া দর্শন করিলে, তত সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু অশীতি হস্তের বহির্ভাগ হইতে, অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে তাজের দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া, দর্শন করিলে বিশেষ শোভাসম্পন্ন, পরম রমণীয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

তাজ সম্বন্ধে অভিমত ও উপসংহার

তাজের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইয়া এপর্য্যন্ত অনেকেই ইহার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—অনেক প্রকার মতামত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাজ গঠন বৈচিত্র্যে ও গুণগৌরবে এমন অনন্ত সাধারণ, এরূপ অদ্ভুত ও অশ্রুতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার যে, কোনও অভিমতের দ্বারাই ইহার সুষমা-সম্পদের সম্যক্ অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে। এই বিরাট বিশ্বমণ্ডলে এমন আর কোনও অট্টালিকা কি সমাধি-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার সহিত ইহার কোনও একটী অংশের তুলনা হইতে পারে। মনে হয়, যেন সহস্র চক্ষুও তাজ দর্শনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, লক্ষ লেখনিতে শত বর্ষেও ইহার সম্যক্ আলোচনা, সবিশেষ বর্ণনা সম্ভাব্য নহে। তাজ চক্ষে দর্শনীয় বটে কিন্তু মনশ্চক্ষে হৃদয়েই উপলব্ধ। এজন্য দর্শন মাত্রেই ইহার মনোহারিত্ব, মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আমরা যখন প্রথম তাজদর্শন করি—আমাদিগের অনেক হিন্দুস্থানী সহযাত্রী, বাষ্পীয় শকট হইতে যখন 'ঐ সেই তাজমহল' বলিয়া তাজ দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমরা হতাশ হইয়াছিলাম। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম—'যাহার যশঃ ভুবন-বিশ্রুত, যাহার জন্য এত অর্থব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এতদূর আসিলাম, সেই তাজমহল এমন!' কিন্তু ক্রমে নিকটে গিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া বুঝিলাম,—'না, অর্থব্যয় ও ক্লেশ কিছুই ব্যর্থ হয় নাই। তাজমহল বাস্তবিকই নয়নমনমোহন। যথার্থই এজগতে ইহার তুলনা নাই।' তবে ততক্ষণ মনের তৃপ্তি জন্মে নাই, গ্লানি মিটে নাই, যতক্ষণ ইহার মাধুর্য্যবোধে সমর্থ না হইয়াছিলাম। অতএব কেবল নেত্রের সাহায্যে দর্শন করিলে তাজ দর্শন সম্পূর্ণ হয় না—দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভবের চেষ্টা না করিলে, সে দর্শন বিফল হইয়া থাকে। জনৈক ইংরাজ মনীষী যথার্থ কথাই বলিয়া গিয়াছেন,—"You see it with the heart, before the eyes have time to gaze." সুতরাং যাঁহারা চক্ষে তাজ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল চক্ষেরই সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। তাজের যে মাধুর্য্য, যে গাম্ভীর্য্য তাহা তাঁহারা অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। তবে যাঁহারা কখনও তাজমহল দর্শন করেন নাই, দূর হইতে মাত্র ইহার সৌন্দর্য্যের কথাই শ্রবণ বা পাঠ করিয়া আসিতেছেন, অভিমতের দ্বারা, বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞদিগের সমালোচনা পাঠে তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে—তাঁহারা ইহার মনোহারিত্ব সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন মাত্র।

জনৈক ইংরাজ কবি, তাজগাত্রে সূক্ষ্ম মর্ম্মর শিল্পের, কারুকার্য্যময় প্রস্তর রচনার উৎকর্ষ, একাধিপত্য দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"তাজ প্রস্তরনির্ম্মিত কবিতা

বিশেষ।" তাজের মাধুর্য্য-প্রকাশক, লালিত্য-জ্ঞাপক এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আর হইতে পারে না। কিন্তু একজন ইংরাজ রমণীর অনতিদীর্ঘ অভিমতের দ্বারা তাজের গুরুত্ব যেরূপ পরিব্যক্ত, পরিস্ফুট হইয়াছে, অপর কোনও অভিমতেই সেরূপ হয় নাই। সেই গুণবতী, বুদ্ধিমতী মহিলা, ভূতপূর্ব্ব ঠগী বিভাগের অধ্যক্ষ স্বনামধন্য শ্রীমান সাহেবের পত্নী। একদা তিনি স্বামীর সহিত তাজ দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার স্বামী শ্রীমান মহোদয় তাঁহাকে তাজের কথা—তাজ কিরূপ দেখিয়া আসিলেন—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে বিবি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিয়াছিলেন,—"যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব, আর তাহা আমার সাধ্যায়ত্তও নহে। তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ করিতে পারি, যদি আমার সমাধির উপরে এইরূপ একটী হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়।" তাজ যে কিরূপ সুন্দর, কতদূর মহান্ এবং কেমন লোচন-লোভন ও হৃদয়রঞ্জন তাহা এই সংক্ষিপ্ত অভিমতেই সুপ্রকাশ। সংসারে প্রাণ হইতে কিছুই, কোনও পদার্থই প্রিয়তম নহে। সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম যাহার জন্য, যাহা পাইলে অনায়াসেই পরিত্যাগ করা যায়, তাহা যে কতদূর অনন্যসাধারণ, সুদুর্লভ ও মনোহর তাহা সহজেই অনুমেয়। আমরা তাজমহল দেখিয়াছি তাজমহলের মাধুর্য্যও যে কিঞ্চিৎ বুঝিতে না পারিয়াছি, এমন নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এপর্য্যন্ত কাহাকে কোনও প্রকারেই—মুখে বলিয়া, কি লিখিয়া—ইহার রূপগুণের কোনও কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। আর এই দীর্ঘ প্রবন্ধে এত অধিক কথার আলোচনা করিয়াও যে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাও সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না। অতএব নিতান্ত ক্ষুব্ধ চিত্তে, অতৃপ্ত প্রাণে এই স্থলেই আমরা 'তাজমহল' প্রবন্ধের উপসংহার ও পাঠক পাঠিকাগণের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর

মফঃস্বলের বাণী

স্বায়ত্ত-শাসন

ভারত-গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে সম্প্রতি এক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশের স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার উন্নতি সাধনই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। উক্ত মন্তব্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেওর সময় হইতে এদেশে স্বায়ত্ত-শাসন বিস্তারের কল্পনা চলিতেছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অনেক নগরে এ নিমিত্ত পরামর্শ-কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কার্য্যারম্ভের চেষ্টা হয়। এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রীতিমত কার্য্যারম্ভ হয়। কিন্তু তখনও এদেশের জনসাধারণকে কার্য্যক্ষেত্রে আহ্বান করা হয় নাই। ১৮৮২ সনে সুবিখ্যাত গবর্ণর জেনারেল লর্ড রিপণ স্বায়ত্ত-শাসন-প্রথার সম্প্রসারণ করেন। সেই সময় হইতে মিউনিসিপ্যালিটী সমূহে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপর ক্রমে ক্রমে অনেক সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে। এই সুদীর্ঘকালে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসী ক্রমশঃ

অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, পূর্ণ আদর্শ লাভ করিবার পথে এখনও যথেষ্ট বিঘ্ন রহিয়াছে। দেশের সাধারণ লোকেরা স্বায়ত্ত-শাসন ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট। গণ্যমান্য লোকেরা নির্ব্বাচনের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে অনিচ্ছুক, তদুপরি আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রেষারেষি রহিয়াছে; সুতরাং দেশের যোগ্য লোক তথায় যায় না। এই সমস্ত নানা কারণে মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডসমূহে প্রচলিত স্বায়ত্ত-শাসন প্রথার কিছু সংস্কার করা আবশ্যক।

মিউনিসিপ্যালিটি সম্বন্ধেএই নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে (১) অধিকাংশ স্থলেই নির্ব্বাচিত সভ্যসংখ্যা মনোনীত সভ্য অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত। (২) সাধারণতঃ সভাপতি বেসরকারীও নির্ব্বাচিত হইবেন। যেখানে সরকারী কর্ম্মচারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন, সেখানে গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কলিকাতার মত মিউনিসিপ্যালিটিতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু কার্য্য নির্ব্বাহের ভার থাকিবে কমিশনারের উপর, তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

গবর্ণমেণ্ট আয় ব্যয় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধেও অধিকতর স্বাধীনতা দান করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

জেলাবোর্ড ও লোক্যালবোর্ডের অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, ভারতগবর্ণমেণ্ট এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। জেলাবোর্ডের সভাপতিপদে সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন। লোক্যালবোর্ডের সভাপতিপদেও সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের প্রয়োজন গবর্ণমেণ্ট বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল স্থানে লোক্যালবোর্ডের সভাপতিপদে বেসরকারী লোকগণ নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন সেই সকল স্থানে প্রাচীন রীতির কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অভিপ্রায়ে অনেকে আপত্তি করিতেছেন। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের মতদ্বৈধ আছে। পরন্তু মাননীয় গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ যেভাবে সংস্কারের ইচ্ছা করিয়াছেন, কার্য্যতঃ তাহা কিরূপ দাঁড়াইবে বলিতে পারি না। সরকারী কর্ম্মচারী বা বেসরকারী লোক সভাপতি হইলে, বা তাঁহারা ইচ্ছামত কিছু টাকা খরচ করিতে পারিলে, এবং কয়েকটি বেসরকারী লোকের নাম লিষ্টিতে বাড়াইলে, কাজ যে কিছু অগ্রসর হইবে এমন মনে হয় না। বরং খারাপ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আমাদের স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমানে যেরূপ গড়াইয়াছে, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি গবর্ণমেণ্টের যদি অফিস দ্বারা কাজ চালাইলেই আমরা রক্ষা পাইতাম। গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিতেছেন যে দেশের যোগ্য লোকেরা নির্ব্বাচনের ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহে না। এ দোষ কাহার? মন্তব্য পড়িয়া মনে হয় দেশের লোকের অনিচ্ছা এবং নির্লিপ্ততাই ইহার মূল বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। কিন্তু নির্ব্বাচন প্রথায় যে সমস্ত ত্রুটি আছে সে সব দূরীভূত না হইলে দেশের যোগ্য লোকেরা কখনও তথায় যাইতে ইচ্ছা করিবেন না। বরং পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা দেশের কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষায় মিউনিসিপ্যালিটীতে বা জেলা বোর্ডে আগ্রহের সহিত প্রবেশ করিতেন এইক্ষণ তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছেন।

বিভিন্ন প্রদেশের ও জেলার স্থানীয়

অবস্থানুসারে মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের কার্য্য-প্রণালী বিভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা উঠিয়াছে। আমরা মনে করি নির্ব্বাচন প্রথায়ও কিছু কিছু বিভিন্নতা থাকা আবশ্যক। ট্যাক্সের হার সকল স্থলে সমান রাখা উচিত নহে। ট্যাক্সের হার অনুসারে ভোটদাতার ভোট সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হওয়াও উচিত মনে করি। এইক্ষণ যিনি হাজার টাকা ট্যাক্স দিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেড় টাকার ভোটার সমান অধিকার দাবী করিতেছে। ইহাও কি নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন যোগ্য লোকেরা যেন কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন তেমন ব্যবস্থা করা। শিক্ষিত ও দেশের হিতকামী লোকেরাই এইসব কার্য্যের যোগ্য, তজ্জন্য শিক্ষাকে নির্ব্বাচনের একটা সর্ত্ত করা উচিত। অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকেরা স্বায়ত্ব-শাসনও বুঝে না, ভোটদানের অর্থও জানে না। সুতরাং তাহাদের হাতে যে ইহার ঘোরতর অপব্যবহার হইতেছে ইহা বলাই বাহুল্য। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোককে বশে আনিবার জন্য যত রকম অসদুপায় অবলম্বিত হইতে পারে বর্ত্তমানে তৎসমস্তই আরম্ভ হইয়াছে। দেশের যোগ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবেন না ত কি করিবেন? স্বায়ত্ব শাসন প্রথার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই সব বিষয়ের সংস্কার আবশ্যক।

জ্যোতিঃ।

হিন্দু হইতে হইবে

জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি—ইহাই ভারতের ত্রিবেণী, ইহাই ভারতের ত্রিধারা, ইহাই ভারতের ত্রি-তত্ত্ব; সেই বৈদিক যুগ হইতে ইহাই ভারতের প্রাণপণী! এই ত্রি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বৈদিক ঋষি, এই ত্রি-তত্ত্বের উপসংহার হইয়াছে—ভূদেব, বঙ্কিম ও ইন্দ্রনাথে! বড় দুঃখেই "উপসংহার" বলিলাম। বাস্তবিক ভূদেব, বঙ্কিম, ইন্দ্রনাথের তিরোধানের পর হইতে—আর আমাদের উন্নতি হয় নাই। এই যে বড় বড় সাহিত্যিক, বড় বড় নাট্যকার, বড় বড় কবি, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ইহারা কেহ দশের মুখ চাহিয়াছেন কি? ইহাঁদের কাছে আমরা অনেক জিনিষ পাইয়াছি, কিন্তু আসল জিনিসটুকু ত পাই নাই।

ভূদেবের জীবনে আমরা যে জ্ঞানের লীলা দেখিয়াছি, আর তা দেখিতে পাই না। ভূদেব জ্ঞানাবতার ছিলেন—তিনি যেরূপ গুরু-গম্ভীর উপদেশে—বাঙ্গালার সংসার রচনা শিখাইয়া গিয়াছেন, তেমন শিক্ষক আর কেহ জন্মিল না। বাঙ্গালীর কর্ত্তব্যজ্ঞান—ভূদেবের ইঙ্গিতে উৎপন্ন। বাঙ্গালীর একান্নবর্ত্তিতা, সেবাপরায়ণতা, দেশাত্মবোধ, সামাজিক রহস্য প্রভৃতির কথা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন ব্রাহ্মণ ভূদেব শর্ম্মা। তুমি নাটকই লেখ, বক্তৃতাই দাও, সংস্কারই কর—ভূদেবকে লঙ্ঘনের শক্তি তোমার নাই। তুমি যে ভাবে বঙ্গসমাজ নিয়ন্ত্রিত করিতে চাও, তোমার অনেক পূর্ব্বে—ভূদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এই যে দেশে বাণাদিনীর প্রতিষ্ঠার জন্য তারকনাথের অর্থদান, এ নিঃস্বার্থ দানের গৌরব দেখাইয়া গিয়াছেন—ভূদেব বাবু। ভূদেবের দান না থাকিলে, এতদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আত্মগৌরব হারাইতেন। দেশে সংস্কৃতের চর্চ্চা কমিয়া যাইত, সমাজে যথেচ্ছাচারের কৃষ্ণ যবনিকা বিসর্পিত হইত।

ভূদেবের অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গ-দর্শনের বেত্র হস্তে লইয়া সমাজে অবতীর্ণ। বঙ্কিমের প্রভাব বঙ্গদেশে বড় কম

নহে। বঙ্কিম যাহা করিয়া গিয়াছেন—আর কেহ তাহা পারিবেন কি? তুমি লিখিতেছ—বঙ্কিমের অনুকরণ করিয়া, তুমি কথা কহিতেছ বঙ্কিমের ওজস্বিনী ভাষায়। তোমার সমাজের, জীবনের, কর্ম্মের শত ত্রুটি—বঙ্কিম তোমায় বুঝাইয়া গিয়াছেন। আমাদের কাছে তুমি যদ্যপি মহীয়ান্ হইলেও, বঙ্কিমের কাছে চিরদিনই "অনোরণীয়ান" থাকিবে। বঙ্কিম—বঙ্গের কর্ম্মাবতার। বঙ্কিম না জন্মিলে—বাঙ্গালীর নাম বঙ্গের বাহিরের কেহই জানিতে পারিত না। বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্র গঠন করিয়াছেন বঙ্কিম বাবু—কর্ম্মজগতে বাঙ্গালীর স্থিতি হইয়াছে বঙ্কিমের অমানুষিক প্রতিভা-বলে। বাঙ্গালী মানুষ হইয়াছে, আপনাকে চিনিয়াছে, বঙ্কিমের নিপুণ হস্তের অঙ্কুশ তাড়নায়।

তার পর ইন্দ্রনাথ। যাঁহারা রহস্যপটু বলিয়া ইন্দ্রনাথের নাম শুনিয়াছেন—তাঁহারা ইন্দ্রনাথকে কখনই চিনিবেন না। ইন্দ্রনাথ ছিলেন—ভক্তির প্রস্রবণ। সমাজভক্তি, দেশভক্তি, ভগবৎ ভক্তি—ইন্দ্রনাথ নিখিল ভক্তির "পঞ্চবটী।" দেবতা, দেশ, দাক্ষিণ্য, দীনতা, দয়া—এই পাঁচ লইয়া তিনি "পঞ্চানন্দ।" তাঁহার সকল কাজের মূলে ছিল—অকপট ভক্তি। এই যে এখন কথায় কথায় সংবাদ পত্রে—অন্নকষ্ট, জলকষ্ট,—পল্লীবাসে যীতরাগ প্রভৃতির কথা তার-স্বরে ঘোষিত হইতেছে—প্রথমে ব্রাহ্মণ ইন্দ্র-নাথই ইহা বাঙ্গালীকে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তিনিই বাঙ্গালীকে বুঝাইয়াছিলেন—যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তাহ'লে তোমাকে হিন্দু হইতে হইবে। পল্লীবাস উঠাইলে চলিবে না, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে হইবে না।

আজ আমরা—সেই স্বর্গগত মহাত্মার মহা-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি—যদি বাঁচিতে চাও, মানুষ হইতে চাও, সুখভোগ করিতে চাও,—তবে পল্লীলক্ষ্মীকে অবজ্ঞা করিও না। পল্লীবাসের উন্নতি না হইলে, তোমার এ আর্ত্তনাদ কখনও ঘুচিবে না।

বিলাস-বিভ্রম তোমাকে অন্নজীবী করিয়া তুলিতেছে, ভোগ লালসা তোমাকে—অমানুষ করিয়া ফেলিতেছে, আমোদ প্রমোদ তোমায় ব্যাধিব্যাপন্ন জীবন্মৃত করিয়া তুলিতেছে, পল্লীর প্রতি বিরাগে তুমি দিন দিন দরিদ্র সাজিতেছ—এ কথা একবার বুঝিয়া দেখিও। রোগের কবল হইতে, অনশনের হস্ত হইতে, চির দারিদ্র্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে গেলে জ্ঞানে, মানে, প্রাণে দেহে—আবার তোমায় হিন্দু হইতে হইবে।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ

'সদ্ভাবশতক'-প্রণেতা

স্বর্গীয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

"কি কারণ, দীন, তব মলিন বদন ?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ, ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে ?"

[জন্ম—১২৪৪।৭৫ সন] [মৃত্যু—২৯শে পৌষ, ১৩১৩

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৬ষ্ঠ খণ্ড
৬ষ্ঠ বর্ষ

আষাঢ়, ১৩২২

নবম সংখ্যা।

আলোচনা

১। বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা

বর্ত্তমান শিক্ষায় মানুষ গড়িয়া উঠিতেছে না। কেবল নকলনবীশ, চাকরী বাকরীতে মজবুত, ভাসা ভাসা ধরণের লোক এই শিক্ষায় তৈয়ারী হইতেছে। প্রখর পাণ্ডিত্য, নূতন নূতন বিষয়ে উন্মেষশালিনী প্রতিভা, গভীর ভাবুকতা, পাঁচটা কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চালাইবার ক্ষমতা এতদিনের উচ্চশিক্ষাতেও জন্মিল না। কেবল তৃতীয়শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণীর লোক এই শিক্ষায় বাহির হইতেছে।

পূর্ব্বেকার যুগের ঔদার্য্য, আধ্যাত্মিকতা, ধ্যান-তন্ময়ত্ব প্রভৃতি বর্ত্তমান শিক্ষায় যেন জন্মাইতে পারে না। আর ইংরাজদের মত আস্ত আস্ত পালোয়ান, যাহারা কোন বাধা, বিঘ্ন, দুরূহতাকে ভয় করে না, যেখানে যাক সেইখানেই প্রতিকূলতার উপর নিজেদের মনুষ্যত্বের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করে, কই এখনও ত এই শিক্ষায় গজাইয়া উঠিল না। পূর্ব্বেকার ভারতীয় শিক্ষায় এবং ইয়োরোপে আধুনিক শিক্ষায় গড়িবার ক্ষমতার, সৃজনী ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ অসম্ভব হয় নাই। কিন্তু ইয়োরোপের শিক্ষার একটা নির্জ্জীব নকল এদেশে চালাইতে গিয়া খালি নকল নবীশই গড়িয়া উঠিতেছে; মেরুদণ্ডহীন, প্রাণহীন "মেশিন" পাওয়া যাইতেছে। কয়েক লক্ষ লোক ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু সবাই যেন মরা, কলের মত কাজ করিয়া যায়, ধরাবাঁধা কাজ 'রুটিন ওয়ার্ক' বেশ গুছাইয়া চালায়। লর্ড কার্জ্জন তাঁহার বিখ্যাত কন্‌ভোকেশন্ বক্তৃতায় এই বিষয়টি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের যে সকল ছাত্র এম এ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করেন, রায়চাঁদ বৃত্তি পান, তাঁহারা অনেকে ডেপুটী-গিরির উমেদারীর জন্য অনেক দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া বেড়ান। আর বেশীভাগ "বারে" গিয়া জোটেন। পি কে লাহিড়ী, এন্ এন্ ঘোষ, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মত অসাধারণ শিক্ষিত শিরোমণিরা ব্যাখ্যাপুস্তক লিখিয়া বিদ্যার সার্থকতা করিলেন। বাস্তবিকই বর্ত্তমান শিক্ষায় মানুষ তৈয়ারী হইতেছে না। আত্মস্বার্থের সঙ্কীর্ণ-সীমার বাহিরের কর্ত্তব্যবোধ এই শিক্ষায় তেমন ঘনিষ্ঠভাবে এখনও চরিত্রে মিশাইয়া দিতে পারে নাই। ইহা অনেক পুরাতন জিনিষ ভাঙ্গিয়াছে, কিন্তু কয়টা নূতন জিনিষ গড়িয়াছে? আর এ শিক্ষায় সাঙ্ঘাতিক বিঘ্ন —মানুষের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য (individuality) ইহাতে ফুটিয়া উঠিতে পায় না। সেই এক গোলাকার গণ্ডের ভিতর দিয়া ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ সবই পার করাইতে হইবে। তাহাদের কোণগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একটা হইয়া যায়। স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ এমন অবস্থায় কি করিয়া সম্ভব? উপকথার দৈত্যের মত সবাইকে এক মাপকাটিতে মাপিবার বন্দোবস্ত, কাহাকেও কাটিয়া ছাঁটিয়া, আর কাহাকেও বা টানিয়া পিটিয়া সেই মাপের সমান করিয়া লওয়া হয়। সম্পূর্ণ বিদেশীয় প্রথায় জাতীয়ধারার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া, দুরূহ বিদেশীয় ভাষার ভিতর দিয়া বাল্যকাল হইতেই আমাদের ছাত্রগণ যে শিক্ষা পায়, তাহাতে তাহাদের সমস্ত শক্তি জাগিয়া উঠে না, সমস্ত বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। বোধ হয় অন্য দেশের লোকেরা ভাবিতেও পারেন না কেমন করিয়া আমাদের দেশে লেখা পড়া, ভাবা চিন্তা সবই একটা দুরূহ বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়া হয়। আমাদের ছাত্রগণের প্রাণ তাই 'সিমেন্টের' (বিলাতী মাটীর) মত হইয়া উঠে, মৃত্তিকার সরসতা চলিয়া যায়।

আমাদের শিক্ষা আর একদিক দিয়া নিতান্তই অসম্পূর্ণ। ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। বাস্তবিকই আমাদের বিদ্যা পুরাপুরি অর্থকরী হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যা এখন আমাদের কাছে অর্থোপার্জ্জনের একমাত্র পথ। অর্থোপার্জ্জনের কতকগুলি সুযোগ আমাদের নাই, আর কতকগুলি আমরা নিজেরাই দূর করিয়া দিতেছি। কোন মতে

দুই একটা পাশ করিয়া কেরাণীগিরি, গবর্ণমেণ্টের চাকরী, ওকালতি, মাষ্টারী আর দুই একটা ধরাবাঁধা কাজে কিছু উপার্জ্জন করিয়া কোনও মতে উদরপূরণ করাটাই আমরা চিনিয়া বসিয়াছি। শিক্ষা আমাদের আদরের জিনিষ, কারণ ইহাতেই পেট ভরাইবার কোন একটা উপায় হওয়া সম্ভব ইহা অপেক্ষা কোন উদারতর, মহত্তর আদর্শ লইয়া কেহই শিক্ষালাভের জন্য অভিলাষী হয় না। দোকানীর ছেলে এনট্রান্স্ পাস করিয়া এপ্রেন্টিস্ খাটিতেও রাজি, কিন্তু তাহার পিতার অবলম্বিত ব্যবসা চালাইয়া মাসে ৪০।৫০ টাকা উপায় করিতে প্রস্তুত নয়। শিক্ষার সঙ্গে এইরূপ অনেক কুসংস্কার ও কুবুদ্ধি জড়াইয়া গিয়াছে। আর যাহারা স্কুল কালেজে শিক্ষা পায় তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীগুলি বহু ছোটখাট বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিড়ম্বনা জুটাইয়া লয়। এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে দারুণ গ্রীষ্মে জামা গায়ে না দেওয়া অভদ্রতা বলিয়া ঠেকে বিবিধ ফ্যাসান ছাত্রজীবনের সঙ্গে জুটিয়া ভবিষ্যতের আপদ বাড়াইয়া তোলে। চরিত্রের গাম্ভীর্য্য, চিন্তার গভীরতা, হুজুক-প্রিয়তার কাছে পরাস্ত হইয়াছে। দরিদ্রের একমাত্র ভরসা স্বাস্থ্য ও খাটিবার শক্তি পরীক্ষার চাপে চুরমার হইয়া গিয়াছে। জীবনের সঙ্কল্প ও কর্ত্তব্য বলিয়া একটা জিনিষের জন্য আমাদের শিক্ষার্থিগণ বড় একটা মাথা ঘামান না। অনেক বি এ ক্লাসের ছাত্রও বলিতে পারে না ভবিষ্যৎ-জীবনে তাহারা কি করিবে। স্রোতের শেওলার মত ভাগ্য বা ঘটনার স্রোত যে দিকে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তাহারা নির্বিরোধে অবনত মস্তকে সেই দিকে ভাসিয়া যায়। এমন দুর্ভাগার দল নিজেরাই বা কি করিবে, আর দেশের দুঃখই বা কতটুকু ইহাদের দ্বারা দূর হইবে? যাঁহারা মেধা ও পরিশ্রমের বলে পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করেন, তাঁহাদের এক রকম স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের মত চাকুরী জুটিয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চিন্ত; সমাজের কথা, দশের কথা ভাবিবার সময় বা সামর্থ্য কোথায়? উচ্চশিক্ষা স্বার্থসিদ্ধির উচ্চতর উপায়। ছাত্রজীবনের গোড়া হইতেই আত্মস্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া ধর্ম্মবোধের ও ধর্ম্মনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের সম্পর্ক না রাখিয়া শিক্ষার প্রারম্ভ। আর কায়ক্লেশে, হীনতায় ও দীনতায় ডুবিয়া কোন মতে উদরপূরণ, অথবা পরীক্ষায় ভাল করিয়া পাশ করিতে পারিলে অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন সেই শিক্ষার পরিণতি। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, এম্ এ, পি এইচ ডি প্রস্তুত করণ, শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশ গমন ত তুমুল বেগেই চলিতেছে। পরের কথা ভাবিবার জন্য কয়জন প্রস্তুত হইতেছেন?—গাঁয়ের বন্যায় গা ঢালিবার জন্য কয়জন শিক্ষিত হইতেছেন?—দশের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই বা কয়জন সঙ্কল্প করিতেছেন?—নিজেকে ভুলিবার জন্য কয়জন চেষ্টা করিতেছেন? কারখানায়, ফ্যাক্টরীতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ যথেষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের হিসাবটা বাড়িয়াছে। পণ্ডিত হইয়া সকলে নিজেকেই বড় করিতে শিখিয়াছেন। সেরূপ পাণ্ডিত্য বাড়াইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন দরিদ্রের বন্ধু, অশিক্ষিতের সহায়, নিম্নশ্রেণীর উপদেষ্টা লোকহিতৈষী 'মানুষের' সৃষ্টি করা যায় কি না, দূরদর্শী ব্যক্তিগণের তাহাই ভাবিবার বিষয়।"

এখন রোগ ত ধরা পড়িল, প্রতিকারের ব্যবস্থা কি হইবে? সনাতন জাতীয়তাকে মুছিয়া ফেলিয়া শিক্ষার যে উদ্ভট ফল ফলিতেছে, বিদেশী ভাষার বাহুল্য শিক্ষাকে যে পরিমাণে খর্ব্ব করিয়াছে, বিজাতীয় সভ্যতার আদর্শ ও উপাদান যতটা আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে তাহা ত বেশ সুস্পষ্টভাবে এখন বোঝা যাইতেছে। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা যে সব নূতন জিনিষ ও জীবন্ত উপকরণ আমাদের কাছে আনিয়া দিয়াছে তাহার সুফল একান্ত প্রয়োজনীয়তা ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এখন আমাদের যাহা ভাল, যেটা আমাদের এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া বিদেশের শিক্ষা ও সাধনার যে যে কল্যাণকর জিনিষগুলি আমাদের বাঁচিবার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের নিয়তি যাহাকে অবলম্বন করিয়া সার্থকতা-লাভ করিবে, সেই সমুদয়ের সমাধান করিয়া দেশের শিক্ষার্থিগণের জন্য প্রকৃত মঙ্গলকর শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে আর চলিবে না। ব্রহ্মচর্য্যের সনাতন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর "গুরুকুল," ভারতবর্ষীয় ও ইয়োরোপীয় উভয় শিক্ষার সম্মিলনে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কি ফল হয়, কিরূপ মানুষ গড়িয়া উঠে এবং আমাদের অন্নসমস্যা হইতে সার্থকতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও জটিল সমস্যার কতটা সমাধান হয়, তাহা হইতে এই দুরূহ প্রশ্নের অনেকটা উত্তর পাওয়া যাইবে। তবে এদেশের উপযোগী করিয়া ব্যবহারিক শিক্ষার বহুল প্রবর্ত্তন, মাতৃভাষার সাহায্যে বিদ্যাদান, ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রচলন, স্বদেশীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার মর্ম্মবাণীর সহিত পরিচয়ের ব্যবস্থা জাতীয় চরিত্র ও জাতীয় সমাজের ভাল গুণগুলির অনুশীলন, বস্তুগতসমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র ও সাহিত্য আয়ত্ত করিবার উপায়—এইগুলি আমাদের অবলম্বনীয় শিক্ষার অঙ্গ হইবে। এখন শুধু (Scheme) কার্য্যপ্রণালী ঠিক করিলেই চলিবেনা; তদনুসারে কাজ করিবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। আর একেবারে একটা বড় কিছু করিতে না পারিলেও নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে ছোট খাট সংস্কারগুলির সম্বন্ধে ত চেষ্টা করা যাইতে পারে।

* *
*

ইউরোপীয় সমাজ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা

মানুষের সভ্যতা ক্রমবিকাশের ফল, তাহার মনোবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে বিস্তার-লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে নিজের স্বার্থের জন্য খাটিত, স্বার্থের সংঘর্ষ মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব কলহ, মারামারি, কাটাকাটি বাধাইয়া দিত। কিছুকাল পরে সে দেখিল শুধু নিজের সুখ ও সম্ভোগের দিকে চাহিলে চলে না। সবাই যদি আপনার সুখ, আপনার সম্ভোগটাই বোঝে, নিজের কড়াগণ্ডার হিসাবই দেখে, তাহা হইলে কেহ কাহারও জন্য সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়িবে না, অপরের নিমিত্ত আত্ম-স্বার্থের পরিমাণ একতিলও কমাইবে না। ছোট খাট ব্যাপার লইয়া যখন এইরূপে মারামারি, রক্তারক্তি চলিতে লাগিল, তখন দায়ে পড়িয়া সে একটু একটু করিয়া অপর পাঁচজনের অস্তিত্বের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিল। জীবনটা যদি শুধু আগা-গোড়া হাঙ্গামায় কাটিয়া যায়, তবে সুখ কোথায়? আর সে যখন রোগে অশক্ত, বার্দ্ধক্যে অবসন্ন, তখন অন্যের সাহায্য ব্যতীত বাঁচাও যে অসম্ভব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মানুষ দশের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সামঞ্জস্য করিয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইল। সে এমন সব সুখের উপাদানের খোঁজ পাইল যেগুলি আয়ত্ত করিতে হইলে জোট বাঁধিয়া কাজ করা একান্ত আবশ্যক। ক্রমে এইরূপে মানুষের মধ্যে

জোট বাঁধার সূত্রপাত। দশজনে কাজের খাতিরে স্বার্থের সাধনে, জোট বাঁধা তেমন জমিয়া উঠে না, জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা যদি একটা সামঞ্জস্যের উপর দাঁড় করান না হয়—এই তত্ত্বটী ধীরে ধীরে মানুষের অভিজ্ঞতায় ফুটিয়া উঠিল। তারপর হইতে স্বার্থ সামঞ্জস্যের ভিত্তির উপর মনুষ্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করার ফলে কতকগুলি সামাজিক প্রবৃত্তি তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সমবেদনা, সহিষ্ণুতা, পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি ইহারই ক্রমবিকাশ। ক্রমে এই সকল বৃত্তি এমন গভীর ভাবে মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে জড়াইয়া গেল যে, পরের দুঃখে ত্যাগ, অন্যের বেদনায় সান্ত্বনা তাহার কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। সেবা, সহানুভূতি, ত্যাগ, দান প্রভৃতি সে আত্মসুখের জন্যই করিয়া থাকে। যদি এই সব প্রবৃত্তির স্ফুরণের অবসর বা সঙ্গতি তাহার না জোটে তবে সে নিজেই দুঃখ পায়, তাহার হৃদয়ে স্বতঃই অশান্তি আসে। এই পরার্থপরতামূলক প্রবৃত্তিগুলির উৎপত্তি একটা উচ্চতর, সূক্ষ্মতর (finer) স্বার্থপরতায়, কারণ মানুষ ইহার মধ্যে আপনার নির্ম্মল উদার আনন্দ চায়। ক্রমে এই জোটবদ্ধ সমাজের পরিধি, দল জাতি দেশ রাষ্ট্র (nation) ও সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষ বুঝিয়াছে যত অধিক লোক এক সঙ্গে জোট বাঁধিতে পারিবে, স্বার্থ ততই সুসিদ্ধ ও বিঘ্নহীন হইবে। অনেকবার এই সব জোট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কারণ সেই জোট গুলি সকলের স্বার্থ সমানচক্ষে দেখে নাই। এইজন্য যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিকত্বের বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল, বর্ত্তমান ব্রিটাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত "ষ্টেট্"গুলি বরাবর লড়াই ও কাটাকাটি করিত। মানুষ ঠেকিয়া শিখে। সে দেখিল বড় জোট না বাঁধিলে চলে না, আত্মরক্ষা ও উন্নতি নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন জোট বাঁধার মূলসূত্র খুব উদার হইয়া উঠিল। "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার উপর জোট প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইল। ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড আগুনের জ্যোতি এই সত্যটী ইউরোপের চোখের সম্মুখে জ্বলন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ফ্রান্সের অসংখ্য ভাবোন্মাদ সন্তানের আত্মত্যাগ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে এই রক্ষা কবচটী দান করিয়াছে। মুখ্যতঃ আত্মরক্ষা, উন্নতি ও পরস্পরের স্বার্থসংঘর্ষের নিবারণই জোট চালকগণের দেখিবার বিষয়। সমষ্টির মধ্যগত ব্যষ্টিসমূহের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা প্রায় ষোল আনাই অক্ষুণ্ণ। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্য এই নীতি অবলম্বন করিয়াই বিস্তৃত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই নীতির খানিকটা সম্প্রসারণেই রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে "অ্যালায়েন্স" (alliance) "আঁতেৎ" (Entente) প্রতিষ্ঠা। হতভাগ্য বেলজিয়মের দুর্দ্দশা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে—এখন আর ছোট খাট রাষ্ট্র টিকিতে পারিবে না। শক্তিমানের উদার নিরপেক্ষতা (benevolent neutrality) যে দিন টলিবে, বলবানের স্বার্থের কালানলে সে দিনই ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলিকে পুড়িয়া ছারখার হইতে হইবে। তুর্কীও একদিন আসহস্তে বিজেতার দম্ভে ইউরোপ টলমল করিয়াছিল। কিন্তু ভাবে, চিন্তায় ও কর্ম্মে অগ্রসর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগণের প্রাভবেদের প্রভাব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া সে এতকাল "ইউরোপের আতুরে"র (sickman of Europe) মত বাঁচিয়াছিল। সবলের স্বার্থ রক্ষা বহুদিন তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছিল। রুশিয়ার বিরাট মুখগহ্বর ও তাহার জন্য চিরকালই বিস্তৃত ছিল। তুর্কী নিজের জোট জমাইতে পারে নাই, তাহার ব্যষ্টিগুলিকে সমষ্টির সঙ্গে সৌভ্রাত্র ও সদ্ভাবের সূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করে নাই। ইউরোপে বসিয়া স্বরাজ্যে ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইংলণ্ড তুরস্কের জন্য লড়িয়াছে, ফ্রান্স এই আতুরের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে! বলকান যুদ্ধের সময় দেখা গেল তুর্কী কেবল অতীতের পসারের আর শক্তিমানের নিরপেক্ষতার উপরে দাঁড়াইয়াছিল। এখন

ইউরোপের ইতিহাস স্পষ্ট করিয়া তাহার বাণী শুনাইয়া দিতেছেন—আল্‌পা ছোট, ছোট গাট ছোট, রাষ্ট্র, সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিকূল সমষ্টি, আর টিকিবে না। এখন সাফল্যের পরিধি বাড়াইতে হইবে, ছোটগুলি বড় বড় আঁটবাধা জাতায় পরিণত না হইলে রক্ষা পাইবে না। আবার ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ লইয়া দুইটা প্রবল মত উঠিতেছে। একদল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষে। তাঁহারা বলেন মানুষ স্বাধীন, তাহার ইচ্ছার সঙ্গে যেখানে অপর ইচ্ছার ঠোকাঠুকি সম্ভাবনা, যেখানে তাহার নিজের সুখ অন্যের পীড়াকর কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহাকে সংযত করার অধিকার ষ্টেটের আছে। অন্যত্র সে নিরঙ্কুশ। এই নীতি ধরিয়া ষ্টেট চালাও, দেখিবে, সব দিক দিয়াই কল্যাণ হইবে। আর একদল বলেন—ষ্টেট্ আগে। রাষ্ট্রের স্বার্থ, রাষ্ট্রের স্থিতি ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যক্তির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও চরিতার্থতার পথ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া। ব্যক্তি, রাষ্ট্রকেই তাহার চরমলক্ষ্য করিয়া চলুক, রাষ্ট্রের বিরাট নিয়তির মধ্যে তাহার নিয়তি মিলাইতে শিখুক, রাষ্ট্রের মহামঙ্গলের মধ্যে সে মঙ্গললাভ করিবে। খবরদার, ব্যক্তিত্বের হৈ চৈ তুলিও না। বিস্তৃত ব্যাপক কল্যাণকে টুকরা টুকরা করিতে যাইও না। রাষ্ট্রের সাধনা ও শক্তিলব্ধ কল্যাণ এত বড় যে ব্যক্তি তাহা পাইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইবে। জার্ম্মাণি এই নীতির জীবন্তমূর্ত্তি। ইউরোপীয় সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নূতন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতেছে। আমরা ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

* *
*

৩। বাঙ্গলার সঙ্গীতসম্পদ

আজ একটি জিনিষ বাঙ্গালী হারাইতে বসিয়াছে। সেটি তাহার চিরভক্ত বাঙ্গালীর গান। বাঙ্গালীর ইতিহাস যতদিনের তাহার গানের ইতিহাসও ঠিক ততদিনের। ছড়া, পাঁচালী বৈঠকী, চুটকী, টপ্পা, কবি, তরজা, আখড়াই, কথকতা, যাত্রা, বাউল, হোলির গান, বাইচের গান, সারিগান, ভাটিয়াল গান, সঙ্কীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন, মনসার ভাসান, ধর্ম্মঠাকুরের গান, বৈষ্ণব ও ফকিরের গান, আগমনী বিজয়া, গ্রাম্য উৎসবাদির মেয়েলী গান, গম্ভীরা, গাজন, প্রভৃতি বিবিধ আকারে সঙ্গীত বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরকালই তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। বাঙ্গালীর আনন্দ গানের ভিতর দিয়া ঝঙ্কৃত, উৎসারিত হইয়াছে; তাহার শোকের দিনে সে অনেক সময় গানের মধ্যে সান্ত্বনা পাইয়াছে। কত সামান্য, অসামান্য কথা গানের ভিতরদিয়া বাঙ্গালাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কত রহস্য, বিদ্রূপকে বাঁচাইয়া গান তাহাদের সরসতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। বাঙ্গলাদেশে অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব গানকে আশ্রয় করিয়া সমাজের নানাস্তরে বিস্তারলাভ করিয়াছে। স্বদেশীর দিনেও ত, আমরা দেখিলাম গানের ভিতরদিয়া দেশের-মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি সন্তানের দায়িত্ব বেশ জাগিয়া উঠিল। অনেক সামাজিক ব্যাপার গানের ভিতরদিয়াই বাঙ্গালীর চিত্তকে স্পর্শ করিয়াছে। কত ভক্ত সাধকের প্রাণেরবাণী আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা গানের মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের চির-মধুর, চিরনবীন গান, সাধক রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত, ভাবুকভক্ত কমলাকান্তের পদাবলী প্রভৃতি পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণবঙ্গে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিন আগেও কুমারখালির কাঙ্গাল হরি-নাথের গান অনেক গভীর তত্ত্বকথা সাধারণের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা চিরদিনই গানগুলি বুঝিতেন, সেই গান তাঁহাদের প্রাণে নাড়া দিত। কলু ঘানিতে বসিয়া সেইগুলি গাহিত, মাঝিদের মুখে সে-গুলি শুনা যাইত। ভদ্রলোকেরা চণ্ডীমণ্ডপে, চাষাভূষাদের উঠানে সবাই জমিয়া সেই গান গাওয়া হইত। মৃদঙ্গ, খোল, করতাল, তান-পুরা, বাঁশী, সারঙ্গ প্রভৃতি সুলভ যন্ত্রে কাজ চলিত। আজকালকার থিয়েটার অপেরা প্রভৃতির মত এইগুলি বহুব্যয়সাধ্য ও দুরূহ ছিল না। ইহাতে আনন্দে নিবিড় অনুভূতি, শোকে সান্ত্বনা, উৎসবে প্রাণের মিলন, ধর্ম্ম-তত্ত্বের সহিত পরিচয়—একাধারে এতগুলি

কাজ হইত। আজকাল যে সব পুরাণ পুঁথি পত্র হইতে বাঙ্গালার প্রাচীন সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে এই 'গান-সাহিত্য' বড় কম নয়। কিন্তু কই, সেইসব গান যেন কোথায় উড়িয়া যাইতেছে। যাহাদের ধারা এতদিন বহু-দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়াও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, আজ তবে কেন তাহারা এমন করিয়া নিঃশেষিত ও নিস্তব্ধ হইতে বসিয়াছে? এগুলি হারাইলে বাঙ্গালী একটা মস্ত প্রাচীন সম্পদে বঞ্চিত হইবে। বাঙ্গালীর বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহা একটা কম দুর্ভাগ্য হইবে না। যখন ছাপাখানা রাশি রাশি পুস্তক উদ্গার করে নাই, বিশ হাজার পঁচিশ হাজার গ্রাহকওয়ালা খবরের কাগজ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, বক্তার দলের নিমিত্ত যে যুগে দেশ বক্তৃতামঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, তখন ত শিক্ষার প্রসার, নীতিবিস্তার, ধর্ম্মপ্রচার এই বিবিধ প্রকারের সঙ্গীতের সহায়তাতে হইয়াছিল। আজ কেন তবে আমরা এমন একটা সুন্দর প্রাণবান্ জিনিষ খোয়াইব? এখনও এই 'সঙ্গীত-সাহিত্য' মরে নাই। এখনও অবহিত হইলে আবার ইহাকে বাঁচাইয়া আমাদের মঙ্গলের উপায় করিয়া তুলিতে পারি। "মালদহের গম্ভীরা" নূতন উৎসাহ, নূতন ভাব ও ভাবুক পাইয়া বেশ সজীব ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল। আর নূতন ভাবুক না আসিলেও রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির গান ত চিরদিনই নূতন। আমাদের বিড়ম্বনাময় আনন্দহীন জীবনে একটা অপূর্ব্ব মধুরতা ও শান্তি এই সব সঙ্গীতের মধ্যে এখনও খুঁজিয়া পাই। তাই আজ যেন আমাদের আনন্দ, কল্যাণ ও সান্ত্বনার এই অপূর্ব্ব সম্পদটি আমরা না হারাই। বাঙ্গালী আজ জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে, এইসব পদাবলী, গীতাবলী, বাউলগান জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট হউন।

* *
*

৪। মহারাষ্ট্রের একজন সুসন্তান

আমরা ইতিপূর্ব্বে মহারাষ্ট্রের কয়েকজন সুসন্তানের পরিচয় দিয়াছি। এবার দেশের ভক্তসন্তান, শিক্ষায় ও ত্যাগে ভারতবাসীর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরেঞ্জপের সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব। পরেঞ্জপে ১৯০১ খৃঃ অব্দে বিলাতে বাংলার পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তখন বোম্বাই প্রদেশের "গ্রাজুয়েট সভার" অভিনন্দনের উত্তরে তিনি যে কথাগুলি বলেন, তাহার দুই চারিটা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিব। বিলাতে অবস্থান সময়ে তাঁহার জনৈক বন্ধু বলেন "আপনি আর দুই এক বৎসর এখানে থাকিয়া যান" পরেঞ্জপে উত্তর করিলেন "কর্ম্ম-জীবনের দুই এক বৎসর পিছাইয়া দেওয়া আমি ভাল বিবেচনা করি না।" গ্রাজুয়েট এসোসিয়েশনের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তিনি সর্ব্ব-প্রথমে মহামতি রাণাডের পরলোক গমনে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন "রাণাডে মহোদয় দেখাইয়া গিয়াছেন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কৃতী ছাত্রগণ তাঁহাদের অধ্যয়নের সুযোগ কিরূপভাবে কাজে লাগাইতে পারেন। আমার মত যুবকদের প্রকৃষ্ট সার্থকতা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলা। * * * * অধ্যাপক কারোই মহোদয়ের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শৃঙ্খলা (discipline) এবং ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম করা (Patient work) সম্বন্ধে তিনি আমাকে স্থানয়মত ভাবে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্রধানতঃ তাহারই বলে আমি সাফল্য লাভ করিয়াছি। * * * * * * * আপনা-দিগকে একটি বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আমি ফার্গুসন কলেজের কার্য্যে জীবন নিয়োগ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। সেই নিমিত্ত আপনারা আমার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এই জীবনের কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে কোনও বিশেষ ত্যাগ করি-য়াছি বলিয়া আমার অনুভব হইতেছে না। ফার্গুসন আমার নিজের প্রিয় পুরাতন বিদ্যা মন্দির, আমি ইহাকে বরাবরই প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়া আসিয়াছি। আত্মবলতার (Self-help) যে নীতি এখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমার পূর্ব্বতন শিক্ষকগণ এখানে কাজ করিতেছেন, তাহা আমার হৃদয়কে গভীররূপে

অধিকার করিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের কার্য্যে জীবনোৎসর্গ করিয়া আমার অধ্যয়নের ধারা অব্যাহত রহিবে এবং উচ্চ আদর্শের জন্য খাটিয়া গেলে মানুষের কেমন করিয়া আত্মোৎকর্ষ হয় তাহাও বুঝিতে পারিব। * * আমি আজ যৌবনে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, আমার জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্মুখে রহিয়াছে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন আমাকে সম্মানিত করিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি নাই, ইহা আমার উপরে এক গভীর দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। এই কর্ত্তব্য কতদূর পালন করিয়া উঠিতে সমর্থ হইব ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবে। আমি আপনাদের কাছে এইটুকু মাত্র নিবেদন করিতে পারি—কঠোর অনলস-শ্রমে যতটুকু হওয়া সম্ভব, তাহাতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না।" ইহার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। বাঙ্গালার কৃতী-ছাত্রগণ এই কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

* *
*

৫। আদর্শের কাছে আত্মনিবেদন

মানুষের প্রাণ যখন অসাড় হইয়া গিয়াছে, নব আশা, নূতন ভাব, উদার কর্ত্তব্য যেদিন তাহার হৃদয়ে সাড়া আনিতে পারে না, তখন ভাবের উচ্ছ্বাস, আবেগের উত্তেজনা, কল্পনার বিদ্যুদ্দীপ্তি প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেবলমাত্র উচ্ছ্বাস, উত্তেজনা মানুষকে পরিণতির পথে লইয়া যাইতে পারে না। ভাব, আবেগ ও কল্পনা যেখানে উদ্দাম, সেখানে বিবিধ বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলা আসিয়া লোকের সিদ্ধির পথ দুর্গম করিয়া তোলে। গীতায় সেইজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।" আবেগ উত্তেজনা ও বানের জল। কূল ছাপাইয়া দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিল, আবার কিছুকাল পরেই সব শুদ্ধ। কিন্তু যে নদীর স্রোত বারমাস বহতা থাকে তাহাতেই নাবিক নৌকা ভিড়া ভাসাইয়া বাণিজ্যসম্ভার লইয়া যায়। যে সব হৃদয় সূত্র, আমোদ, হাস্য, পরিহাস, ছোট, খাট সুখ দুঃখ লইয়াই সাধারণতঃ ব্যস্ত, তাহাদের উত্তেজনা বেনোজল ছাড়া বেশী কিছু নয়। চট্ করিয়া আসে, আবার চট্ করিয়া চলিয়া যায়। ইহাদের কাছে সঙ্কল্প নিষ্কৃতির প্রতি পরিহাস মাত্র, সাধু উদ্দেশ্য কেবল বিড়ম্বনারই নামান্তর। মোহের ঘোরে চলার বড় আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ছোটে। কিন্তু সংমূঢ়চেতা কবে কি কাজ করিয়াছে? মোহমুক্ত, নিষ্কলঙ্ক আত্মবান্ পুরুষই সর্ব্বত্র শুভকর্ম্মের, সাধুব্রতের অনুষ্ঠাতা। বড় কাজের নেশা অনেকেরই আসে, কিন্তু সে নেশা ছুটিয়া গেলে আবার তাহারা ধূলা কাদা গায়ে মাখিয়া ঘরে ফেরে, আর স্বার্থ, ভোগ ও বাসনার দুর্গে নিজেদের আটকাইয়া রাখে। পৃথিবীর ইতিহাসে যাঁহারা মহৎ কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, উচ্চ ব্রতের সাধক, তাঁহারা এইরূপ নেশার খেয়ালে কোনও দিন কর্ত্তব্যের পথে নামেন নাই। তাঁহাদের কাছে জীবন সাধনা। কর্ম্ম, বাক্য, ভাব সবই সেই সাধনার শৃঙ্খলায় সংযত ও সংহত। তাঁহাদের জীবন অসাধারণ ধৈর্য্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় বলিষ্ঠ। সুখ দুঃখ তাঁহাদের প্রাণকে বিচলিত করে না। জয় পরাজয় তাঁহাদের গণনার জিনিষ নয়। কর্ত্তব্যযজ্ঞে সমস্ত শক্তি, চিন্তা, অর্থ ও সামর্থ্যের আহুতিই তাঁহাদের একমাত্র দেখিবার বিষয়। তাঁহারা এক দুরূহ সাধনার সাধক, সারা জীবন পরমনিষ্ঠায় একাগ্রচিত্তে মহত্ত্বের উপাসক। জীবনের সবদিক দিয়াই "কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং" এই মহাবাক্যটী তাঁহাদের কাছে সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠে। নিষ্ঠা সংযম ও শৃঙ্খলার সোপান পরম্পরার উপর দিয়া মনুষ্যত্ব, ত্যাগ ও চরিতার্থতার অসীম আনন্দে তাঁহারা উঠিতে থাকেন। একটা সুমহান্ সঙ্কল্পের আলোক তাঁহাদের পথ চিনাইয়া দেয়, তাঁহারা তাই কখনও দিশেহারা হন না। যাহাদের সম্বল কেবলমাত্র আবেগ আর উত্তেজনা, নিষ্ঠা, কৃচ্ছ্রসহিষ্ণুতা, ও ভোগবিলাসের পরিহারের নিমিত্ত যাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে না, তাহারা আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া যথার্থই মাঠে মারা যায়। বড় মহৎ কর্ত্তব্য তাহাদের "স্বধর্ম্ম" নয়, নিতান্তই 'পরধর্ম্ম,' তাই 'ভয়াবহ'। তাহারা আত্মস্থ, প্রকৃতিস্থ হইয়া কাজ করে

না। কাজের জন্য উৎসাহ ও আগ্রহ তাহাদের কাছে একটা ক্ষণিক জিনিষ মাত্র। পৃথিবীর কল্যাণব্রতের আখ্যায়িকায় ইহারা চিরদিনই দুর্ভাগ্য বলিয়া কথিত থাকে। আদর্শের কাছে তাই সাধককে আত্মনিবেদন করিতে শেখা চাই। 'কায়েন মনসা বাচা' – কায় মন এবং বাক্যে—আদর্শের মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আপনাকে আদর্শের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। গৌড়ীয় হিন্দুর কাছে যেমন "মন্বর্থা বিপরীতা যা স্মৃতিঃ সানপ্রশস্যতে"—মনুর অর্থের বিপরীত স্মৃতিবাক্য প্রশস্ত নয়, আদর্শের সাধকের কাছেও তেমনি আদর্শের ব্যতিরেককর কথা, কাজ, চিন্তা, আচার, ব্যবহার সবই অবৈধ ও অকার্য্য হইয়া উঠা চাই। যখন মানুষ এইরূপে ভাবে তন্ময় হইয়া উঠে তখনই আদর্শের কাছে তাহার আত্মনিবেদন সম্ভব, আর এইরূপ আদর্শের সাধকই পৃথিবীর সমস্ত মঙ্গলপ্রচেষ্টায় মানবের কল্যাণকর অনুষ্ঠানে সার্থকতা আনে।

* *
*

৬। ভূদেব ও তাঁহার স্বজাতি

বাঙ্গালী ভূদেবকে বুঝে নাই। তাঁহার স্বদেশপ্রেম কি খাঁটি জিনিষ, স্বজাতির কল্যাণ কামনা ভূদেবের হৃদয়ের কতটা জুড়িয়া ছিল, সাধারণ বাঙ্গালী তাহার খবর কমই রাখে। কেশাগ্র হইতে নখ পর্য্যন্ত স্বদেশীভাবে স্বদেশীয়ানায় পোরা, স্বধর্ম্মের অনুশাসনের নিগূঢ় উদার তত্ত্বে অভিজ্ঞ, স্বজাতির প্রণষ্ট গুণগুলির পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত আগ্রহান্বিত ভূদেব ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও সাহিত্যের ভিতর দিয়া কতটা কাজ করিয়াছেন সে কথা বুঝিবার জন্য বাঙ্গালী তেমন চেষ্টা করে নাই। স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার 'প্রতিভা' নামক গ্রন্থে ভূদেবের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের বেশ সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বাঙ্গালী মাত্রেরই সেই উপাদেয় প্রবন্ধটি পাঠ করা উচিত। আমরা ভূদেব বাবুর পুত্রগণকে অনুরোধ করিতেছি তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃদেবের একখানি জীবন চরিত প্রকাশ করুন। ভূদেবের প্রবন্ধগুলি বড় ভারি। হালকা বিষয়, হালকা কথা, হালকা ভাবভঙ্গী তাহাতে মোটেই নাই। আমাদের দেশের লোক তাই বোধ হয় সেদিকে বড় একটা ঘেঁসেন না। কি অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর ভাবুকতা, স্বদেশ প্রেম ও আত্মসম্ভ্রম পুস্তকগুলির ছত্রেছত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভূদেবের প্রাণ আশার উৎস। হিন্দুর ভবিষ্যৎ তাঁহার কাছে মহত্ত্বের রশ্মিচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। তিনি স্বজাতির দোষে অন্ধ নহেন, স্বদেশের সভ্যতার যে যে স্থলে বলাধান আবশ্যক সেকথা তিনি অন্ধ অনুরাগে বিস্মৃত হন নাই। কি করিয়া তাঁহার স্বদেশবাসী আবার মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইবে, নিজেদের কোথায় কতটা ভাল আছে, পরের কাছে কি লইতে হইবে এবং কতটা লড়তে হইবে, সে বিষয় তিনি বিশেষ স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। সারা জীবন অক্লান্তভাবে খাটিয়া শেষে জীবনের সমস্ত উপার্জ্জন স্বধর্ম্মের রক্ষায় এবং স্বদেশীয় শিক্ষাবিস্তারের জন্য উৎসর্গ করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য ষোল আনা পালন করিয়াছেন। Plain living and high thinking সরল সাদাসিধা ভাবে থাকিয়া মহৎ চিন্তার ধ্যান ও মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বোধ হয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর ভূদেব চরিত্রেই দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বইগুলি এক একটি অমূল্য রত্নমঞ্জুষা। কত রত্নই না তাহাতে সাজান রহিয়াছে। বাঙ্গালী আজ সেগুলি বুঝুক, তাহার জাতীয়তার নব উন্মেষে ভূদেবের শিক্ষা, ভূদেবের চিন্তা ও নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে আরম্ভ করুক। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কিন্তু ভূদেবের মহিমা ধরিতে পারিয়াছিল। "নারায়ণ" পত্রে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গীয় নবপ্রতিষ্ঠিত "সাহিত্য পরিষদের" জন্য বঙ্কিম বাবুকে সভাপতিত্ব প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করেন "যখন ভূদেব বাবু জীবিত রহিয়াছেন তখন আর কেহই সভাপতি হইতে পারেন না।" অভাগা আমরা এখনও ভূদেবের শিক্ষা মাথায় তুলিয়া লইতে শিখিলাম না। তাঁহার পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, 'আচার

প্রবন্ধ' বিশেষতঃ 'সামাজিক প্রবন্ধ' বঙ্গ-সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ সামাজিক প্রবন্ধ খানি প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার মত থাকা উচিত। স্বদেশের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও নিয়তি সম্বন্ধে কত জ্ঞাতব্য কথা এই পুস্তকে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কি কি উপাদানে আমাদের সমাজের স্থিতি ও পুষ্টি তাহা তিনি বেশ বিশদ ভাবেই ইউরোপীয় তথ্যগুলির সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কর্ত্তব্যবিমূঢ় আমরা ইহাতে অনেক কর্ত্তব্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ বুঝিতে পারিব, স্বদেশের মাটিতে কি ফলিয়াছে ও কি ফলিতে পারে তাহাও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। এখন-কার অনেক জটিল সমস্যারই মীমাংসা ভূদেব করিয়া গিয়াছেন। এই নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানী ও কর্ম্মী তাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার বলে আমাদের জন্য বহু গভীর তত্ত্বের সমাধান করিয়া গিয়া-ছেন। আশা করি আমরা এখন তাঁহার দান ভক্তিপ্রণত চিত্তে গ্রহণ করিব এবং আমাদের জাতীয়তার পীঠে তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি দিতে শিখিব।

৭। একান্নবর্ত্তী পরিবার

স্মরণাতীত কাল হইতে একটি অপূর্ব্ব জিনিষ হিন্দুর জাতীয় সম্পত্তি ছিল। বহু আঘাতে, অসংখ্য ভাগ্যবিপর্য্যয়ে, হিন্দু তাহার এই পরমসম্পদটি হারায় নাই। ইংরাজী শিক্ষা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ভাবভঙ্গীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহা হারাইতে বসিয়াছি। এই সম্পদটি—আমাদের একান্ন-বর্ত্তী পরিবার। ইহার উদার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কত অনাথ, অসহায়, পিতৃহীন, মাতৃহীন জগতে বাঁচিবার ও দাঁড়াইবার স্থান করিতে পারিয়াছে। হিন্দুকে ইহা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার গ্রাস হইতে মুক্ত রাখিয়াছিল। সমাজে আত্মসম্মান, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি বড় বড় গুণগুলি একান্নবর্ত্তিতার কল্যাণে এতদিন বাঁচিয়াছিল। হিন্দু জন্ম হইতেই বুঝিত সে একলার জন্য নহে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাই তাহার পরিবারের সংজ্ঞা নয়। তাহার কর্ত্তব্য বহুব্যাপক, তাহার উপার্জ্জন বহুর সুখের নিমিত্ত। দায়শাস্ত্রে তাই উত্তরা-ধিকার নির্ণয়ে "সগোত্র" "সমানোদক" "সকুল্য" প্রভৃতির অধিকার নির্দ্দেশ আছে। হিন্দুর হৃদয় এই অপূর্ব্ব প্রথাটীর কল্যাণে বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুদিগের মধ্যে তাই ভদ্রসমাজ আপনার "ভদ্রত্ব" অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল। এই একান্নবর্ত্তিতাই ত মানুষকে নিঃস্বার্থতার হাতে খড়ি দেয়, মানুষের হাতে কর্ম্মে আচার ব্যবহারে একটা মধুর উদার ভাব ফুটাইয়া তোলে। হিন্দুর তাই গোড়া হইতে এক নহে, সে বহু। তাহার কর্ম্ম এইরূপে স্বভাবতঃ 'বহুজনসুখায়' এবং তাহার ধর্ম্ম 'বহুজনহিতায়' হইয়া উঠিয়াছিল। ত্যাগ, সংযম, সহিষ্ণুতা, ঔদার্য্য, ব্যাপক, ভালবাসা এতদিন একান্নবর্ত্তিতার শান্ত ছায়ায় পুষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু এতকালের রক্ষাকবচটা আজ খাইতে বসিয়াছে। এই অন্নের কাঙ্গাল, অভাবে শীর্ণজাতি তাহার কল্যাণের এই সুন্দর উপায়টী আজ বিসর্জ্জন দিতেছে। পরিবার (family) কথাটী কি হীন ভাবেই না সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে! আত্মস্বার্থ, নিজের ভোগবিলাস, সুখস্বাচ্ছন্দ্য হিন্দুকে জুড়িয়া বসিতেছে। তাহার কর্ত্তব্য এখন স্ত্রী পুত্র কন্যা জামাতার মধ্যেই আবদ্ধ ও তৃপ্ত। ভাইয়ের নিরন্ন ছেলেরা বিধবা মার সঙ্গে পথে বসিয়াছে, তাহাতে তাহার কি যায় আসে? পাঁচটা কুপোষ্যের জন্য সে ত তাহার নিজের সুখে কাঁটা দিতে পারে না! তাহার 'অলস নিষ্কর্ম্মা' আত্মীয়গুলিকে পুষিবার জন্য সে কি কেবল চোকঢাকা বলদের মত খাটিতে আসিয়াছে?—এইগুলিই এখনকার যুক্তি! হায়! হায়! পুরাতনের যেটুকু ভাল অবশিষ্ট ছিল এমন করিয়া আমরা তাহা ভোগমূলক স্বার্থসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণতার পায়ে ডালি দিয়া সব রকমে নিজেদের লক্ষ্মীছাড়া করিয়া ফেলি-তেছি। এবার বিষ আমাদের মর্ম্মস্থানে তাহার ক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি আমাদের গৌরবের দিনে এই একান্নবর্ত্তিতার কোলেই পুষ্ট হইয়া-ছিল। তোমরা নূতন প্রতিবেশের সহিত সমাজকে খাপ খাওয়াইতে চাও। কিন্তু

ইহার আগে নিজেদের সভ্যতার মূলসূত্রটা বুঝিয়া দেখ। আর যাহাকে পৃথিবীর এই প্রাচীনতম সমাজে প্রতিষ্ঠা দিতে চাও তাহারও মূলতত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝ। আমের গাছে আপেলের কলম লাগাইও না, তাহাতে কল্যাণ হইবে না। এখন আমরা কিছু গড়িতে পারিতেছি না, কেবল চারিদিকেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছি। যেখানে রৌদ্র ও বায়ুর পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, স্বাস্থ্যের জন্য, বাঁচিবার জন্য সে জায়গাটা ভাঙ্গিতে পার। কিন্তু দরজা জানালা বসাইতে পারিবে ত? সে কথা চিন্তা করিও। শুনিতে পাই একান্নবর্ত্তিতায় একজন কর্ম্মীর অর্থ আর দশজন শ্রমবিমুখ বসিয়া বসিয়া খায়। অবশ্য এ অভিযোগ অস্বীকারের উপায় নাই। সে ক্ষেত্রে অলস কর্ম্মবিমুখগণকে খাটাইয়া লইবার ব্যবস্থা কর। এ কাজটী শক্ত। কিন্তু শক্ত বলিয়াই কি যাহা সহজ তাহাই করিতে হইবে? সহজ বলিয়াই কি তাহা কল্যাণকর? আর নিষ্কর্ম্মাদের অজুহাতে অনাথ অসহায় অভাগাদেরও যে তোমরা আবর্জ্জনার মত এই স্বার্থ ও ভোগপরতার সমার্জ্জনীর আঘাতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইতেছে। গড়িবার সামর্থ্য যেখানে সুপ্রচুর নূতন কল্যাণের সৃষ্টি, পুরাতন মঙ্গলের পুষ্টি যেখানে শক্তিমান কর্ম্মীর কাছে সুসাধ্য, সেই ক্ষেত্রেই ভাঙ্গ। আমাদের বহুকালের সৌধটী বটবৃক্ষের সহস্রশিকড়ে জড়াইয়া কোথাও কোথাও জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে বটে কিন্তু মাল মসলার জোগাড় না করিয়া, শক্তি সামর্থ্যের বোঝ না বাঁধিয়া ইহার উপরে এই যে নির্ম্মম আঘাত করা হইতেছে, তাহাতে হিন্দুকে গাছ তলায় বসিতে হইবে আশ্রয় ও রক্ষার আর স্থান থাকিবে না।

* *
*

৮। কয়েকটি মুষ্টিযোগ

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাল মহাশয় নিম্নলিখিত কয়েকটি মুষ্টিযোগের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন :—

শৃগাল কুকুরের দংশন প্রতিকার

১। ব্রহ্মদেশে 'মাইলং' ব'লে একরকম গাছ আছে এই 'মাইলং' এর ছাল একটু শীতল জল সহ পিষিয়া ঘরের চালের নীচ হইতে গিয়া (জানি না ইহার সঙ্গে রোগা-রোগের কোন সংস্রব আছে কি না।) প্রাতঃকালে কোন কিছু খাওয়ার পূর্ব্বে শুধু পেটে দষ্টব্যক্তি গিলিয়া ফেলিবে। এইরূপ তিনদিন খাইবে। তাহা হইলে শৃগাল বা কুকুরের দংশন কখন লাগিবে না। শৃগাল কুকুরের কামড়ে যতদিন পর্য্যন্ত লাগে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ততদিনের ভিতর যে কোন তিনদিন এই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন। আমি নিজে তিন জন লোককে এই ঔষধ ব্যবহার করাইয়াছি। কয়জনে আমার পরামর্শে ব্যবহার করিয়াছে; তাহাদের কাহারো কুকুরের বা শৃগালের কামড় লাগে নাই। আর এই ঔষধ যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের কাহারো কুকুরের কামড় লাগিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। সেই জন্য এই মুষ্টিযোগে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা ব্রহ্মদেশে তাঁহাদের পরিচিত লোক থাকিলে তাঁহাদের দ্বারা 'মাইলং' আনাইয়া রাখিতে পারেন।

২। কচি পেঁপে কয়েকটি সকালে অভুক্তাবস্থায় খাইলে কুকুর দংশন লাগে না। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে খাওয়া চাই; নতুবা ফলপ্রদ হইবে না।

৩। সকালে ছটাক পরিমাণ ঘি গরম করিয়া পর্য্যায়ক্রমে সাতদিন খাইলেও কুকুরের কামড় লাগে না। কিন্তু কুকুরের দংশন দিন হইতে একুশ দিনের ভিতর এক সপ্তাহ গরম ঘি খাওয়া আবশ্যক। আমার শৈশবে একবার একটি কুকুর আমাকে কামড়াইয়া ছিল। আমি উপর্য্যুক্ত ২নং এবং ৩নং ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলাম।

সর্প দংশন প্রতিকার

৪। কাহাকেও সাপে কাটিলে কলাগাছের জল দষ্ট ব্যক্তিকে পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে এবং ঐ জল চোখে, মুখে সমস্ত শরীরে আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রায়ই খুব ভাল করিয়া ছিটাইয়া দিতে হইবে। যদি দংশনের পর রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে তবে জ্ঞানলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত অনবরত ঐ কলাগাছের জল

বা রস দ্বারা রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ছিটাইতে হইবে। এই ঔষধটি একজন মানুষ ও একটি গরুর উপর প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে।

(শিলচরের 'সুরমা' হইতে)

৫। সর্পদষ্ট ব্যক্তির নাসারন্ধ্রদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে ৫।৬ টা ঠুনিমানকুনির (কোথাও বা অজুরীপাতা বলিয়া অভিহিত হয়) ডাঁটা (পাতা ছাড়াইয়া) গুঁজিয়া দিতে হয়। রোগী ঐ ডাঁটাগুলি বাহির করিয়া আনিতে চেষ্টা করিবে; কিন্তু তাহাকে যে কোন রকম তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যাহাতে ঐ ডাঁটাগুলি নাকের ভিতর থাকিয়া সাপের বিষ শুষিয়া লইতে পারে তাহাই করিতে হইবে। ক্রমে ডাঁটা গুলি বিষ শুষিয়া লওয়ায় তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া কাল হইয়া যাইবে। তখন ঐ ডাঁটা গুলি ফেলিয়া দিয়া নূতন ডাঁটা গুজিয়া দিতে হইবে। ঐরূপ পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যখন ডাঁটাগুলির বর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে না তখন বুঝিতে হইবে যে রোগীর শরীরে সাপের বিষ নাই, সব নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়াছে।

(বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি)

৬। ঘলঘসিয়ার (ওনকলস, দ্রোণ পুষ্পের গাছ) পাতা বাঁটিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির সমস্ত গায়ে প্রলেপ দিতে হইবে; আর পাতার রস দিয়া চোখে পুনঃ পুনঃ ছিটাইতে হইবে। যতক্ষণ রোগী আপনাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বেদনা ও আরোগ্য অনুভব না করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ ছিটা দিতে হইবে।

(পরীক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি)

৯। বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী ও তামিল ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা

আমরা ইতিপূর্ব্বে এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছি—এবারও দুই চারি কথা বলিব। বঙ্গভাষা এতদিন বাঙ্গালী সখ করিয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার স্থান ছিল না। তাহার ফল হইয়াছিল, চিঠিপত্র, বক্তৃতা, প্রবন্ধপাঠ, সভাসমিতির নির্দ্ধারণ কিছুতেই ইংরাজী না হইলে চলিত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বাঙ্গালীও মাতৃভাষায় কিছু লিখিতে গেলে পাঁচ সাত গণ্ডা বর্ণাশুদ্ধি ব্যাকরণাশুদ্ধি করিয়া বসিতেন। অধিকাংশেরই রচনায় প্যাজ রসুনের গন্ধ পাওয়া যাইত। কিন্তু অস্বাভাবিকের উপর স্বাভাবিকের জয় অনিবার্য্য। তাই নানাদিক হইতে নানাভাবে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রাণের গোপন সুর আমাদের আপনার ভাষার ভিতর দিয়াই বাজিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। ইতিপূর্ব্বে আমাদের জাতীয় সভ্যতা, জাতীয় ভাব, বহুবার বঙ্গবাসীর উদ্ভ্রান্ত চিত্ত ঘরের দিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। এবারও আমাদের আত্মবিস্মৃত হৃদয় আপনার সন্ধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বঙ্গের শেষ বাঁটী বাঙ্গালী কবিদের একজন, নিধুবাবু, তাঁহার টপ্পায় গাহিয়াছিলেন—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি মনের আশা!
কত নদী সরোবর
কিবা বল চাতকীর
ধারাজল বিনে কভু মিটে
কি পিয়াসা?

যথার্থই বোতলের জলে আর সে ব্যাকুল তৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। দেশের মাটির গভীর স্তরে যে সরসতা যুগ যুগান্ত ধরিয়া সঞ্চিত ছিল, যাহাকে আমরা এতদিন উপেক্ষা করিয়াছিলাম, সেই অমৃতধারা আমাদের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে উৎসারিত হইয়া উঠিল। অবশ্য বঙ্কিম প্রমুখ জনকত মনীষি ইহার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সসম্ভ্রমে বঙ্গভাষার পূজার পীঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখন বাঙ্গালী ছাত্র মাতৃভাষার জ্ঞানলাভে উদাসীন থাকিতে পায় না। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে আমাদের মাতৃভাষার শক্তি আরও বহু পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা সহজলভ্য ও বহুদূর ব্যাপ্ত হইবে।

এখন আবার আর একটা বৃহত্তর ও জটিলতর সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এখন শুধু বাঙ্গালী নই, আমরা ভারতবাসী। এখন শুধু বঙ্গভাষাভাষী একলা আমাদের ভাই নহে, ভারতবর্ষের ত্রিশকোটী লোকের সহিত আমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। এ বন্ধন অচ্ছেদ্য এবং নিয়তই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। ইহাকে উপেক্ষা করিলে বাঙ্গালীর অকল্যাণ, যাবতীয় ভারতবাসীর অকল্যাণ। অথচ এক-ত্বের সূত্র এতদিন বাহিরে লোকের চোখে পড়ে নাই। এতকাল মহাভারতবর্ষের এই গভীর ঐক্য হিমাদ্রিকিরীটিনী, সমুদ্রবন্দিতা পূর্ব্ব পশ্চিম ঘাট সুরক্ষিত, ভারতভূমির ভৌগলিক অখণ্ডতা বলিয়া পরিচিত ছিল। হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসভ্যতা কি অপূর্ব্ব কৌশলে সমগ্র ভারতবর্ষে এক আত্মার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এক সুর জমাইয়াছে, আগন্তুক মুসলমান ঘরের ছেলে হইয়া কেমন সেই সুরে আপনার সুরের নবীনতা ও বিচিত্রতা মিলাইয়া তাহাকে অধিকতর গভীর ও উদার করিয়া দিয়াছে, ভারতবর্ষের প্রকৃতি নানা শক্তি উপাদান আশ্রয় করিয়া কিরূপে নানা বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সে কথা বহুকাল আমরা বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। ইংরাজ আসিবার পর আরও কতকগুলি উপাদান, ভাব ও শক্তি ভারতবর্ষের এই গভীর ঐক্যের অখণ্ডতা ও দৃঢ়তা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন এই মহাভারতবর্ষের স্বরূপ ও নিয়তি আমরা বুঝিতেছি। বাঙ্গালীর নিয়তি ভারতের নিয়তি, আর ভারতের নিয়তি বাঙ্গালীর নিয়তি। ভারতবর্ষের অবয়বে বাঙ্গালা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব প্রভৃতি এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। কেহই সমগ্র ভারতবর্ষের—কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া—আত্মকল্যাণের সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিবে না, এবং ইহাদের প্রত্যেকের কল্যাণের সমষ্টিই মহাভারতবর্ষের কল্যাণ। ইহার দ্বিতীয় পন্থা নাই। আমরা ধীরে ধীরে এই সত্যের সাক্ষাৎ পাইতেছি। যতদিন বাঙ্গালী বঙ্গভূমিকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিবে, সাফল্যের কথা, সমষ্টির বিনয় ভুলিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার সাধনা অপূর্ণ ও আদর্শ সঙ্কীর্ণ রহিয়া যাইবে। সুখের বিষয়, ভারতবর্ষের এই ঐক্যোপলব্ধি আজ ভাবুকগণের ধ্যান ও কর্ম্মীদের সাধনায় নূতন চেতনা আনিয়াছে। এই সত্যের সাক্ষাৎকার ভারতবর্ষের জীবনে আশার উদ্বোধন। কিন্তু এই আশাকে ত সাধনার বিষয় করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী নির্ব্বিশেষে ভারতবাসীর ভাব ও কর্ম্মে, আচারে ও ধর্ম্মে ইহাকে জীবন্ত করিয়া তোলা আবশ্যক সকলকে বুঝান দরকার ভারতবর্ষ অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং এক; ভারতবাসীর নিয়তিও এক। এই অখণ্ড ঐক্যের প্রতিষ্ঠা কি করিয়া হইবে? ত্রিশকোটী লোককে এক নিয়তির বাণী, এক সভ্যতার মর্ম্মকথা কি উপায়ে বুঝান যাইবে? এই অগণিত নরনারীর প্রাণে সমষ্টির আত্মীয়তা বোধ, ঘনিষ্ঠতার ভাব কোন্ পথ দিয়া জাগাইবে? ইংরাজ আমলে গবর্ণমেণ্ট, ইংরাজি ভাষা, একরূপ সুখদুঃখ, রেল, ষ্টীমার, টেলিগ্রাফ, খবরের কাগজ, সভাসমিতি প্রভৃতি ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম ঐক্যকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করিয়াছে। এখন ইহার সন্ধান বাহিরেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই সব উপায়ে যাহা হইবার তাহা ত হইয়াছে। এখন আর কোন্ দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক তাহা ভাবিতে হইবে।

সকলের আগে ভাবের ঐক্য চাই। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভাব, শ্রেষ্ঠ চিন্তা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ পঞ্জাব প্রভৃতি পাইবে; এবং বোম্বাই মাদ্রাজ এবং অন্য যে কোনও প্রদেশের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মহত্ত্বাব ও সাধু চিন্তার সহিত ভারতবর্ষের সকল প্রদেশই পরিচিত হইয়া উঠিবে। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন শরীরের সর্ব্বত্র বল সঞ্চার করে, দেশের চিন্তাবীর জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর ও কর্ম্মবীরগণের কার্য্য ও ভাব সেইরূপ যাহাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই নব আশা ও নবজ্ঞান ছড়াইয়া দিতে পারে, সেই দিকেই সর্ব্বাগ্রে অবহিত হওয়া আবশ্যক। শুধু ইংরাজিতে সে কাজ চলিবে না। ইংরাজি যে টুকু

করিবার করিয়াছে। খবরের কাগজ, ছাপাখানা ও বক্তৃতার আমলের বহু পূর্ব্বে শঙ্কর, গুরু নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্থাপকগণ অসংখ্য লোকের প্রাণে ভাবের ঐক্য জাগাইয়াছিলেন। বিদেশী ভাষা কি করিয়া ব্যাকুলহৃদয়ের সেই দুর্দ্দমনীয় ভাব ও প্রেম প্রকাশ করিবে? তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাগুলি এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। যাঁহারা ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চান, ভারতবাসীর সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত ঘনিষ্ঠতা যাঁহাদের কামনা, ভাবের বাঁশী বাজাইয়া সারা ভারতবর্ষের প্রাণে যাঁহারা স্পন্দন তুলিতে চান, এবং যে সাধকগণ সাধনার নৈবেদ্য মহাভারতবর্ষের বেদীতলে উপহার দিবার জন্য সাজাইতেছেন, তাঁহাদিগকে আজ বাঙ্গালা মারাঠী, হিন্দী ও তামিল ভাষা শিখিতেই হইবে। বাঙ্গালা, হিন্দী ও মারাঠী সংস্কৃতমূলক; সুতরাং একটী ভাল করিয়া শিখিলে অপরগুলি আয়ত্ত করা তাদৃশ কষ্টকর হইবে না। তামিল দিগের ভাষা স্বতন্ত্র। কিন্তু মান্দ্রাজকে ছাড়িয়া ভারতবর্ষের পূর্ণতালাভ বাতুলের কল্পনামাত্র। তাই তামিল ভাষা শেখাও আমাদের একান্ত প্রয়োজন। হিন্দী আয়ত্ত হইলে উর্দ্দু শিখিতে বিলম্ব হইবে না। উড়িয়া ও আসামী ভাষা বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞাতি। সুতরাং যিনি শ্রদ্ধা ও আগ্রহে ইহা ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিবেন, তাঁহার সাধনা বিদেশীর দুরূহ ভাষা আয়ত্ত করা অপেক্ষা অল্প শ্রমেই এইগুলি অধিগত করিয়া লইবে। "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং", চাই শ্রদ্ধা, চাই সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়। যাঁহার যেটী শিখিবার সুবিধা আছে, তিনি এখন সেই ভাষাটীই শিখিয়া লউন। কলিকাতায় একটী ভাষা শিখাইবার বিদ্যালয় (সান্ধ্য বা নৈশ) খুলিতে পারিলে ভাল হয়। বহু মেধাবী, আশাবান্ ছাত্র সহজেই শিক্ষার সুযোগ পাইবে। যদি এই প্রস্তাবটী আমরা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের নূতন দিক খুলিয়া যাইবে, কর্ম্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া উঠিবে, আমরা কর্ত্তব্যের প্রকৃত পথ চিনিয়া কর্ম্মে ও সাধনায় মহাভারতবর্ষের ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইতে পারিব। জানিনা এ রোদন অরণ্যে রোদন কি না!

* *
*

১০। উড়িষ্যার গ্রাম্য স্কুল

কয়েকজন স্বার্থত্যাগী শিক্ষিত মহোদয় উড়িষ্যার সত্যবাদী গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহার আদর্শ অনেকটা আমাদের যোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মত। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় স্কুলটির বিস্তৃত বিবরণ ভারতবর্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ১২ জন বালক লইয়া সত্যবাদী স্কুল আরম্ভ হইয়াছিল। এখন সেখানে প্রায় ৫০০ ছাত্র। ইহা দ্বারা শিক্ষা-বিষয়ে দেশের অভাব কিছু পূরণ হইয়াছে। এই স্কুল একবার দাঁড়াইয়া উঠিলে, উড়িষ্যার অন্য অন্য স্থানেও বিদ্যালয় স্থাপনা হইতে পারিবে। কর্ত্তৃপক্ষেরা আশা করেন, সত্যবাদী স্কুলের কোন কোন ছাত্র পরার্থপর হইবে। আজিকালি কেবল বঙ্গে নহে, ভারতের সর্ব্বত্র 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' রব উঠিয়াছে। কিন্তু কি ভাবে শিক্ষা পাইলে দেশের ছেলেরা মানুষ হইবে, সে বিষয়ে তেমন রব শোনা যাইতেছে না। স্কুল চাই—কলেজ চাই: কিন্তু কেন চাই? যাহা চাই তাহা পাইতেছি কি? অধিকাংশ স্কুল গতানুগতিক ন্যায়ে চলিতেছে। কিন্তু প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ। ছেলেরা কিছু শিখিতেছে না, এমন নহে। ইংরাজী শিখিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পার হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা বহু স্কুলের, কেবল উপরের একটা দুইটা শ্রেণী নহে, নীচের শ্রেণীতেও আদর্শ হইয়াছে। স্কুলে ছেলেরা "লেক্‌চর্" শোনে ঘরে গিয়া মাষ্টার-মশায় ও পণ্ডিতমশায়ের নিকটে পড়া মুখস্থ করে। অনেক স্কুলে ছেলেরা বহির বোঝা বহিতে বহিতে কাতর হইতেছে। এক ইংরাজী ভাষা শিখাইতে কত ব্যাকরণ, কত সাহিত্য, কত গল্পপুস্তক, বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদশিক্ষা, ইংরাজী রচনাশিক্ষা ইত্যাদি গদ্য-পদ্য কত

বহি পড়ান হইতেছে। এমন স্কুল আছে, যেখানে বর্ষে বর্ষে বহি পরিবর্ত্তিত হইতেছে; পাটীগণিত—বীজগণিতের বহিও হইতেছে! হঠাৎ দেখিলে এসব পরিবর্ত্তন জীবনের লক্ষণ মনে হয়। মনে হয়, শিক্ষার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কি কৌশলে অল্প সময়ে ছেলেরা পণ্ডিত হইতে পারে, তাহার পরীক্ষা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, অধুনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষা লঘু হইয়াছে। এবং সে কারণে বহু ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছে। আমার মনে হয়, পরীক্ষা লঘু হয় নাই; পরীক্ষা পার হইবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে। চারি-পাঁচ বৎসর ধরিয়া, যদি প্রবেশিকা-পরীক্ষা জপ করা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধ না হইবে কেন? উদ্দেশ্য দেখিলে, প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট, তাহা বলিতেই হইবে কিন্তু মানুষের অভাব-আকাঙ্ক্ষা পরিবর্ত্তিত হইতেছে; পরীক্ষা-পারগতা জীবনের লক্ষ্য হইতেছে না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সত্যবাদী স্কুলের যুবক-শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রবে থাকিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু স্কুলে পাঠ পড়িলেই ত হয় না; সংসার আছে। এই হেতু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়াছেন; এই বৎসর হইতে পাইয়াছেন তথাপি প্রচুর স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন। ইহার খরচের আশঙ্কায় সরকারী অর্থসাহায্য অদ্যা-বধি গ্রহণ করেন নাই। মাসিক ব্যয় ৫০০৲ টাকা, ৪০০ ছাত্র হইতে উঠিতেছে। অর্থাভাবে সকল দিকে মন দেওয়া হইতেছে না; কিন্তু নাই বলিয়া বসিয়া থাকাও চলে না। বস্তুতঃ দেশের পক্ষে স্কুলের পরীক্ষা—শিক্ষাপদ্ধতির পরীক্ষা আবশ্যক হইয়াছে। দেশের যাবতীয় বালক-বালিকাকে এক পাকা বাঁধা রাস্তায় চালাইয়া তাহাদের মন হইতে অন্য পথের সম্ভাবনা লুপ্ত হইতেছে। এমন কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, তিনি যে পথ উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তাহাতেই সমস্ত সিদ্ধি হয়। সুখের বিষয় স্কুলের ইন্‌স্‌পেক্টর হইতে সরকারী শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই সত্যবাদী স্কুলের প্রশংসা করিয়াছেন। দুই মাস হইল সত্যবাদী স্কুল হইতে "সত্যবাদী" নামক এক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে।

* *
*

আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় প্রচারের আবশ্যকতা

সেই মানুষই মহৎ, সেই জাতিই বড়, যাহার আদর্শ মহৎ। যাহারা সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া চলে, তাহাদের বাক্য, চিন্তা ও কর্ম্ম উদার। তাহাদের জীবনের কর্ত্তব্য-গুলির সঙ্কীর্ণতা ধীরে ধীরে ঔদার্য্যে ডুবিয়া যায়। নদী যেমন ক্রমাগতই তাহার জল-রাশি বহন করিয়া অসংখ্য লোকের তৃষ্ণা মিটাইয়া সাগরের সন্ধানে ছোটে, আদর্শবান মানুষও তাঁহার চারিপাশের লোকের কল্যাণ সাধন করিয়া স্বজাতি, স্বদেশ ও বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য জীবনোৎসর্গ করেন। এইরূপ একটা প্রাণ যে দেশের উপর দিয়া বহিয়া যায়—সে দেশ সরস হইয়া উঠে। যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসে তাহাদের তৃষ্ণা দূর হয়। অসংখ্য উষর ক্ষেত্র শস্যের শ্যামল শ্রীতে পুলকিত হইয়া উঠে কিন্তু মহৎ আদর্শের প্রতিষ্ঠা ত সুসাধ্য নয়। বহু চেষ্টা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ত্যাগের সমবায়েই এক একটী বড় আদর্শ ও বড় কাজ মানবসমাজে আপনার স্থান করিয়া লইতে পারে। মানুষকে নীচে টানি-বার জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র স্বার্থ, প্রলোভন, অপাথ সম্ভোগলিপ্সা আলস্য ও মোহ চারিদিকে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। মানুষ ইচ্ছা করিলেই বড় হইতে বা একটা বড় কাজ করিয়া ফেলিতে পারে না। বড় আদর্শের প্রতিষ্ঠার অথবা বড় কাজের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে long mis-sionary work বহুদিন ব্যাপী প্রচারের প্রয়োজন। লোকের চৈতন্য উদ্বুদ্ধ করা চাই। ইহার জন্য দৃঢ়হস্তে প্রকৃত জ্ঞানের আলো লোকের সম্মুখে ধরিতে হইবে। সাধারণের বোধশক্তি মহত্ত্বের দিকে আগ্রহ ও উন্মুখ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টারই প্রয়োজন যাহাতে মহৎচিন্তা মহদ্ভাব তাহা-দের মনে বিস্তারলাভ করিতে পারে, আর আদর্শ ও কাজের স্বরূপ তাহাদের আয়ত্ত হইয়া যায়। আঁধারে পথ হাতড়াইয়া মানুষ

মহত্ত্বের বেদীতলে কি করিয়া পৌঁছাইবে? পদে পদে যে মাথা ঠুকিয়া যাইবার ও দিশেহারা হইবার সম্ভাবনা। প্রচার তাই সকলের আগে। মানুষের চরিত্র, কার্য্য ও বাক্য আশ্রয় করিয়াই প্রকৃত জ্ঞানের প্রচার সম্ভব। চরিত্র যেখানে নির্ম্মল, স্বার্থশূন্য, ভক্তির মাধুর্য্যে ও নিষ্ঠার দৃঢ়তায় দীপ্ত, কার্য্য যখন বিপুল বন্ধনমুক্ত বাক্য জ্ঞানে ও সঙ্কল্পে প্রাণবান্ তখনই প্রচার সার্থক। নচেৎ বড় বড় কথা শতবার আওড়াইয়া গেলেও কাহারও প্রাণ স্পর্শ করিবে না। দেশের কাছে মনুষ্যত্বসম্পন্ন চরিত্র দেখাও, চারিদিকে নিঃস্বার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, দেশবাসিগণের আঁধার কুটীরে জ্ঞানের দীপ জ্বালাও, দেখিবে মহত্ত্বের প্রচার সার্থক হইয়াছে, লোক মহত্ত্বের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে।

* *
*

১২। দেশীয়রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা

আর একটী দেশীয় রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইল। সুরাটের অন্তর্গত মাচিন রাজ্যের নবাব বাহাদুর তাঁহার প্রজাদের উন্নতির জন্য এই হিতকর ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বরোদার প্রজাবৎসল অধিপতি মহারাজাও গায়কোয়াড় মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে মহীশূর, কর্পূরতলা এবং গণ্ডালেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। মাচিন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। মাচিনের নবাবের এই সাধু দৃষ্টান্ত দেশীয় নৃপতিগণের মনে অনুরূপ সঙ্কল্প জাগাইয়া তুলিবে আশা করা যাইতে পারে। বরোদার অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গায়কোয়াড় স্বয়ং ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যটনের সময়ে পাশ্চাত্য জাতিগণের শিক্ষা ব্যবস্থাগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যে Moving Library" "চলন্ত গ্রন্থশালা" এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা। ভাল ভাল বই লইয়া এক একটী ছোট খাট গ্রন্থশালা খোলা হয়। সেই গ্রন্থশালাটী একখানাটে পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিতে থাকে। লোকে হাতের কাছে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সরল সুপাঠ্য বই পায়। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই এক একটী পাঠকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। পয়সা খরচ করিয়া বই কেনা, দূরের পুস্তকাগারে গিয়া বই আনা, অথবা সময় ও উৎসাহ ব্যয় করা যাহাদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হইয়া উঠে না, তাহাদের কাছে এই "গ্রন্থশালা" গুলি বড়ই উপকারী। প্রজাবৎসল বরোদাধিপতি বহু হিতকর অনুষ্ঠানের কর্ত্তা এখানে উল্লেখ করিব? আমরা বারান্তরে গৃহস্থের পাঠকবর্গকে বরোদার বহুবিধরিণী শিক্ষাপ্রচেষ্টার কথা সবিস্তারে বলিব। গায়কোয়াড়ের প্রবর্ত্তিত এই "চলন্ত গ্রন্থশালা" বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চালাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে হয় না? যাহাহউক দেশীয় রাজাগুলি একে একে অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন, ইহা বড়ই সুখের কথা। আশা করি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও আর বেশীদিন এ বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না।

আমেরিকায় স্পেন ও পর্ত্তুগাল

ভারতে পর্ত্তুগীজ

স্পেনের কথা ভারতবাসীর শুনা নাই—কিন্তু পর্ত্তুগাল সম্বন্ধে আমাদের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ থাকিবার কথা। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। পর্ত্তুগীজেরাই এই প্রাচ্যপ্রতীচ্য সম্মিলনের প্রবর্ত্তক। আধুনিককালকার ব্রিটিশ ভারতের ন্যায় কিছুদিন একটা পর্ত্তুগীজ ভারতও ছিল। সেই পর্ত্তুগীজ প্রভাব মহারাষ্ট্রদেশে এবং বাঙ্গালায় এখনও দেখা যায়। মুসলমানী আমলে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজ বণিকগণের কথঞ্চিৎ হাত ছিল। আমাদের কবিরাজী শাস্ত্রে একটা নূতন রোগের উল্লেখ এই সময়ে দেখিতে পাই। তাহার নাম "ফিরিঙ্গি" রোগ। পর্ত্তুগীজদিগকে ফিরিঙ্গি বলা হইত। আজকাল ফিরিঙ্গি বলিলে আমরা যে কোন ইয়োরোপবাসীকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এই শব্দ যখন প্রথম সৃষ্ট হয় তখন একমাত্র পর্ত্তুগীজদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করা হইত। আমাদের ধর্ম্মজীবনেও পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানেরা কম প্রভাব বিস্তার করে নাই সেই সময়কার পর্ত্তুগীজ সাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুগণকে খৃষ্টান করিবার জন্য অত্যাচার ও নিপীড়ন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এখন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ শাসনের অধীন ভারত সেই ধর্ম্মপ্রচারের সাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় নরনারীগণের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান রেশ চলিত। তাহার ফলে রক্তসংমিশ্রণ এবং জাতিসঙ্কর ঘটিয়াছিল। তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি পর্ত্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। কিছুদিন হইল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় এবিষয়ে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার The Feringis of Chatgaon নামক পুস্তিকায় প্রাচ্যভারতে পর্ত্তুগীজ প্রভাব আলোচনা করিয়াছেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পর্ত্তুগাল এবং পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ভারতবাসী মাত্রের জানা আবশ্যক। এইজন্য পর্ত্তুগীজ ভাষা এবং সাহিত্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান ভারতের—অর্থাৎ প্রাচ্যপ্রতীচ্য-সমন্বয়-বিশিষ্ট ভারত-সমাজের—গোড়ার কথা ধরিতে পারিব না। তাহা হইলে আমরা ইয়োরোপীয় সভ্যতাকেও এক নূতন চোখে দেখিতে শিখিব।

পর্ত্তুগীজেরা যখন ভারতে পদার্পণ করিয়া নূতন পথে প্রাচ্য জগৎ এবং প্রতীচ্য জগতে সংযোগ বিধান করিল সেই সময়ে ইয়োরোপ করিয়াই জগতের চারিদিকে উপনিবেশ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস চলিতেছিল। তাহার ফলে একটা নূতন জগৎ আবিষ্কৃত হইল—তাহার নাম আমেরিকা। এই আবিষ্কারে অগ্রণী ছিল স্পেন ও পর্ত্তুগাল। তাহার পর ওলন্দাজ, ফরাসী এবং ইংরাজ ইয়োরোপের বিস্তারসাধনে এবং দুনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে কৃতিত্ব অর্জ্জন করে।

প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রধানতঃ স্পেনের গৌরব যুগ এবং খানিকটা পর্ত্তুগালের গৌরব যুগ। আজ ইংরাজ যতবড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে স্পেন তদপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিল। বিশ্বসাম্রাজ্য এবং বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনে স্পেনই অগ্রণী। স্পেনই জগতে এমন এক বিশাল রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিল যাহার উপর সূর্য্য কখনও অস্ত যাইত না। অর্থাৎ পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ এবং পশ্চিম গোলার্দ্ধ উভয় খণ্ডেই স্পেনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল—পর্ত্তুগালও এই যশ ভোগ করিত।

স্পেনের সেই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য আজ বিলুপ্ত হইয়াছে—পর্ত্তুগালের সেই গৌরবও আজ অস্তমিত। ইয়োরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলেই কেহ স্পেন ও পর্ত্তুগালের নাম করে না—ইয়োরোপের বাহিরে ইহাদের মর্য্যাদা থাকিবে কোথা হইতে? চিরদিন কখনও কাহার সমান যায় না। বিশ্বসাম্রাজ্য ও বিশ্ব-বাণিজ্য জগতের ইতিহাসে চিরকাল কোন নরসমাজের একচেটিয়া নাই। রাষ্ট্রমণ্ডলের ভারকেন্দ্র নিরন্তর স্থানান্তরিত হইতেছে।

ল্যাটিন আমেরিকার স্বরাজপুঞ্জ

উনবিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে নেপোলিয়ানী কুরুক্ষেত্রের সুযোগে আমেরিকা খণ্ডের স্পেনিষ ও পর্ত্তুগিজ উপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীন হইতে থাকে। স্বাধীনতালাভের পর ক্রমশঃ এই সমুদয় রাষ্ট্রে স্বরাজ ডিমক্রেসী বা রিপাব্লিক নামক প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে! বর্ত্তমানে এইরূপ ২০টি স্বরাজ স্বাধীনভাবে বিরাজমান। তন্মধ্যে উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো এবং দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিন, ব্রেজিল এবং চিলি সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। শেষোক্ত তিনটি রাষ্ট্রকে ইংরাজী নামের প্রথম অক্ষর অনুসারে A. B. C. States বলা হয়।

ভারতবর্ষে এই স্বরাজগুলির নাম পর্য্যন্ত শুনা আছে কি না সন্দেহ। আমাদের নদীয়াবাসী শ্রীযুক্ত সুরেশ বিশ্বাস ব্রেজিল রাষ্ট্রের সেনাবিভাগে অতি উচ্চপদ অধিকার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ব্রেজিল সম্বন্ধে আর বেশী কিছু জানে না। ইতালীর স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক সেনাপতি গ্যারিবল্ডি তাঁহার কর্ম্ম জীবনের কিয়দংশ ব্রেজিলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভারতের শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য এই তথ্য টুকু জানেন। তাহা ছাড়া সম্প্রতি মেক্সিকোতে বিপ্লব চলিতেছে, এই বিপ্লব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রে এবং মেক্সিকোতে গণ্ডগোল বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। সংবাদপত্রের সাহায্যে এই সম্বন্ধে খানিকটা উড়ু খবর ভারতবর্ষে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর আমরা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার এই বিস্তৃত জনপদের অধিবাসী, রাষ্ট্রমণ্ডল এবং সাধারণ সভ্যতা সম্বন্ধে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। এমন কি ইয়োরোপের লোকেরাও এই স্বরাজসমূহের প্রকৃত অবস্থা জানে না।

আমেরিকা বলিলে লোকেরা সাধারণতঃ উত্তর আমেরিকা মাত্র বুঝিয়া থাকে—বস্তুতঃ উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা মাত্র বুঝিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে উনবিংশশতাব্দীতে যুক্তরাষ্ট্র জগতের সকল প্রকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এবং ক্যানাডা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হওয়ায় দুনিয়ার নজরে থাকিতে পারিয়াছে। এই দুই জনপদে ইংরাজী ভাষার প্রাধান্য—বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী ইয়োরোপ হইতে আসিয়া এই দুই দেশের সমাজ সৃষ্টি করি-

তেছে সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভাষা এই দুই সমাজেই ইংরাজী—এবং ইংরাজের রক্তই সমাজের ভিতর প্রবল। এই জন্য আমেরিকার এই অংশকে য়্যাংগ্লোস্যাক্সন (Anglo-Saxon) আমেরিকা অথবা টিউটনিক (Teutonic) আমেরিকা বলা হয়। ইয়োরোপের আর্ম্মাণ, ওলন্দাজ, ইংরাজ ইত্যাদি জাতিসমূহ টিউটনিক গোত্রের অন্তর্গত। ইহাদের ভাষাসমূহ এক মূল হইতে নিঃসৃত হইয়াছে।

আমেরিকার এই দুই রাষ্ট্র ছাড়িয়া দিলে উত্তরে ও দক্ষিণে যে বিশাল জনপদ অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম ল্যাটিন (Latin) আমেরিকা অথবা রোমান্স (Romance) আমেরিকা। এই জনপদের আধুনিক স্বরাষ্ট্রসমূহ স্পেন ও পর্ত্তুগালের ভাষাভাষী নরনারীর রক্তে গঠিত হইয়াছে। এই সকল লোকের ভাষা প্রাচীন রোমের ল্যাটিন ভাষা হইতে নিঃসৃত। ফরাসী ভাষাও এই হিসাবে রোমান্স ও ল্যাটিন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ভূখণ্ডে ল্যাটীন জাতীয় সমাজের উপনিবেশ ছিল। কাজেই তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, কায়দা, ও রীতি নীতি সবই এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই জনপদের লোকেরা স্পেনিষ ও পর্ত্তুগীজ ভাষাই ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে—এবং স্পেন ও পর্ত্তুগালের সাহায্যেই ইয়োরোপের সঙ্গে আদান প্রদান চালাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতেও এখানকার কর্ম্মবীর ও চিন্তাবীরগণ স্পেন, পর্ত্তুগাল ও ফ্রান্স হইতেই তাঁহাদের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সমুদয় রাষ্ট্রের ভিতর একমাত্র ব্রেজিলে পর্ত্তুগালের সাম্রাজ্য ছিল। কাজেই ব্রেজিলের বর্ত্তমান দুইকোটি লোক পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথা বলে—ইহারা পর্ত্তুগালকে বেশী চিনে। হাইটি (Haiti) দ্বীপরাষ্ট্র ফরাসীসম্ভূত। অপর ১৮টী রাষ্ট্র স্পেনের অধীন ছিল—এই সমুদয়ে স্পেনিষ ভাষাই জনপদের মাতৃভাষা। ইহাদের লোক সংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটি।

এই সাড়ে সাত কোটি লোক বিশটী রাষ্ট্রের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে মেক্সিকো ব্রেজিল এবং A. B. C. States বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। কাজেই য়্যাংগ্লো-স্যাক্সন আমেরিকা, বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্র ইহাদের ভয়ে সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত। তাহার উপর জাপানের লোক জন ইতিমধ্যে লাটিন রাষ্ট্রসমূহের ভিতর বসতি স্থাপন করিতেছে, এবং ইয়োরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে হীনবল করিবার অভিপ্রায়ে লাটিন রাষ্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, রাজস্ব ইত্যাদি বিভাগে গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া থাকে। মোটের উপর দেখা যাইতেছে আগামী ত্রিশবৎসরের ভিতর লাটিন আমেরিকাই জগতের একটা প্রবল ঘটিকাকেন্দ্রে পরিণত হইবে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই জনপদের ভবিষ্যৎ লইয়া জাপানে, যুক্তরাষ্ট্রে, এবং ইয়োরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জে ঘোরতর জটিলতা পুষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা গিয়াছে। এক্ষণেই বুঝিতে পারা যায় যে, লাটিন-আমেরিকা-সমস্যাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা। প্যানামা খাল কাটা হইবার ফলে জাপান ও ইয়োরোপের প্রভাব আমেরিকা খণ্ডে আরও বাড়িয়া যাইবে। ফলতঃ ল্যাটিনসমস্যা ঘনাইয়া আসিবে।

কাজেই নিউইয়র্কে হান্টিংটন Hispanic

Society বা "স্পেনতত্ত্ব প্রচারিণী সভা"র প্রতিষ্ঠা নিতান্তই স্বাভাবিক। স্পেন, পর্ত্তুগাল এবং ফ্রান্স অর্থাৎ ইয়োরোপের ল্যাটিন সমাজকে না বুঝিলে ল্যাংলোস্যাক্সন আমেরিকা ঘর সামলাইতে পারিবেন না।

এই সোসাইটির প্রবর্ত্তক শ্রীযুক্ত হান্টিংটনের সঙ্গে কয়েকবার দেখা হইয়াছে। ইনি স্পেন ও পর্ত্তুগালের ভাষা ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার একবার ভারতবর্ষে আসিবার সখ খুব বেশী। সম্ভবতঃ ভারতে পর্ত্তুগীজ প্রভাবের পরিচয় পাওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া দেশ দেখা ত আছেই। ইনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, আমি যদি ইচ্ছা করি—তাহা হইলে মোটরকারে বসিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিতে পারি কি? ভাল ভাল পাকা রাস্তা আছে ত?" বুঝিলাম—ইহার নাম "আমেরিকান টুরিষ্ট।" ইহার পয়সার অভাব নাই। আমি বলিলাম—"স্পেন পর্ত্তুগাল ভ্রমণ করিয়া স্পেনতত্ত্ব-প্রচারিণী সভা স্থাপন করিয়াছেন। আশা করি আপনার ভারতভ্রমণের ফলে নিউইয়র্কে একটা ভারত-তত্ত্ব-প্রচারিণী সভাও সংস্থাপিত হইবে।" ইনি উত্তর করিলেন—"ইচ্ছা আছে। দেখা যাউক কতদূর কি হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদের দেশবাসী সাহায্য করিবেন কি?"

একদিন "হার্ভার্ড ক্লাবে" আর্জেন্টিন সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। বক্তা আমেরিকান ভূগোল-পরিষদের সভ্য। ইনি আর্জেন্টিনের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জলবায়ু, রাস্তা ঘাট, ধাতু খনি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ল্যাণ্টার্ণ স্লাইডের চিত্র দেখাইয়া ইনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আর্জেন্টিনের ক্রমিক উন্নতি বুঝাইয়া দিলেন।

অধ্যাপক শেপার্ড

ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি বহুবার মেক্সিকো হইতে দক্ষিণ আমেরিকার শেষ সীমা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। দুই এক বৎসর হইল ইনি ভারতবর্ষও দেখিয়া আসিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দী হইতে জগতে ইয়োরোপের বিস্তার সুরু হয়। বর্ত্তমান ভারত এবং বর্ত্তমান আমেরিকা খণ্ড সেই Expansion of Europe এর এক নিদর্শন। কাজেই ইয়োরোপের উপনিবেশগুলি বুঝিবার সময়ে বিগত ৩০০ বৎসরের ভারতেতিহাসও পণ্ডিতগণের জানা কর্ত্তব্য। এই বুঝিয়া ল্যাটিন আমেরিকার বিশেষজ্ঞ মহাশয় ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। ইহার নাম শেপার্ড (Shepherd)। ইনি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে Colonial History র অধ্যাপক। ইনি বলিলেন—"মহাশয়, আমি তাড়াহুড়া করিয়া গ্রন্থপ্রকাশের পক্ষপাতী নহি। আমার বন্ধুগণ দুই তিন মাস মাত্র চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদি দেশে বাস করিয়া ৭০০।১০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থ লিখিয়া ফেলেন। কিন্তু আমি এতদিনে দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে একখানাও বড় গ্রন্থ লিখিতে পারিলাম না। এই সেদিন Home University Library গ্রন্থমালায় "Latin America" নাম দিয়া একটি পুস্তিকা লিখিয়াছি মাত্র।"

ইহার মতে ইয়োরোপের জাতিপুঞ্জ বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া নানাভাবে নব নব ধারণা গ্রহণ করিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকা ইয়োরোপের নিকট অনেক বিষয়ে নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু ইয়োরোপও এই সমুদয় জনপদের অধিবাসীদিগের নিকট কম ঋণী নয়।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার উপর এই সমুদয় সমাজের প্রভাব এখনও সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হয় নাই। তাহা হওয়া আবশ্যক। ভারতবর্ষ ইয়োরোপকে কোন্ কোন্ বস্তু দান করিয়াছে তাহার সংবাদ ইংরাজী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কোন কোন জার্ম্মাণ, ফরাসী ও রুশ পণ্ডিত এই বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু যথোচিত আলোচনা এখনও হয় নাই। ভারতবাসীরা যদি তাঁহাদের বিগত তিন শতাব্দীর ইতিহাস ইয়োরোপের সমসাময়িক ইতিহাসের সঙ্গে মিলাইয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন তাহা হইলে এই কার্য্য সহজে সিদ্ধ হইতে পারে।

শেপার্ড বলিলেন—"ল্যাটিন আমেরিকা সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়ান এবং ইয়াঙ্কিদিগের ভুল ধারণা আছে। ইহারা মনে করে যে এই বিস্তৃত ভূখণ্ড কেবলমাত্র টাকা রোজগারের জায়গা। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানা, কৃষি ব্যাঙ্ক ইত্যাদি চালাইবার জন্য লোকেরা আসিয়া থাকে। পর্য্যটকগণ এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরাও এই চোখেই ল্যাটিন আমেরিকা দেখিতেছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ল্যাটিন আমেরিকা এইরূপ জনপদ নয়। উচ্চ অঙ্গের সভ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করিলেও ল্যাটিন আমেরিকা আমাদের ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ য়্যাংগ্লোস্যাক্সন আমেরিকার নীচে পড়িবে না। সাহিত্য-সেবা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, চিত্রকলা, শিক্ষা-বিস্তার, পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ল্যাটিন আমেরিকায় কম নয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এই ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহ নানাবিধ উৎকর্ষের অধিকারী হইয়াছে। এ সত্য বেশী দিন চাপা থাকিবে না।"

ল্যাটিন আমেরিকা ও ভারতবর্ষ

শেপার্ডের মতে ভারতীয় সমাজে এবং ল্যাটিন আমেরিকার সমাজে খানিকটা সাদৃশ্য আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় এখানেও অসংখ্য স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্র বিদ্যমান। ইহাদের নর-নারীরা পরস্পর ভাববিনিময় ও কর্ম্ম-বিনিময় বেশী করে না; কিন্তু সকলেই ল্যাটিন সভ্যতার অধিকারী বলিয়া গৌরববোধ করে এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যপাশে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে। ইহাদের অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস যে ইহাদের অভ্যন্তরে একটা সূক্ষ্ম একতাধারা প্রবাহিত। তাহার ফলে ইহারা য়্যাংগ্লোস্যাক্সন আমেরিকা হইতে কথঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন।

শেপার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "ভারতবর্ষেও এইরূপ নয় কি? আপনাদের তেলেগু বা তামিল ভাষাভাষী নরনারীরা লাহোর অথবা কলিকাতার সমাজ সম্বন্ধে কোন কথা জানে কি? বোধ হয় সামান্য মাত্র জানও নাই। আধুনিক ইংরাজীনবীশ শিক্ষিতেরা কথঞ্চিৎ ভাববিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন হিন্দুত্বের প্রভাবে সমগ্র ভারতই ঐক্যবদ্ধ একথা অস্বীকার করিবার যো নাই। আপনার দেশের এক গ্রন্থকার The Fundamental Unity of India নামক পুস্তকে যে সত্য বিবৃত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। একজন আর এক-জনকে জানে না শুনে না—পরস্পরের স্বার্থ হয়ত প্রচুর পরিমাণেই বিভিন্ন—তথাপি ইহারা প্রাণে প্রাণে ঐক্য ও সামঞ্জস্য বোধ করে। এরূপ মনোভাব ল্যাটিন আমেরিকায় দেখিয়াছি আর ভারতবর্ষে পাইয়াছি।"

আর এক বিষয়ে শেপার্ড ভারত ও ল্যাটিন আমেরিকার সাদৃশ্য দেখাইলেন। ইনি

বলিলেন "আমি একদিন দিল্লীতে Supreme Legislative Councilএর সভায় উপস্থিত ছিলাম। Press Actএর সমালোচনা হইতেছিল। আপনাদের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। দেখিলাম ভাষার ছটা, বক্তার ওজস্বিতা, আবেগময়ী উদ্দীপনা। পুলকিত হইলাম কিন্তু কাজের কথা একটাও পাইলাম না। বক্তা মানবজাতির অধিকার, স্বাধীনতার আবশ্যকতা ইত্যাদি সবই বুঝাইলেন কিন্তু এক ওই তিন চারি করিয়া বর্ত্তমান ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের অসম্পূর্ণতা দেখাইতে পারিলেন না। ল্যাটিন আমেরিকারও এইরূপ emotional, imaginative, কবিত্বময়, আবেগময় রাষ্ট্রবীর অনেক।"

হিন্দু-ছাত্র

রুশ বেদনার বাণীমূর্ত্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২)

"কারাগৃহের স্মৃতি" (Recollection of the House of Dead) ডষ্টয়েবস্কির অমূল্য রচনা। ডষ্টয়েবস্কির অধিকাংশ উপন্যাস এবং গল্প শুদ্ধ মানবচরিত্রের অতিমাত্র দৌর্ব্বল্য অথবা পরাক্রমবিকাশের সুনিপুণ চিত্র। কিন্তু "কারাগৃহের স্মৃতি" সেই অতিমাত্রতারও সীমা অতিক্রম করে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ডষ্টয়েবস্কিকে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল "কারাগৃহের স্মৃতি" এই নির্ব্বাসনের প্রতিকৃতি। সমুদ্রমন্থনে গরল না উঠিলে নীলকণ্ঠের নীলকণ্ঠত্ব ঘটিত না। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন না হইলে ডষ্টয়েবস্কি হইতে কারাগৃহের স্মৃতি বাহির হইত না। কিন্তু "কারাগৃহের স্মৃতি"তে রাজনীতির নাম গন্ধ নাই।

য়্যালেকজাণ্ডার গোরিয়ানচিকফ্ একজন লেখক। ঈর্ষা এবং সন্দেহবশে ক্রোধান্ধ হইয়া ইনি নিজ স্ত্রীকে হত্যা করেন। ফলে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হন। লেখাপড়ার স্বাধীনতা ইহার ছিল না। কাজেই সহকারাবাসিগণকে পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই চরিত্র বিশ্লেষণগুলির সমষ্টিই "কারাগৃহের স্মৃতি।"

কারাগৃহের স্মৃতির বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ইহার বিশেষত্ব কিছুই উপলব্ধি হয় না। কাজেই ইহার প্রকৃতি কি সাধারণ ভাবে বুঝা প্রয়োজন। প্রথমতঃ যে যুগে ডষ্টয়েবস্কি এই দুষ্কৃতিন অপরাধীর চরিত্রবিশ্লেষণে ব্যাপৃত হন—তখন সমাজতত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক দণ্ড ও অপরাধের আলোচনা বিশেষতঃ অপরাধীর চরিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদির প্রতি কাহারও লক্ষ্য পড়ে নাই। কিন্তু ডষ্টয়েবস্কির সহানুভূতি এবং উপলব্ধি শক্তি এতদূর উচ্চ অঙ্গের ছিল যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ডষ্টয়েবস্কির গবেষণাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ডষ্টয়েবস্কি কোনকালেও অপরাধীকে পশুবৎ হেয়জ্ঞান করেন নাই। এই কারাবাসিগণের প্রতি ভালবাসা এবং সহানুভূতি দিবারাত্রে তাঁহার হৃদয়কে দ্রবীভূত

করিত। যে ব্যক্তির প্রতিভা উচ্চ অঙ্গের নয়, যে ব্যক্তির চরিত্রে এবং পদ্যবেক্ষণে গাম্ভীর্য্য নাই—সেই ব্যক্তিগণই এক দোষে দোষীর হৃদয় একেবারে দোষপূর্ণ এবং একটী গুণাবলম্বীর হৃদয় গুণপূর্ণ দেখিতে চায়। তাহাদের বিচারশক্তি এত কম এবং তাহাদের মন এত সঙ্কীর্ণ যে অতি ভয়ঙ্কর দোষের পিছনে গুণ এবং গুণপরম্পরার পিছনেও যে দোষ থাকিতে পারে একথা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। কাজেই কারাবাসী নির্ব্বাসিত এই নাম শুনিলে সাধারণ লোকে কেবল তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে অভিনবের উদ্ভাবন চিরকালই সাধারণের তাচ্ছিল্যের অবস্থা হইতে তোলা হইয়াছে। আর ডষ্টয়েবস্কির মত প্রতিভাই এই উদ্ভাবনের পক্ষপাত করিতে পারে।

ডষ্টয়েবস্কি পাপীর বেশ ধরিয়া নির্ব্বাসিতের মন বুঝিতে গিয়াছিলেন। তিনি অতি অল্পকাল মধ্যে কতিপয় নির্ব্বাসিত অপরাধীকে বন্ধুভাবে ধরিতে পারিয়াছিলেন, এই সান্ত্বঃকরণ ব্যবহারের ফলেই তিনি তাহাদের মন বুঝিতে সমর্থ হন।

কয়েকটী চিত্র এস্থানে প্রদর্শন করিতেছি। সর্ব্বপ্রথম বলা প্রয়োজন যে ঘোরতর অপরাধী নির্ব্বাসিত এবং সুকুমার শিশু ও বালকের চরিত্রে সাদৃশ্য অত্যধিক। ইহা প্রকৃতির কুটিল জালের গঠন। শিশু যেমন ভালমন্দ বিচারে অক্ষম যখন যা মনে হয় তাহা করিতে চায়। শিশু সুকোমল ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া সুশোভন গৃহসজ্জার বিকৃতি বা লোপ করিয়া যেন সন্তোষ লাভ করে। ঠিক সেই ভাবে অপরাধীও তার অভিলষিত কার্য্য করিয়া—বিনা বিচারে তাহার কার্য্যফলের সুখ উপভোগ করে। সাইবিরিয়ার দুরন্ত শীতে যখন কর্ত্তৃপক্ষের ভবনসমূহ বরফে ডুবিয়া যাইত তখন উহার নিরাকরণ নির্ব্বাসিতগণেরই স্কন্ধে পড়িত। সকলেই মনে করিবেন কি দুরূহ কাজ? কিন্তু নির্ব্বাসিতগণ এই কাজকে ভিন্ন চক্ষে দেখিত। প্রত্যেককে এক এক খানা কোদাল দেওয়া হইত। দুই হাত পরিমাণ গভীর বরফে এই কোদাল বসাইয়া সবলে বরফ সহ কোদাল বাহির করিয়া পিছন দিকে ফেলিতে হইত। কিন্তু কারাবাসীরা এ উপলক্ষ্যে বরফে গুলি পাকাইয়া পরস্পরের প্রতি ব্যঙ্গচ্ছলে ছোড়া ছুড়ি করিত। অতি অল্পকাল মধ্যেই এই শৈশবোচিত ক্রীড়ায় শৈশবোচিত পরিণামেই উপনীত হইত। কারাবাসিগণ খেলা হইতে প্রকৃত মারামারিতে আসিয়া পৌঁছিত। সমধিক সুস্থগণকে তখন এই খেলার নিবৃত্তির প্রয়াসে নিযুক্ত হইতে হইত।

"কারামাজফ ভ্রাতৃগণ" ডষ্টয়েবস্কির শেষ এবং অনেকাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। "দরিদ্রের কথা" ডষ্টয়েবস্কি প্রতিভার উষা, "দণ্ড ও শান্তি" মধ্য যাম এবং "কারামাজফ ভ্রাতৃগণ" প্রচণ্ড মধ্যাহ্নকাল। জীবনের সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিভার দ্বিপ্রহর আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু "কারামাজফ ভ্রাতৃগণ" দৈবক্রমে ডষ্টয়েবস্কির শেষ গ্রন্থ নহে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ডষ্টয়েবস্কি রুসের রুশত্ব প্রতিপোষক এবং প্রকাশক। "দরিদ্রের কথায়" সেই রুশত্ব দৈন্যের সহিত সহানুভূতিতে প্রকাশিত হয়। "দণ্ড ও শান্তিতে" সেই রুশত্ব প্রচণ্ড মনের বল, আত্মনির্ভর, আত্মজ্ঞান ও আত্ম অনুশোচনারূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু "কারামাজফ ভ্রাতৃগণ" সমগ্র রুস জীবনের

সমবয় এবং অতি অদ্ভুত সমবয়। উপন্যাসের ঘটনাবলী নরকের গভীরতর অন্ধকার অপেক্ষাও তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু এই নিবিড় তমসায় ভক্টরেব্‌স্কি অতি দিব্য বিভাসিত মানব-চরিত্র এবং মানবের চিরবাঞ্ছিত এবং চির-অতৃপ্ত ঈশ্বর অন্বিষ্কর, আত্মার নিত্য-অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু "কারামাজফ ভ্রাতৃগণ" কোন মতেই আদর্শ-মূলক উপন্যাস নয়। রুশেরা নিত্য যেভাবে জীবন যাপন করে, নিত্য-নৈমিত্তিক সাধারণ ও অসাধারণ ঘটনাবলীতে যেরূপ নৈসর্গিক ব্যবহার করে —অন্যান্য যাবতীয় ভক্টরেব্‌স্কির উপন্যাসের ন্যায় "কারামাজফগণ"ও সেই একই বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব জীবনের প্রতিকৃতি গঠন এবং সেই প্রতিকৃতির পিছনে জীবনের আদর্শের পৃষ্ঠপ্রতিপোষক অঙ্কন কেবল ভক্টরেব্‌স্কি-প্রতিভার বিশেষত্ব।

ভক্টরেব্‌স্কি দুর্ভাগ্য ক্রমে এই উপন্যাস খানি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। এই উপন্যাস খানি তিন খানি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পরিণত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। মাত্র একখানি সমাপ্ত করিবার সময় তিনি পাইয়াছিলেন।

এই উপন্যাসে পাঁচটী সর্ব্ব প্রধান চরিত্র। প্রথমতঃ পিতা কারামাজফ, পশুপ্রকৃতির সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। আজীবন পান এবং দেহ প্রবৃত্তির ক্রীতদাস—কালক্রমে পাপের পাপত্ব উপলব্ধিতে অসমর্থ এবং প্রকৃতপক্ষে পাপকলুষে গর্ব্বান্বিত। কিন্তু সময়ে সময়ে নরকের ভয়ে তাহার মন কুণ্ঠিত হয়। পুত্রগণের জন্যেও তার ত্রাস কম নয়। কিন্তু এ যেন ভক্ত-ব্যাকুলতা তার মনে বেশীক্ষণ স্থান পায় না।

পৃথিবীতে পাপের চরিত্রও নানাবিধ। সৌন্দর্য্যে ও বাল্যে নিষ্কলঙ্ক, হিতকথা না শুনিয়া অহিতে প্রবৃত্ত হওয়া দিবারাত্রির মধ্যে অনেকবারই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাতে আমাদের প্রবল ঘৃণা বা গুরুপাপীর ধ্বংস-সাধনে কাহারও মনে আসে না বরং অনেক সময় সেই তরুণ বলিয়াই হাসি স্নেহ-পূর্ণ বচন বা প্রিয় আলিঙ্গনই দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যৌবনের পাপ দোষ বরং অনিষ্ট মতে অবশ্যই দণ্ডার্হ হয় কিন্তু যৌবনের প্রচণ্ড বাসনা এবং লিপ্সা প্রায়ই পাপের পাপত্বের লাঘব করে। প্রৌঢ়বয়সে পাপী পাপী থাকিবে কিনা তাহা স্থির হইতে চলে—কাজেই ঘৃণা অথবা অনুতাপের বিনিময়ে সহানুভূতি এই দুইএর একটী পাপীর অদৃষ্টে আসিয়া জুটে। সুকুমার শিশুর নির্দ্দোষ আলাপ যেরূপ অমৃত—বৃদ্ধ পাপীর পাপ ঘৃণা তেমনিই প্রচণ্ড—তেমনি কুটিল কণ্টকের আঘাত স্বরূপ ঘৃণাকারকেরও পক্ষে কষ্টদায়ক। কাজেই এরূপ পাপীর জন্য বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করিবার বাকি পৃথিবীতে সাংসারিক লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না। পিতা কারামাজফ এরূপ পাপী। পিতার কর্ত্তব্যে পিতৃস্বরূপ গৌরবান্বিত আসনের প্রতিও তার বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নাই। সে জানে পশুপ্রবৃত্তি এবং তার আস্বাদন। কাজেই সেই আস্বাদনের গৌরবকরাও তারপক্ষে অসম্ভব নয়। নিরুপায় শিশুকে যে সাপে দংশন করিয়াছে তার প্রতিকার দয়া হইবে? পিতা হইয়াও যে পশুত্বে অন্বিত তার প্রতি কোন্ পুত্রের শ্রদ্ধা হইবে?

দ্বিতীয় চরিত্র জ্যেষ্ঠ পুত্র মিতিয়া কারামাজফ সে পিতার পাপের—প্রবৃত্তির পূর্ণ উত্তরাধিকারী। ইহার দেহ-সৌন্দর্য্য এবং শারীরিক বল—যথেষ্ট, বিবেকজ্ঞানও কিছু

আছে—কাজেই অনুতাপ করিবার শক্তি এককালে লোপ পায় নাই। কিন্তু আত্ম-সংযম বিন্দুমাত্র নাই, কাজেই পাপের ক্রীতদাস।

দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গে যদি চরিত্র না থাকে তবে সৌন্দর্য্য আস্বাদকগণ আক্ষেপ করেন, কিন্তু নীতিমান তাঁর ঘৃণা বিন্দুমাত্রও কমান না। বরং দেহসৌষ্ঠবের বলে অচরিত্রের কলুষ কম দেখা যাইবে ইহাই ভয় করেন। কিন্তু যিনি নীতিমান এবং সৌন্দর্য্যও সম্ভোগ করিতে পারেন, তিনি মিভিয়া কারমাজফকে ঘৃণা কম করিবেন না কিন্তু ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবিবেন "যদি এ হেন পিতার পুত্র না হইত তবে বোধ হয় ইহার চরিত্র ও দেহসৌন্দর্য্যের উপযোগী হইত।"

তৃতীয় চরিত্র—দ্বিতীয় পুত্র আইভান। নগরের ঘটনা—পিতৃহত্যা—ইহারই অভি-সন্ধির ফল। ইহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। ইহার মানবজাতির প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। কিন্তু মানব চরিত্রে ইহার দৃষ্টি অতি গভীর এবং আত্ম-সেবাই ইহার জীবনের এক মাত্র চরম উদ্দেশ্য।

নেকড়ে বাঘ অসহায় মেষ-শিশুকে আক্রমণ করিলে পৃথিবীর সকলেরই সহানুভূতি মেষ-শিশুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু মেষ-শিশু ভিন্ন বাঘের শোণিত পিপাসা মিটে না—কাজেই মেষ-শিশু হয় আত্মরক্ষা করুক নচেৎ বাঘের ক্ষুধা তৃপ্তি করুক—পৃথিবীরই যেন এই দারুণ বিধি। মেষ-শিশু মেষ বলিয়া অসহায় একথা বাঘ শুনিবে না এবং বাঘের আক্রমণকেও সেই কারণে দোষ দেওয়া চলে না। আইভান, ধূর্ত্ত, অভিসন্ধি-পরায়ণ এবং অভিসন্ধিসাধনে সক্ষম। তার পথরোধ করে কে? কবে কোন্ মানুষের নীতি, মানুষের আইন কানুন আইভান-সদৃশ চরিত্রের পথে দাঁড়াইয়াছে? কবে কোন্ রাষ্ট্র ক্ষমতা আইভান-সদৃশ চরিত্রকে আইনের অধীনে আনিতে পারিয়াছে? রাষ্ট্র ক্ষমতা দুর্ব্বলের জন্য। নির্ভীক দৃঢ়মনা আইভানের নিকট রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতিপত্তি অতি অল্প। যে কেহ আইভানের দোষ দিবেন তাঁহারা যেন আইভানের ক্ষমতাকে উপেক্ষা না করেন। দুর্ব্বল যখন বলবানের দোষ দেখে তখন শক্তির প্রশংসা না করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু শক্তির অপব্যয় হোক আর না হোক তার পূজা করিতে হইবেই। মানুষের মনুষ্যত্ব জীবন-সঙ্কট প্রতিরোধে—আর শক্তিই সেই প্রতিরোধের উপায়। আইভান তার অসাধারণ চরিত্র-জ্ঞান এবং মানুষ পরিচালনের ক্ষমতা নিজ স্বার্থ-সাধনে প্রয়োগ করিয়া তার অপব্যয় করুক। কিন্তু আইভান যেমন নিজ স্বার্থের জন্য করিয়াছে, ছোট বড় সকলকেই তাদের স্ব স্ব অভিসন্ধির জন্য সেই একই শক্তি সঞ্চয় করিতে এবং প্রয়োগ করিতে হইবে। জীবন-সংগ্রাম সতত চলিতেছে; কিন্তু কতক্ষণ এবং কতবার ইহা আমরা উপলব্ধি করি? ডষ্টয়েভ্স্কির যাবতীয় উপন্যাস এই আভ্যন্তরিক সংগ্রামের ব্যক্তিগত ইতিহাস স্বরূপ। আইভানের দুশ্চরিত্রের মর্ম্মান্তিকতা এই জীবন-সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র যে শক্তি তাহা সর্ব্বদা উপলব্ধি করা যায়।

চতুর্থ চরিত্র—তৃতীয় পুত্র আলেষা—ইনি একজন সাধক। ভূমণ্ডলব্যাপী সহানুভূতি ইহার বিশেষ লক্ষণ। আইভানের চরিত্র দেখিয়া আরেয়গিরির কথা স্মরণ হয়। সাক্ষাৎ যম যেন সাতশত যোজন নিয়ে বসিয়া

জীবন-নাশক প্রস্তর, দুর্দ্দিত বায়ু প্রস্তুত করিতেছে এবং সুযোগ বুঝিয়া নিঃসৃত হইয়া নিজ দুষ্কার্য্যে আত্মোপভোগ করিতেছে। আলেষাও গিরির ন্যায় উচ্চ, উদার। গিরির উপরিস্থ উপত্যকা আর আলেষার চরিত্র একইরূপ। গিরির উপরে প্রার্থনা নাই, দুর্দ্দিত বায়ু নাই। নিত্যানন্দ, নিত্যশান্তি উহার লক্ষণ। ঔদার্য্যে ও মহত্বে উহা উন্নত।

পঞ্চম চরিত্র—চতুর্থ পুত্র—স্মেরডিয়াকফ—ইহার মাতা গ্রামের এক অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক, এই কারমাজফ বিবাহিত পত্নীর সন্তান। অল্পবুদ্ধি মৃগীরোগী—পিতৃহত্যা ইহারই কাজ। কিন্তু আইভান তার প্রকৃত অভিসন্ধি-কর্ত্তা এবং আইভান এরই উত্তেজনায় এহেন কাজে প্রবৃত্ত হয়। পরে আত্মহত্যা করে।

জ্যেষ্ঠপুত্র মিতিয়া এবং পিতা কারমাজফ একই স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়। কাজেই সকলেরই সন্দেহ জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর পড়ে। কাজেই মিতিয়া পিতৃহত্যার ফলভাগী হয়। স্মেরডিয়াকফ আত্মহত্যার পূর্ব্বেই আইভানকে সকল কথা খুলিয়া বলে। কিন্তু আইভানও বিকার এবং ভ্রমবশে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে—কাজেই তার কথায় কেহই প্রত্যয় করে না।

এর বেশী লিখিবার সময় ডষ্টয়েবস্কি পান নাই। বাকী খণ্ডে আইভান এবং আলেষার চরিত্র বিকাশ ডষ্টয়েবস্কির উদ্দেশ্য ছিল।

ডষ্টয়েবস্কির কয়েকখানি উপন্যাসের সামান্য মাত্র আভাস দেওয়া হইল। এখন ডষ্টয়েবস্কির রুশ সাহিত্যে কি স্থান এবং তার বিশেষত্ব কি সে বিষয়ে সামান্য কিছু বলা প্রয়োজন।

ডষ্টয়েবস্কি পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত, সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ থেকে শেষ গ্রন্থ পর্য্যন্ত আগাগোড়া রুশ। ইয়োরোপ রুশকে উপলব্ধি করিত না একথায় ডষ্টয়েবস্কি নিরুৎসাহ হইতেন না। ইয়োরোপের রুশকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই এই উত্তর দিতেন। রুশের যে ভবিষ্যৎ আছে—রুশিয়া যে পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিবে—পৃথিবী যে রুশিয়ার নিকট শিখিবে এ ধারণা ডষ্টয়েবস্কির মনে এত প্রবল ছিল যে তাঁর প্রত্যেক পুস্তকেই ইহার আভাষ পাওয়া যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে জাতীয় অভ্যুত্থান এবং সাহিত্যের উন্নতি প্রায় প্রত্যেক দেশেই সমকালবর্ত্তী হইয়াছে। রুশের বর্ত্তমান প্রতাপ ডষ্টয়েবস্কি টলষ্টয় ও তুর্গেনেভের সময় হইতেই সমুদয় পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

উপন্যাস লেখকের দিক হইতে দেখিলেও ডষ্টয়েবস্কি এক অদ্ভুত চরিত্র। আগাগোড়া সমুদয় উপন্যাস ডষ্টয়েবস্কির মৌলিকতা ব্যক্ত করে। তিনি বাহ্য জগতে বিশেষ লক্ষ্য করিতেন না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহার চরিত্রগুলির মানসিক অবস্থার বিবরণ। এই চরিত্রগুলিও তিনি তাঁহার অদ্ভুত মতে গঠন করিয়াছেন। ডষ্টয়েবস্কি কেবল তাঁহার চরিত্রগুলির উপস্থিত মনোভাব ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। প্রত্যেক উপস্থিত মনোভাবের পিছনে কি আছে তাহার স্তর স্তর বিবরণ দিয়া একটী সুন্দর ভূধরন সৃষ্টি করিতেন। এই উপস্থিত মনোভাবের পশ্চাৎ ভাব বিকাশ ডষ্টয়েবস্কির ন্যায় অন্য কেহই এপর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই।

ডষ্টয়েবস্কি বাস্তব-জীবন-বিষয়ক উপন্যাস-লেখক সত্য। কিন্তু তিনি মনুষ্যচরিত্রের আভিশয্যের বাস্তবিকতার চিত্রকর। ডষ্টয়েবস্কির নায়ক নায়িকাগণ হয় অর্দ্ধ উন্মত্ত, নয় ত মৃগী অথবা অন্যান্য স্নায়ু রোগাক্রান্ত। কাজেই

স্থিরচিত্ত লোকের ন্যায় তাদের ব্যবহার বা চরিত্র নয়। কিন্তু তাই বলিয়া ডষ্টয়েভ্স্কির উপন্যাসগুলি কেবল উন্মাদের কুহেলিকাপূর্ণ নয়; ডষ্টয়েভ্স্কির উন্মত্ত চরিত্রগণও মানব-চরিত্রের, মানব-জীবনের এবং মানবে মানবে পরস্পরের সম্পর্ক লইয়া প্রমাণ, কাজেই তাদের পাগলামী হইতে আমাদের শিখিবার বিস্তর আছে। দরিদ্র থাকায়, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাসকোলনিকফ, দুরাশক্ত স্বিড্রিগাই-লফ্, ষড়যন্ত্রকারক আইভান কারামাজফ প্রভৃতির কেহই সাধারণ মানুষ নয় অথচ প্রত্যেকেরই চরিত্রের পিছনে সেই এক ডষ্টয়ে-ভ্স্কির বিশেষত্ব। তাহা এই—মানুষ মানুষ হইতে নিশ্চয়ই নিজ নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাহিবে। কেহ যে উপায়ে করিবে তাকে আমরা বলি সৎ। কেহ অন্য উপায়ে করিবে তাকে বলি আমরা অসৎ। কিন্তু অধিকাংশ সৎ অসৎই মানুষের তৈয়ারি। কাজেই একজন যাকে অসৎ বলিবে অন্য জন তাহা অসৎ কি না তাহা পরীক্ষা করিতে চাহিতে অবশ্যই পারে। কিন্তু এই মানুষের তৈয়ারী সৎ ও অসৎএর দ্বন্দ্বের পিছনে আরও গভীর-তম ডষ্টয়েভ্স্কির বাণী—"জীবনে সাফল্য লাভ ঘটিতে পারে—কিন্তু সাফল্যই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য? চাহিয়া দেখ—যাকে বিফল মনে কর—যাকে জগতের লোকে বিফল মনে করে—তারও মধ্যে হয় ত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সাফল্যই রহিয়াছে—না হয় ত ঐ বিফ-লেই নূতন সাফল্যের বীজ উপ্ত হইতেছে।"

শ্রীবিমলাকান্ত সরকার,
রঙ্গপুর বিদ্যালয়।

সাহিত্য ও সমাজ*

(১)

সৃষ্টিটা যদি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, অতএব অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ না হইয়া প্রথম হইতেই চিরস্থিতিশীল বিচিত্রতাহীন 'একঘাচাধরণে'র হইত, তাহা হইলে মানবের মনে কোন ভাব জন্মিতে পারিত না; এবং এরূপ একটা সৃষ্টির পরিকল্পনাও করা যায় না। পক্ষান্তরে এই বিশ্ব পরিবর্ত্তনের একটা অন্তহীন বৃত্ত ধরিয়া চলিয়াছে—অনবরত কেবল চলিতেছে, কোথাও স্থগিত হইতেছে না। তাই প্রকৃতি-দেবী নিত্য নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া মানবের দেহভবনের দ্বারে—ইন্দ্রিয়সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। মানব তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে! আর অমনি তাহার মন ও প্রকৃতিসহযোগে তাহার হৃদয়-প্রকোষ্ঠে ভাবরাশি সঞ্জাত হইতেছে। সেই ভাবসমূহ মানবহৃদয়ে সুখ-দুঃখ-অভাব-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র অনুভূতি জাগ্রত করিয়া দেয়। মানব সেই সুখ-দুঃখ অভাব-আকাঙ্ক্ষার কথা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া ভাষার সৃষ্টি করে। তখন কেবল ভাষার সাহায্যে ভাবসম্পুট আপন

* ১৩২১ সালের পৌষমাসে হুগলী-সাহিত্য সম্মিলনের শিলচরের অধিবেশনে পঠিত এবং পরিবর্দ্ধিত আকারে।

স্মৃতিতে বহন করিয়া চলে। তারপর যখন ভাবসম্পদ্ এত বেশী হইয়া পড়ে যে তাহা এখন আর স্মৃতির মঞ্জুষায় রক্ষা করা চলে না এবং যখন ঐ ভাবৈশ্বর্য্য কেবল নিজে ভোগ না করিয়া ভবিষ্যদ্বংশধরদিগকেও তাহার উত্তরাধিকারী করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয় তখন তাহারা এতদিন যে ভাবসম্পদ্ স্মৃতির মঞ্জুষায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল তাহা গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। এইখানেই হইল সাহিত্যের উৎপত্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে ভাষার ভিতর দিয়া মানবের হৃদয়নিহিত ভাবরাশির যে অভিব্যক্তি তাহাই সাহিত্য।

(২)

বিশিষ্ট ব্যক্তির মনে বিশেষ স্থানে ও সময়ে যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় সাহিত্য সেই ভাবকে স্থান ও কালের নিগড় ভাঙ্গিয়া বিশ্বমানবের জন্য অনন্তকাল রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই ভাব বিস্ময়মূলক। আবার মানবের শৈশবধর্ম্ম বিস্ময়রূপেই দেখা দেয়; সুতরাং ভাবও ধর্ম্মমূলক। তাই মানব যখন সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিল—নীলবসনা মেঘকুন্তলা বালার্ক-সীমন্তিনী উষারাণী সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তখন বিস্ময়াভিভূত হইয়া তাঁহারই চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিল। তারপর হইতে মানবের ধর্ম্মচিন্তা যতই প্রাকৃতিক শক্তি পুঞ্জের আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া তাহার অন্তরাধিষ্ঠাতা এক অখণ্ড অসীম মহিমাময় মহাপুরুষের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে, সাহিত্যও মানবের চিন্তাপ্রণালী আশ্রয় করিয়া ততই সেই অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। আশা—বিশ্ব-মানবের ধর্ম্মচিন্তা যখন তাহার হৃদয়দেবতার আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া পার্থিব বাসনা-বেদনা ভুলিয়া একান্ত হইয়া থাকিবে, বিশ্বসাহিত্যও তখন সেই অমৃতের সঙ্গ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। সাহিত্যের আশা এত উচ্চ! এত মহৎ!

(৩)

মানব সসীম জীব; সে আপনার শক্তির সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। সংসারে অপর মানবের ও মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে তাহার যে স্নেহ ও প্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে, সে তাহার ভগবান সাকার হ'ন আর নিরাকার হ'ন ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভগবানের সহিতও ঠিক সেই মানবীয় সম্বন্ধ পাতাইতে ব্যাকুল হয়। বস্তুতঃ এই মানবীয় সম্বন্ধের মধ্যদিয়াই সে তাহার ভগবানের অনুভূতি পাইয়া থাকে। মানবীয় সম্বন্ধ হইতেই রসানুভূতি হয় এবং এই রসানুভূতির পরিণতি সেই রসময়ের অনুভূতিতে; কারণ "রসো বৈ সঃ।" রসানুভূতি হইতে আনন্দোৎপত্তি হয়, তাই তিনি আনন্দময়—"আনন্দরূপম্"। সাধক চিরদিনই সেই রসময়ের রসানুভূতি পাইয়া ভূমানন্দ লাভ করিয়াছেন; এবং সাহিত্যকেও সেই রসামৃতের প্রোজ্জ্বলে ও আনন্দের জ্যোৎস্নালোকোদ্ভাসনে, স্নিগ্ধ, চিরপবিত্র ও চিরোদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন। অতএব রসই সাহিত্যের প্রধান বস্তু, রসই সাহিত্যের প্রাণ।

(৪)

কাঠিন্যবর্জ্জ প্রত্যেক জীবন্ত সাহিত্যের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই রসকে সাহিত্যের প্রাণ বলিলে কাঠিন্যগুণকে স্বাস্থ্য বলিয়া অভিহিত করিতে আমি সাহস করি। সাহিত্যের এই স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং,

ধর্ম্মসাধনের প্রধান এবং প্রথম চেষ্টা শরীর রক্ষা। স্বাস্থ্য উপেক্ষিত হইলেই শরীর ব্যাধিমন্দির হয়; সাহিত্যের কাঠিন্য উপেক্ষিত হইলে তাহাতে কুনীতি, কুরুচি প্রভৃতি প্রশ্রয় পায়। ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া সুদূরপরাহত,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" কাঠিন্য-ধর্ম্মহীন সাহিত্যও মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিয়া উন্নত ও প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের অধিকারী করিতে পারে না। সাহিত্যের কাঠিন্যই জাতির জীবনবত্তার পরিচায়ক। জীবন্ত জাতিই স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা জাতিকে উন্নত ও সৎসাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে। মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে ভাবস্থবিরতা কর্ম্ম-শূন্যতা, নিস্পন্দতা লক্ষিত হয়; ফল—তাহাদের অধঃপতন। সাহিত্যে কাঠিন্য-ধর্ম্ম ফিরিয়া আসিলেই তাহারা আবার পুরাতন নির্জ্জীবতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া মানুষের মত উঠিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এমন কাঠিন্যধর্ম্মকে সাহিত্যে বিশেষ যত্নে রক্ষা করা উচিত।

(৫)

সাহিত্য ভাবের অভিব্যঞ্জনা। তাই জাতীয় সাহিত্য সেই জাতির বা সমাজের ভাবাভিব্যক্তির বা ভাবস্থবিরতার—আশা নিরাশা, স্বাধীন চিন্তা ও উদ্দাম কল্পনা এবং জাতির উত্থানপতনের—কথায় পরিপূর্ণ, সেই জাতির বা সমাজের ধর্ম্মের অমৃত রসে ভরপুর। জাতীয় সাহিত্যের (অতএব ভাষারও) প্রত্যেক শব্দের অন্তরালে জাতীয় ভাবোন্মেষের বা ভাবস্থবিরতার কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; প্রত্যেক শব্দ জাতীয় উন্নতি অবনতির কত ইতিহাস কাহিনী বক্ষে ধারণ করিয়া অনন্তকাল-সাগরাভিমুখে চলিয়াছে: প্রত্যেকটি শব্দ জাতীয়ধর্ম্মের সহিত দুগ্ধে নবনীতের মত—ধূপে গন্ধের মত—চন্দ্রালোকে শৈত্যের মত ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে।

পারিপার্শ্বিক শক্তিনিচয়ের প্রভাববশতঃ প্রত্যেক জাতির একটা বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব রীতি নীতি আচার ব্যবহার ও জাতীয় চরিত্রে লক্ষিত হয়। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যেও যে সেই বিশিষ্টতার ছায়া পতিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য আর কি আছে? সাহিত্যিকের প্রত্যেক শব্দচাতুর্য্য ও অলঙ্কার-বিন্যাসই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনা করিয়া থাকে। জগতের যে কোন জাতির সাহিত্যই এই কথার সাক্ষ্য দিতে পারে।

অতএব সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধের কথা মূলভাবে বলিতে গেলে আমাদের বলিতে হইবে—নদী বা পুষ্করিণীর জলের সহিত তীরতরুর যে সম্বন্ধ, সাহিত্যের সহিতও সমাজের সেই সম্বন্ধ। তীরতরুতে দু'টা শাখা বৃদ্ধি পাইলে জলে তাহার ছায়া পড়িবেই, দু'টা শাখা কেহ কাটিয়া লইলে তাহার ছায়া জলের উপর হইতে মুছিয়া যাইবে। বৃক্ষে তাম্রপল্লবোদ্গমে তাহার তাম্রছায়া জলে প্রতিফলিত হইবে, আবার শ্বেতপুষ্প ফুটিলে জলেও তাহার স্ফাটিক প্রতিবিম্বের উদয় হইবে। সাহিত্যের বেলাও তাই। সমাজের রুচি পরিবর্ত্তিত হইলে সাহিত্যের রুচি ও আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইবে; সমাজে ভাবাভিব্যক্তি বা ভাব-স্থবিরতা ঘটিলে সাহিত্যেও তাহা লক্ষিত হইবে। সমাজে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সাহিত্যও অধর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের দণ্ডবিধি আইন হইয়া উঠে। কিন্তু তাই বলিলেই ঠিক হইল না। কারণ সাহিত্য ও সমাজ "যাগর্থা-বিব সম্পৃক্তৌ"—Correlated বা পরস্পর

সংশ্লিষ্ট। সাহিত্য যেমন সমাজের আশ্রয়ে পুষ্টি ও প্রসার লাভ করিয়া থাকে সমাজও তদ্রূপ সাহিত্যের উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মরক্ষা ও উন্নতি-লাভ করে

(৬)

এতক্ষণ আমরা সাহিত্য ও সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধের কথা আলোচনা করিলাম; এখন আমরা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের, ও বঙ্গ সমাজের উপর তাহার বা তাহার উপর বঙ্গসমাজের প্রভাবের কথা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মোটের উপর বলিতে গেলে, বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া দাশরথি রায় পর্য্যন্ত সকলেই কেবল প্রেমের (বিকৃতরুচি সমাজের হাতে প্রেম কামেই পরিণত হয়) সাহিত্য গড়িয়া অলস অকর্ম্মণ্য ভাবপ্রবণ জাতির হৃদয়ের বাসনানলে ইন্ধন যোগাইয়াছেন। তারপর বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন যুগ দেখা দেয়; ইহাকে বঙ্গসাহিত্যের renaissance যুগ বলা যাইতে পারে। এই renaissance যুগের আদি কবি মধুসূদন ইউরোপীয় ভাব লইয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'ন; এবং ইউরোপীয় গৎ ও তাল বাজাইয়াই রঙ্গক্ষেত্র হইতে অপসৃত হ'ন। তারপর ক্রমে রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র আপনাপন শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা ও সামর্থ্য অনুসারে, কেহবা বিগল্ কেহবা ক্লেরিওনেট বাজাইয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেকেরই আহ্বান্ কতকটা জাতীয় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু এই বহুকালের অলস, নিদ্রিত, নির্জ্জীব জাতিকে প্রকৃতশক্তি, উদ্যম ও কার্য্যক্ষমতা দিতে পারে নাই। তারপর কবিবর রবীন্দ্রনাথ বঙ্গবাণীর কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন—

তোমার রাগিনী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন
সদা বাজে গো,
তোমার আসন হৃদয়-পদ্মে রাজে যেন
সদা রাজে গো।

দ্বিজেন্দ্রলাল মধুপবীণায় তান ধরিলেন :—

চাহি না'ক কিছু তুমি মা আমার
এই জানি শুধু নাহি জানি আর
তুমি গো জননী হৃদয় আমার
তুমি গো জননী আমার প্রাণ।

অন্য দিকে 'বীর সন্ন্যাসী' বিবেকানন্দ উদাত্তস্বরে ডাকিলেন 'হে ভারত! পরানুবাদ পরানুকরণ পরমুখাপেক্ষী, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে তুমি তোমার নিজকে চিন্‌তে শিখ। রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রের কাতর প্রার্থনা সরস্বতীর কাছে মঞ্জুর হইয়াছে। 'নরেন্দ্রের' বজ্র-গম্ভীর আহ্বান্ জাতির হৃদয়ে বসিয়াছে; এখন জাতীয় সাহিত্যের সুর কতকটা বদ্‌লাইতে সুরু করিয়াছে।

তা ছাড়া একদল নব্য লেখক (বিশেষতঃ পদ্য লেখক) আছেন—যাঁহারা সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া 'বিশ্বমানবের' পথের ধারে আপনার রুমের (room) দ্বারে প্রেমমন্ত্রের অভিসারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। সর্ব্বদাই প্রেম, মান, অভিমান, অভিসারের কথা কেনাইয়া কেনাইয়া লিখিতেছেন; আর তাহাদের এই manuscript তারাক্রান্ত মুদ্রাযন্ত্র বর্ত্তমান অস্থি-মাংসহীন নির্জ্জীবকল্প সন্তানদের মত প্রাণহীন হীনাদর্শ নীচশ্রেণীর সাহিত্য-পুস্তক ঘন ঘন প্রসব করিতেছে। এই শ্রেণীর লেখক-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই ত্রিবেদী রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন—"বঙ্গভূমি স্বয়ং যে ব্রীহি শস্য বর্ষে বর্ষে উৎপাদন করেন, তাহা শুনিতে

পাই একান্ত নাইট্রোজেন-বর্জ্জিত ; আর বঙ্গের বাক্‌দেবতা যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন তাহা 'ধূমজ্যোতিঃ মরুতাং সন্নিপাতঃ' ; বঙ্গদেশে কাঠিন্য ধর্ম্মবিশিষ্ট সামগ্রীর এত অভাব কেন তাহা সুধীগণের আলোচ্য।" কাঠিন্য ধর্ম্ম-বিশিষ্ট সাহিত্য-পুস্তক অত্যন্ত বিরল ; এবং এই শ্রেণীর সাহিত্যিক দ্বারা সাহিত্য আপন মহনীয় আদর্শ হইতে দিন দিন ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

গদ্য-সাহিত্যে গল্প ও উপন্যাসই আমাদের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করে। কিন্তু অধি-কাংশ গল্প ও উপন্যাসে এমন সব বৈদেশিক উপাদান ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে যাহা আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের পক্ষে উপ-কারী ত নহেই, বরং বিশেষ অপকারী। অসংশোধিত পারদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহা যেমন রোগীর শরীর ব্যতীত কিছুতেই আপনার করিয়া লইতে পারে না ; পারদ ত শরীর ফুটিয়া বাহির হইয়া যায়-ই, তদ্-ব্যতীত রোগীর গলিতাঙ্গ ও প্রাণসংশয় করিয়া যায় ; বৈদেশিক উপাদানের মধ্যে যে-গুলি আমাদের সমাজের ধাতের সহিত মিশিতে-মিলিতে পারে না, সেগুলি বহিষ্কৃত না করিয়া এবং অবশিষ্টগুলি সমাজের ধাতের উপযোগী না করিয়া আমাদের সাহিত্যে চালাইলে অসদাদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবে ও সমাজের রুচিবিকার ঘটিয়া অধঃপতনের পথে দ্রুতগতিতে ছুটিবে। অধিকাংশ গল্প ও উপন্যাস-লেখক এই স্থূল সত্যটি ভুলিয়া যান। অনেকে মনে করেন ও অনেককে বলিতেও শুনিয়াছি যে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণই বুঝি তাঁহাদের আর্টের কাজ। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে মানসিক ভাব-বিকাশের ধারাও জাতীয়-বিশিষ্টতার লাইনকে রেখা-মাত্রও লঙ্ঘন করিতে পারে না ; বরঞ্চ প্রত্যেক জাতির ভাববিকাশের একটা বিশেষ ধারা আছে বলিয়াই জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, নতুবা থাকিত না। সুতরাং এই জাতীয় বিশিষ্টতা কলায় আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে ; ইহাকে জোর করিয়া কেহ চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। সুতরাং মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়া গল্প ও উপন্যাসে আটিষ্ট কিম্ভূত কিমাকার—অদ্ভুত উদ্ভট চিত্রের পরিকল্পনা করিতে পারেন না। কারণ সেই কলাই কলা, যে কলা সমাজস্থ সকল লোকের হৃদয়ে সম-ভাবের লহর তুলিতে পারে। গল্প ও উপ-ন্যাসে যতদূর কলা-কৌশলই থাকুক না, তাহা যদি সমাজের সহিত সমঞ্জসীভূত না হয় তবে সেই কলা-কৌশল সকল মানবের হৃদয়ে সমভাবের তরঙ্গ-দোল দিতে পারে না। অধিকাংশ লেখকই এই সাধারণ সত্যটি উপেক্ষা করেন। তাই আমাদের সাহিত্যে নানান্ অদ্ভুত চিত্র স্থান পাইয়াছে এবং পাইতেছে।

শিশু-সাহিত্যের বিষয়ও একটা কথা বলা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি ; তাই চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তপূর্ণ, দেশের বড় লোকের জীবন-কাহিনী ও সামাজিক ইতিহাস-পূর্ণ পুস্তকই কোমলহৃদয় শিশুদের হাতে দেওয়া উচিত বলিয়াই বোধ হয় সকলে মনে করেন। শৈশবেই তাহাদের সম্মুখে এক এক জন বিশেষ লোকের জীবনাদর্শ পড়িয়া তাহাদের চরিত্র গঠিত এবং ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে—ইহাই উদ্দেশ্য। এই কয় বৎসরের মধ্যেই এরূপ অনেক সরস সুন্দর, সদ্দৃষ্টান্তপূর্ণ শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রকা-শিত হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পুস্তকে

বালক বালিকাদের কোমল ও সাধু হৃদয়ে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পরোক্ষভাবে বিদ্বেষোদ্রেকের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণ :—

বৈরাগী ঠাকুর টং টং,
কাটুয়া যাইতে বড় রং ;
ছলার ভিতর মালা বইয়া,
বৈরাগী পড়ে উপুড় হইয়া।

এখানে লেখকের ইচ্ছা সাধু হইলেও পরোক্ষভাবে কিন্তু এই সম্প্রদায়ের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব বালকবালিকাদের হৃদয়ে উদ্রিক্ত হইতেছে। এরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ভাবের স্থান শিশু-পাঠ্য পুস্তকে বাঞ্ছনীয় কি ?

(৭)

আমরা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অবস্থা আলোচনা করিয়াছি। এখন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ইহা বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালায় এখনও সম্পূর্ণভাবে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই। যে জাতির মাইকেল-বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল-নবীনচন্দ্র সভ্যজগতের কোন দেশের কোন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির চেয়ে কম প্রতিভাবান্ ছিলেন না, আমাদের

'বীর-সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটিছে জগতময়।'

আমাদের কবিই আবার—

" গাহিছে জগতে মহা মিলনের গান।"

এমন জাতির যে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট হয় নাই ইহা কি কম আশ্চর্য্য ?

পক্ষান্তরে এই জাতির জনসাধারণ সাহিত্য যে বোঝে না, উপভোগ করিতে পারে না বা সাহিত্য আলোচনা করিতে জানে না—এমন কথাও বলিতে পারা যায় না। এই বাঙ্গালায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে—যাহার রস এখনও সমাজের কোণায় কোণায় পুরোপুরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা এখনও দেখিতে পাই শাক্ত-ভক্ত ইষ্টদেবতার সাম্নে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

'বল মা! তোমায় কি দিয়ে পূজিলো ব্রহ্মময়ী ?'

বৈষ্ণব-সাধক আকুলকণ্ঠে সজলনয়নে সরল প্রাণে আত্ম নিবেদন করিতেছেন—

"হরি তোমায় ভালবাসি কই ?
কই ? আমার সে প্রেম কই ?"

বৃদ্ধ পৌষের বৈকালে রৌদ্রে বসিয়া তামাক গলায় গাহিতেছে—

"হরি দিন ত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।"

কৃষাণেরা হল-চালনা করিতে করিতে আপনমনে সরল প্রাণে মাঝে মাঝে গান ধরিয়া শ্রমলাঘব করিতেছে। জ্যোৎস্না-ফুল্ল রজনীতে ভাটের তরানদীর বক্ষ দিয়া মাঝি "শান্তির বারমাসী" গাহিয়া 'জালে তালে দাঁড় ফেলে' চলিয়া যাইতেছে। রমণী-গণ বিবাহের বা কালীপূজার রাত্রে গান গাহিয়া জোর করিয়া দিতেছেন। এইরূপে আবালবৃদ্ধবনিতা যে কেবল সাহিত্য উপভোগ করিত তাহা নহে, তাহারা সাহিত্য আলো-চনাও করিত। তাই আমরা নারী-কবি চন্দ্রাবতী, মালী দৈত্যদাস, শুক্লবৈদ্য ভানুদাসকে পদ্মাপুরাণের রচয়িতা পাইয়াছি।

আমাদের বঙ্গদেশে সাহিত্য-প্রতিভা বহুবার বহুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ; আমাদের এই বাঙ্গালায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে ; আমাদের জন-সাধারণ সাহিত্যরস উপভোগ করিয়াছে, আলোচনা করিয়াছে, সাহিত্যের মহনীয় আদর্শে জাতীয় চরিত্র উন্নত হইয়াছে ; অথচ এখন নিখুঁত, সম্পূর্ণ-জাতীয়-সাহিত্য

হয় নাই। ইহার নিম্নলিখিত কারণগুলিই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

১ম কারণ। বাঙ্গালার renaissance যুগের প্রথম ভাগে অর্থাৎ এদেশে ইংরাজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরাজ-সমাজের হাবভাব রীতি-নীতি, আদব কায়দা অনুকরণ করিলেন, এমন কি কেহ কেহ ধর্ম্মান্তর পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন, অন্য সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরে তাহাদের নিজস্ব লইয়াই ব্যস্ত রহিলেন, ইংরাজী হাবভাব রীতিনীতির আমলে আসিলেন না। এইরূপে সমগ্র বঙ্গসমাজ দ্বিখণ্ড হইল। প্রথমোক্ত দলই বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের জনক ও পালক। তাঁহারা তাঁহাদের রুচি ও বিশিষ্টতানুসারে সাহিত্যে আদর্শ, শব্দপ্রয়োগ অলঙ্কার বৈচিত্র, কলা কৌশল ও চরিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি দেখাইলেন। এইখানেই তাঁহাদের সাহিত্য তৎকালীন দেশীয় সাহিত্যের পংক্তি ছাড়িয়া পৃথক্ পংক্তিতে দাঁড়ায়। সুতরাং পৃথক্ পংক্তিতে থাকিয়া ভিন্ন ভাষা ও ভাব, আদর্শ ও উপাদান লইয়া সমাজের প্রাণে আঘাত করিতে পারে নাই। যতদিন না বিদেশীয় রীতিনীতি আচার, ব্যবহার—সভ্যতার মোহ সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া, জাতীয় আদব কায়দা রীতির প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির সুখ-দুঃখে সমপ্রাণতা, সমাজধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা —এক কথায় দেশাত্মবোধ জন্মিতেছে; যতদিন না সরল প্রাণে উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিতেছেন—আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালী 'আমার ভাই','বাঙ্গালী আমার প্রাণ',বঙ্গসমাজ 'আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, ততদিন বাঙ্গালী আদর্শ জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

২য় কারণ। বর্ত্তমান যুগে প্রতীচ্য-সভ্যতা যে যে দেশে বিস্তৃত হইয়াছে সেই সেই দেশেই জীবনের কোন কোন ভাগে বিশেষ উন্নতি হইয়াছে বটে আবার কোন কোন বিভাগে বিশেষ অনিষ্টও হইয়াছে। পূর্ব্ব সভ্যতার সাম্প্রদায়িক উন্নতি হইত; ব্যষ্টির সুখদুঃখ আমোদ আহ্লাদ সমষ্টি ভাগ করিয়া লইত। বর্ত্তমান সভ্যতার মুখ্য উদ্দেশ্য নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তোলা। মানুষ যেখানে স্বীয় ব্যক্তিত্ব ফুটাইতে গিয়া প্রতিবেশীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়, সেখানে দেশ, দশ বা সমাজের চিন্তা অধিকার পায় না। এরূপ অবস্থায় সাহিত্যও ব্যক্তি-বিশেষের উপভোগের ও আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে; তাই এখন মহাকাব্য সৃষ্ট হয় না, গীতিকাব্য বা lyric সৃষ্ট হয়।

৩য় কারণ। বর্ত্তমান সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষাও আর একটি কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ভাষা সম্বন্ধে দুই সম্প্রদায়, দুই মত। রক্ষণশীলেরা বঙ্গভাষা সংস্কৃতমাতৃকা বলিয়া তাহাকে মাতার বস্ত্রালঙ্কার পরাইয়াই তাহার আভিজাত্য রক্ষা করিতে চান, স্বীয় দুহিতাকে কখন সাধারণ মেয়েদের সহিত মেলা মেশা করিতে দিতে রাজি নয়। অন্যদল অত্যধিক উদার, তাঁহারা স্বীয় কন্যাকে যত ইচ্ছা স্বাধীনতা ও যথা-ইচ্ছা ভ্রমণ করিতে দেন। বস্তুতঃ কোনও মতই সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আমরা সাহিত্যে চাই কি? চাই প্রাণ। সাহিত্য জাতির নিম্নতম স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত সকল লোকের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারে, অন্তর্নিহিত উদাত্ত-ভাব, গভীর চিন্তা, মনোহর কল্পনা, মহনীয় আদর্শ দেখাইয়া সমাজকে—জাতিকে সঞ্জীবিত ও উন্নীত করিতে পারে; অন্যদিকে আবার নিজের অভাব-আকাঙ্ক্ষার কথা সমাজকে

বলিয়া দিয়া নিজের উন্মেষের পথ পরিষ্কার করিতে পারে—আমরা তাই চাই। সুতরাং যে ভাষার প্রাণ আছে সেই ভাষাই আমাদের বরণীয়া। উচ্চবংশীয়া সৈনিক রমণীদের লৌহ পাদুকা পরিয়া, চলন্-শক্তি হারাইয়া, সৌন্দর্য্য বাড়াইতে ও অভিজাত-গৌরব রক্ষা করিতে কেহ আকাঙ্ক্ষা করেন না। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রদ্বারা আট ঘাট বাঁধিলে ভাষা তথা সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপভোগ ও আলোচনার সামগ্রী হইয়া পড়িবে। এরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া ভাষা ও সাহিত্য জীবিত থাকিতে ও পুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং জাতির উন্নতিবিধায়কও হয় না; পরন্তু বদ্ধ জলের মত জাতীয় জীবনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকরই হইয়া উঠে। আবার বঙ্গভাষা সংস্কৃত-মাতৃকা হইলেও, কন্যা যে সর্ব্বদাই শারীরিক ও মানসিক বলে ও সৌন্দর্য্যে মাকেই অনুসরণ করিবে এমন কোন কথা নয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মনে রাখা উচিত যে অত্যধিক স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর মাত্র। স্বাধীনতার দোহাই দিয়া যে কোন প্রাদেশিক শব্দের প্রশ্রয় দিলে সাহিত্যের মর্য্যাদার অপলাপ হয় উদ্দেশ্যও সফল হয় না। এরূপ ভাষা, দেশের সর্ব্বত্র জন সাধারণের বোধগম্য হয় না,—তাহাদের কাছে অবোধ্য বঙ্গভাষা যা', গ্রীক ভাষাও তা'। তা'ছাড়া এমনও প্রশ্ন হইতে পারে এবং হইয়াছেও যে যদি যে কোন প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, তবে সকল প্রদেশের শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে কি? অথবা একত্ব রক্ষার জন্য কোন্ বিশেষ প্রদেশের শব্দ ব্যবহৃত হইবে? এখানে সকলের দাবীই প্রায় সমান প্রবল। ইহার একমাত্র মীমাংসা এই যে সাহিত্যে সেই শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে যে শব্দ যে ভাবের বা Conceptএর সৌন্দর্য্য গভীরত্ব ও অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে—এখন সে শব্দ সংস্কৃতই হ'ক আর প্রাদেশিকই হ'ক। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও আবার যে সাধারণ শব্দ দেশের সর্ব্বত্র বুঝিতে পারে বা পারিবে বলিয়া আশা করা যায় তাহার উপরই ঝোঁক দিতে হইবে।

৪র্থ কারণ। জনসাধারণ যে বর্ত্তমান সাহিত্য বুঝিতে পারে না, বা উপভোগ করিতে পারে না, লেখকদের আত্মম্ভরিতা ও অসরলতাও তাহার জন্য দায়ী। অধিকাংশ লেখকই মনে করেন যে তাঁহারা বুঝি বঙ্গসাহিত্যে কিছু করিয়া গেলেন এবং এমন আত্মম্ভরিভাবে ঘুরাইয়া-পিছাইয়া মনোভাব প্রকাশ করেন যে সাধারণ তাহা অনেক চেষ্টায়ও বুঝিতে পারে না। বঙ্গভাষার একজন প্রসিদ্ধ লেখক লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ডে সবাই বলিত ইয়েট্‌স্ একজন অসাধারণ 'মিষ্টিক'। যাহা কিছু দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালী তাহাকেই 'মিষ্টিক' আখ্যা দেওয়া হয় ইহাই জানিতাম। এখনকার কালের সাহিত্যে হঠাৎ যে দক্ষিণে হাওয়া মাধবী বনে পুষ্প বিকাশ বন্ধ করিয়া পূবদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া পূবে হাওয়া হইয়া আকাশকে রহস্য-গম্ভীর জলদজালে ঘেরিয়া ফেলিয়াছে, সে খবর কে জানিত?" এ যে ইয়েট্‌সের 'মিষ্টিসিজম্' থেকে আরও মিষ্টিক্। এর মধ্যে এমন জটিল দর্শনতত্ত্বও নাই যে এর চেয়ে আর সহজ কথায় উহাকে প্রকাশ করা যায় না। কথাটা অতি সাধারণ, অথচ এমন ভাবে বলা হইয়াছে যে সাধারণ লোক

মাথায় হাত দিয়া বসিবে। যতদিন না লেখকরা আত্মম্ভরিতা ও ইচ্ছাকৃত দুর্ব্বোধ্যতা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তাঁহাদের কথায় কেহ উপকার পাইবে না, কর্ণপাত করিবে না। জাতীয় সাহিত্যও সৃষ্ট হইবে না।

৫ম কারণ। পূর্ব্বে মেলায় কথকতায়, পাঁচালী ছড়ায়, বিবাহাদি উৎসবে যাত্রায়, রামায়ণগানে, শ্রাদ্ধোপলক্ষে শাস্ত্রবিচারে, 'হরিসংকীর্ত্তনে,' স্ত্রীমহলে লক্ষ্মী-সূর্য্য-সুবচনীর ব্রত কথায় ও গানে, বালিকাদের মাঘব্রতে ও ছেলেদের কার্ত্তিক পূজার ছড়ায় সাহিত্য প্রচার হইত বা সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। আমার প্রতিবেশী-গ্রামে একটি পাটুনি বৃদ্ধকে সমস্ত পদ্মাপুরাণ মুখস্থ গান করিতে দেখিয়াছি। এখনও সমাজে অনেক নিরক্ষর লোক আছে যাহারা 'শনি-সত্যনারায়ণের পাঁচালী', 'সীতা-বিলাপ', 'অজয় রায়বার', 'পদ্মার বারমাস্যা', 'বেহুলা বিলাপ' অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে এখন আর পূর্ব্বের মত সাহিত্য প্রচার হয় না। সুতরাং সাহিত্য রসপিপাসু শিক্ষিত সমাজের অতি ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে।

৬ষ্ঠ কারণ। শিক্ষার অভাব। সাহিত্য প্রচারের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এখন সাহিত্য-রস সমাজের সকল স্তরে সঞ্চারিত করিতে হইলেও শিক্ষা যে সার্ব্বজনীন্ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা শতকরা ৭ কিংবা ৮ জনের বেশী নয়। সুতরাং এরূপ শিক্ষিত দেশে জাতীয়-সাহিত্য সৃষ্টি করার আশা সুদূরপরাহত।

(৮)

জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে হইলে দেশাত্মবোধ জন্মিতেই হইবে। সমাজ-ধর্ম্ম, রুচি, রীতি-নীতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে, সমাজের ভাব, চিন্তা, কল্পনা, ও আদর্শে মুগ্ধ হইয়া সমপ্রাণতার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—আমাদের—'নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী', উপাস্য সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর।' আমাদের মনে রাখিতে হইবে—'সমাজ আমাদের মহামায়ার বিরাট ছায়ামাত্র'; আর প্রাণে প্রাণে সর্ব্বদা অনুভব করিতে হইবে—'নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, মুচি, অজ্ঞ, মেথর, সেই একই মহা-পুরুষের প্রাণে প্রাণবান্, আমাদের রক্ত আমাদের ভাই।'

কিন্তু কেবল প্রাচীন দেশীয় ভাব, আদর্শ ও কলা-নৈপুণ্য রক্ষা করিলে সাহিত্যে উন্নতি হইতে পারে না। এরূপ অনুন্নত সাহিত্যের দ্বারা সমাজের ক্রমবিকাশের পথও রুদ্ধ হয়। তাই দেশীয় সাহিত্যের সহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিবার জন্য আমাদের দৈনিক-জীবন গৃহস্থালী, সমাজ বা ইতিহাস হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া, জাতির রুচি ও আদর্শ রক্ষা করিয়া জনসাধারণের ভাষায় নূতন ভাব ও চিন্তাপ্রণালী সাহিত্যে আমদানী করিতে হইবে। বিষয়টি জনসাধারণের পরিচিত হওয়ায় তাহারা ইহার মোটামুটি ভাবটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে; এবং ক্রমে নূতন ভাব আদর্শ ও চিন্তাপ্রণালীও সমাজের ধাতের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়া আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবে। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টিকারীরা তাহাই করিয়াছেন; সেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্টন্,

দাস্তে, কালিদাস, ভারবী, কাশীরাম, কৃত্তিবাস যারা এই পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছিল। তারপর পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত স্বভাব কবির কবিতা ও ছড়া, প্রবাদ ও প্রবচন অবলম্বন করিয়া গল্প, উপন্যাস ও কবিতা লিখা উচিত। হার্ডার ও শিলার এই উপায় অবলম্বন করিয়াই জাতীয় সাহিত্যের মূল দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন।

(৯)

সমাজকে কবির দান সম্বন্ধে একটি কথা অতি সংক্ষেপে বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবি কেবল জাতীয় ভাবে ভাবায় ও আদর্শে মুগ্ধ হইয়া সমাজের যথাযথ বর্ণন, বা সমাজে-বর্ত্তমান্ আদর্শানুযায়ী চরিত্রাঙ্কন করিলেই হইল না। তাহাতে সমাজের ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এবং এরূপ কবিও কখন কবি হইতে পারেন না, একজন সাধারণ বর্ণনাকারক মাত্র। কবি জীবনের সাধনায় যে সত্য লাভ করেন, সমাজকে সেই সত্যের আস্বাদন করানই তাঁহার কর্ত্তব্য। সমাজের কাছে প্রত্যেকেই দায়ী। তবে কর্ত্তব্যজ্ঞানানুসারে সেই দায়ীত্বজ্ঞানেরও তারতম্য আছে। সুতরাং সমাজের কাছে কবির দায়ীত্ব অত্যন্ত বেশী। কবি সাধনার তুঙ্গ গিরিচূড়ায় দাঁড়াইয়া অনন্ত ব্যোমে সত্যের যে জ্যোতিঃ দেখিতে পান, তাহার সম্মুখে যে সৌন্দর্য্যের প্রবাহ তরঙ্গভঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, তিনি যে অখণ্ড ভূমা আনন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, সেই সত্যের বার্ত্তা, সেই সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা, সেই আনন্দের বার্ত্তা কবি জাতীয় ভাষা-ভাব আচার-ব্যবহারের মধ্যদিয়া সমাজের দ্বারে গিয়া উপস্থিত করেন। এইটিই হইয়াছে তাহার সমাজের নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই বিবিধ কর্ত্তব্য করিতে একমাত্র কবিই সক্ষম—এবং কবিতেই বহু আস্তার ও মুক্তাত্মার পরিষ্কার প্রকাশ।

শ্রীশশিভূষণ পাল।

জাপানের নারীত্ব

জগতে কি যে ভাল এবং কি যে মন্দ তাহার একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বড়ই দুরূহ সমস্যা। বৈষম্য এবং বৈচিত্র্যই প্রবৃত্তিময়ী প্রকৃতির লক্ষণ। এই বৈষম্য এবং বৈচিত্র্য হইতেই জাগতিক যত দুঃখের উৎপত্তি। মানব যতই কেন আদর্শ ও নিয়ম দণ্ডায়মান রাখুক না, সামাজিক বদ্ধজীব হইয়া দুঃখ এবং ভ্রান্তি হইতে তাহার পরিত্রাণ কোথায়? তজ্জন্য একটা ভাল বা মন্দের সঠিক মীমাংসার আশা কম দুরাশার কথা নহে। জাপানের নারীত্ব ভাল কি মন্দ, তাহার জবাবদিহি আমরা দিব না, আমরা দেখাইব, এই বৈচিত্র্য-প্রধান-জগতে জাপানে নারীপ্রকৃতির অভিনব বিচিত্রতা।

অনেক বিষয়ে জাপানের নারীজীবনের সহিত হিন্দুনারীর সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, কিন্তু ভারতবর্ষের যাহা গৌরব, সতীত্ব, জাপানে তাহা অল্পই দৃষ্ট হয়। সতীত্ব হিন্দুনারীর দুর্লভ সামগ্রী—এমনটী আর কোথায়ও বুঝি মিলে না। জাপানের নারীজীবনের সব

সুন্দর, কেবল ঐটী বাদ। সতীত্ব যে নারী-জীবনের একটা অত্যাবশ্যক সামগ্রী, ইহা জাপানের সভ্যতায় বলে না। জাপানী পিতামাতা স্বেচ্ছায় কন্যাকে পরপুরুষের নিকটস্থ করিয়া দেয়, বেশ্যাবৃত্তি করিতে অনুমতি দেয়। ইহা অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও সমগ্র জাপানী-সমাজ আরও আশ্চর্য্য! জাপানী-সমাজ পৃথিবীর অপরাপর সমাজের ন্যায় বেশ্যাগণকেও পরিহার করে না। যে কোন নারী পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিয়াও আবার বিবাহ দ্বারা সমাজে স্থান পাইতে পারে।

জাপানে সতীত্ব নাই, অথচ বাধ্যতা আছে। নারীজাতিকে মনুর নিয়মেরই ন্যায় বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বৈধব্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাধ্য হইয়া থাকিতে হয়। জাপানের নারীজীবনের এই অনুশাসনত্রয়ই বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। বাধ্যতা সম্বন্ধে জাপানের প্রবাদ এই যে 'ছাগশিশুও নতজানু হইয়া স্তনপান করে।' তাই জাপানী কন্যা বিনা আপত্তিতে পিতামাতার অনুমত্যনুসারে স্বামীগ্রহণ করিয়া থাকে। জাপানী কন্যা অভিনেত্রীর অনুরূপেই শিক্ষিত হয়, নাচিতে গাহিতে, কবিতা লিখিতে, ফুলখেলা খেলিতে, ফুলমালা গাঁথিতে এবং চায়ের পরিপাটী (cha-no-geo) করিতেই শিক্ষিতা হয়; হিন্দুনারীর ন্যায় চরিত্রের উন্নতির দিকে তাহার লক্ষ্য নাই। উচ্চ জাপানী সমাজের নারীগণ সকলেই নৃত্যপরা —নিম্নশ্রেণীর জাপানী নারীদিগের ভিতর অবশ্য নৃত্যনপটুতা কম।

পাশ্চাত্য নারীজাতির অনুরূপ জাপানী নারীর এই সব বিলাস সত্ত্বেও নারীজনোচিত গুণও অনেক। প্রাচ্যজগতে নারীজন্ম যেন একটা অভিশাপের বিষয়, জাপানে তেমন নহে। পুত্রসন্তান হইলে জাপানী পিতা-মাতার যে আনন্দ, কন্যাসন্তান জন্মিলেও সেই আনন্দ। অবশ্য অপরাপর বিষয়ে পুত্রের অধিকার কন্যার অপেক্ষা অধিক। জাপানী পরিবারে কন্যাগণ বড়ই পিতামাতার আদরের পাত্রী হইয়া বর্দ্ধিত হয়। মধ্যবিত্ত গৃহে প্রায়ই বালিকারা স্ত্রীজনোচিত গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হয়। সহধর্ম্মিণী এবং সুগৃহিণীর যাহা কর্ত্তব্য তাহা বালিকা বয়সেই জাপানী নারীদিগকে শিক্ষা করিতে হয়। জাপানী গৃহে কোন আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিতে হইলে গৃহকর্ত্তার জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে নিযুক্তা থাকিতে হয়।

জাপানে নারীর চৌদ্দ বৎসর হইতেই বিকশিত হইতে থাকে, পনের বৎসর বয়সেও জাপানী বালকের বিবাহ হইতে দেখা যায়। ষোল বৎসর বয়সই স্ত্রীপুরুষের পক্ষে বিবাহের কাল। বিবাহব্যাপার জাপানীসমাজের চক্ষে তেমন গুরুতর ব্যাপার নহে, বিবাহ সামাজিক জীবনে একটা সুবিধার ব্যাপার মাত্র। বিবাহ-সম্বন্ধের মধ্য দিয়া একটী জাতীয় জীবন প্রবাহিত হইতেছে মাত্র, বিবাহ জাতীয় জীবনের মূল নহে, ইহাই জাপানীদিগের ধারণা। বিবাহ যেমন অন্যান্য সমাজের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়াছে, জাপানে তেমন নহে। জাপানী বিবাহে কোন প্রকার ধর্ম্মের দোহাই আবশ্যক করে না, কোনরূপ মৌখিকতা বা ভানের আবশ্যক করে না, কোনরূপ পাশ্চাত্য প্রেমাভিনয় বা আদান প্রদানের আবশ্যক করে না, পিতা মাতা যাহার করে সঁপিয়া দেন জাপানী কুমারী তাহাতেই সন্তুষ্ট। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবেশ করিয়া কোন কোন পরিবারে নারী জাতির

এই বাধাতাকে ক্রমশঃই উদ্ধত করিয়া আনিতেছে।

জাপানী আইনে পুরুষের পক্ষে এক বিবাহের রীতি থাকিলেও এক বা ততোধিক রক্ষিতা রাখিলে তেমন দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না, জাপানী স্ত্রীও তাহাতে আপত্তি করে না। সতীত্ব বলিতে আমরা যাহা বুঝি জাপানে তাহা নয়নগোচর না হইলেও নারীজনোচিত সদ্‌গুণ তথায় সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানের নারী-চরিত্র বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন। এক বিবাহের অন্তরালে পাশ্চাত্য নারীজগতে যে সমস্ত লীলা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়, জাপানে তাহা প্রকাশ্যে হইয়া থাকে। ইউরোপের সামাজিক নিয়মে যে সব গুপ্ত অভিনয়ে মণ্ডিত হইতে হয়, জাপানের সামাজিক নিয়মে তাহা প্রকাশ্যে আচরিত হয় বলিয়া কোন-রূপ পাপ বলিয়া বিবেচিত হয় না। সমাজ এই সমস্ত ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতাকে আবহমানকাল ক্ষমা করিয়া আসিতেছে।

একদিকে সমাজ যেমন এই বহু ভোগ প্রবৃত্তিকে বাধা প্রদান করে না, অন্য দিকে তেমনই বিবাহবন্ধন ছেদন (divorce) করিতেও বাধা দেয় না। জাপানে বিবাহ-বন্ধন ছেদন সামান্য ব্যতিক্রমে ঘটিয়া থাকে। জাপানে গড়ে তিনটা বিবাহে একটী করিয়া বৎসরে বিবাহ বন্ধন রহিত হয়। জাপান এ বিষয়ে আমেরিকাকেও পরাস্ত করিয়াছে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে এত ডাইভোর্স সত্ত্বেও জাপানের পারিবারিক জীবনে পাশ্চাত্য জগতের ন্যায় কোনরূপ অশান্তি নাই।

একটি জাপানী পত্রিকার প্রতিবাদ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

Monogamy has been the law of Japan from ancient times. We have not yet heard that the system of polygamy is adopted. Concubinage alone exists. By all means let concubinage be abolished, but remember that each country has its own customs and habits. Nothing is gained by importing exotic fashions. Even though laws were framed to enforce the system of monogamy, if as is the case in Western lands, adultery became prevalent, we should have the pretty name of monogamy indeed, but the reality would be ugly. For our own part, we don't believe that everything is above reproach in the Christian marriage system."

ইহা হইতেই বুঝা যায় যে জগতে কি ভাল এবং কি মন্দ, বিশেষতঃ সামাজিক বিষয়ে, তাহা নির্ণয় করা বড়ই সুকঠিন। এক বিবাহের পশ্চাতেও যে বহু অশান্তি বিরাজ করিতেছে তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে লক্ষ্য করিলে সবিশেষ বুঝিতে পারা যায়। খ্রীষ্টের অনুশাসন তথাকার মানব প্রবৃত্তিকে কোনমতেই রোধ করিতে পারে নাই।

যাহা হউক, জাপানে নারীজাতির নানারূপ বাধ্যবাধকতা থাকিলেও তথায় পরিণীতা রমণীর স্থান অতি উচ্চ। 'ওকুসামা' অর্থাৎ গৃহরাজ্ঞীর সম্মানযোগ্যা মহিলা বলিয়া তিনি সম্বোধিত হন।

জাপানে নারীজাতির বহু মর্য্যাদা থাকিলেও নারীজাতিকে 'গাইসা'-বৃত্তি করিতে সম্মতি

দান জাপানের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। গেইশা অর্থাৎ নর্ত্তকী বা বেশ্যা হইলেও সমাজ হইতে চ্যুত হয় না। এই গেইশা-বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে পরাস্ত করিয়াছে। এই গেইশা-বৃত্তি জাপানী যুবতীরমণী দশ বৎসর পর্য্যন্ত পালন করিয়া আবার বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে পারে।

Letourneau লিখিয়াছেন :—"In Japan the parents willingly hire out their daughters either to private individuals or to houses of prostitution for a period of several years and the girls are in no way dishonoured thereby."

গেইশারা প্রায়ই শিক্ষিতা ও কলাবতী হয় এবং নিম্নশ্রেণীর রমণী হইয়াও আকর্ষণী শক্তিতে উচ্চবংশের যুবককে বিবাহ করিবার সুবিধা পায়।

জাপানে অবিবাহিত নরনারীর দল খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও তাহাদিগকে রক্ষিতা করিয়া রাখা হয়।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কাউণ্ট ওকুমা উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হইলেও স্ত্রীজাতি যাহাতে সুগৃহিণী ও সুজননী হইতে পারে, ইহাই তাঁহার চিন্তা এবং চেষ্টা। তিনি জাপানী রমণীর অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রিয়তা—Indiscriminating Westernization—আদৌ পছন্দ করেন না।

ওকাকুরা কাকুজো তাঁহার The awakening of Japan নামক পুস্তকে জাপানের নারীজাতির ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "যে নারীজাতির উন্নতিতেই জাতীয় উন্নতি হয় তা আমরা এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাদিগের নারীজাতি অতীতের গৌরব এবং ভবিষ্যতের আশাস্থল। আমাদের এই সূর্য্যরাজ্যে (Nippon) যে নব সভ্যতার সূত্রপাত হইতেছে তাহার দায়িত্বভার অতি সাবধানের সহিত আমাদের রমণীদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের রমণীবৃন্দ পাশ্চাত্য নারীদিগের ন্যায় অনেক অধিকার লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহারা সেই অধিকার লইয়াই ব্যস্ত নহে। কারণ আমাদের প্রায় অধিকাংশ স্ত্রীলোকই গৃহকেই তাহার যথার্থ কেন্দ্র বিবেচনা করে, সমাজকে নহে (For almost all of our women still consider the home and not society, as their proper sphere)"

নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারকল্পে জাপানে The Nippon Women's University কয়েক বৎসর হইতে খোলা হইয়াছে তথায় তাহাদিগকে বিজ্ঞান সাহিত্য কলা এবং গৃহকর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। জাপান পাশ্চাত্য হাবভাব অনেক গ্রহণ করিলেও যথার্থ সুশিক্ষার দিকেই জাপানের লক্ষ্য, বিকৃত বিলাসশিক্ষার জাপান আদৌ পক্ষপাতী নহে। Ukakuro kakuzo আর একস্থলে নারীজাতির শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেছেন :—We will give our women the position due to them. By a good education and training we will take care that our girls shall be able to fill in the right manner the post as companions of their husbands and as mothers of their children" সহধর্ম্মিণী

এবং সুজননীরূপে নারীজাতিকে গঠিত করাই আপানের লক্ষ্য। আমরা বিলাসিতার দাঁড়ের পাখী হইয়া এই সব কথা শুনাইয়া বুঝিব কি? আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে নারীজাতির উন্নতি না অবনতি ঘটিতেছে তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। সুগৃহিণী এবং সুজননী হইয়া আমাদিগের বর্ত্তমান নারীসমাজ গঠিত হইতেছে কি?

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপান এতদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য সংসর্গে পড়িয়াও প্রাচ্য বাধ্যতাকে (obedience) ভুলে নাই। ইহার প্রজাগণ রাজার বাধ্য, ইহার পুত্র কন্যাগণ পিতামাতার বাধ্য, ইহার নারীগণ স্বামীর বাধ্য, ইহার যুবকগণ প্রবীণের বাধ্য।

অধ্যাপক Jinzo Naruse পুরাতন আপানের নারীদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন :— "পুরাতন আপানেও বৌদ্ধ ও কনফিউকাসধর্ম্মের প্রবেশের পূর্ব্বেও নারীর অধিকার বড় কম ছিল না। কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক সকলকেই সমান চক্ষে দেখা হইত। পুরুষ জাতিই যে সর্ব্বস্ব এবং নারী জাতি যে কিছুই নহে, এইরূপ অসত্য আদর্শের ছায়া পর্য্যন্ত তৎকালে ছিল না। বরং রাজনীতি ক্ষেত্রে ও রাজ্যশাসনে নারীর ক্ষমতা অধিক ছিল। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে প্রাচীনকালে নয় জন রমণী আপানের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। কি দৈহিক কি মানসিক কি নৈতিক সকল বিষয়েই নারী জাতি, পুরুষদিগের অপেক্ষা কোন অংশেই হীনতরা ছিলেন না। প্রাচীনকালের আপানী নারীগণ শক্তির প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহারা আপনাদিগকে রণস্থিনী করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও কনফিউকাসের ধর্ম্ম-প্রভাব হইতেই আপানে নারী জীবনের বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তখন পর্য্যন্তও নারী জাতির এমনি প্রভাব ছিল যে তাহাদিগেরই চেষ্টায় এই দুইটী ধর্ম্ম আপানে বিস্তারলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল" Count Okuma তাঁহার Fifty years of New Japan নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন "যদিও পুরাকালে আপানী নারীরা শক্তি দেখাইতে সিদ্ধহস্তা ছিলেন, যদিও দেখা যায় তাহারা শিকো-মী (shike-me) অর্থাৎ রণরঙ্গিণী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন তথাপিও তাঁহারা নারীজনোচিত সুকোমল হৃদয় হইতে বঞ্চিতা হন নাই। সকলেই কাব্য এবং সঙ্গীতানুরাগিনী হইয়া বীরভোগ্যা হইতে ভাল বাসিতেন।"

মধ্যযুগে কাইবারা নামে একজন শিক্ষক আপানে নারীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি নারীজাতির মধ্যে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা আদৌ পছন্দ করিতেন না। পারিবারিক মিতব্যয়িতা এবং গণিত-শিক্ষা যে নারীজাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন তজ্জন্য তিনি অনুমোদন করেন। তাঁহার মতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকা এক সঙ্গে পাঠ করিতে পারে। রমণীজনোচিত শিক্ষারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, পুরুষের কার্য্যে নারীজাতির হস্তক্ষেপের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে "Girls must be trained in womanly virtues womanly address, womanly deportment and womanly service."

Mr. Douglas Sladden তাঁহার অভিনব পুস্তক "The Japs at Home" হইতে আপানের নারীধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দেয়াকুওয়ার নিম্নলিখিত বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়াদিয়াছেন।

"The only qualities that befit a woman are gentle obedience, chastity, mercy and quietness. A woman should look upon her husband as if he were Heaven itself, and never weary of thinking how she may yield to her husband and thus escape celestial castigation."

প্রাচ্য-রীতির সহিত জাপানী রীতির এই খানেই সামঞ্জস্য। অথবা জাপান পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াও নারীজাতির এই সব স্বাভাবিক গুণরাশিকে চিরকালের মত বিদায় দেয় নাই। কারণ সর্ব্ববিষয়ে বাধ্যতাই যে তাহার শিক্ষা! বাধ্যতাই যে জাপানের নরনারীর ধর্ম্ম! পাশ্চাত্য আব-হাওয়ায় পড়িয়া জাপান এখনও উদ্ধত হইতে শিখে নাই। জাপানের নারীজাতি উন্নত হইতেছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্য বিকৃতভাব গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। পুরুষের নিকট জাপানী রমণী এখনও সঙ্কুচিত হইয়া চলিতেছে।

যদিও এখন জাপানে নারীজাতির অবস্থা ক্রমশঃই উন্নত এবং তাহাদিগের কর্ম্মও বিস্তৃত, Count Okuma কিন্তু জাপানী নারীর এতাদৃশ উন্নতিতেও সন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। তিনি জাপানের নারীজাতির মধ্যে সন্তানপালন শিক্ষার বিশেষ অভাব এবং আবশ্যকতা পরিলক্ষিত করিতেছেন। বাস্তবিক সন্তানপালনশিক্ষা একটা জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য যে কিরূপ আবশ্যক তাহা বিজ্ঞ সমাজদর্শীমাত্রেই সবিশেষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

জাপানকে বুঝিয়া উঠা যেমন কঠিন, জাপানের নারীত্বকে সম্যক্ উপলব্ধি করাও ততোধিক কঠিন। জাপান জগতের যাহা কিছু ভাল পাইয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু আপনার বিশেষত্বটুকেও সবিশেষ বজায় রাখিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপূর্ব্ব সম্মিলনে এই জাতি গঠিত—ইহার নারী জাতিও গঠিত দেখুন, জাপানী নারীজীবনে পাশ্চাত্য বিবাহবন্ধন ছেদন (divorce) আছে কিন্তু পাশ্চাত্য প্রেম (Court-ship) নাই তৎপরিবর্ত্তে বাধ্যতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে এই বাধ্যতা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রাচ্য সভ্যতার সনাতন সম্পত্তি। পাশ্চাত্য মোহে ভুলিয়া জাপান এই আসল ভিত্তিটাকে হারায় নাই। জাপানের নারী বাধ্য—পুত্র বাধ্য! আবার দেখুন, জাপানে গেইসা-বৃত্তির প্রচলন আছে কিন্তু ইহা নীচ জাত হইলেও সমগ্র জাপানের ইহাতে অনুকূলতি বা পাপ বোধ নাই। তজ্জন্য জাপানীসমাজে গেইসারও স্থান আছে—গেইসাও পরবর্ত্তী জীবনে বিবাহ করিয়া স্থিতিলাভ করিতে পারে। এদিকে পুরুষের ভিতরে দেখুন এক বিবাহের প্রচলন স্বত্বেও বহু রক্ষিতাপোষণও সমাজে নিন্দনীয় নয়, এমন কি পত্নীও তজ্জন্য স্বামীকে বাধা প্রদান করে না। জাপানের নরনারী-জীবনে এবম্বিধ বহু বৈষম্য থাকিলেও তাহা হইতে অশান্তি ও দুঃখের উৎপত্তি নাই। কারণ আমাদের চক্ষে যাহা পাপ, জাপানীদের চক্ষে তাহা পাপ নহে, বৈষম্য নহে, অতএব সে সমাজে দুঃখ কোথায়? ঈর্ষা কোথায়? অসন্তোষ কোথায়? তথায় বহু বিচিত্রতাতেও কোলাহল নাই—অশান্তি নাই মনোমালিন্য নাই, বিদ্বেষ বুদ্ধি নাই। আছে সহযোগিতা ও চির বাধ্যতা! এ বড় মজার দেশ! তাই তথাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতার সদাই প্রফুল্লভাব—মুখে উৎসাহের বাণী, হৃদয়ে আশার উদ্দীপনা। তথাকার বৃদ্ধের

অবসাদ নাই, যুবক যুবতীর প্রেমাভিনয় নাই, শিশুর ক্রন্দন নাই। তবে আছে কি? আছে কেবল জাতীয় উন্নতি করে আপামর সাধারণের ব্যস্ততা ও মরিতেও হাসি হাসি মুখ খানি। জাপান অদ্ভুত দেশ—জাপানের রমণীরাও বৈচিত্র্যময়ী!

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

গ্রাম ও স্বদেশ-সেবা

দেশের শুষ্ক কলেবরে ধীরে ধীরে প্রাণ-সঞ্চার হইতেছে। যাহা এককালে নীচ, ঘৃণ্য বোধে আমরা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া ছিলাম, তাহাই আবার নূতন জ্ঞানে এবং আনন্দে আদর করিয়া বরণ করিতেছি। সাময়িক শারীরিক সুখের আশায় আমরা বিলাসিতায় ডুবিতেছিলাম, যখন স্বাস্থ্য যায় যায়, তখন ঠেকিয়া শিখিলাম—শারীরিক পরিশ্রমই শারীরিক সুখের কারণ। পরিশ্রম ঘৃণা করিতাম, সমাজকে অবহেলা করিতাম, জাতীয়তা একটা শূন্য কথা মনে করিতাম, দেশ একটা মাটির ঢিপ, উদারতা ও বৈরাগ্য অজ্ঞতামাত্র বোধ হইত, স্বার্থই দুনিয়ার চরম লক্ষ্য—এই জ্ঞান নিয়া এতদিন বড় হইতেছি বলিয়া বড়াই করিতেছিলাম; কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিলাম যে দিন দিন এরূপে ছোট হইতেছি, মৃত্যুর দিকে চলিয়াছি। নিজের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে, নিজকে বাঁচাইতে হইলে, নিজে বড় হইতে হইলে, সমাজ ও দেশকে উন্নতির ভিত্তি করিতে হইবে। সমাজের ভিতর দিয়া আত্মবিকাশ ও উন্নতি সাধন করিতে হইবে। 'Die to live'—প্রকৃত মানবজীবন যাপন করিতে হইলে, প্রথম নিজকে সমাজের ভিতর হারাইয়া ফেলিতে হইবে, আত্মবলি দিতে হইবে, তবেই পুনর্জীবন লাভ হইবে। যে মরিতে না জানে, সে বাঁচিতে পারে না। সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের সুখ সুবিধা ত্যাগ করিতে পারিলে, প্রকৃত জীবন লাভ করা যায়, মানুষ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।

মানুষের সমাজ ছাড়া বাস করা সম্ভব নয়। ইংরাজীতে একটা কথা পড়িয়াছি যে সমাজহীন মানব হয় দেবতা, নয় পশু। আমাদের মনুষ্যত্বলাভের জন্য, ভাব, বুদ্ধি ও কার্য্যে উন্নতিলাভ করিবার জন্য আমাদের সমাজেই থাকিতে হইবে। শুধু নিজকে বড় করিবার প্রয়াস সমগ্র রাজ্য ছেড়ে দিয়ে রাজধানীকে সমৃদ্ধিশালী করিবার চেষ্টার মত ক্ষণস্থায়ী, কষ্টকর ও নিষ্ফল হয়। সমাজের সঙ্গেই আমরা বড় বা ছোট হই। শুধু নিজকে লইয়াই আমার দুনিয়ার সাথে পরিচয় নয়, এ পরিচয় এ সমস্ত আবহমান-কাল থাকিবে, বংশপরম্পরায় চলিবে। আমি বরং দৈবাৎ উল্কার মত ছুটিয়া আসিয়া সুখে ও সমৃদ্ধিতে জীবন কাটাইয়া গেলাম কিন্তু যাহারা আমার রক্তের সাক্ষ্য নিয়া এই ধরাতে বাস করিবে তাহারা ত এই সমাজ হইতেই শিক্ষা লাভ করিবে, এই দেশের জল-বায়ু হইতে পুষ্টি সাধন করিবে, এই সমাজের শক্তি লইয়া হৃদয়ে বল পাইবে; কিন্তু এ সমাজ যদি দুর্ব্বল ও দুষ্টদেশাচারক্লিষ্ট হয়, এদেশ যদি পূতিগন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর হয় ইহা

কি প্রকৃত পক্ষে আমারই আত্মোন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইবে না ?

এ সকল সদ্‌যুক্তি হইলেও আমরা সকল সময়ে সকল কথা বুঝিয়া উঠি না। আমাদের সমাজও এতদিন এ সকল চিন্তা ভুলিয়া দুর্ব্বল, পরনির্ভর ও রোগগ্রস্ত হইয়া উঠিতেছিল। এখন আবার ধীরে ধীরে সমবের বিকাশ ও শিক্ষার সহিত প্রকৃত উন্নতির দিকে লক্ষ্য পড়িয়াছে। আমাদের চিন্তা ও কার্য্য বিশেষ-ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। আমরা আগে চিন্তা করি, পরে কাজ করি, এবং কার্য্যের ভিতর দিয়া চিন্তা প্রবাহিত হইয়া সুফল দান করে। যেমন চারিদিকে নানা-ভাবের ভাবুক দেখা দিয়াছেন বিভিন্ন পথ-প্রদর্শক উপস্থিত হইয়াছেন, তেমন আবার অনেক কর্ম্মবীরেরও অভ্যুদয় হইয়াছে, বিভিন্ন প্রণালীতে কার্য্য চলিতেছে।

বর্ত্তমানে বড় ছোট সকলেরই একদিকে লক্ষ্য, সকলেই যেমাতার সেবায় নিজকে নিয়োজিত করিতেছেন। এককালে যেমন অনেকেরই দৃষ্টি বাহিরের দিকে ছিল, এখন আবার তেমনি ঘরমুখো হইবার চেষ্টা চলি-তেছে। বিদেশে নিজকে বিকাইবার চেষ্টা এখন স্বদেশে আপনাকে বিলাইবার ইচ্ছায় পরিণত হইতেছে। স্বদেশ ও সমাজের ভিতর দিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা এবং আত্ম-বিকাশের চিহ্ন দেখা দিয়াছে। দেশে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান হইয়াছে বা হইতেছে, সে সকলের কথা ভাবিতেছি না। বড় বড় স্কুল কলেজ, কারখানা, রামকৃষ্ণ-মিশন, দামোদর বন্যা প্রভৃতি আমাদের জাতীয় গৌরববৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করে সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু এগুলি দিয়াই দেশকে প্রকৃতভাবে বিচার করা চলে না। স্বদেশী আন্দোলনের মত বিরাট ব্যাপারকেও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায় না; কারণ ইহা আন্দোলন, সাগরতরঙ্গের ন্যায় উপরেই অধিকাংশ আধিপত্য বিস্তার করে, নিম্নস্থিত জলরাশি হয় ত ইহা অনুভব করে না, পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়। অবশ্য, আমাদের স্বদেশী আন্দোলনকে অন্য ভাবে দেখিয়া থাকি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ইহার ফল গভীরতম দেশকেও স্পর্শ করিয়াছে। তবে, যে কোন আন্দোলন হইতেই জাতির পরিচয় লাভ করা যায় না।

সমাজ বা জাতির প্রাণ গ্রামে, দরিদ্রের কুটিরে বাস করে। ইংরাজীতে বলে, 'A nation lives in a cottage'. সেই নীরব আড়ম্বরশূন্য লোকালয়ে যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাই জাতির প্রাণ। সহরের জীবন ত toilette করা সাহেবীমুখ, সে ত শুধু মনভুলানো লোক দেখানো সাজ। যদি সেই লুকানো দেহখানি দেখিতে হয়, ভিতরের প্রাণ অনুভব করিতে হয়, জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তি ও বিকাশ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, তবে ঐ বৃক্ষাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র পল্লীগুলিতে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

ঐ গ্রামের উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মাপকাঠি। এই কঠিন মাপকাঠির দ্বারা বিচার করিয়া যদি দেশে জাতীয় জীবন সঞ্চারের সংবাদ পাই তবেই বুঝিব দেশের প্রকৃত অবস্থা কি, দেশ উন্নতির পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং হইতেছে। গভীর আনন্দের কথা যে এখন গ্রামগুলিতে বিদ্যোন্নতি, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, ভ্রাতৃভাব, আত্মনির্ভরের সংবাদ চারিদিক হইতে শুনা যাইতেছে। বর্ত্তমানে এসকল

সংবাদের বিশেষ মূল্য আছে। আমি দুই একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই সকল ঘটনা হইতে আমাদের গ্রামসকলের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত বারদী একটী হিন্দু প্রধান গ্রাম। বিখ্যাত নাগবংশ তথাকার ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার। সেখানে একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে। ঐ গ্রামের চারিদিকে অশিক্ষিত কৃষক মুসলমানের বসতি।

একদা সন্ধ্যাকালে গ্রামের এক প্রান্তে নিরাশ্রয় বিকৃতমস্তিষ্ক উলঙ্গপ্রায় অত্যন্ত কদাকার এক মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হয়। নিকটবর্ত্তী মুসলমান কৃষক বালকেরা কৌতূহলপরবশ তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল ও অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহার উত্তর হইতে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে 'পাগল' বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু পাগল বলিয়া এ অবস্থায় তাহাকে ফেলিয়া কেহই চলিয়া গেল না। সে পাগল হইলেও মানুষ ত। এই অশিক্ষিত চাষাদের হৃদয়ে করুণা ও স্নেহের যে স্রোত বহিতেছে, অনেক শিক্ষিত সভ্য ব্যক্তি তাহা লাভ করিতে পারিলে প্রকৃত মানুষ হইতে পারিতেন। এই বাধিত মানবের নিকট তাহাদের বালক-সুলভ চাঞ্চল্য ও হাসি ঠাট্টা লজ্জা পাইয়া ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। তাহাদের মুখ ধীরে ধীরে চিন্তিত ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। আমি যেন মনুষ্যত্বের জ্যোতি তাহাদের বদনে লক্ষ্য করিলাম। তাহাদের মধ্য হইতে একজন বালক হঠাৎ দৌড়াইয়া গিয়া কতকগুলি পাটকাঠি (সোলা) জ্বালাইয়া নিয়া আসিল। সেই আলোকে যাহা দেখিলাম তাহাতে তাহার দৈন্যতা আরও ভীষণাকার ধারণ করিল—তাহার সর্ব্বশরীর মলমূত্রে আচ্ছাদিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহারা ইহাতে ঘৃণা বা অবহেলা প্রকাশ না করিয়া লোকটীর জন্য অধিকতর করুণা অনুভব করিতে লাগিল। কয়েকটী পাত্রে করিয়া জল আনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দিল। পরে নিকটবর্ত্তী এক মুসলমান বাড়ী হইতে কিছু ভাত ও তরকারী আনা হইল। সে হাতে করিয়া খাইতে পারে না। তাহার হাত অবশ। একটী প্রৌঢ় মুসলমান তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিল—মাও বোধ হয় আপন ছেলেকে এর চেয়ে অধিক যত্ন করেন না।

এমন সময় নাগবংশীয় কয়েকটী বালক (সকলেই বারদী স্কুলের ছাত্র) সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ী অভিমুখে যাইবার সময় এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার দৃষ্টি ও মনোযোগ তাহাদেরই দিকে বিশেষভাবে নিপতিত হইল। তাহাদের কার্য্যকলাপে প্রকৃত সম্ভ্রান্তবংশের পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইলাম। তাহারা উচ্চ জমিদার পরিবারের সন্তান, ধুতি জামা পরা স্কুলের ছাত্র। অশিক্ষিত ধূলিকাদা মাখা চাষা মুসলমান বালকদের সঙ্গে এই নরনারায়ণের সেবায় এক মন এক প্রাণে নিজকে নিয়োজিত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিল না। এই নিরাশ্রয় পথিক রাত্রের হিম হইতে কিরূপে রক্ষা পাইবে—ইহাই তাহাদের চিন্তা। অবশেষে মুসলমান ছেলেদের সহায়তায় তাহাকে কাঁধে করিয়া নিকটবর্ত্তী একটী প্রাচীন মঠের নিকট লইয়া গেল। উহার দুই দিকে দুয়ার কিন্তু একটীও কপাট নাই। তাড়াতাড়ি কতকগুলি পাটকাঠি সংগ্রহ করিয়া দুইটা বেড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল

এবং তাহাকে এই মঠের ভিতর রাখিয়া দুই দিক বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া দিল। তাহাদের উদ্যম দেখিয়া মনে হইতেছিল যে রাত্রের অন্ধকার ও ঠাণ্ডা বাতাস তাহাদের কার্য্যের কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে নাই। কাজ শেষ করিয়া ভগবানের নিকট তাহার শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে ছেলেরা রাত্রি ৮।৮।০ ঘটিকার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিল। রাস্তায় তাহাদের সৎকার্য্যের জন্য কাহারো নিকট বাগাড়ম্বর করিতে শুনিলাম না। তবে, কোন কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট তাঁহার সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য এই ঘটনা দুই একবার তাঁহাদিগকে অতি সকরুণ ভাষায় বিবৃত করিতে শুনিয়াছি মাত্র।

পরদিন প্রাতে নিয়মিত অধ্যয়ন শেষ করিয়া ছেলেরা ঐ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং লোকটীর অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে ভাল ও সুস্থ দেখিয়া সকলেই শান্তিলাভ করিল। তৎপর তাহার ভাত খাওয়ার ও পরিধানের বন্দোবস্ত করিয়া তাহারা প্রফুল্ল-চিত্তে স্কুলে চলিয়া গেল। তাহাদের নীরব কার্য্যধারা প্রশংসাযোগ্য। নিরাশ্রয় পথিকের জন্য ভাত ও কাপড়ের বিশেষ যোগাড় হইয়া গেল; কিন্তু গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তি এমন কি তাহাদের আত্মীয়েরা এই কাজের খবরও পাইলেন না। তাহারা এই পরোপকার কাজটি অতি পবিত্র এবং আপন মনে করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি সঙ্গোপনে সাধন করিয়া প্রকৃত মহত্বের পরিচয় দিয়াছে।

পরদিন তাহার অবস্থা খারাপ হইয়া উঠে। ছেলেরা তাহাকে বার্লি পথ্য দেয়। রাত্রিতে সযত্নে তাহাকে পরম অবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া আসে। এদিকে নিদারুণ কাল তাহাদের সকল চেষ্টা বিদ্রূপ করিয়া আপন কার্য্য সাধন করিল। এতগুলি যুবকের করুণা-রক্ষিত দুর্ব্বল প্রাণটুকু রাত্রি শেষ না হইতেই যম সকলের অজ্ঞাতসারে কাড়িয়া লইলেন। পরদিন স্কুল বন্ধ ছিল বেলা নয় ঘটিকার সময় সেবক দল সেই মঠে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণশূন্য দেহখানি দেখিয়া বড়ই শোকগ্রস্ত হইয়া পড়িল। আমার এখনও তাহাদের সেই সরল বিষাদ-মাখা মুখ খানি মনে পড়ে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া, ক্ষুধার্ত্তকে আহার দিয়া, রোগীকে সেবা করিয়া তাহারা যে কি পরম সুখভোগ করিতেছিল তাহা তাহাদের ঐ সময়ের দুঃখ ও যাতনা দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলাম। "পরোপকারে কাহার উপকার?" ইহার সার কথাটী ছেলেরা ভাষায় না বুঝিয়া থাকিলেও তাহাদের প্রাণে যে ইহার অনুভূতি (nascent consciousness) জন্মিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তৎপর তাহার সৎকারের ব্যবস্থা চিন্তা করিয়া তাহারা গোপনে গ্রাম হইতে পরদুঃখ কাতর শ্রীযুক্তেশ্বরী সুখদাসুন্দরী চৌধুরাণীর নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা গ্রহণ করে এবং ঐ কার্য্য মুসলমান নিয়মানুসারে সম্পন্ন করিবার জন্য একজন মুন্সীকে ডাকিয়া আনা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই গোরস্থান মুসলমান ও হিন্দুছাত্রে ভরিয়া গিয়াছে দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক চাষাই তাহার বন্ধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহের জন্য যথা-সাধ্য দান করিয়াছিল। এইরূপ নিঃস্বার্থদানই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান। মুসলমান রীত্যনুসারে প্রার্থনা ও অন্যান্যকার্য্য হইয়া গেলে পর মা বসুন্ধরা আপন বুক চিরিয়া নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিলেন। তৎপর হিন্দুছাত্রগণ

এবং মুসলমান কৃষকগণ তাহার আত্মার সদ্গতির জন্য জগত্পিতা পরমেশ্বরের নিকট আপন আপন প্রার্থনা জানাইয়া এই ক্ষুদ্র অথচ মহৎ কার্য্যের শেষ আহুতি প্রদান করিলেন। একেই বলে ভ্রাতৃভাব, স্বদেশানুরাগ, প্রেম। ধন্য ছাত্রগণ, ধন্য নিরক্ষর মুসলমান কৃষকগণ। "বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়। দশহাজার লোকের বাহবার সাম্নে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্য্যে সকলের অজান্তেও যিনি নিঃস্বার্থতা, কর্ত্তব্য পরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য।" বিবেকানন্দ

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিব। আমাদের বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখান হয়, যথা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা, ভূগোলের দশ বিশটা নাম, সাহিত্যের রক্তমাংশ ছাড়া কতকগুলি হাড়ের মত শুষ্ক গল্প। ইহাতে না আছে প্রাণ, না আছে অনুভূতি। এগুলি শিখান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিতেছি না। তবে এগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করা আবশ্যক। মানুষকে কতকগুলি কথামাত্র শিখাইলে সে একটা বইয়ের আল্মারি পর্য্যন্ত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত মানুষ তৈয়ারি হইবে কি? তাহাকে পর সেবা, পরোপকার, আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি মহৎভাবগুলি শুধু ঠোঁটে ঠোঁটে শিখাইলে চলিবে না, সে গুলি তাহার প্রাণ দিয়া স্পর্শ করাইতে হইবে। যেমন বিজ্ঞান অথবা সূত্রধরের কাজ practical শিক্ষা দেওয়া হয় সেরূপ উচ্চভাব ও নীতিশিক্ষা ও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকা উচিত। ছেলেরা যেন রোগীকে সেবা করিয়া সেবাধর্ম্ম শিখিতে পারে, নিজ হাতে ছোট বড় কাজ করিতে করিতে আত্মনির্ভর আত্মবিশ্বাস শিক্ষালাভ করিতে পারে। এই উপরোল্লিত ঘটনা হইতে তাহারা যে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা কি তাহারা ২০।২৫টা বই পড়িয়া শিখিতে পারিত?

শুধু এই ঘটনাই নয়; ইহার পূর্ব্বে ও পরে এরূপ আরও কার্য্য সময় সময় আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। যাঁহারা সর্ব্বদা সহরের ঘান্‌ঘ্যানিতে বাস করিয়া শুষ্কহৃদয় ও নিরাশ হইয়াছেন তাঁহারা কোন গ্রামে যাইয়া শস্য-শ্যামল মাঠ, গ্রামবাসীর ভালবাসাভরা বক্ষ, হৃদয়ভরা সরলতা ও প্রকৃত স্বদেশসেবা দেখিলে হৃদয়ে বল বাঁধিতে পারিবেন, বুকে আশার সঞ্চার হইবে ও স্বদেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল প্রতীয়মান হইবে,—সর্ব্বশ্রেষ্ঠলাভ, প্রকৃত মনুষ্যত্বের সাক্ষাৎ পাইয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন।

তারুণ্যের এই ছেলেরাই গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য নিজ হস্তে দা, কোদাল ও কুড়াল লইয়া এবং মাটির বোঝা মাথায় করিয়া প্রায় সকলগুলি রাস্তাই ৩।৪ হাত প্রশস্ত করিয়াছে। যাহারা ঐ রাস্তায় পূর্ব্বে ভ্রমণ করিতেন তাঁহারা পরে ঐ সকল রাস্তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। দুই পার্শ্বের বড় বড় আগাছা ও ভয়ানক কণ্টকময় জঙ্গল পরিষ্কার করিবার সময়ে তাহাদের উৎসাহ দেখিলে হৃদয় আশায় ও আনন্দে পূর্ণ হয়। যে কাজ অধিক কঠিন ও কষ্টসাধ্য সেখানেই তাহাদের অধিক উৎসাহ। কোন বাধা বিপত্তিই তাহাদিগকে দমাইতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে ৩।৪ দিনের ভিতর প্রধান প্রধান ৫।৬টা পথ পরিষ্কার ও উন্মুক্ত হইয়া গেল।

শুধু ইহাই নয়, তাহাদের কার্য্যের অধিকতর সুফল অন্যত্র দেখিতে পাইব। গ্রামের এক

সুশিক্ষিত পণ্ডিত মহাশয় এই উপলক্ষে আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন যে মুসলমান আমলে সকলেই পেছনের চুল বড় রাখিত, ঘাড়ের উপর বাবরি শোভা পাইত কারণ তখনকার মুসলমান সম্রাটেরা ঐরূপ বাবরি রাখিতেন, পরে ইংরাজ রাজা আসিয়া পেছনের চুল কাটিয়া ফেলিবার ফ্যাশন প্রবর্ত্তন করিলেন এবং বর্ত্তমানে উহাই সকলে অবলম্বন করিয়াছে। নিম্নস্তরের লোকেরা উচ্চস্তরের অনুকরণে শিক্ষিত ও সজ্জিত হয়। নাপিতবংশীয় ছেলেদের কাজ দেখিয়া তিনি আমাকে বলিলেন যে, চতুর্দ্দিকে শীঘ্রই এই লোকহিতকর কার্য্যের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবেন। কথাগুলি প্রতি শব্দে শব্দে ফলিল। তখনই দেখিতে পাইলাম অন্যান্য পাড়ার লোকেরাও বিশেষ উৎসাহের সহিত স্বেচ্ছায় এই কাজ আরম্ভ করিয়াছে। দুই এক দিন যাইতে না যাইতে এই নীচ,—আমি বলিব উদার মহৎ—কাজ সংক্রামক হইয়া পড়িল। দূরের অন্যান্য গ্রামেও রাস্তা-ঘাট ও জঙ্গল পরিষ্কার কার্য্য বর্ত্তমানে বেশ উদ্যমের সহিত চলিতেছে। বারদীর কোন কোন ছাত্র ও পদস্থ ব্যক্তি তাহাদের কার্য্যে যোগদান ও সহায়তা করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কোন এক অবস্থাবান ব্যক্তি এই সকল কার্য্যে বিশেষ আনন্দিত হইয়া যুবক কর্ম্মবীরদিগকে কিছু টাকা দান করেন। দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ঐ টাকা হইতে এক কপর্দ্দক তাহারা প্রীতি ভোজনে ব্যয় করে নাই। সকল টাকাই তাহাদের নিজ হাতে গড়া ক্ষুদ্র লাইব্রেরীর পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। ইহা গৌরবের বিষয় নয় কি?

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারি 'Example better than precept.' অনেক বক্তৃতায় যাহা সাধিত হইত না, তাহা দৃষ্টান্তের বলে কেমন নীরবে অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। এখানে বারদী গ্রামের কৃষিকার্য্যের কথাও মনে পড়ে। দেখিতে দেখিতে কৃষি সম্বন্ধীয় কয়েকটী নূতন পন্থা ও নিয়ম দুই বৎসরের ভিতর কেমন গ্রামময় ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহার একটী চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ ইতিহাস আছে। বারান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। কে বলে আমরা conservative, স্থিতিশীল? প্রকৃত উন্নতির আশা পাইলে আমরা নূতন শিক্ষা গ্রহণ ও অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নই। তবে আমাদের হইয়া, আমাদের অবস্থা বিচার করিয়া এ সকল শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার লোকের অভাব। বর্ত্তমানে উপযুক্ত ছাত্রের অভাব হইবে না, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব লক্ষিত হয়।

গ্রামের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলী জাতীয় জীবন চরিতের এক বিশেষ অধ্যায়। এরূপ ঘটনা অনেক গ্রামেই বর্ত্তমানে লক্ষিত হইবে। এই সকল নিত্য নৈমিত্তিক স্বরূপ বিহীন সাধারণ ঘটনা হইতে আমাদের জাতীয় চরিত্র কি তাহা বিচার করিতে হইবে। অবশ্য গ্রাম শুধু এই সকল ঘটনাবহুল নয়। ইহার আর একটা দিক আছে যাহা দেখিলে অনেকেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টি অপসারিত করিবেন। গ্রামের ঐ কদর্য্য দৃশ্যও আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রাখিতে হইবে যেন ধীরে ধীরে উহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি। সুন্দর দিকটা যতই ফুটিয়া উঠিবে, বিপরীত দৃশ্যটী ততই কদর্য্য ও ভয়াবহ হইতে থাকিবে; ফলে, নৈশ অন্ধকার যেমন নবসূর্য্যোদয়ের

সমস্ত ধীরে ধীরে কোথায় বিলীন হইয়া যায়, গ্রামের পাপও সেইরূপ জ্ঞান উচ্চভাব ও কর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা পাইয়া আপনা হইতেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

যে সকল ঘটনা দ্বারা বারদী গ্রামের সামান্য পরিচয় দিলাম, এরূপ ঘটনা বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দৃষ্ট হইবে। ইহারা বাঙ্গালার ভিতরকার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে। আমরা যে নেহাৎ অসভ্য নই, আমাদের ভিতরেও যে মনুষ্যত্ব বিকাশলাভ করিতেছে, আমাদের উন্নতির আশা যে দুরাশা নয়, এই সকল ঘটনা তাহাই বিশেষভাবে প্রমাণ করে। আমাদের প্রাণ কোথায়, আমাদের বিশেষত্ব কি, তাহাও এসকল ঘটনা হইতেই লাভ করিতে হইবে।

বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ধর্ম্মই ভারতের জীবন। ধর্ম্মভাবের ভিতর দিয়াই ভারত আপনার উন্নতিসাধন করিবে। "ত্যাগ ও সেবা" এ জাতির প্রধান অস্ত্র ও বল। এই শক্তিবলেই ভারত এতদিন আপনাকে জীবিত রাখিয়াছে এবং এই শক্তি দ্বারাই ভারত বিশ্বিজয়ে সমর্থ হইবে—ইহা খুব কঠিন ব্যবস্থা সন্দেহ নাই। ত্যাগ ও সেবা ত মানব ইতিহাসের শেষ অধ্যায়। বর্ত্তমান সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় জার্ম্মাণ, মার্কিন, ইংরাজ ও ফরাসী জাতিসকল ত্যাগ ও সেবার পুণ্য আদর্শকে Utopia বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহার কথা তাঁহারা শুধু তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ Bibleএতে শুনিতে পান। ইহা যে কখনও জাতীয় আদর্শে পরিণত হইতে পারে, এরূপ চিন্তা ও বিশ্বাস তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন স্বপ্নদর্শী পুরুষের কল্পনাতে আসিয়াছে মাত্র। আরও কত শতাব্দী পরে এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ঐসকল দেশে জাগিবে, কে জানে? কিন্তু ভারত অন্যদিকে যেরূপ হউক, দুনিয়ার পার্থিব সমৃদ্ধিলাভে যতই হীন হউক, সহস্র বৎসরের সাধনার ফলে ত্যাগ ও সেবা ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তিরূপে চিরকাল বিরাজমান রহিয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে ইহার যথেষ্ট বিকাশ ও পরিচয় নাই, তবু ইহা যে প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়কন্দরে বাস করিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ের সাড়া পাইয়া ইহা যে আবার অতি সহজে জাগরূক হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা যাইতেছে। প্রভেদ এই যে, পশ্চিম জগৎ এই অত্যুন্নতভাব নূতন জ্ঞানে শিখিবে, বহু বৎসরের চেষ্টার ফলে জাতীয় উন্নতির এক নূতন স্তরে আরোহণ করিবে; আর ভারতের ইহা চির-পুরাতন ধর্ম্ম, অনভ্যাসে ইহাতে মলিনতা আসিয়াছে মাত্র, অল্প আয়াসেই আবার ত্যাগ ও সেবার আসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে। দেশের ও দশের 'সেবা,' সমাজের 'সেবা,' সেবা করিবার জন্য 'ত্যাগ' ধীরে ধীরে দেশময় ছড়াইতেছে। এই নূতন আশা, নূতন বাণী সর্ব্বত্র শুনা যাইতেছে। ভারতে প্রাণসঞ্চারের সংবাদ জগৎময় প্রচারিত হইয়াছে।

যে দুই একটী ঘটনা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেও ঐ মহৎ ভবিষ্যৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষা ও বিকাশলাভ করিয়া আমাদের গ্রামের এই সরল ও সাধারণ ভাবগুলি ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া উঠিবে। এই ত্যাগ ও সেবা আমাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র এবং ইহা শিক্ষা ও সাধন করিতে হইবে—আমাদের সমাজে, আমাদের গ্রামে। গ্রামই জাতির প্রাণ। যদি জাতীয় প্রাণ ও শক্তি অনুভব করিতে চান, যদি নিজের প্রাণ উপলব্ধি করিতে চান, তবে গ্রামে যান, পথে

ঘাটে বেড়ান, নিরক্ষর শ্রমজীবী ও সাধারণ গৃহস্থের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করুন। এই গ্রামের সেবা করিতে হইবে, এই গ্রাম-সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইবে, "এই গ্রামবাসী আমার প্রাণ, এই গ্রাম আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী" বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে, আর, সকল জাতির নিয়ন্তা সেই জগৎ-পিতা পরমেশ্বরের শ্রীচরণে একান্ত-হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইবে যে আমাকে সে ভাবুকতা দাও "যে ভাবুকতায় লোকে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি উপলব্ধি করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যাবান ব্যক্তি সমাজে কীর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠালাভের অপেক্ষা না করিয়া বিদ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, স্বয়ং বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দেশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা সৃষ্টি করিতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন; যে ভাবুকতায় ধনবান সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে ধর্ম্মে উন্নীত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদানে ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন; যে ভাবুকতায় ভগবান যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি পরোপকারে এবং সকল প্রকার দারিদ্র্য মোচনে সেই শক্তির প্রয়োগকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করেন; যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে মানব গৃহত্যাগ করিয়া স্থির ও সংযতভাবে সমাজ ও সংসারের উন্নতি কামনা প্রচার করিতে সমর্থ হয়।"

শ্রীগ্রামবাসী।

আমার-আমিত্ব

একদা ভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া প্রকৃতি দেবীর শ্রান্তিহারী ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছি, সম্মুখে একটী নাতিপ্রশস্ত পথ দূরে বহুদূরে সুদূর নীল নভোমণ্ডলে বিলীন হইয়া যেন আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটুকু অনন্তে শান্ত করিতেছে। এই পথ দিয়া দুইটী পথিক মৃদু-মধুস্বরে কথোপকথন করিতে করিতে আমার নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহাদের বাক্যালাপ শ্রবণে হৃদয়ে যে অভূতপূর্ব্ব ভাবোদয় হইয়াছিল তাহা সবিস্তার বর্ণন করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম সুতরাং সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইলাম। জানিনা ইহাতে আমার মনোভাব কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি পাইল কি না!!

আমি ভাবিতেছিলাম—এজগতে যত কিছু গৌরবের, যত কিছু যশের, যত কিছু ভালবাসার, দয়া, মায়া, স্নেহ প্রভৃতির আস্পদ আছে সকলের মূলে আমার "আমি।" আমি তোমাকে ভালবাসি, স্নেহ করি, তুমি

আমার ভালবাসাদির পরিমাণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি আমার মতন অর্থাৎ আমি আমাকে যেমন ভালবাসি ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না বা পারা সঙ্গত নহে। এই উত্তরে তোমার পরম পরিতোষ না হইয়া থাকিতে পারে না অন্যথা হইলে বুঝিব, তুমি কপটী তোমার আমার সে ভালবাসাদির কিছুই মূল্য নাই; কারণ তুমি তোমাকে যেমন ভালবাস এ জগতে আর কাহাকে তাহা অপেক্ষা ভালবাসিতে পার না; অন্য সকলে তোমার আমার সে ভালবাসার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম প্রভৃতি স্থান যথাক্রমে অধিকার করিয়া থাকে। সুতরাং জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির করিতে আমার "আমি" ভিন্ন আর দ্বিতীয় উদাহরণ দেখিতে পাই না। তাই বলিতেছিলাম আমার "আমি" সকলের শীর্ষে। আবার আমার পরম আদরের "আমি" যেমন আমার শত্রুতা করিতে সমর্থ তেমন আর এ পৃথিবীতে কেহ নহে। অন্য সকলের নিকট হইতে নিষ্কৃতি লাভ অল্পায়াসে ঘটিয়া থাকে; কিন্তু আমার সাধের "আমি" হইতে পরিত্রাণ দীর্ঘকালব্যাপী বহু চেষ্টার ফল, কখন কখনও অসম্ভব হইয়া উঠে। ইহা Lord Avebury P. C. একস্থানে প্রকারান্তরে উল্লেখ করিয়াছেন,—"An Estern proverb says that calamities sent by heaven may be avoided, but from those we bring on ourselves there is no escape" অর্থাৎ একটী প্রাচ্য প্রবাদ আছে যে, দৈবপ্রেরিত বিপত্তিসমূহ পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে সকল বিপদ আমরা স্বয়ং আমাদিগের উপর আনয়ন করি তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই। তাই বলিতেছিলাম শত্রুর শীর্ষেও আমার "আমি"।

ধন, জন, ঐশ্বর্য্য ভোগবিলাস পরিপূর্ণ রাজ্যের রাজার "আমি" যেমন প্রিয়, যেমন সুখের, যেমন মমতাময় ও গৌরবান্বিত; ছিন্নকন্থাধারী, ভক্তজনবাসী ভিক্ষোপজীবী, নিরন্ন দরিদ্রের "আমি" তেমনই প্রিয় তেমনই আদরের। অন্যথা হইলে ঐ হীন দরিদ্র প্রাণান্ত পরিশ্রমে নিজ জীবন রক্ষা করিতে অত ব্যগ্র হইবে কেন? আবার শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু গহনকাননচারী গিরিগুহাবাসী সংসারবিরাগী সংযমী যোগী পুরুষের "আমি" তেমনই সুখের, তেমনই মমতার, তেমনই গৌরবের তাহা না হইলে "আমি পরমানন্দ উপভোগ করিয়া মুক্তি পাইব" বাসনায় যোগ-ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। আবার দেখ, রাজাজ্ঞায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, কারারুদ্ধ, সমাজ-বিতাড়িত পুরুষও জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে সুতরাং তাহার "আমি" তাহার নিকট তেমনই সুখের তেমনই আদরের। অন্যত্র আবার ভীষণ আত্মগ্লানি-দগ্ধ-হৃদয় পুরুষ আত্মহত্যা করিয়া সুখী হইতে প্রয়াস করে বলিয়া তাহার "আমি" তেমনই সুখের তেমনই গৌরবের। এইরূপ সর্ব্বত্রই আমিত্বের অবস্থা একপ্রকার অনুভব করিতেছি জানি না এ অনুভূতি বাস্তবিক কি না!

আবার যখনই আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র ধন জন ঐশ্বর্য্যের কোন একটী নষ্ট হইলে, হৃদয়ে কত গভীর আঘাত পাই সর্ব্বদা আমার আমার করিয়া ব্যতিব্যস্ত হই, তখনই মনে হয়, বুঝি এ জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রত্যেক অণুপরমাণু হইতে স্থূল অতি স্থূল পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, নদনদী, বন উপবন, ভূধর সাগর প্রভৃতি প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমের সহিত

আমার "আমিত্ব" অস্থি মজ্জায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত রহিয়াছে ; তাই এ জাগতিক সম্পর্কে ও বিচ্ছেদে আমার সুখ দুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে, বুঝি, আমার "আমি" এ জগতের বস্তু –ইহার সহিত আমার কখন বিচ্ছেদ হইতে পারে না—ইহাকে ত্যাগ করিয়া এই "আমি" এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না—এই সিদ্ধান্ত ধ্রুব সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া থাকি ; তাই বুঝি আমার আমার করিয়া এত পাগল হই।

আমি এই প্রকার আরও কত কি ভাবিতেছি সহসা দূরে উচ্চরোদনধ্বনি আমার চিন্তাস্রোত ফিরাইল, দেখিলাম কাহারা স্কন্ধে করিয়া কি একটা বস্তু লইয়া আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না, ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলাম একটী মনুষ্যদেহ বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে এবং কতকগুলি ব্যক্তি তাহা লইয়া আসিতেছে ও অপর কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ গগনভেদী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে শবের অনুগমন করিতেছে। এইরূপ শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিলাম এবং ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে এই অমঙ্গল দেখিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। অমনি কে যেন বলিয়া উঠিল—এই হতভাগ্যের এ জগতের সমস্ত সম্পর্ক শূন্য হইয়াছে, এখন ঐ দেহটার নাম শব ; উহার আর চেতনা হইবে না এবং আর কখনও উহার প্রিয় বস্তুগুলিকে আমার আমার বলিয়া পাগল হইবে না। লোকে সাধারণতঃ এই অবস্থাকে মৃত্যু কহে, বাস্তবিক কিন্তু ইহা দেহের সহিত জীবের জাগতিক সম্পর্ক ব্যবচ্ছেদক পরিবর্ত্তন মাত্র। তুমি বৃথা জগৎস্বামীকে নিন্দা করিতেছ। চেতন পদার্থ মাত্রই এই পরিবর্ত্তনের একান্ত অধীন।

এই কথাগুলি শ্রবণ করিবামাত্র চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলাম কিন্তু সূত্রাপি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলাম—আমি যে আমার আমিকে এজগতে অস্থি মজ্জায় দৃঢ়রূপে বিজড়িত অবিনশ্বর ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম তাহা ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতে লাগিল। দেখিলাম, যদি আমার "আমির" সহিত জগতের অপরিহার্য্য সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে এ জগৎ কৈ উহার আমিকে ধরিয়া রাখিতে পারিল! উহার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, স্ত্রী পুত্র, পিতা মাতা প্রভৃতি কেহই ত উহাকে রাখিতে পারিল না !! যে সকল বস্তুকে ঐ ঐ ব্যক্তি স্বীয় প্রাণসম প্রিয় ভাবিত ও যাহাদের সম্পর্ক হইতে মুহূর্ত্তমাত্র দূরে থাকিতে পারিত না তাহারা কৈ উহাকে রাখিতে পারিল!!! এখনও উহার প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু সকল পূর্ব্বমত রহিয়াছে, তবে উহার এইরূপ অবস্থা হইল কেন? তবে কি এ পার্থিব প্রিয়াপ্রিয়ের সংযোগ বিয়োগ আমার "আমিত্বের" স্থিতি বিনাশের হেতু নহে! তবে কি আমার এই সাধের পৃথিবী আমাকে চিরকাল রাখিতে পারিবে না !! তাহা হইলে আমার আমিত্বের পরিণাম কোথায়? এ রহস্য কি ভেদ হইবে না! এইরূপ চিন্তা করিতেছি তৎক্ষণাৎ সেই পূর্ব্বপরিচিত গম্ভীরধ্বনি হইল—তুমি যাহার বিনাশ কল্পনা করিয়া অধীর হইতেছ সেই তোমার আমি "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং।" চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং" আমি বুঝিলাম এই আমার আমি জন্মরহিত, সর্ব্বদা একরূপ ও ক্ষয়রহিত। কিন্তু তখনই পূর্ব্বোক্ত শবদেহের কথা মনে উদিত হইবামাত্র ভাবিলাম

এই আমার আমি নিত্য ও পুরাণ শুনিলাম তাহা হইলে উহার ঐ অবস্থা হইল কেন? অমনই গম্ভীরস্বরে আবার ধ্বনি হইল "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে, ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" প্রতিধ্বনি আমাকে বুঝাইল শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে ইনি হত হন না, ইনি কখনও জন্মেন না বা মৃত হন না।

এ আবার কি হইল, আমি কি পাগল হইলাম! আমার আমির রহস্য বিচিত্র! শরীরের সহিত আমি সংযুক্ত নহি? জাগতিক কোন পদার্থের সহিত আমার সম্পর্ক নাই, তবে ঐ শরীর এতদিন থাকিয়া নষ্ট হইল কেন? আবার ধ্বনিত হইল—"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী," তৎক্ষণাৎ চিন্তাস্রোত আমাকে বুঝাইল "মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকে তেমন আমার "আমি" এই অকর্মণ্য শরীরটা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মোপযোগী নূতন দেহ ধারণ করিয়া থাকে; তাহা হইলে দেখিতেছি আমি ও আমার দেহ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবাপন্ন। কিন্তু ঐ যে দেহটি ধূ ধূ জ্বলিয়া দেখিতে দেখিতে ভস্মে পরিণত হইল, আমার এত সাধের আমির পরিণতি ত এইরূপ দেখিতেছি! এ আবার কি হইল? অমনই সেই স্বর কোথা হইতে বলিয়া উঠিল—"অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়ং" এই কথা শ্রবণ মাত্র চমকিত হইয়া ইতস্ততঃ উত্তরকারীর বহু অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কুত্রাপি কাহারও দর্শন না পাইয়া হতাশ হৃদয়ে করযোড়ে ডাকিলাম—"কোথায় আছ হে আমার সন্দেহভঞ্জক? একবার এস, তোমাকে দর্শন করিয়া আমার চিত্তস্থির করিয়া লই, আমি ঘোর বিপদে পড়িয়াছি, সংসার-বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া পদে পদে আমার বিষম বিভ্রান্তি ঘটিতেছে। হে দয়াল, একবার দর্শনদানে কৃতার্থ কর। ভীষণ সন্দেহ দোলায় আমার মন বিচলিত হইতেছে দয়া করিয়া সত্বর আমাকে নিশ্চিন্ত কর" কাতরতাসহকারে বহুক্ষণ এইরূপ ডাকিবার পর আমার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবোদয় হইল, সহসা সম্মুখে এক দিব্য জ্যোতিঃ মূর্ত্তিমান হইয়া আমাকে বিস্মিত করিয়া কহিলেন—"ভয় নাই সখে, আমি আসিয়াছি। নিরন্তর আমি তোমার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেছি। আমাকে তুমি চিনিতে পারিতেছ না? একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, আমি তোমার চিরমিত্র, নাম বিবেক। আমাকে কেহ জ্ঞান, কেহ প্রজ্ঞা, কেহ বিদ্যা প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়া থাকে। যাহাহউক সখে, আমিই তোমার অন্তরে থাকিয়া তোমার অনন্ত জন্মের ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ নানাবিধ মিথ্যা সিদ্ধান্তের ভ্রম দেখাইতেছিলাম। সাধারণতঃ প্রাকৃত বা লৌকিক বুদ্ধিতে আমি দ্বাপরযুগাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের গীতায় অমৃতময় উক্তির প্রতিধ্বনি করিতেছিলাম; তুমি আমাকে চিনিতে না পারিয়া দৈতরূপে আমার অন্বেষণ করিতেছিলে সুতরাং পৃথকভাবে তোমাকে দর্শন না দিয়া থাকিতে পারিলাম না তোমার অভিলাষ পূর্ণ কর?"

তাঁহার এইরূপ অমৃতোপম কথা শ্রবণ করিয়া আমি ভয়ে, বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পূর্ণহৃদয় হইয়া বাক্‌শক্তিবিহীন মূকের ন্যায় তথায় উপবিষ্ট রহিলাম। ক্ষণকাল অতীত হইলে করযোড়ে কহিলাম "প্রভো, সখে, আপনার বাক্যে আমার একটী অদ্ভুত

কৌতূহল জন্মিয়াছে অগ্রে তাহা নিবৃত্ত করিয়া চরিতার্থ করুন। আপনি বলিয়াছেন, "আমি তোমার সহিত পৃথক্‌রূপে অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি কিন্তু তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না"—এ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?" আমার প্রশ্ন শ্রবণে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "সখে, তুমি যাহাকে "আমি" বলিতেছ এবং যাহা হইতে আমাকে ভিন্নজ্ঞানে "তুমি" বলিতেছ বাস্তবিক তোমার আমি ও আমার আমি এই উভয়ই এক, অদ্বিতীয় সর্ব্বব্যাপী বিরাট পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে কেন যে আমাকে চিনিতে ও আমার কথা শ্রবণ করিতে সর্ব্বদা সমর্থ হও না তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর—কাচের সাদিবদ্ধ গৃহে থাকিয়া তুমি বহিঃপ্রদেশে তোমার নিকটস্থ কোন ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলে সে যেমন তাহা শ্রবণ করিতে সমর্থ হয় না কিন্তু কাচ ভগ্ন হইলে যেমন অতি মৃদু আহ্বানও শুনিতে পায় সেই প্রকার আমি নিরন্তর তোমার অনন্তজন্মের অনন্তপ্রাপ্ত সংস্কারপরিপুষ্ট মায়াকাচবদ্ধ হৃদ্‌গুহায় বাস করিয়া নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে তোমাকে সৎপথে বিচরণ করিতে উপদেশ দিতেছি, কিন্তু উক্ত অন্তরায় জন্য তুমি আমার অতি নিকটে অবস্থান করিয়াও সে উপদেশ শ্রবণে সমর্থ হইতেছ না, সময় সময় যেমন মায়াকাচ ভগ্ন হইতেছে অমনই আমার স্বর তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। অন্য ইহা ব্যতীত কিছুই ঘটে নাই। এইরূপে তোমার সহিত আমার নিরন্তর অবস্থিতি। অবিচ্ছিন্নতার বিষয় পরে বলিব। এখন তোমার "আমি" এবং আমার "আমি" অভিন্ন কিরূপে বলিতেছি, তুমি যাহাকে "আমি" বলিতেছ সেই তোমার "আমি" আমি ভিন্ন আর কেহ নহে। যেমন দর্পণে প্রতিফলিত মূর্ত্তি সম্মুখস্থিত ব্যক্তি বা বস্তুর ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না সেইরূপ হৃদয় দর্পণে প্রতিবিম্বিত "আমি" ভিন্ন আর তোমার "আমি" বলিয়া একটা পৃথক্ পদার্থ নাই এই প্রতিফলিত আমিই তোমার আমি অর্থাৎ জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকি; ইহাকে প্রতিবিম্ববাদ কহে। যতকাল তুমি ও আমি এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকিবে ততকাল তুমি আমা হইতে ভিন্ন থাকিবে সুতরাং এই উপায়ে আমি তোমার সহিত নিরন্তর ভিন্নভাবে অবস্থান করিতেছি।"

আত্মবিস্মৃত হইয়া আমার "আমির" এইরূপ অদ্ভুত রহস্য শ্রবণ করিতে করিতে সহসা প্রশ্ন করিলাম কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই আমির যে পরিণাম দেখিলাম তাহা কি?" আমার এই কথা শুনিয়া দিব্যপুরুষ বলিলেন, "সখে, ইহা অতি সামান্য কথা। দর্পণনাশে যেমন প্রতিবিম্বের কিছুই ক্ষতি হয় না যাহা হইতে প্রতিবিম্ব আসিতেছিল সেই বিম্বেই বিলীন হয়; সেইরূপ এই মাংসবসাদিসঙ্কুল পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ ধ্বংসে তোমার "আমির" আত্মার বা আমার কিছুই ক্ষতি হইতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্যই "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়" ইত্যাদি বলিয়াছেন, এখন বুঝিলে ও দেহনাশ ব্যাপারটা জীর্ণবস্ত্রত্যাগ ব্যাপার ভিন্ন আর কিছুই নহে সুতরাং উহাতে তোমার আমির কিছুই অনিষ্ট হয় না। কোন কার্য্য করিবার কালে সর্ব্বদা তুমি হৃদয়মধ্যে দুইটী প্রবৃত্তির উপলব্ধি করিয়া থাক ইহাদের একটী তোমাকে সৎপথে গমন করিতে বলিয়া থাকে অপরটী তাহার প্রতিকূলাচরণ করিতে থাকে; মনে কর কোন একটী কার্য্য করিতে

ইচ্ছা করিলে তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে উক্ত কার্য্যটী অসৎ হইলে একটী প্রবৃত্তি তোমাকে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেয় ও অপর একটী অন্তরাল হইতে তাহাতে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া প্রবৃত্ত করে এইরূপ ব্যাপারের প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিটীকে বিবেক, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা যায় এবং দ্বিতীয়টীকে মন, বলা যাইতে পারে, মন ও বুদ্ধির পার্থক্য এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—

"মনো বিমর্ষরূপঃ স্যাদ্বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা"

(পঞ্চদশী)

মন মলিন এবং বুদ্ধি সদা নির্ম্মল অর্থাৎ নিশ্চয়তা, সত্যতা অবধারণে সমর্থ। এইরূপ মলিন ও চঞ্চল মনই নানাবিধ সংস্কারের আধার এবং ইহাই অনন্ত জন্মের সদসৎ সংস্কার পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্মজ ফলভোগ বাসনায় জীবের পুনঃ পুনঃ জননের কারণ হইয়া থাকে, সুতরাং কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অহঙ্কারের কর্ত্তা হয় বলিয়া প্রকৃত আমাকে বা আত্মাকে আপনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে। এইরূপ ভিন্নভাব বিশিষ্ট মনই তোমার পূর্ব্ব ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের "আমি।" তোমার এইরূপ আমির সহিত আমি অবিচ্ছিন্ন হইয়াও কিরূপে পৃথক্‌ভাবে বাস করিতেছি বলিলাম। এই ক্ষণবিধ্বংসী জড়দেহে সর্ব্বদা তোমার "আমিত্ব" অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হয় বলিয়া প্রকৃত আমিত্বের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হও না; সুতরাং আমাকে ভিন্ন না ভাবিয়া থাকিতে পার না।

তুমি অজ্ঞান, সুতরাং আমাকে ভিন্ন জ্ঞান করিতেছ। এখন বুঝিলে কি তোমার "আমি" ও আমি এক, দুই নহে। এইরূপ জীবজগতের "আমি" ও আমি এক, অভেদ। আমাকে ভালবাসিতে বিস্মৃত হইয়া ভ্রান্ত জীব আমার প্রতিবিম্বে আত্মজ্ঞান করিয়া এই জড়দেহটীতে আমিত্বের আরোপ করিয়া থাকে, সুতরাং ক্রমে ক্রমে এই পাঞ্চভৌতিক অতি স্থূল জড় জগতের অস্থি মজ্জায় পর্দ্দায় পর্দ্দায় এই "আমি" বিজড়িত থাকিতে চাহে। তাই আগন্তুক পরিবর্ত্তনে "আমি"ও পরিবর্ত্তিত জ্ঞান করিয়া থাকে। সুখ দুঃখ প্রভৃতি মিথ্যা সংস্কার মনকে বিচলিত করে বলিয়া তোমার অধিকারী "আমিকে" ভ্রমবশে হৃষ্ট ক্লিষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে।

প্রকৃত তোমার আমিকে জানিতে পারিলে কোন অবস্থা আর তোমাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না। এই তোমার "আমি" ও আমি যে এক, অদ্বিতীয়, অবিনাশী ও অনন্ত ইহা জানিতে হইলে মনকে বুদ্ধিতে পরিণত করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই অর্থাৎ বাহ্য বিষয়াদি উপভোগের বৃত্তিগুলি মনে সম্পূর্ণরূপে নিরোধ বা ধ্বংস করিয়া সদা নির্ম্মল বুদ্ধি পরিচালিত পথে বিচরণ করিলে তোমার "আমি"র স্বরূপ স্বতঃই প্রকাশিত হইবে। মনোবৃত্তি দমনের উপায় সকল শাস্ত্রে যোগ, নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতি নানা নামে কথিত হইয়া থাকে। তোমার যাহা ইচ্ছা একটী অবলম্বন করিতে পার। এইরূপ যোগাদির অভ্যাসদ্বারা মন সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইলে, আমাকে তোমা হইতে কখনও ভিন্ন জ্ঞান করিতে পারিবে না। এযাবৎ যাহা যাহা বলিয়া আসিলাম তৎসমুদয় দ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ যতকাল তুমি ও আমি এই পৃথক্ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল আমি তোমা হইতে অবিচ্ছিন্ন হইলেও তুমি আমাকে একরূপ জ্ঞান করিতে সমর্থ হইবে না। এই হেতু তোমাকে অবিচ্ছিন্ন অথচ পৃথক্‌ভাবে আমার অবস্থিতির কথা

বলিতেছিলাম। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপায়ে ভ্রান্ত দেহাত্মসংস্কার বিনষ্ট হইলে তোমার সাধের "আমি" সচ্চিদানন্দময় আমিতে অথবা পরমাত্মাতে পরিসমাপ্ত হইবে তখন তুমি অগ্নিস্থ লৌহপিণ্ডের মত দ্বৈতজ্ঞান বিশিষ্ট "সোঽহং" সেই আমি এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া আনন্দে অবস্থান করিতে থাকিবে। ক্রমে এক দীপশিখা হইতে অপর দীপশিখা তুল্য অতি দুর্লভ দ্বৈতজ্ঞান রহিত অভেদ সর্ব্ববেদ-বেদান্তসিদ্ধান্ত উৎকৃষ্টতম "ব্রহ্মাস্মি" শব্দের অধিকারী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানী বা জীবন্মুক্ত হইবে। তৎকালে তোমার "আমি" ও আমি সর্ব্বত্র একরূপে অবস্থান করিব এবং তোমার আমি জগতের সমস্ত সম্পর্কশূন্য অনন্ত শাশ্বত ও পূর্ণরূপে স্বতঃ সর্ব্বদা প্রতিভাত হইবে। তখন আমাকে আর পৃথক্ জ্ঞান করিতে পারিবে না এবং আমিও আর তোমার নিকট এইরূপে উপস্থিত হইতে পারিব না। এইরূপ অবস্থায় তোমার "আমি" ও আমি সদা অবিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন। এই তোমার আত্মবের আমি স্বরূপ সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম। যুক্তি ও শাস্ত্র সাহায্যে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর, মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হইলে আমাকে স্মরণমাত্র দেখিতে পাইবে।"

এইরূপ অলৌকিক ও অদ্ভুত "আমি রহস্য" শুনিতে শুনিতে আমার অবস্থান স্থান, শ্রোতব্য, বক্তা ও জগতের সমস্ত সম্পর্কশূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং মুখ হইতে আমার অজ্ঞাতসারে "সদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্" শব্দ উচ্চারিত হইল। উচ্চারণ মাত্র দেখিলাম সেই দিব্য জ্যোতিঃ সহসা সম্মুখস্থ সুনীল অনন্ত নভোমণ্ডলে যেন বিলীন হইলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সহনবানন পরিপূর্ণ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে "শিবোঽহং" শব্দের প্রতিধ্বনি আসিয়া এ হতভাগ্যের কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঊর্দ্ধমুখে স্থির দৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিলাম।

শ্রীবলরাম কবিরত্ন অলঙ্কবেদান্ত।

রাণী জয়মণি

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে ঊনবিংশশতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের সহিত নাটোর রাজবংশের ইতিহাস নিতান্ত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সম্রাট আরংজেবের পুত্র সম্রাট বাহাদুর সাহের নিকট নাটোর রাজবংশের স্থাপয়িতা কণজন্মা রাম-রাইয়া রঘুনন্দন রায়ের ভ্রাতা রামজীবন রায় "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। কমলা যাঁহার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করেন, নানারূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব উপায়ে তাঁহার সমৃদ্ধিলাভ হইতে থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহারাজ রামজীবন রায় ভাগলপুর হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অর্দ্ধ-স্বাধীন নরপতি হইলেন। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ ইতিহাসে "রাজসাহী রাজ্য" (Rajshaye territory) নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের আধুনিক জমীদারগণের শতকরা

প্রায় ৯৯ জন ও দক্ষিণবঙ্গেরও অনেক জমীদার এই সুবিস্তৃত নাটোর রাজ্যের ধ্বংস হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

মহারাজ রামজীবন রায়ের ঔরসজাত কোনও পুত্র ছিল না—তিনি রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন। এই রামকান্তের স্ত্রীই প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী। রামকান্তেরও ঔরসপুত্র ছিল না—তিনি সাধকশ্রেষ্ঠ মহারাজ রামকৃষ্ণকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র—বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। এই দুই ভ্রাতা হইতে নাটোর রাজবংশের বর্ত্তমান দুইটী শাখা উদ্ভূত হইয়াছে।

একদা মহারাজ কুমার বিশ্বনাথ নৌকাভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার নৌকাবাহিনী বড়ল নদী বাহিয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলার অন্তর্গত শিঁয়াইল গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল। এই স্থানে রাজকুমার অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী একটী বালিকাকে নদীর ঘাটে স্নান করিতে দেখিতে পাইলেন। বালিকার অপরূপ সৌন্দর্য্যচ্ছটায় যুবক বিশ্বনাথের মন বিমোহিত হইয়া গেল। নৌকা তীরে লাগাইয়া তিনি বালিকাটীর পরিচয় জানিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। লোক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংবাদ দিল যে, এই কন্যাটী তীরবর্ত্তী শিঁয়াইল গ্রাম নিবাসী বালীকৃষ্ণ মজুমদারের। রূপমুগ্ধ যুবরাজ তখনই নাটোরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতামহী রাণীভবানীর নিকট মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তদনুসারে বালীকৃষ্ণ মজুমদারের নিকট রাজধানী হইতে ঘটক প্রেরিত হইল। কিন্তু বালীকৃষ্ণ রাজঘটকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বালীকৃষ্ণ কাপ, নাটোরের রাজা শ্রোত্রীয়। কাপের কন্যা শ্রোত্রীয় ঘরে প্রদান করিলে কন্যাকর্ত্তাকে শ্রোত্রীয় হইতে হয়। ঘটক মহাশয় অনেক প্রলোভন দেখাইলেন—বলিলেন, তিনি নাটোর রাজ্যের যে কোন পরগণা ইচ্ছা করেন, পাইবেন। কিন্তু বালীকৃষ্ণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘটক মহাশয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু নাটোররাজকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে, তৎকালীন বঙ্গীয়-সমাজে এমন লোক ছিল না। বিশ্বনাথ এই বিবাহ না হইলে কিছুতেই ছাড়িবেন না। অবশেষে কৌশলক্রমে বালীকৃষ্ণকে নাটোর রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হইল ও নানারূপ প্রলোভন ও সঙ্গে সঙ্গে ভয় প্রদর্শনও চলিতে লাগিল। তখনও হিন্দুসমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সুলভ অর্থলালসা প্রবেশলাভ করে নাই—তখনও হিন্দুগণ ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধালাভের আশায় কাল্পনিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়া সহস্র বৎসরের কুলগৌরব বিসর্জ্জন দিতে শিখে নাই। বালীকৃষ্ণ যখন কিছুতেই বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তখন তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া বলে ও কৌশলে অভীষ্টসিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হইল। বালীকৃষ্ণ কারারুদ্ধ হইলেন ও তাঁহার কন্যা অরমণি নাটোরে নীত হইলেন এবং মহারাজ কুমার বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বালীকৃষ্ণ মুক্তি পাইলেন—কিন্তু মর্ম্ম-বেদনায় একেবারে মরিয়া গেলেন। এদিকে ভবিষ্যৎ "অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরের" শ্বশুর যাহাতে স্বীয় পদোচিত মর্য্যাদায় থাকিতে পারেন তজ্জন্য বিস্তীর্ণ জমীদারী ও অর্থগ্রহণের জন্য নানা-রূপ চেষ্টা হইতে লাগিল। বালীকৃষ্ণ ইহাতে নিরতিশয় ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দ্বারা কুলমর্য্যাদা নষ্ট হইল—আবার তিনি কন্যাদানের পরিবর্ত্তে অর্থগ্রহণ করিয়া স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণকে নিরয়গামী করিবেন এ চিন্তা তিনি ভাবিতেও পারিলেন না। অবশেষে

একদিন অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরের শ্বশুর রাজবাটী হইতে কৌশলক্রমে বহির্গত হইয়া নিজ বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বালীকৃষ্ণ আর কখনও নাটোরে পদার্পণ করেন নাই। রাণীভবানীর প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন নাই—তৎকালে বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুব কমই ছিল। কিন্তু অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরের শ্বশুর ও তাঁহার বংশধরগণ নাটোর রাজবংশ হইতে এক ছটাক জমিও গ্রহণ করেন নাই ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

মহারাজ বিশ্বনাথের জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী জয়মণি সর্ব্বাংশে পিতার মানসিক তেজের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। নাটোর বংশ চিরকালই শক্তি উপাসক ছিলেন। কৌলিক প্রথানুসারে মহারাজ বিশ্বনাথ ও মহারাণী জয়মণিও শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে বিশ্বনাথের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি শান্তিপুরের গোস্বামী প্রভুদের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবে চিরকালই বিরোধ। বিশ্বনাথ স্বীয় মহিষীগণকেও বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিতা হইতে আদেশ করিলেন। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া রাণী স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা মহিষী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর পৌত্রবধূ, বালীকৃষ্ণের কন্যা রাণী জয়মণি ঐহিক ভোগবিলাসের লালসায় স্বীয় ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। সবেমাত্র বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত বিশ্বনাথের শাক্তবিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। তিনি রাণী জয়মণিকে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। জয়মণিও পৈতৃক তেজে তেজস্বিনী ছিলেন। স্বীয় ধর্ম্মমত রক্ষার জন্য অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী জয়মণি সর্ব্ববিধ ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মমাত্র অবলম্বন করিয়া মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে দীন-জননী রাণীভবানীর আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন। রাণীভবানীও তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও নিজ কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অবশেষে মৃত্যুকালে তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি জয়মণিকে দান করিয়া যান। রাণী জয়মণি স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এক দত্তক গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট জীবন গঙ্গাতীর বহরমপুরে অতিবাহিত করেন। রাণী জয়মণির বংশধরগণ এখনও বহরমপুরে অবস্থান করিতেছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে জয়মণি সম্পূর্ণরূপে পিতার মানসিক বলের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। জয়মণির দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। বালীকৃষ্ণের বৃদ্ধাবস্থায় দুই পুত্রই পরলোক গমন করেন। ইতঃপূর্ব্বেই বালীকৃষ্ণের স্ত্রীও মারা গিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহা-হইতেই পিতৃপুরুষের পিণ্ডোদক ক্রিয়ার লোপ হইল এই চিন্তায় বৃদ্ধ বালীকৃষ্ণ সত্তর বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে কৃতসংকল্প হন। রাণী জয়মণি বিধবা ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া পিতার দ্বিতীয়বার বিবাহে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু বালীকৃষ্ণ সংকল্পচ্যুত হইবার লোক ছিলেন না :—তিনি কাহারও কোনও কথা গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এই ঘটনায় বালীকৃষ্ণের সহিত জয়মণির দারুণ মনান্তর উপস্থিত হয় এবং কথিত হয় যে অতঃপর পিতা-পুত্রীতে আর কখনও মুখ দেখা দেখি হয় নাই। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বালীকৃষ্ণের দুই পুত্র জন্মে এবং এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ উক্ত শিয়াইল গ্রামেই (হরিপুর পোঃ

পাবনা) অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

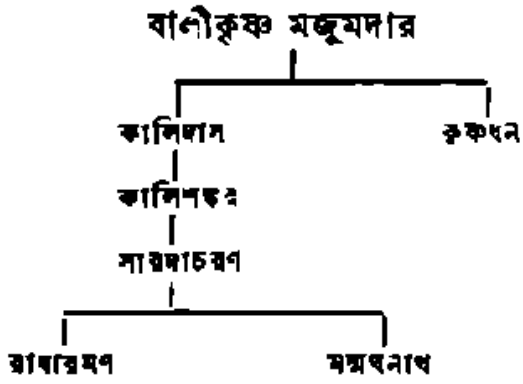

পিতার মৃত্যুর পরে রাণী অন্নমণি জন্মভূমি সিঁরাইল গ্রামে একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার দুই পাড়ে দুইটী "শিশু"গাছ রোপণ করান। এই "অন্নমণি সরোবর" ও শিশু গাছ দুইটী অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এতদিন সরোবরের জল অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নবনির্ম্মিত জেলাবোর্ডের সড়কে অন্নমণি সরোবরের জলগমনাগমনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় উহা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। রাণী অন্নমণির বংশধর ও যাঁহারা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করেন অবিলম্বে এই সরোবরের সংস্কারসাধন করিয়া অন্নমণির স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। *

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

পুণ্যক্ষেত্র ও কালীক্ষেত্র

১। বোকু মুসলমান

কত শত সাধকের কত যুগের সাধনা ফলে, আমাদের তীর্থস্থলগুলি দেশের এক একটা মিলনভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। এক এক বছরের কয়েকদিনব্যাপী কংগ্রেস্, কন্‌ফারেন্স, সম্মিলন প্রভৃতির অধিবেশন করাইতে, কত লোকের কত উদ্যম কত অর্থব্যয় হয়। এইভাবে হিসাব করিয়া দেখিলে আমাদের তীর্থস্থলগুলি কত জনের কত দিনের কত সাধনার ফল কতকটা উপলব্ধি করা যাইবে। ভগবতী আদ্যাশক্তি ও অন্যান্য দেবদেবী মহাপুরুষগণের নামের সহিত বিজড়িত আমাদের তীর্থস্থলগুলি, দেশের এক একটা যেন nerve centre বা স্নায়ুকেন্দ্র স্বরূপ। সমস্ত দেশবাসীর সহিত পরিচিত হইবার, সমস্ত দেশের অবস্থা জানিবার এবং সমস্ত দেশে সাড়া তুলিবার এমন উপায় বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

তা হইলে কি হয়? অস্ত্রের সদ্ব্যবহার না জানিলে, ইন্ধনস্তূপের মাঝে বসিয়া থাকিলেও ফল নাই। তীর্থস্থলগুলিকে এমন সব শক্তিকেন্দ্ররূপে পাইয়াও উহাদের সাহায্যে নানাবিধ সামাজিক কল্যাণসাধনে আমরা তাদৃশ চেষ্টা পাই না এবং চেষ্টা করিলেও হয় ত আশানুরূপ কৃতকার্য্য হই না, কারণ এখনকার দিনে আমাদের যা কর্ম্মশক্তি বা কৃতিত্ব তা আর বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। আমাদের যা কার্য্য হয়, তবের ঘাটে

* সিঁরাইল সারদাচরণ ফ্রি পাব্‌লিক লাইব্রেরী ও বিদ্যোৎসাহিনী সমিতির (হরিপুর পোঃ, পাবনা) মাসিক অধিবেশনে সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

তা যাচাই হয়ে অনেক দিন ঠিক হয়ে গেছে। এখন অন্যের হাতে যেচে উঠে কাজ করিবার ভার দিয়ে, বাকি সকলের, "আমরা সব চিরকেলে বনিয়াদি বড়লোক" ভাবিতে ভাবিতে ঘুমিয়ে পড়িতে চেষ্টা পাওয়াই আমাদের পাতে মিলে। সাধকের অভাব হলে শুধু তীর্থে করিবে কি? এ সেই চিরকেলে পুরাণ কথা—দেশ কাল পাত্রের শুভসংযোগ বিনা শুভফলের প্রত্যাশা বৃথা।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কালীক্ষেত্র আমাদের দেশের এক মহাপীঠ বা মহাতীর্থ। তাহা হইলে কি হয়, গেঁয়ো যোগীর ভিখ্ মিলে না এবং দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। কালীঘাটের সীমানা মধ্যে বাস করিলেও, মায়ের মন্দিরে অবস্থিতি সৌভাগ্য বড় বেশী দিন, বা বেশীক্ষণ ঘটিয়া উঠে না। তথাপি মাঝে মাঝে দু একদিন কিছুক্ষণের তরেও ঐরূপ গমন করিলে, মহাদেবীর কৃপায় সময় সময় অনেক food for thought বা চিন্তা করিবার উপযুক্ত বিষয় পেয়ে তৃপ্ত হওয়া যায়। উহারই দু একটি নমুনা দিবার জন্য অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

একদিন সন্ধ্যার পর মায়ের মন্দিরে আরতি হইয়া গিয়াছে; নাটমন্দির দেখি তখনও লোকপূর্ণ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের প্রসিদ্ধ চণ্ডীর গান হচ্ছে, সকলে তন্ময় হ'য়ে শুন্‌ছে। কালীঘাটে মাঝে মাঝে এমন ঘটিয়া থাকে। কোন দিন বা কোন যাত্রার অধিকারী এসে, দলের সাফল্য কামনা করে, মায়ের সম্মুখে সকলকে নিজ ব্যয়ে যাত্রা শুনিয়ে যান; কখন বা কোন ভাল কথক এসে, নিয়মিতভাবে কিছুদিন সকলকে হরিকথা শুনাইয়া যেন ও শ্রোতৃবর্গের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থাদি পেয়েই তুষ্ট হন। এইরূপ কোন দিন রামায়ণ গান, কোন দিন কীর্ত্তন, কোনদিন বা পল্লীর উচ্চ খচমচ ধ্বনি সহকারে হিন্দুস্থানী ভজন, কখন বা বহুজনে মিলিত হয়ে স্বাহা স্বাহা মন্ত্রে বিরাট্ হোম, কাহারও বা অন্নপ্রাশন উপনয়নাদি উপলক্ষে ইংরাজি বাজনা, ব্যাগ্‌পাইপ্ সহযোগে প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যভাণ্ড, কোন দিন বা কোন ধনীভক্ত বা নির্লোভ পালাদার কর্ত্তৃক চারিদিকে দীয়তাং ভুজ্যতাং শব্দের মাঝে খিচুড়ি, দৈ, মুড়কি অথবা লুচি মিঠাই প্রভৃতি দিয়ে একটু অসাধারণভাবে কাঙ্গালী ভোজন, কোন দিন বা ফটো তুলিবার যন্ত্র লয়ে কোন সাহেবের শুভাগমন অথবা কোন রাজা রাণী প্রভৃতির আগমন উপলক্ষে একটা হৈ চৈ ব্যাপার, এতদ্ব্যতীত পূজা পার্ব্বণাদি শুভদিনে একটু বিশেষরূপ সমারোহ বা অসাধারণ গোছের যাত্রী সমাগম প্রভৃতি একটা না হয় আর একটা উপভোগ্য ব্যাপার যেন লাগিয়াই আছে। এদিন যিনি গাহিতেছিলেন, শুনিলাম তিনি এই চণ্ডীর গান গাহিয়াই আজ দেশপ্রসিদ্ধ। কবিকঙ্কণের বর্ণনীয় বিষয় নব্যদলের নিকট এখনও একটা প্রহেলিকাস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় নাই। ছাপাখানার প্রসাদে অনেকেই সম্ভবতঃ উহা অবগত আছেন। ইহাদিগকে বোধ করি আজ খোলসা করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য ও মার্কণ্ডের চণ্ডী একই পুস্তক নহে। মার্কণ্ডের চণ্ডীখানি শাস্ত্রগ্রন্থরূপে পঠিত ও পূজিত কিন্তু চণ্ডীকাব্যে কবি তাঁহার কল্পিত মনোমত ভাবে মহাদেবীর লীলারহস্য বুঝাইতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবি কল্পনায় দেখিতেছেন জগতে নিজ মহিমা প্রচার জন্য মহাদেবীর মনে বাসনা জন্মিয়াছে। "উচ্চৈর্নীচং নীচমুচ্চৈশ্চ

কর্তুম্"—উচ্চকে অবনত এবং নীচকে উন্নত করিতে যিনি সমর্থ তিনি আজ ধরাধামে আগমন করেছেন। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনরূপ বিশেষ উদ্দেশ্য হৃদয়ে লয়ে, সুদীর্ঘকালে যুগান্তর সাধক কোন এক অবতার রূপেই শুধু তিনি অবতীর্ণা হন না। আমাদের প্রাণপণ যত্নের আবাহন উদ্বোধনে, ভক্তের কাতর আহ্বানে, অনেক সময় তাঁর অকাল বোধন ও আমাদের মাঝে আগমন হয়। শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্যের কাতর আহ্বান এক সময় এইরূপ সফল হয়েছিল। শ্রীনিত্যানন্দ সহচর শ্রীগৌরাঙ্গকে পেয়ে, দেশবাসী এক সময় এইরূপ প্রাণের জ্বালা জুড়িয়েছিল এবং এখনও নিত্য অসংখ্য ভক্তবৃন্দ মহাদেবীর বরপুত্র মহাজনগণকে প্রাপ্ত হয়ে, তাঁহাকে নিত্য পূজা ও নিত্য প্রত্যক্ষ করিবার সাধ মিটায়। এই ভাবেরই ভাবুক হয়ে, কুম্ভমেলার সেই মহাপুরুষ, জগৎ রামময় দেখিতেন এবং সকলকেই "আরে মেরা রাম" বলিয়া সাদর আরতি করিতে অগ্রসর হইতেন (শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ প্রণীত "কুম্ভমেলা" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)। অনেক সময় আবার আমাদের উদ্যোগ আয়োজনের অপেক্ষা না রেখে, শুধু নিজ কৃপা হতেই মাঝে মাঝে নিজ মহিমা প্রচার জন্য মহাদেবীর সাধ জাগে, ও ইচ্ছাময়ী সেই সময় আমাদের মাঝে এসে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস এক সময়ে কি এই আকারে বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল! মঙ্গলকাব্যরচয়িতৃগণের লেখা হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাই। এগুলি আধুনিক ইতিহাসের ন্যায় সত্য ঘটনা সমূহের যথাযথ বিবৃতিরূপে বিবেচিত না হইয়া, কতকটা কাব্য কতকটা বা পুরাণস্থলীতেপে পরিগণিত ও ঐভাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত। ফুল্লরা কালকেতু বা মাণিক পীর সত্যনারায়ণ কথার নায়ক নায়িকাগুলা কল্পিত হউক বা না হউক উহাদের বর্ণনীয় লীলাসমূহ মোটের উপর সত্য, কারণ ঈশ্বর কোন এক যুগে কতকগুলি লীলা করিয়া পেন্সন লইয়া বসিয়া নাই; দেখিতে শিখিলে, আমাদের মাঝে তাঁহার সত্তা সদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে," প্রভৃতি ধারণের কত লীলা এখনও কি নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে না? যাহাদের দেখিবার সে চোখ আছে, তাহারা এখনও ঐ সব দেখিতে পায়। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক ও অনুষ্ঠানাদি ঘটিত বিবাদের মীমাংসা, উপাস্যের লীলা রসভোগ প্রভৃতিই লেখক ও পাঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য—কষ্টিপাথরে ঘষিয়া বর্ণনীয় বিষয়ের সত্য মিথ্যা নিরূপণ উদ্দেশ্য ছিল না। পুরাণ সকল সে হিসাবে কোন কালেই শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হয় নাই। ফলতঃ উপাস্যকে নিত্য, অন্ততঃ মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষ ও পূজা করিয়া চরিতার্থ হওয়া যায়, দেশবাসীর হৃদগত এই ভাবটিকে কবি তাঁহার চণ্ডীকাব্যে আকার দান করিয়াছেন এবং গায়কও অতি নিপুণভাবে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় অনুরূপ ভাবরসে সিঞ্চিত ও মুকরিত করিয়া তুলিতেছিলেন। দরিদ্র কালকেতুর দারিদ্র্যমুক্তি এ দিনকার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। ক্ষুধাক্লিষ্ট ব্যাধ কালকেতু আর কিছু না পেয়ে, বন থেকে এক গোধিকা বেঁধে এনেছে। কালকেতু জানে না, ভগবতী নিজেই ঐ স্বর্ণগোধিকা মূর্ত্তি ধরে স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়েছেন। কালকেতু ক্ষণতরে স্থানান্তরে গিয়াছে, ভগবতীও ইত্যবসরে সুন্দরী রমণীমূর্ত্তি ধরে ঘর আলো করে বসে আছেন

—একবার পরীক্ষা লয়ে সকলকে দেখাবেন, নীচকুলে জন্ম হলেও কালকেতুর ভিতরে কতটা সার পদার্থ আছে। দরিদ্রের সতী নারী ফুল্লরাই প্রথমে বাহিরে এসে তাঁর দর্শন লাভ করিল ও এইরূপে সতী পত্নী মাত্রেরই যেন মর্য্যাদা বাড়াইল। সে রূপরাশি দর্শন করে এবং কালকেতু তাঁহাকে আনিয়াছে ও অতঃপর কালকেতুর সহিত অবস্থানেই তিনি কৃতসংকল্প শুনে, ফুল্লরা মনে মনে প্রমাদ গণিল। তাহার ক্লেশময় দরিদ্র জীবনে পতির একনিষ্ঠ প্রেমই যে তাহার সমস্ত সুখ নিদান ছিল, অতঃপর তাহাও বুঝি হারাইতে হয়। রমণীকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায় ফুল্লরা কত চেষ্টা পাইল, অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তাহাদের ভীষণ দারিদ্র্যক্লেশ বর্ণন করিল, রমণী কিন্তু নিবৃত্তা হইবার নহে। ভগবতী যখন দয়া করেন তখন এইরূপ খেদাইয়া দিলেও যান না। নিরুপায় হয়ে ফুল্লরা অবশেষে পতিকে ধরিয়া পড়িল, প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে, পর নারীর উপর অনুরাগ অপরাধে কালকেতুকে অনেক রূঢ় কথা, শুনাইল; প্রকৃত পতিহিতৈষিণী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় পতির ধর্ম্মরক্ষা জন্য অনেক অনুনয় বিনয় ধর্ম্মোপদেশাদি প্রদান করিল, শেষে নরম গরম ব্যবস্থাটাই সমীচীন বিবেচনা করিয়া পরস্ত্রী হরণজন্য রাজদণ্ডের ভয় দেখাইতেও বিরতা হইল না। পত্নীর ব্যবহারে হতবুদ্ধি কালকেতু ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বাহিরে আসিয়া রমণীকে দেখিল, কিন্তু ব্যাধকুলে জন্ম হলেও শাপভ্রষ্ট ইন্দ্রপুত্র কালকেতু, জিতেন্দ্রিয়তা বিষয়ে আমাদের সকলের আদর্শ। দিব্য মোহিনী-মূর্ত্তি অবধি তাহার মন টলাইতে পারিল না। হীনবংশে জন্ম যাদের, তাদের উত্থানের উপায় কি, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক পথ নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন অর্থ, কেহ বলেন বিদ্যা, কেহ বলেন পৌরুষ—"সুতো বা সুত পুত্রো বা যে বা সো বা ভবামাহং দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তস্তু পৌরুষম্"। আমাদের দেশেরই কোন প্রাচীন কবি হীনবংশে জন্ম জ্ঞানে অনাদৃত কর্ণের মুখ দিয়া জন্মপর হীনতা পরিহারক ঐ উক্তিটি বাহির করিয়াছেন। কাহারও মতে ভক্তিই এসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ পথ—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ"—"মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে"। আমরা দেখিলাম জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজিতে চরিত্র বিভূষিত করাও জন্মপর-হীনতা নাশের একটা শ্রেষ্ঠ সদুপায়। মাতৃ-ভক্ত ও মাতৃভাবে পর নারী দর্শনে অভ্যস্ত হইলে জিতেন্দ্রিয়তার অগ্নিপরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কালকেতুও তাহাই হইল।

কালকেতু জগন্মাতাকে যতই যাইতে বলে, তিনিও স্নেহপূর্ণ ভাষায় ততই সহাস্যে উত্তর দেন, রহিবার জন্যই তিনি আসিয়াছেন, যাইবেন না। উপায়ান্তরাভাবে কালকেতু অবশেষে রমণীকে হস্ত দিবার জন্য সূর্য্যসাক্ষী করিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। কালকেতুর একার্য্যটা বিরুদ্ধভাবে সমালোচিত হইতে পারে সত্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, কালকেতুকে অজ্ঞাতসারে অসুরনাশিনীর বিরুদ্ধে ঐ ভাবে দাঁড় করাইয়া, কবি অজ্ঞভাবে তাঁহার কাব্যের রস রক্ষাও করিয়াছেন। তা ছাড়া কালকেতু স্ত্রীহত্যার ভয় দেখাইয়াছিলেন মাত্র—সত্য সত্য কি করিতেন কে জানে?

যাহা হউক কালকেতুর পরীক্ষা এই

খানেই শেষ হইল। জননী তাঁহার উপযুক্ত সন্তানের নিকট আজ অধিকক্ষণ আত্ম-গোপন করিতে পারিলেন না। এ যেন পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব কথিত সেই সন্দেশের তমঃ বা তাকাতে পূজা। জননী কাল-কেতুকে সাতঘড়া ধনের সন্ধান বলিয়া দিলেন। কালকেতুর এখন নিতান্ত সরল ভাব—মায়ের কোলে এলে, সন্তান এমনই নিঃসঙ্কোচ বোধ করে। দয়া স্নেহ প্রেম প্রভৃতির নিকট গুণদোষ বিচারের অবসর নাই; ভক্তিভাবের সাধক তাই উপাস্যকে ভয় করিতে জানে না। কালকেতুও তাই দেবীকে এক ঘড়া ধন বহিয়া আনিতে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইল না। দেবীর এমনই বিচিত্র দয়া, যে কালকেতু যখন সন্ধিধান হইয়া মাঝে মাঝে পিছনে চাহিয়া দেখিতে-ছিল ধনের ঘড়া লয়ে দেবী সরিয়া পড়িলেন কি না, সে সন্দেহ দেখেও তিনি তৎপ্রতি রুষিতা হইলেন না।

প্রাচীন কবির এই নানা ভাবে কবিত্বপূর্ণ অথচ সরল সহজ বর্ণনা গায়কের গুণে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিশেষভাবে স্পর্শ করিল। এই দিনের মত এই খানেই পালা শেষ হইলে চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। অনন্তর অধিকাংশ ব্যক্তিই একে একে চলে গেলেন কিন্তু দু চারিজন তখনও উপস্থিত থাকিয়া ঐ প্রসঙ্গেই নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। আলোচনাটা হৃদয়গ্রাহী বোধ হওয়ায় আমিও রহিয়া গেলাম ও উহার ফলে যথেষ্ট পুরস্কৃতও হইলাম।

আলোচনাটা প্রধানতঃ একাল ও সেকাল সম্বন্ধে হইতেছিল। একালের লোকগুলা ক্রমশঃ যেন ভাবহীন শুষ্কহৃদয় হয়ে পড়ছে; আমরা আমাদের ভাবপ্রবণ প্রকৃতিটা দিন দিন যেন হারিয়ে ফেল্‌ছি, ফলে কোন বিষয়েই আর অন্তরের সহিত মাতিতে পারি না। হৃদয়ই নাই হৃদয় দিয়ে কর্ম্মরত হইব কি প্রকারে? একালের তুলনায় সেকালের লোকগুলা বহুগুণে সরস ও আনন্দপূর্ণ ছিল। শুষ্ক জ্ঞান-চর্চ্চার বিষময় ফল থেকে রক্ষা করিবার জন্যই চৈতন্যদেব হয় ত দেশে প্রাণ সঞ্চারে চেষ্টা পেয়েছিলেন এবং তাঁহাকে ভালরূপে বুঝিতে না পেরেই হয় ত আমরা মনে করি ভক্তিমার্গটা জ্ঞানমার্গের বিরোধী। একালের লোকগুলা যদি সেকালের মত হইতে পারে, তবে অনেক বিষয়ে অনেক অধিক সুখী হয়।

অতীত ও বর্ত্তমান পরস্পরের নিকট বহু পরিমাণে অপরিচিত ও সেই হেতু পরস্পরকে অনেক সময় অবজ্ঞার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। সে কালের লোকের মুখে, এ কালের লোক-দের নিন্দা শুনিলে সেইজন্য তাহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার কিছু নাই কিন্তু তাই বলিয়া ঐরূপ নিন্দা এক্ষেত্রে ভিত্তিহীন মনে হয় কি?

একপার্শ্বে বসে কে একজন গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরায় সকলের মন সেই দিকে গেল। চাহিয়া দেখি, বিলম্বিত শ্মশ্রু, পক্বকেশ এক-জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সে কালের কথায় হয় ত অতীত কি সুখস্মৃতি মনে উঠায়, কি এক স্বপ্নে যেন বিভোর হয়ে, আপন মনে গান ধরেছেন। সকলের মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়েছেন দেখে, একটু যেন উল্লসিত হয়ে, আরও একটু স্পষ্ট করে গানটি আমাদিগকে শুনাইলেন। যতদূর স্মরণ হয় উহার ভাষা ও ভাব এইরূপ।

"আয় চলে ভাই, ভার লয়ে যাই,
আজি রাম রাজা হবে।
গরীবের ভার, রাম বিনা আর,
এ সংসারে কেবা লবে।

পাপেতে হয়েছে ভারী, আর ত এ ভার
সহিতে নারি,
শুনেছি সে ভূভারহারী, ভার হলেও ভার
নিতে হবে।
চরণে লইব শরণ, বিনয় করে বলব বচন,
এবার ভার বহালে যেমন, আর যেন ভার
না বহি ভবে।"

আমাদিগকে আনন্দিত দেখে, গায়কও আনন্দিত বোধ করিলেন এবং এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন ফলে আমাদিগকে যে কথা শুনাইলেন, আজিকার দিনে তাহা এক বিচিত্র ব্যাপার অথচ সেকালের সামাজিক অবস্থারও এক উৎকৃষ্ট নিদর্শক। বৃদ্ধ যাহা বলিলেন তাহার ভাব এই :—

খুব অধিক দিনের কথা নহে, যে সময়ে গোবিন্দ অধিকারী, বদন অধিকারী, প্রভৃতি যাত্রাদলপতিগণের কীর্ত্তিকথা বঙ্গদেশে এবং বঙ্গের বাহিরেও বিস্তৃত হইতেছিল ইহা সেই সময়ের কথা। এই সময়ে আর একজন যাত্রার অধিকারী বেশ নাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নাম আজকাল অনেকেই জানেন না। এই অধিকারীটির নাম "বকু" মুসলমান। "বোকু" জাতিতে মুসলমান হইলে কি হয়, তাঁহার রাম বনবাস গীতাভিনয় শ্রবণে লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইত। নন্দবাবা (বৃদ্ধটির নাম) বাল্যবয়সে এই দলের একজন ছোক্‌রা ছিলেন। উদ্ধৃত গীতটি বোকুর দলের গানের একটা নমুনা। রাম রাজা হবেন, প্রজারা সকলে কে কিরূপ ভেট বা নজর লয়ে যাবে আলোচনা করছে। 'ভার' শব্দটি প্রথমে এই নজর বা ভেট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; "ভার" শব্দের আর একটি প্রচলিত অর্থ হচ্ছে বহনীয় দ্রব্যরাজি। ইহা হইতে ভারী বা ক্লেশের ভাবটা আপনিই মনে আসে। সুকবি যাত্রার অধিকারী মহাশয় ঐ ভারী শব্দ হইতে পাপের বিষম ভার এবং সেই ভার হইতে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। শেষ লাইনটিতে দার্শনিক ভাব সুস্পষ্ট; যে ভাবিতে পারে, এসংসারে সে কোন কাজেরই কর্ত্তা নহে, শুধু ভারবাহী মাত্র, তাহারই "আর যেন ভার না বহি ভবে" বলে প্রার্থনা করিবার অধিকার জন্মেছে। সে কালের অনেকে এইরূপ নানাভাব মিশাইয়া বাক্য রচনা পছন্দ করিতেন ও এইভাবে গান বাঁধায় বোকুর দলেরও খুব নামডাক হয়েছিল।

একদিন হিন্দুপ্রধান নবদ্বীপ হইতে গাহিবার জন্য "বাহানা" বা নিমন্ত্রণ আসিল। সমস্ত ঠিক ঠাক, ডাঙলে বা নৌকা করিয়া প্রায় পঞ্চাশ জন লোক লইয়া বোকু মুসলমানের দল নবদ্বীপের বাজারে আসিয়া নৌকা বাঁধিল। এইখানে কিন্তু পরম্পরায় শ্রুত হওয়া গেল, যাঁহাদের উদ্যোগে যাত্রা হইবার কথা, তাঁহাদের অনেকেই মুসলমানের মুখে হিন্দু যাত্রা শুনিতে গুরুতর আপত্তি তুলিয়াছেন। কে কবে ভূতের মুখে রাম নাম শুনিয়াছেন? উহা হয়ও না এবং মানায়ও না; রাম নাম যদি শুনিতে হয় তবে ভূতের মুখে কেন? ইত্যাদি। বোকু সংবাদ শুনিয়া আর তথায় গেলেন না। দলের লোককে ডাকিয়া বলিলেন "বাবারা এভাবে ফিরিয়া গেলে আমার বড় অপমান হইবে। (তখনকার দিনে বোধ হয় ড্যামেজ বা ক্ষতিপূরণ জন্য মোকদ্দমার কথা কেহ জানিত না।) যদি একদিনের জন্য খাওয়া খাওয়ার কষ্ট কিছু সহিতে পার, তাহা হইলে একবার ইহার প্রতিশোধ দিয়া যাই।" দলের কেহ কেহ এজন্য আর চেষ্টা করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র

মনে করিলেন, কিন্তু শেষে অধিকারী ও তাঁহার মতানুবর্ত্তী দলেরই জয় হইল। স্থির হইল, আধমণ আন্দাজ দুধের যোগাড় করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ কয় জনার চলিয়া যাইবে। বাজারে দুধ দুষ্প্রাপ্য হইল না।

অপমানের প্রতিশোধ দিবার অভিপ্রায়ে ঐ বাজারেই অযাচিতভাবে যাত্রা শুনাইয়া যাওয়া স্থির হইল। বোকু আড়ম্বরাদি করিতে একেবারেই নিষেধ করিলেন। কতকগুলা খুঁটির উপর কলসি বাঁধিয়া এবং তাহাতে মাষকলাই দিয়া আলোর বন্দোবস্ত হইল। এই সামান্য সজ্জামাত্রে, ভোর বেলায় বোকুর যাত্রা আরম্ভ হইল। যত বেলা হইতে থাকিল, ক্রমেই লোক বাড়িতে লাগিল। একবার যে শুনিতে বসে, আর সে উঠে না। কেহ গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, স্নানের কথা ভুলিয়া মুগ্ধ মনে যাত্রা শুনিতে লাগিলেন। কেহ "বিদায়" লইয়া আসিতেছিলেন, যাত্রা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বিদায়ের টাকা ও তৈজস অবধি "পালা" বা পুরস্কারস্বরূপ দান করিয়া ফেলিলেন। এমনও হইল, দু এক জন উত্তরীয় পরিধান করিয়া, উচ্চতর মূল্যের পরিধেয় বস্ত্রখানি অবধি দান করিয়া বসিলেন। এইরূপে শ্রোতৃবর্গকে আপনহারা করিয়া বেলা প্রায় দুইটার সময় যাত্রা ভাঙ্গিল। গণনায় দেখা গেল, ঐ ভাবের অযাচিত দানে প্রায় নয়শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, আর থালা, ঘড়া, প্রভৃতি তৈজস ও বস্ত্রাদির ত পাহাড় জমিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। আনন্দিত চিত্ত বোকু টাকাগুলি রাখিয়া তৈজস ও বস্ত্রাদি সমস্তই বিলাইয়া দিতে বলিলেন। এইরূপে তাঁহার প্রতিশোধ স্পৃহার সুসমাপ্তি হইল।

অতঃপর যে হইল শুধু কি বোকুর গুণে? তখনকার সমাজ এখনকার তুলনায় ভাবগ্রাহী ছিল; কোন বিষয় অন্তরে অনুভব করিয়া সেই বলে পরিচালিত হইত। এখনকার দিনে আমরা প্রায় কোন বিষয়েই আকৃষ্ট হই না, আমরা চাই কি তাহাই জানি না, বৃথা ক্ষণস্থায়ী প্রাণহীন হুজুকে প্রমত্ত হই। আমাদের এখন প্রয়োজন, দেশবাসীর হৃদয় আবার জাগাইয়া দেওয়া, তাহাতে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা এবং শক্তিশালী দেশহিতৈষিগণের কর্ত্তব্য হইতেছে সর্ব্বতোভাবে ঐ সব আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা সাধনের উপায়-বিধান করা। নতুবা সর্ব্ববিষয়ে দেশের এই নির্জ্জীব ভাব দিন দিন বাড়িয়াই যাইবে।

গৃহে প্রত্যাগমন কালে আরও কত কথা মনে উঠিতে লাগিল! বোকু মুসলমান হয়েও রামচরিতে মজিয়াছিলেন; রাধাকৃষ্ণ বিষয়েও এইরূপ অনেক মুসলমান কবির নাম পাওয়া যায়; আন্টুনি ফিরিঙ্গি সুকবি বলে দেশ-প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এবং আমাদের দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাসূচক গানও বেঁধেছিলেন। স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও তখন পরধর্ম্মীসহ কেমন সুন্দর সরল মেশামিশি হইত। পরধর্ম্মীসহ মিশিতে হইলে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, যোনি বিচার, অন্ন বিচার প্রভৃতি উঠাইতে হইবে এমন কেহ ভাবিত না। এখনই বা নব্য দলের কেহ কেহ ঐরূপ একাকার প্রবর্ত্তনে চেষ্টা পাইয়া অনেকের সন্দেহ ও ভীতির কারণ হন কেন? যে সুন্দর সাহিত্যচর্চ্চা প্রভাবে দেশে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে এমন অদ্ভুতভাবে মিলন সংঘটিত হইতেছিল এখনই বা তাহা হয় না কেন?

এই যে কেন, ইহার উত্তর ভাবিতে গেলে অবসাদে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। যিনি "কর্ত্তা,

কারয়িত্রী এবং কর্ম্মহেতু স্বরূপা" তাঁর কৃপা হলে, দেশ কাল পাত্রের শুভ সংযোগ ঘটিবে এবং তখন আর এই কাতরতার কারণও অপনীত হবে। হায়, কি সেই সাধনা, যাহার বলে তাঁর এই কৃপা উদ্রেকে সমর্থ হওয়া যায়!

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

ইষ্টপূজা

আমার মন কেন আজি এত চঞ্চল হইল? বহুদিন বিস্মৃতির পর, আজ মনে করিলাম একটু ইষ্টারাধনা করিব। সংসারের শত সহস্র প্রলোভনে নিমজ্জিত হইয়া, এক প্রকার বেশ ভুলিয়াছিলাম, সহসা অন্তরের অন্তরতম দেশ হইতে এ কি হাহাকার উত্থিত হইয়া প্রাণ চঞ্চল করিয়া তুলিল? এ কি হইল? কে যেন ভিতর হইতে হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঘাত করিতেছে—থাকিতে পারিতেছি না। তাই মনে হইল আজ ইষ্টপূজা করিব।

মহামায়ার আবরণে জ্ঞানচক্ষু আবৃত জীব ভুলিয়াও ভগবানের নাম করে না। কেবল অপরার শাসনে পরা হইতে ক্রমাগত দূরে প্রয়াণ করিতেছে। কে উদ্বোধিত করিবে? কাহার প্রেমময় আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া জীব আবার প্রিয়তমের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবে? কে সে? সেই পতিতপাবন দীনজনবন্ধু কোথায়? আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া যাই বলিয়া, দয়াময় সময়ে সময়ে বিপদরূপ আঘাত আমাদিগকে দেন। সম্পদের সময় ত তাঁহাকে মনে পড়ে না—তাই দয়া করিয়া বিপদ চাপাইয়া দেন। আমরা তাঁহাকে ভুলিলে তিনি ত ভুলেন না, জীব তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলে তিনি ত ছাড়েন না। কে এমন কৃপাময়?

সন্তান শত সহস্র অপরাধ করিলেও, মাতা কখনও তাহার অমঙ্গল কামনা করেন না। মধ্যপ সন্তান বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলেও বাটী ফিরিল না। মা সেই দুর্ব্বৃত্ত সন্তানের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন, কতক্ষণে সে ফিরিবে, আহার করিয়া তৃপ্ত হইবে। তবে মা আহার করিবেন। সন্তান হয় ত নেশার উন্মত্ততায় দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই স্নেহময়ী জননীকে প্রহার করিল। নয়নাশ্রু নয়নে মারিয়া মা তাহাকে আহার করিতে বসাইলেন। এ নিঃস্বার্থ ভালবাসা কোথা হইতে আইসে? এই রক্তমাংসবসা সংযুক্ত মলবাহী স্নেহের মধ্যে এত দেবত্ব কোথায় ছিল? সন্তানের শত অত্যাচারেও মাতার হৃদয় কঠিন হয় না। সন্তানের উপর মাতৃস্নেহ অগাধ অপরিমেয়। কাহার স্নেহের কণা লইয়া এই মাতৃস্নেহ? যে বিন্দু হইতে এ অপূর্ব উৎপত্তি, তাহা কি? কে বুঝাইবে? দুর্ব্বলচিত্ত, সংসারের কীট, কাম কাঞ্চনের ক্রীতদাস, বুঝাইলেই বা কিরূপে বুঝিব?

রোগী যেরূপ সুপথ্য পরিত্যাগ করিয়া, স্বাদু কুপথ্যেই অনুরক্ত হয়, সেইরূপ সার নিত্য পদার্থ ত্যাগ করিয়া জীব অসার অনিত্যে মগ্ন হইয়া, দয়াময় হরির নিকট হইতে বহুদূরে পড়িতেছে, কিন্তু দয়াময় জীব কোমল অঙ্ক অহরহ পাতিয়া বসিয়া আছেন। পাপী, তাপী, সাধু অসাধু যে একবার যাইবে,

আর ফিরিবে না, সে শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইবে।

আমরা চাহিনা। ভ্রমান্ধ মায়িক জীব আমরা পাইলেও চাহিনা। শিশু যেমন অমূল্য রত্নের অপেক্ষা আপনার মিষ্ট আহার্য্য অধিক বুঝে, ক্ষুদ্র জীব আমরাও সেইরূপ প্রকৃত সুখ ত্যাগ করিয়া মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া অশেষবিধ কষ্ট পাই। কে বুঝাইবে, তাই ভগবান গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ে বলিয়াছেন

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।"

"ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান যখনই যখনই হয়, তখনই আমি আত্মমায়া দ্বারা আত্মসৃষ্টি করি" এইরূপে

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

সাধুগণের উদ্ধারের জন্য ও দুষ্কৃতকারীগণের বিনাশের নিমিত্ত আর ধর্ম্মসংস্থাপনের কারণ আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েন, সাধুর পরিত্রাণের ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য মায়ামনুষ্যরূপী হরি ধরায় আসেন। সাধু যে সে ত আপনার সাধন বলে উদ্ধার পাইবে। যে পতিত, যে দুষ্কৃতকারী তাহার উপায় কি? তাই ভগবান পতিতপাবন পতিতোদ্ধারের নিমিত্ত ধরায় আগমন করেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যখন শুনিলেন যে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে পাষণ্ড জগাই মাধাই হত্যা করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন আত্মমায়ায় বিস্মৃতচিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য "চক্র, চক্র" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেইদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তখন সেই দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান। ললাটদেশ বিদীর্ণ হইয়া ধরদারত গাত্রে শোণিত স্রাব হইয়া তাঁহার গৈরিক বসন লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, তখনও বাহু তুলিয়া বলিতেছেন

"ভাইরে
মেরেছিস্ বেশ্ করেছিস্
হরি বলে নাচ ভাই!"

এমন সময় মহাপ্রভু রুদ্রমূর্ত্তিতে তথায় সমুপস্থিত। তদ্দর্শনে নিত্যানন্দ প্রভু করজোড়ে ভীতচিত্তে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিলেন "ঠাকুর, একি লীলা তোমার? এবারের অস্ত্র ত চক্র নয়—তবে এ রুদ্রমূর্ত্তি কেন দেব? এবারের প্রতিজ্ঞা কি ভুলিয়া গেলেন?" শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কৃপায় দুর্ব্বৃত্তের উদ্ধার হইল। পাষণ্ড দুইটীকে বিনাশ করিতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের কয়দণ্ড লাগিত? কিন্তু তাহা হইলে পতিতপাবন নাম সার্থক হয় কিরূপে? দুষ্কৃতি নাশ করিয়া তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলেন। শ্রীপাদের আলিঙ্গনে বহুদিনের সঞ্চিত পাপরাশি বিধৌত হইয়া গেল—তাহারা উদ্ধার পাইল। হিংসা করিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা প্রেম পাইয়া ধন্য হইল। আজ প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অবতীর্ণ না হইলে জগাই মাধাইকে কে উদ্ধার করিত?

আমরা চাহি না, তথাপি অযাচিত প্রেম বিতরণে কে আমাদিগকে ধন্য করিত? যখনই ভাবি, যতই অধম হইনা, অধমতারণ আছেন, তখন ভরসা হয়, আর নিরাশা আসিয়া হৃদয় বাত্যাক্ষুব্ধ সরসীর ন্যায় বিচঞ্চল করিতে পারে না। তাই আজ বহুদিনের পর, বহু বিস্মৃতির পারে আসিয়া, ইষ্টপূজা করিতে বসিয়া উদ্বেলিত ভরসান্বিত হৃদয়কে শান্ত

করিয়া ইষ্ট পাদপদ্মে মতি ফিরাইতে পারিব ভরসা হইতেছে।

আমি ইষ্টপূজা করিব—যখন পূজা করিব বলিয়া বসিয়াছি, তখন সব বাধা বিপত্তি চরণে দলিত করিয়া সেই শ্রীচরণ পূজা করিবই। যখন যৌবনে পশুবলদৃপ্ত হৃদয়ে অনন্ত বাসনার ভার লইয়া জগৎময় ছুটাছুটী করিতেছিলাম, যখন কুসঙ্গীগণের কুপরামর্শে কোন কুকার্য্যকেই অকার্য্য বলিয়া মনে হইত না, যাহাতে আনন্দ হয়, পশুর ন্যায় সেই সমস্ত অপকর্ম্ম অম্লানবদনে সংসাধিত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই, যখন উষ্ণ শোণিতের তেজে আস্তিকতা পর্য্যন্ত আচরিত করিয়া, এই দুর্ল্লভ মানবহৃদয়কে পিশাচের লীলাক্ষেত্র করিয়াছিলাম, তখন কে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছিল? পাপ ও কুসংস্কারের গভীর আবর্জ্জনার মধ্য হইতে কে হাত ধরিয়া তুলিয়াছিল? কে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল? যাঁহার কৃপায় ঘোর অন্ধকার হইতে প্রেমের বিমল জ্যোতির আভাস পাইয়া ধন্য হইয়াছি, সে শ্রীচরণ পূজায় কে বাধা দিতে পারে?

যৌবনের প্রারম্ভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য অপরিণামদর্শী বালকের ন্যায়—অন্ধবৎ কুসঙ্গীর পরামর্শে যথেচ্ছাচারে যখন রত ছিলাম, তখন মনে হইয়াছিল এ জীবন এইরূপেই কাটিবে। আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি সম্ভোগের জন্য এ জীবন—এ দুর্ল্লভ মানবজন্ম পাইয়া যে আর কিছু করিতে হইবে,—পাঞ্চভৌতিক দেহধারণের যে অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে, তাহা কখনও মনে পড়ে নাই। সহসা কে যেন হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে দারুণ আঘাত দিল। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ঘোর হাহাকার উঠিল, দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। তবে কি জীবনধারণের অন্য উদ্দেশ্য আছে? পশুবৎ জীবনযাপন ব্যতীত অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য আছে? এই চিন্তায় হৃদয় উদ্বেলিত হইল। কি করিব, কি করিলে এ অভাগার উপায় হইবে? অস্থির হইয়া পড়িলাম। শক্তিহীন দুর্ব্বলচিত্ত, অসংযতমতি দুর্ব্বৃত্ত আমি, কোথায় যাইব? কাহার নিকট যাইলে দয়া করিয়া সদুপায় করিয়া দিবে? বিক্ষিপ্তচিত্তে ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমান অবস্থায় অকস্মাৎ কোন দয়াময় সাধুপদে স্থান দিলেন, অধমের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ক্রমে চিত্ত ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে ভক্তগণের অদ্ভুত চরিত্র গল্পচ্ছলে শুনাইতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে, ভক্তের সরলতা, একপ্রাণতা, অকপট ভালবাসা, অপূর্ব্ব ত্যাগ শুনিতে শুনিতে কি জানি এ মলিন প্রাণেও কি এক অমৃতমধুর স্নিগ্ধালোক বিকশিত হইল। দারুণ উৎকণ্ঠায় চিত্ত অস্থির করিয়া তুলিল, "দয়াময়, কি হইবে, কি করিলে তোমার শ্রীচরণে স্থান পাইব কে বলিয়া দিবে?" অহরহ অন্তরের ভাষায় অন্তর্যামীকে ইহাই জানাইতে লাগিলাম। দয়াময়ের দয়া হইল। একদা নিশা শেষে আমার হৃদয়ের দেবতা, আমার সারাৎসার পরাৎপরধন স্বপ্নাবেশে দর্শন দিয়া কি করিতে হইবে, দুইটি কথা বা অক্ষরে বলিয়া দিলেন। সে আজ কত দিনের কথা! তখন সবে মাত্র যৌবনের মধ্যাহ্ন। আর এখন পলিতকেশ, গলিতমাংসপেশী, ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল, প্রায় প্রৌঢ়াবস্থায় শেষসীমা ও বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভ। তাই আজ মনে হইল, সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মনে পড়িল একবার প্রাণ ভরিয়া ইষ্টপূজা করিব। কি উপচারে যে পূজা করিতে হয়, তাহাত শিখি নাই; হৃদয়ের বৃত্তি বলি দিয়া পূজা করিলে কি আমার দেবতা তুষ্ট হইবেন? ছাগরূপী

দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে বলি দিতে হইবে। তাহাদিগকে হৃদয়াগার হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, হৃদয় ফিরিবে না। এত আবর্জ্জনা লইয়া কি ইষ্টপূজা হয়? অন্তরদেশ পরিমার্জ্জিত করিয়া, অশ্রুজলে ধৌত করিয়া মলিনতা দূর করিতে হইবে। অত্যাচারে অত্যাচারে, অবশ্বে অবশ্বে, বহুতর আগাছার জন্ম হইয়াছে, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। তবে এ মলিন পাপভারগ্রস্ত প্রাণ ইষ্টপূজার উপযোগী হইবে।

এখন কে বলিয়া দিবে কি করিলে—মলিন-প্রাণ সুপরিষ্কৃত হয়। ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল কেন নাম গ্রহণ করি না—তাহা হইলে ত সে কার্য্য হইতে পারে, কারণ শাস্ত্রে শুনিতে পাই, নাম ও নামী অভেদ। নাম করিতে করিতে নামে রুচি হইলে, হৃদয় কপটতা শূন্য হইয়া মনে মুখে এক হইয়া যায়। তখন সেই সরল হৃদয় মধ্যে নামীর উদয় হয়—যথা পদ্মপুরাণে

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥"

নাম ও নামী যখন অভেদ, তখন নাম গ্রহণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। নাম সঙ্কীর্ত্তনই জগতের সার, কারণ শ্রীভাগবতের ১ম স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন,—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥"

"হে রাজন, শ্রীহরির নাম কীর্ত্তনই মোক্ষাভিলাষী সাধকের মোক্ষ, শান্তিকামী ভক্তের শান্তি এবং আনন্দপ্রার্থীযোগীর পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।" বৃন্দাবনের গুহ্য-লীলা সহজবোধ্য করিবার জন্য যিনি স্বয়ং আজ কিঞ্চিদধিক চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়া পাপী, তাপী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চণ্ডাল প্রভৃতিকে সমভাবে নামসুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কৃপা হইলে এই চণ্ডালাধমও ধন্য হইবে। জগাই মাধাই অপেক্ষাও দুষ্কর্ম্মপরায়ণ এ অধম নামসুধায় সিঞ্চিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিবে। কারণ নাম কীর্ত্তনই—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনম্ ভবমহাদাবাগ্নি
নির্ব্বাপনম্
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

কলিপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভু সংসারাসক্ত জীবের কলুষিত হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করিয়া ভগবৎ সেবার উপযোগী করিবার জন্য আজ উপদেশ দিলেন এই হরিকীর্ত্তন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং"—

চিত্তরূপ দর্পণ পরিষ্কৃত করিবার জন্য একমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনই প্রশস্ত। মহাপ্রভু নীলাচল বাসের শেষ কয়েক বৎসর শ্রীপাদ স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দ রায়ের সহিত যে লীলারসাস্বাদন করিয়াছিলেন, সেই লীলা-রসাস্বাদনের প্রয়োজনীয়তা জগৎকে শিখাইবার জন্য সেই সময় ক্রমান্বয়ে আটটি শ্লোক উচ্চারণ করেন। তাহার প্রথমটি এই।

মানবের চিত্ত দর্পণস্বরূপ কারণ তাহাতে সমস্তই প্রতিবিম্বিত হয়। এই চিত্তদর্পণ বাসনার মলিনতার দ্বারা অপরিষ্কৃত হইলে স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না তাই ইহা মার্জ্জনের অবশ্যক। যাহাতে স্বরূপ উপলব্ধি হয় তাহাই বুঝাইবার জন্য মহাপ্রভুর প্রথম উপদেশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তদর্পণের মলিনতা বিদূরিত করিতে হইবে, তবে তাহাতে স্বরূপ

উপলব্ধ হইবে। চিত্তের মালিন্য দূরীভূত হইলে, আর চিত্ত উন্মার্গগামী হয় না—ভগবন্নামে মত্ত হয় সুতরাং মায়ার জ্বালা আর তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে পারে না, তাই এই নাম সঙ্কীর্ত্তন "ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং"। ভবসংসারে আসিয়া মানব অহরহ কাম-কাঞ্চনের সেবাতেই রত থাকে, যতই ভোগ করে ততই ভোগস্পৃহা বলবতী হয়—তৃষা আরও বাড়ে যেমন "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে" ভোগে ভোগলিপ্সা বর্দ্ধিত হয়, যেমন অনলে ঘৃতাহুতি। তাই এই নাম সঙ্কীর্ত্তনই সেই মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণের একমাত্র উপায়। আর এই নামসঙ্কীর্ত্তনে অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হয়—নামশক্তি পরম শ্রেয়ঃ লাভের একমাত্র উপায়, সর্ব্ব মঙ্গলালয় তাই আদি পুরাণ বলিতেছেন—

"নামৈব কারণং জন্তোর্নামৈব প্রভুরেব চ
নামৈব পরমারাধ্যা নামৈব পরমা গুরু।"

জগতসংসারের যাহা কিছু সবই এই নাম শক্তিতে উৎপত্তি, স্থিতি এবং গতি। এই নাম "বিদ্যাবধূজীবনং"। কৃষ্ণভক্তি লাভের নাম ভিন্ন উপায় নাই—কারণ কৃষ্ণভক্তিই সকল বিদ্যার সার, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

"রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।" এই শ্রীকৃষ্ণ নামই বিদ্যাবধূর জীবন। নাম কীর্ত্তনে এই ভক্তিলাভ হয়, নতুবা অন্য উপায় নাই। কলিযুগে ক্ষীণ অল্পায়ু জীবের জন্য দয়াল নিতাই এই নামধন জগতে বিতরণ করিলেন,—জাতিনির্ব্বিশেষে, আচণ্ডালে অকাতরে নাম দান করিলেন। জগৎ ধন্য হইল, ভক্তির স্রোত বহিল, কৃষ্ণভক্তিধারায় জগৎ স্নাত হইল। এই নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দসাগর উচ্ছলিত হয় বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং" আর "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং" প্রতি বাক্যে, নামের প্রতি অক্ষরে পূর্ণামৃতাস্বাদন হয় কারণ নাম সর্ব্বদাই পূর্ণ, নামে অপূর্ণতা থাকে না কারণ নাম ও নামী অভেদ। নামীর চিন্ময়ত্ব হেতু নামও চিন্ময় সুতরাং সদাই পূর্ণ যথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলা সপ্তদশ অধ্যায়ে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি নভবেদ্ গ্রাহ্য মিন্দ্রিয়ৈঃ
সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।"

"অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস ;
প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে হয় স্বপ্রকাশ
কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ গুণ, কৃষ্ণ লীলাবৃন্দ ;
কৃষ্ণের স্বরূপ সম হয় চিদানন্দ।"

এই পূর্ণ প্রেম ধারায় হৃদয় সিঞ্চিত হয় বলিয়া নাম "সর্ব্বাত্ম স্নপনং"। এই নাম সঙ্কীর্ত্তনের জয় ঘোষণা করিয়া পরম সাধনের ধন লোক-লোচনের সমক্ষে ধরিয়াছেন। নাম ভিন্ন কলির অন্য সাধনা নাই, তাই বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলিতেছেন,

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

এই নাম সকল জড় ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়া মনকে নিরঞ্জনের শ্রীচরণ তলে লইয়া যায়, হৃদয় গলিয়া যায়, আত্মপর বোধ থাকে না। নাম করিতে করিতে নামে রুচি জন্মে, প্রত্যহ একমনে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মনে নাম দৃঢ় হইয়া যায়। তখন নামী সর্ব্ব-মন অধিকার করিয়া উদয় হ'ন, অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হইয়া যায়। ভক্ত ভগবানকে হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হন। আর সংসার ভাবনা থাকে না। মহাদাবাগ্নিরূপ মায়ার তাপ আর তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না। সেই "জনন মরণ ভীতি ভ্রংশী সচ্চিৎ স্বরূপ" পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে

একবার দর্শন করিলে, জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া দেবত্ব আইসে—পুনঃ পুনঃ গতায়ত ঘুচিয়া যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্ম কলিযুগে দুঃসাধ্য, জ্ঞান-মার্গ বড় কঠিন—সাধারণ জীবের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব—তাই নদীয়াধামে অবতীর্ণ হইয়া সাধনার সহজ পথ দেখাইয়া দিলেন, কৃষ্ণলাভের উপায় করিলেন, স্বয়ং হরি হরি-নাম গাহিলেন—বৈষ্ণব কবি গাহিলেন

"দেখরে নদীয়াবাসী হরি নাচেন হরি বলে"

শোক তাপ জর্জ্জরিত দেহ নাম ধারায় সিক্ত হইলে শীতল হইয়া যায়, প্রাণে শান্তি আসে, দুঃখ চলিয়া যায়। জিহ্বায় নাম স্পর্শ মাত্রেই দেহ, মন পবিত্র হইয়া যায়। কোন সাধনার প্রয়োজন হয় না। যথা পদ্মাবল্যাং

"আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং

চাংহসা

মা চাণ্ডালমমুক লোক সুলভো বশ্যশ্চ

মোক্ষশ্রিয়ঃ।

নো দীক্ষাং নচ সৎ ক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্য্যাং

মনাগীক্ষতে

মন্ত্রোঽয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ

নামাত্মকঃ॥"

"শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র গুরূপদেশ, সাধুসেবা বা পুরশ্চরণাদি শুভানুষ্ঠানের অপেক্ষা না করিয়া রসনা স্পর্শ মাত্রই ফলদান করে। ইহাতে জিতেন্দ্রিয় পুণ্যাত্মাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; পাপ দূরীভূত হয়; ইহা আচণ্ডাল সকলেরই সুলভ; এবং ইহাতে মুক্তিরূপ সম্পদ বশীভূত হয়।"

আর বৈষ্ণব কবি গাহিলেন "রসনা স্পৃগেব ফলতি।" যে নাম রসনাস্পৃষ্ট হইবামাত্র অন্ত ফলপ্রদ, যে নাম আচণ্ডাল সকলেরই সমান অধিকার, এমন কি মোক্ষ যাঁহাদের করতলগত তাঁহারাও যে নামের বশীভূত হয়েন, যে নাম গ্রহণ করিলে আর ব্রত, যজ্ঞ, পুরশ্চরণ প্রভৃতি কোন কৃচ্ছ্র সাধনার প্রয়োজন হয় না, সেই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র কৃষ্ণনাম। নাম করিতে করিতে হৃদয় মন নির্ম্মল হইয়া যায়। তখন সেই পূতাসনে নামীর উদয় হয়। নাম ও নামী অভেদ, কারণ নাম ও রূপ অভিন্ন। তোমার নাম জিহ্বায় উচ্চারিত হইলেই—তোমার মূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে উদিত হইবে। এই জন্য বৈষ্ণবকবি গাহিলেন

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি

নামের ভিতর আছেন আপনি শ্রীহরি॥"

নামের মধ্যে যে নামী আছেন, তাহা কেনা জানে? পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে বলিয়াছিলেন—

"বীজের ভিতর বটগাছটি আছে যেমন আঁকা নামের মধ্যে আছে তেম্‌নি চূড়া, ধড়া বাঁকা॥" নাম করিলেই নামীকে মনে পড়িবে তাই নাম করিবার এত আদেশ সর্ব্বশাস্ত্রে দেখিতে পাই। বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত করিতে নাম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কোন সাধনার শক্তি নাই? নাই রহিল শক্তি। যতক্ষণ রসনায় বাক্য উচ্চারণের শক্তি আছে, ততক্ষণ সব সাধন ও শক্তি সুলভ। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া, মনে মুখে এক করিয়া দিবা-রাত্রির মধ্যে যদি অর্দ্ধ দণ্ড কাল নিশ্চিন্ত হইয়া নাম করিতে পার, দেখিবে কত শীঘ্র তোমার প্রাণের প্রাণ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিতে তোমার হৃদয় মন্দির আলোকিত করিয়া উদিত হইয়াছেন।

এই সহজ সাধনার পথ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আচরিয়া জগৎকে শিখাইয়াছেন। নামের শক্তিতে পাষণ্ড জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন,

যত দুর্বৃত্ত হউক না, যতই দুষ্কৃতকারী হউক না, নাম উচ্চারণ মাত্রেই উদ্ধার হইবে, কারণ একবার নাম উচ্চারণ করিলে এত পাপ ধ্বংস হয় যে জীব জীবনে এত পাপ করিতে পারে না। যথা :—

"নাম্নস্য যাদৃশী শক্তিঃ পাপ নির্হরণে হরে।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং
পাতকী জনঃ।"

এত পাপ জীব জীবনে করিতে পারে না, যাহা নামের শক্তিতে হ্রাস হয় না। যেমন লৌহ যতই কেন মলিনতা মাখা হউক না, স্পর্শমণি স্পর্শ মাত্রেই তাহা সুবর্ণ হইবে, সেইরূপ হৃদয় পাপাচারে যতই কেন আবর্জ্জনাময় হউক না, একবার নাম করিলেই সব মলিনতা বিধৌত হইয়া যাইবে। যেমন অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি" কিন্তু "কয়লাকা ময়লা ছুটে, যব্ আগ্ করে পরবেশ্" সেইরূপ শতবার ধৌত করিলেও যদি হৃদয়ের মলিনতা দূর না হয়, তবে নামরূপ অগ্নি স্ফুলিঙ্গ একবার তাহাতে সংলগ্ন কর দেখিবে মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্ব মলিনতা, সর্ব্ব কালীমা বিদূরীত হইয়া বিমল ঐশী জ্যোতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং সেই জ্যোতির আভাস তোমার দেহে, বদনে সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইবে। নামের তুল্য সাধনা নাই। জগৎ সংসারে যতই কেন পুণ্যানুষ্ঠান কর না, এক গোবিন্দ নামের তুল্য কিছুই নহে

"গো কোটি দানে, গ্রহণে চ কাশী
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী
সুমেরু সমতুল্য হিরণ্যদানে
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দ নামে।"

কলির শ্রেষ্ঠ সাধনা নাম সঙ্কীর্ত্তন। ইহাই ইষ্টপূজা, ইহাই প্রাণায়াম, তপস্যা, যোগ, পুরশ্চরণ সব। ইহা ভিন্ন গতি নাই। শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে মতি স্থির করিয়া একবার ভাই হরিনামে মত্ত হও দেখি, দেখিবে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার হৃদয়মল বিদূরীত হইয়া পূর্ণ-প্রেমের বিমল জ্যোতিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া অন্ধকার গৃহ আলোকিত করিবে। যেমন পরমহংসদেব বলিতেন "সহস্র বৎসরের জমাট অন্ধকার একটি দিয়াশালাই জ্বালিলে একেবারে বিনষ্ট হয়।" অনন্তকালের বাসনার আধার এই হৃদয় একবার নামের আলোক প্রকাশিত হইলে, সব বাসনান্ধকার দূর হইয়া যাইবে। একবার নাম করিলেই বুঝিতে পারিবে। ইহা অনুভূতির বিষয়। মুখে কেহ বলিলে বুঝিতে পারিবে না। একবার ঔষধ গিলার মত নাক টিপিয়া কোন রূপে কৃষ্ণনাম জিহ্বায় উচ্চারিত হইলেই হইল, বুঝিতে পারিবে কি শক্তি নামে নিহিত। ইহাই ইষ্টপূজা, ইহাই সাধনা, ইহাই সাধনার পরিণতি। শ্রীগুরুর কৃপায় এই নামধন যে লাভ করিয়াছে তাহার জীবনধারণ সার্থক হইয়াছে, নহিলে "জীবন্তি চ ম্রিয়ন্তে চ মক্ষিকাঃ ক্ষুদ্র জন্তবঃ।" আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জন্তু কত জন্মগ্রহণ করিতেছে ও মরিতেছে তাহাতে সৃষ্টিকার্য্যের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নামহীন জীবন পশু জীবন অপেক্ষা হীন। যে নামধনে ধনী তাহার এ সংসারে কিছুরই অভাব থাকে না। নামী স্বয়ং তাহার সকল অভাব পূরণ করিয়া দেন, যথা গীতায় ঠাকুরের প্রতিজ্ঞাবাক্য

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্।"

নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব সেবন, ইহাই

জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই কর্ত্তব্য যিনি সাধন করিতে পারেন তিনি জীবন্মুক্ত, মোক্ষ তাঁহার পদাশ্রিত। নাম করিতে করিতে তবে নামে রুচি আসে। এই নামধর্ম্ম "নির্ম্মৎসরানাং সতাং বেদ্যং" নির্ম্মৎসর হইলে তবে নামসাধনা সিদ্ধ হয়। নাম করিতে করিতে মাৎসর্য্য চলিয়া যায়। অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের কণা হৃদয়ে সিঞ্চিত হইয়া হৃদয়কে প্রেমময় করিয়া তুলে; অণু, পরমাণু, ত্রাসরেণু হইতে বিরাট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত এই নামের বলে সকলকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। তখন পূর্ণ প্রেমময় প্রাণে প্রেমাধীন ভক্তবৎসল আসিয়া উদিত হয়েন। নাম সঙ্কীর্ত্তনের এত মাহাত্ম্য। আরও এক কথা, বৃহন্নারদীয় পুরাণে ভগবান স্বয়ং নারদকে বলিতেছেন :—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের ভক্ত সমাগম প্রিয়তম। নারদকে তাই বলিতেছেন "নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে থাকিনা, যোগীগণের হৃদয়েও আমার অধিষ্ঠান নাই, আমার ভক্তেরা যেখানে আমার গুণগান করে, সেই খানেই আমি থাকি।" কি আশাপ্রদ বাক্য। একবার পাঁচজনে মিলিয়া কাতর কণ্ঠে সঙ্গীত সুরে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি সেইখানে উপস্থিত হয়েন। ইহাপেক্ষা সংকীর্ত্তনের উৎকর্ষ আর কিসে প্রদর্শিত হইবে? "দেব মুনীন্দ্র গুহ্য" পরমধন, শত শত বর্ষ কঠোর তপস্যায় যাহাকে মহর্ষিগণ লাভ করিতে পারেন না, সেই পরম সাধনের ধন একবার সরল মুখে এক করিয়া ডাকিতে পারিলেই দর্শন দেন। তাই বলি ভাই, যতক্ষণ জিহ্বার শক্তি আছে, যতক্ষণ কাল আসিয়া তোমার ক্ষুদ্র দেহের ক্ষুদ্র বায়ু রোধ না করিতেছে, ততক্ষণ সময় থাকিতে থাকিতে প্রাণ খুলিয়া গাও

"রাধে গোবিন্দ বল"

জন্ম মৃত্যুভয় ঘুচিয়া যাইবে। ব্রজপরিবারের মধ্যে স্থান পাইয়া অনন্ত কালের জন্য সেবানন্দ উপভোগ করিবে। যাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দও অতি তুচ্ছ, যাহার বর্ণনায় আজ শাস্ত্রকার বলিলেন সেবানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ বিন্দুমাত্রও নয়। পরার্দ্ধ পরিমিত ব্রহ্মানন্দ পাইলেও আজ সেবানন্দের বিন্দুর সমান হইবে না যথা :—

"ব্রহ্মানন্দ ভবেদেষা চেৎ পরার্দ্ধ গুণীকৃতঃ।
নহিভক্তি সুখাম্বোধেঃ পরমাণু কণায়পি॥"

ব্রহ্মানন্দ পরার্দ্ধ পরিমাণ গুণীকৃত হইলেও ভক্তিসুখাম্বুধির অনুকণায়ও সমান হইবে না। এই সেবানন্দই সর্ব্বসাধনার সার এবং বৈষ্ণবের প্রাণের জিনিস। এই সেবানন্দ উপভোগ করিবার অতি সহজ উপায় নাম সংকীর্ত্তন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারিযুগ লইয়া এক মন্বন্তর। এই চারিযুগের সাধনা-প্রণালী বিভিন্ন প্রকারের শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে

"ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈ ত্রেতায়াং
দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য
কেশবম্॥"

তথাহি শ্রীভাগবতে

"কৃতে যদ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানই একমাত্র সাধনার বিধান শাস্ত্রে পাওয়া গেল। ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই সাধনা এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা অর্চ্চনা। কিন্তু কলিযুগে নাম

সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র সাধনা। সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপরে বিভিন্ন প্রকারের সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা যে ফললাভ করা যায়, কলিযুগে একমাত্র নাম সঙ্কীর্ত্তনেই সে সকল ফল লাভ হইয়া থাকে অধিকন্তু অনর্পিত ধন প্রেমও লাভ করা যায়। সুতরাং কলিযুগে নাম সঙ্কীর্ত্তনই ধর্ম্ম। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনই নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতে অনায়াসে লাভ করা যায়; তাই শ্রীপদে নরোত্তম দাস ঠাকুর মঙ্গলাচরণে বলিলেন

"প্রণমহ কলিযুগ সর্ব্বযুগসার।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যাহাতে প্রচার॥"

এই সঙ্কীর্ত্তন ধর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া এই যুগই সর্ব্বযুগসার।

তাই চঞ্চল চিত্তে, উদ্বেলিত হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে নাম গ্রহণের ইচ্ছা হইবামাত্র উদ্ভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হৃদয় শান্ত হইল। শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে কেবল নাম জপ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিতে পারিলে মানবজন্ম ধারণ সার্থক জ্ঞান করিব। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে শান্তি ও আনন্দ লাভের ইহা ব্যতীত কলিতে অন্য উপায় আছে বলিয়া আমার ধারণা হয় না। তাই আজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহেতুকীত্বয়ি॥"

যে যে যোনিতে জন্মগ্রহণ করি মন তোমাতে যেন অধিচ্ছিন্ন ও নিশ্চলা ভক্তি থাকে। আর কিছু চাহিনা।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

মহম্মদ *

মহম্মদ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে ইতিহাসের একটু আলোচনা আবশ্যক; কারণ যে সমস্ত মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবসমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়াছেন—ইতিহাস তাঁহাদেরই কার্য্যসমূহ কীর্ত্তন করে। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, সে সমস্তই সেই সেই মহাপুরুষ রোপিত বীজসমূহের ফলস্বরূপ। কত শতাব্দীর পূর্ব্বে মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন—কিন্তু তাহার শক্তি পৃথিবীতে এখনও কত ক্ষুদ্র মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কত শত যুদ্ধ, কত সম্রাটের উত্থান ও পতন, কত সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বিলয় এই এক মহাপুরুষমুখ নিঃসৃতবাণীর দ্বারায় সংসাধিত হইয়াছে। রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ হইল—কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল কি সীমানা লইয়া বিবাদ বাঁধিয়াছে; কিন্তু যদি ভিতরে প্রবেশ করা যায়, দেখা যাইবে যে এইরূপ কোন মহাপুরুষউপ্তবীজ হইতে এই মহামহীরুহ উৎপন্ন।

কিন্তু আজকাল এই 'বিংশে অবিশ্বাসের, দিনে প্রকৃত মহাপুরুষ সম্বন্ধে ধারণা করা

* কার্লাইলরচিত Hero worship "বীরপূজা" অবলম্বনে লিখিত।

বড়ই কঠিন। আজকাল সকলের মধ্যেই এমন একটা হামবড়া ভাব আসিয়াছে যাহা দ্বারায় এক এক জন মহাপুরুষের চরিত্র অতি সাধারণ বলিয়া অনুমিত হয়। সকলেই এখন স্ব স্ব প্রধান, বড় সহজে কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহেনা।

একটা কোন বিষয় বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মন হইতে সমস্ত বিদ্বেষভাব মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া নিরপেক্ষভাবে তাহার আলোচনা আবশ্যক; অন্যথা তাহা বোধগম্য হয়ই না, উপরন্তু একটা ভাচ্ছীল্যের ভাব আসিয়া পড়ে। যে কোন বিষয় বুঝিতে হইবে তাহার ভিতর নিজেকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, তাহার পর তাহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া ভাল যদি কিছু থাকে ত ভক্তিপ্রণতচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে অন্যথা পুরাতন বস্ত্রের মত ত্যাগ করিতে হইবে।

মহাপুরুষগণের নানা নাম আছে। কেহ দেবতা বলিয়া কেহ অবতার বলিয়া, কেহ কবি, কেহ সাহিত্যিক, কেহ রাজা ইত্যাদি নানারূপে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হন। কিন্তু মহাপুরুষ বলিতে যে সমস্ত গুণ বুঝায় সকলের মধ্যেই তাহা বর্ত্তমান। তবে এই-রূপ পরিবর্ত্তন কিরূপে হয়? এই যে নানা-রূপে প্রতিভাত হওয়া—ইহা কেবল বেষ্টনেরি গুণে। প্রত্যেক মহাপুরুষের আবির্ভাব সময়ে মানবের মানসিক শক্তি যেরূপ থাকে সেইরূপ ভাবে মহাপুরুষকে দেবতা, অবতার ইত্যাদি নানা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, বেষ্টনীর উপরেই মহাপুরুষের অভ্যর্থনা নির্ভর করে।

মহাপুরুষের একটি প্রধান গুণ সরলতা, সরলতা বলিলেই চুকিয়া গেল না; গভীর অনাবিল প্রাণস্পর্শী যে সরলতা তাহাই প্রকৃত সরলতা নাম পাইবার যোগ্য। আমার যে সরলতা আপনাকে সরল বলিয়া জগৎ সমক্ষে প্রচার করে তাহা সরলতা ত নহেই, তাহা শূন্যগর্ভ কলসের শব্দ, তাহা অহঙ্কার মহাপুরুষের সরলতা এরূপ নয়। তিনি জানেন না সরল কিনা; তাঁহার মনে অসরলতার কথাই উদয় হয়। তিনি ভাবেন এ জগতে সামান্য একদিনও কে যথার্থ সত্যের পথে চলিতে পারেন? মহাপুরুষ নিজে সরল বলিয়া গর্ব্ব করেন না, সরল কি অসরল এইরূপ জিজ্ঞাসাবাদও করেন না। তিনি সরল না হইয়া থাকিতে পারেন না, ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত। সৃষ্টি স্থিতির জটিলরহস্য যাঁর চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা ভাসমান, সেই রহস্য সমাধানের জন্য যিনি ব্যাকুল তিনি কি সরল না হইয়া থাকিতে পারেন? সমস্ত পৃথিবী তাঁদের কুটিলতার পথে পাতালপান দিতে পারে কিন্তু তাঁহার চক্ষে যে এই সমস্তের অসারত্ব ও জীবন, মৃত্যুর রহস্য নিত্য পরিদৃশ্যমান। সকলে সরল না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার তাহা হইবার উপায় নাই, সাধ্যও নাই।

এই সরলতা মৌলিকতার উৎস। যে সত্যের উপর এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত, সে সত্যের কণা-মাত্রের অধিকারী হয় বলিয়া মানুষ, মানুষ। তাহা পাইতে হইলে সরল হওয়া চাই। বাঁকা পথে বাঁকা জিনিষই পাওয়া যায়। অতি সরল বলিয়াই জগতের মূলীভূত সত্য আমাদের চোখে পড়ে না। যদি তাহাতে বক্রতার লেশ-মাত্র থাকিত তাহা হইলে বক্র আমরা, কুটিল আমরা তাহার আংশিক ব্যান ধারণাও করিতে পারিতাম। মহাপুরুষের মনে কোন মারপ্যাঁচ নাই বলিয়া, স্বচ্ছ মুকুরের মত হৃদয় আছে বলিয়াই জগতের সত্য তাহাতে প্রতিফলিত

হয়। তাই সরলতার সহিত মৌলিকতার নিগূঢ় সম্বন্ধ। জগতের সারভূত সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে হংসবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয়। হাঁসে যেমন জলটুকু ফেলিয়া দুধটুকু খায় মহাপুরুষও সেইরূপ মিথ্যাগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া তাহার ভিতর হইতে সত্যটিকে টানিয়া বাহির করিতে পারেন। যাহা অপরের অজ্ঞাত, যাহার সম্বন্ধে অপরের কোন চিন্তাই নাই, মহাপুরুষ সেইটিকে জগতের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন।

মহম্মদের সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা মহম্মদের মহাপুরুষত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইয়া তাঁহাকে কপট ধার্ম্মিক আখ্যা প্রদান করেন। যদিও কোন বিষয়ে তাঁহার কপটতা ছিল কিন্তু তাঁহার যে একটা নিজস্ব ছিল, যাহার প্রচারের জন্য তিনি ভগবানের আদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। যে সত্যের মহিমোজ্জ্বল রশ্মিতে জগৎ স্নাত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোকে এই ত্রয়োদশ শত বর্ষ ধরিয়া যাহাকে জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছে তাহা যদি কপটতাপ্রসূত হয় তাহা হইলে পৃথিবীতে আশ্চর্য্য বলিয়া জিনিষ কিছুই থাকে না। কপট যে, বাঁকা যার বুদ্ধি সে এমন একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে যাহা দ্বারায় আমাদেরি মতন লক্ষ লক্ষ লোকে তেরশত বৎসর ধরিয়া সুশৃঙ্খলায় জীবনযাপন করিতে পারে। এই যে মহম্মদের উপর কপটত্ব আরোপ ইহা এই যুগেই সম্ভবপর। এখন লোকে চায় মহত্বকে মুছিয়া ফেলিতে—সে আমার অপেক্ষা বড়, ইহা কি কখনও সম্ভবপর, হইতেই পারে না, সে খোঁড়াইয়া তান করে বড় হইতেছে, ইহাই এখনকার ধ্যান ধারণা। মিথ্যার সাহায্যে সত্যের জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। মিথ্যার তাসের ঘর নির্ম্মাণ হয়; একদিন থাকিতে পারে কিন্তু সত্যের প্রবল আঘাতে তাহার বিলয় অবশ্যম্ভাবী।

হইতে পারে মহম্মদের অনেক দোষ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই দোষের ছোট ছোট দুই একটি ফোঁক্‌ড় সত্যের প্রকাণ্ড গুঁড়িটিকে ঢাকিতে পারে? দোষ!—দোষ কার নাই? 'আমি দোষী নয়' এই যে জ্ঞান, ইহা সকলের অপেক্ষা বড় দোষ। Bibleএ Davidকে ভগবানের মনের মত লোক বলা হইয়াছে; কিন্তু Davidর কি দোষ ছিল না? পাপের অন্ধকার কূপে তিনি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু অনুতাপাশ্রুবিধৌত David আবার উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেন। পাপ পুণ্যে সংগ্রাম লইয়াই মানুষ, একবার পাপ উপরে উঠে, অনুতাপের চেষ্টার সাহায্যে পুণ্য আবার বড় হয়। ইহাই ত মানুষের বৈশিষ্ট্য। অনুতাপের দ্বারা, কপটতালেশমাত্রহীন চেষ্টা দ্বারা উপরে উঠাই মানুষের লক্ষ্য। মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্মে অনেক দোষ, অসামঞ্জস্য থাকিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা সেই অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে একবার তাকাইব না? যদি খালি তাঁহার দোষের দিকেই দেখি তাহা হইলে সত্যের সন্ধান আর মিলিবে না। তাঁহার প্রচারিত বাণীতে কিছু না কিছু সত্য অবশ্যই আছে ইহা মনে করিয়া লইয়া দেখা যাক্ যে কি মনোমুগ্ধকরী বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত এই ইস্‌লাম জগৎ আজ ত্রয়োদশ শত বর্ষকাল চলিতেছে।

উপযুক্ত স্থলেই মহম্মদের জন্ম হইয়াছিল। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটা গভীর প্রতিচ্ছবি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত। আরব জীবন সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র। কোথাও মেঘ-

চুম্বি পর্ব্বতসমূহ বৃক্ষলতাদিশূন্য, নির্জ্জন যেন প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখাইতেছে। আবার কোথাও দিগন্তবিস্তৃত ধূ ধূ বালুকারাশি। যতদূর দৃষ্টি যায়, প্রখর রবিকরতপ্ত বালুকাসমুদ্র। কখনও স্থির কখনও প্রচণ্ড বাত্যাসংঘোগে আন্দোলিত। দিবসে সেই নির্জ্জন দেশে সূর্য্য জ্বলিয়া যায়, রাত্রে অসংখ্য তারকা খচিত নীলাকাশে শান্তি অপনোদন করে। আবার এই ভীষণতা বেশী পরিস্ফুট করিবার জন্যই যেন মধ্যে মধ্যে তৃণশস্যাচ্ছাদিত জলাশয়াদি শোভিত চরিৎ ক্ষেত্র। শ্রান্ত পথিক যখন ইহা দেখিতে পায় তখন তাহার কি আনন্দ! এদেশের জল হাওয়া যেন স্বভাবতঃই মনে একটা স্নিগ্ধতা একটা এক প্রাণতা আনিয়া দেয়। সেই জনশূন্য প্রান্তরে, প্রকৃতির উন্মুক্ত, উদার আকাশের তলে একা দাঁড়াইয়া মনটা স্বভাবতঃই একটা অসীমতার খোঁজে ঘুরিয়া বেড়ায়। আরববাসী শত্রুতা করিত প্রাণের সহিত, আবার বন্ধুতাও করিত সেইরূপ। তাহাদের আতিথেয়তা বিশ্ববিদিত। পরমশত্রুও অতিথি হইলে যথাযোগ্য সম্মান পাইত। এই প্রাকৃতির নীরবতার মধ্যে এই ভীমসৌন্দর্য্যে পরিপুষ্ট আরব সহজেই আবেগ পরিপূর্ণ। কিন্তু ভাবও যেমন উদ্দামগতিতে নৃত্য করিতে চেষ্টা করিত, সংযমও তেমনই কঠোর হস্তে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিত। মহম্মদের পূর্ব্ব হইতেও ইহাদের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আরব সভ্যতার সেই প্রভাতোন্মুখ সময়ে সেখানে কবিতার প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণাদি হইত।

এই ভাব প্রবণতা হইতে তাহাদের আর এক গুণ উদ্ভূত হইয়াছিল—ধর্ম্মপ্রাণতা। আকাশে যখন শত শত বহ্নিকা জ্বলিয়া উঠিত ধূ ধূ বালু প্রান্তরের মধ্যে যখন কুলুকুলুনাদিনী পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী দেখা যাইত, নীল আকাশের গায়ে যখন তরঙ্গায়িত পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহ মনের মধ্যে একটা কি জানি কি ভাব আনিয়া দিত তখন তাহারা যে ইহাদেরে দেবতা বলিয়া পূজা করিবে তা আর আশ্চর্য্য কি! আরববাসিগণ নানা শাখায় বিভক্ত ছিল। সকল শাখাতেই নানা মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়।

মুসলমানদের এমন যে 'কাবা' আছে তাহা একটি বৃহৎ কাল প্রস্তরের উপর তৈয়ারী। পৌত্তলিক আরববাসী এই কৃষ্ণ প্রস্তর খণ্ডকে আর সন্নিহিত 'জেমজেম' বলিয়া কূপকে পূজা করিত। এই কৃষ্ণ প্রস্তর এবং কূপপূজা হইতেই মক্কা সহরের উৎপত্তি। তীর্থযাত্রীর সমাগমে স্থানটী গুলজার হইয়া উঠে। মক্কাবাসিগণ নানা শাখায় বিভক্ত হইলেও তাহারা একতাবদ্ধ ছিল। যে কোন প্রকারের পৌত্তলিক হউক না কেন, বৎসরান্তর সকলেই একবার 'কাবায়' আসিয়া সম্মিলিত হইত।

নানাশাখায় বিভক্ত আরবে তখন কতকটা সাধারণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। মহম্মদ যে 'কোরিশ' শাখায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শাখারই তখন মক্কায় অধিক প্রভুত্ব। সেই জাতি হইতে দশজন প্রধান প্রধান ব্যক্তি বাছিয়া লইয়া শাসন কার্য্য চলিত।

মহম্মদের জন্ম সময়ে পৌত্তলিকতা কতকটা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। 'হুজার' আত্মত্যাগী অবতার কাহিনী ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনে একটা ভাবান্তর আনিয়া দিতেছিল।

আরবের যখন এইরূপ অবস্থা, সমাজের মধ্যে যখন একটা চাঞ্চল্যের ভাব দেখা দিয়াছিল, সেই সময়ে ৫৭০ খ্রীঃ অব্দে 'কোরিশ' শাখার 'হাসেম' কুলে মহম্মদ জন্ম-

গ্রহণ করেন। শৈশবেই পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়ায় মহম্মদ পিতামহের স্নেহময় ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। কিন্তু কালবশে একশত বর্ষীয় বৃদ্ধ মহম্মদকে জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। আবু তালেবও মহম্মদকে যথাযোগ্য যত্নের সহিত আরবোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

মহম্মদের জীবন বড়ই বৈচিত্রময়। পিতৃব্যের সহিত কখনও তিনি বাণিজ্য করিতে যাইতেছেন, কখনও বা যুদ্ধে শৌর্য্যপ্রকাশ করিতেছেন। অনেকে বলেন যে এই বাণিজ্য ব্যপদেশে মহম্মদ মিসরে আসিয়া সার্জ্জিয়াস্ নামে এক ক্রিশ্চিয়ান সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হন। ইহা হইতেই তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইতে থাকে কিন্তু চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক এক বিভিন্নভাষীর নিকট কি এমন জ্ঞানলাভ করিলেন যাহা দ্বারা তাঁহার জীবনে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল? বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষার, একটা অতৃপ্তির ভাব আসিয়া দেখা দেয়। সেই আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির পূর্ণতায় খোঁজেই তিনি গভীর বিস্ময়ে জগতের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। এই চাওয়া, এই ব্যগ্র দৃষ্টিপাতই তাঁহার জ্ঞান-লাভের মূল।

মহম্মদের কখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষা হয় নাই। এখন যাহাকে আমরা বিদ্যাশিক্ষা বলি তাহা তাঁহার ছিল না। আরবে তখন সবেমাত্র লিখনপ্রণালীর প্রচলন হইয়াছে। মহম্মদ কখনও লিখিতে পারিতেন না। তবে কি তাঁহার শিক্ষা হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছিল। কে দিল? সীমাহীন মরুভূমি, মেঘবিজলির লীলাভূমি অনন্ত আকাশ, উন্নত পর্ব্বতনিচয় তাঁহাকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছিল, তাহার কাছে আমাদের এই দশজনের চর্ব্বিত চর্ব্বণ শূন্য, পরিত্যাজ্য। শিক্ষা কি শুধু পুস্তকে নিবদ্ধ? প্রকৃতির যে বই উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহার দিকে না চাহিয়া পরে কি বলিতে পারে জানিতে যাওয়ার নাম শিক্ষা? উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া যায়। মহম্মদের গুরু এ জগতের স্থাবর জঙ্গম। বিশ্বের মূলীভূত সত্যের কূলে দাঁড়াইয়া মহম্মদ চিন্তা করিতেছেন—আছে শুধু নীরবতা আর স্পন্দিত ব্যাকুল হৃদয়। ইহা হইতে যে শিক্ষালাভ হইয়াছিল তাহার মহিমময়ী শক্তি এখনও জগতের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই মহম্মদের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তায়, কথায় এবং কার্য্যে কখনও সামঞ্জস্যচ্যুতি হইত না। কথাবার্ত্তা বড় বেশী বলিতেন না; কিন্তু যখন বলিতেন তখন তাহা সকলের হৃদয়েই আঘাত করিত। তাঁহার সামান্য ইঙ্গিতে জটিল রহস্যের সমাধান হইত। চিন্তাশীল ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার আনন্দ ছিল না—তাহা নয়। তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতেন। সে হাসি এখনকার কপটতার, শিষ্টাচারের নহে; সে হাসির উৎস ছিল সরলতা, সত্য-বাদিতা। তাঁহার আকৃতিও প্রকৃতির গুণ অনুযায়ী ছিল; একটা সহজাত গাম্ভীর্য্য গৌরবে অলঙ্কৃত ছিল। তিনি 'খাদিজা' নাম্নী এক ধনী সম্ভ্রান্ত মহিলার কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ক্রমে তাঁহার এবং কর্ত্রীর মধ্যে অনুরাগ দেখা যায়। ফলে মহাম্মদের বয়স যখন ২৫ এবং খাদিজার ৪০ তখন তাঁহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর খুব শান্তির সহিত, সাধারণ লোকের মত তাঁহাদের জীবন

চলিতে থাকে। ক্রমে মহম্মদের বয়স যখন ৪০ তখন তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে কথা বলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতি যে ভণ্ডামির আরোপ করা হয়—ইহা দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া উপলব্ধি হয়। কারণ জীবনের মধ্যাহ্নকালে তিনি শান্তিতরুমূলে বাস করিয়া আসিয়াছেন, ধর্ম্মপ্রচারের কোন রকম উচ্চাশা মনে আসে নাই, পঞ্চাশদ্বর্ষে সেই বণিতাবিয়োগবিধুর মহম্মদ শান্তির সুখময় ক্রোড় ত্যাগ করিয়া ঘাত প্রতিঘাতসঙ্কুল সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন? বার্দ্ধক্য স্বভাবতঃই শান্তির প্রয়াসী। সে সময়ে মহম্মদের ভণ্ডামির এমন কি প্রয়োজন হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আরববাসীর পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন? উচ্চাশা তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছিল? কখনই নয়। প্রকৃতির উন্মুক্ত উদার নীরবতার মধ্যে পালিত মহম্মদের মন কখনও চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয় নাই, দেশের অধঃপতিত অবস্থা তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল। সত্যের মহিমময়ী বাণী তাঁহাকে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বাধ্য করিয়াছিল। সত্য যে তাঁহার অন্তরে, তিনি কি তাহা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন? প্রকৃতির জটিলরহস্য সমুদয় তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়াছিল। প্রাণে যখন তাঁহার আমি কে? কি করিতে এখানে আসিলাম? এ জগৎ কি? ইত্যাদি প্রশ্ন উদিত হইত, তখন ব্যাকুল, উদ্ভ্রান্ত মহম্মদ চারিদিকে তাহার উত্তরের আশায় ছুটাছুটী করিতেন। কিন্তু কে বলিয়া দিবে? সম্মুখে উত্তুঙ্গ হেরা, সিনাই পর্ব্বত, মাথার উপর অনন্ত নীল আকাশ, আশে পাশে বৃক্ষলতাবিহীন জনশূন্য মরুভূমি,—কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিত না। অতৃপ্ত মহম্মদ আপনার মনোমধ্যস্থ ঐশী প্রতিভার নিকট শেষে তাঁহার উত্তর পান, তিনি কি তাহা প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন?

প্রকৃতির আবরণ যাঁহার জন্য উন্মুক্ত, ঐশীপ্রতিভা যাহার অন্তরে সর্ব্বদাই একটা জ্ঞানলিপ্সার ভাব আনিয়া দিতেছে তিনি কি সত্যহীন অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে পারেন? অপরে ভণ্ডামির প্রশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু সত্যের দ্বার যাঁহার কাছে উন্মুক্ত, জ্ঞাতসারে মিথ্যার প্রশ্রয় তাঁহার কাছে মহাপাপ। বড় হইবার ইচ্ছায় তিনি লোকের কাছে ভণ্ডামি করিতেছিলেন,—আশ্চর্য্য বটে। আরবের অধীশ্বর—সে ত দুদিনের খেলা! জগতের মুকুট—সে ত আজ আছে, কাল নাই। যিনি একবার সত্যের স্নিগ্ধ কিরণে স্নাত হইয়াছেন,—মুক্তি যাঁহার আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যার অত্যাচার নিবারণ যাঁহার লক্ষ্য, তিনি হীরা জহরতে ভুলিয়া যান?

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

হাঁটু গাড়া *

(১)

ভাদ্রমাস। বেলা প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রখর সূর্য্যকিরণ অনল রাশি বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতেছে। আকাশের অতি উপরে কতকগুলি কৃষ্ণপক্ষী বিচরণ করিতেছে। ধীর বায়ু কখন কখন সরসী হৃদয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া বৃক্ষের শাখারাজি দোলাইয়া দোলাইয়া তপনতাপিত স্বেদাক্ত শরীরে অমৃত ধারা ঢালিয়া দিতেছে। দুই একটী বলাকা পুষ্করিণীর তীরে ধীরে ধীরে আহার খুঁজিতেছে। কৃষকেরা জলযোগের পর তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ গল্প গুজব করিতেছে। কিশোর বয়স্ক নিত্যানন্দ উক্ত কৃষকগণের সঙ্গে কৃষি কার্য্যের নানা কথা কহিতেছেন। কৃষকগণ অদ্য কে কত বিঘার ঘাস তুলিয়াছে তাহার গল্প করিতেছে। কেহ কেহ নিজ নিজ শক্তির প্রদর্শন জন্য আপনাদের কৃত কার্য্যকে খুব রঞ্জিত করিয়া শ্রোতার সম্মুখে স্বীয় স্বীয় কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিতে ছাড়িতেছে না, বলিতেছে, ভাই, আমি একবিঘা জমির ঘাস তুলিলাম। আর একজন তরুণ বয়স্ক কৃষক একটু অট্ট হাস্য করিয়া বলিল তুমি তফাৎ আর গল্প করিও না। আমি অদ্য দেড় বিঘা জমির ঘাস তুলিয়া জলযোগ করিয়াছি। আর এক কৃষকপুঙ্গব গর্ব্বিত বাক্যে বলিয়া উঠিল, তোমাদের যাহা-দুরী রাখিয়া দাও। আমি যদি সকাল বেলা হইতে জমিতে বসিতে পাই, তবে দুই বিঘা জমি নিড়াইয়া জল খাইতে পারি। এইরূপ অনেক কৃষকতনয় স্বীয় স্বীয় বীরত্বের পরিচয় দিয়া বেশ মজলিস জাঁকাইয়া গল্প করিতেছে। কিন্তু অতি রৌদ্রে কাহারও সাধ্য নাই যে ক্ষেত্রের তপ্তজলে বসিয়া জমি নিড়াইতে যায়। কেবল কথা কাটাকাটি চলিতেছে মাত্র। কোন কোন কৃষক বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় গামছা পাতিয়া শয়নকরত সুষুপ্তি সুখ অনুভব করিয়া বিপুল নাসিকা ধ্বনি করিতেছে। নিত্যানন্দ সকলের কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছেন। তাঁহাদের কতকগুলি ছোট জমিও এই স্থানের অতি নিকটে আছে। সেই সকল জমিতে তাঁহাদের কৃষাণগণ কাজ করিতে আসিয়াছে তাহাই পরিদর্শন জন্য অদ্য এখানে তাঁহার শুভাগমন। তিনি বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার কথা কহিলেন। ধীরে ধীরে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, আমি এক প্রহরের ভিতর সাত বিঘা জমি নিড়াইতে পারি। তোমরা কেহ আমার সমান কার্য্য করিতে পার কি? এই কথায় কৃষক মহলে একটা হাসির রোল উঠিয়া পড়িল। কেহ কেহ বলিল দাদাঠাকুর বলেন কি? কেহ বলিল, আপনি কত কাঠায় বিঘা হয় তাহা জানেন না। কেহ বলিল, ওরে

---

* স্থানীয় কিম্বদন্তী এই অলৌকিক ব্যাপার। "হাঁটুগাড়া" আশ্রম প্রভুনিত্যানন্দের দেবত্বের অসাধারণ চিহ্ন। লোকমুখে বহুকাল ধরিয়া এই অলৌকিক ঘটনা এতদিন পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই আশ্রমে ও আশপাশের আশ্রম গুলিতেও তাঁহার দেবত্বের বিষয় প্রকটিত। তদ্ভিন্ন তথায় এক এক সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। বহুকাল হইতে উক্ত আশ্রমগুলি বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিচিত। প্রকৃত ভক্ত যাঁহারা, তাঁহারা এই ঘটনাকে প্রভুনিত্যানন্দের বিচিত্র লীলা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

খুড়াঠাকুর তোদের সহিত তামাসা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছিস না। কেহ বলিল এরূপ অসম্ভব গল্পতো কখন শুনি নাই। নিত্যানন্দের কথায় অল্পক্ষণের মধ্যে কৃষকমহলে একটা প্রবল আন্দোলনের ঝড় বহিয়া গেল। নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কোমল করপল্লব আন্দোলন করিয়া পুনর্ব্বার মিষ্ট বাক্যে বলিলেন নিশ্চয় পারি! নিশ্চয় পারি!! তোমরা আমার কথাকে কি মিথ্যা বলিয়া স্থির করিলে? নিত্যানন্দ মিথ্যাকথা বলিতে শিক্ষা করে নাই। স্বপ্নেও কখনও মিথ্যাকথা বলে না। সত্যই আমি এক প্রহর কি তাহার কম সময়ের মধ্যে সাতবিঘা জমি নিড়াইয়া দিতে পারি! এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃষকগণ পরস্পর মুখ চাহাচাহি করিতে লাগিল। এবং সকলে নিত্যানন্দের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক বদনসুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল উহাতে যেন সাফল্যের দৃঢ়ছায়া পরিলক্ষিত। দেখিতে পাইল উহাতে যেন প্রসাঢ় অধ্যবসায়ের উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট। দেখিল উহাতে যেন কোন এক স্বর্গরাজ্যের পবিত্রতা ও দেবত্ব বিরাজিত। উহারা সকলে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার উত্তর করিল, দাদাঠাকুর আপনি যে কথা বলিতেছেন তাহা আমাদের কাহারও সাধ্য নাই। এরূপ কার্য্য এত অল্প সময়ের মধ্যে কেহ করিতে পারে এমন গল্প কখনও আমরা কাহারও মুখে শুনি নাই। আপনার মুখে কেবলই ঐ কথা শুনিতে পাইতেছি মাত্র। কাহার সাধ্য এত অল্প সময়ের মধ্যে এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়? এই কথায় নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, তোমরা আমাকে ৭ বিঘা জমি দেখাইয়া দাও, এখনি আমি উক্ত জমি নিড়াইয়া তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিতেছি। তোমরা সকলে কিছুকাল অপেক্ষা কর। আমি কার্য্যসম্পাদন করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি। উঠ আর বিলম্ব করিও না। জমি কোথায় শীঘ্র আমাকে দেখাইয়া দাও। এই বলিতে বলিতে তিনি ক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। একজন কৃষক বলিল কাকা ঠাকুর, এইতো সম্মুখে আপনাদেরই সাত বিঘা জমি। যদি পারেন তবে উক্ত জমিখানি নিড়াইয়া ফেলুন। আপনাকে আর অপরের জমি নিড়াইতে হইবে না। নিজের জমির ঘাস তুলিয়া ফেলুন। এই কথার পর কৃষক নীরব হইল। অপরাপর কৃষকগণ কৌতুকের সহিত দর্শন করিল নিত্যানন্দ উক্ত ক্ষেত্রখানি নিড়াইবার জন্য জমির ভিতর বসিয়া পড়িলেন। কৃষকেরা আর তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। উক্ত ধান্যক্ষেত্রের ভিতর তিনি যেন লুক্কায়িত হইলেন। কৃষকগণ সকলে আপন আপন স্থানে বসিয়া এই কৌতুকজনক অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। একজন বৃদ্ধ কৃষক বলিয়া উঠিল দেখতো নিত্যানন্দ কি করিতেছে। এই প্রবল রৌদ্রে ধানের ভিতর প্রবেশ করিয়া তপ্তজলে বসিয়া উহার কত কষ্ট হইতেছে। আহা সেই সুকোমল দেহ কর্দ্দমাক্ত ও উত্তপ্ত সলিলে দগ্ধীভূত হইতেছে। উহাকে শীঘ্র ডাকিয়া আন। আমাদেরই দো'ষ হইল এই কথা বল। আহা তাঁহাকে রৌদ্রতপ্ত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত দেখিলে কাহার হৃদয় প্রবল দুঃখে দগ্ধ না হয়? অথবা তোমরা থাক, আমি নিজে গিয়া নিত্যানন্দকে ধরিয়া আনি। তিনি

তোমাদের কথায় হয়তো আসিবেন না। এই বলিয়া বৃদ্ধ কৃষক নিত্যানন্দকে ধরিয়া আনিতে গেল। তাহার মনে খুব একটা দুশ্চিন্তা ও ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল কারণ সে মনে মনে চিন্তা করিতেছিল হাড়াই পণ্ডিত কি পদ্মাবতী এই বিষয় কোন প্রকারে জানিতে পারিলে অতিশয় দুঃখিত হইবেন। সকলকে বিশেষরূপে তিরস্কার ও শত ধিক্কার প্রদান করিবেন। এই মনে করিয়া বৃদ্ধ কৃষক তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল। তাহার মনে এই ভাব তখন এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে সে কেবলই চিন্তা করিতে লাগিল আমরা নিত্যানন্দকে জমি নিড়াইতে নিষেধ না করিয়া বড়ই কুকর্ম করিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কৃষক পূর্ব্বকথিত জমির বড় আলি ধরিয়া গমন করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যতদূর অগ্রসর হইতে লাগিল ততদূরই সুন্দর ভাবে নিড়ান হইয়াছে দেখিতে পাইল। তদ্দৃষ্টে কৃষক অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কার্য্য কোন মনুষ্যেরই করিবার সাধ্য নাই। তবে ইহা কি দেবমায়া? নিতাই কি তবে দেবতা! সত্য নিতাই দেবতা। তাহার চোখ মুখ-শরীর কিছু তো মানুষের মত নয়। অমন টুকটুকে লাল লাল পা দুটী তো মানুষের হয় না। অমন হাসিমাখা মুখ কখন মানুষের ভিতর দেখা যায় না। পরের দুঃখ নিত্যানন্দের জীবনে অসহ্য। পরের চক্ষে জল দেখিলেই নিতাই ক্রন্দন করে। তাহার মুখে হরিনাম শুনিতে যেমন মিষ্ট লাগে কাহারও মুখে তো সেরূপ শুনা যায় না। নিত্যানন্দ মাতা পদ্মাবতীকে লুকাইয়া লুকাইয়া সমস্ত রাত্রি হরি সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ায়। এই সকল দেখিয়া মনে হয় নিতাই নিশ্চয়ই দেবতা। আমরা এতদিন উহাকে চিনিতে পারি নাই। আমরা অহা কি কুকার্য্যই করিলাম। এ পাপের বুঝি নরকেও স্থান হইবে না। সেই সুকোমল অঙ্গ কত প্রকার কলঙ্কের চিহ্নদ্বারা এতক্ষণ কলঙ্কিত হইয়াছে। সেই চাঁদবদনখানি এতক্ষণ রৌদ্রদগ্ধ হইয়া ঘর্ম্মস্রোতে বিমলিন হইয়াছে। কৃষক মনে মনে এই সব চিন্তা করিয়া অতিশয় দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে জমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিতে লাগিল। যতদূর গমন করিল দেখিতে পাইল জমিতে একগাছী ঘাসের চিহ্নমাত্র নাই। সমস্তই এখনি কে যেন পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া দিয়াছে। কৃষক মনে মনে ভীত হইল। সে ভাবগদগদ চিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নিত্যানন্দের উদ্দেশে চলিতে লাগিল। আর জমির অত্যল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। দেখিল নিত্যানন্দ চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া ক্ষেত্রের শস্য সকল উত্তোলন করিতেছেন। কৃষক ভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার আর পা উঠিল না। নেত্রে আর পলক পড়িল না। অপলক নেত্রে সেই অপূর্ব্ব মহিমাময় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিল। যেরূপ অতি কঠোর সাধনায় প্রায় কেহ কখন দেখিতে পায় না সেই অপূর্ব্ব রূপ কৃষক নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার দু নয়ন প্রেমজলে পরিপ্লুত হইল। শরীর কণ্টকিত ও কম্পবিশিষ্ট। সে অপলক নেত্রে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। জমির ঘাস তোলা হইল। এইবার তিনি হাঁটুগাড়িয়া উক্ত ঘাস গুলিকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে নিত্যানন্দ দিক পরিবর্ত্তন করিলেন।

দিকপরিবর্ত্তন করিবামাত্র বৃদ্ধের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। অমনি তিনি যেন কিছু ব্যস্ত হইলেন। কৃষক তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না। তিনি পলকের ভিতর কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। বিজলী নীলমেঘে লুক্কায়িত হইল। পূর্ণচন্দ্র যেন নবজলধরে ঢাকিয়া গেল। যেখানে তিনি জমির ঘাস-গুলিকে হাঁটু দ্বারা মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত করিয়াছিলেন তথায় একটী কূপের মত হইয়াছে। দৌড়িয়া গিয়া কৃষক তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল। ভাগ্যবান কৃষক ইন্দ্রজালের ন্যায় পলকমধ্যে এই সব ঘটনা দেখিল। সে পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে এই অপূর্ব্ব ঘটনা এবং ভগবানের আশ্চর্য্য বিভূতি দর্শন করিল। বুঝিল, তাহার মুক্তির জন্য দয়াময় হরির অন্যকার এই আশ্চর্য্য খেলা। তাঁহার অচিন্তাঘটনা এবং আশ্চর্য্য মায়াত্মা কে বুঝিতে পারে? কৃষক মনে মনে এই সব চিন্তা করিয়া সেই মনোমোহনরূপ পুনর্ব্বার দর্শন করিবার জন্য ধূলায় গড়াগড়ি দিতে ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

"হাটুগাড়া" আশ্রম সম্বন্ধে এতদঞ্চলে এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচারিত আছে। বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দপ্রভুর এইরূপ দেবত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। উক্ত দিবস হইতে পূর্ব্বোক্ত কূপটী তীর্থক্ষেত্র স্থানরূপে পরিগণিত। হাঁটু হইতে এই কূপটীর উদ্ভব, তজ্জন্য উহার নাম "হাটুগাড়া।"

(২)

এখানে বহুকাল হইতে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বোধ হয় উহা তীর্থক্ষেত্র-রূপে পরিচিত হইবার পর কোন ভক্ত বৈষ্ণব দ্বারা সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। মকর-সংক্রান্তির দিবস অনেক স্ত্রী যাত্রী উক্ত কূপে অবগাহন করা অতি পুণ্যময় বলিয়া অবধারণ করিতেন। তদ্ভিন্ন বহু দূরতর স্থান হইতে অনেক ভদ্র মহিলা উক্ত দিবস উক্ত পবিত্র-কূপে অবগাহন করিবার জন্য এখানে সমাগতা হইতেন। ঐ সময় পুরুষের গমনাগমন একবারেই থাকিত না। উক্ত তীর্থভূমি স্ত্রী-যাত্রীগণ পরিশোভিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, ভাব-গাম্ভীর্য্য ও মহত্বে মহিমান্বিত ছিল। বর্ষীয়সী সধবা বিধবা যুবতী কিশোরী এবং কনক-কুসুমসদৃশা বালিকাগণদ্বারা উক্তস্থান অপূর্ব্ব-ভাবে সজ্জিত হইত। আজ বহুদিন হইল অত্র বীরভূম জেলার কড়িধা গ্রামনিবাসী সেনবংশীয় সদাশয় পুণ্যবান্ ৺বিনোদীরাম সেন মহোদয় উক্ত কূপটিকে একটু প্রসারিত করিয়া উহার ভিতর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির কি কোন্ দেবের মন্দির তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না। তবে কূপের জলের ভিতর সে আপনার শরীরের অধিকাংশ নিমজ্জিত রহিয়া সাক্ষ্য স্বরূপ মস্তকভাগ সমুন্নত করিয়া বহুদিন হইতে কালের তরঙ্গকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি উক্ত কূপের ঘাটটিও পাকা করিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। একটি বৃত্তাকার সুগোল কূপ সম্পশোভিত হইয়া দর্শকের নয়নে বড়ই শোভনীয় হইয়াছিল। উক্ত কূপের বায়ুকোণে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তিটী প্রতি-ষ্ঠিত ছিল। এই মনোহর তীর্থভূমি বীরচন্দ্র পুরের শেষ সীমায় অবস্থিত। ৺বঙ্কিম রায়ের গৃহ হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে, খোলা মাঠের মধ্যে বিদ্যমান। গোষ্ঠ, আরাধনা ও রথের সময় বীরচন্দ্রপুরে যে সকল যাত্রীর গমনাগমন ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে অনেকেই এখানে আসিয়া এই কূপের পবিত্র বারি স্পর্শ

করত আপনাদিগকে বিশেষরূপে পবিত্র মনে করিয়া থাকেন মকর সংক্রান্তির দিন কেবলমাত্র স্ত্রীযাত্রীগণ এই পবিত্র কুণ্ডে স্নান করিয়া আপনাদিগকে পুণ্যবতী ও পরিশুদ্ধা মনে করিয়া বিশেষ আনন্দিতা হইতেন। একে একে যুবতীরা এই কুণ্ডে অবগাহন করত সিক্ত কেশে সিক্ত বস্ত্রে নিঃশঙ্কিতভাবে পরস্পরে প্রাণ ভরিয়া যেন এক প্রীতি ও অমৃতের প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেন। যে সকল ভদ্রমহিলারা কখন গৃহের বাহির হইতেন না এইরূপ বহু যুবতী একত্রিত হইয়া পরস্পরের সহিত প্রাণ খুলিয়া হৃদয়ের কথায় মাতিয়া যাইতেন।

কাহার পাপে ও অভিসম্পাতে সেই চাঁদের হাট ভঙ্গ হইয়াছে? ইহার জন্য দায়ী কে? সেই পবিত্রতা ও মধুরতা বুঝি চিরকালের জন্য বিলীন হইয়াছে!

(৩)

গোস্বামীপ্রভুদিগের অনবধানতা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আশ্রমটী চরম দুর্দ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এই স্থানে একটী সেবাশ্রম ছিল। একজন মহান্ত উক্ত আশ্রমের মালিক ছিলেন। উক্ত মহান্তের যথাসর্ব্বস্ব দস্যুগণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। মহান্ত মহাশয়ও দস্যুগণ দ্বারা দারুণ প্রহৃত হইয়াছিলেন। রাজদ্বারেও ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই। গোস্বামী প্রভুরাও উক্ত মহান্তের কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। তজ্জন্য বাবাজী ভয়ভীতচিত্তে এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন। যদি গোস্বামী প্রভুরা লোকজন দিয়া এই আশ্রম রক্ষার সাহায্য করিতেন তাহা হইলে বাবাজী আশ্রম ফেলিয়া কখনই পলায়ন করিতেন না। মহান্তের স্থান পরিত্যাগের পর এই আশ্রমের অবনতি ঘটে। আশ্রমস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলি বড় হইয়া উক্ত কূপকে সমাবৃত করে। উহাদের স্খলিত পত্র কূপের উপর পতিত হইয়া জলকে নিতান্ত দুর্গন্ধযুক্ত ও বিমলিন করিয়া একবারে পানের অযোগ্য করিয়া তোলে। উহার জলের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ যে উহাতে অবগাহন করা দূরে থাকুক স্পর্শ করিতেও ঘৃণাবোধ হয়। বহুকাল হইল কূপটির পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছিল। তজ্জন্য উহা আবার ভরাট হইয়াছে। উহার জল সর্ব্বদা বৃক্ষছায়াবৃত থাকায় রৌদ্র দ্বারা পরিশোধিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে ঐ স্থানের পূর্ব্ব সৌভাগ্য আনয়ন করিতে হইলে কূপটির পুনর্ব্বার পঙ্কোদ্ধার করাইতে হইবে। ঘাটটী পুনর্ব্বার ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দিতে হইবে। আর চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষাবলীকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে, এবং এক মহান্তদ্বারা পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে আশ্রম স্থাপন করাইতে হইবে। নতুবা ইহার উন্নতির আর কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মহান্তগণ দস্যুদ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব ও প্রহৃত হইয়াছিল বলিয়া অন্য কেহ ভয়ে উক্ত স্থানে আশ্রম স্থাপন করিতে সাহসী হইতেছে না। এজন্য গোস্বামী বংশধরগণকে মহান্তের সাহায্য করিতে হইবে। স্বর্গীয় মহাত্মা গোপীনাথ গোস্বামী ও স্বর্গীয় নবীন কিশোর গোস্বামীদের জীবিতাবস্থায় বীরচন্দ্রপুরের প্রত্যেক আশ্রমই শ্রীসম্পন্ন ছিল। তাঁহারা প্রত্যেক আশ্রমের মহান্তগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাঁহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় চিন্তা করিতেন। যদিচ সাংসারিক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল তথাপি এই সকল ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কখনই মতান্তর ও মনান্তর ছিল

না। এক্ষণে এই বংশে যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন তাঁহাদিগকে সেই পূর্ব্ব প্রদর্শিত পথে চালিত হওয়া উচিত, এবং বীরচন্দ্রপুরের সকল আশ্রমগুলির যাহাতে উন্নতি ঘটে তজ্জন্য প্রখর দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই তাঁহারা অচিরে যেন পূর্ব্বের মত একটি সেবাশ্রম এই হাটুগাড়া কুণ্ডের পূর্ব্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেখিলাম উক্ত স্থানে একটি পাকাঘরের বুনিয়াদ গঠনকরা হইয়াছিল। বোধ হয় কোন বাবাজি খুব উৎসাহের সহিত এই স্থানে আশ্রম স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহ প্রস্তুত হয় নাই। প্রস্তুতকালে বোধ হয় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় আর প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হন নাই। এই আশ্রমটি গ্রাম বীরচন্দ্রপুরের নিকটে নহে, অনেক দূরে। তজ্জন্য এখানে কেহ সাহস করিয়া আশ্রম স্থাপন করিতে অগ্রসর হইতেছে না। কিন্তু এই আশ্রমের অতি নিকটেই যখন সিদ্ধবকুলাশ্রম তখন এখানে কেহ বাস করিতে সাহসী হন না কেন? যাহা হউক গোস্বামী প্রভুরা যত্ন করিয়া শীঘ্রই এক সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেদের কলঙ্করাশি ভঞ্জন করিয়া ফেলুন। সেই বড়দিনের ছুটীর সময় কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত বন্ধুর সহিত এই স্থানে ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম এই আশ্রমের অনেক স্থানে কোন কোন কুলাঙ্গার মলত্যাগ করিয়াছে। কুক্কুরেরা তুলসীগাছে প্রস্রাব করিয়া থাকে উহার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র অবগত নহে। সেই সকল কুলাঙ্গারেরা নিতান্তই কুক্কুর প্রকৃতির, নতুবা এমন ঘৃণাজনক নরকের পথে অগ্রসর হইবে কেন? গোস্বামীদিগের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত তাঁহাদের আমলে এই স্বর্গভূমির কেমন শোচনীয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ইহার জন্য তাঁহারাই দায়ী। কোন ধনী বৈষ্ণব কি এই আশ্রমটী রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে পারেন না? আজ নিত্যানন্দ তাঁহার বংশবিশেষের সামগ্রী নহেন। আজ সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া তাঁহার হরি নামের প্রেমপতাকা ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে উড্ডীয়মান। ভাগীরথী বহিয়া তিনি যে জাহাজ ভরা হরিপ্রেম আনিয়াছিলেন তাহা আজও ফুরাইল না। তিনি যে গোলকধাম হইতে মর্ত্ত্যে হরিনাম আনিয়া জীবকে উদ্ধার করিয়াছেন জীবগণ চিরকালই উক্ত নামামৃতপানে ভবজ্বালায় মুক্তিলাভ করিবে, তাঁহার সেই হরিনামের ভাণ্ডার এখনও অফুরন্ত। ঐ শুন ভক্ত বৈষ্ণবগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গাহিতেছেন—"লওরে কিশোরীর প্রেম নিতাই ডাকে আয়।" বঙ্গের অভিনয় মঞ্চে মঞ্চে এখনও ধ্বনিত হইতেছে—"এমন মধুর হরিনাম নিতাই কোথা পেয়েছে, যে নাম একবার শুনে হৃদয় বীণে আপনি বেজে উঠেছে।" সুতরাং তাঁহার আনীত সেই নামসুধা চিরকালই পাপী তাপীর হৃদয়ে অমৃত ধারা সেচন করিবে। এখনও এই বঙ্গের ভিতর শত শত উপাসক সযত্নে স্বীয় স্বীয় হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার কমনীয় মূর্ত্তি খানিকে বসাইয়া প্রীতিসলিলে ভাবচন্দনে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। এখনও প্রত্যেক বৈষ্ণবের হৃদয়-তার ঐ নিত্যানন্দের প্রেমময় নামে একসুরে বাজিয়া উঠে। আমি তজ্জন্য সমস্ত ভক্তমণ্ডলী ও সমস্ত উপাসকগণকে আজ এই গভীর দুঃখের কথা শুনাইলাম। বীরচন্দ্রপুরের শুধু এ আশ্রম বলিয়া

নহে প্রত্যেক আশ্রমের এইরূপ চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। প্রভুর জন্মভূমি গর্ভবাসের দুর্দ্দশার বিষয় ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, আজ তদীয় একটি বাল্যাশ্রমের শোচনীয় দুর্দ্দশার বিষয় লিখিলাম। এখানে বঙ্গের সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উচিত হইয়াছে এই সমস্ত আশ্রমগুলি একবার পরিদর্শন করা। বীরভূম ও মুরশিদাবাদের অনেক বড় বড় ভূম্যধিকারী বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের এবিষয়ে চিন্তা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা সমস্ত বৈষ্ণব-সমাজের ভাবিবার গুরুতর বিষয় হইয়াছে। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বাল্যক্রীড়ার পবিত্র-স্থানগুলি যে সুন্দর স্মৃতিচিহ্নে পরিশোভিত ছিল যদৃচ্ছে শত শত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তিরাশিকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিত আহা আজ সেই সুপবিত্র ধামগুলি কালের মুখে যাইতে বসিয়াছে। সে গুলিকে রক্ষা না করিলে বৈষ্ণবধর্ম্মে ঘোরতর কলঙ্ক উপস্থিত হইবে। শুধু কলঙ্ক নয় সাংঘাতিক ক্ষতিও ঘটিবে। এই জন্য আমি আজ বিষাদমাখা প্রকৃত ঘটনা প্রচারে অগ্রসর হইলাম। শুধু ধর্ম্ম প্রচারে নয়, সমাজ-রক্ষা বিষয়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও তদীয় প্রচারকগণ সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। যে সময় ভারতবর্ষে এই নবধর্ম্ম প্রচারিত হয় সে সময় অনেক হিন্দুই মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছিল। যদি তাহাদের সম্মুখে এই নব ধর্ম্ম সংস্থাপিত না হইত তাহা হইলে অনেক হিন্দুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দেখা যাইত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করতঃ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছে।

এজন্য হিন্দুসমাজের উচিত উচ্চমনা প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণকে সমাজের উচ্চস্থানে স্থান প্রদান করা। এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিগুলিকে সংরক্ষণ করা। তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরও এবিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহাতে তীর্থকলঙ্ক দূরীভূত হয় তজ্জন্য সকলেরই সত্বর যত্ন চেষ্টা করা উচিত।

উপসংহারে বক্তব্য এই "হাটুগাড়া" আশ্রমটিকে পাকা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টন করিতে হইবে। কুণ্ডটির পঙ্কোদ্ধার করা অতিশয় প্রয়োজন। ঘাটটী ভাল করিয়া আবার বাঁধাইয়া দিতে হইবে। বড় বড় বৃক্ষাবলীকে কাটিয়া দিয়া কুণ্ডের জলের পরিষ্কৃততা রক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে এই আশ্রমে আবার এক নূতন মহান্ত বসাইয়া আবার একটি সেবাশ্রম খুলিতে হইবে।

শ্রীরামতারণ রায়।

উদাসীনের চিঠি

সম্পাদক ভায়া,

তোমার কাগজের নাম "গৃহস্থ"। আমি উদাসীন। উদাসীন মানুষের চিঠি তোমাদের কাগজে ছাপিবে কি না জানি না। তবে একলা বসিয়া মাঝে মাঝে গোটাকত কথা মনে উঠে। তোমরা হয়ত সে গুলিকে 'প্রলাপ' বলিয়া হাসিয়া উড়াইবে। হাসি কান্নায় আমার এখন আর বড় যায় আসে

না। সেদিন বহুকাল চলিয়া গিয়াছে। তোমাদের দশজন ব্যথার ব্যথী,—"আহা," "উহু" করিবার লোক আছে। আমারও একদিন ছিল। তখন লোকের চোখের জলে আকুল হইতাম, মানুষের বিদ্রূপ বুকে বাজিত, আদর ভালবাসায় প্রাণ গলিত। এখন প্রাণ পাষাণ হইয়া গিয়াছে। মানুষকে হাসিতে কাঁদিতে দেখিলে মনে হয় ও সব ছেলে-মানুষি। তাই তোমাদের উপহাস তাচ্ছিল্যের ভাবনা না ভাবিয়া এই কয় ছত্র "গৃহস্থে" ছাপিবার জন্য পাঠাইলাম। তুমি বলিতে পার "উদাসীনের" আবার ছাপার বাতিক কেন? পাঁচজনকে ডাকিয়া হাঁকিয়া শুনাইবার বাসনা এখনও গেল না? আমার একটা উত্তর আছে। আমি তোমাদেরই মত বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষার কোলে মানুষ (?) হইয়াছি। ছাপাখানার সঙ্গে চার বৎসর বয়স হইতেই পরিচয়। ছাপা কেতাবের মধ্য দিয়াই স্কুল, কলেজে, "প্রকৃতি," "দেশ," "সৃষ্টি," "ভগবান" প্রভৃতি সকলকেই আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ছাপাখানার সঙ্গে এতদিনের ঘনিষ্ঠতা ঘুচিয়া ফেলা যে অসম্ভব। যাহা হউক তুমি চিটিখানি ছাপিও।

আগে তোমাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। তোমাদের কাগজখানি আমি মাসে মাসে পড়ি। এটাও একটা ছাপাখানার বাতিক। কি জানি ছাপার অক্ষর দেখিলেই—কেমন মুখটা চুলকাইয়া উঠে। তোমরা দেখিতেছি একটা নূতন ছাঁদ সুরু করিয়াছ। তোমাদের বোধ হয় চালকাসান মনে ধরে না। কতক-গুলি দোহাই ঠিক করিয়া লইয়াছ। তোমা-দের কাগজখানি আষ্টে পৃষ্ঠে সেই দোহাই গুলিতে ভরা। তোমরা এ বিষয়ে বোধ হয় ষোল আনাই subjective; নিজের মনে যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই বলিয়া যাইতেছ। গ্রাহক ও পাঠক বলিয়া যে একটা মস্ত objective আছে, সে কথাটা ভুলিবার যোগাড় করিয়াছ। দেখিলে না "dawn" কাগজখানার পরিণাম? সম্পাদক-প্রবর মনগড়া ছাঁচে পত্রিকা চালাইতে গেলেন, দেশের লোক এক টাকা দাম দিয়াও কাগজ লইতে রাজি হইল না। তিনি কেবল 'ভারতমিত্র', 'ভারতীয় সমাজ,' 'ভারতীয় নৌবিদ্যা,' 'ভারতীয় শিক্ষা'তেই কাগজ ভরাইয়া বাঙ্গালী পাঠকের কাছে পাঠাইয়া দিতেন। পদ্মের চাষ চপ্, কাটলেট্, আর তাহাকে দেওয়া হইল কি না গব্য ঘৃত, হরিষাত্র! হরি! হরি! এমন করিয়া কি দোকানদারি চলে? আমি ত ভারতবর্ষময় ঘুরিয়া আসিয়াছি, কৈ এমন অদ্ভুত দোকানদার ত দেখি নাই। তোমার গৃহস্থও দেখিতেছি সেই চোরা বালিতে পা দিয়াছে। ভায়া! তোমরা তেমন পাকা লোক নও। একবার মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলাম। একজন লোক তার বাজারের কথা ভুলিয়া কেবল রথের বামন মূর্ত্তির দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে। জনস্রোত সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, তার কিন্তু হুঁস নাই। আমি অভ্যাসের দোষে বলিয়া ফেলিলাম, "তোমার কলা বিকাইবে না বাপু! এই বেলা কলা বেচিয়া লও।" সে পাঁচডাকের পর উত্তর করিল, "যাও মশাই! আমার কলা আমি বেচিব না।" জানি না তুমি আবার সেই গোঁয়ার গোবিন্দের মত উত্তর দিবে কি না। ভায়া, দেখিতেছ না সবাই অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছে। তোমার এ গুরুপাক জিনিষ কেন তাহাদের পেটে সহিবে? লোক চায় ফিন্‌ফিনে জামা গায় দিয়ে ফুলের হাওয়া খাইতে, তুমি বল কিনা 'চাষ কর,' 'ব্যবসা কর,' 'হাটে, মাঠে ঘোর' না! এমন অবুঝের কর্ম্ম নয় কাগজ চালান। আমরা চাই রাতারাতি বড়লোক হইতে, তোমার কাগজ মাসের পর মাস ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতেছে,"মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে শেখ," ধীর হও," "খাটিতে আরম্ভ কর।" না, আর কত বলিব? যদি তোমার চৈতন্য হইবার হয় ত, ইহাতেই হইবে। তোমার পাঁঠা তুমি ল্যাজেই কাট আর মুড়িতেই কাট, আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি? উদাসীনের এই নিঃস্বার্থ হিতোপদেশ না শোন, তোমাদেরই ধন স্থানে শনি। তুমি সগর্ব্বে ছাপিয়াছ, বুড়া অক্ষয় সরকার, প্রৌঢ় রামেন্দ্র ত্রিবেদী তোমার কাগজ পড়িয়া ভারি খুসি হইয়াছেন। ওসব কথায় কাণ দিও না, উঁহাদের ভীমরতি ধরিয়াছে। কোন লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিও,

দেশিতে পাইবে যুবক বাবাজীবনরা (যাঁহারা তোমাদের কাছে সমাজের আশা, দেশের ভরসা ইত্যাদি ইত্যাদি) 'রসের সার চুটকী' গল্প নাই বলিয়া তোমার কাগজের বড় একটা কদর করেন না। তাঁহারা মুখে বলিবেন, "বেশ কাগজ। খাসা কাগজ। স্বদেশ ও স্বজাতির কথায় ভরা।" কিন্তু ভায়া! জানিয়া রাখিও ইহাদের কাছে তোমার "গৃহস্থ" more admired than read! ইহার মূলকথা—আজকাল স্বদেশপ্রেমের অভিনয় না করিলে বড়ই বেমানান দেখায়। ছোকরা যুবক মহলে তাই তোমার ঘুরোখাতির।

এখন সাধারণ ভাবে আর একটা কথা বলি। তোমার কাগজে প্রায়ই লেখা থাকে,"ইহা করিতে হইবে," "উহা করা চাই," "একাজটি না করিলে চলিবে না" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ভায়া তোমরা একটা জিনিষ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ। মহাবীর নেপোলিয়ন বলিতেন, "ফরাসীর অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দ নাই।" আমাদের নব্য বাঙ্গালার অভিধানেও খুঁজিয়া দেখিও "কৃ" ধাতুটি পাইবে না। কর্ত্তাদের সংস্কৃত কোষে সেটি ছিল। তাহারা উভয়পদী "কৃ" ধাতুই ব্যবহার করিতেন। আমরা আমাদের সাহিত্যে যদিও কোথাও ইহার প্রয়োগ দেখি, সেটা সম্পূর্ণ পরস্মৈপদী—লোট্ বিভক্তি। একমাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষেই ইহার ব্যবহার। আমি ত কোথাও উত্তম পুরুষে ইহার প্রয়োগ দেখিলাম না। 'তুমি কর,' 'তাহারা করুক' দেখা যায় কিন্তু 'আমাদের করা যাউক' নব্য-জাগরণের সাহিত্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তুমি হয়ত ইহার উত্তরে বলিয়া ফেলিবে তুমি কয়জনকেই বা জান? রাম, শ্যাম,] যদু, মধুকে দেখিয়া সমস্ত জাতির সম্বন্ধে একটা ঝোঁটিয়ে মন্তব্য (sweeping generalisation) দেওয়া অনুচিত।" বহুৎ আচ্ছা। আমি তোমাদের ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়া জাতীয় দৃষ্টান্তই দিব। তাহা হইলে বোধ হয় তোমরা চটিবে না। আর যদিই বা চটিয়া যাও, আমার বড় বেশী ক্ষতি নাই। এখনও গাছতলা সম্বল, তখনও গাছতলা ঘুচাইতে পারিবে না।

আগে তোমাদের "জাতীয় ভাণ্ডারের" (National Fund) ব্যাপারটা ধর। সেই ৩০শে আশ্বিনের কথা মনে করিলে এখনও শরীরে রোমাঞ্চ হয়। সেদিন বঙ্গভূমি সত্য সত্যই তোমাদের কাছে মাতৃমূর্ত্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। তোমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের "বন্দেমাতরম" বাঙ্গালীর অবসন্ন হৃদয়ে আশার বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। উদাসীন আমি, নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল ভিখারী আমি, তোমাদের ঐশ্বর্য্যে তোমাদের আশায় একটা অক্ষয় সম্পদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। গাছতলা ছাড়িয়া তোমাদের পল্লীতে, সহরে সর্ব্বত্রই এই প্রাণের উচ্ছ্বাস, পৌরুষের পূজা দেখিয়া—বন্ধু হইবার জন্য ছুটিয়া বেড়াইয়াছিলাম তোমরা যে সেদিন ভ্রাতৃত্বের রাখীর বন্ধনবাঁধনে এই অভাগাকেও বাঁধিয়াছিলে! তোমাদের আশার নেশায় যে আমিও উন্মত্ত হইয়াছিলাম! যাক্ সেকথা। তোমরা "জাতীয় ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করিবে ঘোষণা করিলে। কোথা হইতে হাজার হাজার লোক ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া—টাকা দিতে জুটিল। তোমরা—সেদিন টাকা কুড়াইয়া উঠিতে পার নাই। তারপর—আজ ১০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, সেই আগ্রহের দান, উচ্ছ্বসিত প্রেমের অর্ঘ্য একটা বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তোমাদের জাতীয় জীবনের ইহা মস্ত অপবাদ; তোমরা সেই অর্থ খরচ করিবে কি করিয়া, বাঙ্গালী জাতির কোন্ কাজে তাহা সার্থক করিবে, সে ভাবনা কাহারও নাই। এই দেখ "কৃ"-ধাতুর প্রথম দফা।

তারপর তোমাদের "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্"। "জাতীয় প্রথায়, জাতীয় আদর্শে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হইবে," "মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান না করিলে চলিবে না" এইরূপ রবে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মাতাইয়া তুলিয়াছিলে। আমি গাছতলায় বসিয়া তাহার প্রতিধ্বনি শুনিতাম, আর ভাবিতাম এবার একটা কিছু যথার্থ জিনিষ সত্যসত্যই গড়িয়া উঠিবে। তোমাদের ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, কাঁসর যেমনই একটা নূতন সুর জুড়িয়া দিল। হুড়্ হুড়্ করিয়া

টাকা জুটিতে লাগিল। মহা উৎসাহে "জাতীয় শিক্ষাপরিষদের" প্রতিষ্ঠা হইল। ও হরি! এখন গিয়া দেখ, শূন্য বেঞ্চের সামনে দাঁড়াইয়া তবল এম্. এ. তিনটা-এম্. এ, রায় চাঁদ প্রেমচাঁদ পাশকরা, হার্ভার্ডের এ বি, বি এ মাষ্টার মহাশয়রা আকাশের বিচিত্র শোভা দেখিয়া আত্মহারা হইতেছেন। এখন তাড়াটিয়া বাড়ী আর—আধ পেটা ভোজী মাষ্টারের দল বোধ হয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের মহানির্ব্বাণের পথে দুইটী অন্তরায়। নেতারা চেলারা সবাই এখন ভাল মানুষের মত নিজ নিজ কাজে মন দিয়াছেন। দেশে বিদ্যার বান ডাকিয়াছে, প্রাথমিক-শিক্ষা, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা, জাতীয় আদর্শে শিক্ষা, বৈষয়িক (technical) শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি! এই তোমাদের "কৃ" ধাতুর দ্বিতীয় ধক্কা।

তারপর তোমাদের "বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল।" স্বদেশীর পুরা জোয়ারে ও চড়ায় আটকাইয়া গেল। বৌথকারবারের কথা মুখে আনিলেই লোকে বলে, "বঙ্গলক্ষ্মীর শেয়ার ঘরে পোকায় কাটিতেছে।" এই দেখিয়া লও "কৃ"-ধাতুর তৃতীয় ধক্কা।

আর একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। কারণ বেশী বাড়াবাড়ি করিলে গাছতলাতেও তোমরা লাঠি লইয়া তাড়া করিবে। কয়েক বৎসর ধরিয়া তোমাদের 'সাহিত্য পরিষদ', 'সাহিত্য সম্মিলন' বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ধুয়া তুলিয়াছেন। একবার এই উদ্দেশ্যে একটী কমিটীর সদস্যের লম্বা তালিকা কাগজে দেখিয়া ছিলাম। রামেন্দ্রসুন্দর কলিকাতার অধিবেশনে তাঁহার আহত স্নায়ুগুচ্ছকে ব্যস্ত করিয়া পারিভাষিক শব্দ রচনা ও বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য খানিকটা চেঁচাইলেন। দেশের ঘরে ঘরে লোক এখন পারিভাষিক শব্দে পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য বোধ হয় কমিটি—কোথাও হইতে সস্তায় খাঁটি তেজাল শূন্য সর্ষপ তৈল কিনিয়া—নাসারন্ধ্রে প্রয়োগ করিয়া নিদ্রার (মহানিদ্রার ?) আয়োজন করিয়াছেন।

আর কাজ নাই। এই খানেই ইতি করিলাম। তুমি চিঠি খানি মনোযোগ দিয়া পড়িও, তারপর তোমার কাগজের এক কোণে ছাপিয়া দিও। ইতি

শ্রীউদাসীন।

মফঃস্বলের বাণী

১। স্বদেশীর পতনের হেতু কি ?

মূল জিনিষ পাওয়ার অসুবিধা, কর্ম্মঠ ও নিপুণ কর্ম্মচারীর অভাব ও অর্থ ব্যবহারে অনভিজ্ঞতাই কোন কোন স্থলে স্বদেশীর পতনের সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু ইহার পতনের প্রধান কারণ দুইটী—(১) মূল ধনের অভাব, (২) কার্য্য পরিচালনে অপরিপক্কতা। এই সকল কোম্পানীর উদ্যোক্তৃবৃন্দ অভিজ্ঞতার অভাবে, ব্যবসায়ে কি পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হইবে তাহা স্থির করিতে না পারায়, অপ্রচুর মূলধনের সাহায্যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অনেক স্থলেই বিপন্ন হইয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক স্থলেই প্রাপ্ত মূলধন প্রয়োজনীয় মূলধন অপেক্ষা অনেক কম পড়িয়াছে। কিন্তু কাজ আরম্ভ হইলেই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইবে এই ভরসায় কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে একটী কোম্পানীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ঐ কোম্পানী ৪০০০০০ টাকা মূলধন নিয়া গঠিত হয়; তন্মধ্যে ৮৫০০০ টাকার অংশ বিক্রীত হয় এবং মাত্র ৬৫০০০ টাকা পাওয়া যায়। যাহা হউক এই টাকা দিয়াই যন্ত্রাদি করিয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। সত্বরই দেখা গেল যে, অধিক হারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং কোম্পানীর পক্ষে লাভ করা অসম্ভব হইল, এবং জনসাধারণও আর ঐ কোম্পানীর অংশ

খরিদ করিল না। কাজেই প্রথম হইতেই এই ব্যবসায়ে বিস্তর বাধা উপস্থিত হইল এবং কোম্পানীও ঋণমুক্ত হইতে পারিলেন না। আর একটী কোম্পানী ২০০০০০ টাকা মূলধনে গঠিত হয় এবং তন্মধ্যে ৯০০০০ টাকা পাওয়া যায়; এই টাকা দ্বারা যন্ত্রাদি খরিদ করত কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখা গেল যে, সংগৃহীত অর্থ কলের ব্যবহার্য্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদ করার পক্ষেই সম্পূর্ণ অপ্রচুর।

মূলধনের অভাব

ভারতীয় মূলধনে ও ভারতবাসীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ব্যবসায়ে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন; কারণ ব্যাঙ্ক তাহাদিগকে টাকা ধার দিতে এবং যে সকল কোম্পানী যন্ত্র ও জিনিষ প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহারা তাহাদিগকে ধারে জিনিষ বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া থাকে। কোন কোম্পানীকে যদি নগদ মূল্যে জিনিষ খরিদ করিয়া ধারে বিক্রয় করিতে হয়, তবে তাহার যথেষ্ট মূলধন থাকা আবশ্যক ব্যাঙ্ক হইতে টাকা নেওয়ার সুবিধা না থাকা ব্যবসায় পরিচালনের অন্তরায় বলিয়া অনেকে আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

ভবিষ্যতে সত্বর ভারতীয় মূলধন যে কোনও শিল্প কি ব্যবসায়ে নিয়োজিত হইবে বর্ত্তমানে তাহার কোনও চিহ্ন দেখা যায় না। ইংলণ্ডে যেমন মধ্যশ্রেণীর লোকের ঘরে অর্থ আছে, এদেশে সেরূপ নাই। মারোয়াড়ী ব্যতীত এ দেশের ধন অনেক স্থলেই ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীগণের হাতে ন্যস্ত; তাহারা ভূমি খরিদ করা কিম্বা টাকা ধার দেওয়াই লাভজনক মনে করে। ভূমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিলে নির্ব্বিবাদে শতকরা ৬৲ টাকা হারে সুদ পাওয়া যায়, কিন্তু ধনী যদি একটু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হ'ন, তাহা হইলে তিনি ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে লাভবান হইতে পারেন। অনেক স্থলেই তাহারা ব্যবসায়ে টাকা নিয়োজিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন; কারণ ব্যবসায়ের সফলতা অনিশ্চিত এবং তাহা হইতেও শতকরা ৬৲ টাকার বেশী লাভ করার আশা করা যায় না। এই সকল কোম্পানীর নিরাশাব্যঞ্জক বিবরণ তাহার আশঙ্কা আরও দৃঢ় করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত ব্যক্তিগত ব্যবসায় বা অন্য উপায়ে পরিচালিত নূতন ব্যবসায় লাভজনক হওয়ার কথা প্রতিপন্ন করা না যাইবে, ততদিন বঙ্গের মূলধন শিল্পের দিকে নিয়োজিত হইবে না।

কার্য্যপরিচালনে অভিজ্ঞতার অভাব

অভিজ্ঞতার অভাব যে অনেক স্থলে স্বদেশীর পতনের নিদানস্বরূপ, তৎসম্বন্ধে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। ঐ সকল ব্যবসা যে বাঙ্গালীর মূলধনে ও বাঙ্গালীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। শিল্পসংক্রান্ত ব্যবসায়ের পরিচালক হইবার উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বঙ্গদেশে অল্প কয়েকজনই আছেন। অধিকাংশ স্থলেই আইন ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের মধ্য হইতে তত্ত্বাবধায়ক নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। তাঁহারা খুব ক্ষমতাশালী লোক ও নিজ নিজ ব্যবসায়ে বিশেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ; কিন্তু শিল্প-ব্যবসায়ে এবং অর্থ নিয়োগে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ তাঁহাদের আদৌ ঘটে নাই। শিল্প বহুল দেশে কোন ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে সেই ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ লোকই অনেক থাকে। বঙ্গদেশে ঐরূপ লোক পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সকল কোম্পানীর পরিচালকেরা বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ পাইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই কারণে অনেক স্থলে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। একটী কোম্পানী কতকগুলি যন্ত্র খরিদ করিয়াছিল, পরে ঐ যন্ত্রগুলি ব্যবহারের অনুপযোগী প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া কঠিন। ব্যবসা ও বাণিজ্য শিক্ষার জন্য যে সকল যুবক গত কয়েক বৎসর যাবত আমেরিকা, ইউরোপ এবং জাপানে প্রেরিত হইয়াছিল, ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাচনের ইচ্ছা তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে অনেকেই উত্তম উত্তম প্রশংসাপত্র সহ এবং ব্যবসা সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ উপাধি গ্রহণ করতঃ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহারা

ব্যবসা পরিচালনের কার্য্যে কোনও শিক্ষা পায় নাই। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে, তাহারা কার্য্যদক্ষ লোক হইত এবং কয়েক বৎসর কার্য্যের পর সম্ভবতঃ পরিচালকের কার্য্যে সিদ্ধহস্ত হইতে পারিত। কিন্তু কিরূপে উচ্চ লাভে ক্রয়বিক্রয় করিতে হয়, অথবা কিরূপে কার্য্য চালাইতে হয়, তাহার কোন শিক্ষা না পাওয়ায়, নূতন ব্যবসা ও বাণিজ্য করিতে ও তাহা পরিচালনে সক্ষম হয় নাই এবং সেজন্য তাহারা প্রায় সকল কার্য্যেই বিফল মনোরথ হইয়াছে।

যুদ্ধের ফল

যখন ইউরোপে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন স্বদেশীয় শিল্পের দ্রুত উন্নতির পথ প্রসারিত হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কোন কোন স্থলে এপ্রদেশ হইতে মূল জিনিষ ইউরোপে রপ্তানী হয় এবং সেখানে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; আবার কোন কোন স্থলে যদিও মূল পদার্থ এখানে পাওয়া যায়, তথাপি তৈয়ারী জিনিষ ইউরোপ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে। এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে চামড়া জার্ম্মেণীতে রপ্তানী করা হয় এবং সেখানে উহা কশান হয়। এদেশে রাসায়ণিক দ্রব্য প্রস্তুতের বিস্তর মৌলিক পদার্থ থাকা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর ইউরোপ হইতে প্রচুর রাসায়ণিক পদার্থ এদেশে আমদানী করা হয়। যদি চামড়া, রাসায়ণিক দ্রব্য, কাচের বাসন, দেশলাই ও পেন্সিল এদেশে প্রস্তুত করা হইত, তবে নিশ্চয়ই উহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইত।

যুদ্ধে যেমন সুবিধা হইয়াছে তেমন অসুবিধাও ঘটিয়াছে। ধনীর মনে সর্ব্বদাই অশান্তি ও অনিশ্চয়তার ভাব আগ্রত হওয়ায়, সে সর্ব্বদাই আপনার অর্থ নিজ হস্তে রাখিতে আশঙ্কা বোধ করিতেছে। সুতরাং ইহা কোন বর্ত্তমান ব্যবসায়ের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। প্রথম তিন মাস পাটের ব্যবসায় একরূপ বন্ধ ছিল। রায়তগণ পাট বিক্রয় করিতে পারে নাই, সুতরাং অন্য জিনিষ খরিদ করিতেও পারে নাই, কাজেই পূর্ব্ববঙ্গে সূত্রশিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কোনও বেশম ব্যবসায়ী আমাকে বলিয়াছেন যে, এবার পূজার সময় তাহার অন্যান্য বৎসরের ১/৮ অংশ বিক্রয় হইয়াছে। বৈদেশিক জিনিষ আমদানী না হওয়ায় কোন কোন শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন কারবার এই সুযোগে বেশ লাভবান হইয়াছে বটে; কিন্তু দেশে কোনও নূতন শিল্পের সূচনা করা হয় নাই।

ঢাকাপ্রকাশ।

২। ক্ষুদ্রের মহত্ত্ব

মনুষ্যের শক্তি-পরীক্ষার প্রকৃষ্টস্থান কর্ম্মক্ষেত্র। কখনও জলে না নামিয়া যেরূপ সাঁতার দিতে শিক্ষা করা যায় না, কদাচ কর্ম্ম না করিলেও তদ্রূপ কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে কি না তাহা বুঝা যায় না। আবার ক্ষুদ্রের অবহেলা করিলে, ক্ষুদ্রত্বকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে মহত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব; তাহার তাহাতে মান হানিই হইয়া থাকে। ছোট বলিয়া অনেক কাজ আমরা অবহেলা করি, তাহা করিয়া আমাদের সময় নষ্ট করা অনুচিত বিবেচনা করি কিন্তু তাহার একমাত্র ফল এই হয় যে বৃহৎ কোন একটা কার্য্যের ভার যখন আমাদের স্কন্ধে পড়ে, তখন কর্ম্ম-অপটুতা এবং অনভ্যস্ততা শত মূর্ত্তিতে আসিয়া সহস্র প্রকার জটিলতা পাকাইয়া তোলে; এবং সেই জটিলতা খুলিতেই আমাদের উদ্যমের অর্দ্ধাংশ ব্যয়িত হইয়া যায়;—যে অপরার্দ্ধ তাহার বাকী থাকে, তাহাও ঐ একই কারণে সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে আমরা সমর্থ হই না।

বাঙ্গালী যে আজ এত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের কর্ম্মপরাঙ্মুখতা তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ক্ষুদ্রকে আমরা ঘৃণা করি, বৃহৎকে ধরিতে আমাদের সামর্থ্যে কুলায় না,—লাভের মধ্যে এই হয় যে আমরা দুইই হারাই। প্রায়ই আমরা ভুলিয়া যাই যে জগতে তাবৎ বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান নিচয়ের প্রারম্ভে ক্ষুদ্রত্বের কতখানি দাবী আছে। ভবিষ্যতে দশজনের উপকার করিবেন ভাবিয়া অনেকেই অন্য একজনের উপকার করিতে চাহেন না; ভবিষ্যতে একশত

লোকের অন্ন সংস্থাপন করিয়া দিবেন বলিয়া আর একজন নিরন্নের আহার যোগান হেয় বিবেচনা করিয়া তাহা তুচ্ছতাচ্ছীল্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না।

কথাটা নিতান্ত চাঞ্চল্যোদ্দীপক বলিয়া ঠেকিতে পারে, কিন্তু জগতে সত্যের চাইতে অদ্ভুত জিনিষ নাই। ক্ষুদ্রত্বের প্রতি এই যে একটা অসম্মান এবং বৃহত্বের প্রতি এই যে একটা কৃত্রিম সম্মান—ইহা হইতেই আমাদের অনেকখানি অধঃপতন হইয়াছে চক্ষুষ্মান, মাত্রেই দেখিয়া লজ্জিত হয়েন যে আমরা কি পরিমাণ শক্তি লইয়া জগতে আসি, এবং তাহার কত তুচ্ছাংশ দলের ও দেশের উপকারে নিয়োজিত করিয়া থাকি। শক্তির অপব্যবহার আমাদের দেশে যেরূপ সুলভ, অন্যত্র সেরূপ নহে।

অবসর কাটাইবার যে সহজ এবং সাধারণ রীতি আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে তাহা প্রকাশ করিলে যদি আমাদের কিছু বাড়ে, তবে তাহা লজ্জা, গৌরব নহে। অবসর প্রাপ্ত চারিজন লোক একত্র হইলে আর রক্ষা নাই। তাসের চটাচট্ শব্দে, পাশার দানের অপূর্ব্ব হাঁকডাকে গৃহের সকলের এবং প্রতিবাসীদিগের কাণ ঝালা পালা হইবে; আর তামাকের শ্রাদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পরকুৎসা এবং পরচর্চ্চার মজলিস বেস জাঁকিয়া উঠিবে। বাধার ত কথাই নাই। সময়কে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে যাঁহারা জবাই করেন, তাঁহারা কবাই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে স্ব-বৃত্তিতে স্বীয় পরিজনগণের উন্নতি করিতে পারিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য আর যাহাই কিছু তাঁহাদের মুখে সাজুক, 'স্বায়ত্তশাসন' 'স্বরাজ' প্রভৃতি বড় বড় কথা সে সকল মুখে যে আদপেই মানায় না তাহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। সময় আমাদের কিনিতে হয় না; সুতরাং এ জগতে তাহার অপব্যবহারের জন্য কাহারো নিকট কৈফিয়ৎ দিবার ততটা আবশ্যকতা নাই, কিন্তু শক্তি আমাদের যতটুকু আছে, তাহার উপর কেবল যে আমাদেরই দাবী, তাহা নহে; আমাদের শক্তির সাহায্যে যাহাদের উপকারের বিশেষ সম্ভাবনা, আমাদের শক্তির উপরে তাহাদেরও দাবী নিতান্ত কম নহে।

তাই যখন দেখি, সময়ের অপব্যবহারের সহিত টেক্কা দিয়া শক্তির অপব্যবহার পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, তখন আমাদের জাতির দায়িত্বজ্ঞানের উপর অনেকটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়। বাক্ সর্ব্বস্বদিগকে এখন যদি বনে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে কতিপয় মন্দভাষী কর্ম্মী মাত্রকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দেশের কার্য্য অনেকখানি অগ্রসর হয় বলিয়া আমাদের পরিষ্কার ধারণা আছে।

তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসিয়া ধূমপানের সহিত দেশোন্নতির জন্য নানাবিধ গবেষণা করিবার দিন আর আমাদের নাই; অথবা বিদেশীমতে চা-পান করিতে করিতে কুব হল ঘরের চেয়ারগুলিতে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত উপবেশন করিয়া স্বদেশী সম্বন্ধে discussion করিলেও আমাদের স্বদেশহিতৈষণা কার্য্যকরী হইবে না। আজ আমাদের চাই প্রকৃত কার্য্য সাধন। বক্তৃতার দিন চলিয়া গিয়াছে, গবেষণা ও গবেষকদিগের রাজ্য এবং রাজত্বকাল ফুরাইয়া গিয়াছে—আসিয়াছে এখন প্রকৃত কার্য্য করিবার দিন। কার্য্য ছোট হউক বা বড় হউক, তাহাতে দেশের উপকারের আশা থাকিলে, তাহা আমাদের করিতেই হইবে,—আমরা ছোট হই, বা বড় হই, আমাদের প্রত্যেকেরই শক্তির কতকাংশ দেশকে দিতে হইবেই। এইরূপ একটা ভীষণ পণ না করিলে ঠিকভাবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে নামা হইবে না।

তাহার পরে চাই ত্যাগ। আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। তাস পাশা খেলিয়া যে আমোদটুকু আমরা আজ পাই, দেশের ও দলের মুখ চাহিয়া তাহা আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, পরচর্চ্চার যে সুখ, তাহা পরোপকারের দ্বারে বিলাইয়া দিতে হইবে; বন্ধুবর্গের সহিত রহস্যালাপ বা দিবানিদ্রায় আমোদ স্ফূর্ত্তি আমো আমাদিগকে আজ জোর করিয়াও ছাড়িতে

হইবে। ইহা ছাড়া আমাদের শক্তির যতটুকু আমরা পারি দেশের হিতকল্পে তাহা নিযুক্ত করিতে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বীকৃত হইতে হইবে। এই ত্যাগটুকু করিতে স্বীকার করিলে, আমাদের মধ্যে কর্ম্মীর অভাব হইবে না। আমাদের প্রত্যেকের অবসর কালের যে অমূল্য মুহূর্ত্তগুলি আজ আমরা আলস্যভাবে অপকর্ম্মের স্রোতে ভাসাইয়া দিতেছি, সেইগুলি দিয়াই আমরা অনেক কার্য্য করিতে পারিব, আমাদের সময় এবং শক্তির স্বল্পাংশ মাত্র এবিষয়ে দান করিলে আমাদের দেশের কত শত নিরক্ষর ছেলে-মেয়ে যে অন্ততঃ লিখিতে ও পড়িতে শিখে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমরা ভাবুক নই, আমরা জাগিয়া স্বপ্ন দেখি না, তথাপি বেশ বুঝিতে পারি; যে এইরূপ হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

"ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না।" এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন, তবে আমরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিব না। উপরে যে উপায়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আমরা প্রস্তাব করিলাম, তাহা নিতান্ত সরল এবং অল্পায়াস সাধ্য, যাঁহারই হৃদয়ে স্বদেশ-হিতৈষণার কণা মাত্র বিদ্যমান আছে, তিনিই দেখিবেন আমাদের কথা কতদূর সত্য।

ইহা নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা কার্য্যকারী শক্তির অভাবের দোহাই দিয়া কোনও বাক্‌সর্ব্বস্ব আর স্বদেশ-হিতৈষী সাজিয়া জনসাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।

মানভূম।

রাজসাহী নৈশ বিদ্যালয়

কোন প্রতিভাবান লেখক বলিয়াছেন—"যদি দেশের কোন কাজ থাকে ত তাহা ইতর সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে লেখা পড়া শিখিয়ে দাও,—তারা নিজের ভাবনা আপনি ভাববে।" কথাটা বড় সত্য এবং ইহারই ভিতরে কত জীবনের উপলব্ধ সত্যের সমাবেশ আছে। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা নিজের অভাব বুঝিতে পারিয়া সে অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু যাহারা মূর্খ সে অভাব ধরিতে জানে না, আর যাহারা অভাব বুঝিতে পারে না তাহারা উন্নতি করিবে কেমন করিয়া?

ইউরোপীয় কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন—সভ্য হইতে হইলে অভাবের আধিক্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে দেশের পনেরো আনা লোক অশিক্ষিত, তাহারা সভ্যতার বড়াই করে কোন্ মুখে?—আর তাহাদের অভাবের আধিক্যই বা কোথায়? তোমাদের রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইতে পারেন, তোমাদের জগদীশচন্দ্র জগতপূজ্য হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারাই কি তোমাদের দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি?—তাঁহারাই কি তোমাদের দেশ?—চার কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে তাঁহারা কয়জন?—চারকোটী বঙ্গভাষা ভাষীর মধ্যে কয়জন ব্যক্তি শিক্ষিত? ওগো! যাদের লইয়া তোমাদের গ্রাম, তোমাদের দেশ, যাহাদের লইয়াই তোমাদের গর্ব্ব, তোমাদের হর্ষ, যাহাদের দিয়াই তোমাদের অর্থ, তোমাদের মান্য, একবার তাকাইয়া দেখিয়াছ কি তারা থাকিতেও তারা ভাষামূক, চক্ষু থাকিতেও তাহারা অন্ধ?

হে রাজসাহীবাসী ভদ্রমণ্ডলি! তোমাদের আশুকুলো স্থানীয় সহরে দরিদ্রকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য সহরের গরীব বালকগণকে মানুষ করিবার জন্য চার বৎসর হইল কলেজিয়েট স্কুল গৃহে একটা নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে স্কুল বাঁচাইয়া রাখিবার ভার তোমরা না লইলে আর কে লইবে? তাহাকে উন্নীত করিয়া তুলিবার চেষ্টা তোমরা না করিলে আর কে করিবে? শিক্ষা বিস্তারের জন্য তোমরা অনেক করিয়াছ, অনেক করিতেছ; কিন্তু তোমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ইহাই যথেষ্ট নয়। এ জেলার কলেজ, স্কুল, পাঠশালা—এ সবই তোমাদের কীর্ত্তি। কিন্তু যাহারা দিনের বেলায় খাটিয়া খায় লেখাপড়া করিবার অবসর

মাত্র পায় না, আর যাহারা পয়সা খরচ করিয়া পড়িতে পারে না তাহাদিগের দিকেও একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে স্থানীয় নৈশ বিদ্যালয়ের উন্নতি-বিধান অন্ততঃ এই কাজ অনতি বিলম্বে প্রয়োজনীয় কি না।

কোন কাজ করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন, এক মানুষ, দ্বিতীয় টাকা। এই সহরে কর্ম্মীর অভাব হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যাঁহারা এবার ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট বা বিএ পরীক্ষা দিয়াছেন এরূপ ছাত্র সংখ্যা কম নহে। তাঁহারা মনে করিলে সারা দিনটা ঘুমাইয়া, নভেল পড়িয়া না কাটাইয়া এ কার্য্যের বেশ সুবন্দোবস্ত করিতে পারেন। আর যাঁহারা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছেন তাঁহারাও যে পড়াশুনা করিয়াও এ কার্য্যের জন্য কিছু করিতে পারেন তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস প্রত্যেক সহরে দুইজন করিয়া কর্ম্মী পাওয়া গেলেই একটী নৈশ বিদ্যালয় বেশ স্থাপন করা যাইতে পারে। তারপর টাকার কথা তেমন কর্ম্মী থাকিলে টাকা জুটিবেই জুটিবে। জমিদার, ব্যবসাদার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, অধ্যাপক, শিক্ষক কেহই বোধ হয় এ কার্য্যের অন্তরায় হইবেন না—কারণ মানবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে শিক্ষা তাহার বিরুদ্ধে ভদ্রসন্তান দাঁড়াইতেই পারেন না। তবে তাঁহাদের অনেকেই নিজের কাজ করিয়া অবসর পান না বলিয়া স্কুল সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ তেমন যত্ন লইতে পারেন না। স্কুলের খরচ বাবদ মাসিক বা বাৎসরিক চাঁদা তুলিতে হইবে, কারণ হাওয়ার উপর স্কুলের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। মুষ্টিভিক্ষাই অর্থাগমের প্রধান উপায়। তবে যথারীতি উহা আদায় করা যাইতে পারে কি না, সে বিষয় বিশেষ চিন্তা করিয়া সেপ্রথা স্থাপন করা উচিত। আর ভগবানের আশীর্ব্বাদে যদি কোন ভদ্রলোক নিজে শিক্ষকতা করিতে স্বীকৃত হন তবে টাকার প্রশ্ন অনেকটা সহজ হইয়া আসে। এখনকার দিনে এরূপ সহৃদয় মহোদয় পাওয়া একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

রাজসাহী করোনেশন নাইট স্কুলে সর্ব্বপ্রথমে একজন মুসলমান ভদ্রলোক বিনা বেতনে শিক্ষকতা করিতেন। তার পর টাকা পয়সার সুবিধা ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় দুইজন বেতনভোগী শিক্ষক রাখা হইয়াছে। একত্রে দুই জনের বেতন মাসিক ১৬৲ টাকা। বাতির তৈলের মূল্যও মাসে ১৲ টাকার উপরে পড়ে। ইহার উপরে নিতান্ত গরীব লোকের ছেলেদের পুথি, পেন্সিল ও বৎসর শেষে প্রাইজের পুস্তকগুলির দামও নেহাৎ কম নয়। এদিকে স্থায়ী মাসিক আয় কিন্তু তেমন নয়। রাজসাহী করোনেশন ডাণ্ড হইতে প্রাপ্ত যে দুই হাজার টাকা রাজসাহী ব্যাঙ্কে জমা আছে তাহার সুদ মাসিক ৮৸০ ও প্রতি প্রভিন্সিয়াল ডাণ্ড হইতে প্রাপ্ত মাসিক ২৲ টাকা সর্ব্বসাকুল্যে এই ১০৸০ টাকা মাত্র স্কুলটির স্থায়ী মাসিক আয়। তাই প্রত্যেক মাসেই স্কুলের সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্ম্মীগণকে টাকার জন্য বড়ই বেগ পাইতে হয়। স্কুল কমিটী এজন্য স্থানীয় ভদ্রগণের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করিতেছেন। আশা করি তাঁহারাও ইহাদিগকে নিরাশ করিবেন না। স্কুল কমিটী যে ব্যর্থপ্রয়াস হইবেন না তাহার চিহ্ন পূর্ব্ব হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। স্কুলের পুরস্কার বিতরণের জন্য শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের সভাপতিত্বে মরিশন হলে যে সভা হয়, তাহাতে মিউনিসিপালিটির ভাঁইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী এবং স্থানীয় জমিদারদ্বয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বাগ্‌চী ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রসুন্দর মজুমদার প্রত্যেকে দশ টাকা এবং আরও তিন জন ভদ্রলোক ৩২৲ টাকা এককালীন চাঁদা দিয়াছেন। অবসর প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী ওয়াজীউদ্দিন সাহেব যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। আশা করি সমস্ত জেলার লোকই এই মহৎ কার্য্যের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন।

হিন্দুরঞ্জিকা।

৪। শিশু-শিক্ষা

প্রবন্ধের নামকরণ দেখিয়া পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা শিশুশিক্ষা নামক গ্রন্থ বিশেষেরই আলোচনা বা সমালোচনা করিতে বসিয়াছি। বস্তুতঃ আমাদের বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান শিশু-শিক্ষা সমস্যার কথাঞ্চিৎ আলোচনা এবং উহার সমাধান-চেষ্টা।

আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল শিশুগণের শিক্ষাসমস্যা দিন দিনই বেশ জটিল হইতে জটিলতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই শিশু-শিক্ষা সমস্যার সমাধান করে আমাদের আর অমনোযোগী থাকিলে চলিবে না। আমাদের সুকুমার শিশুগণের কোমল মস্তিষ্কের উপর আজকাল রাশি রাশি গ্রন্থের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে বটে কিন্তু তাহাতে তাহাদের উপকার না হইয়া বরং অপকারই বেশী হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় সেইরূপ তীক্ষ্ণ মেধাবী ও প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ শিশুগণের মধ্য হইতে যেন আর বড় বাহির হইতেছে না। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, হেমচন্দ্র, নবীন প্রভৃতি অসীম প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমকক্ষ একটি লোকও ত আর এদেশে জন্মগ্রহণ করিতেছে না। অতীতের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম বর্ত্তমানযুগের ন্যায় আশুতোষের ন্যায় অসাধারণ মেধাসম্পন্ন পুরুষও সমগ্র দেশ খুঁজিলে আর একটি মিলে না। এইরূপ অবস্থার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার দিন আসিয়াছে। আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। শিশু-শিক্ষার প্রতি উদাসীন হইয়াই বঙ্গসমাজের আজ এই শোচনীয় অবস্থা। Child is the father of Man—শিশুই মানবজাতির পিতা বা ভাগ্যবিধাতা। সকল জাতির ভবিষ্যতের ভরসাই শিশুগণ। কেননা শিশুরা ত চিরকাল শিশু থাকিবে না, বড় হইয়া তাহারাই সমাজের নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা হইয়া নানারূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজ ও ভীষণ অন্নসমস্যার সমাধান করিবে। সুতরাং শিশুগণের শিক্ষা বিষয়ে আমাদের আর অমনোযোগী থাকা শোভা পায় না। শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া এবং গৃহশিক্ষক রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেই চলিবে না। প্রত্যেক পিতা মাতা ও অভিভাবকগণকে নিজে প্রস্তুত হইয়া আজ স্বহস্তে শিশুগণের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। শিশুগণকে যথার্থ মানুষে পরিণত করিতে হইলে তাহাদিগকে দিয়া কেবল পাঠ্যের বোঝা বহন করাইলেই চলিবে না। কোন্ পাঠে কি বস্তু আছে তাহার প্রকৃত স্বাদ আজ তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। পাঠ্যের বোঝাও কমাইয়া দিতে হইবে। পাঠ্যের বোঝায় বিব্রত হইয়া পড়ায় শিশুরা পাঠ্যের রসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। পাঠ্যের নামে কত অপাঠ্য যে আজ শিশুগণের মস্তক চর্ব্বণ করিতেছে তাহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। ছেলেদের জন্য নিত্য নূতন পাঠ্য বই বাহির হইতেছে, অথচ তাহাদের নিত্য নূতন জ্ঞানোদয় হইতেছে না। শিশুশিক্ষা, বোধোদয়, বালাশিক্ষা, পদ্যমালা, কোমল কবিতা, কথামালা, হিতোপদেশ প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থের একখানা মাত্র পাঠ করিলে পূর্ব্বে শিশুদের যে জ্ঞানোদয় হইত আজ ১৫।২০ খানা নূতন শিশুপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়াও সেইরূপ জ্ঞানোদয় হয় না। কত কিম্ভূতকিমাকার অপাঠ্য কুপাঠ্য যে আজ শিশুপাঠ্যরূপে সুকুমার শিশুগণের আস্বাদন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

এদেশে কথাসাহিত্যে এক সময় অতি সুন্দররূপে শিশুশিক্ষা হইত। আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যও এক সময় কথাসাহিত্যে ভরপুর ছিল, আজও যে নাই তাহা নহে, কিন্তু শিশুসাহিত্যে তাহার ঠাঁই যেন কম। আমাদের কথাসাহিত্যের রাজা ছিলেন বিষ্ণুশর্ম্মা। ইতর জন্তুর মুখে নানারূপ দুর্লভ বচন সকলের সমাবেশ করিয়া তিনি কেবল যে শিশুগণেরই সুশিক্ষা এবং চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, যুবক বৃদ্ধগণেরও নৈতিক দৈন্য পূরণের পথ করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়,—দীর্ঘশ্মশ্রু ধর্ম্মাচার্য্যগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা, বিষ্ণুশর্ম্মা বর্ণিত অজপুত্রগণের সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ উপদেশের কাছে যেন দাঁড়াইতে

পারিতেছে না। পক্ষান্তর কথায় শতবর্ষ ধরিয়া আমাদের শিশুরা মানুষ হইতেছে। সকল দেশের সকল ভাষাই কথাসাহিত্যে আজ ভরপুর। বিষ্ণুশর্ম্মার নিকট এ বিষয়ে বহু জাতি যে ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মহাভারতের কথাসাহিত্য হিন্দু জাতির সর্ব্বস্তরে কত অমূল্য রত্ন যে ছড়াইয়া রাখিয়াছে কে তাহার সংখ্যা করে? প্রাচীনকালে এদেশে এত পাঠ্যের বোঝা ছিল না। আমাদের দেশের মা মাসী ও দিদিমাদের মুখে কথাসাহিত্যের অতি সুন্দর বিকাশ হইয়াছিল। আর যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতিতেও তাহার বিকাশ হইত। আজকাল তাহার আর বেশী কিছু নাই। সে মা-মাসীও নাই, সে দিদিমাও নাই। সে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতাও তেমন নাই। শিশুশিক্ষার সে প্রণালী অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন মা মাসীর স্থান অধিকার করিয়াছেন নিত্য নূতন পাঠ্য গ্রন্থ! কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহোদয় সঙ্কলিত "ঠাকুরমার ঝুলি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকায় কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় যথার্থ বলিয়াছেন,—"পাল পার্ব্বণ যাত্রা গান কথকতা এ সমস্তও ক্রমে মরানদীর মত শুকাইয়া আসাতে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যেখানে রসের প্রবাহ নানা শাখায় বহিত, সেখানে শুষ্ক বালু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বয়স্ক লোকদের মন কঠিন স্বার্থপর এবং বিকৃত হইবার উপক্রম হইতেছে, তারপর দেশের শিশুরাও কোন্ পাপে আনন্দের রস হইতে বঞ্চিত হইল! তাহাদের সায়ংকালীন শয্যাতল এত নীরব কেন! তাহাদের পড়াঘরের কেরোসিন দীপ্ত টেবিলের ধারে যে গুঞ্জন ধ্বনি শুনা যায়, তাহাতে কেবল বিলাতী বানান বহির বিভীষিকা। মাতৃস্তন্য একেবারে ছাড়াইয়া লইয়া কেবলি ছোলার ছাতু খাওয়াইয়া মানুষ করিলে ছেলে কি বাঁচে! কেবলই বইয়ের কথা! স্নেহময়ীদের মুখের কথা কোথায় গেল!—দেশ লক্ষ্মীর বুকের কথা কোথায়!" ইত্যাদি। "ঠাকুরমার ঝুলির" সুযোগ্য লেখক বলেন,—"একদিনের কথা মনে পড়ে, দেবালয়ের আরতির বাজনা বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে, মা'র আঁচলখানির উপর শুইয়া রূপকথা শুনিতেছিলাম।

* * * *

"সে যেন কেমন—কতই সুন্দর! পড়ার বইখানি হাতে নিতে নিতে ঘুম পাইত; কিন্তু সেই রূপকথা তা'রপর তা'রপর করিয়া কত রাত জাগাইয়াছে! তা'রপর শুনিতে শুনিতে চোখ বুজিয়া আসিত;—সেই অজানা রাজ্য সেই অচেনা রাজপুত্র সেই সাতসমুদ্র তের নদীর ঢেউ ক্ষুদ্র বুকখানির মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে খেলিয়া বেড়াইত:—আমার মত দুরন্ত শিশু!—শান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।

"বাঙ্গালার গ্রামপল্লীর কোণে কোণে এমনি আনন্দ ছিল, এমনি আবেশ ছিল। মা আমার অনুরূপ রূপকথা বলিতেন। জানিতেন বলিলে ভুল হয়, ঘরকন্নার রূপকথা যেন গড়ানো ছিল; এমন গৃহিণী ছিলেন না যিনি রূপকথা জানিতেন না,—না জানা যেন লজ্জার কথা ছিল! কিন্তু এত শীঘ্র সেই সোণা-রূপার কাটি কে নিল, আজ মনে হয়, আর ঘরের শিশু তেমন করিয়া জাগে না, তেমন করিয়া ঘুম পাড়ে না! ইত্যাদি।

হায়, সে দিন আবার ফিরিবে কি না কে জানে? আজকাল অনেক ভূতের গল্প, আজগুবি কাহিনী, হাসি খুসির কথা লইয়া শিশুদের জন্য পাঠ্য রচিত হইতেছে। ইহাতে ভূত প্রেত সম্পর্কে নানারূপ অন্ধ বিশ্বাস ছেলেদের মনে গাঁথিয়া যাইতেছে। ছেলেরা প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার কিছু পাইতেছে না। নানারকমের পুস্তক বাহির হইতেছে বটে কিন্তু ছেলেরা তাহাতে বিশেষ কিছুইত পায় না। অনেক স্থলেই ছেলেদের হাসাইয়া, তরল আজগুবি কথায় তাহাদের চমকাইয়া পুস্তকের কাটতি করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। রাশি রাশি ছবির গ্রন্থ বাহির হইতেছে, ছবির পারিপাট্যে ছেলে ভুলান হইতেছে, কিন্তু তাহাতে ছেলেদের স্থায়ী উপকার হইতেছে না লেবেনচুষ সাময়িক মুখরোচক হইতে পারে, কিন্তু একথা ভুলিলে বিপদ হইতে পারে যে আর কিছু না দিয়া কেবলই লেবেনচুষ খাওয়াইলে ছেলে বাঁচে না। আমাদের

বর্ত্তমান শিশুসাহিত্যেও একথাটী বেশ খাটে। শিশুদিগের শিক্ষার জন্য স্থায়ী ও পুষ্টিকর সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। পৃথিবীর নানা বিষয়ের জ্ঞাতব্য কথাগুলি অতি সরল ও সরস ভাষায় লিখিত হওয়া চাই। তবেই শিশুদের উপকার হইবে, নচেৎ নহে। দেশের সহৃদয় সুশিক্ষিত লোকেরা এই কার্য্য-ভার গ্রহণ করুন। নতুবা আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ ঘোর তমসাচ্ছন্ন।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ।

স্বর্গীয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সদ্ভাব-শতক-প্রণেতা স্বর্গীয় কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তৈলচিত্র স্থাপিত হইয়াছে।

আজকালকার ইংরাজী-শিক্ষিত-সমাজের কাছে কৃষ্ণচন্দ্র সুপরিচিত না হইলেও—বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি এমন অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন—যাহা বহুকাল বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্য অমর ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। তাঁহার "অয়ি, সুখময়ী উষে কে তোমারে নিরমিল?" গান এক সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে গীত হইয়াছে;—তাঁহার—

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

প্রভৃতি কবিতা এক সময়ে প্রবাদ বাক্যের ন্যায় বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্চারিত হইত।

৺ডাঃ—সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌরব

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৬ষ্ঠ খণ্ড
৬ষ্ঠ বর্ষ

শ্রাবণ, ১৩২২

দশম সংখ্যা।

আলোচনা

১। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

হিন্দু অতি প্রাচীন জাতি। হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি কত-কালের তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। তবে ইয়োরোপের সুসভ্যজাতিগণের মধ্যে যখন সভ্যতার আলোক মাত্রও প্রবেশ করে নাই, তখনও হিন্দুগণ স্বীয় প্রতিভা এবং মনীষা বলে জীবনের কঠিন সমস্যাসমূহের সমাধানে নিযুক্ত ছিলেন। নানাবিধ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে, রাজ পরিবর্ত্তনে এবং পারিপার্শ্বিক

বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহু সহস্র বৎসর তাঁহারা তাঁহাদের সেই সভ্যতা, ধর্ম ও শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। হিন্দু এই স্বাতন্ত্র্যটুকু হারাইলে তাহার পৃথক্ সত্তার বিলোপসাধন হইত; হিন্দু বলিয়া কোন জাতি, অথবা ধর্ম এখন আমরা দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু দধীচির হাড়ের মত হিন্দুর এই মরা হাড়ে এখনও বজ্রোৎপাদনের উপযোগী শক্তি আছে। এই হাড় গড়িয়া পিটিয়া আপনি প্রস্তুত করিতে পারে। এই অবনতিপ্রাপ্ত হিন্দুজাতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত মহাশক্তি বিরাজ করিতেছে তাহাকে কার্য্যোপযোগী করিয়া তুলিতে পারে এমন বিশ্বকর্ম্মা সহজে মিলে না।

সলিলে, বায়ুতে, বাষ্পে, তাড়িতে যে শক্তি আছে তাহাকে কাজে খাটাইতে পারাতে আজ প্রতীচি নিজেকে এত গৌরবান্বিত মনে করিতেছে, এবং নরলোককে কত রকমে সুখ স্বচ্ছন্দ প্রদান করিতেছে; আর এত বড় একটা জাতি, এত প্রাচীন সভ্যতা, এতকালের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি ইহাকে পুনরায় সবল ও কার্য্যক্ষম করিতে পারিলে এই প্রকাণ্ড সমাজ-দেহের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারিলে কত বড় গৌরবের বিষয় হইবে, তাহা ভাবিতেও মন বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়। এই উদ্বোধন একটু একটু করিয়া হিন্দুসমাজে দেখা দিয়াছে, বহুদূর হইতে জোয়ার আসিলে যেমন খালেতে পৌঁছিতে তাহার বেগ একেবারে মন্দীভূত হইয়া যায়, হিন্দুসমাজে শরীরের বর্ত্তমান স্পন্দনও সেইরূপ অতি সূক্ষ্ম, অতি মন্থর। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যম এই মৃদুস্পন্দন এই সব জাগরণেরই ফল।

হিন্দুর নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে শিক্ষার্থীগণ নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষার্থ সমাগত হইত। হিন্দুর শিক্ষা কখনও পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যকে শিক্ষার একমাত্র কার্য্য স্থির করে নাই, গুরুগৃহে, গুরু ও সতীর্থ সঙ্গে একত্র বাস, অধ্যয়নকে তপস্যা মনে করিত এবং অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস এবং ধর্মশিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া মনে করিত। বর্ত্তমানে যে residential system লইয়া পশ্চিমে এবং তদনুকরণে আমাদের দেশে বিশেষ আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে, তাহা আমাদেরই প্রথা শুধু পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি পশ্চিম দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে—আমাদের দেশে উহা কখন ছিল না। হিন্দু সভ্যতা শিক্ষা-দানের যে প্রণালীকে প্রকৃষ্ট সাব্যস্ত করিয়া ছিল এতকাল পরে ইউরোপের সভ্যতা তাহাকেই খাঁটি সাব্যস্ত করিয়া তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা হিন্দু চিন্তারই প্রকর্ষের পরিচায়ক এবং বর্ত্তমান হিন্দুসন্তান-গণের গৌরবের বিষয়। কিন্তু শুধু পূর্ব্ব-পুরুষের কীর্ত্তিকলাপের গৌরব করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করা দুর্ব্বলের কর্ম্ম; পিতৃপুরুষগণের আজীবন কঠোর তপস্যা, চিন্তা ও সাধনার বলে এদেশের ধর্ম্মে এবং শিক্ষায় যে ভাগীরথী-প্রবাহ অবতরণ করিয়াছিল সেই প্রবাহকে সচল এবং সজীব অবস্থায় রাখা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু বংশের কুলাঙ্গার আমরা বাপ পিতামহের এমন সাধের জিনিষকে সজীব রাখিতে পারি নাই, তাঁহাদের সযত্নসঞ্চিত জ্ঞানরাশিকে আমরা পঙ্কিল করিয়াছি, সেই পুণ্যপ্রবাহ আমা-দেরই মূঢ়তা এবং উপেক্ষায় প্রতিহত-বেগ এবং স্বল্পতোয় হইয়াছে। এই বহুকাল অর্জ্জিত পঙ্কের উদ্ধারসাধন প্রত্যেক হিন্দুরই সাধ্য হওয়া উচিত। হিন্দুর ন্যায়, বেদান্ত,

বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন ; মনু, অত্রি, বৃহস্পতি, পরাশর, রঘুনন্দন, প্রভৃতি স্মৃতি ; ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণ ; বেদ, উপনিষদ, গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, পাণিনি, কাত্যায়নের ব্যাকরণ এই সকলই অপূর্ব্ব মেধা অদ্ভুত প্রতিভা, অমানুষী শিক্ষার চরম ফল। আমরা এই সকল অমূল্য রত্ন বিনা আয়াসে প্রাপ্ত হইয়া মূর্খতা বশতঃই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই উপেক্ষা, সেই মোহান্ধতা দূর করিবার সময় এখন আসিয়াছে, তাই ঘরের ছেলে ঘরের দিকে ফিরিয়াছে ; বহির্জগতের শিক্ষায় তৃপ্তি না পাইয়া হিন্দুর মন এখন অন্তর্মুখীন হইতেছে। তাই সমগ্র ভারতব্যাপী হিন্দুসমাজের আন্দোলনে আজ হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

ভাল, দেশে এত স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় থাকিতে নূতন একটি পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন কি? যদি থাকেই তবে হিন্দুমুসলমান এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের জন্য এক একটি বিদ্যামন্দির সংস্থাপন করাতে দেশের কি উপকার সাধিত হইতে পারে যাহার জন্য দেশীয় রাজন্যবৃন্দ হইতে মধ্যবিত্ত লোক পর্য্যন্ত অর্থ দান করিতেছে? এই দুইটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই লোকের মনে উঠিতে পারে। যে জিনিষের কোন সার্থকতা নাই তাহার জন্য দেশের অর্থ ও শক্তি ব্যয় করা কোন রূপেই উচিত নহে। অথচ হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় মনীষিগণ এবং রাজশক্তির সর্ব্বপ্রধান অধিনায়কগণ এই অনুষ্ঠান সমর্থন করিতেছেন। এতদ্দ্বারাই অনুমান করিতে হইবে যে এই নব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উপকারিতা অবশ্যই আছে। ভাল, বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি কার্য্যের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন—

১। বিশ্ববিদ্যালয় নিজে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, এবং ছাত্রগণের শিক্ষা নিজেরই তত্ত্বাবধানে চালাইবেন, পরের হাতে শিক্ষার ভার দিয়া নিজে শুধু পরীক্ষা গ্রহণের কাজ নিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না (Teaching University.)

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রগণের মধ্যে সহানুভূতি এবং সাহচর্য্যের ভাব বিকশিত করিবার ব্যবস্থা অর্থাৎ ছাত্র ও শিক্ষক একই স্থানে বাস করিয়া ছাত্রের জীবনকে প্রকৃত শিক্ষার জীবন করিয়া তুলিবেন, অধ্যাপকগণ স্বীয় স্বীয় সাধনা এবং চরিত্র দ্বারা ছাত্রগণকে মৌলিক অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করিবেন। ইহাই হইতেছে Residential University.

৩। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যেতৃগণের ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। এমন লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে ধর্ম্ম, উপাসনা প্রভৃতি অর্দ্ধবিকশিত অথবা অধিকাধিক মনোবৃত্তির ফল, কেবল ভাবপ্রবণতা (Sentimentality) ভিন্ন কিছুই নহে। মানুষের মনের যদি পূর্ণ বিকাশ হয় তবে এই ভাবপ্রবণতা লোপ পায় ; ধর্ম্মের জন্য লোকে ব্যাকুল হয় না, কিন্তু সর্ব্ববাদিসম্মত নীতিশাস্ত্র (ethics) অনুসারে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিলেই সন্তোষ লাভ করে। সুখের বিষয় এইরূপ নাস্তিকের সংখ্যা সমাজে বেশী নাই। যাহারা আছে তাহারাও মূর্খতাই হওয়াতে তেমন সজোরে ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে পারিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে চিন্তন এবং মনন যেমন মনের বৃত্তি, ভাবপ্রবণতা

তেমনই হৃদয়ের বৃত্তি। উভয়ই মানুষের ধর্ম; কখনও কোন ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া শুধু ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি পথে চলিতে যাঁহারা পরামর্শ দেন সেই "তর্কে কর্কশধিয়" ব্যক্তিগণ নিজেরাই কি ভাবকে একেবারে স্বীয় হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিয়াছেন? ধর্ম্মভাব যে মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ বৃত্তি তাহা অধিকাংশ লোকেই স্বীকার করেন, তাই ধার্ম্মিক লোকের সর্ব্বত্রই আদর। শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রকৃত মানুষ গঠন করা, মানুষের অন্তর্নিহিত সদ্ভাব নিচয়কে উপযুক্তরূপে বিকাশ করা। বিকাশের সুবিধা না পাইলে অনেক সদ্ভাব ক্রমে ক্রমে মন হইতে একেবারেই বিদূরীত হয়। ধর্ম্মভাবও সেইরূপ ফুটাইয়া তুলিবার অপেক্ষা রাখে। মানুষের চরিত্রগঠনের প্রকৃত কাল যখন তখন সে বিদ্যার্জ্জনে নিযুক্ত। সেই সময় যদি তাহার ধর্ম্মভাবে জলসেচন ও বায়ু, আলো, তাপ উপযুক্তরূপ না দেওয়া যায় তবে পরে তাহার মরা মানকে ফুল ফুটাইবার চেষ্টা প্রায়ই সফল হয় না। সে কারণ সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরাবিদ্যার আলোচনা হওয়াও দরকার, সাহিত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমাদের দেশের যিনি অধিপতি তিনি বিদেশী, আমাদের দেশে বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস একারণ রাজপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ধর্ম্মের শিক্ষারই বন্দোবস্ত করা হয় নাই। কোন জাতি এবং ধর্ম্মের প্রতি তিনি পক্ষপাত করিতে পারেন এ কারণ নিজের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় স্থান পায় নাই। অথচ নিজের প্রজাগণ স্ব স্ব ধর্ম্মে শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক ইহাও রাজার অভিপ্রায়। সুতরাং যদি কোন শ্রেণীর লোকে স্বীয় চেষ্টায় অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে পারেন রাজা তাহা অনুমোদন করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? হিন্দুসমাজ চিরকালই ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া পরিচিত; তাহার একটা জাতীয় শিক্ষালয়ের অভাব, যেখানে তাহার জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা, ও ধর্ম্মসাধনের প্রকৃষ্ট সুব্যবস্থা থাকে সেরূপ একটি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনেকদিন হইতে চিন্তাশীল হিন্দুনায়কগণ অনুভব করিয়া আসিতেছেন। তাই প্রধানতঃ এই জাতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার শিক্ষাবিধানের জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই যে তিনটি কার্য্যের কথা একে একে উল্লেখ করিলাম হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে এই তিনটিই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে অধ্যক্ষগণ এইরূপ আশাতেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

ইতিমধ্যেই একটি কথা উঠিয়াছে, যে এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিপন্থী, এবং পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষবহ্নির উদ্দীপক হইবে। এখন এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কলেজে শিক্ষালাভ করিবার সময়ে হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খ্রীষ্টান পরস্পরের সঙ্গে যে সদ্ভাব বিনিময় করে তাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্য বৃদ্ধি পাইবারই সম্ভব। সুতরাং সে প্রথার অনিষ্টকর কাজে আমাদের জাতীয় ভাব গঠনের বিশেষ প্রতিবন্ধক আছে। যাঁহারা একথা বলেন তাঁহারাও চিন্তাশীল লোক এবং দেশের মঙ্গলানুধ্যায়ী। তাঁহাদের এ কথাটা প্রণিধান যোগ্য।

মৌখিক ঐক্যে অথবা দুই দশটা ভিন্নভাবে একত্র মিলিয়া বক্তৃতাতে প্রকৃত একতা হয়

না। এক স্বার্থ, এক ভাব, এক চিন্তাই প্রকৃত একতার মূল স্বার্থের ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করা চিন্তার কাজ। আজ ভারতে আমার স্বার্থ ও মিঃ গজনবির স্বার্থ যে এক তাহা বুঝিবার জন্য শিক্ষার দরকার, আবার বুঝিতে পারিলেও সেই স্বার্থ সাধনের জন্য এক কাজে ব্রতী হওয়া মনুষ্যত্ব সাপেক্ষ। আমাদের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ হইলেই রাষ্ট্রে প্রকৃত ঐক্য দেখা দিবে। আর মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া ঐক্য যদিও আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তাহা ধনু ও শরের মত অতি অল্পক্ষণ সংযুক্ত থাকিবে; ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্মুখে আসিলেই জাতীয় স্বার্থ ভুলিয়া যাইব, জাতীয় ঐক্য বিলোপ করিব। এখন কি রাষ্ট্রীয় ঐক্য, কি সামাজিক ঐক্য, কি ব্যবসায়ের ঐক্য সমস্ত আমাদের ব্যক্তিগত মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। এই মানুষগড়া হইতেছে এখনকার সমাজের প্রকৃত কাজ, তাহার পথ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা, তাহাই অনুসরণ করা হইতেছে প্রকৃত সমাজ-সেবা। জগতের সমস্ত পদার্থের মত মনুষ্যত্ব বিকাশসাপেক্ষ। বিদ্যাসাগর মনুষ্যত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নিজেই তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের মত লোক দুই চারি জনের অধিক দেখা যায় না। অন্য লোকের চরিত্র, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব বিকাশ দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে,—(১) শিক্ষা, (২) পারিপার্শ্বিক অবস্থা, যথা সৎসঙ্গে বাস, সাধু আদর্শের অনুকরণ প্রভৃতি। যে শিক্ষামন্দিরে এই উভয় পদার্থের অনুকূল ব্যবস্থা যত বেশী সেখানেই মনুষ্যত্ব গঠনের সম্ভাবনা তত অধিক। শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষক যদি সুনির্ব্বাচিত হয় এবং সেই সাধুচরিত্র শিক্ষকগণের মহান আদর্শের দ্বারা অনুভাবিত হইবার সুযোগ এবং সুবিধা যদি শিক্ষার্থীকে দেওয়া হয় তাহা হইলে ছাত্রের মানসিক ও নৈতিক আশানুরূপ উৎকর্ষ বিধানে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। যে শিক্ষাতে মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবে, যাহাতে মানুষের চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টির সহায়তা করিবে তাহা কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মনের মধ্যে চিন্তা-শক্তির পথ উন্মোচন করা; এই সংসারে অবতীর্ণ হইবার পর তাহার সম্মুখে যে সকল জটিল কুটীল নানাবিধ সমস্যা উপস্থিত হইবে তাহার সমাধান সম্বন্ধে ধীরভাবে চিন্তা করিয়া তাহার একটা কিনারা করিতে পারিবে এইরূপ শক্তি যাহাতে প্রদান করে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আত্মতত্ত্ব, জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি, সমাজের সঙ্গে মানবের সম্পর্ক, স্বার্থ ও পরার্থ, এই উভয়ের সমন্বয় প্রভৃতি গুরুতর অথচ অহর্নিশ দৃশ্যমান বিষয়ের সুমীমাংসা করিয়া শক্তিলাভ করিতে যে শিক্ষা উত্তরদায়ক হয় তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। প্রত্যেক মানবেরই জন্মাবধি কোন কোন বিষয়ের সংস্কার থাকে তাহাকে লোকে heredity বলিয়া থাকে। যে যে ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়াছে সেই ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে তাহার অন্য কোন শিক্ষা ব্যতীত যে ধারণা থাকে তাহা অন্যের থাকে না। আর এই ধর্ম্ম-শিক্ষা দ্বারাই লোকে আত্মপর, সংসার সমাজ, স্বার্থ ও পরার্থের কথা সম্যক্ বিবেচনা করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং প্রথমাবধিই নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র ও জাতীয় দর্শনশাস্ত্র সম্যক্ অধীত না হইলে লোকের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের আসল জিনিষটাই অগঠিত ও অবিকশিত থাকিয়া যায়। হিন্দু আগে নিজেকে যদি হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত

করিতে পারে, মুসলমান যদি প্রথমে নিজেকে মুসলমানত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তবেই বিশ্বসংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে; আর আমি যদি নিজগৃহে, নিজ পরিবারে সুপ্রতিষ্ঠিত না হই তবে বাহিরের লোক আমার কথা কেন শুনিবে? ধর্ম্ম আর রাষ্ট্র দুইটি পৃথক্ জিনিষ। আমি যদি খাঁটি হিন্দু হই আর তৎসঙ্গে আমার যদি উদার শিক্ষা (liberal education) হইয়া থাকে তবে আমি আমার ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান হইব তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যে কারণে আমি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিব সেই কারণেই খাঁটি মুসলমানকে আমি সম্মান করিব, সেই কারণে নৈষ্ঠিক খ্রীষ্টান আমার আদরের পাত্র হইবে। যদিও আমরা বুঝি যে "যথামেকোসমঃ" সেই ভগবান্‌ই সত্য, তথাপি এখন আর একথা কোন চিন্তাশীল লোকেরই বুঝিতে বাকী নাই যে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক ধর্ম্মের কল্পনা অলীক আকাশকুসুম বই কিছুই নহে। দেশকাল, পাত্র, পারিপার্শ্বিক, এবং পূর্ব্বতন সংস্কারাদি ভেদে লোকের ধর্ম্ম বিভিন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। যেমন শুধু প্রাণবায়ুটি থাকিলে আমাদের হিসাবে লোক হয় না তাহার শরীর অবয়ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চাই, সেইরূপ শুধু ধর্ম্মের মূলসূত্র নিয়া কোন সমাজ চলিতে পারে না—তাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্তর বাহির দুই চাই। একারণে ধর্ম্মে বিভিন্নতা থাকিবে। কিন্তু তাহা যে রাষ্ট্রীয় উন্নতিপন্থী যে ঐক্য তাহার পরিপন্থী একথা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। স্বার্থের ঐক্যই লোককে এক করে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ এক রাজা, এক রাজবিধির অধীন হওয়াতে বিভিন্ন প্রদেশের লোকের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এক দাঁড়াইয়াছে। সেই স্বার্থ সেই ঐক্য আমরা যতই বুঝিতে পারিব ততই আমাদের মধ্যে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকিবে। সমস্ত প্রকৃত শিক্ষাই এই ঐক্যের প্রয়োজন ও গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবে। তবে মোট কথা শিক্ষাটি ভাল হওয়া চাই, সেইখানে যদি বিকার হয় তবেই ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ বাড়িয়া উঠিবে, বাজে স্বার্থের জন্য পরার্থ ভুলিয়া যাইবে। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হইবে তাহাতে লোকের মনে উচ্চ ভাব, মহত্ত্ব ও পরার্থপরতাই ফুটিয়া উঠিবে এখন পর্য্যন্ত এরূপ আশা না করার কোন কারণ নাই।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা আর একটি অনুপেক্ষণীয় লাভ হইবার আশা আছে। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে সব রাষ্ট্রীয় আন্দোলন প্রভৃতি চলিতেছে, রাষ্ট্রীয় হিতকল্পে যে সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা প্রভৃতি হইয়া থাকে তাহাতে প্রায় দেশীয় রাজন্যবৃন্দের প্রজাগণ বাদ পড়িয়া থাকেন। ইহার কারণ সেই সব রাজ্যের লোকের সঙ্গে বিটিশ ভারতের লোকের ভাবের তেমন আদান প্রদান মেলা মেশা চলে না, আর পূর্ব্বে যে একস্বার্থের কথা বলিলাম তাহাও এক্ষেত্রে তেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। মূলে কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীরই একই রাষ্ট্রীয় স্বার্থ। এখন সে ব্রিটিশ ভারতেরই অধিবাসী হউক, কি রাজপুতানা, ইন্দোর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদের অধিবাসী হউক, ভারতবাসী সে বটেই এবং তাহার স্বার্থ ভারতের অন্য প্রদেশবাসী লোকের স্বার্থ হইতে বিভিন্ন নহে। সত্য একথার দিকে হইলেও এখনও একথাটা আমাদের মধ্যে তাদৃশরূপ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। নাই হউক, সত্য

সত্যই বটে। এই সমস্ত ভারতীয় নরপতি-বৃন্দের স্থাপিত রাজ্যের লোকের সঙ্গে ভাবের বিনিময় এবং সম্মিলন হওয়া যে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের পক্ষে বিশেষ হিতকর এবং অতি প্রয়োজনীয় সে কথার সন্দেহ হইতে পারে না। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সেই মিলনের একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, ব্রহ্ম হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অর্থসাহায্য করিতেছেন এবং সকল দেশের লোকেই ইহার শাসন-পরিষদের সভ্য থাকিবেন, আর সকল প্রদেশ হইতেই বিদ্যার্থীগণ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসিবেন। ইহা রাষ্ট্রীয়জীবনের পক্ষে কম লাভ নহে, জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষণীয় নহে।

শুধু ভাবের কথা বলিয়া লোক ভুলাইতে চেষ্টা করা বৃথা। বাস্তবিক আমরা কি চাহিয়া কি পাইতেছি তাহা একটু প্রণিধান করিয়া দেখা উচিত। ভারতবর্ষে ৭টি বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে আর ঢাকায় একটি হব হব করিতেছে। এই ছয়টিই গবর্ণমেণ্টের উদ্যমে স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টেরই ব্যয়ে এবং তাহাদেরই শাসনাধীনে পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের শাসনের একটু ভগ্নাংশ যে আমাদের ভাগে পড়ে নাই একথাও বলা অন্যায়। এইগুলি ছাড়া যদি আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না নিয়া অন্য কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় করিতে যাই, তাহার প্রকৃতি এবং গতি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। গবর্ণমেণ্টের কোন সংস্রবে না থাকিয়া আমরা এ শিক্ষা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট আমাদের কার্য্যে কোন উৎসাহ দিবেন না বরং একটু সন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারেন এবং এই শিক্ষাপরিষদের প্রদত্ত উপাধি তাঁহারা স্বীকার না করিতে পারেন। আর গবর্ণমেণ্টের অনুমতি মত যদি আমরা ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে যাই তবে তাঁহারা যেরূপ ভাল মনে করেন তাহা করিতে উপদেশ দিবেন, ইহার শাসনে গবর্ণমেণ্টেরও কিছু হাত থাকে সে বিষয়ের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিবেন। অবশ্য বর্ত্তমান্ রাজবিধি প্রভৃতির বলে গবর্ণমেণ্ট দেশের সমস্ত কার্য্যই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে নিজেদের অধীনে রাখিতে পারেন। পরোক্ষে হইলে উভয় পক্ষকেই সন্দেহের মধ্যে থাকিতে হয়, আর প্রত্যক্ষে হইলে সেরূপ সন্দেহ না করিয়া উভয়ে উভয়কে বিশ্বাস করিতে পারেন। হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-কমিটি এই দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিম্নলিখিত সুবিধা পাওয়া যাইতেছে।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিবেন।

(২) গবর্ণমেণ্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সমূহকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্তৎ উপাধির সমতুল্য বিবেচনা করিবেন।

অবশ্য যদি গুণ থাকে তবে তাহার আদর আজ না হউক দশ বছর পরে হইবেই; তাহা না হইলে সুইটজারলণ্ড, কালিফর্ণিয়া বা জাপান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি এখানে আদরের সহিত গ্রাহ্য হয় কেন। কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ। তাছাড়া আইনের উপাধি গবর্ণমেণ্ট মান্য না করিলে আর্থিক হিসাবে তাহার কোন মূল্যই হয় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এই দানের মূল্য কম নহে। এই দানের পরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টও নিম্নলিখিত শাসন অধিকার পাইতেছেন।

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপক সভা Senate নামে অভিহিত। এই সিনেট সভায় অন্যূন ৫০ জন সভ্য থাকিবে তাহার মধ্যে ৫ জন গবর্ণমেণ্টের মনোনীত লোক হইবে।

(২) Vice Chancellor এবং Pro-Vice Chancellorএর নিয়োগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার অনুমোদন লইতে হইবে।

(৩) উক্ত শাসনকর্ত্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের visitor হইবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং যদি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়-বিধির বিরোধী কোন কাজ অনুষ্ঠিত হইতে দেখেন তাহা তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা রহিত করিতে পারিবেন।

(৪) ভারতের রাজপ্রতিনিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কাজ শিক্ষা ও সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করিলে তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে এই কয়টি বিধানের প্রয়োজন থাকিতে পারে। কারণ গবর্ণমেণ্ট এই রাজ্যটি আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক নহেন, ইহা সকলেই বুঝেন। আমাদের অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের সকল প্রান্তের লোক বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিবে, সেখানে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন গবর্ণমেণ্টের খুবই আছে, আর তাহাতে যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরোধী কোন শিক্ষা প্রচলিত হয় তবে গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহা রহিত করা একথাও সহজে বুঝা যাইতে পারে। তথাপি আমাদের বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কার্য্যে এতটা হাত না রাখিলেও পারিতেন। গবর্ণর জেনারেলের হাতে যখন প্রভূত ক্ষমতা রহিল তখন Vice Chancellor এবং Pro.-Vice-Chancellor এর নিয়োগ visitorএর অনুমোদন সাপেক্ষ না করিলে বিশেষ ক্ষতি কি? আর visitor যেখানেই বলিয়া একটা কাজ রহিত করিয়া দিলেন শেষে ইহা লইয়া আইনের আশ্রয়ে না যাইতে হয় এরূপ visitorএর একমতাটিও কর্ত্তন করিলে কোন ক্ষতি ছিল না। মোট কথা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তরল শাসন না রাখিলেও চলিত।

এখন মাত্র বিল ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত হইবে। ইহার পর জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করা হইবে, এবং select কমিটি এই বিলের সংশোধন করিয়া দিবেন তৎপর ইহা আইনে পরিণত হইবে। কিন্তু এই বিল সম্বন্ধে এটা সুনিশ্চিত যে উভয় পক্ষ অনেক দিন আলোচনা আন্দোলন করিয়া যে বিল প্রস্তুত করিয়াছেন select কমিটিতে তাহার বেশী পরিবর্ত্তন হইবে না।

তথাপি একটু আধটু অদল বদল হইবে না একথা বলা যায় না। গবর্ণমেণ্ট যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন তাহার হানি হইবার কোন সম্ভব নাই। আমাদের নিবেদন গবর্ণমেণ্ট যে টুকু অধিকার হাতে রাখিয়াছেন তাহার আরও কিছু ছাড়িয়া দিবেন। Select কমিটিতে এই বিষয়ের আন্দোলন হইয়া কিছু সুফল হইলেই বিশেষ সুখের কথা হইবে। এ সম্বন্ধে এখন হইতেই দেশে বিশেষ আলোচনা হওয়া উচিত। তাহা হইলে আইন পাশ হইবার সময়ে এই সকল বিধির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে।

২। প্রাচীন হিন্দুদিগের নীলনদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার

আজ কাল নানাভাবে হিন্দুজাতির অতীত গৌরবকাহিনীর আলোচনা হইয়া থাকে। দেশীয় ও বিদেশীয় বহুসংখ্যক পণ্ডিত আপনাপন শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে হিন্দুদিগের সাহিত্য, দর্শন, অঙ্কশাস্ত্র শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ গবেষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুর পুরাতন ভূগোলশাস্ত্র সম্বন্ধে এখন কাহাকেও বড় একটা কোনও কথা বলিতে শুনা যায় না। এই বিষয়টির আলোচনার নিমিত্ত একশত বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে একবার মাত্র চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টার প্রবর্ত্তক কে এবং তাহা কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কে পি জয়সোয়াল এম্, এ, 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাহারই সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সিস উইলফোর্ড নামক ভারতীয় সৈনিক বিভাগের একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী হিন্দুদিগের পুরাণগুলি যত্নসহকারে পাঠ করিয়া সেই সম্বন্ধে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে একটি প্রবন্ধে "হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থরাজি হইতে" তথ্য সংগ্রহ করিয়া "ইথিওপিয়ার কালী বা নীলনদীর সন্নিকটস্থ ইজিপ্ট ও অন্যান্য স্থানের বিবরণ" লিখিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি ১৭৯১ খৃঃ "এশিয়াটিক রিসার্চে" (Asiatic Reserches) প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে ১৭৯৯ খৃঃ লণ্ডনে উহার পুনর্মুদ্রণ হয়।

উইলফোর্ড যখন এদেশে ছিলেন হিন্দুদিগের মধ্যে তখনও পুরাতন ভূগোল সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত ছিল। সেই সকল কথা তিনি কাশী ও অন্যান্য স্থানে যাইয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এইরূপ কথা সংগ্রহের দ্বারা তাঁহার প্রাচীন ভূগোল আলোচনার অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহার প্রবন্ধ হইতে ভূগোল সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত দুই একটি কথা উদ্ধৃত হইল। উইলফোর্ড লিখিতেছেন—

"আমি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছি যে আজও হিন্দুদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুশদ্বীপমধ্যে অবস্থিত দুইটি জ্বালামুখী দেখিতে গিয়া থাকেন। প্রথম জ্বালামুখী টাইগ্রীস নদীর নিকট এবং দ্বিতীয়টি বাকুর নিকট অবস্থিত। শুনা যায় কোনও যোগী একদল তীর্থযাত্রীসহ মস্কোপর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন।" "অনেক ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যদেশের মধ্যে লোকের যথেষ্ট গতিবিধি ছিল।"

হিন্দু ভৌগলিকের মতে পৃথিবীর সুমেরু ও কুমেরু নামক দুই প্রধান বিভাগ। ইহা আবার নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বিভক্ত। পুরাতন ভূগোলে দেশের বিবরণের মধ্যে নদী, হ্রদ, পর্ব্বতাদির নাম এবং জল বায়ু ও ফল ফুল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কথা লিখিত আছে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া উইলফোর্ড বলেন নানা প্রকার প্রমাণ ও পুরাণোক্ত বিবরণের সাহায্যে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে "কুশদ্বীপ" নীলনদীর মোহানা এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বসীমা হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তস্থিত সিরহিন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আবার হিন্দুরা যে স্থানকে কুশদ্বীপের প্রান্তভাগ বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই স্থানের বর্ণনা পাঠ করিয়া উইলফোর্ড বর্ত্তমান আবিসিনিয়া ও ইথিওপিয়া এবং পুরাতন কুশদ্বীপ প্রান্তভাগকে (Kushadvipe Exterior) একই স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৎপরে পুরাণ হইতে নীলনদীর নিম্নোক্ত-প্রকার বর্ণনা সংগৃহীত হইয়াছে।—পবিত্র-সলিলা কালী বা কৃষ্ণানদী (অথবা নীলা) অমর হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই অমর হ্রদ অজগর ও নীতান্ত পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বস্থান নামক দেশে অবস্থিত। অজগর ও নীতান্ত সোমগিরি-(Mountains of the Moon) পর্ব্বতের অংশ। সোমগিরির চতুষ্পার্শস্থ স্থানকে চন্দ্রীস্থান (Moonland) বলে। কৃষ্ণানদী বর্ব্বরদেশের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া তপসারণ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং তৎপরে কুশদ্বীপস্থ মিশ্রদেশের মধ্যদিয়া লঙ্কাসাগরে পতিত হইতেছে।"

এক্ষণে পুরাণোক্ত এই বর্ণনা যে প্রকৃত নীলনদীরই তাহা প্রমাণের সাহায্যে দেখান যাইতেছে।—

১। কালী বা কৃষ্ণা এবং নীলনদী একই; কারণ শৈবরত্নাকর নামক গ্রন্থের একটি গল্পে (legend) বর্ব্বরদেশ মিশ্রদেশ ও অর্ব্বস্থান প্রভৃতির সহিত নীলা নদীর নামোল্লেখ আছে। কালী বা কৃষ্ণা বর্ব্বরদেশ ও মিশ্রদেশ দিয়া প্রবাহিতা। সুতরাং কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী।

২। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে "মিশ্র" ইজিপ্টেরই বহু পুরাতন নাম। ইজিপ্টদেশের লেখমালা হইতে জানিতে পারা যায় যে ঐ দেশেরই এক সম্প্রদায় লোক বর্ব্বর নামে অভিহিত। "কুশ" আবিসিনিয়ার প্রাচীন নাম। সুতরাং বর্ত্তমান ভূগোলের ইজিপ্ট দিয়া প্রবাহিতা নীলনদী এবং পুরাতন ভূগোলের মিশ্র ও বর্ব্বরদেশ দিয়া প্রবাহিতা কৃষ্ণা বা নীলা একই নদী। ভাষাতত্ত্বের প্রমাণের দ্বারা উইলফোর্ডের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়।

৩। পুরাণ ঐ সকল দেশের লোককে "কুটিলকেশ" "শ্যামমুখ" বর্ব্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট লোকই এখনও ঐ দেশে বাস করে।

১৮৬২ খৃঃ স্পিক নীলনদের উৎপত্তিস্থান পুনরাবিষ্কার করেন। স্পিকের আবিষ্কারের বিবরণ হইতেই আমরা উইলফোর্ডের কথার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ প্রাপ্ত হই। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র হিন্দুরাই যে নীলনদীর উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন স্পিকের কথায় তাহাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

৪। উৎপত্তিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া লঙ্কাসাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত নীলনদীর পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে উইলফোর্ড নিজপ্রবন্ধে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং সেই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া তিনি নীলনদীর ও তন্নিকটস্থ দেশের একখানি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। নদীর এই বিস্তৃত বিবরণ ও মানচিত্রখানি ১৮৬০ খৃঃ স্পিকের নিজের নিকট ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বলেন—

"নীলনদী ও সোমগিরির (Mountains of the Moon) মানচিত্র-সম্বলিত একটি প্রবন্ধ আমি কর্ণেল Rigleyএর নিকট প্রাপ্ত হই। হিন্দুদিগের পুরাণ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া লেফ্‌টেন্যাণ্ট উইলফোর্ড এই প্রবন্ধটি রচনা করিয়াছিলেন। আমার পাঠকবৃন্দকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। হিন্দুরাই নীলনদীর উৎপত্তি স্থানকে অমরনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ভিক্‌টোরিয়া ন্যান্‌জার উত্তরপূর্ব্বদিকস্থ দেশ আজও অমর নামেই অভিহিত হয়।"

উইলফোর্ডের বিবরণ অনুসারে স্পিক সোমগিরির (Mountains of the Moon)

নিকট উপস্থিত হইয়া একটি হ্রদের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নীলনদী ঐ হ্রদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। স্পিক উহা আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঐ হ্রদের ভিক্টোরিয়া ন্যান্‌জা নাম দিয়াছেন। হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষগণ উহাকে অমর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ঐ হ্রদের সন্নিকটস্থ স্থান আজিও অমর নামে অভিহিত হয়। তথাকার অধিবাসীবৃন্দ আজও সোমগিরিকে দেশীয় ভাষায় সোমগিরি নামেই অভিহিত করিয়া থাকে।

Encyclopædia Britanicaতে নীলনদী সম্বন্ধে যে ব্যক্তি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাঁহার ধারণা এই যে "নীল" নাম কোথা হইতে আসিল তাহা জানা যায় না। কিন্তু নীলনদী সম্বন্ধে হিন্দুর পুরাণোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে তিনি বহুদিন পূর্ব্বে এই বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে পারিতেন।

৩। মুসলমান ও বাঙ্গালা সাহিত্য

মানুষ কেবলমাত্র বাহিরের আচার নিয়মের সাম্য দেখিয়াই আর একজনের সঙ্গে প্রীতির যোগ স্থাপিত করে না। সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে—হৃদয়ের সঙ্গেই তাহার ঐক্যবন্ধন। হৃদয়কে—হৃদয়ের সেই ভাবকে প্রকাশ করে বলিয়াই ভাষার এত আদর—সাহিত্যের এত প্রতিষ্ঠা।

বাঙ্গালা সাহিত্য এতদিন হিন্দুর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মুসলমান ভ্রাতাগণ বাঙ্গালা-ভাষাভাষী হইয়াও তাহার দিকে বড় নজর দেন নাই। সেই জন্য উভয়ের মধ্যে ঐক্য-বন্ধন তেমন দৃঢ় হইতে পারে নাই। কিন্তু এখন তাঁহারা বাঙ্গালাভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন—বুঝিতেছেন বাঙ্গালা সাহিত্যই হিন্দু ও মুসলমানকে লইয়া বাঙ্গালী জাতি সংগঠনে সহায়তা করিবে। এবিষয়ে তাঁহাদের মত 'আল্ এস্‌লাম্'পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার কিয়দংশ পাঠকদিগকে শুনাইতেছি—

"কবি, বক্তা এবং লেখকগণই এক্ষণে আমাদিগের জাতীয় জীবন সংগঠনের একমাত্র উপায়। সুতরাং জাতীয় উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে উচ্চ আদর্শে লক্ষ্য রাখিয়া বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত রসনা ও লেখনী পরিচালনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদিগের উপরই বিরাট্ বঙ্গীয় মুসলমান জাতির পুনরভ্যুত্থান এবং সুখসৌভাগ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং যাহা তাহা লিখিয়া—নিজের সখ মিটাইতে গেলে চলিবে না। প্রতিবেশীদিগের সাহিত্যের অনুকরণে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পুষ্ট করিলে প্রকৃত মঙ্গলের আশা খুব বিরল। পবিত্র জাতীয় ভাষা আরবী এবং পারসী ও উর্দ্দু হইতে জাতীয় ভাব রুচি ও তেজোরাশি আহরণ করিয়া বঙ্গভাষাকে নূতনভাবে গঠন করত আমাদিগের জন্য জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইবে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য আমাদিগের জড়তাপূর্ণ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে। জাতীয় ভাষা আরবী, এবং তৎসহ পারসী ও উর্দ্দু হইতে এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে জাতীয় সাহিত্য ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রাদির অনুবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইতিহাস মুসলমান জাতির প্রাণস্বরূপ। জাতীয় ইতিহাস ও মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যতীত

মুসলমানদিগের মৃতদেহে শক্তিসঞ্চারের অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু হায়! আমাদিগের লেখকগণের মধ্যে জাতীয় ইতিহাস ও জীবন-চরিত সঙ্কলনের অনুরাগ প্রায়ই দৃষ্ট হইতেছে না। তৎপর যাহার তাহার পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে—জাতীয় সাহিত্যের এই ভিত্তি সংগঠনের সময়ে—লেখনী ও রসনা পরিচালনা করা কখনও মঙ্গলজনক নহে। তপস্তেজঃপূর্ণ পবিত্র হৃদয় জাতীয় হিতচিন্তাময় ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাজনগণই লেখনী ও রসনা পরিচালনার উপযুক্ত। যাঁহারা সত্য সনাতন পবিত্রতম ইস্‌লাম ধর্ম্মের গভীর উদ্দেশ্যে সদা অনুপ্রাণিত, এবং জাতীয় অধঃপতনে যাঁহাদের হৃদয় নিয়ত মুমূর্ষুর দাহনে দগ্ধ হইতেছে; যাঁহাদের মনোবেল স্বর্গীয় তেজে সদা উদ্দীপ্ত, তাঁহারাই একণে লেখনী পরিচালনা ও সাহিত্য সংগঠনের জন্য অগ্রগণ্য হইবার উপযুক্ত। কোনকালেই ব্রহ্মতেজঃসম্ভূত মহাপুরুষগণ ব্যতীত অপর কেহ জাতিসংগঠনে সক্ষম হন নাই—তাহা হওয়াও অসম্ভব। তাই বলিতেছি, ভাই বঙ্গীয় মুসলমান লেখক ও কবিগণ! কেবল নিজের নাম মিটাইবার জন্য বা ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা ও অনুরাগভাজন হইবার জন্য, কদাপি লেখনী পরিচালনা করিও না। তোমাদের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে তোমরা অবতীর্ণ হও;—বিমল উদার হৃদয়ে, জাতীয় জড়জীবনে ধর্ম্মবল্লা এবং বৈদ্যুতিক তেজঃ সঞ্চারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হও। মাননীয় পূর্ব্বপুরুষগণ যেমন বজ্র-বহ্নি-বিদ্যুৎ ঝঙ্কার প্রতাপ লইয়া জলজিহ্ব কৃপাণ সঞ্চালনে বাধাবিঘ্ন এবং পাপতাপরাশি নাশ করিয়া আপনাদিগের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, একণে তোমাদের লেখনী ও রসনা সত্য ও পবিত্রতার দীপ্ত তেজোরাশি লইয়া, সেইরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হউক! তোমাদের লেখনী হইতে ইস্‌লামের প্রদীপ্ত প্রভাপুঞ্জ, মেঘবিচ্ছিন্ন মধ্যাহ্ন মিহিরের প্রোজ্জ্বল মযূখমালার ন্যায়, অযুত প্রবাহে বিস্ফুরিত হইয়া জাতীয় জীবনকে আলোকিত পুলকিত ও সুশোভিত করিয়া তুলুক!! জাতীয় জীবনের আলস্য-উদাস্য, জড়তা-মূর্খতা ও হীনতা মলিনতা রূপধ্বান্ত তিমিরপটল একবারে বিলুপ্ত হউক!!!

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, সাহিত্যশক্তি "জাতীয়-জীবন" সংগঠনের প্রধানতম এবং প্রবলতম উপায়। দেশে দিন দিন সাহিত্যের আলোচনা বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দেশের লোক তদনুরূপ ধার্ম্মিক, চরিত্রবান্ এবং চিন্তাশীল ও সন্নীতিপরায়ণ হইতেছে কি? চরিত্র ও নীতিবল ব্যতীত কোন্ জাতি ও কোন্‌দেশ কবে অবনতিগহ্বর হইতে উদ্ধৃত ও উন্নত হইয়াছে?

ধর্ম্ম ও নীতি দূরে থাক্—আমাদের দেশের লোক কি দিন দিন চরিত্র ও সততা হইতেও ভ্রষ্ট হইতেছে না? আমাদের শিক্ষিতদের—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের—মধ্যেই বা কয়জন চরিত্রবান্ আদর্শ মহাত্মা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে? এই যে, দেশের কি হিন্দু কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি লোমকূপ হইতে কুপ্রবৃত্তির সুতীব্র পুতিগন্ধ নির্গত হইতেছে, এই যে দিন দিন পল্লীতে পল্লীতে থিয়েটার ও বারাঙ্গনালয় স্থাপিত হইতেছে—দেশ হইতে সংযম ও সাধুতা, পবিত্রতা ও সরলতা একেবারে উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে; সাহিত্যের কুৎসিত উত্তেজনা ও অশ্লীল দৃশ্য কি ইহার একটী প্রধান শক্তিশালী কারণ

নহে? যে বারাঙ্গনা স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পাপের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি এবং নরকের ঘৃণিত কীট বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, যে দেশের সাহিত্যে এহেন ঘৃণিত নরক-ইন্ধন কুলটা, কবির কল্পনা লেখনী-সংযোগে "যৌবনে যোগিনী"রূপে বর্ণিত এবং পবিত্রতায় পুষ্পের সহিত উপমিত; সে দেশের আর নৈতিক জীবন ও ধর্ম্মবলের আশা কোথায়? যে দেশে ব্রহ্ম-সঙ্গীত পার্শ্বেই পিশাচিনীর উলঙ্গ প্রেমসঙ্গীত স্থান পায়, সে দেশে যে হাকি উলিনিয়াম বা পম্পেয়াই নগরের ন্যায় বিধাতার অভিসম্পাৎ-রূপ কালানলে এখনও ভস্মীভূত হয় নাই, ইহাই তাঁহার অপরিসীম করুণা! এই যে, দেশের স্কুলের কোমলমতি ছাত্র হইতে কলেজের তরুণবয়স্ক যুবক এবং আফিসের পরিণতবয়স্ক কেরাণী পর্য্যন্ত, প্রায় সকলেই নানাবিধ কুৎসিত কদর্য্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বঙ্গের ভাবী বংশধরগণকে চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য এবং শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে; এই যে, অনবরত দেশের সর্ব্বত্র মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার জন্য অসংখ্য প্রকারের তৈল, এবং স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য সংখ্যা-হীন পেটেণ্ট ঔষধ বাহির হইতেছে—এই যে, দেশের শত শত সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র প্রত্যহ পাপজনিত কদর্য্য পীড়াসমূহের ঔষধ ও চিকিৎসার অশ্লীল বিজ্ঞাপনমালা অঙ্গে ধারণ করিয়া লজ্জা ও নীতির মাথা খাইয়া পাপের দিকে—ব্যভিচার ও কদাচারের দিকে—জন-সাধারণকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে; ইহাদ্বারা দেশের ধর্ম্মভাব, চরিত্র বল এবং পবিত্রতার পরিমাণ করা যায়। এ সমস্তের মূলে কি দেশের যাত্রা, থিয়েটার, নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, প্রহসন, গীতি-কবিতা, প্রেম-কবিতা, প্রেম-কাহিনী এবং কদর্য্য সঙ্গীতের আদৌ প্রয়োজনা ও প্রবর্ত্তনা নাই?

যিনি যাহাই বলুন না কেন, কুৎসিত সাহিত্যের অশ্লীলভাবে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। হায়! এমন কি কেহ নাই—যিনি এই পৈশাচিক কদর্য্য সাহিত্যের মূলে সমালোচনার বিষদিগ্ধ তীব্র কুঠার প্রহার করেন? কে আছ বঙ্গের সুসন্তান! এস, পবিত্রতম মাতৃপ্রতিম বঙ্গভাষাকে চরিত্রহীন কুৎসিত স্বভাব ঔপন্যাসিক এবং ভণ্ড কবি-কুলের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও!"

* * *

ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিশ বৎসর আগে স্কুদেব বড় দুঃখে লিখিয়াছিলেন "ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড়-লোক বলিয়া জানিতে চাহে না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ-কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই, অতএব ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে পাই।" সেই সাধনা আজও চলিয়াছে তাই দেশে চারিদিকেই ন-কড়ে ছ-কড়েই দেখি। কিন্তু দেশটা আমাদের রত্নপ্রসবা তাই মাঝে মাঝে এই ন-কড়ে ছ-কড়ের মধ্যে একটা একটা মানুষ আপনিই জন্মিয়া যায়, আর তাঁহারা নিজের ভাস্বর প্রতিভায় অনেকটা আশা জাগাইয়া তোলেন। সে দিন সেই রকম একটা বড় আশার প্রদীপ প্রয়াগে হঠাৎ নিভিয়া গেল। গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ৮ই জুন, ৪৪ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরলোক গমন করিয়াছেন। সেই সৌম্য-শান্ত মূর্ত্তির সহিত দেশের কতটা আশা আকাঙ্ক্ষা সে দিন ত্রিবেণীর তীরে ফুরাইয়া গেল!

সতীশচন্দ্র একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন, তাঁহাকে লইয়া আমরা দশের কাছে দেশের হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম। তাঁহাতে "তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, অগাধ পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর গুরুত্বের" সহিত গভীর স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়তা ছিল। দেশের এমন সৎকার্য্য নাই যাহার সহিত ডাক্তার সতীশের যোগ ছিল না, দেশের এমন সদনুষ্ঠান নাই যাহার জন্য তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন না। তিনি "স্বদেশী" ব্যবসায়াদির সাহায্যে বহু অর্থ দিয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস দলের তৎকালীন প্রধান সংবাদপত্র "ইণ্ডিয়ান পিপলের" অস্তিত্বের শেষ তিন বৎসর ইহার ব্যয়ভার, বহু সহস্র টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া, তিনি বহন করিয়াছিলেন। পরে "লিডার্" পত্র প্রচারিত হইলে এবং তাহার সঙ্কটকালে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়াছেন এবং এই পত্রপরিচালক কোম্পানির সভাপতি ছিলেন। ইহা ব্যতীত হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগের ইংরাজি-বাঙ্গালা স্কুল প্রভৃতি শিক্ষাবিষয়ক, বিবিধ রাজনৈতিক, দুর্ভীক্ষ বা জলপ্লাবন পীড়িতের সাহায্যার্থ লোকহিতকর—সকল অনুষ্ঠানের সহিতই তাঁহার যোগ ছিল, সকল অনুষ্ঠানেই তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কত দুস্থ ব্যক্তি তাঁহার নিকট সাহায্য পাইত। কিন্তু এ স্থানে যশের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না, ইহার পরিমাণ উচ্চ রবে ঘোষণায় হয় নাই, আজ ইহার অভাবের হাহাকারে কথঞ্চিত হইতে পারে।

যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক কার্য্যের সহিত তাঁহার বিশেষ যোগ ছিল এবং সেই প্রদেশের কংগ্রেসদলের নেতাদের মধ্যে তাঁহার উচ্চ আসন ছিল। সমগ্র ভারতের কংগ্রেস বৈঠকেও তিনি সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মিলনে (Provincial Conference) একবার, আর একবার, শিল্প-সম্মিলনে (Industrial Conference) সভাপতির পদে তিনি বৃত হইয়াছিলেন। অল্পদিন হইল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশবাসীর বড় আশা, সেখানে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও জলন্ত স্বদেশ প্রেম মিলিত হইয়া দেশের কত না কাজ করিবে, অঙ্কুরেই বিলীন হইল। ডাঃ সতীশ প্রাদেশিক সভায় বসিবার পূর্ব্বেই ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা কলিকাতা ও প্রয়াগ উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দেদীপ্যমান ছিল। উভয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষায় তিনি গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল এল ডি উপাধি পাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে (Tagore Law lecturer) তিনি যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন তাহা তাঁহার Law of Specific Relief গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। এই পুস্তক আইনের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিদ্বৎমণ্ডলীর নিকট আদৃত হয়। পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র চারিদিক হইতে ইহার সুখ্যাতি হইয়াছিল। দর্শনশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। প্রাচ্য

ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনেই তাঁহার সম্যক্ অধিকার ছিল। তিনি পাশ্চাত্য দর্শনবিষয়ক একখানি পুস্তক সম্পাদন করিয়াছিলেন; সাংখ্যদর্শনবিষয়ক যে সন্দর্ভ লিখিয়া তিনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান তাহা হইতে এবং পরে হিন্দু দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থাদির সমালোচনাদি হইতে তাঁহার হিন্দু দর্শনশাস্ত্র-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার রাজনৈতিক, সামাজিক, দেশের শিল্পোন্নতি, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধাদি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিচয় দিত।

কেবল আপনার মেধা এবং অধ্যবসায় বলে আইন ব্যবসায়ে প্রয়াগের হাইকোর্টে খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন সে-জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট মানসিক শ্রম স্বীকার করিতে হইত, তাঁহার স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল না। কিন্তু তত্রাচ তিনি বিদ্যাচর্চ্চা হইতে বিমুখ ছিলেন না। তাঁহার বিদ্যানুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় গৌরব, বৃত্তি ও উপাধি অর্জ্জনে পর্য্যবসিত হয় নাই বা কমলার কৃপাদৃষ্টির সহিত শুকাইয়া যায় নাই। তাঁহার প্রয়াস বিদ্যানুশীলন ও ধনোপার্জ্জনের মধ্যে সমাপ্তি পাইয়া মাতৃভূমির সেবা একটা সৌখীন চিত্তবিনোদন বা যশের সোপান মাত্রে পরিণত করে নাই। তাঁহার সকল চেষ্টার মধ্যে, জীবনের সকল কার্য্যের মধ্যে জন্মভূমির প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিত।

তাঁহার আদর্শ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে—কি পুত্র, কি ভ্রাতা, কি পতি, কি পিতা, কি বন্ধু, কি আত্মীয়-কুটুম্ব, কি প্রতিবাসী—সকল রূপেই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও মধুর চরিত্রের পরিচয় দিতেন। আর সকল বিষয়ের মধ্যেই তাঁহার দেশের হিত-সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা যাইত। তাঁহার স্বভাবের একটা বড় গুণ ছিল যে তিনি নিজেকে ঢাকিয়া ফেলিতেন, মুছিয়া ফেলিতেন। তাঁহার সৌম্য শান্ত দৃষ্টিতে, বিনীত সরল ব্যবহারে যে কেহ ভুলিয়া যাইত যে এত বড় একজন প্রতিভাবান মহৎ ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার মহত্ব অপরকে তাহার চাপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। কিন্তু তাঁহার শান্ত-স্নিগ্ধ দৃষ্টির অন্তরালে নির্ম্মল চরিত্রের ভাস্বর জ্যোতিঃ, সততা, সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীকতার বল সর্ব্বদা সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইত। কোন কার্য্যে তিনি রাজপুরুষ বা কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির রোষ কটাক্ষ বা কৃপাদৃষ্টিতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, অপর পক্ষে কোন কার্য্যে ঔদ্ধত্য বা অবিনয়ও প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যে দৃঢ়তার সহিত নিরহঙ্কার ভাবের সম্মিলন ছিল, তাঁহার চরিত্রে আদর্শ হিন্দুর কোমল-কঠোর স্বভাব-শোভন শুদ্ধ-শান্ত ভাবটী ফুটিয়া ছিল।

তাঁহার নিকট কোন প্রকার সংকীর্ণতা প্রশ্রয় পাইত না। তিনি যে হিন্দু দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাহার সেই আকাশের ন্যায় উদার ভাবটী তাঁহার মধ্যে বিকশিত ছিল। তাঁহার মধ্যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির উভয় ভাবই সুপ্রকটিত ছিল। তিনি যুক্তপ্রদেশের সেবায় প্রাদেশিকতার অন্ধকারে পড়িয়া ভারতকে ভুলিয়া যাইতেন না। আবার ভারতের কল্পনায় যুক্তপ্রদেশও যে ভারতের অংশ তাহা বিস্মৃত হইতেন না। তিনি এ কথাও জীবনে কখন ভোলেন নাই যে তিনি বাঙ্গালী—তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চার ন্যায় বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন, ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন, বাঙ্গালীর সকল

অনুষ্ঠানে, সকল কার্য্যে আন্তরিক ভাবে যোগ দিতেন,—কিন্তু বাঙ্গালী যে ভারতবাসী এবং ভারতবাসীও যে বাঙ্গালীর স্বদেশী স্বজাতি তাহাও কখন ভোলেন নাই। তিনি হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে গৌরব অনুভব করিতেন, নিজ বাটীতে দুর্গোৎসবাদি হিন্দু অনুষ্ঠানে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত, কিন্তু মুসলমানাদি অহিন্দুগণ তাঁহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বা স্বদেশীয়ের গণ্ডীর বাহিরে পড়িয়া থাকিত না। তিনি বড় বড় দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া কি পারিবারিক কি সামাজিক কোন ছোট অনুষ্ঠানকে অবহেলা করিতেন না। তাঁহার প্রথম কর্ম্মজীবনে হুগলী কলেজের অধ্যাপকতাকালে ছাত্রদিগের সহিত তাঁহার যে যোগ হইয়াছিল, সে যোগ তিনি এলাহাবাদেও বরাবর রাখিয়াছিলেন। ছাত্রমণ্ডলীর সভায় অভিভাষণ, ও তাহাদের বিবিধ অনুষ্ঠানে যোগদান করা তিনি কংগ্রেস কনফারেন্সের কার্য্য অপেক্ষা কম মনে করিতেন না।

এতগুলি আপাত বিরোধি গুণ যে আজ কালকার ন-কড়ে ছ-কড়ের দিনে কাহারও থাকে তাহা বিশ্বাস করা দুর্ঘট। কিন্তু ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন যথার্থই মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে যেই আসিয়াছে সেই বুঝিয়াছে যে এরূপ অসম্ভবও বাস্তবজগতে সম্ভব হয়। তাই বলিতেছিলাম সতীশচন্দ্রের সহিত দেশের বড় একটা আশা আকাঙ্ক্ষা ফুরাইয়া গিয়াছে। যথার্থই ফুরাইয়া গিয়াছে কি? সেই নির্ব্বাপিত জীবনপ্রদীপে শত শত প্রদীপ জ্বালাইয়া সতীশচন্দ্রের স্বদেশবাসী স্বজাতিগণ দেশের সেবায় দীক্ষিত হইবে না কি, তাঁহার জীবনে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ পাইবে না কি, বুঝিবে না কি যে দেশের জন্য জীবনযাপন করা অসম্ভব নয়, কবির কল্পনা নয়?

ওলন্দাজ শিল্প ও বাণিজ্যে
"সংরক্ষণ-নীতি"*

বর্ত্তমান কালে হল্যাণ্ড, ফ্ল্যাণ্ডার্স এবং ব্র্যাব্যাণ্ট প্রদেশত্রয়ের সঙ্গে জার্ম্মাণ জাতির কোন সংস্রব নাই। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্য যুগে এই জনপদকে জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত বিবেচনা করা যাইতে পারিত। প্রথমতঃ এই জনপদ জার্ম্মাণির সংলগ্ন সাগরোপকূল স্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ এই জনপদবাসীর সঙ্গে জার্ম্মাণরাষ্ট্রের সম্বন্ধ ন্যূনাধিক ঘনিষ্টই ছিল। তৃতীয়তঃ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা ভাষাহিসাবে এবং রক্তহিসাবে জার্ম্মাণভাষাভাষীদিগের জ্ঞাতি ও কুটুম্ব। অধিকন্তু আদব-কায়দা, স্বভাব-চরিত্র এবং রীতি-নীতিও দুই সমাজে অনেকটা এক ধরণেরই দেখা যাইত।

এই জনপদের আর একটা সুবিধাও ছিল। ফ্রাঙ্ক সম্রাট শার্ল্‌ম্যান মাঝে মাঝে এই সকল দেশের সমীপবর্ত্তী নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তাহার ফলে রাজকীয় প্রভাব এখানে বেশী পড়িত। দূরবর্ত্তী জার্ম্মাণ জেলাগুলি অপেক্ষা হল্যাণ্ড, ফ্ল্যাণ্ডার্স এবং ব্র্যাব্যাণ্ট সহজেই রাজদরবারের নব নব আদর্শ ও ধারণাগুলি গ্রহণ করিতে পারিত। জীবনের উৎকর্ষবিধান এই উপায়ে বিশেষরূপেই সাধিত হইয়াছিল।

এই তিন প্রদেশের ভিতর কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ছিল। প্রকৃতি ফ্ল্যাণ্ডার্স ও ব্র্যাব্যাণ্টে কৃষিক্ষেত্র এবং শিল্পকেন্দ্রের সুযোগ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হল্যাণ্ডে পশুপালন এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়েই লোকজনের স্বাভাবিক সুবিধা ছিল।

এই সাগরোপকূলবর্ত্তী প্রদেশের নদীবক্ষে ও সমুদ্রবক্ষে তরণীর গতিবিধি অতি সহজসাধ্য ছিল। এই কারণে এই অঞ্চলের ভিতর নানা বাণিজ্যকেন্দ্র স্বাভাবিক ক্রমেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী জার্ম্মাণ জনপদে আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যের বিকাশ এত সহজ ছিল না। জলপথে বাণিজ্যের বিস্তার হওয়ায় এই সকল স্থানে কৃষিকার্য্যের উন্নতি দ্রুতগতিতে সাধিত হইয়াছিল। অল্পকালের মধ্যে নানা সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম খাল কাটিয়া নগরের সঙ্গে নগরের এবং জেলার সঙ্গে জেলার ঘনিষ্ঠতর সংযোগবিধানের প্রয়াস আরব্ধ হইয়াছিল। জার্ম্মাণির অন্যান্য নৃপতি বা ভূম্যধিকারিগণ তখনও এই সকল দিকে দৃষ্টি দিতে অগ্রসর হন নাই। অধিকন্তু ফ্ল্যাণ্ডার্সের "কাউণ্ট" বা জমিদারেরা নগরশাসনে এবং নগরের শান্তি রক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক থাকিতেন। উত্তম রাস্তা প্রস্তুত করিয়া যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টি করাও তাঁহাদের একটা লক্ষ্য ছিল। ফলতঃ নানা কারণে জার্ম্মাণি অপেক্ষা এই সকল প্রদেশ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের রাজন্যবর্গ হিংস্র পশুগুলির

---

* ফ্রেড্‌রিক লিষ্ট প্রণীত "স্বদেশী অর্থ-বিজ্ঞান" ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

উচ্ছেদ সাধন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দস্যু তস্কর এবং সশস্ত্র লুণ্ঠনকারীদিগকেও ধ্বংস করা হইতে লাগিল। নগর হইতে পল্লীতে বণিকেরা নিরাপদে দ্রব্যসম্ভার পাঠাইতে সুরু করিল। গো-পালন, মেষ-পালন এবং চাষ আবাদের জন্য ভূমির পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল। একে প্রাকৃতিক সুযোগ, তাহার উপর রাষ্ট্রীয় সুব্যবস্থা এবং গমনাগমনের সুবিধা। কাজেই নানা স্থান হইতে সুদক্ষ ও বুদ্ধিমান্ শিল্পী ও কারিগর ফ্ল্যাণ্ডার্সে আসিয়া বসতি স্থাপন করিতে লাগিল। এখানকার ভূম্যধিকারিগণ এইরূপ বসতি-স্থাপনেও যারপরনাই সাহায্য করিতেন। নানা উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিচক্ষণ শিল্পীগণকে ফ্ল্যাণ্ডার্সে আমদানি করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। বহু পশম বয়নকারী তন্তুবায়ের পরিবার এইরূপ রাজনিমন্ত্রণে ফ্ল্যাণ্ডার্সে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে পশম-শিল্প এই অঞ্চলে একটা স্থায়ী ঘর করিতে পারিল।

ফ্ল্যাণ্ডার্সের এবিষয়ে অন্য সুবিধাও ছিল। হান্সা-লীগের সঙ্গে এবং ইতালীর সঙ্গে এই অঞ্চলের দ্রব্য-বিনিময় চলিত। এই কারণে ফ্ল্যাণ্ডার্সের পশম-ব্যবসায় উত্তর-ইয়োরোপের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ফলে ফ্ল্যাণ্ডার্সও উত্তর-ইয়োরোপে একটা সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইল। দক্ষিণ-ইয়োরোপে ভেনিস এই ধরণেরই বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। ফ্ল্যাণ্ডার্সের নৌশিল্প ছিল না—ভেনিসের এই বিষয়েই বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু স্বকীয় জাহাজ না থাকা সত্ত্বেও ফ্ল্যাণ্ডার্সের কোন ক্ষতি হয় নাই। হান্সা-লীগ এবং ইতালীর জাহাজে ফ্ল্যাণ্ডার্সের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য সর্ব্বত্র বিতরিত হইত। বস্তুতঃ এই তিন সম্প্রদায় সমবেত হইয়া সমগ্র অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের রক্ষণা-বেক্ষণ করিত। এইরূপ পরস্পরসাপেক্ষতার প্রভাবেই উত্তর জার্ম্মাণির সমুদ্রোপকূল সমগ্র উত্তর-ইয়োরোপে বৈষয়িক আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল।

তখন ফ্ল্যাণ্ডার্সের কোন প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না। পশম-শিল্পে অন্য কোন সমাজ হস্ত-ক্ষেপ করে নাই। কাজেই স্বদেশীয় শিল্প "সংরক্ষণ" করিবার জন্য রাজন্যবর্গ উদ্বিগ্ন হইত না। বিদেশীয় দ্রব্য "বহিষ্কারের" আবশ্যকতাই ছিল না। বরং তখন ফ্ল্যাণ্ডার্সের লোকেরা "অবাধ বাণিজ্য"ই বেশী পছন্দ করিত। তাহারা য়্যাডাম স্মিথের গ্রন্থ পাঠ না করিয়াই বিদেশীয় বণিকগণের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি উৎসাহিত করিত। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা ফ্লেণ্ডার্সের শত্রু ছিলেন। তিনি স্বদেশজাত বাণিজ্যদ্রব্যের দেখিয়া হিংসা করিতেন। ফ্ল্যাণ্ডার্সের কাউণ্ট তৃতীয় রবার্ট ইংরাজরাজের একখানা অনুরোধপত্র পান। তাহাতে লেখা ছিল—"আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার দেশ হইতে ফ্লেণ্ডার্সের ব্যবসায়ীদিগকে বহিষ্কৃত করিবার ব্যবস্থা করুন।" কিন্তু ফ্ল্যাণ্ডার্সের শিল্প ও ব্যবসায় তখন অতিশয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—স্বদেশজাত বণিকেরা তাহার কোনও ক্ষতিই করিতে পারিত না। কাজেই ফ্ল্যাণ্ডার্স হইতে স্বদেশীদিগকে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা কাউণ্ট-দিগের হৃদয়ে জাগিত না। সুতরাং তিনি ইংরাজ নরপতিকে উত্তর দিলেন—"মহাশয়, ফ্ল্যাণ্ডার্সের বাজারে দুনিয়ার বণিকগণের গতিবিধি স্বাধীন। আমরা কোন দিনই 'অবাধ-বাণিজ্য-নীতির' বিরুদ্ধে যাই না।

বর্ত্তমানে এই নীতি বর্জ্জন করা আমাদের স্বার্থ নয়। কাজেই স্বচ্ছন্দিকগণের বিরুদ্ধে বয়কট ঘোষণা করা আমাদের দ্বারা হইবে না।" আজকাল ইংলণ্ডে ষ্যাডাম স্মিথের প্রভাবে এই নীতিই চলিতেছে না কি? যখন কোন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে সহজেই পরাস্ত করিবার ক্ষমতা থাকে তখন সকল জাতিই ষ্যাডাম স্মিথের নীতি অবলম্বন করেন।

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ফ্ল্যাণ্ডার্স উত্তর-ইয়োরোপের প্রধান শিল্পকেন্দ্র ছিল। ব্রুজেসনগর ইহার প্রধান বাজার ছিল। পরে ফ্ল্যাণ্ডার্সের কাউণ্টগণ নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিলেন। স্বদেশীয় বণিক ও শিল্পীদিগের অভাব অভিযোগ এবং সুবিধা ও সুযোগ বিচার না করিয়া তাঁহারা কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এই কারণে পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাব্যাণ্ট প্রদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইল। এই সময়ে য়্যাণ্টোয়ার্প নগর উত্তর-ইয়োরোপের বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হইল, এবং শিল্পকেন্দ্র হইল লুভেইন নগর। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবে ব্রাব্যাণ্টের কৃষিকার্য্যেও উন্নতি দেখা দিল। ব্রাব্যাণ্টে সমৃদ্ধির যুগ আসিল। ইতিপূর্ব্বে এই প্রদেশে কারবারের লেন দেনে শস্য ব্যবহারের পরিবর্ত্তে মুদ্রাব্যবহার শুরু হইয়াছিল। কাজেই ব্যবসায়ের সুবিধা বেশ ছিল। তাহা ছাড়া ব্রাব্যাণ্টে রাষ্ট্রীয় অনৈক্য এবং দলাদলি বেশী ছিল না—ফিউডাল প্রথার প্রভাব অতি সামান্য ছিল। এই সকল কারণে ব্রাব্যাণ্টবাসিগণের ধনসম্পদ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল।

এদিকে হল্যাণ্ডের জনগণ ধীরে ধীরে ইয়োরোপের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রের ওলন্দাজেরা সমবেত হইয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ফ্লান্ডারীগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। তাহাদের ভবিষ্যৎ সমুদ্র-প্রতাপের ভিত্তি স্থাপিত হইল। এই ক্ষুদ্র সমাজ প্রকৃতির সুযোগ ও দুর্য্যোগ উভয় হইতেই লাভবান হইয়াছে। সমুদ্র হইতে নিম্ন সমতলে ইহাদিগকে বাস করিতে হয়। সমুদ্রের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা ইহারা কঠোর সাধনায় ব্রতী থাকে। এই কারণে প্রতিকূল শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে যুঝাযুঝি করিবার প্রবৃত্তি, পরিশ্রম-পরায়ণতা, উৎসাহশীলতা এবং অপব্যয় নিবারণের আকাঙ্ক্ষা ইহাদের চরিত্রে স্বভাবতই দেখা দেয়। ইহারা কষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন জাতি। ইহার ফলে ভূমিকর্ষণ এবং ভূমির উন্নতি সাধনও ওলন্দাজগণের পক্ষে ব্রতপালন স্বরূপ। যে ভূমি সৃষ্টি করিতে ইহাদিগকে অসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক।

সামান্য পরিমাণ ভূমিতে কতটুকু ফসলই বা উৎপন্ন হইতে পারে? বস্তুতঃ ওলন্দাজেরা বিদেশ হইতে শস্য, কাষ্ঠ, বস্ত্র ইত্যাদি আমদানী না করিলে জীবনধারণ করিতে পারে না এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ইহারা মাছের চাষে, এবং মাংস মাখন পনির ও অন্যান্য পশুজাত দ্রব্যের উৎপাদনে মনোনিবেশ করিত। সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের বিশেষত্ব ছিল। কাজেই বাণিজ্য পরিচালনায় ইহাদের একটা বিশেষ সুবিধা হইত।

ওলন্দাজদিগের অভ্যুদয়ে ফ্লান্ডারীসের কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িল। ইয়োরোপের

উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে হান্সা-সমিতি ক্রমে ক্রমে হটিতে থাকিলেন। কারণ ওলন্দাজেরা এই জনপদের শস্য তৃণ কাষ্ঠ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে আমদানি করিত। কিন্তু হান্সা-সমিতি এই সকল পদার্থ অন্য স্থান হইতে আনিত। ওলন্দাজগণের বিকাশ না হইলে হান্সার সম্বন্ধ ঐ প্রদেশে অটুট থাকিত। ওলন্দাজদিগের অন্যান্য সুবিধাও মন্দ ছিল না। প্রথমতঃ বেলজিয়ামের শিল্প-কেন্দ্রগুলি হল্যাণ্ডেরই সন্নিহিত। দ্বিতীয়তঃ রাইণ নদের সকল প্রভাবই ওলন্দাজদিগের উপকারে লাগিত। জার্ম্মানির উর্ব্বর ও সুপ্রশস্ত ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসমূহ এই নদের উপর দিয়া হল্যাণ্ডে আসিত। অধিকন্তু হল্যাণ্ডের সমুদ্রকূল হইতে সুইজর্লাণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত রাইণবক্ষে গমনাগমন সহজসাধ্য ছিল। এই সকল কারণে হান্সা-সমিতি ওলন্দাজ বণিক্‌সঙ্ঘকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝিলেন।

সমুদ্রকূলোপবর্ত্তী জনপদ সম্বন্ধে প্রথমেই একটা কথা স্বীকার করিয়া লওয়া চলিতে পারে। তাহা এই যে, নদী প্রক্ষালিত ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ থাকিলে এই জনপদের বাণিজ্য সমৃদ্ধি সহজে উৎপন্ন হয়। আর নদীপথে সুবিস্তৃত জনপদের সঙ্গে গমনাগমনের সুযোগ না থাকিলে এই জনপদ সহজে সমৃদ্ধ হইতে পারে না। ইতালীর দৃষ্টান্ত দিতেছি। এখানে ভেনিস্ জেনোয়া এবং পাইসা তিন নগরেই বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে ভেনিসিই সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইতালীর মানচিত্র দেখিলেই প্রাকৃতিক কারণ বুঝা যাইবে। ভেনিস নগর পো-নদের প্রভাবে উন্নত হইয়াছিল। এই নদের উত্তরকূলে উর্ব্বর ভূমিসমূহ না থাকিলে ভেনিসের আকৃতি অন্যরূপ হইত। কিন্তু জেনোয়া অথবা পাইসার এই স্বাভাবিক সুযোগগুলি ছিল না।

রাইণ নদ এবং তাহার শাখা প্রশাখাগুলি যেসকল ভূমি ধৌত করে তাহার প্রভাবেই হল্যাণ্ডের বাণিজ্যধারা নিয়ন্ত্রিত হইত। সেইরূপ এস্‌ব্‌ এবং ওয়েজার নদদ্বয়ের সন্নিহিত জনপদের প্রভাবে হান্সীয়গণের বাণিজ্য-ধারা নিয়ন্ত্রিত হইত। রাইণ উপত্যকা অপর দুই উপত্যকা অপেক্ষা বেশী "ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা"। সুতরাং ওলন্দাজ-বাণিজ্য হান্সা-বাণিজ্যকে হতপ্রভ করিবে ইহাত স্বতঃসিদ্ধ। ওলন্দাজদিগের ভাগ্যে এই প্রাকৃতিক সুযোগ ছাড়া আর একটা সুবিধা জুটিয়াছিল। পিটার বকেল্‌স্ নামক এক ব্যক্তি হেরিং মৎস্য লবণে ভাজা রাখিবার কৌশল উদ্ভাবন করেন। এই বিদ্যা বহুকাল পর্য্যন্ত ওলন্দাজ জাতির গুপ্তবিদ্যা থাকিল। ফলতঃ ইয়োরোপের বাজারে ওলন্দাজ ধীবরেরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হেরিংমাছ চালান দিত—অন্যান্য দেশের মৎস্য পালকেরা লোকের পছন্দসই ভাল মাছ যোগাইতে পারিত না। কাজেই ওলন্দাজেরা এই ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া ফেলিল। এমন কি বেশী দর চাহিলেও ইহাদের খরিদ্দারের সংখ্যা কমিত না। তাহারা এত ভাল জিনিস সরবরাহ করিত যে অধিক মূল্যে ক্রয় করিবার লোকও বাড়িতে লাগিল। ইংলাণ্ড ও স্কটলাণ্ডের ধীবর ও মৎস্য ব্যবসায়ীরা রাজদরবার হইতে (bounty) অর্থ সাহায্য পাইল। ইয়োরোপের মাছের বাজার হইতে ওলন্দাজদিগের একাধিপত্য দূর করিবার জন্য ইংরাজরাষ্ট্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সরকারী টাকা সাহায্য পাইয়া

মৎস্যব্যবসায়ীরা বাজারে বাজারে সস্তায় মাল ছাড়িতে লাগিল। তথাপি তাহাদের ক্রেতা জুটিত না। ওলন্দাজদিগের হেরিং-ব্যবসায় টিকিয়া গেল।

"রিফর্মেশন" বা ধর্মসংস্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত খৃষ্টান-সমাজে মাছের কাটতি খুব ছিল। এইজন্য ওলন্দাজগণের হেরিং ব্যবসায় একটা বিপুল কারবারে পরিণত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর ২০০০ নূতন "জেলে-ডিঙ্গি" প্রস্তুত না করিলে ইহাদের চলিত না! অথচ এই সময়ে হ্যান্সা-লীগের অর্ণব-বাণিজ্যে ভাঁটা পড়িতেছিল।

বার্গাণ্ডি রাজবংশের অধীনে হল্যাণ্ড এবং বেল্‌জিয়াম এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। এই ঐক্যের ফলে হ্যান্সার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওলন্দাজেরা বহু সুবিধা পায়। সম্রাট্ পঞ্চম চার্লসের আমলে এই ওলন্দাজ যুক্তরাষ্ট্র প্রবল প্রতাপ লাভ করে। তাহার দ্বারা চার্লস্ জলে এবং স্থলে অসীম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিতেন। অসংখ্য সোণার খনি পাইয়া অথবা ধর্ম্মগুরু পোপের নানাবিধ "দাক্ষি" পাইয়াও তিনি এতদূর প্রতাপান্বিত হইতে পারিতেন না। কিন্তু ওলন্দাজ যুক্ত-রাষ্ট্রের যথার্থ মূল্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। এইজন্য ইহার শক্তিগুলি তিনি নিজস্বার্থে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইলেন।

জার্ম্মাণসম্রাট চার্লস যখন ওলন্দাজ যুক্ত-রাষ্ট্রের অধীশ্বর হইলেন তখন তাঁহার স্পেনের মুকুট প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল। মানুষের গলায় একটা ভারি পাথর বাঁধা থাকিলে তাহাকে ক্রমশঃ অধোগামী হইতে হয়। স্পেনের মুকুটও চার্লসের পক্ষে এইরূপ একটা বন্ধন-শৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি যদি এই শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারিতেন তাহা হইলে জার্ম্মাণ এবং ওলন্দাজ জাতিদ্বয়ের ভাগ্য অন্যরূপ হইত। তিনি ওলন্দাজ যুক্ত-রাষ্ট্রের কর্ত্তা থাকিতেন, জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের অধিনায়ক থাকিতেন এবং ধর্ম্মসংস্কারের ধুরন্ধর থাকিতেন। এই ত্রিবিধ নেতৃত্বের প্রভাবে তিনি জগতে এক অসাধারণ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। তাঁহার শিল্প ও বাণিজ্যের অবধি থাকিত না। তাঁহার সামরিক শক্তি এবং নৌবলের নিকট সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইত। সেই সাম্রাজ্যের পতাকাতলে পূর্ব্বে ডানজিগ হইতে পশ্চিমে রিগা বন্দর পর্য্যন্ত অর্ণবযানের গতিবিধি শাসিত হইত।

স্পেনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেই জার্ম্মাণি দুনিয়ার বিশালতম ও দৃঢ়তম রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারিত। জগতের সকল বাজারেই জার্ম্মাণ শিল্প ও বাণিজ্যের আধিপত্য থাকিত। আর এই আধিপত্য বহুকালব্যাপী হইত। কিন্তু পঞ্চম চার্লস এবং তাঁহার পুত্রের বিপরীত বুদ্ধি হইল। তাঁহারা স্পেনকে ত্যাগ ত করিলেনই না। বরং স্পেনের ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টানগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসংস্কারের আন্দোলনে বাধা দিলেন এবং ওলন্দাজ সমাজে স্পেনের প্রভাব বাড়াইতে চেষ্টিত হইলেন। মোটের উপর একটা নিষ্যাতন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। তাহার ফল ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন। ওলন্দাজ যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরার্দ্ধ (অর্থাৎ হল্যাণ্ড) রক্ত দান করিয়া স্বাধীন হইল। দক্ষিণার্দ্ধের কৃষক ও শিল্পীরা দলে দলে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিল। অনেকে দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হইল। ফলতঃ অ্যান্টোয়ার্প হইতে শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র সরিয়া গেল। তাহার

স্থানে হল্যাণ্ডের আম্‌ষ্টার্ডাম বন্দর বিশ্ব-বাণিজ্যের বাজার হইল। কিন্তু আম্‌ষ্টার্ডাম এবং উত্তর ওলন্দাজ রাষ্ট্রের অন্যান্য নগর দেশত্যাগী বেল্‌জিয়ান্ কারিগরগণকে স্থান দিতে পারিল না। এত বেশী লোকে দেশ ছাড়িয়া যাইতে ছিল! কাজেই বহুসংখ্যক কারিগর ইংল্যাণ্ডে এবং স্কান্ডিনেভে আশ্রয় লইল। চার্লস্ নিজ পায়ে নিজে কুঠারাঘাত করিলেন—অন্য দেশীয় লোক জনের উপকার হইল।

ক্ষুদ্র হল্যাণ্ড প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইল। যুদ্ধের ফলে ওলন্দাজ-গণের আশা বিশ্বাস ও সাহসিকতা শতগুণ বাড়িয়া গেল। তাহাদের চিন্তায় কিছুই আর অসাধ্য মনে হইত না। এদিকে স্পেনে ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে জনগণের উৎসাহ, ও শক্তি খর্ব্ব হইতে থাকিল। ওলন্দাজেরা স্পেনের বাণিজ্য নষ্ট করিতে লাগিল—তাহার ভাণ্ডার-তরীগুলিও লুট করিতে লাগিল। স্পেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ ওলন্দাজ-রাষ্ট্রের বশবর্ত্তী হইল। পর্ত্তুগালের সঙ্গে স্পেনের সংযোগ সাধিত হইবার পর ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ সমূহেরও কিয়দংশ হস্তগত করে। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলের খানিকটা এবং ভারতীয় পর্ত্তুগীজ সাম্রাজ্যের খানিকটা ওলন্দাজরাষ্ট্রের দখলে আসে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ওলন্দাজেরা ইংরাজ জাতিকে সকল বিষয়েই পরাস্ত করিত। ইংরাজের শিল্প, বাণিজ্য, উপ-নিবেশ, অর্ণবযান, সাম্রাজ্য সবই ওলন্দাজ অপেক্ষা হীন ছিল। আজ কাল এই সকল বিভাগে ফরাসী অপেক্ষা ইংরাজ যত উর্দ্ধে, সেই যুগে ইংরাজ অপেক্ষা ওলন্দাজের মর্য্যাদা তত উর্দ্ধে ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব সাধিত হয়। তাহার প্রভাবে ইংরাজ-সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হইল।

ওলন্দাজেরা ক্ষুদ্র নগর-প্রীতি এবং ক্ষুদ্র জেলা-প্রীতি মাত্র বুঝিতে পারিত। তাহা-দের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় সুবিস্তৃত জনপদের ঐক্য-বিধান স্থান পাইত না। ধনসম্পদের গৌরবে এই ব্যবসায়ী জাতি কিছুকাল জগতে উচ্চ মর্য্যাদা ভোগ করিতে পারিল। তাহারা প্রথমে শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিল পরে আর্থিক ও বৈষয়িক কার্য্যকলাপে বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিল। কিন্তু তাহাদের দৌড় এই পর্য্যন্ত। উচ্চতর স্বাদেশিকতা অথবা গভীরতর রাষ্ট্রনীতিজ্ঞতা ওলন্দাজ-সমাজে বিকশিত হয় নাই। তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, বৈষয়িক সমৃদ্ধি রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের এক বিশাল রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক। ক্ষুদ্র জনপদে তাহাদের রাষ্ট্রীয়তা ও জাতীয়তা আবদ্ধ থাকিলে তাহারা কোন মতেই জগতে প্রভুত্ব করিতে পারিবে না—এই কথা তাহাদের বেশ বুঝা উচিত ছিল; কিন্তু তাহাদের রাষ্ট্রবীরেরা ক্ষুদ্রত্ব ও সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন করিতে পারিল না।

এদিকে ইয়োরোপের রাজতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র-সমূহ ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত ওলন্দাজরাষ্ট্রের অভিবৃদ্ধি দেখিয়া হিংসা করিতে লাগিল। তাহা-দের নরপতিরা ভাবিলেন—"আমরা বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিবাসী। আমাদের দেশে নানাবিধ প্রাকৃতিক সুযোগ সর্ব্বদাই পাইতে পারি। অথচ একটা ক্ষুদ্র বণিক্‌সম্প্রদায় আমাদিগকে দুনিয়ার বাজার হইতে হঠাইয়া দিতেছে। কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি মৎস্যপালন, কি নৌবল সকল বিষয়েই আমরা ইহাদের নিকট হতপ্রভ। নিতান্তই লজ্জা ও ক্ষোভের কথা।"

বিলাতের লোকেরাই এই লজ্জা ও ক্ষোভ বিশেষরূপে বোধ করিত। এই সময়ে অত্যাচারী দেশদ্রোহী রাজাকে নির্ব্বাসিত করিয়া ইংরাজেরা এক অভিনব স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই তাহারা শতগুণ উৎসাহের সহিত শিল্পে ও বাণিজ্যে লাগিয়া গেল। ওলন্দাজদিগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই তাহাদের এই যুগের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল। ইংরাজেরা "Navigation Laws" জারি করিল। তাহার বিধানে ইংরাজনির্ম্মিত জাহাজ ব্যবহার না করিয়া কোন বণিক ইংরাজের জন্মভূমি অথবা ইংরাজ-সাম্রাজ্যের সঙ্গে ব্যবসায় চালাতে পারিতেন না। তাহারা এইরূপ বিদেশীয় বহিষ্কারনীতি প্রবর্ত্তন করিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ওলন্দাজ বাণিজ্য খর্ব্ব করিল। ওলন্দাজে ইংরাজে বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাষ্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হইল। সংগ্রামের পর সংগ্রাম বাধিল। ক্ষুদ্র ওলন্দাজ বৃহত্তর ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইল।

ইংরাজের স্বদেশী আন্দোলন অনুসারে ফরাসীরাও কর্ম্মে ব্রতী হইল। ওলন্দাজ তরণী বয়কট করিবার আকাঙ্ক্ষা ফরাসী সমাজে দেখা দিল। চতুর্দ্দশ লুইয়ের মন্ত্রী কলবার্ট ফরাসী বাণিজ্যের তথ্য সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে বুঝাগেল যে সর্ব্বসমেত ২০,০০০ তরণী ফরাসী বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত—তাহার মধ্যে ১৬,০০০ তরণী ওলন্দাজদিগের সম্পত্তি। এই ক্ষুদ্র বণিক্‌সমাজের নিতান্তই অতিবৃদ্ধি হইয়াছিল!

সুতরাং স্বদেশী-সংরক্ষণ এবং বিদেশী-বর্জ্জন দুই দেশে একসঙ্গে সুরু করা হইল। ওলন্দাজ-শিল্পী ও বণিকেরাই তখন ইয়োরোপের বাজারে হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিল। এই দুই বৃহত্তর রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওলন্দাজ শিল্প ও বাণিজ্য যৎপরোনাস্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল। ইতিমধ্যে ফরাসী বোর্বোবংশীয় নরপতী স্পেনের সিংহাসনে বসিলেন। তাহার ফলে ফরাসী-শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার স্পেনে বাড়িয়া গেল। ওলন্দাজেরা স্পেনের বাজার হইতে হঠিতে থাকিল। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী-রাষ্ট্র দেশীয় ধীবর, মৎস্যপালক, শিল্পী, কারিগর এবং জাহাজনির্ম্মাতাদিগকে bounty বা অর্থসাহায্য দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সাহায্য পাইয়া ফরাসীরা ওলন্দাজদিগের সঙ্গে সহজে প্রতিযোগিতা করিতে পারিল। সকল দিক হইতেই ওলন্দাজেরা কোণ-ঠেসা হইয়া পড়িল।

ইংরাজেরা ক্রমে ক্রমে উত্তর ইয়োরোপের বাণিজ্য করতলগত করিল। স্পেনে এবং স্পেনিশ উপনিবেশ সমূহের বাজারও ইংরাজের অধিকৃত হইল। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জেও ইংরাজেরা ওলন্দাজকে স্থানচ্যুত করিল। মাছের ব্যবসায়েও ওলন্দাজেরা পরাজয় স্বীকার করিল। পরে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মেথুয়েন সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার সর্ত্তে পর্ত্তুগাল, পর্ত্তুগীজ-সাম্রাজ্য এবং ভারতীয় উপনিবেশ সমূহের সঙ্গে ওলন্দাজগণের যে ব্যবসায়-সম্বন্ধ ছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া গেল। ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ওলন্দাজেরা ইয়োরোপের চিন্তায় একটা প্রাচীন সেকেলে জাতি থাকিল। অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজ ও ফরাসী এই দুই নবীন জাতির লীলা প্রকটিত করিতে আরম্ভ করিল।

হান্সা-লীগের এই দশা পূর্ব্বে ঘটিয়াছে—ভেনিসেরও এই দুরবস্থা এক সময়ে দেখা-গিয়াছে। ওলন্দাজদিগের বহির্ব্বাণিজ্য অবসন্ন হইল—কাজেই ইহাদের লোকজন এবং

টাকা পয়সা বিদেশীয় কর্ম্মক্ষেত্রে চালান করা হইতে থাকিল। ইংলণ্ডে এবং ফ্রান্সে আসিয়া ওলন্দাজ শিল্পীরা কর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ওলন্দাজ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ মূলধনও এই সমুদয় দেশে রপ্তানী করা হইত। নবীন জাতিদ্বয় এইরূপে প্রাচীন জাতির অর্থবলে এবং লোকবলে প্রতাপবান্ হইল।

ওলন্দাজেরা বেলজিয়াম, রাইণ-প্রক্ষালিত জনপদ এবং উত্তর জার্ম্মাণির সঙ্গে সমবেত হইলে কি দেখিতাম? ইংরাজ অথবা ফরাসী ওলন্দাজ জাতিকে বাণিজ্য-যুদ্ধে অথবা রাষ্ট্রীয়-যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিত না। ওলন্দাজের শিল্পগৌরব ও বাণিজ্যগৌরব বাঁচিয়া যাইত। সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের সঙ্গে ওলন্দাজজাতির সংযোগ থাকিলে তাহারাও একটা বিদেশী-বর্জ্জন নীতি প্রবর্ত্তন করিতে পারিত। ইংরাজের Navigation Laws, এবং ফরাসীর কলবার্ট-নীতির ন্যায় ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য-নীতিও প্রবল থাকিত। কাজেই জগৎ হইতে এত শীঘ্র ওলন্দাজকে বিদায় লইতে হইত না।

অবশ্য ফরাসী ও ইংরাজেরা স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে নিজ নিজ শিল্পের উৎপত্তোন্নতি উন্নতিবিধান করিত সন্দেহ নাই। তাহার ফলে ওলন্দাজশিল্পের বাজার স্বতঃই কমিয়া আসিত। কিন্তু সেই ক্ষতি-পূরণ করিবার পথও আবিষ্কৃত হইত। কারণ বিশাল জনপদ তাহাদের অধীনে থাকিলে লোকবল এবং বিচিত্র প্রাকৃতিক উপকরণ সর্ব্বদাই তাহাদের হস্তগত থাকিত। কাজেই বিদেশে উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ থাকিত —এই উপনিবেশ-সাম্রাজ্য ইংরাজ ও ফরাসী জাতিদ্বয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতে পারিত।

হল্যাণ্ডের অবনতির একমাত্র কারণ—তাহার ক্ষুদ্র আকার এবং অল্প পরিমাণ প্রাকৃতিক উপকরণ। সামান্য সমুদ্র-কূলোপবর্ত্তী জনপদের অধিকারীরা কতদিনই বা জগতে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে? ওলন্দাজেরা এই ক্ষুদ্র জনপদকেই 'স্বদেশ' বিবেচনা করিত। কতিপয় ধীবর, মৎস্যপালক, মেষ-পালক, নাবিক, কৃষক ও বণিকের পরিবার লইয়া তাহারা সাম্রাজ্যগঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। লোকাভাবে এবং উপকরণাভাবে তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হইত। তথাপি তাহারা তাহাদের গণ্ডী বিস্তার করিতে চাহে নাই—বরং সন্নিহিত উর্ব্বর জনপদের অধি-বাসিগণকে তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু বিবেচনা করিত। হল্যাণ্ড প্রাকৃতিক হিসাবে বস্তুতঃ এই জনপদেরই এক অংশ। কিন্তু ওলন্দাজেরা এই জনপদকে 'বিদেশ' ভাবিত। এই সঙ্কীর্ণতা ও নির্ব্বুদ্ধিতাই ওলন্দাজের অবনতির যথার্থ কারণ।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ভেনেশিয়া এবং ইতালীয় নগররাষ্ট্র-সমূহের দৃষ্টান্তে বুঝিলাম যে, কতকগুলি ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ বণিক দেশে থাকিলেই বহুকাল পর্য্যন্ত ইহার শিল্প, বাণিজ্য ও ধনসম্পদ জগতে স্থায়ী হয় না। দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা অনুকূল না থাকিলে কোন সমাজ সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতিভারও সমাজের কীর্ত্তি জগতে বেশী বিস্তৃত হয় না। এইজন্য রাষ্ট্রের প্রতাপ এবং শাসন-প্রণালীর গৌরব থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে জনগণের কর্ম্মশক্তি ও চিন্তাশক্তি বহু-গুণ বৃদ্ধি পায়।

বেলজিয়ামের কৃষিকার্য্য আবার উন্নত হইয়াছিল—সে প্রবল প্রতাপ অষ্ট্রিয়ার

অধীনতায়। বেল্‌জিয়ামের শিল্পসম্পদও আবার বাড়িয়াছিল—সে ফরাসীরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগের পর। হল্যাণ্ডও একাকী আর বৃহত্তর রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে নাই। ১৮১৫ সালে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম একরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। তখন হইতে ওলন্দাজদিগের লোকবল বাড়িয়া গেল। তাহাদের প্রাকৃতিক উপকরণও প্রচুর পরিমাণে জুটিত। দেশের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় নানা সুযোগ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হইল। ফলতঃ এই সময়ে আবার ওলন্দাজজাতির শিল্পগৌরব ও বাণিজ্য-গৌরব দেখিতে পাই। অন্যান্য বৃহত্তর রাষ্ট্রের ন্যায় ওলন্দাজরাষ্ট্রও একটা স্বদেশী-বাণিজ্যনীতি প্রবর্ত্তন করেন। পরে বেল-জিয়াম হইতে হল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই সেই বাণিজ্য-নীতি বা সংরক্ষণনীতির দ্বারা এক্ষণে কোন সুফল ফলিতেছে না।

ওলন্দাজ-বাণিজ্যের এক্ষণে দুইটি মাত্র সম্বল। প্রথমতঃ তাহার উপনিবেশসমূহের সহিত সম্বন্ধ, দ্বিতীয়তঃ জার্ম্মাণির মালবহন কার্য্য। প্রথম সম্বলের উপর ওলন্দাজেরা বেশী দিন নির্ভর করিতে পারে না। কারণ একটা বড় যুদ্ধ বাধিলেই ওলন্দাজ উপনিবেশ-সমূহ হাতছাড়া হইয়া যাইবে। সুতরাং জার্ম্মাণির সঙ্গে ঐকাসূত্রে গ্রথিত হওয়াই উহাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হইবে। এই বুঝিয়া জার্ম্মাণ Zollverein বা বণিক্-পরিষদের হল্যাণ্ডকে নিজ গণ্ডীর ভিতর আনিয়া ফেলা উচিত। বণিক-পরিষদের অন্তর্গত নগর, প্রদেশ, বা জেলাসমূহ পরস্পর পরস্পরের দ্রব্যবিনিময়ে সাহায্য করে। পরিষদের অন্তর্গত জনপদের কোন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে মাল আমদানি রপ্তানি করিতে কোন শুল্ক আবশ্যক হয় না। স্থানগুলি বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের ভিতর থাকিলেও বাণিজ্যবিসাবে এইগুলিকে এক বিধানের অন্তর্গত বিবেচনা করা হয়। হল্যাণ্ডকেও জার্ম্মাণির অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় একটি বাণিজ্য-পরিষদের সামিল করা উচিত।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মাংসভোজন

নৌকার দাঁড় টানিয়াই হউক, বা কোদাল কুড়ুল পাড়িয়াই হউক হাতে কড়া পড়িয়া গেলে আঘাত করিলেও সেই স্থানে বেদনার অনুভূতি হয় না। অভ্যাসের এমনই এক প্রভাব আছে। এই প্রভাব শরীরের ন্যায় মনেও দেখিতে পাওয়া যায়। অতি গর্হিত কাজ হইলেও প্রতিদিন তাহা করিতে করিতে এরূপ একটা মনের ভাব দাঁড়াইয়া যায় যে, ঐ কাজটি যে, অতি গর্হিত, তাহা লেশমাত্রও মনে জাগে না, বরং অনেক সময় আবার তাহা না করাটাই অতি গর্হিত মনে হয়। এই অতি অভ্যস্ত কাজগুলির ভাল-মন্দ বিচার বা তাহার প্রয়োজনীয়তার কথা মনের মধ্যে মোটেই উঠে না। মনে হয় নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় এগুলি অতি স্বাভাবিক, এ সম্বন্ধে আর প্রশ্নের অবকাশ কোথায়। কেহ বা প্রশ্ন তুলিলেও তাহাতে একটু কাণ দেওয়াটাও অনাবশ্যক মনে হয়। অভ্যাসে-

অভ্যাসে মানবের হৃদয় এমনই জড় হইয়া গিয়াছে যে, আঘাত করিলেও তাহা সাড়া দেয় না, বা দিতে পারে না। সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, যাঁহারা মহত্তর, শাস্ত্রদর্শী, বিচারক, বিজ্ঞ, তাঁহাদেরও হৃদয়ের অনেক সময়ে সাড়া পাওয়া যায় না। অভ্যাসে সংস্কারে ইঁহাদেরও হৃদয় সাধারণ লোকেরই মত অসাড়, তাই অভ্যস্ত কুকার্য্য-গুলি উভয়েরই মধ্যে অবাধে চলিয়া যায়।

অন্যান্য সমস্ত জীব অপেক্ষা মানুষের বিচারশক্তি অধিক। চুল-চেরা বিচারের দরকার নাই, মানুষ যদি মোটামুটি বিচার করিয়া দেখে, চিরাগত সংস্কারকে দূরে রাখিয়া অপক্ষপাত হৃদয়ে একবার ভাবিয়া দেখে, তাহা হইলে সে তাহার প্রতিদিনের অভ্যস্ত বহু গর্হিত কাজ হইতে বিরত থাকিতে পারে। কিন্তু সে এতই অন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, ইহার আবশ্যকতাই দেখিতে পায় না।

শরীর-রক্ষার জন্য ভোজনের আবশ্যকতা আছে। জীবহিংসা না করিলেও আমাদের ভোজনের ব্যবস্থা হইতে পারে, এবং তাহা কোনরূপে নিকৃষ্ট নহে, বরং সর্ব্বাংশে অত্যুৎ-কৃষ্ট, তথাপি মানবের ভোজনের জন্য প্রতি-দিন এত জীবহত্যা হয় যে, চিন্তা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। আশ্চর্য্যের বিষয় মানুষ কিরূপে ইহা দেখিয়া শুনিয়া সহিয়া থাকিতে পারে। এবিষয়ে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুসমূহের সহিত মাংসাশী মানবের কোন ভেদ নাই।

জগতে সমস্ত জীবেরই আহারের প্রবৃত্তি সমান ও স্বাভাবিক। প্রবৃত্তির প্রেরণায় পশুর ন্যায় মানবও আহার অন্বেষণ করিয়া থাকে। মানব ও পশুর মধ্যে এ-সম্বন্ধে এই-মাত্র প্রভেদ যে, প্রবৃত্তি নিয়ত প্রেরণা করিলেও মানব নানাদিক্ বিচার করিয়া এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে; আর পশু তাহা পারে না। মানব নিজের উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে পারে বলিয়াই তাহার মহত্ত্ব। যে স্থানে তাহার এই সংযম থাকে না, সেই স্থানেই সে ক্ষুদ্র। মাংস-ভোজন তাহার ক্ষুদ্রতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্থল।

মাংস ভোজন করিতে গিয়া মানুষ যে, কতদূর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয় তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। অসহায় দুর্ব্বল জীবগুলি মাংসভোজীদের নিকট জীব বলিয়াই মনে হয় না, ইহারা তাঁহাদের নিকট জড়-পদার্থ বলিয়াই গণ্য। ছিপ দিয়া পুকুরে মাছ ধরিবার সময় কোন মাছ নিজের দুর্ভাগ্যবশতঃ বড়শি গিলিয়া যখন প্রাণের যন্ত্রণায় মুক্তির আশায় জলে দ্রুতবেগে ইতস্ততঃ ছুটিয়া যাইতে চায়, কিন্তু ছিপের সুতার সহিত বাঁধন থাকায় যাইতে পারে না, মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর হইয়া অস্থির হইয়া ধড়ফড় করে, তখন যিনি মাছ ধরেন ও যাঁহারা তাহা দেখেন, উভয়েরই কি আনন্দ উল্লাস! তাঁহারা সেই করুণার্হ দুর্ভাগ্য মৎস্যটির তীব্র মৃত্যুবেদনার এক কণিকাও অনুমান না করিয়া বরং বলিয়া থাকেন "বাঃ কি চমৎকার খে লি তে ছে!" "দাও দাও, আমিও একটু খে লা ই!" একটা জীব মৃত্যুযন্ত্রণায় যেখানে ছট্‌ফট্ করিতেছে, মানুষ সেখানে মনে করিতেছে, উহা তাহার খেলা। কোন একটা বড় মাছ বা হৃষ্টপুষ্ট ছাগশিশু সম্মুখে উপস্থিত হইলে, অথবা সেরূপ কোন পাখী নয়নগোচর হইলে, মাংসাশী মানবের মনে খাদ্য-খাদক ভাবটিই জাগিয়া উঠে; এই সমস্ত জীবের যতই কেন সৌন্দর্য্য থাকুক

না, তাহা ইহার হৃদয়ে কেবল ঐ ভাবটিকেই উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। এইজন্যই বুঝি তাহার সৃষ্টি! তাহার মধ্যে যে, আর কিছু আছে তাহা মোটেই ইহার হৃদয়ে জাগে না। এই সকল দুর্ব্বল জীবকে বধ করিবার সময়েই বা মাংস-ভোজীদের কত আনন্দ! হত্যা করিবার সময় এই জীবগুলি যদি তাহাদের স্বাভাবিক প্রেরণায় আত্মরক্ষার জন্য যথাশক্তি কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া বাধা প্রদান করে, তবে সেই নিষ্ঠুরদের নিকটে ইহাও অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়! হুঙ্কার করিয়া তাহা হইতেও ইহাদিগকে নিবৃত্ত করা হয়! মরণেরও সময়ে একটু ছট্‌ফট্ করিবারও তাহাদের অধিকার নাই!

বস্তুতই হিংসা করিতে করিতে মানুষ জীবে দয়ার কথাটা একবারে ভুলিয়া যায়, এবং উত্তরোত্তর অধিকতর ভাবে অবনত হইয়া পড়ে। তাহার পশু-ভাব, পশু-প্রকৃতি, পশু-প্রবৃত্তি চারিদিক্ হইতে ফুটিয়া উঠে। মানুষ তখন সত্য সত্যই পাষাণ হইয়া যায়: বাহিরে উচ্চশ্রেণীতে উচ্চসমাজে অবস্থান করিলেও, অন্তরে সে নিতান্ত নিকৃষ্ট হইয়া উঠে। * মাংসাহারের এই ভীষণ অপগুণ আছে বলিয়াই জগতের প্রধান প্রধান সমস্ত ধর্ম্মেই ধর্ম্মজীবনের উন্নতির জন্য মানবকে ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। † জীব-হিংসা করা এবং তাহার মাংসভোজন করা উভয়ই গর্হিত, উভয়ই ধর্ম্মজীবনের কণ্টক। ধর্ম্মজীবন যাপন না করিলে মানব পশু হয়। অতএব ঐ উভয়ই তাহার পরিত্যাজ্য।

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মানবের খাদ্যাখাদ্য-সম্বন্ধে আজকাল বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারাও একথা বলেন। সাধারণ পাঠকবর্গের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য এস্থলে তাঁহাদের উক্তি কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব;—

1. "I need not tell you that animal food is stimulant, that *it inflames the lower passions, and tends to make both men and animals pugnacious, selfish and cruel when they are fed upon it.*"—Sidney H. Beard *Is flesh-eating morally Defensible?* p. 28. (The Order of the Golden Age.)

2. "The harm done to man's moral nature *directly*, by the consumption of flesh and blood, is suggestive of the *indirect* evil which results from the barbarous practice. It is undeniable *that where slaughter and blood-shed are most prevalent, the people become brutalized and crime increases.* In the East end of London, where slaughter-houses are numbered by hundreds, where little children are sent with jugs to be filled with worm blood—and are thus accustomed to scenes of violence and cruelty from babyhood—crime, degradation, and ferocity are rampant." *Ibid.* 30.

3. "The effect of meat on *mind* and *thought* is proved to be distinctly detri-mental. "Fruitarians are clearer thinkers than meat-munchers"—Rev. A. M. Mitchel, M. A. The *Church and Food Reform*, p. 12.

4. "There is another effect for which the confirmed bad habit of flesh-eating is responsible, an effect disastrous to the highest interests of Man here and hereafter—*the hindrance to spiritual growth, the ruin of spirituality. A great meat-eater is never a spiritually minded person.* Meat for break-fast, meat for dinner, meat for supper builds up a spiritual bankrupt! Such meat gorging would, in time, transform a St. John the Divine into Henry VIII."—*Ibid.* p. 18.

† "The Founders of the various Religious Orders I have mentioned this evening, recognised this fact, and religious Leaders, Saints Prophets, Reformers in all ages have endorsed it. Amongst others were, Pythagoras, Plato, Socrates, Buddha, Manu,

এক মানুষ ছাড়া জগতের আর সমস্ত জীবই নিজ নিজ স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে, কৃত্রিম খাদ্যের দিকে ইহারা যায় না, এবং সেই জন্যই ইহারা উত্তম স্বাস্থ্যে সমগ্র জীবন যাপন করিয়া থাকে, চিকিৎসকের নিকট তাহাদিগকে নিরন্তর গমনাগমন করিতে হয় না, এবং আকস্মিক দৈব ঘটনা ভিন্ন নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আয়ু তাহারা উপভোগ করিতে পারে। কিন্তু মানব নিজের স্বভাবের দিকে উপযুক্ত পরিমাণ লক্ষ্য না করিয়া কৃত্রিমতারই দিকে অধিক অগ্রসর হয়, এবং সেই জন্যই ইহাকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা ভুগিতেও হয় অনেক অধিক। স্বাভাবিকের স্থান অস্বাভাবিক কৃত্রিমকে প্রদান করিলে কখনই যথাযথ-ভাবে অভীপ্সিত ফল ও লাভ করাই যায় না, বরং অনেক সময়ে বিপরীত ফল হইয়া দাঁড়ায়। মাংস মানবের স্বাভাবিক খাদ্য নহে, মাংস-খাইবার জন্য মানব সৃষ্ট হয় নাই। কেন না মাংসাশী অন্যান্য জীবের সহিত মানবের মিল নাই। মাংস আহার করিয়া পরিপাক করিবার জন্য যে সকল আবশ্যক যন্ত্র অন্যান্য জীবের আছে, মানবের সে সমস্ত নাই। বৈজ্ঞানিকগণ এ-সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তই স্থির করিয়াছেন —মানব মাংসাশী জীব নহে। * অতএব মাংস ভোজন করা তাহার কিছুতেই উচিত নহে।

Zoroaster, Danial, Isaiah, Jesus....."—Sidney H. Beard *Is flesh-eating morally defensible?* p. 28. এ স্থানে কোন জৈন তীর্থঙ্করের নাম গৃহীত হয় নাই, কিন্তু জৈনধর্ম্মে মাংসভোজন বা জীবহিংসার যেরূপ তীব্র নিষেধ আছে, অন্যত্র এরূপ নাই।

* এ সম্বন্ধে বহু বহু তথ্যের মত উল্লেখ করিতে পারা যায়। পাঠকগণ "The order of the Golden Age" (153, 155, Brompton Road London, S. W.) এর প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ও পুস্তকগুলি দেখিতে পারেন। সাধারণের জন্য তাহা হইতেই এখানে কিছু উদ্ধৃত হইতেছে। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে ইহার মূল পুস্তক আনাইয়া দেখিতে পারেন (Lallubhai Gulabchand, Hon. Vyavasthapaka, Jivadaya-Jnana-Rakashah Fund, 309, Shroff Bazar, Bombay. অথবা Umed Singh Musuddilal Jain, Katra Jallovala, Amritasar. এই ঠিকানায় লিখিলে বিনামূল্যেও পুস্তিকাগুলি পাওয়া যাইবে।)

Is Flesh-eating Morally Depensible? pp. 11-13.

1. Prof. Baron Cuvier says :—" Comparative Anatomy teaches us that *man resembles the frugivorous animals in everything, the carnivorous in nothing*..... It is only by softening and disguising dead flesh by culinary preparations that it is rendered susceptible of mastication or digestion, and that the sight of its bloody juices and raw horror does not excite loathing and disgust.

2. Professor William Lawrence, F. R. S., declares :—

" *The teeth of man have not the slightest resemblance to those of the carnivorous animals,* excepting that their enamel is confined to external surface. He possesses, indeed, teeth called canino, but they do not exceed the level of others, and are obviously unsuited to the purposes which the corresponding teeth execute in the carnivorous animals " (Lecture on comparative Anatomy).

3. Prof. Sir Charles Bell, F.R.S., says :—" It is, I think, not going too far to say that every fact connected with the human organization goes to prove that *man was originally formed a frugivorous animal.* This opinion is derived principally from the formation of his teeth and digestive organs, as well as from the character of his skin and general structure of his limbs." (Anatomy Physiology, and Diseases of the Teeth.)

আমিষ ভোজন যে, মানবের পক্ষে কেবল অস্বাভাবিক মাত্র তাহা নহে, ইহা স্বাস্থ্যের ঘোর অনিষ্টজনক। ইহার অপকারিতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অভিজ্ঞগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আমিষ ভোজন ও রোগ ভোজন একই কথা।* ঔষধ প্রয়োগে কোন-কোন স্থলে ইহার দ্বারা উপকার পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাধারণ খাদ্যরূপে ইহার ব্যবহারে ক্ষয়, বাত, জ্বর, দুষ্ট ব্রণ, Appendicitis, Tuberculosis ইত্যাদি নানা দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময়ে এই সকল ব্যাধি মাংসাশীদের বংশ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতে দেখা যায়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ মাংসভোজনের এই সকল ভীষণ পরিণাম নিরূপণ করিয়া এখন মুক্তকণ্ঠে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সকলকে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, চিকিৎসারও জন্য মাংস ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নাই। এবং কার্য্যতও তাহা তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছেন। Lady Margaret Hospital, (Bromley, Kent), St. Francis Nursing Home. Margaret Nursing Home, ইত্যাদি আরোগ্যশালায় রোগীদিগকে কোনরূপে আমিষ ভোজন করান হয় না। একজন সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞ চিকিৎসক লিখিয়াছেন তাঁহার পরিবারে বহুদিন হইতে সর্দ্দি, কাশ, জ্বর, হাম প্রভৃতির ভয়ানক প্রকোপ চলিতেছিল, তিনিও প্রতি বৎসর ভুগিতেন। পরে মাংস ত্যাগ করার পর ফল ভোজন আরম্ভ করায় সেই সমস্ত উপদ্রব চলিয়া গিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের পরিবারেও মাংসভোজন নিষেধ করায় সুফল হইয়াছে, এবং তাঁহার রোগীরাও ইহাতে অদ্ভুত ফল

---

4. Dr. Pouchet, (Author of "The Universe" writes :—"It has been truly said that man is frugivorous. All the details of his intestinal canal, and above all his dentition, prove it in the most decided manner."

5. Prof. John Ray, F. A. S., Says :—"*Certainly man was never made to be a carnivorous animal.*"

6. Dr. Josiah Oldfield, D. C. L., M. A., M. R. C. S., L. R. C. P. writes :—"To-day there is the scientific fact assured that *man belongs not to the flesh-eaters, but to the fruit-eaters.* To-day there is the chemical fact in the hands of all, which none can gainsay, that the products of the vegitable kingdom contain all that is necessary for the fullest sustenance of human life.

Flesh is an unnatural food, and therefore, tends to create functional disturbance. As it is taken in modern civilization it is affected with such terrible diseases (readily communicable to man), as cancer, consumption, fever, intestine worms, etc, to an enormous extent. There is little need for wonder that flesh-eating is one of the most serious causes of the diseases that carry off ninety-nine out of every hundred people that are born."

বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত হইল না। Encyclopædia Britanica নামক অভিধানেও পাঠকগণ এসম্বন্ধে অনেক কথা দেখিতে পাইবেন।

* "Flesh-eating very commonly means 'desease-eating.' I say *desease-eating* and I mean it. When we sit at the dinner or supper table eating flesh meats, the probability is we may be infecting ourselves with a fatal malady, singing our own death warrants."—Rev. A. M. Michell, M. A., The Church and Food Reform, p. 8.

লাভ করিয়াছে। তাঁহার কথাগুলি সকলেরই আলোচনার যোগ্য।*

বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বহু বহু বিষয় সর্ব্বত্র আলোচিত হয়, স্বাস্থ্যের কথারও যে, আলোচনা না হয়, তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা স্বাস্থ্যের দিকে মানবকে অধিকতর উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ ভাবে চলিলে তাহার স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিতে পারে, অধিকাংশ লোকই সে দিকে লক্ষ্য রাখেন না। স্বাস্থ্য ক্ষয় করিয়া অনেকেই নানাবিধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ এই স্বাস্থ্য না থাকিলে যে, তাঁহাদের সদ্ভাব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে, তাহা জানিয়াও তাঁহারা জানেন না। যে সকল পদার্থে শরীরে জীবনীশক্তি রক্ষিত হয় খাদ্য তাহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। জীবকে ইহার উপরে প্রভূত ভাবে নির্ভর করিতে হয়। এই খাদ্য বিশুদ্ধ ও উপযুক্ত হইলেই শরীর স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে, এবং খাদ্যের ব্যতিক্রম হইলেই শরীরেরও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, ইহা স্বাভাবিক। এই জন্য খাদ্যাখাদ্য বিচার করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকালকার দিনে এ-কথাটা অনেকেরই অনালোচ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে, ব্যারামটাই লোকের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করিয়া অবিশুদ্ধ অঘন্য খাদ্য গ্রহণ করায় দেশের অবস্থা সর্ব্বত্রই কিরূপ হইয়া উঠিয়াছে, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক তাহা এই ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"Our Hospitals and Nursing Homes are full and running over. Day and Night the words are crowded and the out-patients are thronging in, and asking anodynes and that healing which they so often fails to get. Doctors are multiplying with an alarming rapidity, and worse than all, the idea of being unwell is beginning to be looked upon as the normal condition of life.

What does all this mean? It

* "Before I started on the natural food I suffered from numerous colds every year and for years I had a severe attack of influenza every Christmas. Wife and Children were equally troubled. colds, sore-throats, diptheria, measles, whopping cough, even typhoid, the all appeard in our family in their turn and at pretty regular intervals. *Since fruit has been our mainstay, and meat has disappeared from* our table, since water and fruit juices became our drinks, since tea and coffee were reduced to a minimum, *no disease whatever has made his appearance in our home, and we have lost all fever of disease or infection*, while in quite an automatic way I have lost all inclination and lust for beer, whisky and tobacco.....And the results with my patients? Well, they are simply phenomenal. *Out of 166 cases of typhoid* (at the Mildura District Hospital) *treated with fruit and fruitjuices, without any drugs or unnatural alimentation, only two died*, the one coming *too late* (in the third week) under the regime, the other succumbing to heat-wave, when four, apparently healthy people, died in the streets around in one week with heat-apoplexy."—O. L. M. Abramowski, M. D., Ch. D., M. O. H. (Late senior Physician to the District Hospital, Mildura, Australia) : Fruitarian Diet and Physical Rejuvenation, pp. 6-7.

means that instead of man living out his natural life in joy and health and lightsome happiness, living on to the natural age of 105,

...instead of all this, *the faults in food, the disobedience of the words of counsel of Mother Nature have cursed civilised mankind with a penalty of pain and anguish and suffering and premature death that are enough to make the human race an object of pity rather than of envy.*"—Dr. Josiah Oldfield, D. C. L., M.A., M.R.C.S., L.R.C.P. The Diet for Cultured People, pp. 12-13.

খাদ্যের জন্য যেসকল জীবকে হত্যা করা হয়, অনেক সময় তাহাদের শরীরে নানারূপ ব্যাধি থাকে। সব সময়েই এই সমস্ত ব্যাধিকে চিনিতে পারা যায় না। অথবা ব্যাধি আছে জানিয়াও তাহা গ্রাহ্য করা হয় না, বিশেষতঃ মাংসবিক্রেতারা ত ইহা করেই না। ফলে মানুষ এই সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত মাংস ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ভোজন করিয়া ফেলে, এবং ইহার পরিণাম যে কি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক সময় মাংসবিক্রেতারা কোন পশুকে রোগগ্রস্ত জানিয়াই তাড়াতাড়ি তাহাকে হত্যা করিয়া ঐ মাংস বিক্রয় করে, কারণ লোকের স্বাস্থ্য অপেক্ষা নিজের অর্থেরই দিকে লক্ষ্য থাকে অধিক। রোগগ্রস্ত পশুকে মাংসের জন্য হত্যা করিবে না—এরূপ নিয়ম কাগজে-কলমে থাকিতে পারে, এবং পশুর রোগ পরীক্ষা করিয়া দেখিবারও জন্য অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী শত শত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বলিতেছেন বস্তুত পরীক্ষা করা হয় না। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে বড় বড় কসাইখানাতে সহস্র সহস্র পশুকে পরীক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কেবল অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা হয় না। বিশেষতঃ গরুটার শিং আছে কি, না আছে ঠিক করা যেমন সহজ, পশুদের রোগ আছে কি না তাহা পরীক্ষা করা তেমন সহজ নহে। বড় বড় ধনশালী রোগীর শরীরের এখানে সেখানে নানাবিধ যন্ত্র সংযোগ করিয়াও বড় বড় চিকিৎসকেরা বহুত রোগ নির্ণয়ে অসমর্থ হন, তখন কসাইখানার পশুদের ব্যাপার কি গতি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল ইহাই নহে, যে সকল মাংস পচিয়া যাওয়ায় বা অন্যকোন কারণে আরও বিকৃত হইয়া যায়, নানারূপ দ্রব্য সংযোগে, নানারূপ পাক প্রক্রিয়ায় তাহাকেই আবার উপাদেয় খাদ্য-রূপে বিক্রেতারা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহা কেবল এদেশের কথা নহে, সুশিক্ষিত সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশেও এইরূপ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী প্রামাণিক ব্যক্তি-গণের এবিষয়ে বহু সাক্ষ্য আছে। এই সমস্ত জঘন্য আহার গ্রহণ করিয়া লোকে চিররুগ্ন হইয়া উঠিতেছে।

আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের তারতম্য বহুবার পরীক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ ভোজনে শরীরে অধিকতর বল-বৃদ্ধি, রোগ সহিষ্ণুতা ও কার্য্যক্ষমতা জন্মে। আমিষ ও নিরামিষ খাদ্য সামগ্রীর পুষ্টিকর অংশ বিশ্লেষণ করিয়াও তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, আমিষ অপেক্ষা নিরামিষ খাদ্য সামগ্রীতেই তাহা বহু প্রচুর ভাবে রহিয়াছে।

বেদপন্থিক, বৌদ্ধ ও বিশেষতঃ জৈনধর্ম্ম ভারতবর্ষকে বহু পরিমাণে আমিষ ভোজন

হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিল, নানা লোককে নানারূপে এসম্বন্ধে ঐ সকল ধর্ম্মে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবাসীর যতদিন তাহাতে গভীর শ্রদ্ধা ছিল, ততদিন অনেকেই ঐ ভীষণ অখাদ্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতেন: পাশ্চাত্যগণের সংসর্গে শ্রদ্ধার শিথিলতার সহিত ধর্ম্মোপদেশে অবিশ্বাসের সহিত ভারতবাসীদেরও মধ্যে মাংসাহার ক্রমশঃ বেশী হইয়া চলিয়াছে দেখা যায়। পাশ্চাত্য জাতির এখন এবিষয়ে নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে, তাঁহারা মাংস ভোজনের অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন, এবং নানারূপে লোককে বুঝাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কার্য্যতও অনেকে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। আশা করা যায়, ভারতবাসীরও আবার চক্ষু খুলিবে, তাঁহারাও আবার ফিরিয়া দাঁড়াইবেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

সমস্যা

জ্ঞান অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়। জগতে জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত সংশয় বৃদ্ধি পাইতেছে। দর্শন বিজ্ঞানের বিভিন্ন মতের সমন্বয় এখন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ধর্ম্ম' 'পরলোক' প্রভৃতি অপ্রমেয় ও 'রাজনীতি' প্রভৃতির সমস্যা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা 'বৈজ্ঞানিক' 'সামাজিক' প্রভৃতি কয়েকটি সমস্যার বিষয় আলোচনা করিতেছি।

১। বিজ্ঞানের মতে আমরা ইচ্ছা করিলে অনেক রোগ তাড়াইতে পারি। ইতালি, পানামা প্রভৃতি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া তাড়াইতে পারিয়াছি। ডিপ্‌থিরিয়া শাসনে আসিয়াছে; আমরা আশা করি সুদূর ভবিষ্যতে সকল রোগই বিজ্ঞানের শাসনে আসিবে।*

জীবজগতে রোগ আছে, ও রোগযন্ত্রণায় অনেক ইতর-প্রাণী অকালে প্রাণ হারায়। তাহারা বিজ্ঞানের সাহায্য নির্ভর করে না, তাহাদের প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতাই প্রধান সম্বল। যাহাদের রোগ সহ্য করিবার শক্তি আছে, তাহারাই বাঁচিয়া যায়, ও অক্ষমেরা মারা যায়। সুতরাং যাহারা বাঁচে তাহাদের সহ্যগুণ বেশী। এইরূপে যোগ্যতমের সমুন্নতি ও অযোগ্যের লয় ইতর জীবের উপকারে আসিতেছে, তাহারা ক্রমশঃ রোগ সহ্য করিবার ক্ষমতা অধিক অর্জ্জন করিতেছে, আর সভ্য মানব সে ক্ষমতা হারাইতেছে। সেদিন পড়িলাম যে বিলাতে পশুশালায় মেরু প্রদেশের শ্বেত ভল্লুকের কয়েকটি শাবক হইয়াছিল, ও তাহারা সকলেই নিউমনিয়া রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে তাহাদের প্রতি বৎসর শাবক হয় ও ঐ রোগে মারা যায়। নিউমনিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়। ভল্লুকদম্পতির ও রোগ হয় নাই তাহাদের শাবকদেরই হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সওন মেরু প্রদেশ অপেক্ষা অনেক গরম কিন্তু শাবকগুলি

* The victory over plagues of nature is seem to be well within the competance of man—N. Century and after, Sept. 1913.

বাঁচে না। অনেকের মত যে মেরু-প্রদেশে নিউমনিয়া রোগ নাই, সুতরাং ঐ প্রদেশস্থ জীবগণকে এপর্য্যন্ত ঐ রোগের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই, সেই জন্য তাহাদের ঐ রোগ সহ্য করিবার বংশগত ক্ষমতা নাই। ভদ্রদম্পতি কএক বৎসর লণ্ডন সহরে বাস করিয়া বোধ হয় ঐ রোগ সহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে কারণ তাহাদের ত রোগ হয় না। অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, যে স্থানে কোন রোগ সংক্রামক হইতেছে তথায় অন্য স্থান হইতে আগত অনেরা, ব্যাধি গ্রস্ত হইতে অধিক দেখা যায়। ইহারও ঐ কারণ। রোগের মধ্যে থাকিলে বোধ হয় ঐ রোগ সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা করা উচিত।

আবার বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা কয়টা রোগ তাড়াইতে পারিয়াছি ও সভ্যতার সহিত কয়টা রোগ সৃষ্টি করিয়াছি তাহাও দেখা উচিত। ডারউইন দেখাইয়াছেন যে সভ্যতার সহিত রোগসংখ্যা বৃদ্ধিপায়। আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে উল্লেখ নাই এমন কত রোগ আমরা দেখিতেছি। 'টিকা'দেওয়া আজকালকার রোগ হইতে নিস্তার পাইবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া স্থির হইয়াছে। বসন্তের 'টিকা', প্লেগের, টাইফএড্ এমন কি সিফিলিস্ ও গনোরিয়ার টিকা উঠিয়াছে। কিন্তু এক বসন্তের ভিন্ন অন্য রোগের তাবৎ ফল পাওয়া যায় নাই। আবার একদল ডাক্তারদের মত টিকাদেওয়াতেই যত রোগের উৎপত্তি হইতেছে। বিলাতে টিকা-দেওয়ার একটি বিপক্ষদল হইয়াছে।

আমরা সকলেই জানি যে জলে, বায়ুতে ও খাদ্যে কতরকম রোগের বীজাণু আছে ও প্রত্যহ কতলক্ষ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। কিন্তু আশ্চর্য্য আমরা কি করিয়া বাঁচিয়া থাকি? অনেকের মত যে আমাদের শরীর রোগের জন্য প্রস্তুত (predisposed) হইলে তবে রোগ হয়। মনের স্ফূর্ত্তি, সহজ পথ্যে উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি অনেক রোগকে প্রতিহত করে। যতদিন বাঙ্গালায় অন্নকষ্ট ছিল না মনে সুখ ছিল খাদ্য বিশুদ্ধ ছিল ততদিন বাঙ্গালায় ম্যালেরিয়া ছিল না। আজ যদি সত্য সত্যই আমরা ম্যালেরিয়ার বিষ দেশ হইতে তাড়াইতে পারি কাল আর একটি রোগ উপস্থিত হইবে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে পঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশে ম্যালেরিয়া ছিল না। তখনও বাঙ্গালা হইতে ঐ রোগের বীজ তথায় আসিত, কিন্তু কেন তথায় ঐ রোগ বিস্তার করিত না? এখন ঐদেশ বাঙ্গালার মত ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কেন? ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

Dr. Macnamara বলেন ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত দেশের জন্ম সংখ্যা হ্রাস পায়, কারণ ঐ রোগীদের পুত্র উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া যায়। Malthus দেখাইয়াছেন যে কোন সুজলা সুফলা দেশে কোন জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিলে ২৫ বৎসর অন্তর তাহাদের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। তাহার পর যত অন্ন দুর্লভ হয় অপত্য উৎপাদিকা শক্তিও কমিয়া যায়। যতদিন মনের স্ফূর্ত্তি থাকে, আহার বিশুদ্ধ ও সুলভ থাকে, তাহারা ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে। তাহার পর অন্নচিন্তা চমৎকার হইলেই অবসাদ ও রোগ আসে।

ইংরাজেরা অষ্ট্রেলিয়া দখল করিলেও তদ্দেশবাসীরা শীঘ্রই অধীনতা স্বীকার করে নাই। সেই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও সেই আদিম জাতি বাঁচিয়াছিল। কিন্তু তাহারা যেদিন হইতে অধীনতা স্বীকার করিল সেই দিন

হইতে লোপ পাইতে বসিল। ইংরাজ তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টাই করিলেন। স্বাস্থ্যকর একটী দ্বীপ তাহাদের ছাড়িয়া দিলেন কিন্তু কিছু হইল না, তাহাদের লোপ কেন হইল? বিজ্ঞান কি তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? বাঙ্গালার আর্থিক, মানসিক, শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হইলে ম্যালেরিয়া যাইবে না। ইতালি, প্যানামা প্রভৃতি দেশেও আমরা এই সমস্যাই দেখিতে পাই।

২। নূতন বিজ্ঞান Eugenus এর মতে (ক) কেবল 'যোগ্য' জীবকে বংশরক্ষা করিতে দেওয়া উচিত (খ) অযোগ্যকে নহে।

এ এক নূতন কৌলিন্য! যাহারা প্রকৃতির সুসন্তান, রূপে গুণে স্বাস্থ্যে বুদ্ধিতে উন্নত, তাহাদেরই বংশ রক্ষা করা উচিত। আর যাহারা অযোগ্য, তাহাদের যাহাতে বংশ না থাকে তাহা করা উচিৎ। এই বিজ্ঞানমতে এই রূপেই মানবজাতির উন্নতি সম্ভব।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রকৃতির অযোগ্য সন্তানের বংশই বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। জলে যখন খাদ্যের অপ্রতুল হইল বা এমন কোন কারণ ঘটিল যে দুর্ব্বল মৎস্যগণ অপেক্ষাকৃত সবল জাতিদের সহিত আর পারিয়া উঠিল না তখন তাহাদিগকে পরাজিত ও বাধ্য হইয়া স্থলের দিকে আসিতে হইয়াছিল এবং সেই দুর্ব্বল মৎস্যদিগের বংশধরগণ ক্রমে সরীসৃপে রূপান্তরিত হইয়াছিল। আবার সেই সরিসৃপদের মধ্যে দুর্ব্বল অক্ষমেরা অপেক্ষাকৃত সবল জাতিদের নিকট পরাজিত হইয়া তাহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও তাহাদের সন্তানেরা ক্রমে চতুষ্পদ পশুতে রূপান্তরিত হইয়াছিল ও এইরূপে পশু হইতে মনুষ্যতে পহুঁছিয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে যে অযোগ্য মৎস্য হইতে ক্রমে সরীসৃপে ও তাহা হইতে কত যোনি ভ্রমণ করিয়া ক্রমে মানবে পহুঁছিয়াছে ও সেই সবল মৎস্যগণ এখনও মৎস্যই রহিয়াছে। এখানে অযোগ্যতাই উন্নতির মূল। যদি সেই সবল মৎস্যগণ তাহাদের দুর্ব্বল জাতিদের অযোগ্য বলিয়া তাড়াইয়া না দিত তবে বোধ হয় অভিব্যক্তির ইতিহাস অন্যরূপ হইত। মানবের উদ্ভব হইত না এখনও আমরা হয়ত কোন অতল জলে সাঁতার দিতাম। মানব সেই অযোগ্যের সন্তান, আর তখনকার সুযোগ্য বংশ এখনও মৎস্য সূর্খাদি অবস্থা হইতে উন্নত হয় নাই।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে New Statesman পত্রে একজন একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য জার্ম্মাণজাতির ভুল দেখান, কিন্তু তিনি প্রসঙ্গক্রমে বৈজ্ঞানিক নানামতের সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে Darwin এর Struggle for existance (জীবিত থাকিতে হইলে যুদ্ধ করিতে হয়) একটি প্রকাণ্ড অর্দ্ধ সত্য (half truth) এবং এই ভুল মত যে আমরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম ইহাই আশ্চর্য্য। তাঁহার মতে এই ভুলের জন্য আমরা কত অন্যায় করিয়াছি ও করিতেছি।

জার্ম্মাণদের মতে ভারউইনের 'জোর যার মুলুক তার' একটি চির সত্য সুতরাং আমাদের জোর আছে, আমরা দুর্ব্বলদের নিকট হইতে কেন কাড়িয়া লইব না? প্রত্যেক জীব যাহা করিতেছে আমরা তাহা কেন করিব না? জগতে যদি সব জীব বাঁচে তাহা হইলে দুই দিনে খাদ্যাভাবে সকল জীবই মরিয়া যাইবে। সেই জন্য যে কাড়িয়া খাইতে পারে সেই বাঁচে। প্রত্যেক জীব

যাহা করে আমরা তাহার অতিরিক্ত কিছু করিতেছি না। সবলেরা কাড়িয়া খাইয়া বাঁচে ও দুর্ব্বলেরা মরিয়া গিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করে। এইরূপে জীব উন্নত হয়। Eugenus এই কথাই বলে। লেখক বলিতেছেন ইহা সত্য নহে Eugenus এর ভুল ভাঙ্গিয়াছে, আর যুদ্ধের পর Eugenists বা সুজনন-বাদীদের দেখা যাইবে না। যদি সকল ইংরাজ এই সুজনন-বাদীদের মতে চলিয়া সকল দুর্ব্বল শিশুদের মারিয়া ফেলিত, তাহা হইলে এতদিন ইংরাজ সৈন্যভাবে জার্ম্মাণের কবলে আসিত। এই লেখকের মতে সকল মনুষ্যই সমান। মানবের উন্নতি সংগ্রামে নহে, মৈত্রীতে।

ইনি বলেন 'প্রকৃতির নির্ব্বাণে' প্রকৃত প্রকৃতির 'বিবর্জ্জন' অর্থাৎ ইহাতে ধ্বংসের ইতিহাসই পাওয়া যায়; বোধ হয় তাহার বলিবার উদ্দেশ্য যাহারা প্রকৃতির উপযুক্ত নহে তাহারা মারা যায় বটে, কিন্তু যাহারা উপযুক্ত তাহাদের বিশেষ কোন উপকার হয় না। তাহার মতে পরস্পর সাহায্য করাই (Co-ordination) সকল উন্নতির মূল, বিরোধ নহে।

তিনি তাঁহাদের বুঝাইবার জন্য দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন। একটি—আমাদের দেহ অনেকগুলি কোষে নির্ম্মিত, যতদিন সব কোষগুলি একত্র কার্য্য করে ও পরস্পরকে সাহায্য করে জীব বাঁচিয়া থাকে। আর যে মুহূর্ত্তে পরস্পর বিদ্রোহী হয় মৃত্যু আসে।

তিনি বলেন দেখ ইহুদী জাতি যুদ্ধ না করিয়া কত উন্নতি করিয়াছে। তাহারা জগতের সর্ব্বত্র বাস করে। তাহাদের উন্নতির মূল তাহারা শান্তিপ্রিয় ও স্বজাতিবৎসল।

সুতরাং জগতে 'যোগ্য' ও 'অযোগ্য' বলিয়া কিছু নাই। যে কেহ কোন বিষয়ে যোগ্য অন্য বিষয়ে অযোগ্য হইতে পারে। আজ যাহা যোগ্য কাল তাহা অযোগ্য হইতে পারে। আবার 'অযোগ্য' হইতেই কত উন্নতি হইয়াছে। আমরা দেখিলাম যে, আদি যুগে যাহারা সম্পূর্ণ যোগ্য ছিল তাহারা আজিও সেই অবস্থায় আছে আর অযোগ্যের বংশধরই জগতে উন্নতি করিয়াছে।

মানব প্রকৃতির বিদ্রোহী সন্তান।* মানুষের মনুষ্যত্ব ইহাই। Sir Oliver Lodge বলেন, মানবের নৈতিক উন্নতি প্রাকৃতিক 'ক্রমোন্নতির' বিরোধী। জীবের স্বজাতি-প্রেম ও পরস্পর সাহায্য করা ব্যতীত জাতির উন্নতি কেবল বিরোধ ও যুদ্ধের দ্বারা সম্ভব হইত কিনা তাহা এখন ঠিক হয় নাই।

(খ) Engenies শাস্ত্র রোগীদের উপর বিশেষ আপত্তি। রোগী প্রায় নিজ সন্তানে রোগের বীজ রাখিয়া যায়। উন্মাদ্‌গ্রস্তের সন্তান বা পৌত্র প্রায় উন্মাদ্ হয়। কুষ্ঠ ব্যাধি গ্রস্ত, যক্ষ্মাগ্রস্ত উপদংশাক্রান্তদের সন্তানেরা প্রায় ঐ ঐ রোগগ্রস্ত হয়। সুতরাং ইহাদের বংশ বিস্তার করিতে দেওয়া উচিত নহে।

গত বৎসরের British Medical Gazetteএ এক ব্যক্তি প্রতিভা ও ব্যাধি বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই কোনও না কোন ব্যাধি-গ্রস্ত ছিলেন। সিজার মহম্মদ, মৃগি রোগ গ্রস্ত; ক্যাল্‌ভিন্ সকল রোগের অধীন Rachelieu জীবনের বেশী ভাগ রোগের যন্ত্রণায় কাটাইয়াছেন। নিউটন স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য রোগে কাতর ছিলেন, ডারবিন্ দুই ঘণ্টা

* Man is nature's first rebel * * her first insurgent son. Ray Lanketer.

পরিশ্রমে কাতর হইতেন। হুই, হুইফট্, জনসন, কোনও না কোন রোগগ্রস্ত ছিলেন।

আরিষ্টটলের সময় হইতে ইহা জানা আছে যে প্রতিভা ও বায়ু-রোগ অঙ্গেছ্যভাবে সংযুক্ত। কেহ কেহ বলেন যে প্রতিভাই বায়ুরোগের একটি লক্ষণবিশেষ। ইহা জানা আছে যে প্রতিভাবান্ অনেকেই কোনও না কোন বায়ু-রোগগ্রস্ত (Neuratic) বংশ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন।

বাত-রোগ (Gout) অধিকাংশ প্রতিভাবান লোকের দেখা যায়। পিত্ত-রোগ কার্লাইলের অনেক রচনায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

যক্ষ্মা-রোগে অনেকগুলি কবি ভুগিয়াছেন। Dr. Charles Readএর মত যে যক্ষ্মার বিষই রক্তে মিশিয়া প্রতিভার বিকাশ করিয়াছে।

Dr. Knox বলেন বাতুলতা ও প্রতিভা পরস্পর সংযুক্ত। * অনেক পাগলদের দেখা যায় যে তাহারা প্রতিভাবান পিতামাতার সন্তান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের পুত্রেরা প্রায় বাতুল বা অপরাধী। লুথারের এক পুত্র অতিশয় রুঢ় ও পাষণ্ড, সিসিরোর পুত্র মদ্যপায়ী। মার্কাস আরলিয়সের পুত্র নৃশংস নরাধম ছিল। আমরা যদি পিটর দি-গ্রেট ও নিজারদের বংশাবলি অনুসন্ধান করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব তাহারা অবনতির পথেই অগ্রসর হইয়াছিল উন্নতির পথে নহে। এ দেশেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। সুতরাং Eugenies মতে চলিলে যে বিশেষ উপকার হইবে বোধ হয় না। বরং অপকারের সম্ভাবনাও আছে। এ বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকা এ সমস্যা সমাধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

৩। মানসিক শক্তির বিশেষ পরিচালনা করিলে শারীরিক শক্তির অবনতি ঘটে। আবার দুর্ব্বলচেতা প্রায়ই বলবান হয়। বিদুষী রমণী (Intillectual woman) প্রায় বন্ধ্যা হন। সুতরাং যাহারা যতই মস্তিষ্ক চালনা করিবেন ততই অপুত্রক হইবেন। * এদিকে যত পাষণ্ড ব্যক্তিরা শত পুত্রের জনক হইয়া জীবন-যুদ্ধে অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে। ইউরোপে অপত্য সংখ্যা কমিতেছে ও এসিয়ার পীত জাতি ও আফ্রিকার কৃষ্ণজাতি বাড়িতেছে। অনেক পণ্ডিতের মত দূর ভবিষ্যতে শ্বেতকায় জাতি লোপ পাইবে ও ইহারাই জগৎ অধিকার করিবে। ইহাই পীত আতঙ্ক। এ সমস্যার মীমাংসা করিতে পাশ্চাত্য সুধীগণ ভাবিয়া আকুল হইতেছেন।

৪। সামাজিক সমস্যা প্রধানতঃ স্ত্রী পুরুষের অবস্থা লইয়া। ইহা ইউরোপ ও আমেরিকার ভীষণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা নারীকে নানা বন্ধনে বাঁধিয়া নিশ্চিন্ত আছি।

আদিতে যখন সমাজবন্ধন হয় নাই—নরনারীর অবস্থার কোনরূপ বৈষম্য ছিল না, তাহারা পশু পক্ষীদের মত অপত্য উৎপাদনের জন্য মধ্যে মধ্যে মিলিত হইত, পরস্পরের আর কোন সম্বন্ধ থাকিত না; মাতাকে সন্তান প্রতিপালন করিতে হইত পিতার সহিত আর বিশেষ সম্পর্ক থাকিত না। নারীকে সন্তান প্রতিপালনের গুরুভার বহন ও আত্মরক্ষা করিতে ক্রমে বেগ পাইতে

* The Statesman 27-12-13.

* Genisis vary inversely as individuation, it must be suppressed altogether if individuation becomes complete—The Evolution of Sex. Geddes and Thomson.

হইল। সেই জন্য প্রথম সমাজবন্ধনের সৃষ্টি হইল। নরকে গর্ভ ধারণ ও শিশু প্রতিপালন করিতে হইত না বলিয়া সে অপেক্ষাকৃত বলবান ছিল। সুতরাং নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইল। এইরূপে নারী অধীন হইল। ক্বচিৎ নারীকে কর্তৃত্ব করিতে দেখা যায়, সে অন্য কারণে। নারী ইচ্ছা করিয়া নরের অধীনতা গ্রহণ করিয়াছে বোধ হয় না। সামাজিক ইতিহাসে কত সন্ধি বিদ্রোহের চিহ্ন প্রচ্ছন্ন আছে। নর ও নারীর সন্ধি বিদ্রোহ লইয়া কত বিভিন্ন সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে, কোথাও নারী রাণী ও কর্ত্রী আর সর্ব্বত্র প্রায় দাসী, নর তাহার ভাগ্যবিধাতা। আমরা কত আচারে বিচারে নারীকে কত বন্ধনে বান্ধিয়াছি। কোন পুরাকালে নারী নরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, নর তাহার দাবী আজিও ছাড়িতেছে না। ১৩২০ সালের 'যমুনা' পত্রে শ্রীমতী অনিলা দেবী দেখাইয়াছেন আমরা নারীর কি মূল্য নিরূপণ করিয়াছি।

পশ্চিমে নারী আবার সন্ধি ভঙ্গ করিতেছেন। কোন কোন স্থলে তাঁহারা নরের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতেছেন। তাঁহারা অনেক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন। তথাপি বিবাহ-বন্ধন আর নারীর একলার বন্ধন নহে নর ও নারীর উভয়ের তুল্যবন্ধন। Suffrajist তার কোথায় দাঁড়াইবেন কে জানে! পশ্চিমের নরনারীর সংঘর্ষ দেখিয়া বোধ হয় তাঁহারা আবার আদিম যুগের মত প্রকৃতির বেদীতে আসিয়া দাঁড়াইবেন। এ সমস্যার মীমাংসা কোথায়?

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি, এ।

আসাম প্রদেশে হিন্দুধর্ম্মের সম্প্রসারণশীলতা

সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস হিন্দুধর্ম্ম সম্প্রসারণশীল নহে। ম্লেচ্ছাদি আর্য্য-সংস্কার-হীন জাতি অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণ হিন্দুধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিতে পারেন না। আজি কালি দৃষ্টতঃ এরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই বলিয়া এরূপ বিশ্বাস সাধারণতঃ হওয়া অসম্ভব নহে।

দেখা যায় সম্প্রসারণশীলতাই সমাজের সজীবতার লক্ষণ। ক্ষয়শীলতা তাহার বিপরীত। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত মানব-সমাজ উন্নতিমার্গগামী থাকা অবস্থায় উদারভাব পোষণ করিয়া সমাজের সম্প্রসারণশীলতার বহুবিধ উপায় বিধান করিয়া রাখেন। অবনতি অবস্থায় রক্ষণশীলতা এবং ক্রমশঃ সঙ্কোচনশীলতা দৃষ্ট হয়, তখন উদারতার স্থলে সঙ্কীর্ণতা দৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মণ্যানুগত ভারতীয় আর্য্যগণও উদারতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সমাজের সে সম্প্রসারণশক্তি জাগরিত রাখিয়াছিলেন এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নাই, বর্ণভেদ বা জাতিভেদযুক্ত হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে উহার অতি প্রাচীনতম সময়ে কি অবস্থা ছিল নির্ণয় করা কঠিন হইয়াছে। ইতিহাস অভাবে কিছু কিছু ইঙ্গিত করিলেও মানবের স্বাভাবিক আত্মমর্য্যাদা ভক্ত বংশ বা আভিজাত্য মর্য্যাদা

বশতঃ পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ বা স্বীকার করিতে সহজে সম্মত হয় না।

অতীব প্রাচীনতম কালের এ-প্রদেশের ইতিহাস অবগত হওয়া যায় না। পুরাণ-কাহিনীই ইতিহাসের অভাব বলিয়া অনেকটা ধরিয়া লইবার আবশ্যক হয়। পুরাণাদিতে জানা যায় কামরূপ প্রদেশে আসুরিক রাজত্ব ছিল। অসুররাজ্যাধিপতি নরকাসুর আর্য্য রাজর্ষি জনকের গৃহে ভূমিষ্ঠ হওয়াবধি যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত বিশেষ যত্ন সহকারে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হন। আসুরিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এ-প্রদেশে ম্লেচ্ছ স্বভাবাপন্ন দুর্দ্ধান্ত কিরাতজাতির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর্য্যদ্বেষী দানবাধিপতিরও এ অঞ্চলে বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। নরকাসুরের ভূমিষ্ঠকাল অবধি কামরূপ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত এই সময়ের পৌরাণিক আখ্যান পাঠে বেশ ধারণা হয় আর্য্যভাবে প্রতিপালন ও আর্য্যসংস্কারে অতি সযত্নে পালন করিয়া আর্য্যসংস্কারপুষ্ট ও আর্য্যপ্রভাবাধীনে লব্ধ রাজত্ব কামরূপ প্রদেশে আর্য্যপ্রভাব বিস্তার করাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আযৌবন নরকাসুর রাজর্ষি জনক ও তদীয় মহিষীকেই জনক জননীরূপে সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছিল। আর্য্যভাবে প্রতিপালন করিয়া আর্য্যসংস্কার বদ্ধমূল করাই এরূপভাবে প্রতিপালনের উদ্দেশ্য ছিল। আসুরিক শক্তির পরিচালনাধীনে কিরাতাদি দুর্দ্ধান্ত ম্লেচ্ছশক্তি উদ্ভেজিত করা এবং দানবীয় শক্তির প্রভাব হীন করিয়া আর্য্য প্রভাবাধীনে আসুরিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করাই উদ্দেশ্য ছিল।

আর্য্য-সংস্কারাপন্ন ও আর্য্য প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও কালক্রমে কামরূপেশ্বর নরকাসুর দেববিদ্বেষী হইয়া আর্য্যদিগের ঘোরতর বৈরীতাচরণ করিয়াছিলেন। নরকাসুর বিনষ্ট হইবার পর তদীয় পুত্র ভগদত্ত শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্য স্বীকার করিলেও বৈরীতা বিস্মৃত হন নাই। আর্য্যশক্তি যখন কুরুপাণ্ডবরূপে আত্মদ্রোহীতায় মত্ত সে সময় কুরুক্ষেত্রের মহাহবে কুরুকুল আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডবকুলের বৈরীতাচরণ করিতেছিলেন। আর্য্যবংশধর আসুর ভাবাপন্ন দুর্য্যোধনকে কন্যাদান করিয়া আর্য্যদিগের সহিত আত্মীয়তা আনুগত্য রক্ষা করিতেছিলেন। পৌরাণিক আখ্যান হইতে এই সকল বৃত্তান্ত দ্বারা ধর্ম্ম বা সমাজের সহিত রাজনৈতিক সংস্রবের আভাষ পাওয়া যায়।

যেহারত মানবসমাজ ধর্ম্মানুশীলনের দ্বারা পারলৌকিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে ঐহিকতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহকাল হারাইয়া পরকাল চিন্তা করিলে সমাজের প্রতিষ্ঠা কিরূপ ভাবে থাকিতে পারে অনুমান সাপেক্ষ। কাজেই সমাজের ঐহিকতা রাখিতে হইলে ধর্ম্মের সহিত সকল প্রকার যোগ রাখারও যেমন প্রয়োজন রাজনৈতিকতা রক্ষা ও তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় নহে। সুবিধা অসুবিধার দিক দিয়া রাজনৈতিকতার প্রতিষ্ঠা, কাজেই রাজনৈতিকতার সহিত সমাজ ও ধর্ম্মবিশেষের সংস্রব ধর্ম্মের দিক দিয়া পরকালের সহিত জড়িত নহে সুবিধা অসুবিধার দিক দিয়া ঐহিকের সহিত সংস্রবযুক্ত।

ভগদত্ত ব্যতীত নরকাসুরের অন্যান্য পুত্রও ছিল কালিকা পুরাণে তাহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত তাহাদিগের সম্বন্ধে অন্য কোন প্রসঙ্গ কোনও পুরাণে উল্লেখ আছে বলিয়া আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সম্ভবতঃ তাঁহারা ভারতবর্ষের বাহিরে দূরতর প্রদেশে আসুরিক রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা আর্য্য সংস্রবে ছিলেন না তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

ভারতের বাহিরে সুদূরতম প্রদেশেও যে আসুরিক রাজ্য ছিল তাহার উল্লেখ পুরাণাদিতেই পাওয়া যায়। প্রবল প্রতাপান্বিত শক্তিশালী নরকাসুর দেবদ্বিজদ্বেষী হইয়া আসুরিক দুর্দ্দান্ত শক্তিতে যে সময় কামরূপরাজ্য শাসন করেন সে সময় পৃথিবীর অন্যান্য স্থল হইতে আর্য্যদ্বেষী প্রধান প্রধান অসুরগণকে নরকের রাষ্ট্রীয় শক্তি সুদৃঢ় রাখিবার জন্য কামরূপরাজ্যে আনয়নপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করা হয়। পৌরাণিক আভাষে অনুমান হয় বিচ্ছিন্ন প্রায় আসুরিক শক্তি এই সুযোগে নরকাসুরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া জগতে আসুরিক শক্তিপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আর একবার এই সময় একতাবদ্ধ হইয়াছিল। আসুরিক শক্তি দমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই সময় মুরমুন্দ উপসুন্দ প্রভৃতি অসুরপ্রধানগণকে বিনাশ করিয়া পরে নরকাসুরকে বিনাশ করেন।

মহাভারতে দৃষ্ট হয় ভগদত্তকে যবনাধিপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মুর ও নরকদেশাধিপতি বলিয়াও উল্লেখ আছে বরুণের যেমন পূর্ব্ব মহাসমুদ্রান্তর্গত প্রদেশে রাজ্য ছিল ভগদত্তেরও পশ্চিমদিকে তদ্রূপ রাজ্য ছিল বলিয়া মহাভারত পাঠে বুঝা যায়। "যিনি মস্তকে দিব্যমণিধারণ করেন, যিনি মুর ও নরকদেশ শাসন করেন, যিনি বরুণের ন্যায় পশ্চিম দেশে বাহুমূল হইয়াছেন, তোমার পিতৃবন্ধু মহাবলপরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিয়া থাকেন।" শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে ঐরূপ বলিতেছেন। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত সভাপর্ব্ব ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। মুরদেশ নরকদেশ কোনটি বর্ত্তমানকালে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নাম সাদৃশ্যে Moorsland নরক দেশ কি না তাহা অনুমানসাপেক্ষ।

ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র মহাসমরে বিনষ্ট হইলে তদীয় পুত্র বজ্রদত্ত রাজ্যপ্রাপ্ত হন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ আর্য্যপ্রভাবাধীন হইয়া নরকাসুরবংশীয় নরপতিগণ বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়া উঠেন। দেবদ্বিজদ্বেষী অসুরবংশীয় নরপতিগণের বংশধরগণ উত্তরকালে দেবদ্বিজে নিষ্ঠান্বিত ও ব্রাহ্মণাধিষ্ঠিত আর্য্যধর্ম্মের অত্যন্ত অনুগত হইয়া প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। এমন কি নরকাসুরবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াও দেব, বর্ম্মণ, উপাধিধারী হইয়া ক্ষত্রিয় পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ব্রহ্মপালাদি নরকাসুর বংশীয়গণের তাম্রশাসন হইতে উহাদিগের আসুরিক বংশপর্য্যায়ে বর্ম্মান্তধর্ম্মান্বিত আর্য্যপরিচয়ে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় উল্লেখ আছে। কুমার ভাস্কর বর্ম্মার তাম্রশাসনে তিনিও নরকাসুর বংশীয় ছিলেন বলিয়া উল্লেখ অবগত হওয়া যায়। বর্ম্মণ উপাধিতে ক্ষত্রিয় পরিচয় জ্ঞাত হওয়া যায়।

পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইলে পর যাঁহারা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা যথার্থ ক্ষত্রিয় নহেন। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার করিয়া থাকেন ও তাঁহারা একত্র হইয়া কুল-নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতের উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে।

ব্যবহারিকভাবেও দেখা যায়, সাধারণতঃ প্রবাদ আছে "বার রাজপুত তের হাড়ী"

রাজপুত ক্ষত্রিয় পরিচয়েও পরস্পর অন্নগ্রহণ প্রথা প্রচলিত নাই। শুধু যে আভিজাত্য মর্য্যাদাই ইহার মূলে আছে, মূলতঃ জাতিভেদ (Racial distinction) নাই এমন মনে হয় না। (Racial distinction) বলিলে ঠিক কথাটা প্রকাশ করা হয় না। আকৃতি অনুসারে Racial distinction অনেকটা অবধারণ করা হয়। আর্য্যগণ প্রকৃতি অনুসারে জাতি নির্ণয় (Racial distinction) করিতেন। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অসুর, সুর, প্রভৃতি নামে মানবজাতিকে প্রকৃতি অনুসারে বিভাগ নির্ণয় করিতেন। আর্য্য অনার্য্য-ভেদ নির্ণয় বর্ত্তমান কালের civilized, uncivilized শব্দ প্রয়োগের ন্যায় আর্য্য অনার্য্য শব্দ প্রয়োগ হইত বলিয়া অনুমান হয়। আর্য্যানুমোদিত সভ্যতা যাহাদিগের ছিল তাঁহারা আর্য্য তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলে অনার্য্য বলিয়া অভিহিত হইত। যুদ্ধ বিসম্বাদে ও ঘৃণা প্রকাশ কালে অকারণ "অনার্য্য" বলিয়া অভিহিত করিতেও দেখা যায়।

সুতরাং শ্বেত কৃষ্ণ পীত পিঙ্গলবর্ণ হ্রস্বকায় দীর্ঘকায় যেরূপ আকৃতি হউক না কেন আর্য্য হইতে বাধা কি হইতে পারে বুঝি না। আজি কালির পাশ্চাত্য সভ্যতা পৃথিবীর যে-কোন দেশবাসী যে-কোন জাতিই পরিগ্রহণ করুক না কেন তাহাদিগকে যেমন civilized বলা যাইতে পারে, আর্য্যও তদ্রূপ ভাবে বলা যাইত বলিয়া অনুমান করা যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট হইলেই যে অসভ্য বর্ব্বর অর্থে অনার্য্য বুঝিতে হইবে এমন কোন কথা নাই।

রাক্ষস অসুর আখ্যাধারী মানবগণেরও জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। বরং মায়া কৌশলে রাক্ষসাদি জাতিনিচয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অনেক স্থলে এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে মায়াকৌশলকে mechanism বলিয়া ধারণা হয়। ইন্দ্রভবন হইতে অর্জ্জুন যখন অসুরাধিকৃত দ্বীপে গমন করেন, তথাকার বর্ণনা যাহা মহাভারতে উল্লেখ আছে তদ্দ্বারা ও মায়ানারী, মায়াযুদ্ধ, ইত্যাদি পৌরাণিক বর্ণনায় mechanism বলিয়া মনে হয়। সম্মিলিত শক্তি, ও ভীষণ যুদ্ধ যে প্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে উহাকে মায়াযুদ্ধ, রাক্ষসী যুদ্ধ বলা যাইতে পারে।

অসুর, রাক্ষসাদি জাতির সহিত আমরা যাঁহাদিগের আর্য্যত্ব গৌরবপরিচয়ে আত্মগরিমা বোধ করি, তাঁহাদিগের সহিত বিবাহাদি সংস্রব হইত।

অসুর, রাক্ষসাদি বিবিধ শ্রেণীর মানবসম্প্রদায়ের স্ব স্ব সম্প্রদায়েও যে সকলেই খুব জ্ঞান বিজ্ঞানে শিল্প সৌষ্ঠবে উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় না। উহাদের দিক দিয়া ধারণা করিলে মনে হয় উহাদিগের স্ব স্ব জাতি মধ্যেও সভ্যতার তারতম্য ছিল এবং অনেকে হয়ত সভ্যতালোক পায় নাই।

জীবিকা শ্রেষ্ঠত্বহীনত্বানুসারে অনার্য্যত্ব সম্বোধন করিতেন বলিয়াও মনে হয়। আবার আচার ব্যবহার বেশ ভূষা অনুসারে পৌরাণিক আর্য্যগণ যাহাদিগের বিভিন্নতা বা ত্রুটি দেখিতেন তাহাদিগকে অনার্য্য বলিয়াছেন এমনও ধারণা হয়। আসুরিক রাষ্ট্রীয় প্রভাব প্রবেশের পূর্ব্বে কামরূপ প্রদেশ যে-সকল কিরাতদিগের অধিকারগত ছিল, ঐশ্বর্য্যসৌষ্ঠবে রথাদির উল্লেখে মনে হয় আজিকালির হিসাবে অসভ্য ছিল না,

বরং সভ্যই ছিল। তবে আধ্যাত্মিক স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে পৌরাণিক আর্য্যগণ অনার্য্য বলিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। স্বভাব প্রকৃতি অনুসারে আর্য্যানার্য্য বিশেষণ উল্লেখ আছে বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হয় না। নচেৎ তাহাদিগের সভ্যতা বলিতে আজিকালি যাহা বুঝায় সে সভ্যতা যে ছিল না এমন মনে হয় না।

যাহা হউক ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে অসুরবংশপরিচয়ে কুমার ভাস্কর বর্ম্মার ন্যায় অনেক নরপতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দান করিয়াছেন। এইরূপে অনেক ব্রহ্মণ্যানুগত আর্য্যদিগের পন্থানুবর্ত্তন করিয়া চলিয়া উপযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনুমান হয় বৌদ্ধমতে ভারত প্লাবিত হইলে বর্ণাশ্রম বিভাগের ব্যতিক্রম ঘটার পর আবার যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাব উন্মূলিত হইয়া ব্রাহ্মণ্য প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইল সে সময় বর্ণাশ্রম বিভাগানুসারে পুনরায় অনেক বৌদ্ধমতাবলম্বীগণ সুবিধা অথবা উপযুক্ত অনুসারে বর্ণাশ্রম মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেখা যায় প্রাচীন ইজিপ্ত দেশেও জাতি বিভাগের ন্যায় জীবিকাভেদ ছিল। এরূপ আভাষ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী রুক্মিণীদেবীর পিতৃবংশ আসুরিক ক্ষত্রিয় ছিলেন। রুক্মিণীদেবীর ভ্রাতা ভোজকট নগর সংস্থাপন করেন। আসাম অঞ্চলেই যে ভোজরাজা কুণ্ডিলানগর ছিল কিম্বদন্তী ও পুরাস্মৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

পৌরাণিক সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়—অনার্য্য ম্লেচ্ছকোচগণ ব্রহ্মণ্যানুগত হিন্দুপর্য্যায়ে গণ্য হইয়াছিলেন। অনার্য্য ম্লেচ্ছ অহোম নরপতিগণও হিন্দুপর্য্যায়ে স্থান প্রাপ্ত হন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হওয়াও আশ্চার্য্য ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় গৌরব মহিমা খর্ব্ব হওয়ায় সে সুযোগ ঘটে নাই।

নামোপাধির সাদৃশ্য পৃথিবীর সুদূরতম দেশেও দৃষ্ট হয়। Datus, Palusএর "us" বা "S" যদ্যপি : উচ্চারণ বলিয়া অনুমান করা হয় তাহা হইলে "দত্ত" অথবা "পাল" উপাধির সহিত বিশেষ পার্থক্য থাকে না।

প্রাচীন কামরূপ প্রদেশের কোন কোন পালোপাধিক নরপতির প্রদত্ত তাম্রানুশাসন দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাঁহাদিগের রাজত্ব সুদূর বিস্তৃত ছিল। উহা অনেকে অত্যুক্তি বলিয়া অনুমান করেন। "Hindu Superiority" নামক গ্রন্থপাঠে হিন্দুদিগের উপনিবেশের আভাষ উল্লেখ আছে। হিন্দু প্রভাব ভারতের বাহিরে ব্যাপ্ত ছিল। বর্ণাশ্রম বিভাগ হিন্দুধর্ম্মের বিশেষত্ব, সুতরাং কোন এক সময়ে সে সকল প্রভাবও অন্যত্র ব্যাপ্তিলাভ করে নাই একথা বলা যায় না। ইজিপ্ত অতি প্রাচীন দেশ তথাকার যেটুকু ক্ষীণ ইতিহাসাভাষ পাওয়া যায় তাহারই বা নিদর্শন এখন তথায় কোথায় আছে?

সম্প্রসারণশীলতা যে ছিল তাহার আরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। হৈড়েম্বের কাছাড়ী নরপতিগণ কাছাড় প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া ক্ষত্রিয় পরিচয়ে ব্রাহ্মণ্যানুগত হিন্দু ধর্ম্মাচার পালন করিতেন। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ ম্লেচ্ছ রাক্ষস ছিলেন বলিয়া মহাভারতে অবগত হওয়া যায়। শত্রু মিত্রভাবে সমাগত রাক্ষসাদি বহু নিধন হইয়াছিল। ঘটোৎকচের নিধনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবোধ দিবার ছলে ঘটোৎকচের নিধন হইবার হেতু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন। মণিপুর রাজবংশ

ক্ষত্রিয় পরিচয় দান করেন কিন্তু ইতিহাস মণিপুর রাজবংশ অসভ্য নাগাদিগের জাতিত্ব খ্যাপন করেন। চিত্রাঙ্গদা ও উলূপীর পরিচয়ে পৌরাণিক ঘনিষ্ঠতাও উভয়ের মধ্যে দেখা যায়। সম্প্রসারণশীলতা ছিল না একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় না। তবে সঙ্কোচণশীলতা সে দ্বার অধিকতর রুদ্ধ করিয়া ইতিহাসের সত্যাভাব পাইবার বিঘ্ন ঘটাইয়াছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুণ্যক্ষেত্র ৺ কালীক্ষেত্র

(২)

কালীঘাটে বিদেশী-সমাগম

কালীঘাটে বিদেশী-সমাগমটা দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস। পূজাপার্ব্বণ যোগাদি উপলক্ষে এক একদিন দূরদূরান্তর হইতে যাত্রীসমাগম হয়। এই সব বিদেশীর অভিথির, মায়ের এই সব ভক্ত সন্তানদের, কেবা যত্ন লয় কেবা খোঁজ খবর রাখে; বরং নানাবিষয়ে অনভিজ্ঞ এই সব নবাগতদিগকে নানাদিকে ঠকাইয়া দুপয়সা রোজগারে বিলক্ষণ সুবিধা এবং অনেকেই সে লোভ সংবরণ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, নিজে ত্যাগ স্বীকার করেও অপরের সুখ সুবিধার্থ অগ্রসর এরূপ মহাপ্রাণ জনগণেরও অভাব নাই, কিন্তু কোন দেশেই সেরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে। যাহা হউক এই সব যাত্রীসমাগম হইতে দেশবাসীর উপর মায়ের প্রভাব যে কত বেশী এবং মায়ের টান যে কি বস্তু, সময় সময় তার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত ও বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না এবং এই উপলক্ষে কখন কখন দু একটি নূতন তথ্যও অবগত হওয়া যায়।

আফ্‌গানী হিন্দু

একদিন আফিসে ছুটি হয়েছে, সমবয়স্থ অনেকে মিলে পথ হেঁটে চলেছি ও প্রমলাঘব জন্য নানাবিষয়ে নানারূপ গল্পগুজব করছি, হঠাৎ সঙ্গী একজন বলে উঠলেন "ওহে সেদিন কালীঘাটে এক বড় মজা হয়ে গিয়েছে; মায়ের মন্দিরে একদিন দুই আফ্‌গান্ আফ্‌গান্ এসে হাজির; ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছে দেখে সকলে কাপ্তা হয়ে উঠ্‌ল, কেহ বা নূতন যবন আক্রমণ বুঝি হল ভেবে ভয় পেলে, কেহ বা হিন্দুর মন্দিরে যবনের প্রবেশে বাধা দিতে ছুটল। শেষে জানা গেল—পৈতা খুলে দেখালে—তারা পাঠান নহে, হিন্দু। বহুবর্ষ যাবৎ আফ্‌গানিস্থানে বাস করায়, আকারে ও পোষাকে হুবহু কাবুলীদের মত দেখিতে হয়েছে। তখন বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে সকলে অবাক্ হয়ে মার মহিমা ভাবিতে লাগিল। অমন বিপৎসঙ্কুল খাস মুসলমানের দেশেও হিন্দুর বাস আছে; অত দূরদেশে এতদিন বাস করেও, মাকে তারা ছাড়ে নাই এবং মাও তাদিগকে ভুলেন নাই। হৃদয়ের কিরূপ টানে, কত অর্থ ব্যয় করে, কত ক্লেশ সহ্য করে কালীঘাটে তারা এসেছে কিন্তু এসেই ত প্রথম নজরেই মার স্থানীয় সন্তানদের নিকট ঐরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিল।

আমাদের জানা ছিল, বহু ভারতবাসী আজ পেটের দায়ে জাভিবার মরিশাস্ প্রভৃতি

নানা দূরদেশে কুলিগিরি করছে। অনেকে আবার চেষ্টা করেও, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি বিবিধ সভ্য রাজ্যসমূহে প্রবেশ অনুমতি অবধি পাইতেছে না, ঐ-সব দেশে বাস করে মানের সহিত জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হওয়া ত দূরের কথা। এ অবস্থায় প্রচণ্ড পাঠানের রাজ্যভিটা আফ্‌গানিস্থানে যে হিন্দুর বসতি আছে, পূর্ব্বে আমরা অনেকেই জানিতাম না। একজন ভদ্র গোছের কাবুলীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, পরে জানা গিয়াছে আমীর মহোদয়ের রাজ্যে অনেক হিন্দু বণিকের বাস আছে এবং অন্য অনেক দেশের তুলনায় এখানে তাহারা খুব সদ্ব্যবহারও পায়। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ থাকিতেই হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। মুসলমান হইলেই হিন্দুর শত্রু হয় না। একথা স্বীকার করিতেই হইবে, প্রজারঞ্জন বিষয়ে কোন কোন মুসলমান নরপতি কখন কখন অদ্ভুত মনস্বিতা ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন। বৎসর কত পূর্ব্বে আমাদের সদাশয় ইংরাজ রাজের মিত্র ও অতিথিরূপে আমীর মহোদয় যখন একবার ভারতে এসেছিলেন তখন তাঁর সম্মানের জন্য দিল্লীবাসী মুসলমানগণ অনেক গো কোরবাণী করার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু আমীর মহোদয় হিন্দুগণের মনোবেদনার কারণ হ'তে অনিচ্ছুক হয়ে বলে পাঠালেন যে ওরূপ করা হ'লে তিনি আর দিল্লীনগরীতে প্রবেশ করিবেন না। আফ্‌গান আমীরের হিন্দুপ্রীতির ইহা এক প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে। আকবর বাদশাহ ভারতে গোহত্যা তুলে দিয়ে "হিন্দীশ্বরো জগদীশ্বরোবা" আখ্যা পাইয়াছিলেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, প্রজারঞ্জন বিষয়ে আমাদের ইংরাজরাজ নিয়ত সচেষ্ট। ভারতেশ্বর যদি দয়া করে ভারত হ'তে গো-হত্যাটা তুলে দেন, অন্ততঃ বন্ধুবান্ধবদেশে পর্ব্বাদি উপলক্ষে কোরবাণী ব্যতীত অন্য সময় উহা রহিত করেন, গো-মাংসের আবশ্যক হইলে অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অন্য দেশসমূহ হইতে উহা আমদানী করেন, তাহা হইলে অতি সহজে গো-ব্রাহ্মণ-হিতরত হিন্দুসম্প্রদায়ের বিশেষভাবে মনোহরণে সমর্থ হন এবং যতদূর বুঝিতে পারা যায় ভারতবাসী অন্যান্য সম্প্রদায়ও উহাতে তুষ্ট বই ক্ষুণ্ণ হন না। যাহা হউক এ বিষয়ের এখানে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

এই প্রসঙ্গে আফ্‌গানী হিন্দু সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক একটা ঘটনার কথা মনে পড়িল। বৎসর তিন চারি হইল, একবার প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন কালে ঘণ্টা কয়েকের জন্য আগ্রা সহরটি দেখিয়া আসিতে সাধ যায়। আগ্রাষ্টেশনে নামিয়া মাত্র কাশীঘাটের দালালদের ধরণে একজন হিন্দু-হোটেলওয়ালার চাকরের পাল্লায় বাঁধা পড়ে গেলাম। হোটেলটি ষ্টেশনের খুব নিকটেই অবস্থিত ছিল। সেখানে স্নানাহারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে নগর বেড়াতে যাব ভেবে, সবে একটু বিশ্রাম করছি, এমন সময় প্রকাণ্ড এক মোট লয়ে পশারি এক উপস্থিত। আমার কিছু কিনিবার প্রয়োজন নাই পুনঃ পুনঃ বলিলেও সে নিরস্ত না হইয়া বেশ বিনয় ও সৌজন্যপূর্ণ ভাবে তাহার দ্রব্যগুলি আমাকে শুধু একবার দেখিতে বলিল ও একে একে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। আগ্রার পাথরের মালা, পাথরের ঘড়ির চেন, পাথরের উপর ঝিনুকের কাজ করা থালা, রেকাব, কাসজ চাপা প্রভৃতির মনোহারিত্ব বিখ্যাত।

বিক্রেতা এমনই কৌশলে, একটির পর একটি করিয়া ক্রমশঃ উৎকৃষ্টতর ও অধিকতর মূল্যবান্ শিল্পজাত দেখাইয়া অল্পে অল্পে আমাকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল যে দু একটি না কিনিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে যদি চলিয়া যায়, আর একজন আসে ও এইরূপে আমি কিরূপ দরের খরিদ্দার বুঝিয়া লইতে উহাদের আর বাকি থাকিল না। এইবার একটা নাটুকে কাণ্ড ঘটিল। আমার কক্ষের নিকটেই কাহারা ঝগড়া গোলমাল গালাগালি বাধাইয়াছে। বাহিরে আসিয়া দেখি হোটেল ওয়ালা বা তাহার কোন কর্ম্মচারী, একজন কাবুলীকে নানারূপ ভয় দেখাইতেছে ও গালাগালি দিতেছে। কাবুলিটিও ছাড়িবার পাত্র নহে, কখন ফিরাইয়া গালি দিতেছে, কখন বা মারিতে যাইতেছে, পরক্ষণেই আবার বিনা দোষে সরাইওয়ালার হাতে অপমানিত ও প্রপীড়িত হইতেছে বলিয়া অপরের যেন সাহায্য ও সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতেছে। লোকটিকে দেখিতে অবিকল কাবুলীর ন্যায় কেবল পরিচ্ছদটা সাধারণ কাবুলীর চেয়ে একটু উচ্চ মূল্যের ও জাঁকাল। আমাকে বাহির হইতে দেখিয়াই কাবুলী ভদ্রলোকটি আমার দিকে ছুটিয়া আসিলেন ও হিন্দি ভাষায় তাঁহার অভিযোগের মর্ম্মটা আমায় জানাইলেন, যদ্যা তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ,—পৈতা খুলিয়াও দেখাইলেন—কিন্তু হোটেলওয়ালার এতদূর স্পর্দ্ধা যে মুসলমান বিবেচনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছে ও ঘরভাড়া চাহিতেছে। তিনি একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছেন, তাঁহাকে অধিকতর বিপন্ন করিবার মানসে, হোটেলওয়ালা ভাড়া আদায়ের অছিলায়, ভাল ভাল গরম কাপড়গুলা নাম মাত্র মূল্যে কিনিয়া লইতে চাহিতেছে। একটু সময় দিলে তিনি সেগুলা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া হোটেলওয়ালার প্রাপ্য অর্থ চুকাইয়া দিতে পারেন। তাঁহার নিকট এখন অর্থ নাই হোটেলওয়ালা তাহা বুঝিতে পারিয়াই এইরূপে তাঁহাকে প্রপীড়িত ও অপমানিত করিতেছে।

হোটেলওয়ালার উগ্রভাব তখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই কিন্তু আমার সহিত একটু নরম ও ভদ্রভাবে কথা কহিল ও অনুরোধ করিল আমি যেন উহাদের কথায় না থাকি; তাহারও দু পয়সা লাভের প্রত্যাশা সুতরাং এমন সব সুবিধা সে হাতছাড়া করিতে পারে না ইত্যাদি। এবং আমার সম্মুখেই আহমদানী হিন্দুটিকে যেরূপে পারে কাপড় গুলা বেচিয়া তাহার ভাড়া শীঘ্র শোধ করিয়া দিবার জন্য পুনরায় শাসাইল। কাবুলী হিন্দুটি রাগে গর গর করিতে করিতে তাহার গরম কাপড়ের প্রকাণ্ড বোচকাটি লইয়া আসিল, আমার সম্মুখেই হোটেলওয়ালা সে গুলা দেখিতে লাগিল এবং কাবুলী যে দর চাহে তার চেয়ে খুব কম করে দর দিতে লাগিল। কাবুলী বণিকটি আমাকেই মধ্যস্থ মানে ও এত কমদরে কিরূপে ঐ-সব ভাল জিনিষ ছাড়া যায় ভাবিতে বলিল। আমি এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ নহি কাপড় কিনিবারও প্রয়োজন ছিল না, তথাপি কেমন উহাদের কথাবার্ত্তার টানে পড়িয়া হোটেলওয়ালা অপেক্ষা একটু বেশীদামে একখানি আলোয়ান কিনিতে চাহিলাম। বণিকটি প্রথমে উহাতে রাজি হয় না, কিন্তু শেষে, লোকসান করিয়াও ছাড়িবে তথাপি হোটেলওয়ালার হাতে যাবে না এইরূপ ভাব দেখাইয়া আমাকেই বেচিল। টাকাগুলি গণিয়া দিবার পর আমার কেমন মনে হল, এ সমস্তটাই একটা

নাটুকে কাণ্ড—ভাণ মাত্র। কলিকাতার লোক হ'লেও আমাকে ইহারা ঐরূপে মুগ্ধ করিয়া কৌশলে খরিদদার করিল মাত্র। সত্য-ঘটনা কখন কখন উপন্যাসের ন্যায়ই বিচিত্র হয়; কাবুলী হিন্দু বণিকটির সত্য সত্যই বিপন্ন হওয়া অসম্ভবও নহে। যাহাহউক এ ঘটনাটি কাবুলে হিন্দুর বাস সম্বন্ধে একটা প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে।

মায়ের এই সব নিরক্ষিষ্টপ্রায় সন্তানগণকে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের উপর অনুরাগী রাখিবার জন্য আমরা করিতেছি কি? জাভা ও অন্যান্য স্থলের হিন্দু অধিবাসীরা আমাদের পর হয়ে পড়িল কেন? উত্তরপশ্চিম প্রান্তের কত কত বীর হিন্দুজাতিকে আমরা হারাইলাম কিরূপে? মাদাগাস্কর, মরিশস, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে সব হিন্দুঅধিবাসী বা প্রবাসী রহিয়াছে, হিন্দুস্থান ও হিন্দুধর্ম্মের সহিত ভবিষ্যতে তাহাদের সম্বন্ধ কি আকার ধারণ করিবে? ইহাদিগকে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের উপর অনুরাগী রাখিবার উপায় কি? হিন্দু সন্তানগণের মিলন, রক্ষাসাধন ও বলবৃদ্ধির সদুপায় কি? এই সব বিষয়ে, যাহার একটুও হৃদয় আছে সে অনেক ভাবিবার মত বিষয় পাইবে। আমাদের তীর্থস্থল, দেবালয় প্রভৃতি বহু পরিমাণে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছে। এ-সম্বন্ধে পুণ্যক্ষেত্র এই কালীক্ষেত্র এবং জগন্মাতার অধিষ্ঠানভূমিরূপে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য মহাপীঠ, উপপীঠ, সিদ্ধপীঠ প্রভৃতির প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাম শুনে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণভক্ত, জানিনা কোন্ কৃষ্ণানন্দ ভারতের নানাস্থানে যে সমস্ত কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সে গুলা সেই চিরস্নেহময়ী মায়েরই ন্যায়, অধিনে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীকে আশ্রয় দিয়ে তাঁহাদের অনেকের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় করে দিয়েছে। কালীঘাটের এই মায়ের মন্দিরেই, আমরা জীবিকার্জ্জনের একটা সূত্র পেয়ে কতজন শেষে উন্নতির উচ্চ চূড়ায় আরোহণে সমর্থ হয়েছেন, চেষ্টা করিলেই অনেকে তাহার অনেক সন্ধান পাইতে পারেন। এখনকার দিনে নূতন দেবালয় আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠার কথা ক্বচিৎ কখন শুনতে পাই মাত্র। আমাদের উন্নতির অভিমানটা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। সেকালে আমরা অতীত যুগের বড়াই করিতাম ও নিজেরা বিনয় শিখিতে চেষ্টা পাইতাম। একালের সব উল্টা ব্যাপার। এখন আমরা অতীতকে অবজ্ঞা করে আপনাদিগকে বড় বলে বড়াই করিতে শিখেছি, কিন্তু এখনকার দিনে উন্নতি অভিমানী আমাদের মধ্যে কয়জন ঐ কৃষ্ণানন্দের মত শক্তির ও সাধনার সাফল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম? ফলতঃ আমাদের মনে হয়, দেশে বিদেশে মঠ, দেবালয় আশ্রমাদির প্রতিষ্ঠা, জীর্ণ দেবমন্দির-সমূহের সংস্কারসাধন, প্রতিষ্ঠিত মঠ মন্দিরাদির সুপরিচালন প্রভৃতি আমাদের পুনরুত্থান সাধনের এক প্রকৃষ্ট উপায়।

৩। ৺কালীক্ষেত্র কি বৌদ্ধেরও পুণ্যক্ষেত্র?

একদিন মন্দির থেকে বাহির হ'য়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলেছি, হঠাৎ এক ব্রহ্মদেশীয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। ব্রহ্মদেশবাসিগণ হিন্দু নহেন, বৌদ্ধ। বৌদ্ধের দর্শন এখন দুর্লভ হ'লেও, দেশে উঁহাদের সংখ্যা এক সময় অগণন প্রায় ছিল। অনেক কষ্টে, অনেকের প্রাণপণ সাধনা বলে, হিন্দু আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছে। তা হউক, আমাদের ভুলা উচিত নহে, ধর্ম্মজগতে বৌদ্ধ আমাদের জ্ঞাতি ভাইয়ের মত। জ্ঞাতি শত্রুর চেয়ে

বড় শত্রু আর নাই বটে কিন্তু জাতি হ'লেই যে শত্রু হ'তেই হবে এমনও কোন নিয়ম নাই এবং সেরূপ হওয়া একটা বাঞ্ছনীয় বা সুখের বিষয়ও নহে। "মোদের গিং বাকা যুঝবার বেলা আঁকা," বিপদের দিনে জাতি-সহ মিলনেই বল বৃদ্ধি হয়। কে বলিতে পারে, প্রোটেষ্টাণ্ট, ক্যাথলিক বা সিয়া সুন্নীর ন্যায় হিন্দু বৌদ্ধের শুভ মিলন ফলে ভবিষ্যতে এক মহাজাতি গঠিত হবে না এবং মায়ের মন্দিরই হয় ত সেই মহামিলনস্থল।

জানা ছিল, বৌদ্ধগণের মধ্যে তন্ত্রের প্রচলন আছে, বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেকেই শক্তিপূজক। মন্দিরের নিকট হঠাৎ এই ব্রহ্ম যুবকটিকে দেখে আমার কৌতূহল জেগে উঠল, তিনি কে, কি হেতু আগমন, আমি তাঁহার কোন কাজে আসিতে পারি কি না, ইত্যাদি বিষয় ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবকটিও ইংরাজীতে কৃতবিদ্য—আলাপে অসুবিধা হল না। যুবক যাহা বলিলেন তাহার ভাব এই। আমরা যেমন শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা পিতৃদেবগণের পূজা করি, চীন ব্রহ্মাদি দেশেও সেইরূপ পিতৃপূজা অবশ্য-কর্ত্তব্যরূপে বিবেচিত হয়। যুবক এখন বিদেশে, সুতরাং দেশের প্রথানুযায়ী পিতৃ-পূজায় অক্ষম, উপায়ান্তরাভাবে তিনি মনে করিয়াছেন, পুণ্যধাম কালীঘাটে আগমন করিয়া পিতৃদেবের প্রীত্যর্থ কোন একটা পুণ্য-কর্ম্ম করিয়া যাইবেন। যুবকের কথা শুনিয়া মনে কতরূপ ভাবোদয় হইল। হিন্দুবৌদ্ধ পরস্পরের চির শত্রু হইলেও উহাদের মধ্যে এই ত সব মিলন স্থল রহিয়াছে। প্রাচীন পারসিকগণ যখন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় লন, তখন গুজরাতের হিন্দু নরপতি উহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া উহাঁদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। পারসিকবৃদ্ধগণ সেই সময় উঁহাদের যে সব আচার ব্যবহার আমাদের সহিত মিলে, বাছিয়া বাছিয়া বিশেষ ভাবে সেই সমস্তের উল্লেখ করেন এবং উহার ফলে অচির-কালমধ্যে দেশবাসীর প্রীতি আকর্ষণে সমর্থ হন। গোমাংস ভক্ষণে উঁহাদের আপত্তি না থাকিলেও দেশপ্রথা মান্য করিয়া উহাতে বিরত থাকিতে স্বীকার পান এবং অদ্যাপি সেই অঙ্গীকারবাণী পালন করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ আচার ব্যবহারের সাদৃশ্যটা, পরস্পরের সহিত মিলনের ও বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে একজাতির ভাব আনয়নের এক অতি সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। আমাদের শাস্ত্রকারগণ আচার ব্যবহারটা শাস্ত্রশাসনে সংযত করিতে প্রয়াস পাইয়া-ছেন। উহার এই একটা শুভফল হইয়াছে, যে হিন্দুস্তান মাত্রের মধ্যেই আচার সাদৃশ্যটা এখনও বহুবিষয়ে বহুপরিমাণে বিদ্যমান আছে। সকলেই জানেন, একই রাজবিধির অধীনে অবস্থিত রহিলে দেশ-বাসিগণমধ্যে ক্রমশঃ একজাতির ভাবটা পরিস্ফুট হয়। সংহিতাসমূহে আচার ব্যব-হার সম্বন্ধে বিধিনিষেধের এত অধিক ছড়া-ছড়ি ও কড়াকড়ি, আমাদের মাঝে অনুরূপ শুভফলের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। এবিষয়ে একজন সেন্সাস্ রিপোর্টার স্বীকার করে গেছেন, হিন্দুগণমধ্যে হিন্দুর বিশেষত্বজ্ঞাপক কোনরূপ সাধারণ লক্ষণ এখন আর অধিক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাপি বর্ত্তমান-কালে গোহত্যা-বিরতিই হিন্দুর সর্ব্বাপেক্ষা সজীব লক্ষণ কারণ হিন্দু মাত্রেই এই নিয়মটা এখনও মানিয়া চলেন। গোরক্ষাব্রত এইরূপে হিন্দুকে এখনও একটা সজীব জাতিরূপে দাঁড়

করাইয়া রাখিয়াছে। নারায়ণের শ্রীচরণে "গো ব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায়" প্রতিদিনের এই প্রার্থনা মন্ত্রটি মুখের বাণী না হয়ে, যদি অন্তরের আদর্শ ও জীবনের ব্রত হয়, তাহা হইলে হিন্দুর জাতীয়তা আরও স্পষ্ট আরও সজীব আকার ধারণ করে। বুঝা গেল বোধ হয়, আচার ব্যবহারে সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠিত হ'লে একজাতির ভাবটা অতি সহজে ফুটিয়া উঠে। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" জাতীয়ত্ব সংস্থাপন অনুরোধে স্বধর্ম্ম বর্জ্জনটা কখনই ভাল নহে। আমাদের যে সমস্ত আচার ব্যবহার অন্যের সহিত মিল খায় সেইগুলিকে একটু বড় করিয়া দেখিলে সবদিক্ রক্ষা পায়। জাপান, চীন, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে এখনও পিতৃপূজা প্রচলিত; শ্রাদ্ধ তর্পণ প্রভৃতি আমাদের মতেও পুণ্য কর্ম্ম; এই অবস্থায় আমাদের উচিত, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি অনুষ্ঠানের উপর আমাদের অনুরাগটা পূর্ব্বের ন্যায় বজায় রাখিতে যেন আমরা চেষ্টা পাই। ইহার ফলে আর কিছু হউক না হউক, এশিয়ার এই নবজাগরণের দিনে, এশিয়ার অন্যান্য দেশসহ ঐক্যবর্দ্ধনে অনেকটা সুবিধা হইবে। এক সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ বাঙ্গালীগণ তীব্বতাদি দেশে বিদ্যাদাতা, জ্ঞানদাতারূপে বাঙ্গালীর গৌরব বাড়িয়েছিলেন; ফাহেন সিং, হুয়েন সাং প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতরা বিদ্যার্থীবেশে ভারতে এসেছিলেন; এখন দাঁড়িপাল্লার উল্টা অবস্থা, এখন আমাদিগকেই রত্নসন্ধার্থীরূপে ঐসব দেশ ঢুঁড়িয়া দেখিতে হইবে। আমরা য়ুরোপ আমেরিকাদি দেশে রত্ন আহরণ জন্য অনেক দিন হ'তে অনেকে চেষ্টা পাচ্ছি কিন্তু ঘরের কাছের দেশগুলায় ঐরূপ খোঁজ লইবার করছি কি? কৈ কতবর্ষ পূর্ব্বে ৺রামানন্দ ভারতী "সাহিত্য" পত্রে "হিমারণ্য" প্রবন্ধে আমাদিগকে শুনাইয়া গেলেন, তীব্বতের থিলাং মঠে তিনি প্রায় পাঁচলক্ষ পুস্তক দেখে এসেছেন। আমাদের কত শাস্ত্র গ্রন্থ, কত লুপ্ত বিদ্যা পুনরুদ্ধারের কি উৎকৃষ্ট অবসর! কিন্তু দেশের কয়জন সুসন্তান এসব কার্য্যে অগ্রসর হইবার শক্তি প্রবৃত্তি বা সাহস রাখেন? শতবর্ষ পূর্ব্বে ষোড়শবর্ষীয় বাঙ্গালী বালক রামমোহন রায়ের যে শক্তি হয়েছিল, এখন আমাদের তাহাও আর হয় না? লিখিত বর্ণমালার যখন প্রচলন হয়েছিল কিনা সন্দেহ, সেই সময় ভগবান্ বেদব্যাস বেদবিভাগ করে গেলেন, মহাভারত রামায়ণের ন্যায় বিরাট ও মহৎ গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইল; বেদ, ষ্টীমার, মুদ্রাযন্ত্র যখন আবিষ্কৃত হয় নাই, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তখন যৌবন সমাপ্তির পূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্মে নবপ্রাণ সঞ্চার করিলেন, একদিকে হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গোপরিস্থ যোশীমঠ, অন্যদিকে সাগরচুম্বিত সেতুবন্ধ রামেশ্বর, একপ্রান্তে পূর্ব্ব সমুদ্রতটে পুরীধাম, অন্যপ্রান্তে পশ্চিম সমুদ্রতীরে দ্বারকাপুরি—চারিধামে চারি মঠ প্রতিষ্ঠা করে গেলেন, ধর্ম্মরক্ষার্থ গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শৃঙ্গারি মঠ প্রভৃতি স্থানে রাশি রাশি গ্রন্থ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন; চৈতন্যদেব এসে, গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনধামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন; পূর্ব্বের ঐসব অনুভূতির দিনে, দেশের লোকগুলা এইভাবে শক্তির পরিচয় দিত, আর আজকাল এত উন্নতি-সত্ত্বেও ঐ শৃঙ্গারিমঠে কি আছে আমরা জানি না; ইংলণ্ড জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে নিত্য কতজন যাইতেছি কিন্তু উহাঁদের যাদুঘর প্রভৃতিতে ভারতের কি কি গুপ্তরত্নসমূহ সংগৃহীত আছে, সে সংবাদ দিবার শক্তি

নাই ; আমরা সত্য সত্যই কি উন্নত হইতেছি বা অগ্রদিকে ছুটিয়াছি ? যাহা হউক নিরাশ হ'বার কোন কারণ নাই। "যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধ'রে।" ইহারই মধ্যে তাহার লক্ষণও একটু আধটু দেখা যাইতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সন্ন্যাসী শিষ্য জগতের ধর্মসভায় ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিল ; কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর ন্যায় হরনাথের লোকোত্তর শক্তিতে ৺পুরীধামে হরনাথ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল, হঙ্গারি, ফিন্‌ল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দূর দূরান্তরে অবস্থিত দেশের লোক অবধি, হরনাথের সহিত পরিচিত হইতে, কৃষ্ণকথা শুনিতে, কৃষ্ণপ্রেম পাইতে ব্যগ্রতা জানাইল। আসল কথা এই, ভগবতী আদ্যাশক্তির দয়া হ'লে, সব বাধা কেটে যায়, এইরূপ সব অচিন্ত্যভাবে শক্তির উপচয় ঘটিতে থাকে, সুতরাং আমরা নিরাশ হ'ব কেন ? ছেলে কাঁদিলেই জননীর স্তনে ক্ষীরধারা, অমৃতের উৎস ছুটিতে থাকে। দুর্দ্দিন বেড়েছে, বাড়িলই বা, আমাদের মা আছেন। লেখকের বিশ্বাস, মায়ের সব উপযুক্ত সন্তান, ভারতের ঐ সন্ন্যাসী ও সাধক-সম্প্রদায়ই পূর্ব্ব পূর্ব্বারের ন্যায় এবারেও ভারত-তরণীর কর্ণধার হইবেন।

৪। চৈনেরও উপাস্যা ঈশ্বরী

একদিন বৈকালে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কাঙ্গালী ভোজনের আয়োজন হচ্ছে, এমন সময় দেখি এক চীনদেশবাসী আসিয়া উপস্থিত। বুঝিলাম লোকটি এই প্রথম আগমন করে নাই, কারণ দুধারের সন্দেশ ও ও নৈবেদ্যাদি বিক্রেতারা লোকটিকে দেখিবা-মাত্র "১৪নং চীনাপাড়া" বলিয়া চেঁচাইয়া, তাহাকে যে উহারা চিনিতে পারিয়াছে তাবে বুঝাইল ; কেহ কেহ বলিল ও পুরাতন ঠিকানা এখন বদলাইয়া গিয়াছে। চৈন ভদ্রলোকটি একটি সন্দেশের দোকানে যাইয়া বসিলেন। তিনি এক আনার পূজা দিতে ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু দোকানীর জেদে পড়ে চারি আনার ডালি দিতেই সম্মত হ'লেন। চৈনগণের পূজাপদ্ধতিসহ কিয়ৎপরিমাণে পরিচিত, এরূপ একজন কর্ম্মচারীও দোকানে পাওয়া গেল। চৈন ভদ্রলোকটি ছোট ছোট ধূপের মত দেখিতে কতকগুলা কাটিচরা একটি কৌটা বাহির করিয়া কর্ম্মচারীটির হাতে দিলেন। দোকানীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "সময় সাড়ে সাতটা, ও ২০নং চীনা পাড়া।" শুনে আমার মনে হল, হয় ত কোনরূপ দ্যূতক্রীড়ায় সাফল্য কামনা করিয়া চৈন ভদ্রলোকটি দেবীসকাশে পূজা দিতে এসেছেন। দোকানীকে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, তাহারও ঐরূপ অনুমান। আমি একটু কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বলিলাম, এলোকটি বিদেশী ও বিধর্ম্মী হয়েও দেখ্‌ছি মা কালীকে ভক্তি করে। দোকানী জানাইল এ একটা এমন কিছুই নূতন ব্যাপার নহে ; জাপান, আমেরিকা, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতেও লোক এসে মাঝে মাঝে পূজা দেয়। বলা বাহুল্য এই সব পূজার কতগুলাই বা লোক দেখান ও তামসিক এবং কতগুলাই বা ভক্তিবিশ্বাসপ্রণোদিত সাত্ত্বিক ব্যাপার, ঠিক করিয়া বলা কিছু কঠিন। দোকানীকে ছেড়ে দিয়ে, চৈন ভদ্রলোকটির অনুসন্ধানে গিয়া দেখি, নাটমন্দির ও মন্দিরমধ্যস্থ গলি-পথে দাঁড়িয়ে, চক্ষু মুদ্রিত ক'রে তন্ময়ভাবে তিনি মাকে ডাকছেন আর মন্দিরের উপর কক্ষদ্বার সম্মুখে উপবেশন করে কর্ম্মচারীটি কৌটা হ'তে সেই ধূপের মত কাঠির বাণ্ডিলটি লইয়া ঠকাঠক্ করে ঠুক্‌ছে, বোধ হল চৈন

প্রণাম মায়ের উদ্বোধনে চেষ্টা পাচ্ছে কিয়ৎক্ষণ পরে বাণ্ডিল থেকে একটি কাঠি বাহির ক'রে চৈন ভদ্রলোকটির হাতে দিলে, ভদ্রলোকটি সেই কাঠির গায়ে কি লেখা আছে বেশ করে দেখে লয়ে বুকপকেটে রেখে দিলেন; তারপর সম্মুখে রক্ষিত রেকাবীর উপর চারিটি পয়সা রেখে দিয়ে চলে গেলেন, বোধকরি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত একখানা পূজা স্বতন্ত্রভাবে দিলেন। পূজারি যে সিঁদুর দিতে এল, সেটা আর কপালে পরলেন না, কিন্তু বুকপকেটে সিঁদুরের পাতাখানি সযত্নে রেখে দিলেন।

আরও একবার একজন চৈনকে মায়ের মন্দিরে উপাসনারত দেখেছিলাম। এ-ব্যক্তিটি পূজারি প্রভৃতির সাহায্য লয় নাই, চেহারা দেখে দরিদ্র শ্রমজীবী বলে বোধ হল। যুক্তকরে দাঁড়িয়ে আপন মনে একাগ্রভাবে বিড় বিড় করে যেন মন্ত্র আওড়ে যাচ্ছিল। অন্যান্য লোক এসে মায়ের পূজা দিবার জন্য অনুরোধ করিলে সে একটু বিরক্ত হ'য়ে তাহাদিগকে সরিয়ে দিলে ও ঐরূপে মানস-পূজা করেই চলে গেল। শুনিলাম কখন কখন কেহ কেহ এসে ছাগ বলি অবধি দেয় এবং কামারের খড়্গাঘাতের সময় নিজেই ছাগটিকে ধরিয়া রাখে।

চৈনগণের এইরূপ কালীপূজা দেখিলে অনেক কথাই মনে পড়ে। শুনা আছে, আমাদের বশিষ্ঠ ঋষি পুরাকালে মহাচীন দেশে গমন করেছিলেন এটা নিশ্চয় যে আমাদের অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ চীন তিব্বত প্রভৃতি দেশে রক্ষিত আছে। পুরাতন "সাহিত্য" পত্র পাঠে অবগত হই, স্বর্গীয় রামানন্দ ভারতী মহোদয় তিব্বত ভ্রমণ কালে একদা যখন চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তথাকার কোন এক মঠের জনৈক লামা বা মোহান্ত তাহা শুনিবা মাত্র বুঝিতে পেরেছিলেন ও বলেছিলেন ঐ গ্রন্থ তাঁহাদের মঠের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। তিব্বতীয় লামা অবধি ভারতী মহোদয়ের ত্রিশূল ও দেবীমূর্ত্তি দেখে "তারা"-দেবী বলে চিনেছিল ও কোন প্রকার অত্যাচার না করে চলে গিয়েছিল। তিনি এই তিব্বত ভ্রমণ কালে, সুদূর সাইবিরিয়া হইতে সমাগত রুদ্রাক্ষমালা বিভূষিত সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি অবধি নয়নগোচর করিয়াছিলেন। ফলতঃ যতই আলোচনা করা যায় ততই প্রতীতি জন্মায়, চীন তীব্বতাদি দেশগুলি ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে সম্বদ্ধ, এমন কি ঐগুলি কোনকালে হিন্দুস্থানের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত কি না সন্দেহ জন্মায়। কৈলাস, মানস-সরোবরাদি হিন্দুর অনেক তীর্থ এখনও তিব্বতে বিদ্যমান। কৈলাসেশ্বর মহাদেব বৃষবাহন, তীব্বতে "য়াক্" নামক গোজাতীয় পশু এখনও বাহন রূপে ও ভারবহন কার্য্যে প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। য়াক্ ও যক্ষ শব্দ দ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। যক্ষাধিপতি কুবের আমাদের ধনরত্নের ভাণ্ডারী। তিব্বতের লোকে এখনও ডমরু বাজায়, হাড়ের মালা পরে ও হাড়ের বাঁশী ব্যবহার করে যক্ষের জ্ঞাতি ভ্রাতা রক্ষগণেরও প্রাচীন নিবাস এই তিব্বত। এখনও তথায় রাক্ষসতাল নামে একটি হ্রদ আছে। রাক্ষসের বংশ এক সময় হয় ত ভারত ছাইয়া দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের সময় দাক্ষিণাত্য রাবণের শাসনাধীন ছিল। তিব্বতের এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন আচার ব্যবহার, আমাদের মহাভারতে, আর্য্য সমাজের

সুপ্রাচীন যুগের আচার ব্যবহাররূপে বর্ণিত আছে। এক নারীর বহু পতিগ্রহণ অল্পাধিক পরিমাণে উভয় স্থলে এখনও প্রচলিত তিব্বতীয়গণের আর এক নাম "হুন"। রাক্ষস-গণের ন্যায় হুনেরা এক সময় য়ুরোপে গিয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ রোমকগণের রাজ্য উলাইয়া দিয়াছিল; অষ্ট্রিয়ার হঙ্গারি দেশবাসীগণ সম্ভবতঃ এই হুনগণের বংশসম্ভূত। তিব্বতের লোকে জন্মান্তরবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী; পূর্ব্বজন্মের কথা মনে আছে কি না পরীক্ষা লইয়া এখনও অনেক মঠে মোহান্ত নির্ব্বাচিত হয়। তিব্বতীয় সাধু নরকপালের মহিমা বুঝেন, সিদ্ধপুরুষগণের আত্মা দেহত্যাগ কালে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রস্থান করে, অনেকেই বিশ্বাস করেন। আমাদের বহু তন্ত্রশাস্ত্র হরপার্ব্বতীর কথোপকথনচ্ছলে বিরচিত। তিব্বতে তন্ত্র ও যোগমার্গের এখনও সমাদর। কাশী-নামার, বা, ৺ কাশী ধামের সন্ন্যাসীর, তিব্বতে বহু মান। সম্ভবতঃ নব পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনের কোন এক সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্গার বিদ্রোহ উপলক্ষে চীন-প্রবাসী কোন এক বাঙ্গালীর লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি, চীন রাজধানী পিকিং সহরে এখনও দশ মহাবিদ্যার পূজা হয়; চীনের বিষপত্র ব্যবহারের অবধি উল্লেখ আছে। মূর্ত্তিগুলি কাষ্ঠে রচিত এবং শ্রীশ্রীছিন্নমস্তা দেবীর মূর্ত্তিটি একটু বিশেষভাবে বিনির্ম্মিত। অর্দ্ধকর্ত্তিত শির একদিকে যেন চলিয়া পড়িয়াছে ও তাহাতে মূর্ত্তিখানি আরও স্বাভাবিক ও ভীষণ ব'লে বোধ হচ্ছিল। চীন তিব্বতাদি দেশসহ ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন এক সময় যদি সম্ভবপর হয়েছিল এখনই বা অসম্ভব হইবে কেন?

৫। সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি

পূর্ব্বোক্ত দোকানী ভায়া বলেছিলেন বটে, ইউরোপ আমেরিকা থেকেও অনেকে এসে মায়ের কাছে পূজা দিয়ে যায়, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিজে যাহা দেখেছি তাহাতে ভক্তভাবেই সকলে যে সমাগত হন মনে হয় না। পাঁচ জনের পাঁচ রকম প্রকৃতি, এইজন্য তীর্থস্থল, বড় বড় সহর প্রভৃতিতে সকল রকম লোকেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ও অনেক রকম কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এক বৎসর শিবচতুর্দ্দশী বা ঐরূপ কোন ব্রতের দিন, দেখি, দু জন সাহেব ফটোগ্রাফ তুলিবার যন্ত্র হাতে লয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্থানীয় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ইঁহাদিগকে নানা বিষয় বুঝায়ে দিচ্ছেন এবং আর কেহ ঐরূপ করিতে যাইলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছেন। সাহেবদের সহিত বন্ধুত্বটা একচেটিয়া রাখাই যেন তাঁর অভি-প্রায়। রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শকের ন্যায় আমি একটু তফাতে তফাতে থাকিয়া ইঁহাদের কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। বৃদ্ধটি ভেবেছিলেন, সাহেব দুটি নিশ্চয়ই কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি হ'বেন—ভাবিবার একটু কারণও ছিল—তাঁহারা দুই প্রকাণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন, রাজপথে ঘোড়া দুটাকে ধরিয়া দু জন লোক অপেক্ষা করিতেছিল। বৃদ্ধটি নানাভাবে সাহেব দুটির সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়াইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; তিনি একজন সেকালের সিনিয়ার পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলে আত্ম-পরিচয় দিলেন। নানা কথার পর যখন মনে করিলেন যে আগন্তুক দু জনার সহিত বেশ বন্ধুভাবে মিশিতে সমর্থ হয়েছেন তখন তাঁহার ঝুলির ভিতর থেকে বিড়ালটিকে বাহির করিয়া দিলেন অর্থাৎ তাঁর আসল মনের কথাটি ব্যক্ত করিয়া বসিলেন।

বাঙ্গালীর অতীব অভ্যস্ত ভিখারী মূর্ত্তিটি ধারণ ক'রে, সাহেব দু জনকে মিনতি ক'রে বললেন যে তাঁহার প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রটি নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় ঘরে বসে আছে, বেকার অবস্থার ন্যায় যুবক জনের শত্রু আর দ্বিতীয় নাই, অতএব সাহেব দুটি যদি দয়া করে তাঁহার পুত্রটিকে একটি চাকুরী জুটাইয়া দেন তা হ'লে একটা পুণ্য ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হয় ইত্যাদি। সকলে ভাবিল বুড়া বড়ই চালাক, এত লোকের মাঝখেকে কেমন নিজের কাজ হাঁসিল করিয়া লইল। সাহেবরা বেশ বন্ধুর ন্যায় বুড়ার সকল কথা শুনিতেছেন, ও, নিজের কাজ করিয়া যাইতেছেন। শ্যামসুন্দরজির কোন্‌টা পুরাতন মন্দির, নূতন মন্দিরে কেনই বা তিনি উঠিয়া আসিলেন ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা শুনিতে শুনিতে সহসা এক স্থূলোদর অর্দ্ধ উলঙ্গ সন্ন্যাসী তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সন্ন্যাসীটির ফটো লইবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ফটো লওয়া হইলে, সন্ন্যাসীকে এক সেলাম ঠুকিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখি, সন্ন্যাসীরও সেই ভিখারী ভাব। ছবি ছাপা হ'লে তিনি একখানি ফটো প্রার্থনা করিলেন, সাহেবরা তৎক্ষণাৎ রাজি। কিন্তু কি ক'রে কোথায় যে সন্ন্যাসীকে পুনরায় দেখা পাওয়া যাবে ও কবে ফটো দেওয়া হ'বে সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা হ'ল না। কিছু পরে তাঁহারা একটি সুন্দরী বঙ্গযুবতীর অবগুণ্ঠনমুক্ত মুখচন্দ্রিমার ক্ষণতরে দর্শন পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার এক snapshot ফটো তুলিয়া লইলেন। এদিকে ওদিকে থু থু ফেলিয়া নিষ্ঠাবতী দু একটি প্রাচীনা রমণীকে ব্যস্ত সমস্তভাবে সরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়া কৌশলে আপনাদের গন্তব্য পথের ভিড় কমাইয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার আমরা সব আদত বদমায়েস, আমাদের দোষেই আমাদের ললনাকুল সচ্ছন্দ ভাবে বাহিরে বেড়াতে পারেন না বলে, আমাদিগকে অল্প বিস্তর সত্য মিথ্যাপূর্ণ ক্ষুদ্র এক লেক্‌চার শুনাইয়া দিতেও ত্রুটিত হইলেন না। (প্রতীচ্য প্রাণ বুঝি শুধু যুবতী জনকেই সম্মান দেখাইতে ব্যস্ত এবং তাঁহাদের নারীপূজা ও আমাদের নারীপূজা দুটায় কিছু প্রভেদ আছে বলেই মনে হল।) ভাবের দোকান থেকে ভাব কিনে, এক একটা চুষানি ফেলে দিয়ে, নবাবী কায়দায় বাকি পয়সা আর ফেরত লইলেন না। যাহা হউক সাহেবদের ধরণ ধারণ দেখে এতক্ষণে সকলেই একটু বুঝিতে পারিল, সাহেব দুজন তেমন কোন বড় দরের ভক্ত নহেন সুতরাং অর্থাদি পাইবার বিশেষ আশা নাই বুঝিয়া অনেকেই একে একে সরিয়া পড়িল, বুড়াটি কিন্তু তখনও তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়েন না। সাহেব দুটি চলিয়া যাইবার জন্য যখন ঘোড়ায় চড়িতে যাইতেছেন, বুড়াটি আর থাকিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন,যে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত আপনাদের নাম ও ঠিকানার বিষয় কিছুই বলেন নাই; উহা না বলিলে তিনি তাঁহার প্রাপ্তবয়স্ক বেকার পুত্রটিকে লইয়া কিরূপে তাঁহাদের নিকট যাইবেন? দুজনার মধ্যে একজন সাহেব কোন কথা বলিল না, অপরটি বেশ গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বানান করিয়া বলিল T-o-s-h। তারপর দুজনে "ধড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনই চাবুক।" উহাদের এই অসঙ্গত ব্যবহারে বৃদ্ধটি বড়ই ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হইলেন এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "এ বেটারা তামাসা ক'রে গেল হে।" সমবেদনা প্রকাশের পরিবর্ত্তে সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল মাত্র।

ঘটনাটি সামান্য কিন্তু সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই অনেক চিন্তার বিষয় পাইবেন।

কালীঘাটে সমাগত প্রতীচ্য দেশবাসীমাত্রই এইরূপ ধরণের লোক, মনে করিলে কিন্তু ভুল করা হইবে। এইবার সে সম্বন্ধে দু এক কথা না বলিলে উঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে।

৬। বিদুষী ইংরাজ মহিলা

একদিন শুনিলাম একটি ইংরাজ মহিলা কালীঘাটে বক্তৃতা দিবেন। তাঁহার নামটি ঠিক স্মরণ হচ্ছেনা, বোধ করি শ্রীমতী লিলিয়ান্ এড্‌গার মহোদয়া হইবেন। মায়ের মন্দিরে বিদুষী ইংরাজ মহিলার বক্তৃতা শুনিতে নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। প্রথমে বক্তৃতাস্থল লয়ে একটু গোলমাল হ'বার উপক্রম হয়েছিল; নাটমন্দিরে বিবিকে বক্তৃতা করিতে দিতে কেহ কেহ অনিচ্ছার ভাব দেখিয়েছিলেন, শেষে এ বিষয়টা লয়ে আর গোলমাল করা হল না। শ্রীমতীর বক্তৃতা শুনে সকলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন; উহার অনেক স্থলের ভাব এখনও মনে আছে। আজ কাল অনেকেই জীবনটাকে private & public অথবা লোক দেখান ও লুকান এইরূপ দুইভাগে ভাগ করেন। ঈশ্বরের নিকট এরূপ লুকোচুরি খেলার প্রয়াস নিরর্থক ও অনাবশ্যক। হিন্দু উপাসক এ তত্ত্বটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে প্রয়াস পান ও সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বরকে নিজ জন জ্ঞান করিতে চেষ্টা পান। হিন্দু জানেন, সদ্ব্যক্তির যেমন তিনি নিজ জন, নিতান্ত অসদ্ব্যক্তির পক্ষেও তাহাই। যে যেভাবে তাঁহাকে ধারণা ও উপাসনা করে, তিনি সেই ভাবেই তাঁহার নিকট সন্নিহিত থাকেন। হিন্দু দস্যু অবধি ঈশ্বরের নামে ভয় পায় না, তাহার উপাস্যা জননী তখন ডাকাতেরই জননী; আবার ঐ দস্যুই যদি বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হন, তখন তাঁহার উপাস্য ঈশ্বরও তদনুরূপ হবেন। ফলতঃ সকলেই স্ব স্ব ধারণা শক্তির অনুযায়ী আদর্শের উপাসনারত, ইহাই নিয়ম। অনেকেই কিন্তু উহা ভুলে গিয়ে, সকলের অনুসরণীয় একটি-মাত্র আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পান ও তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। প্রকৃত অধিকারী না হয়ে অধিকারীর ভাণ বা ভণ্ডামি, প্রাণহীন ধর্ম্ম চর্চ্চা, হিন্দু এসব ভাল বাসেন না এবং তাঁহার উপাস্য ও তাঁহাকে স্বভাবে চিরপর হয়ে থাকিতে দেন না। মায়ের কাছে সন্তানের আবার কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ভয়? (শ্রীকৃষ্ণ তাই গোপীগণের বস্ত্র হরণ করেন, ঈশ্বরের সহিত পতি-পত্নীর সম্পর্ক তাই "মধুর" সম্পর্ক নামে অভিহিত হয়)। সহসা মনে হতে পারে এভাবে সাধনায় পাপের ভয় থাকে না। এ পথে পাপের ভয় না থাকুক কিন্তু উহা পাপ-জীবন কাটিয়ে উঠিতে বা মহা পুণ্যবান্ হ'তেও বাধা দেয় না; প্রমাণ রত্নাকর, প্রমাণ, বহু বহু সাধক-শ্রেষ্ঠের নিজ নিজ জীবনে লব্ধ অভিজ্ঞতা।

৭। "খাক্ত সোশিয়ালিষ্ট"

কালীঘাটে সমাগত বৈদেশিকবর্গমধ্যে একজন ফরাসী পর্য্যটকের মন্তব্য আমাকে যেরূপ মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল, এমন আর কিছুতে হই নাই। একদিন দেখি দুজন য়ুরোপীয় বেশধারী পুরুষ কালীঘাটের গঙ্গার ঘাটে বেড়াচ্ছেন। একজনকে সাহেব বলেই মনে হল, কিন্তু আর একজন একটু খর্ব্বকায়, দেখিতেও খুব বলিষ্ঠ বা হৃষ্টপুষ্ট নহেন, এবং তাঁহার বর্ণও অনেকটা আমাদের ন্যায় অর্থাৎ সাধারণ ইংরাজ অপেক্ষা কিছু মলিন। আমার

কেমন মনে হ'ল, লোকটি নিশ্চয়ই একজন জাপানী এবং অনুমানটা ঠিক হ'ল কিনা নির্ণয়ার্থ তিনি কোন দেশের লোক জিজ্ঞাসা করিয়াও বলিলাম। আমি ইংরাজিতেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও ইংরাজিতেই উত্তর দিলেন যে তিনি একজন ফ্রেক তাঁহার সঙ্গীটিও ফরাসী কি না জানি না, কিন্তু তাঁহারা পরস্পরের সহিত কথোপকথনটা ইংরাজিতেই করিতেছিলেন। এই কথা-বার্ত্তাটা এমনই একটু উচ্চতর প্রকৃতির বা পণ্ডিতি ধরণের হইতেছিল, যে উঁহাদের পাছু পাছু ঘুরিবার লোভ ছাড়িতে পারিলাম না। গঙ্গার ঘাটে একটি পাথরের দেবমূর্ত্তিকে, স্থানীয় লোকে শিব মূর্ত্তি বলে বুঝাইয়া দিলেও খর্ব্বকায় লোকটি তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন যে উহা বস্তুতঃ একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি—মূর্ত্তিটি দেখিলে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয় বটে—বর্ত্তমানকালে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মে এইরূপ মেশামিশি হইয়া গিয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম অন্যধর্ম্ম গ্রাসে এখনও এইরূপ শক্তি রাখে এবং ইহা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বধর্ম্মমতের একটা সমবায় মাত্র।

কতকগুলা শকুনী উড়িতেছে দেখিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেহান্তে মৃত-দেহগুলির এখানে কি ভাবে সৎকার করা হয়? বৃথা নষ্ট না করিয়া অন্য জীবের হিতার্থ কুকুর বা পাখীকে খাইতে দেওয়া হয় কি এবং সেরূপ কোন সৎকারস্থল নিকটে আছে কি? সাহেব হয়ত মনে করিয়াছিলেন, তিব্বতী বা পার্শী সৎকার প্রথাটা আমাদেরও সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে প্রচলিত আছে। (পার্শী সৎকার প্রথায়, মৃতদেহকে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থলে রাখিয়া আসা হয়; গৃধ্রাদি পক্ষীকুল শীঘ্রই মাংসগুলি খাইয়া ফেলে, তারপর অস্থিগুলি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। তথায় সেগুলি কালসহকারে চূর্ণে পরিণত ও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া সমুদ্রে নীত হয়। বোম্বায়ে পার্শীদের এইরূপ একটি সমাধি মন্দির আছে, উহার ইংরাজী নাম tower of silence বা নীরব-মন্দির। উহার প্রাচীরপার্শ্বে অসংখ্য গৃধ্র মৃতদেহের প্রতীক্ষায় নিরত বসিয়া আছে। তিব্বতী সৎকারপ্রথায় মৃতদেহগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুরের উদর পূরণ করা হয়। আজকাল হিন্দুসম্প্রদায়সমূহ মধ্যে এভাবে সৎকারপ্রথা কোথাও প্রচলিত আছে কি না আমাদের জানা নাই কিন্তু পণ্ডিতগণ অনুমান করেন পুরাচীনকালে তিব্বতীয় সৎকার প্রথাটা সম্ভবতঃ কোন কোন হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যেও প্রচলিত ছিল। দিবা ও রাত্রির সমবায়ের নাম কাল; যমরাজের আর একটি নাম কাল; মৃত্যুপতির "শ্যামশবলৌ শ্যাম শবলৌ" দিবা ও রাত্রিরূপী শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের কুকুরদ্বয় জীবগণকে নিয়ত ভক্ষণ করিতেছে। মহাভারতে আছে, ধর্ম্ম-রাজ কুকুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহাপ্রস্থান কালে পঞ্চপাণ্ডবের অনুগমন করিয়াছিলেন। সভ্যমানবগণ যে সাধারণতঃ ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য বিবেচিত হন, মৃতদেহ ভক্ষণের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না কে বলিতে পারে? দেখিতে পাই, শবসম্পর্কে নিয়ত অবস্থিত রহিয়া ডোম, মুদ্দফরাস প্রভৃতি, অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বর্ণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। মৃত্যুকে যাঁহারা একটা বিভীষিকার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করেন না, শুধু সেই সন্ন্যাসিগণ কুকুরকে ঘৃণা না করিয়া ভৈরোঁ বা ভৈরব দেব বলিয়া আদর করেন। হিন্দু জাতিরই একটি শাখা স্বরূপ রাক্ষস জাতি, শবদেহ

সাহায্যে অন্য জীবের দেহ পোষণ ত দূরের কথা আত্মদেহ পোষণেও আপত্তিহীন। রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচাদি নরমাংসভুক্ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। আমরা কেহই ইচ্ছা করি না, জীবনান্তে আমাদের দেহগুলি দ্বারা অন্য জীবের দেহ পোষণ হয় কিন্তু অন্য জীবদেহগুলির সাহায্যে মানবদেহ পোষণে আমাদের তেমন আপত্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্র মতে বৃথামাংস ভোজন নিন্দিত এবং অনেক জীবের মাংসই অভক্ষ্য কিন্তু মাংসভোজনে যাঁহারা সুবিধা বিবেচনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই এ সম্বন্ধে কোনরূপ বিধিনিষেধের ধারাই রাখেন না। চৈনগণের প্রায় কোন জীবের মাংস ভোজনেই আপত্তি নাই। শুনা যায় কোন কোন অসভ্য জাতি শক্তিহীন বুড়া বাপমাকে চাল কুমড়া করিয়া মারিয়া ফেলিয়া তাঁহাদের দেহগুলি দ্বারা অন্য মানবের দেহ পোষণ ও শক্তি বৃদ্ধি করাটাই সুবুদ্ধিসঙ্গত মনে করে। অনেক দেশের অনেক অসভ্য জাতি, বিপক্ষ দেহগুলি বৃথা নষ্ট না করিয়া এই ভাবে সৎকারের পক্ষপাতী। ইউরোপের বর্ত্তমান প্রলয় ব্যাপারে যে ভাবে মনুষ্যজীবন নিয়ত নষ্ট হইতেছে এবং রাক্ষস ও পৈশাচ লীলাসমূহ নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহাতে কোন দিন বা শুনিব, সভ্য সমাজেও পূর্ব্বোক্ত রাক্ষস ও পৈশাচ-সৎকার-প্রথাই নরদেহের শ্রেষ্ঠ সৎকাররূপে বিবেচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

যাহা হউক সাহেবটির প্রশ্নে আমার মনে হ'ল, তিনি বোধ হয় সুপ্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাসী উদার ভাবটি নানারূপে ধারণা করিতে এবং তৎসম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহে যত্নশীল। তাঁহার পরবর্ত্তী মন্তব্যটি আরও চমৎকার এবং বলিতে কি উহা বলিবার জন্যই প্রধানতঃ এ প্রবন্ধের অবতারণা।

সাহেব দুইজন ক্রমশঃ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা হইতে তখন আর অধিক বিলম্ব নাই। মন্দির প্রাঙ্গণে তখন অনেকগুলি কাঙ্গালী ভোজন হইতেছিল।

কালীঘাটে অন্নপূর্ণারূপিণী জগন্মাতার পূজার ইহা একটি প্রাত্যহিক ব্যাপার। কিন্তু নিত্য ইহা দর্শন করার এই সুন্দর প্রথা অবলোকন করিয়াও সাধারণতঃ আমাদের হৃদয়ে প্রায় কোনরূপ সুভাবের উদয়ই হয় না। বিদেশী ফরাসী ভদ্রলোকটির কিন্তু ইহা তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ও সহানুভূতির স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন নিত্য এইরূপ করা হয় কি না? যখন শুনিলেন, যে দিন যিনি পালাদার বা পূজার কর্ত্তা তিনি সেইদিনের লক্ষ অর্থে এবং দ্রব্যাদির কিয়দংশে এই ভাবে দেবীপূজা নির্ব্বাহ করেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গীটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "চেয়ে দেখ হিন্দুরা জাগ্রত ও প্রত্যক্ষ দেবতা বলিলে কি বুঝে; সমাজের সমস্ত শক্তি, দেবতার নামে ও দেবকার্য্যে উৎসৃষ্ট হইয়া কেমন শক্তিময়ী প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত দেবতার সৃষ্টি করিয়াছে।, ইহা purely socialism খাঁটি সমাজ-সেবা বই আর কিছুই নহে। হিন্দুরা অনেক দিন থেকে এই সোশিয়ালিজম্ সম্বন্ধে অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। উহাদের নাগা সন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্প্রদায় এই সোসিয়ালিষ্টিক আদর্শে বা "সকলেই সকলের জন্য" এই ভাবে গঠিত ও পরিচালিত। ধর্ম্মমাত্রেরই মূল এই সোসিয়ালিজম্ বা জনহিতার্থ আত্মোৎসর্গ ও শক্তিসম্মিলন। ইহাই লোকহিতসাধক সভাসমিতি, চর্চ্চা বা উপাসককুলের মিলন

ভূমি, দম্ভ, মন্দির প্রভৃতিরূপে দেখা দেয়। অসংখ্য জীবকোষ সমবায়ে জীবদেহ গঠনের ন্যায়, প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত শুভেচ্ছা প্রণোদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকোষগুলি জনহিতার্থ সম্মিলিত করিতে সমর্থ হইলেই মহাশক্তিময়ী প্রত্যক্ষ ও জাগ্রত দেবতার আবির্ভাব হয়। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এক নামই হচ্ছে আদি শক্তি বা আদ্যাশক্তি।

মায়ের এই স্নেহ সন্তানের মুখে এতাদৃশী উক্তি শ্রবণ করে, আমি ক্ষণতরে এতই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ প্রায় হ'য়ে পড়িলাম, যে সন্ধ্যার সেই শুভক্ষণে গীতার শ্রীভগবানের মুখের সেই মহাবাণী "সর্ব্বং কৃষ্ণে সমর্পণং" মন্ত্রটি কর্ণে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। চণ্ডীগ্রন্থে দেবগণের শক্তিসম্মিলন ফলে মহাদেবীর জন্মকথা স্মরণে আসিল, যাকে কোন না কোন ভাবে প্রত্যক্ষ দেখিবার আশায় হৃদয় যেন ভরে গেল। যখন চমক ভাঙ্গিল চাহিয়া দেখি সাহেব দুজন ততক্ষণে কোথায় সরিয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

ওলন্দাজ সাহিত্যের সেক্‌স্‌পায়ার *

একটি ক্ষুদ্র পরিবার যেমন সেই পরিবারস্থিত কোন এক অতীত খ্যাতনামা পুরুষের নাম গান করিয়া আজিও নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়া আসিতেছে পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যজাতিও সেইরূপ সাহিত্য-জগতে সম্মানকামী হইয়া স্বজাতীয় সাহিত্যিকগণের গুণকীর্ত্তনে সতত তৎপর। আমরা সেই পুরাতন কালিদাসকে লইয়া আজিও সাহিত্য-বাজারে সসম্মানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; সেক্সপীয়ারের স্তুতিগান ইংলণ্ডের যথায় তথায় আজও শুনিতে পাইবে; গোটের ভাবঝঙ্কার আজিও জার্ম্মাণহৃদয় স্পর্শ করিতেছে; দান্তের মাধুরীগাথা এখনও ইটালির সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন জীবন আনিয়া দিতেছে। সকল দেশেই এইরূপ। এক একদেশে এক একটি মহাত্মা কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া সমাজের কীর্ত্তি, সমাজের কর্ত্তব্য, সমাজের আদর্শ, সমাজের ধর্ম্ম গাহিয়া চলিয়া যান—আর মানবগণ তাহাকে "জাতীয় কবি" আখ্যা প্রদান করিয়া চরিতার্থ হয়। কালিদাসকে আমরা সেই পদ দিয়াছি; রবীন্দ্রনাথ পাইতে চলিয়াছেন। সেক্সপীয়ার ইংলণ্ডে, গোটে জার্ম্মাণীতে, দান্তে ইটালিতে আজিও সেস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। আমরা সকলেই ইহাদের বিষয় কিছু না কিছু জানি। কিন্তু ইহাদিগের মত আরও যে কত মহাত্মা কত জাতির সাহিত্য-ভাণ্ডার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া না দিয়া গিয়াছেন তাহা কে জানে? যদি আমরা প্রণতমনা হইয়া সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য-ভাণ্ডার খুঁজিতে প্রবৃত্ত হই তবে দেখিব যে জগতে আরও অনেক কালিদাস, সেক্সপীয়ার, আরও অনেক দান্তে, টাসো, গোটে, শীলার, মিল্টন আছেন। কেবল ভারতবর্ষ বা ইংলণ্ড বা জার্ম্মাণীই রত্নপ্রসবিনী নয়।

---

* ওলন্দাজ সাহিত্য-প্রচারক লিওনার্ড ভ্যান্‌মোপেল প্রণীত "Vondel Lucifer"এর ভূমিকা অবলম্বনে লিখিত।

ওলন্দাজ কবি ভণ্ডেল সেই সুপ্তধনের একজন। যদিও স্বদেশে তিনি চিরকালই পূজিত হইয়া আসিতেছেন বহির্জগত ইহার বিষয় খুব কমই জানে। এমন কি হলাণ্ডের অপর পারের প্রতিবেশী ইংলণ্ডের সাহিত্য-বাজারেও ইহার নাম নাই বলিলেই চলে। তাই ভারতবাসী যে এই মহাকবি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবেন তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ভণ্ডেলকে ভারতীয় জনসাধারণের সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভণ্ডেলের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে ইয়োরোপের ইতিহাসে কিছু প্রবেশ করিতে হইবে। কারণ, যে সকল আন্দোলনের সংস্পর্শে ভণ্ডেল বর্দ্ধিত তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ভণ্ডেলের প্রতিভা যথোপযুক্তভাবে প্রকাশ পাইবে না।

১

বসন্তের প্রথম চাওয়ায় যেমন সুপ্ত গাছ-পালাগুলি তেজঃপূর্ণ হইয়া উঠে "রেণাসাঁস" বা নবাভ্যুদয়ের বীর আহ্বানে নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মবিষয়ক অত্যাচারে জর্জ্জরিত মধ্যযুগের ইয়োরোপও সেইরূপ প্রাণ পাইয়া নৃত্য করিয়া উঠিল। Renaissance ইয়োরোপের জীবন-দাতা; আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূলে রেণাসাঁস। এই "নবাভ্যুদয়" জিনিষটী কি? রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ কহত বলিবেন ইহার দ্বারা ধর্ম্মগুরু পোপের অতিবৃদ্ধি এবং অত্যাচারবহুল সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে সমগ্র ইয়োরোপব্যাপী জাতীয় ভাবের প্রকাশ এই যুগান্তরের বিশেষ লক্ষণ। ঐতিহাসিক বলিবেন Renaissance ইয়োরোপকে রাষ্ট্রীয় দলাদলি, গৃহবিবাদ এবং সম্রাটবংশীয় ধনী সৈনিক পুরুষগণের জুলুম হইতে মুক্ত করিয়া সমাজে নূতন আদর্শ অনয়ন করিয়াছে।—তাহার ফলে সমাজের ভিতর ব্যবসা বাণিজ্য (Industrialism) লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বৈশ্যবৃত্তি ক্ষাত্রধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন Renaissanceএর ফলেই আজ আমরা প্রকৃতিকে পুনরায় আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। কত নূতন দেশ আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়া মানবের জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে; জ্যোতির্ব্বিদ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এককথায় আধুনিক বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য আমরা এই "নবাভ্যুদয়ের" নিকট চির-ঋণী। ভাবুক বলিবেন এই যুগান্তরের প্রধান লক্ষণ এই যে, ইয়োরোপীয়েরা শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। লোকেরা Reason বা যুক্তির পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ধর্ম্ম আলোচনায় এই নবযুগ ধর্ম্মসংস্কারের (Reformation) আন্দোলন আনিয়া দিয়াছে। আর সাহিত্যিকের নিকট Renaissance প্রাচীন মনীষিগণের গবেষণাপূর্ণ পুঁথিসমূহের উদ্ধারসাধন। তাহার ফলে সাহিত্যজগতেও যুগান্তর সৃষ্টির পথ প্রস্তুত হইয়াছে।

এই নবাভ্যুদয় বা যুগান্তরের প্রভাব সর্ব্বতোমুখী। বর্ত্তমানে আমরা কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রে উহার প্রভাব আলোচনা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। দেখিব ভণ্ডেল কতটা যুগান্তরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই খ্রীষ্টীয় চার্চ্চ ইয়োরোপে সর্ব্বশক্তিমান হইয়া উঠে। এমন কি ইয়োরোপীয় রাজন্যমণ্ডলীও ত্রয়োদশশতাব্দীর প্রথম ভাগে পোপের আজ্ঞাবহ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য

বশতঃ চার্চ্চের এই উন্নত অবস্থাই উহার ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। অর্থপিশাচ ধন ও মহাশক্তির অধীশ্বর পোপগণ বিলাসী হইয়া পড়িলেন। শিক্ষার ভার ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে থাকায় সমাজের ভবিষ্য নেতারা স্বেচ্ছাচারী পোপের কার্য্যসাধনোপযোগী যন্ত্ররূপে শিক্ষিত হইতে লাগিল। পোপ-বাণী উল্লঙ্ঘন করিতে বা তাঁহার কার্য্যকলাপ স্বাধীনভাবে আলোচনা করিতে কেহই রহিল না। কিন্তু সকল বিষয়েরই মাত্রা আছে। স্বাধীন চিন্তা হইতে বিচ্যুত হইয়া চিন্তাশীল মানব কতদিন নীরবে থাকিতে পারে? ইংলণ্ড হইতে পোল্যাণ্ড পর্য্যন্ত ও জার্ম্মাণী হইতে সিসিলী পর্য্যন্ত সকলই বিদ্রোহানলে জ্বলিয়া উঠিল। চার্চ্চ এই বিদ্রোহ দমনের জন্য যে ভীষণ প্রথার আবিষ্কার করিল তাহার নাম স্মরণ করিলে আজিও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সেই ধর্ম্মনির্য্যাতন প্রথার নাম Inquisition. তাহার ফলে খৃষ্টানসমাজ সত্যান্বেষণকারী, স্বাধীনচেতা, নির্ম্মলপ্রাণ ব্যক্তিবর্গের রক্তে রঞ্জিত হইল। হায় মূর্খ ধর্ম্মযাজিগণ, জীবনের ভয় দেখাইয়া তোমরা সত্যের পূজা বন্ধ করিতে চাও! বিদ্রোহের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে লুথার "ধর্ম্মসংস্কারে"র আন্দোলন আনিয়া ইয়োরোপে স্বাধীন চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। জনসাধারণ শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে লাগিল। সীমাবদ্ধ, কুসংস্কারপ্রপীড়িত, চার্চ্চপ্রবর্ত্তিত ধুয়াধরা শিক্ষার পরিবর্ত্তে নির্ম্মল হাওয়ায় স্বাধীনভাবে সমাজের ভবিষ্য নেতৃগণ শিক্ষা পাইতে লাগিল। প্রকৃতবিদ্যার পথ এখন উন্মুক্ত। মুক্ত স্রোতস্বতীর ন্যায় তীব্রবেগে ইয়োরোপের বিদ্যুওলী সভ্য ও সাহিত্য সেবার জন্য চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। অত্যাচার নির্ম্মূল হইল; ভয় ও ভ্রান্তি দূরে চলিয়া গেল। এখন রহিল কেবল আশা। কাল দেশময় প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজিকার প্রভাত শান্ত, নির্ম্মল, উজ্জ্বল। এমন সুন্দর আশাপ্রদ দিনে এরাস্‌মাস্ সাহিত্যের রাজ্যে নূতন সংবাদ লইয়া আসিলেন। হল্যাণ্ডের সাহিত্য-বাজারে সে সংবাদ পৌঁছিল। ভণ্ডেলের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিল।

ওলন্দাজগণ বীরজাতি। পার্শ্ববর্ত্তী বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের সহিত ইহাদিগকে অনেকবার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ইহাদিগের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে অনেক প্রতাপসিংহের জন্ম হইয়াছে। সেই জন্যই বীরতনয় ওলন্দাজগণ ইয়োরোপের ভীষণ রাজনৈতিক ঘূর্ণ-চক্রমধ্যে আজিও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে সমর্থ। এই বীর-সমাজে কেবল ডে ভিট্, উইলিওম্ অব্ অরেঞ্জ, উইলিওম্ দি সাইলেণ্ট্ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হইয়াছে এমন নহে। সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের বিশ্বমন্দিরে ভণ্ডেল, রেমব্রাণ্ট, স্পোসিয়াস ও স্পিনোজা ইত্যাদি ওলন্দাজসন্তানগণের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। আজ আমরা ভণ্ডেলের সহিত পরিচিত হইতে যাইতেছি।

(২)

পুটাস্ ভ্যান্ ভণ্ডেল ১৫৮৭খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর কলোন-সহরে জন্মগ্রহণ করেন। এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ড যেরূপ সাহিত্য জগতে উচ্চস্থান লাভ করিতেছিল নবপ্রতিষ্ঠিত ওলন্দাজরাষ্ট্রও তখন হোফ্‌ট্, ব্রেডেরো ও হোগানের ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। হল্যাণ্ডের রাজধানী এমষ্টারডাম সহর তখন সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের কেন্দ্র-

স্থান। ভণ্ডেল পরিবার কলোন পরিত্যাগ করিয়া এই সহরেই বসবাস করিতে মনস্থ করিয়া পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে যত্নপর হইলেন।

বৃদ্ধ ভণ্ডেল সহরে আসিয়া একটি মনিহারী দোকান খুলিলেন। দোকানের সামান্য আয়-দ্বারা কোন প্রকারে সংসারের খরচ চলিয়া যাইতে লাগিল। শৈশব হইতেই পুষ্টাস্ মেধাশক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। পিতামাতা তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইতেই বালক ভণ্ডেল কবিতা লিখিতে আরম্ভ করে। দৈবক্রমে তাহার একটি কবিতা রাজধানীর শাসনকর্ত্তা ও দেশের উদীয়মান সাহিত্যিক পিটার হোফটের নজরে পতিত হয়। হোফট্ এমষ্টারডামের বিখ্যাত সাহিত্য-পরিষদের (Chamber of the Eglantine) সভায় কবিতাটীর প্রশংসা করেন। ভণ্ডেলের ভাগ্যদ্বার বুঝি খুলিয়া গেল!

এই সাহিত্য-পরিষৎটি ফরাসী দেশের বিখ্যাত College de Rhetoriqueএর অনুকরণে সংস্থাপিত। সভার উদ্দেশ্য সাহিত্য-চর্চ্চা। রেণাসাঁসের মৃদু হাওয়ায় নবজীবন লাভ করিয়া এই সভাটি জাতীয়-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বদ্ধপরিকর হইল। কেবল হল্যাণ্ডে কেন সমস্ত পশ্চিম ইয়োরোপময় সহরে সহরে এইরূপ পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট সাহিত্যিকগণ একাসনে বসিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিল না। এইরূপ উদ্যমশীল ও উৎসাহপূর্ণ সভায় হোফট্ শুভক্ষণে ভণ্ডেলের নাম করিলেন।

কিন্তু ভণ্ডেলের কপালে সুখের পরিমাণ বেশী ছিল না। দারিদ্র্যের ছায়ায় বর্দ্ধিত না হইলে বোধ হয় কবির কবিত্ব পরিস্ফুট হয় না। বিপণীর ক্ষুদ্র আয়ে ভণ্ডেল-পরিবারের ব্যয়-সঙ্কুলান হইল না। বালক ভণ্ডেলকে পরিবারের ব্যয়ভার বহনার্থ পথে বাহির হইতে হইল। কিন্তু অবসর পাইলেই পুষ্টাস্ অধ্যয়নে ও কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইত। কোনও এক বন্ধুপরিবারের পরিণয়োপলক্ষে ভণ্ডেল তাহার কবিত্বের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইল। অধিকাংশ শিশুকবিদিগের অবস্থা যেরূপ হয় ভণ্ডেলের অবস্থাও সেইরূপ হইল। শব্দ-ঝঙ্কারে কবিতার লালিত্য নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু উন্মেষোন্মুখ কবির আবার নৈরাশ্য কোথায়? দ্বিগুণ উৎসাহে সে ফরাসীরাজ চতুর্থ হেনরীর ভয়াবহ হত্যাকাহিনী রচনা করিয়া ফেলিল। এবার তাহার রচনায় শব্দাড়ম্বর তত দেখা যায় না; সরলতা ও ভাবের সমবদ্ধতা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ভণ্ডেলের মুখে বুঝি কবিত্ব ফুটিয়া উঠিল!

সংসারের পীড়নে ভণ্ডেলকে কয়েক বৎসর সাহিত্য-রাজ্যে নীরব থাকিতে হইল। কিন্তু এই সময়েই আমাদের শিশুকবি প্রেমপাকে পড়িয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। পত্নী মেরী উল্‌ফ স্বামীর প্রাণে শান্তি ও আশা আনিবার উপযুক্ত পাত্রী। আমরা দেখিতে পাই স্বামী ঊর্দ্ধাও হইয়া আকাশপানে তাকাইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জটিলতার মধ্য হইতে কবিত্বের মাধুরী আস্বাদন করিতে বিমনা, আর পত্নী তাঁহারই পেছনে দোকানঘরে ক্রেতাদিগের অভিলষিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া সংসার পরিচালনে নিবিষ্টচিত্ত।

(৩)

১৬১২ খৃষ্টাব্দে ভণ্ডেলের প্রথম নাটক

The Passover প্রকাশিত হয়। এই সময়ে হলাণ্ড স্পেন রাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া পড়ে এই মহৎ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য হলাণ্ডবাসীরা ভণ্ডেলের নূতন নাটক অতি সমারোহে অভিনয় করিল। ভণ্ডেলের নাম ক্রমশঃ বিদগ্ধমণ্ডলীতে আদরের বস্তু হইয়া পড়িল। Eglantine পরিষদের সভ্য হইবার জন্য ভণ্ডেল আমন্ত্রিত হইলেন। ভণ্ডেল এখন ঘনিষ্ঠভাবে বড় বড় সাহিত্যিকগণের সহিত মিশিতে লাগিলেন।

হলাণ্ডের তাৎকালীন প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণের মধ্যে রোমার ভিসারের নাম চিরপ্রসিদ্ধ। রোমার ব্যবসায়ে বণিক। কিন্তু জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধনে তাঁহার অগাধ টান থাকায় অবশেষে বণিকবৃত্তি ছাড়িতে হইল। বহুল ধনের অধিকারী রোমার সাহিত্য চর্চ্চায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার প্রাসাদসম বাটি কবিগণের সম্মিলন-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। রোমারের কন্যাদ্বয়—বিকাশোন্মুখ যীর এনা এবং সুশ্রী ও তেজঃপূর্ণ তাসেলসাদ পিতার ন্যায়ই সাহিত্য-সেবী। ইহাদিগের গুণে মুগ্ধ হইয়া কবিগণ নানা রঙ্গরঙ্গে ইহাদিগের শোভা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। এনাও, বিশেষতঃ তাসেলসাদ উভয়েই রচনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। উহাদিগের কবিতা আজিও হলাণ্ডের সাহিত্য-সংসারে আলোচিত হইয়া আসিতেছে।

রোমারের সূত্রে ভণ্ডেল হলাণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ নাটককার ব্রেডেরোর সহিত পরিচিত হন। ব্রেডেরোও একদিন তাহারই মত নিঃস্ব ছিল। কিন্তু আজ তিনি রোমারের কৃপায় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইয়া হলাণ্ডে গণ্যমান্য ব্যক্তি। হোফটের নাম আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। পিটার করনেলিয়াস হোফট বিখ্যাত ধনীর পুত্র। যদিও তিনি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ও নাটক লিখিয়াছেন ঐতিহাসিক বলিয়াই হোফট্ দেশময় সবিশেষ পরিচিত। বিখ্যাত ইয়াঙ্কি ঐতিহাসিক Motley তাঁহাকে "Dutch Tacitus" আখ্যা দিয়াছেন।

এইরূপ ধনী মহলে দরিদ্র ভণ্ডেল সাদরে গৃহীত হইল। ভণ্ডেল এখন বিংশবর্ষে পড়িয়াছে। দারিদ্র্য নিবন্ধন তাহার শিক্ষা যথেষ্টই উপেক্ষিত হইয়াছে। Eglantineএ প্রবেশ করিয়া ভণ্ডেল বেশ বুঝিতে পারিলেন তাঁহাকে আরও অনেক পড়িতে ও শিখিতে হইবে, তবে যদি তিনি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের সমকক্ষ হইতে পারেন। সর্ব্বপ্রথম তিনি বিদেশী ভাষা শিখিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই লাটীন, গ্রীক ও ইংরাজী ভাষা তাঁহার আয়ত্ত হইয়া পড়িল। ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি "Jerusalem Desolate" নামে একখানা নাটকও লিখিয়া ফেলিলেন।

এনা ও তাসেলসাদ স্বভাবতঃই এই সাহিত্যিকপুঞ্জের প্রধান আলোচনা ও সাধনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। ভণ্ডেল পূর্ব্বেই বিবাহিত। কিন্তু এই সুন্দরী ও গুণবতী ললনাদ্বয় অন্যান্য কবিগণের প্রাণে যে প্রেমরাগের ঢেউ খেলাইয়া দিয়াছিল তাহার ফলেই আজ ওলন্দাজ সাহিত্যে আমরা প্রেম-গীতির ঘ্রাণ পাই। হোফট এনার পরিণয় ভিক্ষা করিয়া বিফলমনোরথ হইল। ব্রেডেরো "নগরের শোভা তুমি জগতের গৌরব" গাহিয়াও এখন পর্য্যন্ত তাসেলসাদের কোমল প্রাণ গলাইতে পারিল না। সমসাময়িক সাহিত্যের উন্নতিকল্পে

খুব কম ললনাই বোধহয় এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে! এনা ও তাসেল-সাদের সৌন্দর্য্য ও প্রভায় মুগ্ধ হইয়া কোন কবি তাহাদের প্রণয়ভিক্ষার্থী হইয়া প্রেম গাথা না গাহিয়াছিলেন! বিবাহিত ডণ্ডেলও বোধ হয় বাদ পড়িবে না! কিন্তু বালিকা-বধূর অত্যধিক স্তুতিবাদে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া সাহিত্য-চর্চ্চায় মগ্ন থাকিত। ডণ্ডেল প্রায়ই এই বালিকাবধূর নিকট তাঁহার নূতন রচনাগুলি পড়িয়া শুনাইতেন। তাহাদের তীব্র সমালোচনার ফলে ডণ্ডেলের লিখনশক্তি ক্রমশই পরিণত হইতে লাগিল। তাই ডণ্ডেল যখন তাঁহার তৃতীয় নাটক ছাপাইলেন তখন তাহার প্রশংসা সকলের মুখেই শুনা যাইতে লাগিল। এবার তাঁহার ভাষা নিখুঁত ও প্রাঞ্জল, ভাব পরিষ্কার ও উচ্চ। রোমারের কবি-কুঞ্জে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাইয়া ডণ্ডেল ক্রমশঃ প্রকৃত ডণ্ডেলে পরিণত হইতে লাগিলেন। রোমারের প্রাসাদ "নবাভ্যুদয়ের" মন্দির স্বরূপ। সেখায় ধর্ম্মের জঘন্য ষেযাষেষি বা অনৈতিক হল্লার ঘ্রাণ পাওয়া যায় না। সে মন্দিরে কেবল সৌন্দর্য্য ও সাহিত্যের পূজা হইয়া থাকে।

৪

১৬১৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে তারিখে উইলিয়াম দি সাইলেন্টের উত্তরাধিকারী বিখ্যাত রাজনৈতিক ও শাসনকর্ত্তা ওল্ডেনবার্ণভেল্ট ষড়চক্রিষড়্যন্ত্রের চক্রান্তে গোপনে নিহত হন। ওল্ডেনবার্ণভেল্ট নবপ্রসূত সাধারণ তন্ত্রের উন্নত অনুষ্ঠানসমূহের উপযুক্ত প্রহরী ছিলেন। কিন্তু কোথা হইতে যেন একদল কুলাঙ্গার আসিয়া স্বদেশহিতৈষিতা ও ধর্ম্মের নামে এই বিশ্বস্ত প্রহরীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অশীতিবর্ষকাল যাবৎ স্বাধীনতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে ক্ষুদ্র হল্যাণ্ড খ্যাতি ইয়োরোপময় ছড়াইয়া ফেলিয়াছে সেই ওল্ডেনবার্ণভেল্ট নাকি আজ দেশদ্রোহী বলিয়া অপোচরে নিহত হইল!

হল্যাণ্ডের শাসনভার হত্যাকারীদিগের হস্তে পতিত হইল পশ্চাৎপথাবলম্বী প্রিন্স মরিস শাসনকর্ত্তা হইলেন। যে হল্যাণ্ড কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কর্ম্মের লীলা নিকেতন ছিল, সেই হল্যাণ্ড আজ পুণর্মূষিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া কুসংস্কার ও কল্পিত সত্যের উপাসনায় নিবিষ্ট থাকিয়া অধোগামী হইতে চলিল। রাজ্যদেশে, ধর্ম্মের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল—সকলকেই রোমানক্যাথলিক চার্চ্চের খোদ কর্ত্তা পোপের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ক্ষুদ্রচিত্ত, ধর্ম্মোন্মত্ত, ধর্ম্মযাজকগণের উৎপীড়নে, জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা, বিজ্ঞান, সাহিত্য সকলই অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। "International Law" বা আন্তর্জ্জাতিক আইনের প্রথম প্রবর্ত্তক সুপণ্ডিত গ্রোসিয়াস্ নূতন ভাব প্রচার দোষে কারারুদ্ধ হইলেন। ধর্ম্ম-গোঁড়ামির অত্যাচারে পর্ব্বিত হল্যাণ্ড আজ নতশির।

কিন্তু যে মহেন্দ্রক্ষণে হল্যাণ্ডের ক্ষুদ্র উদ্যানে Renaissanceএর বীজ উপ্ত হইয়াছিল তাহা কি এত সহজেই নির্ম্মূল হইয়া যাইবে? উৎপীড়িত হইয়া স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী জনগণ যুদ্ধদানে প্রস্তুত হইল। উভয়দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। এ যেন পাপ ও পুণ্যের যুদ্ধ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যুদ্ধ, দুঃশাসন ও যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ। ডণ্ডেল—যাঁহার প্রাণে ধর্ম্ম ও স্বদেশ-হিতৈষণার পার্থক্য ছিল না, দুইই এক জিনিষে পরিণত হইতেছিল, সেই মহাপ্রাণ ডণ্ডেল আজ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। এনা ও

তাদেলসাদের পদপ্রান্তে প্রেমপ্রীতি উৎসর্গ করিবার পরিবর্ত্তে আজ ভণ্ডেল স্বাধীনতা-দ্রোহীদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার বজ্রসম লেখনী প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন "Murdered Innocence" নাম দিয়া তিনি যে এক ব্যঙ্গ নাটক বাহির করিলেন তাহার তীব্র তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বিপক্ষীয় দল উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। রাজাদেশ হইল ভণ্ডেলকে কয়েদ করিতে হইবে। ওল্ডেনবার্ণভেল্টের মত ভণ্ডেলও কি শেষে নিহত হইবে!

বন্ধুবর্গের পরামর্শে ভণ্ডেল লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভগ্নী এবম্বিধ নাটক লেখার জন্য তিরস্কার করিলে ভণ্ডেল নির্ভয়ে বলিয়া উঠিলেন "উহাদিগকে আমার আরও অনেক তীব্র সত্য শুনাইতে হইবে।" কৃষ্ণ কণীর ন্যায় ভণ্ডেলের তেজ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতাপ সিংহের ন্যায় সাহিত্যবীর সত্যের পূজার জন্য অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেও প্রস্তুত। এরূপভাবে আর কয়দিন চলিবে? শত্রুগণ ভণ্ডেলকে ধরিয়া ফেলিল। ভণ্ডেল বিচারালয়ে আসীন। ভণ্ডেলপক্ষীয় উকিল কোর্টকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে "Murdered Innocence" অন্যভাবে ব্যাখ্যা করাও যাইতে পারে। সৌভাগ্য ক্রমে কোর্ট সেইরূপই বুঝিল। ৩০০ গাল্ডেন জরিমানা দিয়া ভণ্ডেল মুক্ত হইলেন। ভণ্ডেলের নাম এখন চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। কয়েকবৎসরের মধ্যেই নাটকখানা তিনশত বার ছাপিতে হইয়াছিল।

ভণ্ডেল যখন শেষবারের জন্য Murdered Innocence সংশোধন করিতেছিলেন এমন সময় তাঁহার পত্নী আসিয়া বলিল—

"স্বামিন্ প্রিন্স মরিসের মৃত্যু হইয়াছে" ভণ্ডেল হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"তাহাকে মরিতে দাও। আমি ইতিপূর্ব্বেই (আমার নাটকে) তাহার মৃত্যুদণ্ডে টান দিয়াছি।" পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা ফ্রেডেরিক হেনরী ভণ্ডেল-দলের পক্ষপাতী। ভণ্ডেলকে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করাইয়া গ্রন্থকারের মুখেই তিনি "Murdered Innocence" শুনিলেন; ফলতঃ পুনরায় স্বাধীন হাওয়া বহিল। কবির প্রাণেও আনন্দের রেখা দেখা দিল।

(৪)

গ্রোসিয়াস (Grotius) এখনও কারাগারে আবদ্ধ। ভণ্ডেল ল্যাটিন হইতে সেনেকার একখানা পুস্তক অনুবাদ করিয়া তাঁহার নামে উৎসর্গ করিলেন। শাসনকর্ত্তৃবর্গের ভয়ে পুস্তক-প্রকাশক প্রত্যেক সংখ্যার উৎসর্গপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু ভণ্ডেলের প্রাণে আবার কিসের ভয়!

এই সময়ে "ধর্ম্ম সংস্কারে"র আন্দোলনপ্রসূত Calvenist সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার অযুক্তিপূর্ণ কুসংস্কারের নিন্দাবাদ করিয়া তিনি একখানা ব্যঙ্গ পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি স্বয়ং ধর্ম্মসংস্কারক ক্যাল্‌ভিনকেও

That monster dread that from a poison-chalice
Pours out the drug of hell in unetuous malice;
And makes the gracious God a very fiend.

তিরস্কার করিতে পশ্চাদপদ হন নাই। চতুর্দ্দিক হইতে ক্যাল্‌ভিনপন্থীরা এবং স্বাধীনতাদ্রোহীরা পুনরায় ভণ্ডেলের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু

আমাদের কবি সর্ব্বদাই শান্ত গম্ভীর ও বজ্রহস্ত গ্রোসিয়াসের কারা-মুক্তি উপলক্ষে তিনি "গ্রোসিয়াস-মঙ্গল" নামক এক কবিতা লেখেন। সেই কবিতাটী একদিকে যেমন অন্তর্জ্জাতিক আইনের অনুষ্ঠাতা স্বাধীনচেতা গ্রোসিয়াসের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ, অপরদিকে তেমনই আবার অত্যাচারী, কুমন্ত্রচিত্ত শাসন-কর্ত্তৃবর্গের নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ। কিন্তু ভণ্ডেল কেবল বাদানুবাদেই লিপ্ত থাকিতেন না। স্বদেশের গৌরব কীর্ত্তনে তাঁহার লেখনী সদাই প্রস্তুত। যখন হল্যণ্ড জলযুদ্ধে স্পেইনের দর্প চূর্ণ করিল তখন মৃত বীরগণের উদ্দেশে তিনি অনেক চৈতালিপি লিখিয়াছিলেন। আর যখন প্রোটেষ্টাণ্টগণের অভয়দাতা বীরবাহু সুইডেনরাজ গাষ্টাভ এডলফাস্ লাইপজিকের মহা-যুদ্ধে ক্যাথলিকগণকর্ত্তৃক ম্যাগ্‌ডিবর্গ লুণ্ঠনের প্রতিশোধ লইলেন ভণ্ডেলের লেখনী হইতে তখন Funeral Sacrifice of Magdeberg বাহির হইয়াছিল। "I needs must sing the song that fills my heart." ভণ্ডেলের প্রাণের কথা ভণ্ডেল লিখিবেই।

ভণ্ডেল এখন তাঁহার মহাকাব্য Constantine লিখিতে আরম্ভ করিলেন ১২ খণ্ডে তিনি এই মহাকাব্য শেষ করিবেন ইহাই তাঁহার বাসনা। নিজকে এই বিরাট কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য ভণ্ডেল অনুসন্ধান ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নী ভণ্ডেলকে একটি পুত্ররত্ন উপহার দিলেন। আনন্দে উৎফুল্ল ভণ্ডেল তাঁহার ভবিষ্য কাব্যের বীরের নামে পুত্রের নাম রাখিলেন কনষ্টেনটাইন। কিন্তু হায় মানুষ যাহা আশা করে তাহা যদি সবই ফলিত! কিছুদিনের মধ্যেই কনষ্টেনটাইন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পত্নীও তাঁহাকে ফাঁকি দিল ভণ্ডেলের চতুর্দ্দিক এখন অন্ধকারপূর্ণ। গভীর শোকে ভণ্ডেল গ্রোসিয়াসকে লিখিয়া পাঠাইলেন "আমার কনষ্টেনটাইন আমাকে ফাঁকি দিয়াছে, তাহার উদ্দেশে আর আমি ফিরিব না।" বাস্তবিকই তিনি মহাকাব্য লেখা চিরদিনের জন্য বন্ধ করিলেন। দূর ভবিষ্যতে হয়ত একদিন আবার কনষ্টেনটাইন লিখিবার ইচ্ছা আসিতে পারে। তাই তিনি পাণ্ডুলিপিগুলি সযত্নে ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু হায়! এগুলি যে অতীত জীবনের সুখকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া অতি তীব্রভাবে তাঁহার হৃদয় আঘাত করিতে লাগিল। নীরবে একদিন তিনি সেগুলিকে অগ্নিতে বিসর্জ্জন দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ সাহিত্যের "মহাভারত"-ও জগতের সাহিত্যভাণ্ডার হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল।

৬

এই দুর্ঘটনার পরে ভণ্ডেল কয়েক বৎসর যাবৎ অনুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। পত্নীর আকস্মিক মৃত্যুপাতে তাঁহার হৃদয়ে যে মহাশূন্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করিতে তিনি লেখনীর আশ্রয় লইলেন। অনুবাদ কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি "Virgin" নামক নূতন একখানা নাটক প্রকাশ করেন। এই নাটকে ভণ্ডেলের ক্যাথলিক ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ টান দেখা গেল। তৎসঙ্গে সঙ্গে সহরে গুজব চলিল যে নির্জ্জন জীবন যাপনে পরিশ্রান্ত ভণ্ডেল এক ক্যাথলিক বিধবা নারীর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন। কে এই রূপগুণাবিভূষিতা বিধবা নারী? এ আমাদের সেই কবি-প্রিয়া ভাসেলদাঘ যে এখন দশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিয়া হঠাৎ

একই মুহূর্ত্তে স্বামী পুত্র হারা হইয়া কাণ্ডারী-বিহীন তরীর ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাসেলসাদ পুনরায় কবি মহলে চন্দ্রকলার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বার্লিয়াস প্রভৃতি নব্য কবিগণ তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পুনরায় প্রেডেরোর মত বিফল মনোরথ হইল। ল্যাটিন ভাষার উৎকৃষ্ট পুস্তকসকল ওলন্দাজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাকি জীবনটা অতিবাহিত করিব ইহাই তাসেলসাদের এখন আন্তরিক অভিপ্রায়। কাজেও তিনি তাহাই করিলেন।

১৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন ভণ্ডেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোকান্তক নাটক "Brother" বাহির হইল তিনি তখন সহজেই, হলাণ্ডের কবিসম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বৎসরাবধি অবিরাম অধ্যয়ন ও গবেষণা, আত্মোন্নতির চেষ্টা ও সাহিত্যের প্রতি অগাধ ভক্তির ফলে আজ ভণ্ডেল দিগ্বিজয়ী। তাহার ভাষার বিশুদ্ধতায়, সরলভাবে অথচ সংক্ষেপে দুরূহ বিষয় প্রকাশ করিবার ক্ষমতায় এবং রচনা মাধুর্য্যে পাঠকবর্গ সর্ব্বদাই তৃপ্ত হইত। পূর্ব্বোক্ত নাটক খানি Virgin Maryএর নামে উৎসর্গীকৃত হওয়ায় বন্ধুবর্গ স্পষ্টই বুঝিলেন ভণ্ডেল এখন ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী।

পাঠক আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন যে যে ভণ্ডেল যৌবনের মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্যাথলিক ধর্ম্মের অনুদার নীতির বিরুদ্ধে লেখনী প্রচালন করিয়া আসিতেছিলেন সেই ভণ্ডেলই আবার জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ হইয়া কিরূপে ক্যাথলিক ধর্ম্মের দ্বারে অভয় ভিক্ষা মাগিতে চলিলেন। ঘটনাটী আশ্চর্য্যই বটে। কিন্তু সমাজের তদানীন্তন অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলে এই অসামঞ্জস্য অনেক পরিমাণে দূর হইয়া যাইবে।

ভণ্ডেল কেনই বা ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন না? তাঁহার সংসারের আপনার বলিতে যে কেহ আছে সকলেই ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। আর স্বয়ং তাসেলসাদ, সেও ক্যাথলিক। যদিই বা তাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়া পড়ে। কিন্তু ভণ্ডেলের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ ইহা নহে। প্রটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্যাথলিক ধর্ম্মের ন্যায় উহাও অলক্ষে ধীরে ধীরে অনুদার নীতির দাস হইয়া পড়িতে লাগিল। অপর দিকে Counter Reformationএর শুভ প্রভাবে ক্যাথলিকগণও ক্রমশঃ উদার নীতির উপাসক হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ভণ্ডেল ভুলিয়া যান নাই যে লুথারের বিজয়নাদই হলাণ্ডের স্বাধীনতা লাভের প্রধান সহায়। তিনি ভুলিয়া যান নাই যে Renaissanceএর উপযুক্ত সন্তান প্রটেষ্টানটিসমই পশ্চিম ইয়োরোপে স্বাধীন চিন্তার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছে। অতীতের গৌরব কাহিনী তিনি বিস্মৃত হন নাই। বিস্মৃত হয়েন নাই বলিয়াই বর্ত্তমানে প্রটেষ্টানটিসমের অধঃপতন তাঁহার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। আজ প্রটেষ্টানটিসম স্বাধীনতার গৌরব কীর্ত্তন করিতে যাইয়া ব্যাভিচারের নামান্তর হইয়াছে। তাই ভণ্ডেলের শুপ্ত প্রাণ নব্য ক্যাথলিক ধর্ম্মে উদারনীতির প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল। ক্যাথলিক ধর্ম্মের জাকজমকপূর্ণ পূজা অর্চ্চনা, তিথিপর্ব্ব সঙ্গীত; ইহার প্রাচীনত্ব ও বিশালতা ভণ্ডেলের শ্রান্ত মন অধিকার করিয়া বসিল। ভণ্ডেল এখন শান্তি প্রার্থী।

(৭)

ভণ্ডেল সত্য সত্যই এখন বিশ্রাম-কামী। পত্নী ও পুত্রের পর বন্ধুবান্ধবগণই তাহার

সুখের আকর; কিন্তু বিধাতা সে অবশিষ্ট-সুখ হইতেও ভণ্ডেলকে একে একে বঞ্চিত করিতে লাগিলেন। হল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-নাটককার ব্রেডেরো সুধায় তাসেলসাদের প্রেমভিক্ষা মাগিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়া পড়িলেন। এই অন্তর্বেদনার ফলেই তিনি জীবনের মধ্যাহ্নে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রীল শীঘ্রই ব্রেডেরোর অনুগামী হইল। তারপর হোফট্ ও বেলিয়ার্স ভণ্ডেলকে শ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসাইয়া অন্তর্হিত হইল। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা উইলিয়মও তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত উইলিয়মও বাল্যকাল হইতে কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। কিন্তু উইলিয়মের মেধাশক্তি মুকুলেই বিনষ্ট হইল। ভণ্ডেল ভ্রাতৃশোক কিছুতেই প্রশমিত করিতে পারিলেন না। "I could cry when I think of my brother. He was much my superior." বলিয়া ভণ্ডেল অনেক সময়েই অশ্রু ফেলিতেন।

কিন্তু ভণ্ডেলের চরম দুর্গতি এখনও আসে নাই। তাসেলসাদ যে এখনও ইহধামে আছে! হায়! হল্যাণ্ডের সাহিত্যাকাশ হইতে এ নক্ষত্রও অকালে খসিয়া পড়িল। ভণ্ডেলের আপনার বলিতে রহিল কেবল তাহার বিধবা লেখনাস্ত। তাসেলসাদের কবরোপরি শোকার্ত্ত ভণ্ডেল লিখিয়া রাখিলেন :—

Here Tasselschade lies
Let no one rashly dare
To give the measure of her worth
beyond compare
Her glory, like thesun's, the poet's
pen defies."

এই সকল ধারাবাহিক শোকাবহ ঘটনার পর পুত্রের হস্তে বিপণীর ভার সমর্পণ করিয়া ভণ্ডেল অবশিষ্ট জীবন জগতের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া আশ্রম জীবন যাপনে কাটাইবেন, ইহাই ভাবিলেন। তাঁহার বয়সও এখন ষষ্টিবৎসর। কিন্তু বিধাতা যে তাঁহার কপালে বিশ্রাম সুখ লিখিয়া রাখেন নাই বৃদ্ধ ভণ্ডেল তাহা জানিতেন না। তাঁহার জীবন-যুদ্ধ মাত্র আরম্ভ প্রায়।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে আমষ্টারডাম সহরের প্রায় শতাধিক কবি, শিল্পী ও ভাস্করগণ সম্মিলিত হইয়া ভণ্ডেলের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক মহাসভার আহ্বান করিলেন। প্রকাণ্ড টেবিলের একপার্শ্বে আমাদের শুভ্রকেশ কবি উচ্চমঞ্চে উপবিষ্ট। সভার যথারীতি কার্য্যসকল সম্পন্ন হইলে জনসঙ্ঘ তখন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ভণ্ডেলের শিরোপরি বিজয় মাল্য বর্ষণ করিতে লাগিল। আজ ভণ্ডেল হল্যাণ্ডের রাজা—হল্যাণ্ডের প্রাণ। গর্ব্বিত ও উৎফুল্লমনে শ্রোতৃমণ্ডলী এক কণ্ঠে তাঁহাদের জাতীয় গান গাহিয়া উঠিল—"The great Wilhelmus." হে হল্যাণ্ডবাসিগণ, উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত গান গাহিয়াছ! একশত বৎসর পূর্ব্বে ভিলহেলমাসই তোমাদিগকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনিয়া দিয়াছিলেন, আর আজ সেই ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধ ভণ্ডেল তোমাদের জাতীয় সাহিত্যে নবজ্যোতি ঢালিয়া দিলেন।

ভণ্ডেল বুঝিলেন তাঁহার জীবনব্যাপী যুদ্ধের ফল ফলিয়াছে। তাই আজ ভণ্ডেলের হৃদয়ে বাল্যতেজ ফিরিয়া আসিয়াছে—তাঁহার মূর্ত্তি তেজোময়, লাবণ্যপূর্ণ ও শক্তিমান্। ভণ্ডেল বিজয় মাল্য পাইলেন বটে; কিন্তু মাল্যের প্রতি ফুল তাঁহারই জীবনরক্তধারা কেনা।

(৮)

ভণ্ডেলের নির্জ্জনবাস ঘটিয়া উঠিল না। আমষ্টারডামের সেই শুভ উৎসব ভণ্ডেলের প্রাণে নবশক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সাহিত্য-জগতে টানিয়া আনিল। এবার ভণ্ডেল যে রত্নে সাহিত্যভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিলেন সে রত্ন বাস্তবিকই রত্ন—অমূল্য, অতুলনীয়। ইহাই ভণ্ডেলের "লুসিফার"। কালিদাসের রঘুবংশ, দান্তের Divine comedy, Miltonএর Paradise Lost, আর ভণ্ডেলের লুসিফার।

"লুসিফারে" কি আছে? পাঠক হয়ত তাহা জানিতে ইচ্ছুক। তাই লুসিফারের কয়েক পংক্তি পাঠককে শুনাইব।

লুসিফার "man's first disobedience" এর গল্প নয়—যদিও পরিশেষে তাহাই হইয়া দাঁড়াইবে। দেবগণের স্বর্গচ্যুতি বর্ণনাই—"লুসিফারে"র প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মানবের কথাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট। কার্য্যকারণের আবর্ত্তে পড়িয়াই দেবগণ স্বর্গ হারাইলেন আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ এডাম ও ইভ্ (খৃষ্টীয়ানদিগের মতে) পাপ কার্য্য করিয়া সকল দৈন্যের অধিকারী হইলেন। বিধাতা যেদিন পবিত্রমনে মানুষের জন্ম দিলেন সে দিন হইতেই দেবগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পড়িলেন।

নাটকের রঙ্গভূমি স্বর্গালয়ে যেখানে ভগবান রাজত্ব করেন

" Before whose face
The universe with its eternity
Is but a mote, a moment poised
in space,"

কেবল সেখানেই

" Stand the hidden springs of life
revealed,
mechanism from
earth concealed,
There Nature's primal premises
appear
deep and
crystal clear,
Flowing from out the heart of
boundless ocean
Of the eternal now. With rapt
devotion
A myriad ministering forces there
await
The summons of His awful eyes
of fate,
The mandates of His all compell-
ing voice."

আর নিম্নে অতি নিম্নে এডাম ও ইভের পৃথিবী। পরমেশ্বর ও মানব—স্রষ্টা ও সৃষ্ট, আদি কারণ ও শেষ ফল এই উভয়কে লইয়া ভণ্ডেল 'লুসিফারে' উপস্থিত।

দেবরাজ লুসিফার কর্ত্তৃক প্রেরিত এপোলিয়ন নবসৃষ্ট পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়া দেবগণ-সমক্ষে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল। পৃথিবীর শোভায় মোহিত হইয়া আদিযুগের প্রেম, সরলতা, সৌন্দর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মহিমা গাহিতে গাহিতে এপোলিয়ন বলিল

" And then he (Adam) kissed
His bride and she her bridegroom
—thus on joy
Their nuptials fed, on feasts of
fiery love,
Better imagined far than told—
a bliss
Divine beyond all angel ken ;"

আর ইহার সহিত দেবগণের অবস্থা তুলনা করিয়া

" How Poor
for us no union sweet
Of two-fold sex—of maiden and of man—
much of good we miss ; we know
No mate or happy marriage in a heaven
Devoid of woman."

ইর্ষ্যায় জর্জ্জরিত এপোলিয়ন লুসিফার যে প্রশ্ন করিতেছে তাহার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল

" Their life consists
Alone in loving and in being loved—
One sweet, one mutual joy, by them indulged
Perpetually, yet e'er unquenchable"

এপোলিয়ন পৃথিবী বর্ণনা সাঙ্গ করিল। উপস্থিত দেবগণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়। সামান্য মানব, তাহার সৌভাগ্য কি দেবগণ হইতেও বেশী ! বেলজিবাব ক্রোধান্ধ হইয়া তেজঃপূর্ণ ভাষায় এডাম ও লুসিফারের পরস্পর অবস্থা তুলনা করিতে লাগিল। অমনি দেবগণের হৃদয়ে বিদ্রোহবীজ উপ্ত হইল। এমন সময়ে ভগবানের দূত উচ্চ হইতে ঘোষণা করিল "হে দেবগণ, পরমেশ্বরের নূতন আদেশ শ্রবণ কর, এবং তৎপ্রতিপালনে যত্নপর হও। ভগবানের ইচ্ছায় পৃথিবীতে এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। তোমরা উহাকে সম্মান করিতে ভুলিও না।"

দূত গেব্রিলের আদেশবাণী শুনিয়া দেবগণের গর্ব্বিত হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। লুসিফার দূতকে প্রশ্ন করিল "কেন ভগবান আর এক জাতি সৃষ্টি করিলেন ?" দূত উত্তর দিতে নারাজ। ভগবানের আদেশ প্রচার করিয়া সে প্রস্থান করিল। বেলজিবাব লুসিফারের পরিতপ্ত হৃদয়ে কুমন্ত্র ঢালিতে লাগিল। লুসিফার ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম করিয়া সদর্পে চীৎকার করিয়া উঠিল

" Now swear I by my crown upon this chance
To venture all, to raise my seat amid
The firmament, the spheres, the splender of
The stars above. The Heaven of Heavens shall then
place be ; the rainbow be my throne ;
The starry vast, my court ; while down beneath,
The Earth shall be my foot-stool and support ;
I shall, then swiftly drawn through air and light.
High-seated on a chariot of cloud,
With lightning-stroke and thunder grind to dust
Whate'er above, around, below doth us
Oppose, were it God's Marshall grand himself ;

these empyrean vaults
Proud in their towering Masonry, shall burst,
With all their airy arches, and dissolve
this huge and joint-racked earth
Like a misshapen monster lifeless lie;
This wondrous universe to chaos fall,
desolation change,
Who dares, who dares defy great Lucifer?"

কেমন তেজঃপূর্ণ ভাব! বিদ্রোহের তীব্রভাব আর কোন কবির লেখনীতে এমন অগ্নিপূর্ণ ভাষায় সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি? সাধুরাজ্যে অসতের এহি মহা দর্প! লুসিফার, তোমার হৃদয়ে বল আছে বটে!

লুসিফার প্রমুখ দেবগণ তখন কলঙ্কমন্ত্রণায় লিপ্ত হইল। উদ্দেশ্য স্বর্গ অধিকার, আর

"For all eternity
Mankind to lock without the gate of Heaven"

তাহাদের এই জঘন্য প্রতিজ্ঞা

"Tinckles well in the angelic ear,
And flashes like a flame from choir to choir."

সমস্ত স্বর্গধাম এখন বিদ্রোহভাবে পরিপূর্ণ—যখন তখনই প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। স্বর্গ-সেনাপতি মাইকেল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ —ভগবানের আদেশ পাইলেই শত্রু নিপাতে বহির্গত হইবে। আর লুসিফার—সেও যুদ্ধ দিতে প্রস্তুত। ভগবানের সম্মুখে সে মস্তক অবনত করিতে চাহে কিন্তু ভগবান আজ সামান্য মানবের ভগবান গাহিতে যাইয়া অন্যায়ভাবে তাহার মানহানি করিয়াছেন। এইজন্য আজ লুসিফার স্বীয় সম্মান রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর—ভগবানের বিনাশ সাধনে উদ্যত।

"Then shall we venture all, our favor lost
To the oppressors of your lawful right."

বলিয়া দেবসৈনিকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এখন,

"The whole of Heaven glows with the fierce blaze
Of tumult and of treachery."

তাই গেব্রিল ভগবানের নামে মাইকেলকে আদেশ দিলেন

"To burn out with a glow of fire and zeal
These dark, polluting stains."

মুহূর্ত্তে মাইকেল সসৈন্যে বহির্গত হইল। যুদ্ধবাদ্যে গগন বিদীর্ণপ্রায়। চকিত অন্তরে লুসিফার একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন। একি তাহারই স্মরণ বাজনা! কিন্তু এখন আর পিছপা হওয়া চলে না। বিংশশতাব্দীর বেথলেম হোলভেথের ন্যায় লুসিফার বলিয়া উঠিল "Necessity must be our law." লুসিফার সৈন্যবর্গকে আদেশ দিলেন—"অগ্রসর হও"।

এমন সময় ভগবানের দ্বিতীয় দূত রেফেল লুসিফারকে এবম্বিধ পাপকার্য্য হইতে

নিরস্ত করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু রেফেলের চেষ্টা বৃথা। লুসিফার যে দেবগণের রক্ষক! তাই লুসিফার বলিল

"I shall maintain the holy right, compelled
By high necessity, thus urged at length,
Though much against my will, by the complaints
And mournful groans of myriad tongues."

কিন্তু লুসিফারের হৃদয় আবার কাঁপিয়া উঠিল। এ যে বিধাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ তিনি কি বাস্তবিকই দোষী? সন্দেহ আসিয়া তাহার মন অধিকার করিয়া বসিল। পরাজিত হইলে তাহার দশা কি হইবে?

"What creature else so wretched is as I?
On the one side flicker feeble rays of hope,
While on the other yawns a flaming horror.

লুসিফারের উহাই সঙ্কট মুহূর্ত্ত

"This brevity twixst bliss and endless doom."

পরাজয়ের ভীষণ ফল ভাবিতে ভাবিতে তাহার শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িল। "But it is too late—all hope is past," লুসিফার সৈন্যবর্গকে আবার আদেশ দিলেন —"অগ্রসর হও।"

যুদ্ধ বাধিল। উভয় দলই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

"Both standing there in shining panoply
Vying in splendors grand."

যুদ্ধের বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নাই। পাঠক, মেঘনাদবধে মধুসূদনের যুদ্ধ বর্ণনা পড়িয়াছেন ত? ওগেলের ভাষা বোধ হয় তাহা অপেক্ষাও তীব্র, তীক্ষ্ণ অথচ প্রাঞ্জল।

লুসিফার পরাজিত হইল। রথ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সে মহা গহ্বরে পতিত হইল। আর, তাহার সঙ্গে সঙ্গে "lion, dragon, driver, all plunge down." বেলজিবাব ও এপোলিয়ন বৃথায় পুনরায় সৈন্য-সংগ্রহে চেষ্টিত হইল।

"O'er them fell destruction rolls in flood."

বিজয়ী মাইকেল স্বর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আজ পাপিগণের চক্রান্ত হইতে স্বর্গের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। শত্রুগণ স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

"All blind and overcast
With shrouding mists, and horribly deformed."

"Thus is the fate who would assail God's throne."

বলিয়া বিজয়ী মাইকেল তাহার বিজয়সংবাদ সমাপন করিলেন।

কিন্তু সয়তানকে বুঝি এত সহজে দমন করা যায় না। স্বর্গের আনন্দকোলাহল ভেদ করিয়া স্বর্গীয় দূত গেব্রিল নিনাদ করিয়া উঠিল—"এডামের পতন হইয়াছে"। লুসিফারের চক্রান্তে এডাম নিষিদ্ধ আপেল ফল ভক্ষণ করিয়াছে। ক্রোধোন্মত্ত মাইকেল সেনাপতি উরিলকে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে পৃথিবীতে পাঠাইলেন—

"To drive the pair from Eden who have dared
Transgress, so rash and blind, the primal law."

কেবল ইহাই নহে। আজ হইতে মানব-জাতির উপর এই অভিসম্পাত

"To labor, sweat, arduous slavery."

সয়তানের চক্রান্তে পড়িয়া মানবজাতির অবস্থা শেষে এই হইল।

আর লুসিফার, তুমি স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছ! এ ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে তোমার স্থান কোথায়? তোমার স্থান ভূমণ্ডল মধ্যস্থিত গন্ধক-হ্রদের জলন্ত অনলমধ্যে। সেখানে তুমি—

"In the eternal fire
Unquenchable, with chilling frosts commingled,"
"Amidst the blast of memory's regret,"

ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিবে

"How slow time limp upon a crutch of pain."

আর ভগবানের আজ্ঞালঙ্ঘনকারী মানব! তুমি আর এ-জীবনে শান্তি ভোগ করিতে পারিলে না, কিন্তু বিধাতা তোমার প্রতি নির্দ্দয় নন। অভিজ্ঞ দেবগণের স্বর্গচ্যুতির ফলে স্বর্গে যে শূন্যস্থান পড়িয়া আছে পরজন্মে সে স্থান তোমারই হইবে।

(৯)

এই ত আমাদের "লুসিফার।" পাঠক যদি লুসিফারের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে চান তবে সমস্ত বইখানাই পড়িবেন। কবি-অধ্যাপক ভ্যান্‌নোপেন ওলন্দাজ-কাব্যের ইংরাজী অনুবাদ রচনা করিয়াছেন। স্বর্গের প্রীতি ও মানবের উৎপত্তি গাহিতে যাইয়া অনেক দেশের অনেক কবিই গদ্যে পদ্যে অনেক কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু সময়ের ধ্বংসকারিণী শক্তির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আজ মাত্র ইংরাজ "প্যারাডাইজ লষ্ট" এবং ওলন্দাজ "লুসিফার" বাঁচিয়া আছে। প্রথমটি ইংরাজী কাব্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে আর দ্বিতীয়টি ওলন্দাজ সাহিত্যের কহিনুর।

উপরে "লুসিফারে"র যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল তাহাতেই পাঠক হয় ত বুঝিয়াছেন Miltonএর Paradise Lost ও ভণ্ডেলের লুসিফারে কতটা সামঞ্জস্য। Paradise Lost এর ১৩ বৎসর পূর্ব্বে লুসিফার প্রকাশিত হয়। মিল্টন ওলন্দাজ সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যে লুসিফারের ভাব ও এমনকি বাক্যও অনেকস্থানে অবিকল ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আর তবে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? মিল্টন স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"To borrow and to better in the borrowing is no plagiaric." পাঠক ভণ্ডেলের লুসিফার যতই পড়িবেন ততই বুঝিতে পারিবেন মিল্টন ভণ্ডেলের নিকট কত পরিমাণে ঋণী।

(১০)

"লুসিফার"প্রণেতার শেষ জীবন শোকাবহ ঘটনায় পরিপূর্ণ। পুত্র পুষ্টাস্‌ভণ্ডেল ও কন্যা এনা ব্যতীত বৃদ্ধের সংসারে আপন বলিতে আর কেহই নাই। পুষ্টাস্ অমিত-ব্যয়ী ও নির্ব্বোধ। বৃদ্ধের কষ্টার্জ্জিত আয় পুত্র দুই হাতে আমোদ তামাসায় উড়াইয়া দিতে লাগিল। "Name no child by your own name; for if he should not turn out well it is forever branded" বলিয়া ভণ্ডেল প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন।

পুত্রের অসদাচারে ভণ্ডেল ক্রমশঃই হত-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলেন। পাড়াপড়শীগণের

পরামর্শে ভণ্ডেল অবশেষে জোর করিয়া পুত্রকে ধর্মযাজকের ভাগ্যপরীক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ভণ্ডেলের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তির একবিন্দু পুত্রসন্তান থাকা কি কম ক্ষোভের কথা! ভণ্ডেলের আজীবন দারিদ্র্যও বোধ হয় ভণ্ডেলের প্রাণে এত যাতনার কারণ হয় নাই। পুত্রের পাষণ্ডে মৃত্যুসংবাদ যখন বৃদ্ধের কর্ণগোচর হইল তখন তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন "How sharper than a serpent's tooth it is to have a thankless child—but I am free now."

ভণ্ডেলের নিকট সৎসন্তান প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু কিন্তু যে সন্তান মনুষ্যত্ব বিহীন সে সন্তান তাহার নিকট সতত বিষকুম্ভবৎ পরিত্যাজ্য। তাহার প্রাণের কনষ্টেনটাইন যখন অকালে প্রাণ হারাইল তখন ভণ্ডেল আক্ষেপে লিখিলেন

"Why mourn'st thou Vossius?
Why has pain
Its furrows to thy pale brow give?
Seek not to hold thy son from heaven!
'Tis heaven that draws—resign him then."

পুত্রকৃত দেনা শোধ করিতে যাইয়া ভণ্ডেল একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে এক ব্যাঙ্কে একটী মুহুরীর চাকরী জোগাড় করিয়া দিল। যে ভণ্ডেল লুসিফার উপলক্ষে মধুসূদনের মতই সদর্পে বলিতে পারিতেন "রচিব মধুচক্র—

সৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান
সুধা নিরবধি";

যাঁহার লেখনী প্রসাদাৎ ওলন্দাজ সাহিত্য কল্পনার উচ্চশিখায় আরোহণ করিয়াছে সেই ভণ্ডেলের কলম নাকি আজ ব্যাঙ্কের সামান্য মাসিক হিসাব রাখিতে ব্যস্ত থাকিবে। জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট বাস্তবিকই বলিয়াছেন যে "এ পৃথিবীতে ন্যায়বিচার নাই। ন্যায়বিচার কেবল ঊর্দ্ধে ভগবানের নিকট প্রাপ্য। যদি ঊর্দ্ধে বা অন্য কোথাও ভগবান বলিয়া কোন জিনিষ না থাকেন তাহা হইলে অন্ততপক্ষে ঐরূপ জিনিষ থাকা উচিত। তাহা না হইলে ব্রহ্মাণ্ড চলিতে পারে না।"

ভণ্ডেল মুহুরির কাজ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ব্যাঙ্কের মহাজন দয়া পরবশ হইয়া ভণ্ডেলকে পেন্সন দিলেন। পেন্সনভুক্ত ভণ্ডেল সময় পাইয়া পুনরায় অনুবাদ ও রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি প্রায় ৩৩খানা নাটক হল্যাণ্ডকে উপহার দিয়া যান।

বার্দ্ধক্য আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে লাগিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল। পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুবান্ধবদিগকে ভণ্ডেল প্রায়ই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন "আমার কবরের উপর তোমরা এই কথাগুলি লিখিয়া রাখিও"—

"Here in peace lies Vondel old
He died because he was so cold."

আট দিনের অসুখের পর ভণ্ডেল ৯১ বৎসর বয়সে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এইরূপে Renaissanceএর প্রকৃত পুত্র ভণ্ডেল আজীবন স্বাধীনতার নীতি গাহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার কবরের পার্শ্বেই হোফ্‌ট, ব্রেডেরো, ভাসেনলাঁর প্রভৃতি হল্যাণ্ডের বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ বিশ্রাম করিতেছেন।

ভণ্ডেলের বজ্রনিনাদ যখন বার্দ্ধক্যের ধীর

আক্রমণে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল সেই জীবন-সন্ধ্যায় তিনি গাহিলেন—

"O ! help me, O my God, to give
my life to thee,
My fragile self, my will, my little
all let me,
O thou beyond compare ! O source
of everything.
In praises rich and deep thy
matchless glory sing."

তিনি আবার ভগবানকে আরাধনা করিলেন—

"Holy ! holy ! once more holy !
Three times holy ! Honor God !
Without Him is nothing holy !
Holy is his mighty nod !"

আর ভগবানও তাঁহার উপযুক্ত সন্তানকে তাঁহার শান্তিক্রোড়ে টানিয়া লইলেন !

কিন্তু মর্ত্যে তাঁহার আধিপত্য এখনও অটুট। ঐ শুন হলাণ্ডবাসিগণ আজও ভক্তিভরে তাঁহার নামে অঞ্জলি দিতেছে—

"Vendel ! thousand thousand
voices
Echo answer—grandly sing
Praises to our greatest poet,
Hailing him the poets' king."

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বি, এ,

শ্যামারূপার গড় *

পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সেন উপাধিধারী সামন্ত রাজগণ শ্যামারূপার গড়ের অধীশ্বর ছিলেন। ইহার অপর নাম ত্রিবষ্টিগড় ও চেকুর। সেনরাজগণের অধিকৃত ও পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় লোকে ইহাকে সেনপাহাড়িও বলিত। গড়ের নামানুসারে অজয় তীরবর্ত্তী কিয়দংশ ভূভাগ সেনপাহাড়ি পরগণা নামে বিখ্যাত হইয়াছে। সেনপাহাড়ির উত্তরে বীরভূমী বঙ্গ গৌরব কবীন্দ্র জয়দেবের লীলাস্থলি কেন্দুবিল্ব ধাম। মধ্যে অজয় নদ তাহার দক্ষিণ তটে সেনপাহাড়ি, উত্তর তটে কেন্দুবিল্ব; লক্ষ্মী ও সরস্বতীর, বীরত্ব ও কবিত্বের দুই পুণ্য নিকেতন, অজয় প্রবাহকে পবিত্রতা দান করিয়াছে।

কবিবর 'ঘনরাম' বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে 'কনক সেন' 'কর্ণ সেন' 'লব সেন' বা 'লাউ সেন' এবং 'চিত্রসেন,' সেনবংশীয় এই চারিজন নৃপতিকে সেনপাহাড়ির অধীশ্বর স্বরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) কর্ণসেনকে বিতাড়িত করিয়া 'ইছাই ঘোষ' নামক একজন গোপ

---

* বর্ত্তমান অষ্টম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে ইতিহাস শাখায় পঠিত।

(১) ধর্ম্মমঙ্গল ত্রয়োদশ সর্গে হস্তীবর পালায় লাউসেন আত্মপরিচয় দিতেছেন।

ধুমসীল সজ্জন সত্য বুদ্ধি কর্ণ কাজে। পরম পিরীতে পরিচয় দিল তারে।
মদনা নগরবাসী সাগর সমীপ। পিতামহাশয় মোর যার নরাধিপ।
পিতামহ ঠাকুর কনকসেন রায়। যার যশ কীর্ত্তি জগৎ জুড়ি গায়।
তস্য পিতা কর্ণসেন রায় নৃপবরি।'

অষ্টম উনবিংশ সর্গে ৪৪৫ সংখ্যক শ্লোক।

আনন্দে আনন্দ বৃদ্ধি সিদ্ধি গুণাগুই। পুত্র চিত্রসেন তাঁর হইল ভূমিষ্ঠ।

এই গড়ে কিছুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তিনিই ভামারূপা দেবীর সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। (২) ভামারূপা নাম সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নামটি একটু অদ্ভুত রকমের হইলেও, ইহার মধ্যে একটা অর্থ সঙ্গতি থাকা সম্ভব কি না অনুমান করিবার পূর্ব্বে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

'বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা' হইতে 'পৌণ্ড্র' 'বঙ্গ' 'উপবঙ্গ' 'সমতট' 'বর্দ্ধমান' 'সুহ্ম' ও 'তাম্রলিপ্তি' বঙ্গদেশের এই কয় বিভাগের নাম প্রাপ্ত হইতেছি। তাহার প্রায় একশত বৎসর পরে যুধন চোয়াঙের বিবরণী হইতে আমরা সুহ্মের পরিবর্ত্তে কর্ণ-সুবর্ণের নাম প্রাপ্ত হই। কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্কদেবের বিরুদ্ধে বিপুল অনীকিনী সজ্জিত করিয়া মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন যখন গৌড়দেশে আসিয়া উপস্থিত হন 'সম্রাজ সভাকবি বাণভট্ট'-ও তখন তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। বানভট্টের হর্ষচরিতে বর্ণিত আছে, সুহ্মাধিপতি দেবসেনের দেবরাসুরক্তা মহিষী দেবকী বিষচূর্ণ গর্ভ কর্ণোৎপল সাহায্যে স্বামীর বিনাশ সাধন করেন'। খুব সম্ভব সেই বিপ্লবের সময় সুহ্ম শশাঙ্ক কর্ত্তৃক কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। তদবধি সুহ্ম আর পৃথক্ বিভাগরূপে উল্লিখিত হয় নাই। তাই চৈনিক পরিব্রাজক 'যুয়ান চোয়াঙ' সুহ্মের পরিবর্ত্তে কর্ণসুবর্ণের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখিতে হইবে সুহ্ম বলিতে কোন্ স্থানকে বুঝাইত? মহাভারতের টীকাকার 'নীলকণ্ঠ' বলেন 'সুহ্মারাঢ়া'। অজয়ের উত্তর তটবর্ত্তী ভূভাগই রাঢ়ের অন্তর্গত। তাহা হইলে ইহারই মধ্যে সুহ্মের রাজধানী থাকিবে। আমাদের মনে হয় ত্রিষষ্টীগড়ই সুহ্মের রাজধানী ছিল। কর্ণসেন প্রভৃতি দেবসেনেরই বংশ-সম্ভূত। সুহ্মাধিষ্ঠাত্রীদেবী সুহ্মারূপাই কালে 'ভামারূপা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং সুহ্মারূপা নাম হইতে দুর্গটীরও ভামারূপার গড় এই আখ্যা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। অন্যথায় কালীকাদেবীর অপর নামই যখন ভামা, তখন ভামারূপা বোধ হয় দেবীর নাম হইতে পারে না। আর এক কথা বর্দ্ধমান তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি যখন বর্ত্তমান রহিয়াছে; তখন সুহ্মের একান্ত অস্তিত্বাভাব একেবারেই অসম্ভব। আশা করি ঐতিহাসিকগণ ইহার সত্য নির্ণয় করিবেন।

ইছাই ঘোষের সুবৃহৎ দেউল ও ভামারূপার গড় বিদ্যমান থাকিতে ইছাই ও লাউসেনের অস্তিত্বে সন্দিহান হইবার উপায় নাই। রাজা গণেশ ও বঙ্গজ কায়স্থ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মত ইছাই ঘোষের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা তৎসাময়িক বঙ্গে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। ইছাইয়ের রণভেরী রব গৌড়েশ্বরের দুর্গম প্রাসাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে কাহিনী ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে পল্লবিত হইলেও একেবারে কবি-কল্পনা নহে। সুতরাং লাউসেনের কাল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মমঙ্গলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এখন সেই পথেই অগ্রসর হওয়া যাউক।

---

(২) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে আসা সীতারামপুরের পরবর্ত্তী ষ্টেশন সালানপুর হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ভাঁড়াশাহাচ সন্নিধে ভামারূপা দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। প্রবাদ শেখর ভূমের রাজা কল্যাণশেখর বল্লালসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দেবীকে যৌতুক প্রাপ্ত হন। কল্যাণ-শেখরের নামানুসারে সেই অবধি ভামারূপা দেবী কল্যাণেশ্বরী নামে খ্যাতা আছেন।

ইছাই ঘোষের দেউল

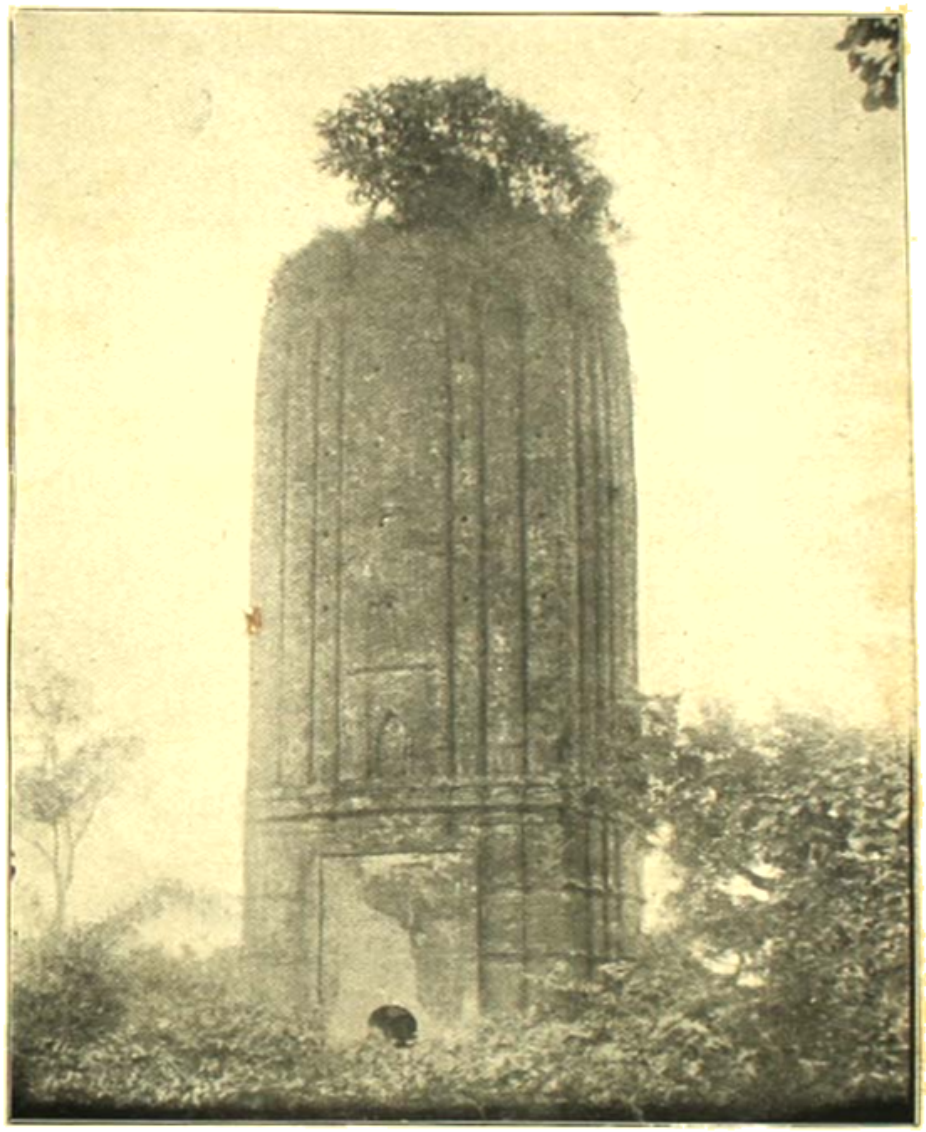

ইছাই ঘোষের জয়স্তম্ভ-স্বরূপ এই দেউলটি কিঞ্চিদূন
প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন।
উচ্চতা প্রায় শত ফুট হইবে। দেখিলে এই
সেদিনের বলিয়া মনে হয়।

INDIA PRESS, CALCUTTA.

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে—

'ধর্ম্মপাল রাজা ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রণবে পুণ্য পাপ যায় দূর।
পৃথিবী পালিয়া স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্য্যবন্ত পুত্র তার রাজা গৌড়েশ্বর'।

(২য় সর্গ ঢেকুর পালা)

অন্যত্র কাড়ুর যাত্রা পালা চতুর্দ্দশ সর্গে কামরূপ হইতে গৌড়ে প্রত্যাগত হইয়া লাউসেন গৌড়-রাজমহিষীকে (ভানুমতিকে) 'ব্রহ্মকর জাপামালা ও সমুদ্র কাটারী'র জন্য বলিতেছেন :—

• • •

'সেন বলে মাসী গো কহিতে নাহি ভয়।
তোমার পাশুড়ী বুড়ি কৃপাদৃষ্টে চায়।
ব্রহ্মপুত্র নদ তবে তড়ে' পার যায়।

ধর্ম্মমঙ্গলে এই পাশুড়ীর নাম বল্লভাদেবী। ইনি ধর্ম্মপালের পত্নী।

মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও বর্ণিত হইয়াছে :—

'ধর্ম্মপাল রাজ ব'ল অরাজক দেশ।
পাত্র মিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ।
পাটহস্তী রাজার আছিল পুরজন।
পূজা যোগ পেয়ে হস্তী প্রবেশে কানন।
সাঙ্গুলার সদন সমীপে দরশন।
গজপৃষ্ঠে গৌড়েশ্বর গৌড় গমন।
আনন্দের সীমা নাই অনুদিন পরে।
উপনীত হ'ল সবে গৌড় নগরে।'

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর লাউসেনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ধর্ম্মমঙ্গলে কিন্তু ধর্ম্মপাল-পুত্রের নাম উল্লিখিত হয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ সকলেই তাঁহাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের দুই পুত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ১ম ত্রিভুবন পাল, ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ২য় দেবপাল, ত্রিভুবন পাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেও দেব পালই গৌড়-সিংহাসন লাভ করেন। দেব পালের মাতার নাম রন্না দেবী। ডাক্তার ফ্লিটের মতে রাষ্ট্রকূটপতি পরবল তৃতীয় গোবিন্দ এই রন্না দেবীর পিতা। ত্রিভুবন পালের মাতার নাম জানিবার উপায় নাই। আমাদের মনে হয় ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত বল্লভা দেবীই ত্রিভুবন পালের জননী ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধর্ম্ম পাল কর্ত্তৃক বল্লভা দেবী নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন এবং সমুদ্রের ঔরসে তাঁহার গর্ভে ধর্ম্মপালের এক ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে যে রন্না দেবীর পাণিগ্রহণের জন্যই হউক বা অপর যে কোন কারণেই হউক বল্লভা দেবী কিয়দ্দিনের জন্য সমুদ্রতটবর্ত্তী কোন প্রদেশে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ত্রিভুবন পাল সেই স্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। অনুমান হয় ৭৯৫ খৃঃ অব্দে ধর্ম্মপাল গৌড়সিংহাসন লাভ করেন। রন্না দেবীর পিতা পরবল বা গোবিন্দের রাজ্যকাল খৃষ্টীয় ৭৯৪ অব্দ হইতে ৮১৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। সুতরাং বলিতে হইবে ধর্ম্মপাল রাজ্যগ্রহণের বিংশতি বৎসর মধ্যে রন্না দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার ৩২শ বর্ষ রাজ্যাঙ্কে তিনি ত্রিভুবন পালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। সে হিসাবে আমাদের এ অনুমান অসঙ্গত হইতেছে না যে রন্না দেবীকে বিবাহ করার পর ত্রিভুবন পাল জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ হইলেও যৌবরাজ্য গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স অন্ততঃ ২০ বৎসর ধরা যাইতে পারে।

ধর্ম্মমঙ্গলোক্ত ধর্ম্মপাল-পুত্র গৌড়েশ্বর

বলিতে আমরা ত্রিভুবন পালকে ধরিয়া লইতে পারি। খুব সম্ভব লাউসেন ইঁহারই তালিকা পুত্র ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে ইঁহার নাম অনুল্লিখিত থাকিবার হেতু এই হইতে পারে যে দেবপাল ও ত্রিভুবন পালকে লইয়া ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ হয় ত মহা গোলে পড়িয়া ছিলেন। হইতে পারে মন্ত্রী দর্ভপানী ও সেনাপতি জয় পালের সাহায্যে দেবপাল যখন গৌড়েশ্বর হন তখন লাউসেনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে লাউসেনের কীর্ত্তি কলাপ বর্ণন করিতে গিয়া তাহার প্রভুকে গৌড়েশ্বর বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গলকারগণ সকল গোলের হাত এড়াইয়াছেন। ত্রিভুবন পাল ও দেব পালের রাজ্যগ্রহণের জন্য পরস্পর বিবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। ঐরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মাণিক গাঙ্গুলী লিখিয়াছেন—

'ধর্ম্মপাল রাজা ম'লো অরাজক দেশ।'

এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা অনুমান করিয়াছি যে খৃঃ ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে লাউসেন বর্ত্তমান ছিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের বীরত্বকাহিনী যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তিনি দেবপাল বা ১ম মহীপালের সমসাময়িক হইলে অবশ্যই কোনও না কোন তাম্রশাসন বা শীলালিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যাইত।

অনেকে লাউসেনকে ১ম মহীপালের সমসাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সম্বন্ধে আমাদের অনেক বিষয় বলিবার আছে। মোটামুটী একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। ধর্ম্মমঙ্গল পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে ইছাই ঘোষ একজন প্রবল পরাক্রান্ত বীর নৃপতি ছিলেন। তাঁহার স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী ছিল। দুর্ভেদ্য দুর্গ, অপরিমেয় সৈন্যবল ও তৎকালোপযোগী যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতিরও তাঁহার অভাব ছিল না। ধর্ম্মমঙ্গলে বর্ণিত আছে যে,—"গৌড়েশ্বর মন্ত্রী মহামদার অত্যাচারে উৎপীড়িত সোম ঘোষ গৌড়েশ্বরের শুভ দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া বিপন্মুক্ত হয়েন। এবং বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে আদেশ করেন :—

"বারভূঞা মাঝে যার কথা নাহি নড়ে।
হেন কর্ণসেন রায় ত্রিষঙ্গির গড়ে।
সে মোর পরম বন্ধু বাহে বীরপনা।
তাহার উপরে তুমি হ'য়ে যাও সানা।
মাসে মাসে বেবাক পাঠাবে ইরসাল।
কর্ণসেন উপরে বাড়াবে ঠাকুরাল।
* * * *
নাগরা নিসান দিল লিখি পরোয়ানা।
বিদায় হইল গোপ করিয়া বন্দনা।
কোলে পুত্র কেবল ইছাই কুলচাঁদ।"

ইছাই ত্রিষঙ্গীর গড়ে আসিয়া এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গড়ের বাহিরে রাজধানীর উপকণ্ঠে এক সুবৃহৎ দেউল নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে ৺শ্যামারূপা মায়ের সুবর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। দেউল সান্নিধ্যে এক নগর পত্তন করিয়া আপনিও তথায় বাস করেন। অতঃপর কিয়দ্দিন গতে 'খয়ড়া' 'লোয়াড়' প্রভৃতি ইতর জাতি সমবায়ে গঠিত আপনার সৈন্যদল সমভিব্যাহারে বিদ্রোহাচরণপূর্ব্বক গড় হইতে কর্ণসেনকে দূরীভূত করিয়া দেন। ত্রিষঙ্গীগড়ের নাম চেকুর রাখিয়া আপনি তাহার অধীশ্বর হন এবং স্বাধীনতাব্যঞ্জক রাজকীয় চিহ্ন ধবলছত্রাদি ব্যবহার করিতে থাকেন। কর্ণসেন গৌড়েশ্বরের শরণাপন্ন হইলে তিনি দূত পাঠাইয়া অকৃতকার্য্য হওয়ার পর কর্ণসেনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য প্রেরণ

গৃহস্থ

শ্যামারূপার গড়ের
অতি দুর্গম প্রদেশস্থ অপর একটী মন্দির।

শ্যামারূপার গড়ের
দুর্গম প্রদেশস্থ একটী ভগ্ন মন্দির।

INDIA PRESS, Calcutta.

করেন। অতঃপর গৌড়েশ্বর শ্রীলিকা রঞ্জাবতীর সহ কর্ণসেনের বিবাহ এবং লাউসেনের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক ইছাই বধ প্রভৃতি। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে ইছাই উৎকট শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেবল বুদ্ধি ও বাহুবলে আপন অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এহেন ইছাই ঘোষ প্রথম মহীপালের সময় বর্ত্তমান থাকিলে রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরিলিপিতে তাঁহার নাম যে নিশ্চিতই স্থান পাইত একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায়; যে হেতু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাজেন্দ্র চোল তৎসাময়িক বঙ্গের প্রায় সমস্ত নৃপতিগণকেই পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সকলের বিষয়ই তিরুমলয় গিরিলিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরিলিপিতে লিখিত আছে :—

"পরকেশরী বর্ম্মা শ্রীরাজেন্দ্র চোল দেবের ত্রয়োদশ বৎসরে যিনি বিপুল রণকুশল সৈন্যদ্বারা অধিকার করিয়া ছিলেন—প্রবল যুদ্ধে দুর্গম গুড্ড বিষয়, মনোরম কোশল প্রদেশ যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়া ছিলেন। মধুবারবৃন্দপূর্ণ উদ্যানবিশিষ্ট তদ্দণ্ডভুক্তি ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্র সুপ্রসিদ্ধ তক্কন, লাঢ়ম। প্রবল বেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালদেশ যেখানে বড়বৃষ্টির বিরাম নাই। গজপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিয়া গোবিন্দচন্দ্র যথা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। কর্ণভূষণ পাদুকা ও বলয় ভূষিত মহীপালকে অগ্রিমরণক্ষেত্র হইতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিয়া যিনি অনন্তর বলশালী গজসমূহ এবং রমণীরত্নসমূহ করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই মুক্তাগর্ভ সাগরের ন্যায় রত্নসমৃদ্ধ উত্তির লাঢ়ম ও গঙ্গা যাহার জলরাশি বালুকাগর্ভ—তীর্থসমূহ চুম্বন করিতেছে।"

দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, তদ্দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল এবং বঙ্গে গোবিন্দ চন্দ্র ইহারা সকলেই রাজেন্দ্র চোল দেবের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। শ্যামারূপার গড়ে সে সময় ইছাই ঘোষ বর্ত্তমান থাকিলে দক্ষিণ রাঢ়—অপর মন্দার বা গড়মন্দারণে রণশূরকে পরাজিত করিয়া উত্তর রাঢ়ে গমন করা রাজেন্দ্র চোলের পক্ষে নিরাপদ হইত না। দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোলও ইছাইকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না। এবং গৌড়েশ্বরের সেনা পরাভবকারী স্বাধীনতা প্রয়াসী ইছাইও রাজেন্দ্র চোলের আস্ফালন নীরবে সহ্য করিতেন না। রণশূরের সহিতও মহীপালের সদ্ভাব ছিল না বরং বৈরীভাবই ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে ইছাই বর্ত্তমান থাকিলে প্রতিবেশী গড়মন্দারণ অধিপতি রণশূরের সহিত তাঁহার সখ্যতা একরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে বা অন্যত্র তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তজ্জন্য আমরা ধর্ম্মমঙ্গলের মতই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

ইছাইয়ের মেউল বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু বিগ্রহ নাই। (৩)

---

(৩) অজয়ের দক্ষিণ তটে ইছাইএর মেউল এবং উত্তর তটে তাহারই ঠিক সমসূত্রপাতে লাউসেন তলাও। ইছাইএর সহিত যুদ্ধে আসিয়া লাউসেন এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন। লাউসেনকুণ্ড নামক একটী কূপ ও হাটুপাড়ি নামক, ২টী পুকুরের বিলুপ্তাবশেষ লাউসেন তলাউয়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া এতদঞ্চলের ডোমজাতি প্রতিবৎসর ১০ই বৈশাখ এই স্থানে লাউসেনের সেনাপতি

"চৌদিকে পাহাড় পুরী রক্ষিবার
দুর্গম গহন কাটি।
করিয়া চত্বর বসাল নগর
রাজার বসত বাটী।"

সে সকলের আর কিছুই নাই। শুধুই কতকগুলা কঙ্কাল স্তূপ! অতীতের গৌরব সমাধি একটা শুষ্ক হাহাকার বক্ষে চাপিয়া পড়িয়া আছে। কোটাল পুকুর, চৌকিগড়া, লোহাটার পুরী ও গড় গোপালপুর প্রভৃতি সেনানিবাস এখন নামেমাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে। খয়রা পাড়া, চোয়াড়ি, কোদা প্রভৃতির নাম এখনও লোকে বিস্মৃত হয় নাই। পূর্ব্বে কোটাল পুকুর, দক্ষিণে চৌকি গড়া ও লোহাটার পুরী এবং পশ্চিমে খয়রা-পাড়া ও গড় গোপালপুরের সেনানিবাস, গড়ের সীমান্ত রক্ষা করিত। লোহাটার পুরি বা লোহাগুঁড়ি গ্রামের সরকার উপাধি-ধারী কায়স্থগণ বলেন যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ সরকার 'মহামদার' অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া গৌড়নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে পলাইয়া আসেন। ইছাই তাহাকে আদর করিয়া লোহাটার পুরীতে বাসস্থান প্রদান করেন। তদবধি প্রায় ২৫ পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা লোহাটার পুরীতেই বাস করিতেছেন।

গড়ের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্বদিক ভয়ানক উচ্চ। দক্ষিণদিকের সমতল ভূমি লোহাটার পুরী পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ দিকেই গড়ের সিংহদ্বার ছিল। ইছাইয়ের সেনাপতি লোহটার থানাও দক্ষিণদিকে সংস্থাপিত হইয়াছিল। গড়ের উত্তরে রক্ত-নালা নামক পরিখা ও দুইটি মুকচার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই রক্তনালা শ্যামা-রূপার গড়ের নীচে ঠাকুরাণী পুষ্করিণী নামক সুবৃহৎ বিল হইতে নির্গত হইয়া দৈর্ঘ্যে কোটাল পুকুর পার হইয়া গিয়াছে। গড়ের মধ্যে এক সুবৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে, স্থানটি ষষ্টিতলা নামে বিখ্যাত। ত্রিষষ্টি গড় নামের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানিবার উপায় নাই। তবে কর্ণসেনকে ঢেকা মারিয়া দূর করিয়া দেওয়ায় যে গড়ের ঢেকুর নাম হইয়াছিল এ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

ধর্ম্মমঙ্গল হইতে জগদ্ধার রাজা জয়াদশেখর ও কামদল ব্যাঘ্রের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে শার্দ্দূল শর্ম্মা নামক এক রাজা ছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে। জয়াদ শেখরের সহিত শেখর ভূমের এবং কামদলের সহিত শার্দ্দূল শর্ম্মার কোন সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে।

ধর্ম্মমঙ্গল হইতে কাঙ্গুরের রাজা কর্পূর খবলের পরিচয় পাই। প্রতিহার রাজ নাগ-ভটের বাহুকখবল নামক মহাসামন্তের হস্তে ধর্ম্মপাল বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন। ৪৭৪ বলভী সংবতে খৃষ্টীয় ৮৯০ অব্দে উৎকীর্ণ মহাসামন্ত অবনীবর্ম্মার তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

তাহাদের বলাতি কানুবীরের পূজা করিয়া থাকে। জানিনা ১০ই বৈশাখের সহিত কানুবীরের কি সম্বন্ধ প্রচলিত আছে। লাউসেন তলাওয়ের অদূরে 'অজয়ের দক্ষিণতটে কাঞ্চনে ডাঙ্গা' নামক স্থান ইছাই ও লাউসেনের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। রামনী অজয়সঙ্গমে বিলীন হইলেও এখনও লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে পারে নাই। স্থানীয় কৃষকগণ পর্য্যন্ত সেই স্থান দেখাইয়া থাকে এবং সজল নয়নে আবৃত্তি করে।

শনিবার সপ্তমী সম্মুখে বারবেলা।
আজ রণে যেওনারে ইছাই গোয়ালা।

প্রবাদ শ্যামারূপা দেবী কর্ত্তৃক ইছাইয়ের উপর ঐরূপ দৈববাণী হইয়াছিল।

শ্যামারূপার গড়ে
একটী অতি প্রাচীন তেঁতুল গাছ।

লাউসেন তলাও
লাউসেন ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া
এই স্থানে প্রথম শিবির-সন্নিবেশ করেন।

"অজনি ততোপি শ্রীমান বাহুক ধবলো
মহাদ্ভবো যঃ।
ধর্ম্ম ভবন্নপি নিত্যং রনোদ্ভতো নিনশাদ ধর্ম্মং॥"

অর্থাৎ—"অতঃপর শ্রীমান বাহুকধবল জন্মগ্রহণ করেন। যিনি নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও রনোদ্ভত ধর্ম্ম (পালকে) নিপাত করিয়াছিলেন। এই বাহুক ধবল ও কর্পূর ধবল পরস্পর কোন সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন কি না তাহাও জানা যায় না। এইরূপ আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে, ধর্ম্মমঙ্গল কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া না দিয়া শ্যামারূপার গড় বা তন্নিকট-বর্ত্তী স্থান অনুসন্ধান করিলে তদ্দ্বারা পাল রাজত্বেতিহাসের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা উৎসাহশীল ঐতিহাসিক বৃন্দের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

বর্দ্ধমান জেলার মেলার বিবরণ

অগ্রদ্বীপের মেলা

এই প্রবন্ধে বর্দ্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ, ক্ষীরগ্রাম, জামালপুর, বরিশীতলা, শ্রীখণ্ড, উদ্ধারণপুর প্রভৃতি স্থানের মেলার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে; গৃহস্থের পাঠক পাঠিকাগণকে সেগুলি ক্রমশঃ উপহার দিতে বাসনা রহিল।

অগ্রদ্বীপ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া উপবিভাগের অন্তর্গত একখানি অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও পবিত্র তীর্থস্থান। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বারুণীর দিন অগ্রদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিলে বহুশত সূর্য্য-গ্রহণকালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফলসম ফল লাভ হয়। "অগ্রদ্বীপে মহাতীর্থঃ কাশীসমো বিরাজতে।" কথিত আছে এই মহাতীর্থে তাল বেতালসিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রত্যেক বৎসর বারুণীর দিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। সেই অতি প্রাচীন কাল হইতেই বারুণীর দিন তথায় একটি মেলা বসিত—কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

হুলো পঞ্চাননের "গোষ্ঠীকথা" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভুবনগরাধিপতি মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাগত মহর্ষি ছান্ডড়কে হরিকোটি, ভট্টনারায়ণকে পক্ষকোটি, দক্ষকে কামকোটি, শ্রীহর্ষকে কঙ্কগ্রাম ও বেদগর্ভকে বটগ্রাম বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বেদ ও ব্রাহ্মণ্য প্রচার জন্য যথাক্রমে ত্রিবেণী, কালীঘাট, জাহ্নবীনগর, ভর্ত্তীপুর (ছাপাঘাটীর মোহানা), অগ্রদ্বীপ ও গুপ্তপল্লী দান করেন। যথা :—

"বিদ্যা ব্রাহ্মণ্য প্রচার জন্য গঙ্গাবাসে।
রাজা দেন পাঁচ স্থান দ্বিজ অভিলাষে॥"

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মহারাজ আদিশূরের সময়ে অগ্রদ্বীপ মহর্ষী শ্রীহর্ষের গঙ্গাবাসের স্থান ছিল। যথা:—

"কঙ্কগ্রাম বাণকুণ্ডা গঙ্গা হতে দূর।
গঙ্গাবাসে অগ্রদ্বীপ নিকট গাঙ্গনীর॥"

(হুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা)

গৌড় কুলীন সম্বন্ধে এন্ড্রু মিশ্র যে-সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা জানা যায় যে, মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় অগ্রদ্বীপ নবদ্বীপরাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং কণ্টক নগর (কাটোয়া) অগ্রদ্বীপের মধ্যাংশ ছিল। যথা :—

"অগ্রদ্বীপস্য মধ্যাংশঃ কণ্টক ইতি কথ্যতে।
পূর্ব্বে গঙ্গাজয়োদক্ষে মযূর নয়নোত্তরে॥"
(এড়ু মিশ্র)

অন্যত্র—

* * *

"অগ্রদ্বীপ মহাতীর্থঃ কাশীসমোবিরাজতে।
উত্তরস্যাংস্থিতা পদ্মা ভাগীরথী প্রসূতিকা॥
দক্ষিণে ব্রাহ্মণীযুক্তা অম্বিকা-মঙ্গলান্বিতা।
এতৈর্দ্বীপৈঃ সমাযুক্তো নবদ্বীপ ইতীরিত॥"
(এড়ু মিশ্র)

উপরোক্ত কারিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, সেন রাজাদের রাজত্বকালে অগ্রদ্বীপ বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লী ছিল না; উত্তরে পদ্মাতীর অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ প্রদেশ এবং দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা নদী ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থান অম্বিকা-কালনা ইহার সীমা ছিল এবং কাটোয়া অগ্রদ্বীপের মধ্যাংশ ছিল।

কথিত আছে যে, যখন ত্রয়োদশ কষ্ট-শ্রোত্রিয় অর্থাৎ সৌণকুলীন মর্য্যাদা লাভ করিবার জন্য দনুজ মাধব সেনের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া ছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানাদি গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে আনাইয়া গঙ্গাতীরস্থিত অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন।

যদিও অগ্রদ্বীপ অতি প্রাচীন কাল হইতেই পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল, তথাপি ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভ্যুদয়ের পর হইতেই ইহার গৌরব শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অগ্রদ্বীপ বারাণসীর ন্যায় মহাতীর্থ ছিল, মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ে অগ্রদ্বীপ বৃন্দাবনে পরিণত হইয়াছে। কাশী মুক্তির ক্ষেত্র, বৃন্দাবন ভক্তির ক্ষেত্র। মুক্তি ভক্তির দাসী সুতরাং কাশী অপেক্ষা বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ।

তাই ভক্ত গাহিয়াছেন—

"একেত জাহ্নবী আছেন পতিতপাবনী,
আর তাহে অবতীর্ণ হৈলা চক্রপাণি॥"

এই স্থানে ভক্ত ও ভগবানে বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—ভক্ত পিতা, ভগবান পুত্র; এখানে ভক্ত বড়, ভগবান ছোট। এখানে ভগবান ভক্তের ভক্ত—ভক্তের দ্বারে সদা বাঁধা।

অগ্রদ্বীপ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমভক্ত সঙ্গীতরসজ্ঞ গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের শ্রীপাট। গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাবের পর হইতে এই স্থানে ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে চৈত্র কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে একটি মহামহোৎসব হইয়া আসিতেছে। মহোৎসবের সময় অগ্রদ্বীপে বহু বৈষ্ণবের সমাগম হয়; এই উপলক্ষে তথায় একটি মেলাও বসিয়া থাকে। প্রথমে সংক্ষেপে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের একটু পরিচয় দিয়া মেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

মুর্শিদাবাদ জেলার রসোড়া-গ্রামে আনুমানিক পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে চক্রপাণি ঘোষ নামক একজন উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্রের নাম গোপাল ঘোষ। চক্রপাণি শাক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র গোপাল বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। কৌলাচারী পিতার সহিত বৈষ্ণবাচারী পুত্রের মতানৈক্য হওয়ায় পুত্র পিতার সংসর্গ-পরিত্যাগপূর্ব্বক বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার চারি ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত কুলাই গ্রামে বাস স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গোপালের বল্লভ নামে এক পুত্র ছিলেন। বল্লভ তিনবার বিবাহ করেন এবং তাহার ফল স্বরূপ নয়টি পুত্ররত্ন লাভ করেন। পুত্রগণের নাম ১। বাসু, ২। গোবিন্দ, ৩। মাধব, ৪। কংসারি, ৫। দনুজারি,

মীনকেতন, ৭। জগন্নাথ, ৮। দামোদর, মুকুন্দ।

বাসু, গোবিন্দ ও মাধব কুমার-বৈরাগ্য-বলম্বী ছিলেন। কংসারি, হলুহারি, মীনকেতন, জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ, দামোদর ও মুকুন্দের সন্তানাদি হয় নাই। কংসারি, হলুহারি ও মীনকেতনের বংশ ছিল; কিন্তু এক্ষণে হলুহারির বংশের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না—বোধ হয় তাঁহার বংশ লোপ পাইয়াছে। কংসারি ও মীনকেতনের বংশধারা অক্ষুণ্ণ আছে। দিনাজপুরের মহারাজ ও রায় সাহেব প্রভৃতি বিত্তশালী বৈষ্ণবগণ এই পবিত্র বংশ-সম্ভূত। বর্দ্ধমান জেলার কুলাই গ্রামেও এই পবিত্র বংশের ধারা এখন বর্ত্তমান আছে।

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বঙ্গবাসী আপিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে "বাসু, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষের জন্মস্থান শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রাম।" বিশ্বকোষকার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "কেহ কেহ বলেন অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশী-পুর বিষ্ণুতলায় ঘোষ ঠাকুরের বাস ছিল। কাহার কাহারও মতে বৈষ্ণব তলায় তাঁহার জন্মস্থান। এখনও তথায় উপাধিধারী যে কয়েক ঘর কায়স্থের বাস আছে, ঘোষ ঠাকুর সেই কুলে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ঘোষ ঠাকুর উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর সন্তানাদি না থাকায়, তিনি জীবনে উদাস হইয়া গঙ্গাতীরে অগ্রদ্বীপ আসিয়া বাস করেন।"

"ক্ষিতীশ বংশাবলী" * গ্রন্থে গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরকে সদ্গোপবংশজাত বলা হইয়াছে। স্বর্গীয় পিতৃদেব অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তি রত্নন মহাশয় সংগৃহীত "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশিত অভিরাম দাসের "পাট পর্য্যটন" নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে অগ্রদ্বীপ ঘোষঠাকুরের জন্মভূমি বলা হইয়াছে। ৺জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় "শ্রীগৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থে, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়" এবং শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয় "বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ সেবা প্রতিষ্ঠার পর গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর মহাপ্রভুর আদেশে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দের একটি পুত্রসন্তানও হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানটি শৈশবেই পরলোক গমন করেন।

কিন্তু বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল উক্তির কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না—সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ঐ সকল উক্তির মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই—ঐ সমস্ত উক্তি সম্পূর্ণ কিংবদন্তীমূলক।

সে যাহাইহোক্ এক্ষণে আমি পুনর্ব্বার ঘোষ ঠাকুরের জীবনকথা আলোচনায় অগ্রসর হইলাম।

কথিত আছে যে, একসময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব তীর্থ ভ্রমণাভিলাষে বহির্গত হইয়া কুলাইগ্রামের প্রান্তস্থিত একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেইজন্য সেই স্থান "বিশ্রামতলা" নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বিশ্রামতলায় মহাপ্রভুর সহিত বাসু, গোবিন্দ ও মাধব ঘোষঠাকুরের

* ক্ষিতীশ বংশাবলী গ্রন্থ আমি স্বয়ং দেখি নাই, জনৈক শিক্ষিত বৈষ্ণব এই কথা আমাকে বলিয়াছেন।

মিলন হয় এবং তাঁহারা গৃহত্যাগী হইয়া মহাপ্রভুর সহিত গমন করেন।

ইঁহারা তিন ভাই সঙ্গীতরসজ্ঞ পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহাদের তিন ভাইএর তিনটি সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় ছিল। মহাপ্রভু ইঁহাদের কীর্ত্তন শ্রবণে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইতেন। যথা :—

"গোবিন্দ মাধব আর বাসুঘোষ।
তিন ভাইয়ের কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ॥"
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।)

কথিত আছে কোন সময়ে মহাপ্রভু গোবিন্দ ঘোষঠাকুরের সহিত অগ্রদ্বীপ গমন করেন এবং আহারান্তে মুখশুদ্ধির জন্য হরীতকী চাহেন। গোবিন্দ নিজ বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটি হরীতকী বাহির করিয়া মহাপ্রভুকে প্রদান করেন। তখন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কহিলেন "গোবিন্দ! তোমার এখনও সঞ্চয় বুদ্ধি যায় নাই, সুতরাং সংসার বাসনারও তৃপ্তি হয় নাই। অতএব তুমি, আজ হইতে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর এবং এই স্থানে থাকিয়া ৺গোপীনাথের সেবা প্রকাশ কর।" মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে গোবিন্দ অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তদ্দৃষ্টে ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব গোবিন্দকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন—

"গোবিন্দ! বিষাদ পরিত্যাগ কর, যে দিন তোমার জীবনে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটিবে, সেইদিন- পুনর্ব্বার আমার দেখা পাইবে। যদি কোন অলৌকিক দ্রব্য পাও, যত্নে রাখিও, তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন গঙ্গাস্নানের সময় গোবিন্দ ঘোষঠাকুর গঙ্গাজলে ভাসমান একখানি কৃষ্ণশিলা প্রাপ্ত হন। গোবিন্দ বুঝিলেন ইহাই প্রভুনির্দ্দিষ্ট অলৌকিক বস্তু, কারণ শিলা স্বভাবতঃ জলে ডুবে না ডুবিয়া যায়, কিন্তু এই শিলাখণ্ড যখন জলে ভাসিতেছে তখন ইহা নিশ্চয়ই এক অলৌকিক বস্তু তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখন গোবিন্দ পরম যত্নে সেই কৃষ্ণশিলা মস্তকে করিয়া তুলিয়া আনিলেন। ভগবানের কি অলৌকিক লীলা! ঠিক্ সেই দিনই বহু ভক্তসহ মহাপ্রভু অগ্রদ্বীপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই কৃষ্ণশিলা হইতে সুন্দর গোবিন্দবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। তৎপরে গোবিন্দকে কহিলেন "গোবিন্দ! এই গোপীনাথ বিগ্রহকে তুমি বাৎসল্যভাবে উপাসনা কর, তোমার পরলোক প্রাপ্তির পর এই গোপীনাথ বিগ্রহই তোমার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।" তদনুসারে গোবিন্দের পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্ষে বর্ষে গোপীনাথ বিগ্রহ গলায় কাছা ও হস্তে কুশ দিয়া ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।

কথিত আছে যে, ঘোষঠাকুরের পরলোক গমনের পর—৺ গোপীনাথ বিগ্রহের কমললোচন হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি কোন কোন ভাগ্যবান ভক্ত আজও ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীশ্রীগোপীনাথ বিগ্রহের নয়নযুগলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা দেখিতে পান। অনেকে বোধ হয় এই ঘটনা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই যে, এই ঘটনা অস্বাভাবিক নহে ইহা অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব। আমরা প্রাকৃত চক্ষে যাহা দেখিতে পাই না ভক্তগণ তাঁহাদের দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পান। এই সেদিন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সংকীর্ত্তনে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া

যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ন্যায় মহাত্মার কথা বোধ হয় কেহই অবিশ্বাস করেন না।

ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অগ্রদ্বীপে একদিন চিড়া ও একদিন অন্নমহোৎসব হইয়া থাকে এবং একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা পক্ষদশ দিন থাকে। মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ৺গোপীনাথ দর্শন ও বারুণীতে গঙ্গাস্নান জন্য বহু দূরদেশ হইতে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণব এখানে আগমন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে একদিন চিড়া ও একদিন অন্ন মহোৎসব হইয়া থাকে।

নদীয়া জেলার হরো লক্ষ্মীগাছা গ্রামের গোপজাতীয় ৺চরণদাস পাল বিরাট মহোৎসব দিতেন, তৎপুত্র পরলোকগত কুবেরদাস বাউল ও (ইনি বাউল সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গুরু ছিলেন) মহাসমারোহে মহোৎসব প্রদান করিতেন। এক্ষণে তাঁহারই বংশধরগণ মহোৎসব দিয়া থাকেন, এই মহোৎসবে দুই দিনে প্রায় বিশহাজার বৈষ্ণব, বাউল ও দরবেশ প্রভৃতি ভোজন করিয়া থাকেন।

নদীয়া জেলার সোণাডাঙ্গা নিবাসী রাজপুত জাতীয় জমীদারবাবুগণ, বর্দ্ধমান জেলার কালিকাপুরের গঙ্গাবংশীয় গোস্বামী মহাশয়গণ, কবিরাজ গোস্বামীর জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুরের সদ্গোপজাতীয় বিশ্বমণ্ডল এবং অন্যান্য অনেক স্থানের অনেক মহাত্মা ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক মহোৎসব দিয়া থাকেন; তাহাতেও বহুসহস্র লোক ভোজন করিয়া থাকেন।

কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু মনোহারী, কাঁসা পিতলের বাসন, পোষাক, জুতা, হুঁকা, মিষ্টান্ন প্রভৃতির দোকান এবং সার্কাস্, ম্যাজিক, নাগরদোলা প্রভৃতি খেলা আসিয়া থাকে। সকল প্রকার দ্রব্যেরই বেশ খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। স্বদেশীশিল্পের দোকান এখানে বড় আসে না, স্বদেশ-হিতৈষীগণের এদিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। স্বদেশজাত দ্রব্যের মধ্যে তালপাতার পাখা, বেত্রনির্ম্মিত ধামা, নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের মাটীর পুতুল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের আমদানী হয় তাহা বেশ বিক্রয় হয়।

এই মেলায় যে দুই একটি কু-প্রথা দেখা যায় তাহার সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা আবশ্যক বিবেচনায় বলিতেছি।

১। বহু নীচজাতীয়া বেশ্যা নবদ্বীপ শান্তিপুর, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলার সময় আসিয়া মেলা স্থলের আশে পাশে আড্ডা গাড়িয়া তাহাদের স্বভাবসুলভ হাবভাবভঙ্গী দ্বারা বহু অর্ব্বাচীন যুবকের পরকাল টন্‌টনে করিয়া থাকে।

২। মেলাস্থলে মদ্যের খরিদ বিক্রয়ও হইয়া থাকে এবং অনেক নির্লজ্জ যুবক সুধাপানে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া টলিত পদে এদিক ওদিক ভ্রমণ করিয়া মাতলামীর চূড়ান্ত করিয়া থাকে।

৩। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ "বৈষ্ণব হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
তার মুখ কভু আমি না দেখি সনাতন।"
কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত ঘোষঠাকুরের শ্রাদ্ধবাসরে পুণ্যতীর্থ অগ্রদ্বীপে ভেকধারী অনেক বৈষ্ণব "পাচসিকা দিয়া বৈষ্ণবী গ্রহণ করিয়া থাকেন।"

৪। অনেকে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের লালসায় জুয়াখেলার আড্ডা পাতিয়া সরলপ্রকৃতি গ্রাম্য-যুবকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে।

এইরূপ বিষয়গুলির প্রতি শিক্ষিত লোকের ও রাজপুরুষগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অগ্রদ্বীপ এক্ষণে কৃষ্ণনগরের মহারাজের জমীদারীভুক্ত; মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ও ইহা তাঁহারই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যথা :—

"রাজ্যের উত্তরসীমা মুরসিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ।"

(অন্নদামঙ্গল)

কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বে অগ্রদ্বীপ * পাটুলীর রাজাদের জমীদারী ছিল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন অগ্রদ্বীপের জমীদার সেই সময় কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহকে কলিকাতা লইয়া গিয়াছিলেন। যথা :—

বিজয়রামের তীর্থমঙ্গলে †

"রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়া যাত্রী মাথে মারে হাত।"

তৎপরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পুনর্ব্বার কোনরূপে গোপীনাথকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে গোপীনাথের সেবার যেরূপ ব্যবস্থা ছিল এক্ষণে আর সেরূপ বন্দোবস্ত নাই; সেই জন্য দিনাজপুরের মহারাজ, রায় সাহেব প্রভৃতি ঘোষঠাকুরের ভ্রাতৃবংশীয় বিত্তশালী মহাত্মাগণ কৃষ্ণনগরের মহারাজের নিকট হইতে উক্ত সেবার ভার লইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই চেষ্টা ফলবতী হইলে বৈষ্ণব জগতের বড়ই উপকার হইবে।

অগ্রদ্বীপে বর্দ্ধমান, নাটোর প্রভৃতি স্থানের মহারাজগণেরও দেব-সেবার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান সময়ে অগ্রদ্বীপের শ্রীযুক্ত মধুসূদন মল্লিক মহাশয় একজন শিক্ষিত ও দানশীল জমীদার। তিনি সম্প্রতি অগ্রদ্বীপে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য চল্লিশ হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ভগবান মধুবাবুকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন।

শ্রীভোলানাথ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিনোদ।

চিকিৎসা ও জ্যোতিষ

(১)

প্রাচীনকালে, কি ভারতে, কি মিশরে, কি ব্যাবিলনে, কি গ্রীসে, কি রোমে সকল সুসভ্য দেশেই চিকিৎসার সহিত জ্যোতিষের সম্বন্ধ স্বীকৃত হইত। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে Paracelsus, Hahnemann, Sydenham প্রভৃতি চিকিৎসক চূড়ামণি, যাঁহারা চিকিৎসাজগতে যুগপ্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই, চিকিৎসকের পক্ষে, জ্যোতিষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মদাতা মহাত্মা Hippocrates এবং Galen উভয়েই সুনিপুণ জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন। Hippocrates বলিতেন, যে চিকিৎসক, জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তিনি মূর্খ, কদাচ চিকিৎসক পদবাচ্য নন। আমাদের ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদ

---

* পাটুলী রাজবংশ এক্ষণে হুগলী জেলায় সেওড়াফুলিতে বাস করিতেছেন।

† প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "বর্দ্ধমানের ইতি কথা" গ্রন্থ হইতে এই দুই লাইন উদ্ধৃত।

ও জ্যোতির্ব্বেদ নিত্য সম্বন্ধযুক্ত, একের অনুশীলন অন্যের অনুশীলন অপেক্ষা করে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগতে যখন যে বাদের অভ্যুদয় হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রেও তখন সেই বাদের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শাস্ত্রে যে কত মতের উত্থান ও পতন হইয়াছে এবং সেই জন্য সেই মতানুযায়ী চিকিৎসাপ্রণালীরও যে কত উত্থান ও পতন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন যে চিকিৎসাপ্রণালী, প্রচলিত মতের অনুযায়ী হইয়াছে, তখন সেই চিকিৎসাপ্রণালীই আদৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার বোধ হয় কোন প্রয়োজন হইবে না। জড়বাদের পূর্ব্বে ফলিত-জ্যোতিষের আদর সর্ব্বত্রই ছিল। জড়বাদের অভ্যুদয়ের পর, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের আলোচনা যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ফলিত-জ্যোতিষের আলোচনা সেইরূপ হ্রাস পাইতে লাগিল। আমাদের দেশে এক্ষণে উভয় জ্যোতিষেরই দুরবস্থা, না আছে উন্নত প্রণালীতে সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের আলোচনা, না আছে উন্নত প্রণালীতে ফলিত-জ্যোতিষের আলোচনা। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে ফলিত-জ্যোতিষের উন্নতি, সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের উন্নতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যাহাতে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের উন্নতি হইয়া, ফলিত-জ্যোতিষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হয় সে বিষয়ে আমাদের সকলেরই যত্নশীল হওয়া উচিত। এক্ষণে আমি ফলিত-চিকিৎসাশাস্ত্রের সহিত ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্রের কি সম্বন্ধ এবং ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা ফলিত-চিকিৎসাশাস্ত্রের কি উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা উঠিলে, চিকিৎসকের কথা স্বতঃই মনে হয়। চিকিৎসকের, চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক নিম্নলিখিত বিষয় তিনটীতে জ্ঞান থাকা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন এই তিনটী জ্ঞানের উপর তাঁহার চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে। কোন একটী বিষয়ের জ্ঞানের তারতম্য হইলে, চিকিৎসারও তারতম্য হয়। সেই তিনটী এই :—

১। রোগ ও রোগী বিষয়ে জ্ঞান।

২। ঔষধ বিষয়ে জ্ঞান।

৩। রোগ ও ঔষধের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান।

চিকিৎসাশাস্ত্রের এই তিনটী মূল বিষয়। সকল চিকিৎসাশাস্ত্রে, ইহাদের আলোচনা অল্পবিস্তর দেখা যায়।

১। রোগ কি ?

স্বাস্থ্যের বিকারের নাম রোগ, ইহা কেবল বাহ্যিক ও আন্তরিক লক্ষণের দ্বারা জানা যায়। স্বাস্থ্য কি এবং স্বাস্থ্যের বিকারই বা কি, এই বিষয়ে বহুতর মত আছে। জড়-বাদীরা বলেন বাহিরের কোন পদার্থের উত্তেজনায়—দেহের অঙ্গ বিশেষের বিকার হয়, এবং সেই স্থানীয় বিকার হইতে রোগের উৎপত্তি হয়। অধ্যাত্মবাদীরা বলেন যে মনের বিকার হইতেই কেবল রোগের উৎপত্তি হয়। মনের বাহিরে যখন জগতেরই অস্তিত্ব নাই, তখন মনের বাহিরে কোন রোগবীজেরও অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যাহা আছে তাহা মনেই আছে। মনই সঙ্কল্প দ্বারা রোগ সৃষ্টি করে, এবং মনই সঙ্কল্প দ্বারা রোগ নাশ করিয়া থাকে। আর একদল আছেন ইহারা শক্তিবাদী, ইহারা বলেন জীবনীশক্তিই সকলের মূল পদার্থ।

ইহার স্বাভাবিক অবস্থার নাম স্বাস্থ্য এবং ইহার বিকৃতির নাম রোগ। এই বিকৃতি নানা কারণে সংঘটিত হইতে পারে। কোথাও আধিভৌতিক কারণে, কোথাও আধিদৈবিক কারণে, কোথাও আধ্যাত্মিক কারণে এই বিকৃতি সংঘটিত হয় প্রত্যেক প্রাণীর জীবনীশক্তি পরস্পর হইতে ভিন্ন বলিয়া, একজাতীয় কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যও, পরস্পর ভিন্ন হইতে দেখা যায়। কেন যে প্রত্যেক প্রাণীর জীবনীশক্তি পরস্পর হইতে ভিন্ন সে সম্বন্ধে সকল চিকিৎসাশাস্ত্রই নিরুত্তর। জীবনীশক্তি যে সকলের এক নহে, তাহা সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা, সহজেই বুঝান যাইতে পারে। মনে করুন, সাতটি বন্ধু কোন একদিন শীতকালে, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, বাটীর বাহির হইলেন। বাটী ফিরিবার সময় ইঁহাদের ভিতর একটি দাঁতের অসুখ (দাঁত কন্‌কনানি) লইয়া বাটী ফিরিলেন; একটি কানের অসুখ (কানকট্‌কটানী) লইয়া বাটী ফিরিলেন; একটি রক্তামাশয় লইয়া ফিরিলেন, একটি ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ লইয়া ফিরিলেন, এবং বাকী তিনটী একেবারে সুস্থ শরীরে ফিরিলেন। এরূপ বিভিন্ন ফলের কারণ কি? জীবনীশক্তি বিভিন্ন বলিয়া, কারণ এক হইলেও কার্য্য বিভিন্ন হইল।

২। ঔষধ কাহাকে বলে?

যে পদার্থ সুস্থ শরীরকে অসুস্থ করিতে পারে, অন্যদিকে আবার অসুস্থ শরীরকেও সুস্থ করিতে পারে, তাহাকেই ঔষধ বলা যায়। কি প্রাণীজগৎ, কি উদ্ভিদ জগৎ, কি জড় জগৎ সকল জগতের ভিতরই এরূপ পদার্থ পাওয়া যায়। সকল চিকিৎসাশাস্ত্রে গুণ ও ক্রিয়া-অনুসারে, ঔষধ সকলকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। কি কি প্রণালীতে ঔষধের গুণ ও ক্রিয়া নির্ণীত হয়, তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। জীব জন্তুর উপর পরীক্ষা দ্বারা

২। সুস্থ মানবের উপর পরীক্ষা দ্বারা

৩। ঔষধের মাত্রাবৃদ্ধিজাত অস্বাভাবিক লক্ষণের দ্বারা

৪ চিকিৎসাকালে, অপ্রত্যাশিত লক্ষণের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দ্বারা

৫। ঔষধ ও রোগের বর্ণনাসূত্রের দ্বারা

৬। যোগলব্ধ, দৈবলব্ধ, স্বপ্নলব্ধ এবং জ্যোতিষলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ৬ষ্ঠ প্রণালীটিকে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী বলিয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট ঔষধগুলি যে ঐ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রসূত, তাহা অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যেমন Cinchona, Malaria জ্বরের; Sponge গলগণ্ডের; Arnica আঘাত, পতন বা মচকান জনিত রোগের; Graphite চর্ম্মরোগের (Tetters); Sulphur খোস চুলকানির; পারদ ও Iodide of Potassium উপদংশের; Bismuth অম্লশূলের (Gastralgia); এবং Arsenic (বা সেঁকো) চর্ম্মরোগ বিনাশের ঔষধ। ইহাদের কেহই জীব জন্তুর উপর পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নাই। পঞ্চম প্রণালী দ্বারা, Chelidonium যে যকৃতের ঔষধ, Euphrasia যে চোখওঠার ঔষধ এবং লৌহ যে রক্তহীনতার ঔষধ এইগুলি জানা গিয়াছে।

৩। রোগ ও ঔষধের সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞান—

রোগের সহিত ঔষধের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কেন না তাহা না হইলে, রোগ, ঔষধের দ্বারা কদাচ উপশমিত হইত না। এখন দেখা যাউক সে

সম্বন্ধটি কি; এবং ইহা কত প্রকারের। মোটামুটি ইহা চারি প্রকারের এবং ইহাদের বিবরণ এইরূপঃ—

১। পীড়িত স্থানে ঔষধ না দিয়া সুস্থ স্থানে ঔষধ দিয়া রোগ আরাম করা—যেমন বিরেচক ঔষধের দ্বারা সংক্রান্ত রোগ আরাম করা; মূত্রকারক ঔষধের দ্বারা ফুসফুস ঝিল্লির শোথ আরাম করা। এ চিকিৎসায় রোগের সহিত ঔষধের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই।

২। যে স্থানে পীড়া হইয়াছে সেই স্থানের উপর ক্রিয়াপ্রকাশক ঔষধ, আমরা দুইভাবে ব্যবহার করিতে পারি। মূত্রকৃচ্ছ্রে যখন আমরা মূত্রকারক ঔষধ দিই, কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচক ঔষধ দিই, স্নায়ুর উত্তেজনায় কিংবা মাংসপেশীর আক্ষেপে অবসাদক ঔষধ দিই, বেদনাযুক্ত স্থানে অসাড়তা উৎপাদক ঔষধ দিই, তখন আমরা বিষমভাবে ঔষধ ব্যবহার করি।

আবার আমরা যখন মূত্রকৃচ্ছ্রে, মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদক কোন ঔষধ ব্যবহার করি, কোষ্ঠবদ্ধে কোষ্ঠবদ্ধ উৎপাদক ঔষধ, স্নায়ুর উত্তেজনায় স্নায়ুর উত্তেজক ঔষধ, মাংসপেশীর আক্ষেপে মাংসপেশীর আক্ষেপ উৎপাদক ঔষধ এবং বেদনার জন্য বেদনা উৎপাদক কোন ঔষধ ব্যবহার করি, তখন সমভাবে আমরা ঔষধ ব্যবহার করি। এই দুই স্থলেই, রোগের ক্রিয়া এবং ঔষধের ক্রিয়া একই স্থানে হইলেও, আরোগ্য ঠিক বিপরীতভাবে হইয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক রোগীর সহিত ঔষধের কি সম্বন্ধ। যেখানে আমরা রোগীর পীড়িত স্থান স্থির করিতে পারি, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আমরা ঔষধও সহজে নির্ব্বাচন করিতে পারি; কিন্তু এমন অনেক রোগী আছে যাহাদের পীড়িত স্থান স্থির করা যায় না এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মের দ্বারা ঔষধ নির্ব্বাচনেরও সুবিধা হয় না। এই সকল রোগগুলি কি? আমাদের দেশের চিকিৎসকেরা বলেন যে বায়ু-পিত্ত-কফের সমতাতেই আমাদের স্বাস্থ্য এবং তাহাদের বিষমতাতেই আমাদের রোগ। বায়ু-পিত্ত-কফ কি ইহা জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য হইতে পারে কিন্তু ইহা আমার এক্ষণে আলোচ্য নয়। ইহা বলিলেই আপাততঃ যথেষ্ট হইবে যে ইহারাই দেহের মূল পদার্থ। দেহ রোগাক্রান্ত হইলে, ইহাদেরই কখন একটি, কখন দুইটি, কখন তিনটি একই সময়ে বিকৃত হয়। যে পদার্থটি যখন বিকৃত হয়, তাহার বিকার দেহের সর্ব্বাঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। দেহের এমন স্থান নাই যাহার পরীক্ষা দ্বারা ঐ বিকারটি ধরা না যায়। বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা আনয়ন করিতে পারে এরূপ ঔষধ সকল চিকিৎসাশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। ইহাদিগকে শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারিলে, অনেক পুরাতন দুরারোগ্য রোগ আরাম করিতে পারা যায়। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায় যে আমাদের এই বায়ু, পিত্ত, কফই পাশ্চাত্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার Psora, Syphilis এবং Sycosis নাম গ্রহণ করিয়াছে। রোগীর এই অবস্থাত্রয়ের আবিষ্কারের দ্বারা মহাত্মা Hahnemann পাশ্চাত্য চিকিৎসায় এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।

অনেক সময় এরূপ অবস্থা হয় যে, রোগীর বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া ঔষধ দিলেও সে ঔষধ কার্য্যকর হয় না কিন্তু স্বাভাবিক প্রকৃতি ধরিয়া ঔষধ দিলে, শীঘ্র কার্য্যকর হয়। চিকিৎসার সফলতা এই প্রকৃতিগত ঔষধ নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করে।

এক্ষণে চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া জ্যোতিষশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনেকের ধারণা আছে যে ফলিত-জ্যোতিষ একেবারে আধ্যাত্মিক শাস্ত্র। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ইহার কোন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহা কেবল যোগবলেই হইয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। অন্যান্য পদার্থশাস্ত্রের ন্যায় ইহার অধিকাংশ-তত্ত্বই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়েই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এখন পর্য্যন্ত ফলিত-জ্যোতিষ আমাদের উপর অল্পাধিক পরিমাণে আধিপত্য চালাইতেছে। যাঁহারা ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের ত কথাই নাই; যাঁহারা ইহাকে বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাও ইহার দাসত্ব শৃঙ্খল এখনও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিতে পারিয়াছেন তাহা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দেখা যায় যে অভ্যাসের জন্যই হউক, কুসংস্কারের জন্যই হউক, অথবা প্রবোধের জন্যই হউক, লোকে এখনও রোগে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি এবং বিবাহে যোটক মিলনাদি করাইয়া থাকে। একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে সকল চিকিৎসারই সফলতা রোগের কারণতত্ত্বের উপর নির্ভর করে। প্রকৃত কারণ নির্ণীত হইলে রোগ আরোগ্য অতি সহজেই হয় এবং রোগের ভাবী ফলও সহজেই নির্দ্ধারিত হয়। এই কারণতত্ত্ব এবং ভাবি ফল বিচারে জ্যোতিষ আমাদের বিশেষ প্রয়োজনে আসে।

আমার বিশ্বাস চিকিৎসার সহিত জ্যোতিষের পূর্ণ মিলন না হইলে, চিকিৎসার অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। রোগের কারণতত্ত্বের বিচার করিতে গিয়া পৃথিবীতে যে কত চিকিৎসাপদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পদ্ধতি সকলের উদ্দেশ্য এক হইলেও, প্রত্যেক পদ্ধতি প্রত্যেক হইতে ভিন্ন।

রোগের কারণতত্ত্বকে যিনি যেভাবে দেখিয়াছেন, চিকিৎসাপদ্ধতিও তিনি সেই-ভাবে চালাইয়াছেন। যিনি স্থূলভাবে দেখিয়াছেন, তিনি স্থূলভাবে ব্যবস্থা দিয়াছেন; যিনি সূক্ষ্মভাবে দেখিয়াছেন, তিনি সূক্ষ্মভাবে ব্যবস্থা দিয়াছেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা এই স্থূল সূক্ষ্ম সকল পদ্ধতিরই মীমাংসা হইতে পারে।

অণু পরমাণু হইতে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই, যে গ্রহের শাসনে শাসিত, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে কোন্ গ্রহ কোন্ পদার্থের উপর কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে, নিম্নলিখিত প্রণালী-মত তাহা আমি শাস্ত্রানুসারে সংক্ষেপে বর্ণন করিব। প্রথম গ্রহের কারকতা, দ্বিতীয় রাশি, তৃতীয় মানসিক প্রকৃতি, চতুর্থ ধাতু, পঞ্চম ব্যাধি, ৬ষ্ঠ উদ্ভিদ, সপ্তম ধাতব ও খনিজ পদার্থ।

রবি :—

কারকতা—সৌরজগতের প্রধান গ্রহ বলিয়া ইহাকে গ্রহরাজ কহে। ইহা আত্মা, দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্র, ও পদবৃদ্ধি-কারক। জন্মকালে রবি যাহার অনুকূলে থাকে, তাহার জীবনীশক্তি বড় প্রবল হয়; শীঘ্র রোগাক্রান্ত হয় না, হইলেও শীঘ্র রোগ-মুক্ত হয়।

রাশি—সিংহ

মানসিকপ্রকৃতি—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; অধ্যবসায়ী

ধাতু—পিত্তপ্রধান

ব্যাধি—হৃদয় ও মস্তিষ্কের রোগ; চক্ষু

রোগ যেমন choroiditis, Iritis, সর্দি-গরমি, জ্বর (যাহাতে দেহ পচিয়া যায়)

উদ্ভিদ—আকন্দ, সূর্য্যমুখী, পদ্ম, গোধূম, গাঁদা, আদ্রক, লজ্জাবতী, কুষ্ঠ, চিরতা, নালিতা, নিম্ব, Chamomilla, Euphrasia, Hypericum, Colchicum, Chelidonium, Calendula, Etc.

খনিজ ও ধাতব পদার্থ—স্বর্ণ Chrysolite, বৈদূর্য্যমণি &c.

চন্দ্র :—

কারকতা—যে সকল পদার্থের জীবনীশক্তি ক্ষীণ, শীঘ্র পচিয়া যায় কিন্তু বাড়িবার সময় রাত্রে অতি শীঘ্র বাড়ে (যেমন কপি, বেতের ছাতা) ইহারা চন্দ্রের অধীন। স্ত্রীলোকের উপর, শরীরের জলভাগের উপর, চক্ষুর বহিরঙ্গের উপর ইহার বিশেষ আধিপত্য। শরীরের যে সকল অঙ্গ, পদার্থ বিশেষকে গ্রহণ করিয়া পরিপুষ্ট হয়, তাহারা চন্দ্রের অধীন। যেমন পাকস্থলী, গর্ভাশয়, স্তন, রক্তবহানাড়ী

রাশি—কর্কট।

মানসিক প্রকৃতি—কল্পনাপ্রিয়, ভীতু।

ধাতু—কফ-প্রধান।

ব্যাধি—গণ্ডমালা, গলগণ্ড, শূল, উদরাময়, জলদোষের পীড়া, পাক্ষিক জ্বর Chlorosis, Acdema, Vomiting, Defective Haemoglobin.

উদ্ভিদ—পলাশ, কুমুদ, কাঁকই, কদলী, ও অন্যান্য ক্ষার বৃক্ষ, কুষ্মাণ্ডাদি এক বৎসরস্থায়ী বল্লি, Colocynth, Agaricus, Muscarius, Cheiranthus Cheiri, Lemnae Etc.

খনিজ ও ধাতব পদার্থ—রৌপ্য, শঙ্খ, Aluminium, Moonstone Etc.

বুধ :—

কারকতা—আকারে ইহা ক্ষুদ্র হইলেও, প্রভাবে ইহা ক্ষুদ্র নয়। বাক্য বিদ্যা বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য কারক। মস্তিষ্ক, যান, বাহন, Telegraph, Rail, Post, প্রভৃতির ইহা অধিপতি। জন্মসময়ে চন্দ্র ও বুধ প্রতিকূল থাকিলে জাতক বিকলচিত্ত এবং উন্মাদগ্রস্ত হয়।

রাশি—মিথুন এবং কন্যা—

মানসিক প্রকৃতি—বুদ্ধিমান, বাক্‌পটু, চতুর, অস্থির ও লিপিকুশল।

ব্যাধি—যূর্ণরোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ বাক্‌রোধ, স্মরণশক্তির হীনতা, জিহ্বারোগ, Neurasthemia, Delirium, Trembling, Restlessness, Reflex & Sympathetic, Irritation.

উদ্ভিদ—অপামার্গ, বিজতাড়ক, প্রিয়ঙ্গু, ওল, মান, বচ, অগুরু, চন্দন, Petroselin, Podophylin Etc.

ধাতব ও খনিজ পদার্থ—পারদ (স্বর্ণ-কাংস্য))

শুক্র :—

কারকতা—ইহা একটী শুভগ্রহ। ইহা আর্দ্রতা, উষ্ণতা ও শিথিলতা উৎপাদন করে। প্রতিকূল হইলে সমস্ত শরীর শিথিলভাব ধারণ করে। দেহের সার পদার্থ সকল বাহির হইয়া যায়। শিরার (veins) উপর, বৃকের উপর, গলার উপর, এবং ovaryর উপর, ইহার বিশেষ আধিপত্য। শিরায় রক্তরোধের জন্য, শরীর স্ফীত দেখায়।

রাশি—বৃষ এবং তুলা—

মানসিক প্রকৃতি—কবিতা সঙ্গীত, বিলাস, এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয়।

ধাতু—কফপ্রকৃতি

ব্যাধি—ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীর্য্যহীনতা, বহুমূত্র, গর্ভাশয়ের রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র।

Laxity of Fibre, Mechanical Displacement, Escape of Vital fluids, Asthenic Plethora cystic and hollow tumour formation.

উদ্ভিদ—আমলকী, চম্পক, মেদী, উদুম্বর, কাবাবচিনি, পান, এলাচ, দারুচিনী, গন্ধ-পুষ্পলতা। Pulsatilla, Secale cereale Bellis Perenis, Plantago Major.

ধাতব ও খনিজ পদার্থ—তাম্র (রঙ্গ, রৌপ্য)

মঙ্গল :—

কারকতা—ইহা একটী অশুভ গ্রহ। ইহা শুষ্কতা ও উষ্ণতা উৎপাদন করে। ইহার অনুকূলে জাতক অত্যন্ত সাহসী, বলবান, পরাক্রমশালী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। ইহা উত্তাপ-কারক, প্রদাহকারক এবং ক্ষতি বহিষ্কারক। রবির সহিত ইহার ক্রিয়ার সাদৃশ্য আছে। মঙ্গলের তাপ অতি তীব্র এবং কেন্দ্রীভূত। রবির তাপ অকেন্দ্রীভূত এবং বিস্তৃত।

রাশি—মেষ এবং বৃশ্চিক।

মানসিক-প্রকৃতি—সাহসী, উদ্যমশীল, অস্থিরচিত্ত স্বাধীনতাপ্রিয়।

ধাতু—পিত্ত প্রকৃতি।

ব্যাধি—পিত্তরোগ, হাম, বসন্ত, ব্রণ, স্ফোটক, দগ্ধ, রক্তস্রাব, রক্তামাশয়, অর্শ, ভগন্দর, দন্তমূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, কুৎসিৎ পীড়া, দাহক জ্বর, অস্ত্রাঘাত ও দহন।

উদ্ভিদ—গোয়ালে লতা, অনন্তমূল, খদির, হরিদ্রা, মুসুর কলাই, লঙ্কা, মরিচ, পিপুল সমস্ত মনসাবর্গ।

Cinchona, Nuxvomica, Arnica, Bryonia, Sarasaparila, Cantheridis, Ocimum, bacillinum, Berberis Vulgaris, Urtica Urens, Juniperus Sabina.

ধাতব এবং খনিজ পদার্থ—লৌহ, গন্ধক, সিন্দূর, মনঃশিলা, গৈরিক। Etc.

Iron, Arsenic Tonic drugs

বৃহস্পতি :—

কারকতা—ইহা একটী শুভগ্রহ ইহা আয়ুষ্কারক, স্বাস্থ্যকারক এবং পুত্রকারক। প্রতিকূল হইলে জাতক রক্তঘটিত পীড়ায় কষ্ট পায়। শুক্রের যেমন শিরার (Veins) উপর আধিপত্য বৃহস্পতির তেম্‌নি ধমনির (Artery) উপর আধিপত্য। রক্ত-বিকৃত হইলে, Sugar, Albumen, Fat, Glycogen, Urea, Uric-acid প্রভৃতি শরীরের দূষিত পদার্থ, যাহারা সময়ে সময়ে দেখা দেয়, তাহাদের মূল কারণই প্রতিকূল বৃহস্পতি। আর, অন্ত্রবৃদ্ধি, ফুসফুস ও যকৃতের পীড়া, বৃহস্পতির বশেই হইয়া থাকে।

রাশি :—ধনু (মীন)—

মিথুন রাশির সহিতও ইহার নিকট সম্বন্ধ।

মানসিক প্রকৃতি—ধার্ম্মিক, ন্যায়বান্ দাতা, বদান্য, উচ্চাভিলাষী, শাস্ত্রজ্ঞ।

ধাতু—পিত্ত অথবা রক্তাধিক্য প্রকৃতি (Sanguine Temperament)

ব্যাধি—সর্দ্দি, কাশ, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, যকৃতের ও তালুর রোগ, সংন্যাস।

Sthenic Plethora, Disorderd circulation, changes in blood particles, fatty degeneration, Haemmorhage, Apoplexy, Sugar in blood.

উদ্ভিদ—বামুনহাটী, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, বাদাম, অশ্বত্থ, বট, আম, কাঁটাল, নারিকেল, তুলসী, পীতধাত্ত।

Taraxacium, Iridin, Eupatorium Melilotus officinalis, Triticum.

ধাতব ও খনিজ পদার্থ—Tin (Stannum) গন্ধক, হরিতাল

শনি :—

কারকতা—ইহা একটী অশুভ গ্রহ। ইহা হইতে শীতলতা উৎপন্ন হয়। ইহা সকল পদার্থকে সংকোচ করে, নমন করে, এবং কঠিন করে। ইহার প্রতিকূলে, প্রস্রাবে বালি, পাথরী প্রভৃতি জন্মে, এবং সন্ধিস্থানে খড়ির ন্যায় পদার্থের আবির্ভাব হয়। প্লীহার এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের পীড়া ইহা হইতে উৎপন্ন হয়। জন্মকালে রবি, শনি কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে, মাতৃক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়।

রাশি—মকর (কুম্ভ)

মানসিক প্রকৃতি—গম্ভীর, চিন্তাশীল, বৈরাগ্যপূর্ণ, পরিশ্রমী, ক্লেশসহনশীল, অধ্যবসায়ী বিষাদপূর্ণ।

ধাতু—বায়ু প্রকৃতি

ব্যাধি—বধিরতা, পদবিকলতা, পক্ষাঘাত, শরীর কম্পন, বায়ুরোগ, শ্বাসরোগ, যক্ষ্মা—Diminished secretion, Contraction of Tissue, Lowered Vitality and Sensibility, Induration.

উদ্ভিদ—বেড়েলা, শীম, তাল, খর্জ্জুর, শাল, সেগুন, সমস্ত বিষাক্ত তরুলতা।

Aconite, Belladona, Hyoscyamus, Halleborus, Veratrum Album, Conium, Cannabis Indica, Rhustox, Symphytum, Narcotic drugs.

ধাতব ও খনিজ পদার্থ—Plumbum Grappite, Antimoni, Iron, Soda Solicylas, and Hidrocyanic acid.

ইউরেনস্ :—

কারকতা—ইহা একটী অশুভ গ্রহ। অনেক দুর্ব্বোধ্য বায়ুরোগ ইহা দ্বারা উৎপন্ন হয়।

রাশি—কুম্ভ

মানসিক প্রকৃতি—বায়ুগ্রস্ত, বেয়াড়া ধরণের।

ধাতু—বায়ু প্রকৃতিক

ব্যাধি—আক্ষেপ, Stricture, Contortion, Intussusception, Rupture of Bowels and Perverted Nutrition.

উদ্ভিদ ও রাসায়নিক পদার্থ—জলপাইয়ের তৈল, ether, compressed air and gases.

ধাতব ও খনিজ পদার্থ—Uranium, Pitch-blende Thorium, Radium, Loadstone, Amber, Shellac etc.

নেপ্‌চুন্ :—

কারকতা—ইহা একটী শুভ গ্রহ। ইহা অনেক ভূতুড়ে এবং বায়ুরোগের কারক।

রাশি—মীন

মানসিক প্রকৃতি—কল্পনাপ্রিয়, দৈববল বিশ্বাসী (Psychic), কবিতাপ্রিয়।

ধাতু—কফ প্রকৃতিক

উদ্ভিদ ও রাসায়নিক পদার্থ—অহিফেন ও অহিফেন ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ।

ব্যাধি :—চৈতন্যহীনতা, স্পন্দন শূন্যতা, অসাড়তা, Catalepsy, Coma, Analgesia.

Tonic	Atonic
রবি, Hyperaemic,	চন্দ্র Anaemic
মঙ্গল, Imflamatory	শনি, Paralytic
	Cachectic, reducing
বৃহস্পতি (Sthenic)	শুক্র (Asthenic)
Plethora	Plethora
ইউরেনস্	নেপ্‌চুন্
Stricture,	Atrophy of process,
Disruption.	disruption.

বুধ

সামঞ্জস্য কারক

Receiver, Reflector, Amalgamator.

সংক্ষেপে গ্রহগণের পরিচয় দিলাম। মানবদেহে একটী মাত্র গ্রহের আধিপত্য থাকিলে, রোগ ও তাহার ঔষধ নির্ণয় সহজ হইত। অনেকগুলি গ্রহ একসঙ্গে আধিপত্য করিলে, জ্যোতিষশাস্ত্রমতে, রোগ ও তাহার ঔষধ নির্ণয় অতি কঠিন হইয়া পড়ে। গ্রহ সকলের যৌগিক ফল সূক্ষ্মভাবে বিচার না করিলে সূক্ষ্মফল বলিতে পারা যায় না।

চিকিৎসাশাস্ত্রের এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি আপনাদের সমক্ষে স্থাপন করিলাম। ইহাদের মধ্যে যে একটা সম্বন্ধ আছে তাহার আভাষ বোধ হয় আপনারা পাইয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক তত্ত্ব, জ্যোতিষশাস্ত্রের তত্ত্বের সহিত মিল হইতে দেখা যাইতেছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় জ্যোতিষশাস্ত্রেও প্রধানতঃ বিষম এবং সমপ্রণালীতে ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায়।

বিষমপ্রণালী মতে নির্ব্বাচিত ঔষধের বিবরণ :—

১। রবিঘটিত রোগে শনিঘটিত ঔষধ কার্য্য করে।

২। বৃহস্পতি ঘটিত রোগে বুধঘটিত ঔষধ কার্য্য করে।

সমপ্রণালীমতে নির্ব্বাচিত ঔষধের বিবরণ :—

১। শনিঘটিত রোগে শনিঘটিত ঔষধ—

২। মঙ্গল	মঙ্গল		
৩। রবি	রবি	}	চন্দ্রস্থ
৪। চন্দ্র	চন্দ্র	}	
৫। শনি	শনি		
৬। বৃহস্পতি	বৃহস্পতি		

Arnica, Arsenic, Bryonia, Nux-vomica মঙ্গলঘটিত ঔষধ, মঙ্গলঘটিত রোগে কার্য্য করে।

Sanguine, robust, irritable persons এ মঙ্গলঘটিত ঔষধ কার্য্য করে।

Aconite, Belledona, Veratrum Alb, বায়ুপ্রকৃতিক এবং বিষাদপূর্ণ লোকের উপর কার্য্য করে।

Pulsatilla, Cuprum শুক্র ঘটিত ঔষধ, শুক্রঘটিত রোগে কার্য্য করে।

For Sunstroke × Belladona
(Sun) (Saturn)
For Contusion × Arnica
(Saturn) (mars)
For Periosteal Injury × Ruta
(Saturn) (Sun)
For Glandular Injury × Conium
(Saturn) (Saturn)

৬ষ্ঠ গৃহের বিচার দ্বারা, ব্যাধির কারণতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু প্রবন্ধ জটিল হওয়ার আশঙ্কায়, আপাততঃ উহা বলিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি অতি সংক্ষেপে বলিলাম। ইহাদের ভিতর যে একটী অতি নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা বহু পরীক্ষা দ্বারা আমি জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনাদিগকে ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে পারিয়াছি কি না বলিতে পারি না। যদি না পারিয়া থাকি তাহা আমারই বুদ্ধির দোষে, শাস্ত্রের দোষে নয়।

শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়।

মফঃস্বলের বাণী

১। জীবিকা সমস্যা

যাঁরা বড়লোক—তাঁরা পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খান, থিয়েটার দেখেন, গাড়ী চড়েন, বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ উদরে তুলিয়া দুর্লভ মানবজন্ম অবহেলায় কাটাইয়া দেন! যাঁরা গরীব, তাঁরা দিন-মজুরী করিয়া পরিশ্রম-লব্ধ অর্থে মোটা ভাত মোটা কাপড় সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে জীবন যাপন করে। এই উভয় সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা যে মধ্যম সম্প্রদায় দেখিতে পাই—পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে—কেবল তাহারাই বিড়ম্বিত! মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিতর জীবিকা সমস্যা দিন দিন কঠিন হইয়া পড়িতেছে!

জয় পরাজয় লইয়া, উত্থান পতন লইয়া, উন্নতি অবনতি লইয়া—মানুষের জীবন। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে—উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লইয়া মানুষ—মানুষ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনে কেবল অবনতিরই আধিপত্য। হৃদয়ে নৈরাশ্য লইয়া, প্রাণে অশান্তি পুষিয়া, মনে অবসাদ আঁকিয়া, সমাজে বিপন্ন হইয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—বিধিসৃষ্টি বিফল করিতেছেন। তাঁহার পুলক প্রচুর মুখে বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে,—আশার উজ্জ্বল অরুণ সে কালিমা ভেদ করিতে পারিবে না; জীবন-সংগ্রামে বিজিত বীরের মত বোধ হয় চিরদিন তাঁহাদিগকে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত থাকিতে হইবে।

সত্য সত্যই এবার আমাদের ভাবিবার সময় আসিয়াছে। এই যুগ-সন্ধির মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া—আমাদের জীবন বৈজ্ঞানিকের মত বিশ্লেষণ করিতে হইবে। সংসারে সকলের চেয়ে কঠিন, সকলের চেয়ে জটিল, সকলের চেয়ে দুষ্কর—সকলের চেয়ে প্রধান, মানবের জীবন-সমস্যা। এই জীবন-সমস্যার সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—আর টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না। সেই জন্যই আমরা আমাদের জীবন-সমস্যার মীমাংসার ভার বাঙ্গালী পাঠকের হস্তে অর্পণ করিতেছি। আশাকরি, তাঁহারা একটু ভাবিয়া দেখিবেন, নচেৎ আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, ধমনী শোণিতের চেতনাস্পন্দন থামিয়া যাইবে, মস্তিষ্কে মরণের পূর্ব্ব লক্ষণ "আক্ষেপ" রূপে দেখা দিবে।

আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল আমরা জীবিকানির্ব্বাহে কষ্ট পাইতেছি। এ কষ্টের কারণ অনেকগুলি,—যেগুলি প্রধান এবং অসন্দিগ্ধ, নিম্নে কেবল সেইগুলিরই উল্লেখ করিতেছি। আমাদের প্রত্যেকের সংসারেই এখন ব্যয় বাহুল্য দাঁড়াইয়াছে। যে ক্ষুদ্র সংসার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে—মাত্র দশ টাকা ব্যয়ে স্বচ্ছন্দরূপে চলিয়া যাইত সে সংসারে এখন ১০০৲ শত মুদ্রা ব্যয় করিলেও সকলের পাতে ভাতের উপর ডাল পড়ে না। সুতরাং আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রথম সমস্যা—ব্যয় বাহুল্য।

দ্বিতীয় সমস্যা—চাকুরী। চাকুরী না করিলে আমাদের অন্ন সংস্থান হয় না। আমরা অন্য পথ চিনিও না। ব্যবসায়, কৃষিবিদ্যা বাণিজ্য—আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। ইহাতে আমাদের প্রবৃত্তি নাই। আমরা পণ্য কিনিতে

পারি, কিন্তু শস্য কিসে উৎপন্ন হয়, তাহা জানি না। আমরা বাণিজ্যে লোকের উন্নতি দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হই,—অথচ তাহাতে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি না। যাঁহার প্রবৃত্তি আছে তাঁহার মূলধন নাই।

তৃতীয় সমস্যা—বিলাসিতা। সহরের তড়িৎ প্রভাময়ী সভ্যতা আমাদের নেত্রে যে অপূর্ব্ব 'ঝিলিক্' হানিয়াছে, তাহাতেই আমরা মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। এখন মোটা কাপড়ে আমাদের লজ্জানিবারণ হয় না। প্যারাম্বুলেটারে না চড়িলে আমাদের শিশুর দুগ্ধ পরিপাকের শক্তি থাকে না। সান্ধ্য সজ্জায় একটি সেফ্‌টী পিনের অভাবও আমরা সহ্য করিতে পারি না। এখন তেল মাখিলে আমাদের গাত্রে ময়লা জন্মে,—সাবান চাই। গৃহিণী রন্ধনগৃহে প্রবিষ্টা হইলে হিষ্টিরিয়া সঙ্গিনী হইয়া পড়েন। কেশ তৈল, পাউডার, এসেন্স, বডি, জ্যাকেট, সেমিজ,—আর কত নাম করিব? এসব না হইলে আমাদের ভদ্রতা থাকে কি? আহারে বিহারে ব্যবহারে—বিলাসই আমাদের বিকাশ।

চতুর্থ সমস্যা—পল্লীর প্রতি অনাদর। সেকালের সরল পল্লী-জীবন—সহরের চাক্‌চিক্যে ভুলিয়া আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদেরই অনাদরে পল্লীলক্ষ্মী রত্নভাণ্ডার ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন! আমাদের উদ্যান-চিতান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নদী পুকুর মজিয়া গিয়াছে, গ্রামে প্রবেশের পথ জঙ্গলাকীর্ণ, গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ—এখন আমাদের বালক বালিকার কাছে—ঠানদিদির উপকথা।

পঞ্চম সমস্যা—দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা। দুই টাকার চাল এখন ৮৲ টাকায় পাওয়া যায় না। আমাদের শরীর পোষণের জন্য যতটুকু পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তাহা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি না। দেশের লোক সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ সে পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা আমাদের নাই। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে আমাদের শিশুগুলি, শৈশবের আনন্দ চাপল্যের ভিতরেও পিতামহের মত অস্বাভাবিক গম্ভীর!

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার রহিল। কিন্তু আজ আর না। বারান্তরে এই জীবিকা সমস্যা লইয়াই আবার আমরা আলোচনা করিব।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ।

২। মহীশূরে শিল্পোন্নতি

মহীশূর রাজ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন জন্য শিল্পোন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার না হইলে, ভারতের আর্থিক উন্নতিসাধন যে একান্তই সুদূরপরাহত একথা বোধ হয় এক্ষণে আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ ইউরোপের মহাযুদ্ধের ফলে এদেশে আজকাল অনেক জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং এ সময়ে মহীশূর রাজ্যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন চেষ্টার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। মহীশূর-বাসিগণ সম্প্রতি যেসকল দ্রব্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

(১)

কাপড়ের কল—ষোল লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া মহীশূর রাজ্যে একটি কাপড়ের কল স্থাপন করা হইবে; এই কলে ২৫ হাজার চরকা ও ৫ শত তাঁত থাকিবে। প্রতিদিন এই কলে ১৬ লক্ষ সের সূতা ও ৯ লক্ষ সের বস্ত্র প্রস্তুত হইবে।

(২)

সাবানের কল—মহীশূরবাসিগণ এতদ্দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিতেছেন। এই কলের কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত একজন কার্য্যকুশল বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(৩)

কাচের কারখানা—মহীশূরের কাচের জিনিষ নির্ম্মাতা কারিকরদিগকে ভারতের অন্যান্য স্থানের কারখানাগুলি দর্শনের জন্য প্রেরণ করিয়া উৎকৃষ্ট কাচ নির্ম্মাণের আয়োজন করা হইবে।

(৪)

দিয়াশলাইর কল—মহীশূরের সিমোগা নামক স্থানে একটি দিয়াশলাইয়ের কল স্থাপন

জন্য ৫০ হাজার টাকা মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে।

(৫)

কাগজের কারখানা—মহীশূর রাজ্যে কাগজ নির্ম্মাণোপযোগী ঘাস ও বাঁশ বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়। মহীশূর-জাত বাঁশের মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি সে দেশ হইতে ৫৪০ মণ বাঁশের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া ভারতের কোনও কাগজের কলে প্রেরিত হইয়াছে। এই মণ্ডে ভাল কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিলে মহীশূরে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। ঢাকা প্রকাশ।

৩। গাভীর দুগ্ধ প্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির উপায়

বিচালী অপেক্ষা কাঁচাঘাসে দুগ্ধ বেশী হয়। লাউ, কাঁটানটে, কচুর ডাঁটা ও ক্ষুদ একসঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে দুধ বেশী হয়, এ সকল কথা সকলেই জানেন। নিম্নে দুগ্ধ বৃদ্ধিকর কতকগুলি প্রণালী লিখিত হইল।

১। বাঁশপাতা, কাঁঠাল পাতা, হিমসাগর পাতা এবং যৎসামান্য মৌরী—৩সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিবেন, ৩সের আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া সেই জলে ১মুঠা তিল দিয়া গরুকে খাইতে দিবেন।

২। আখসের খেসারী ভিজাইয়া খাইতে দিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদের সঙ্গে কুলের পল্লব ও কার্পাস বীজ দিলে দুগ্ধ বাড়ে।

৩। ভুই কুমড়া একছটাক, মুগ একমুঠা আতপ চাউল দুমুঠা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া পুরুষিন রাখিয়া দিবেন। পরদিন চটকাইয়া আরো খানিক জল মিশাইয়া খাইতে দিবেন। ইহাতে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৪। ১৫ দিন ধরিয়া ৵০ আনা পরিমাণে তেঁতুল আটা ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

৫। বনচালতার পাতা, আতা পাতা, তিল ২।৩ কুচি বন আদা ক্ষুদের সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবেন।

৬। হাড়জোড়া গাছ খাইলে দুগ্ধ বাড়ে।

৭। কেশুরের পাতা ফিরাইপাতা ক্ষুদের সঙ্গে খাওয়াইলে দুগ্ধ বাড়ে। এই ব্যবস্থার পর রাত্রে ১সের ছোলা ভিজান খাওয়াইবেন।

৮। প্রত্যহ একমুঠা যব, ১ খানা রাঙ্গা আলু, আধখানা মোচা একত্র করিয়া খাওয়াইবেন।

৯। রাখাল শশার ঝোড়া একটা, চুপড়ী আলু ১ টাকা, জলে বাঁটীয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ কোৎরা গুড় মিশাইয়া খাওয়াইলে অদ্ভুত রূপে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এই সঙ্গে কাঁচা বেলও দিলে হয়।

১০। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় ৮।১০ সের জলে আধ ছটাক লবণ ও ১ছটাক বন মুগের পাতার রস নিক্ষেপ করিয়া ইচ্ছামত গরুকে পান করিতে দিবেন। এই উপায়ে দ্বিগুণ দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১১। আধখানা নারিকেল কোরা ৵০ পোয়া কোৎরা গুড় ১ভরি মৌটা সরিষা মিশাইয়া খাওয়াইলে দুধ বাড়ে।

১২। বাঁশ পাতা সিদ্ধজলে ২ভরি জোয়ান আধপোয়া ইক্ষু গুড় গুলিয়া খাওয়াইলে দুধ বাড়ে।

১৩। মাষকলাই সিদ্ধ আধসের, আধসের ভাতের মাড়, একপোয়া গুড়, আধভরি পিপুল চূর্ণ, লবণ এক ছটাক প্রত্যহ রাত্রে এই যোগটী খাওয়াইলে অত্যন্ত দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

১৪। মাষাণীর গাছ কুচি কুচি করিয়া বিচালীর সঙ্গে খাওয়াইবেন।

১৫। শিমুল ফুল চালতের ভিতরের শাঁস শতমূলি চাকুলের পাতা মানকচু এইগুলি একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে এত দুধ বৃদ্ধি হয় যে দশসের মাষকলাই খাওয়াইলেও তত হয় না।

১৬। ৪।৭ টা ভেরেণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করিবেন ঐ পাতা কিছু গরম থাকিতে থাকিতে গরুর পালানের উপর দিয়া কাপড় বাঁধিয়া দিবেন। আধ ঘণ্টা পরে খুলিয়া দোহন করিবেন, এই উপায়ে অত্যন্ত দুধ বৃদ্ধি হয়।

১৭। ভেরেণ্ডার পাতা সিদ্ধ জলে কিঞ্চিৎ গুড় নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই জল গরুকে পান করিতে দিবেন।

১৮। কাঁজিতে খড় ভিজাইয়া সেই খড়ের সঙ্গে কিছু কুঁড়া মিশাইয়া খাইতে দিবেন।

দুধ বৃদ্ধি পক্ষে আখনের গুড় দেড় সের খইলের কাজ করে। বীরভূম বার্ত্তা।

৪। জীবন-সংগ্রাম

বাঙ্গালী যুবকগণের জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাণিজ্য, ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প, চাকরী প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী যুবকগণের প্রবেশদ্বার রুদ্ধপ্রায়। বাঙ্গালী যুবকগণ যতই শিক্ষিত হউক না কেন ভাগ্যদোষে তাহাদের জীবনোপায়ের পথ অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" হইতে আরম্ভ করিয়া রাজসেবা পর্য্যন্ত যখন তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না তখন ভিক্ষা ভিন্ন উপায় কি? কিন্তু ভিক্ষা করিয়া জীবন উপায়ের সংস্থান এখনও এ-দেশে সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আর তাহাতে কুলায় না। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক ডাকাতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই সকল মোকদ্দমায় আসামীরা অনেকস্থলে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে এবং নির্দ্দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তবুও ইহা বাঙ্গালী যুবকগণের পক্ষে প্রশংসা বা গৌরবের কথা নহে। তাহাদের নামে এরূপ কলঙ্ক রটনা হয় এবং তাহাদের চরিত্রে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় ইহা বড়ই ক্ষোভ এবং আক্ষেপের কারণ। যে দেশ ধর্ম্ম ও নীতিই জীবনের সর্ব্বপ্রধান মূলমন্ত্র ছিল সে দেশের যুবকগণ চোর ও ডাকাতের দলের সহিত সমাবদ্ধ হইবে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

যখন যুবকগণের জীবন-সংগ্রা এইরূপ সুকঠিন এবং তাহাদের অন্য কোন পথ নাই তখন এ-ক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি তাহাই অবধারণ করা একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া উঠিয়াছে। অতীতের কিংবা ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন লইয়া বিভোর থাকিলে সংসারের কার্য্য চলিতে পারে না অথবা কর্ত্তব্য সংসাধিত হইতে পারে না। সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইলে কেবল বর্ত্তমান বিষয়ই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, পূর্ব্বে এ-দেশে বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সোণার বাংলা একদিন অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার ছিল এ সকল কথা ভাবিলে বা ইহা লইয়া প্রবন্ধাদি লিখিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না। অথবা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য বড় বড় কথা বলিলে বা গলাবাজি করিলেও দেশের উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। দেশের যেরূপ অধঃপতিত অবস্থা তাহাতে আমাদের নেতা বা সংস্কারকদলের দ্বারা দেশের যে শীঘ্র কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহা মনে হয় না।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে হইবে স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করিতে হইবে। সামান্য পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আপনার এবং পুত্র কন্যাগণের উদর পূর্ত্তি করিতে সমর্থ হয় আর মানব সন্তান তাহা করিতে অসমর্থ হইবে ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। মহাত্মা যীশু খৃষ্ট বলিয়াছেন যে সর্ব্বশক্তিমান পরমপিতা পরমেশ্বর সামান্য চটক পক্ষীর জন্য আহার নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার সন্তান মানবগণ অনাহারে মরিবে ইহা কখনই হইতে পারে না। যাঁহার হৃদয়ে এরূপ বিশ্বাস আছে, যাঁহার প্রাণে অদম্য বল আছে, তিনি কখনই সংসারের আপদ বিপদ, দুঃখে কষ্টে কিংবা অভাব অসুবিধায় মুহ্যমান হইয়া পড়েন না। অনেকে আছেন যাঁহারা নিজেরা নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিয়া কেবল অদৃষ্ট ফল গণনা করেন অথবা ভগবানের নির্দ্দয়তা ও পক্ষপাতিতা প্রমাণ করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়েন। চাকরীর দ্বার যে সহজে উদ্ঘাটিত হয় না তাহা আমরা সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছি। বাণিজ্য বা কৃষিকে জীবনের অবলম্বন করা সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে। তবুও তো জীবনধারণ করিতে হইবে। নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। পরিবারের ভরণপোষণ, পুত্রকন্যার শিক্ষা প্রধান, দেশের ও দশের উপকার—এই সকল কর্ত্তব্য অবহেলার বিষয় নহে। যাহারা সুখে ও সচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইয়াছে, যাহারা

সৌভাগ্য দেবীর বদনাঞ্চলে লালিত পালিত হইয়া কখনও অভাব ও অসুবিধার কথা জানিতে পারে নাই তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের দিকে তাকাইয়া এবং নিজেদের নানারূপ অভাব ও অভিযোগের কথা ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সম্মুখে যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন, জীবন-সংগ্রাম যতই কঠিন হউক না কেন, বীরের ন্যায় তাহার সম্মুখীন হইয়া নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। এক মাত্র ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া যথাসাধ্য বর্ত্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার করা ব্যতীত নিঃসম্বল নিরুপায় ও নির্ধনের অন্য কোন গতি নাই। বল আপনার হৃদয় হইতে আপনি আসিবে। ভগবান স্বয়ং বল প্রদান করিবেন। দৈবকে তুচ্ছ করিয়া কঠোর পুরুষকার দ্বারা ভাগ্যলক্ষ্মীকে অঙ্কশায়িনী করিতে হইবে।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতিলক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি"।

জাগরণ।

৫। স্ত্রী-শিক্ষা

কি প্রণালীর দ্বারা পরিচালিত হইলে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রকৃত কল্যাণদায়িনী হইবে তাহার আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমে শিক্ষা কাহাকে বলে জানিতে হইবে। সচরাচর লিখন পঠন প্রভৃতিকেই শিক্ষা বলা হয়। যে ললনা প্রাইমারী কিম্বা তদূর্দ্ধ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি নাটক উপন্যাস প্রভৃতি পড়িতে পারেন, উলের কাজ জানেন, তিনিই এখন শিক্ষিতা বলিয়া পরিগণিতা। তাঁহার যদি ইংরাজী জানা থাকে কিম্বা বাঙ্গালায় কবিতা রচনার ক্ষমতা থাকে তা'হলে ত সোণায় সোহাগা।

শিক্ষা শব্দের উক্তরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে আমাদের দেশের প্রায় সমস্ত রমণীই এতকাল অশিক্ষিতা ছিলেন এবং অতি অল্প দিন হইল হিন্দু সমাজ তাঁহাদের শিক্ষা বিধানে মনযোগী হইয়াছেন।

পূর্ব্বে দেখা যাইত পল্লীবাসিনী নিরক্ষরা গৃহস্থ কামিনীরা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাঙ্গণ সংমার্জ্জন করিতেন, প্রতি গৃহে গোময়-মিশ্রিত মৃত্তিকার প্রলেপ দিতেন, শিশুদের প্রাতরাশের ব্যবস্থা করিতেন, মাধ্যাহ্নিক রন্ধনের আয়োজন করিয়া স্নানে যাইতেন, জলাশয় হইতে পানীয় ও রন্ধন কার্য্যের উপযোগী জল বহন করিয়া আনিতেন। সহস্তে রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া পরিজন ও অতিথি অভ্যাগতকে ভোজন করাইতেন। উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি স্বহস্তে মার্জ্জন করিতেন। বিকালে বিশ্রামছলে কাঁথা সেলাই অথবা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পাঠ শুনিতেন। প্রদোষে দীপরচনা করিতেন এবং রাত্রিকালে পুনরায় রন্ধনাদি সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রার আশ্রয় লইতেন। তাঁহারা রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিয়া শিরঃপীড়া অনুভব করিতেন না। অম্লদোষে পীড়িতা হইয়া অকাল বার্দ্ধক্যের অভিনয় করিতেন না। তাঁহাদের দেহে নিয়ত স্বাস্থ্য ও মুখে অপূর্ব্ব শান্তির ছটা ভাসিয়া উঠিত। তাঁহারা লিখিতে পড়িতে পারিতেন না বটে, কিন্তু পাঠকতা কার্য্যের সহায়তায় দেশের পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে পরিচিতা হইতেন। মুখে মুখে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সত্যভামা, রুক্মিণী প্রভৃতি বীরাঙ্গনার অপূর্ব্ব চরিত্র বর্ণন করিতে পারিতেন। তাঁহারা উল কার্পেটের কাজ জানিতেন না বটে কিন্তু গৃহস্থের নিত্যোপযোগী সূচী কার্য্য ও বাঁশের শিল্পে অর্থাৎ হাতা খোচনা প্রভৃতি প্রস্তুতে বিশেষ নিপুণা ছিলেন। এবংবিধ অন্নপূর্ণা কমলা গৃহলক্ষ্মীকে কি আমরা অশিক্ষিতা বলিব? বেশী দিনের কথা নয়, আমাদের দেশে সচরাচর এই শ্রেণীর রমণীই দেখা যাইত। যাঁহারা সামান্য পড়িতে জানিতেন তাঁহারা অবসরকালে রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠেই তন্ময় হইয়া থাকিতেন। তখন সৌভাগ্যক্রমে গ্রামে উপন্যাসের এত ছড়াছড়ি হয় নাই। কাজেই পাঠাথিনীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। ধর্ম্মগ্রন্থের পবিত্র ও উচ্চতরভাবে তাঁহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া থাকিত। শিক্ষা শব্দের এখন যেরূপ অর্থ হইয়াছে, তদনুসারে ইহাদিগকেও অশিক্ষিতা বলিবেন না কি?

তাঁহারা পদার্থ কয় প্রকার জানিতেন না, বিড়ালের পায়ে কয়টি নখ আছে তাহার অভ্যাস করিতেন না, "লম্বা লম্বা খেজুর গাছে খেজুর ধরেছে" শিখিতেন না, অহিফেন সেবনে ও পরিধেয় বস্ত্রে কেরোসিন ঢালিয়া অগ্নি সংযোগে আত্মহত্যা করিতেন না।

উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল আমার বিবেচনায় অমার্জ্জিত হইলেও তাহা প্রকৃত স্ত্রী শিক্ষার আদর্শস্থল। শিক্ষার যাহা উদ্দেশ্য —মনের স্থিরতা ও চরিত্রের মধুরতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও ধর্ম্মে মতি, অপরকে সুখী করা ও নিজে সুখী হওয়া,—এই সমস্তই ঐ চিত্রে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু এখন আর ঐরূপ আদর্শ সচরাচর দেখা যায় না। এখন যাঁহার একটু অবস্থা ভাল এবং যিনি ভদ্রলোক নামে পরিচিত হইতে ব্যগ্র, তাঁহার গৃহে পাচিকা ও দাস দাসীর ব্যবস্থা। কাজেই রমণীরা আলস্য-পরায়ণা ও নানাবিধ রোগগ্রস্তা। তাঁহারা অসার পুস্তক পাঠে অথবা বৃথা আমোদ-প্রমোদে ও পরের কথার আলোচনা করিয়া সময় যাপন করেন। গৃহকার্য্য চাকরের উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। বলা বাহুল্য, স্ত্রী-লোকের এই দুর্দ্দশা নগরেই বেশী। সুতরাং বালিকারা বিশেষতঃ নগরবাসিনীরা শিক্ষার যাহা প্রধান অঙ্গ—গৃহে মা, খুড়ী, মাসী, পিসির সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্মোপদেশ অবগত হওয়া ও গৃহকার্য্যে নিপুণা হওয়া,—তাহা হইতে বঞ্চিতা হয়। তাহারা এখন শিবপূজা শিখে স্কুলে, সেলাই শিখে দরজীর কাছে। আমার মনে হয় যতদিন আমরা গৃহে সুশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে না পারিব, ততদিন তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই পাইব। তবে বিদ্যালয়ের যে উপযোগীতা নাই তাহা বলিতেছি না। সেখানে দশজনের সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে হয়, তাহাতে সামাজিকতা জন্মে। পরস্পর প্রতি-যোগিতাও হইয়া থাকে। কিন্তু এই গুণত্রয় বালকদিগের পক্ষে যত অধিক উপযোগী, বালিকাদিগের পক্ষে তত নয়। আমি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নই, পরন্তু আধুনিক বিকৃত শিক্ষার পক্ষপাতীও নই। তাহাদিগকে একটু সাহিত্য পড়াইতে হইবে যাহার সাহায্যে তাহারা রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। তাহাদিগকে সামান্য রকমের অঙ্ক শিখাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা ধোপার, গোয়ালার ও বাজার-খরচের হিসাব রাখিতে পারে। তাহাদিগকে একটু স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহারা কন্যা, ভগিনী, পত্নী ও জননীভাবে উত্তরকালে রোগীর শুশ্রূষা ও শিশু পালনে নিপুণা হয়। তাহাদিগকে একটু ইংরাজী শিখাইতে হইবে, যাহার সাহায্যে নোটের নম্বর ও চিঠির ঠিকানা ইত্যাদি লিখিতে পড়িতে পারে। তাহাদের হস্তাক্ষর সুন্দর করিতে হইবে। এই গেল বিদ্যালয়ের শিক্ষা। এতদতিরিক্ত কল্পনা ও সূচীকার্য্য, ধর্ম্মকথা ও গুরুজন সেবা প্রভৃতি গৃহেই শিক্ষা করিতে হইবে।

বালিকাদিগের সাধারণ শিক্ষার জন্য যে প্রণালীর কথা আলোচিত হইল, তাহা স্বল্প-ব্যয়সাধ্য। বিদ্যালয়ের কার্য্য সকালে ও বিকালে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১০ হইতে ৪টা অতি ভয়ানক সময়; সোগ্রাসে গিলিয়া রুদ্ধ-শ্বাসে স্কুল অফিসে ছুটিতে ছুটিতে বাঙ্গালী জাতি মরিতে বসিয়াছে। আর এক কথা পরীক্ষা। বালিকাদিগকে যেন পরীক্ষা-যন্ত্রে নিষ্পেষিত করা না হয়; এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান করিলে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

জ্যোতিঃ।

স্বর্গীয় কবি বরদাচরণ মিত্র।

গৃহস্থ

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৬ষ্ঠ খণ্ড | ভাদ্র, ১৩২২ | একাদশ সংখ্যা।
৬ষ্ঠ বর্ষ

আলোচনা

১। আত্মসম্মান ও সিদ্ধি

এই পৃথিবীতে মানুষ ও পশু উভয়ের বাস। মানুষের সঙ্গে পশুর ভেদ হইতে "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনক" এই কয়টী বিষয়ের সাদৃশ্য রহিয়াছে; নাই কেবল একটী বিষয়ে—সেইটী ধর্ম্ম; এবং সেই জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ধর্ম্মেন হীনা পশুভিঃ সমানাঃ। পশু নিজের লইয়াই ব্যস্ত; মানুষের শুধু নিজের ভাবিবার উপায় নাই। জন্ম হইতেই তাহার জীবন সমাজের জন্য

উৎসৃষ্ট হইয়াছে। মানুষের অন্তরে ত্যাগ, সাহস, বীর্য্য প্রভৃতি তেজোময় মূর্ত্তি ধরিয়া ব্যবহারের অপেক্ষায় আছে। সমাজে সুখ-শান্তি স্থাপন করা এবং খ্যাতি ও সম্মান বর্দ্ধন করা মানুষের ধর্ম্ম। যিনি ঐগুলির ব্যবহার করিতে জানেন তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। মানুষ দেবতা নহে। সুতরাং তাহার চরিত্রে অল্পবিস্তর মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব আছে। মনুষ্যত্বে নিঃস্বার্থ, পশুত্বে স্বার্থ; মনুষ্যত্বে ত্যাগ, পশুত্বে সঞ্চয়। যখন মানুষ সেই পশুভাব কাটাইয়া নিজকে দাঁড় করিতে পারে তখনই তাহার চরিত্র উন্নত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, মনুষ্যত্বই শ্রেষ্ঠ সম্পদ হয়। এরূপ ভাবে মানব চরিত্র গঠনের পক্ষে —উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ প্রয়োজনীয়।

যে সকল গুণ পুরুষকারের চিহ্ন সেগুলি আত্মসম্মানের দ্বারা পুষ্ট হয়। নতুবা ক্ষণ-কালের নিমিত্ত ক্ষীণ প্রভা বিকাশ করে মাত্র। সাহস শুধু সবলের সম্পত্তি নয়। আত্ম সম্মানীর সম্পত্তি। শুধু বাহুবলের অধিকারী হইয়া কোন জাতি স্বাধীন হয় নাই। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির আত্ম-সম্মান-বোধ জাগ্রত না হইলে, ব্যক্তিত্বে সাহস পুঞ্জীকৃত না হইলে, সকলের সমুদয় ত্যাগের জলন্ত আদর্শ দণ্ডায়মান হইয়া অধর্ম্মকে পুড়াইয়া না ফেলিলে, আত্মশক্তি সংঘবদ্ধ বিজড়িত না হইলে, একটা জাতিই সংগঠিত হইতে পারে না—স্বাধীন হওয়া ত দূরের কথা।

কোন জাতি যখন হীনতার পঙ্কে ডুবিয়া যাইতে থাকে তখন বোঝা যায়, তাহার আত্মসম্মান-বোধ লোপ পাইয়াছে—তাহার ব্যক্তিত্বে ঘুণ লাগিয়াছে। আত্মসম্মান-বোধ না হইলে নিজের জাতিকে বড় বোধ হয় না। এই বোধই সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বাভাস।

***

২। দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি

আমরা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ইতিহাস সম্বন্ধে নিতান্তই অজ্ঞ। কোন্ প্রদেশে কি কি বিষয়ের আন্দোলন, অনুষ্ঠান চলিতেছে, কিরূপ লোকের চেষ্টায় সেগুলি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সেখানে সরকারী ও বেসরকারী কি কি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান, ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান আমাদের খুব কম লোকেরই আছে। হয় ত নিজের প্রদেশেরও সব বিষয়ের খবর আমরা রাখি না। সেই জন্যই, দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক সময়েই বস্তু তন্ত্র হীন হইয়া পড়ে। বিদ্যালয় সে সব শিক্ষাদানের ভারগ্রহণ যখন করিতেছে না, তখন অভি-ভাবকদিগের একটু চেষ্টা করিয়া সেই সব তথ্য সংগ্রহ করা উচিত এবং সংগ্রহ করিয়া ছেলেদিগকে শিক্ষা দিলে উপহাসাস্পদ অজ্ঞতা হইতে তাহারা রক্ষা পাইতে পারে। এইরূপ শিক্ষা দিবার জন্য দেশের কেহ কেহ তথ্য সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ইতিহাস শিক্ষা-প্রণালী এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার বসুর কংগ্রেস ডায়ারী এতদ্বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুরেন্দ্র বাবু কেবলমাত্র বঙ্গদেশের বর্ত্তমান ইতিহাস কিরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় তাহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন, এবং বসু মহাশয় ভারত-বর্ষের ও ভারতের বাহিরের অনেক খবর তাঁহার ডায়ারীতে লিপিবদ্ধ করিতেছেন। সেই ডায়ারীর সাহায্যে ইতঃপূর্ব্বে আমরা অন্ধ্র প্রদেশের আন্দোলন প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অদ্য দাক্ষিণাত্যের শিক্ষা বিষয়ক কিছু তথ্য তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সমিতি তাঁহাদের কাজ করিতেছেন। এই

শিক্ষা-সমিতিই দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। একটী প্রথম শ্রেণীর আর্টকলেজ, ২টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটী প্রাথমিক স্কুল এই সমিতির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। সাড়ে তিন হাজারের অধিক ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছে। ১২৫ জন অধ্যাপক ও শিক্ষক শিক্ষাদানের নিমিত্ত প্রস্তুত রহিয়াছেন। বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকার হইতেও সাহায্য লওয়া হয়। বিদ্যালয় গৃহগুলি শিক্ষা সমিতির নিজস্ব সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের সীমার মধ্যে ছাত্রদিগের খেলিবার জন্য বিস্তৃত মাঠ রহিয়াছে। কলেজের ও বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত পুস্তকাগার (Library) আছে এবং বিজ্ঞানাগারে আজ পর্য্যন্ত শিক্ষা দিবার জন্য সকল প্রকার সরঞ্জাম রহিয়াছে। তাহার মূল্য ১,৭৫,০০০ হাজার টাকা। ইহা সমিতির অস্থাবর সম্পত্তি।

যে সময় পুণাতে শ্রীযুক্ত মহাদেও বল্লাল নাম যোশী ও স্বর্গগত বিষ্ণুকৃষ্ণচিপলুনকর মহাশয়দ্বয়ের সমন্বয়ে নিউ ইংলিশ স্কুল (New English School) প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় দেশমান্য শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক ও তাঁহার স্বর্গগত সহপাঠী অধ্যাপক জি, জি, আগারকর উভয়ে একটী বে-সরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার নাম ফার্গুসন কলেজ। ইহাকে চিরস্থায়ী করিয়া সর্ব্বত্র ইহার উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত ১৮৮৪ সালে কর্ত্তৃপক্ষগণ এই দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সমিতি স্থাপন করেন। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অর্থ সাহায্য দ্বারা ও সমিতির সঙ্গে যোগ রাখিয়া স্কুল ও কলেজ স্থাপন দ্বারা শিক্ষার পথ সুগম করা এবং সাধারণে প্রচার করা। সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বৎসর পূর্ব্বোক্ত ফার্গুসন কলেজ হইতে এফ্ এ পরীক্ষার জন্য বোম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছাত্র প্রেরিত হয়। উহার সাত বৎসর পর বি, এ, ক্লাশের সমস্ত বিষয় পড়াইবার বন্দোবস্ত হয়। সমিতির উন্নতির সময়ে স্রোতে পুণানগরকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছিল।

পৃষ্ঠপোষক, সদস্য সেবক সভা এবং অবসর প্রাপ্ত সভ্য লইয়া দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি গঠিত। সমিতির পরিষদ যাঁহারা একহাজার টাকা দান করেন তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠপোষক এবং যাঁহারা দুইশত টাকা দান করেন, তাঁহাদিগকে সদস্যরূপে নিযুক্ত করেন। যাঁহারা সমিতি হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়া বিদ্যালয়ের জন্য ২০ বৎসর কাজ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তাঁহারাই সেবক-সভ্য হইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে এই সেবক-সভ্য হইয়া অনেক কাজ করিতেছেন। প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হওয়ার পর তাঁহারা সমিতির কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং সদস্যগণের ন্যায় ক্ষমতা ও সুযোগ লাভ করেন। দেশপূজিত তিলক ও পরলোকগত গোখলে ইহার অবসর প্রাপ্ত সেবক সভ্য ছিলেন। বিদ্যালয় পরিচালন জন্য একটী পরিষদ, একটী শাসন-সমিতি এবং সেবক-সভ্যদিগের একটী সভা রহিয়াছে। সমিতির কার্য্যকরী সেবক সভ্যগণ, নির্ব্বাচিত সভ্যগণ এবং পৃষ্ঠপোষক। সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত সেবকগণ হইতে কয়েকজন লইয়া পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

ছাত্রবেতন, সরকারী সাহায্য এবং সাধারণের দান পাইয়া সমিতির অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলি চলিতেছে। সরকার পরিচালিত বিদ্যালয় ও কলেজ হইতে বেতন কম হইলেও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের

ছাত্রদিগের বেতন হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের জন্য সরকারী সাহায্য ব্যতীত বিদ্যালয়ের পাকাবাড়ী তৈয়ারী এবং আসবাব ক্রয়ের জন্য সময়ে সময়ে সরকারের দান পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত সমিতি ভারতীয় রাজন্য-বর্গের নিকট হইতে এবং দাক্ষিণাত্যবাসী ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতেও দান লইতে ছাড়েন নাই। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণ যদিও সাধারণতঃ দরিদ্র, তথাপি তাহারা এই সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্যদানে কুণ্ঠিত নহে।

* *
*

৩। অর্থাভাব মোচনের উপায়

যে কারণেই হউক আমাদের দেশ অর্থের কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন সেই জন্যই আমাদের স্বাস্থ্য সুখ আমোদ আহ্লাদ ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই প্রায় বিপর্য্যস্ত। বর্ত্তমান জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে অর্থের একান্ত প্রয়োজন, একথা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু অর্থ কিরূপে আসে, তাহার উপায় চিন্তা খুব কম লোকেই করিয়া থাকেন। মামুলী রাস্তায় চলিয়া অর্থোপার্জ্জন যখন কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে, তখন রাস্তা বদলাইতে হইবে। কিন্তু কি ভাবে তাহা হয়, তাহার জন্য চিন্তা করিবার সময় কি এখনও আসে নাই? অশিক্ষিত যাহারা, তাহারা নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিবে কিরূপে? শিক্ষিতেরা তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের শিক্ষা ও চিন্তা দ্বারা তাহাদিগকে বলে টানিয়া কার্য্যে না লাগিলে, অর্থাভাব মোচনের আশা সুদূর-পরাহত।

কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন অর্থনীতির চর্চ্চা স্বাধীনভাবে আরম্ভ করিবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে। সেই চর্চ্চা কিরূপ-ভাবে করা আবশ্যক, এতৎসম্বন্ধে পরলোকগত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মত প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"এতদিনকার প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াও আমাদের অর্থনীতিক সাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র। ভাষার বিকাশ সম্বন্ধে চৈনিক ও জাপানী ভাষা সভ্য জগতের বহির্দ্বারে বাস করিলেও অর্থনীতি সম্বন্ধে উভয় ভাষাতেই বহুগ্রন্থ অনূদিত ও রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষা য়ুরো-ভারতীয় (Indo-European) ভাষাসমূহের মধ্যে একটি প্রধান ভাষা; জনসংখ্যার হিসাবে ধরিলে ন্যূনাধিক সপ্তকোটি লোক এই ভাষায় কথা বলে, সমাদরের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা বিশ্বের সভায় নোবেল্ পুরস্কারে সমাদৃত হইয়াছে; সুতরাং কোনো দিক দিয়াই ইহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখা চলিতে পারে না। অর্থনীতিবিজ্ঞানের উপযোগী শব্দের অভাব হইবে এরূপ আশঙ্কা অমূলক। সংস্কৃত-রত্নাকর ছাড়া উর্দ্দু, ফার্সি শব্দসমূহ আমরা অবাধে লইতে পারিব; আবশ্যক হইলে নূতন শব্দ রচনা করা যাইতে পারে, নিতান্ত শ্রুতিকটু না হইলে ফরাসী, ইংরেজী, জার্ম্মান ও ইটালীয় শব্দও প্রচলনের চেষ্টা করা যাইতে পারে। এজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ যাহাতে অবিলম্বে একটি "অর্থনৈতিক শাখা" স্থাপিত করেন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে এই শাখার সভাপতি করিলে সমীচীন হইবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার (যশোহর), এই সভার সহকারী সভাপতি অথবা সম্মানিত সভ্য

থাকিলে খুব ভালো হয়। শীল মহাশয়ের প্রতীচ্যভাষায় জ্ঞান, রায় মহাশয়ের ব্যবসাং-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও শব্দজ্ঞান, ও মজুমদার মহাশয়ের প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষামূলে ব্যুৎপত্তি অর্থনীতিসম্বন্ধীয় পরিভাষা সৃষ্টি করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। সার্ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় কর্ম্মীলোকের সহযোগিতাও একান্ত আবশ্যক। বাঙ্‌লাদেশের মধ্যে ও বাহিরে বিভিন্ন কলেজে যে-সকল বাঙালী অধ্যাপক অর্থনীতি পড়াইতেছেন তাঁহাদের এই সভার সভ্য হইতে নিমন্ত্রণ করা হউক। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা স্বাধীনভাবে অর্থনীতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন তাঁহাদের উপযোগিতা সাদরে আহ্বান করা হউক। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে যেমন পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী যুবকদিগের একটি মণ্ডলী রচিত হইয়াছে, আচার্য্য প্রফুল্ল-চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া যেমন রাসায়নিকমণ্ডলী পুষ্ট হইতেছে, তেমনি আচার্য্য যদুনাথ অথবা তত্তুল্য কাহাকেও মধ্যস্থরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থনীতির অনুশীলনে একদল যুবককে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত উক্ত যুবকদিগকে কামার কুমোর তেলি মুদী মাঝি মজুর কাঁসারি শাঁকারি তাঁতি গন্ধবণিক জেলে চাষা প্রভৃতির সঙ্গে মিশিতে হইবে, এবং তাহাদের ব্যবসায় ও জীবনযাত্রার বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিতে হইবে। বঙ্গের বিভিন্ন অংশ হইতে এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহার সার সঙ্কলন করিতে হইবে। এই সকল লোকের মধ্যে কি পরিমাণ শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে ও অন্ততঃ আরো কতটুকু হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পসময় শ্রম করিয়া অধিকতর অর্থ-উপার্জ্জনে ইহারা সমর্থ হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র অর্থনীতি অধ্যয়ন করিতেছেন তাঁহারা অবকাশমত শ্রমজীবীদের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে তাঁহাদের ইজ্জৎ যাইবে না। ভারতের কোটি কোটি নরনারী সহানুভূতি ও শিক্ষার অভাবে নিতান্ত হীন-ভাবে দিন যাপন করিতেছে; উহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার জন্য আমরা অংশতঃ দায়ী। উহাদের অপরিচ্ছন্নতা ও আনুষঙ্গিক ব্যাধি দূর করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারি। পথে, রেলে, নৌকায় ও ষ্টীমারে সময়ে সময়ে যখন আমরা ইহাদের কাছে পাই তখন শুচিতর, উচ্চতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ইহাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারি। শুধু বৈজ্ঞানিকের মত অর্থনীতির 'থিওরি' লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিলে চলিবে না। ভারতে অর্থ-নীতির চর্চ্চার অর্থ এই, যে, দিন দিন ভারত-বাসী সুস্থতা ও সচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া উদার জগৎ-সভ্যতার মাঝখানে আপনার বিশিষ্টসভ্যতার আসনখানি অম্লানমুখে দাবি করিবে। কয়েক সহস্র বা কয়েক লক্ষ শিক্ষিত লোক লইয়া বাঙ্‌লাদেশ বা ভারতবর্ষ নহে। যে পরিমাণে আমরা আমাদের চতুষ্পার্শস্থ অসহায় নরনারীকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের আস্বাদনসুখে সুখী করিতে পারিব সেই পরিমাণে আমাদের অর্থনীতির অনুশীলন সার্থক হইবে। অর্থনীতি পাশের মাত্র, উদ্দিষ্ট তীর্থ নহে; একথা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখিতে হইবে।

বাঙ্‌লাদেশে ও উহার বাহিরে আজকাল কলের ছড়াছড়ি। বহুসংখ্যক পুরুষ ও নারী এই সকল কলে কাজ করে। অনেক স্থলে এই সকল কল য়ুরোপীয়দের সম্পত্তি; তথাপি

ইচ্ছা করিলে যুবকগণ এই সকল কলবাড়ী দেখিয়া আসিতে পারেন এবং তাহার বিবরণ কাগজে প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রমজীবিগণ প্রত্যহ কয় ঘণ্টা খাটে ও কি হারে মজুরী পায়; কলঘরে আলো ও বাতাস আসে কি না; ঘরের মেঝে শুষ্ক কিংবা স্যাঁতানে; পুরুষ ও স্ত্রীলোক একসঙ্গে কাজ করে কি না; তাহাদের নৈতিক অবস্থা কিরূপ; গর্ভবতী ও দুগ্ধপোষ্য-সন্তানবতী নারী কাজ করে কি না; সন্তানবতী সন্তানকে কোথায় রাখিয়া আসে; ইহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্রাম-গৃহ ও পায়খানা আছে কি না; শ্রমজীবি-গণের মধ্যে সাক্ষরতা কতজন পড়িতে পারে; নিকটে ডাক্তিখানা আছে কি না; কতদূর হইতে ইহারা কাজে আসে; প্রত্যেক পুরুষের সাপ্তাহিক আয় ও তাহার পরিবারের ব্যয়ের আভাস; তাহারা কি কি সামগ্রী আহার করিতে পায় ও তাহাদের প্রত্যেকের কয়খানি কাপড় ও জামা আছে; জুতা থাকিলে কয় জোড়া; পুত্র কন্যা থাকিলে তাহারাও কাজ করে কি না; সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক মজুরের বয়স (বালক অথবা বালিকা); নিকটে নৈশ বিদ্যালয় আছে কি না; শ্রমজীবীদের মধ্যে কতজন সেখানে গিয়া থাকে; বৎসরের মধ্যে রবিবার ছাড়া আর কত দিন তাহারা ছুটি পায়; ছুটির সময়ে তাহারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে কি না; বার্ষিক আয়ব্যয়; প্রধান প্রধান রোগ, ও তাহার চিকিৎসার উপায় ও ব্যয়। ইহা ব্যতীত আরো অনেক বিষয়ে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া নোট লইতে পারেন। বলা বাহুল্য যতক্ষণ তাঁহারা কলবাড়ীতে থাকিবেন অন্ততঃ ততক্ষণ কোনরূপ প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিবেন না, এবং বাহিরে আসিয়া ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে, বিশেষ কারণ না ঘটিলে, সাধারণভাবেই আলোচনা করিবেন; নতুবা অন্যান্য ছাত্রের পক্ষে প্রবেশলাভ কঠিন হইবে। এই সকল শ্রমজীবীদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিবার প্রকৃষ্ট স্থান গ্রাম্য হাট ও বাজার। গ্রীষ্মের ও পূজার ছুটিতে ও অন্যান্য অবকাশ-কালে ছাত্রগণ ইহাদের নিকট তাহাদের জীবনের আদর্শ স্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

শ্রমজীবীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারচেষ্টা একান্ত আবশ্যক। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে চেষ্টা বেশ অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু বিরাট ভারতবর্ষের পক্ষে উহা অতি সামান্য; এই চেষ্টা বিস্তৃতি হউক; তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে শ্রমজীবীদের উপযোগী মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক কাগজ প্রচলন সম্ভবপর হইবে। স্বাস্থ্য, নীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ সহজ ভাষায় লিখিত হইতে পারিবে ও তাহা দ্বারা জগতের আধুনিকতম সভ্যতার সহিত ইহাদের পরিচয় সম্ভবপর হইবে।

কৃষকদের নিকট আধুনিক চাষপদ্ধতি ও যন্ত্রব্যবহার সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে এবং এ বিষয়ে বাঙ্‌লা সাপ্তাহিক কাগজে সহজ প্রবন্ধাদি লিখিতে হইবে। জমীদারগণের খাসে যে সকল জমী আছে তাহাতে আধুনিক উপায়ে চাষ আরম্ভ করাইয়া দৃষ্টান্ত দেখাইলে খুব ভালো হয়। যৌথ কারবারসমূহের কার্যপ্রণালী, আয়ব্যয় প্রভৃতির বিবরণ মধ্যে মধ্যে বাঙ্‌লায় মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইলে ভালো হয়। যাত্রা, পাঁচালি ও কথকথায় শুধু স্বদেশ-প্রেমের বাষ্পের উৎস খুলিয়া না দিয়া কাজের কথা

প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সর্বপাপে অন্নসংস্থান পার্থিব জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কথা।"

* *
*

৪। গ্রন্থ বিক্রয়-ব্যবসা

আমরা বাঙ্গলা দেশের যতটুকু খবর রাখিয়া থাকি তাহাতে জানি দেশীয় পুস্তক ব্যবসায়ীরা, শিক্ষা-প্রচার ও গ্রন্থের বিক্রয় বৃদ্ধি এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। ব্যবসাক্ষেত্রে সদ্ব্যবহার দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকিলেও, দীর্ঘকাল চলিত পথে অভিজ্ঞতা দ্বারা একটা নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এক সময়ে কিছু টাকা খরচ করিয়া অনেকগুলি পুস্তকের তালিকা (catalogue) ছাপান হইয়া থাকিল। সেইগুলি নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বেই কতরকমের নূতন বই বাজারে বাহির হইয়া যাইতেছে। কখন কখন, পুরাতন ভাঙ্গাবাড়ীর সদর দরজার উপর গণেশের মূর্ত্তির মত মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনভাগে ২ ৪ খানি নূতন পুস্তকের নাম দেখা যায়। সেই সকল পুস্তকের অনেকগুলির নাম যেন কয়েক সপ্তাহের মধ্যই দেখা দিতে উচিত হয়। ইহাতে সকলের ভাগ্যে তাহাদের নাম পাঠ করা বা স্মরণ রাখা সম্ভবপর হয় না।

আমাদের দেশে সাহেব পুস্তক ব্যবসায়ীরা কিছুদিনের জন্য একটা স্থায়ী পুস্তক-তালিকা (catalogue) বাহির করিলেও নূতন বই প্রকাশিত হইবামাত্র তালিকার সঙ্গে ক্রোড় পত্রে, অথবা পৃথক কাগজে, নব প্রকাশিত পুস্তকের যথাযথ বিবরণ গ্রাহকের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাতে দেশের লোক বিলাতী গ্রন্থের বিষয় বেশী খবর রাখিতে পারে এবং সাহেব ব্যবসায়ীদিগের প্রতি সমধিক সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে।

নিত্য নূতন খবর দেওয়ার ও গ্রাহকদিগকে জানাইবার নিমিত্ত পুস্তক ব্যবসায়ীদিগের একটা ব্যবস্থা করা উচিত। প্রত্যেক দোকানের সম্মুখে লোক যাতায়াতের পথের ধারে—গ্রন্থকর্ত্তা ও প্রকাশকের নামসহ নূতন পুস্তকের নাম লিখিয়া রাখিলে সাধারণের নিকট সহজ প্রচারের বোধ হয় একটা পন্থা হইতে পারে। বাঙ্গলা দেশে প্রতিমাসে যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহাদের তালিকা প্রতিমাসে বাহির করিয়া গ্রাহকদিগকে বিতরণের ভার যদি কোন পুস্তকব্যবসায়ী গ্রহণ করেন, তাহা হইলেও বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। এইরূপ উপায় সকল গৃহীত হইলে পুস্তকের বাজারে নাম রটাইবার জন্য ভালমন্দ উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর লেখকই কলম ধরিবেন, ইহাতে গ্রন্থকার, পাঠক, গ্রন্থবিক্রেতা ও ব্যবসা সকল দিকেই লাভ হইবে। নিত্য নূতন গ্রন্থরচনা দ্বারা মাতৃভাষাও বহুল প্রচারিত এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবে। তালিকার সঙ্গে প্রত্যেক পুস্তকের ভাল ভাল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেও ভাল হয়। দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের তালিকা ও প্রচারপ্রণালী সাহেবী ধরণে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের ব্যবসা শিক্ষাপ্রচার কার্য্যের সহায়ক এই জন্যই আমরা এই কয়টি কথা উল্লেখ করিলাম।

* *
*

৫। ব্যবসায়ে বাঙ্গালী

নিখিল ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাইর পার্শীগণ ব্যবসাক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অগ্রণী, আর বাঙ্গালী ঠিক তাহাদের বিপরীত। বাঙ্গালী আজকাল ব্যবসাক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর

হইতেছে। ইহা আমাদের সুখের বিষয় ও উন্নতির চিহ্ন বলিয়া গৌরব করি। অন্য দেশের লোকেরা ভাবিবে বাঙ্গালী এইমাত্র ব্যবসা করিতে শিখিতেছে। এখন ইহার শিশুকাল চলিতেছে। আমরা বর্ত্তমানে যে, ব্যবসাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। লোকের হাসি ঠাট্টা ঠেলিয়া আগু যাইতে হইলে, ঐকান্তিকী সাধনার প্রয়োজন। প্রথমতঃ—এখন আমাদের অনুকরণ যুগ চলিতেছে। পাশ্চাত্য দেশের বণিকগণ যে ভাবে বড় রকমে (Large scale) ব্যবসা আরম্ভ করেন, আমরা ভাবি ঐরূপ না করিলে বড় হইতে পারিব না। টেবিল চেয়ার না হইলে আমাদের দোকানে গ্রাহক ঘেঁসে না। সাহা, তিলী প্রভৃতি গাদিয়ানাকে আমরা ঘৃণা করিয়া থাকি। তবে এটা সত্য, বড়রকমে কারবার দিলে বা শিল্পকর্ম্মের প্রতিষ্ঠান হইলে অধিকাংশ লোকের সহানুভূতি পাওয়া যায় এবং অন্নসংস্থান হয়। দ্বিতীয়তঃ ইউরোপীয় বণিকদিগের মত যৌথ কারবারের ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা পাঁচজনে কারবার আরম্ভ করিলে দৃষ্টি থাকে কতক্ষণে মূলধন এদিক সেদিক করা যায়। একটা অব্যাহতির দিকে মোটেই লক্ষ্য থাকে না। তাহারা মনে করে এও একটা ব্যবসা, যে যত আগে ঠকাইতে পারে, এবং সেই বেশী বুদ্ধিমান। সততা গুণটা ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। যতদিন না আমাদের ঐ গুণটা আসে ততদিন একক ব্যবসাই সুখকর ও লাভজনক মনে করি। অনেক সময়ে কর্ম্মচারীদের দ্বারাও সব নষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্যদেশে যাহারা ব্যবসাবিষয়ে অভিজ্ঞ তাহারাই ব্যবসার পরিদর্শন ও পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। আমরা ব্যবসা আরম্ভ করিয়াই দেখি, বারিষ্টার, উকীল, মোক্তার কতজন জুটিয়াছেন, এবং তাঁহাদের উপরই ব্যবসার সমস্ত ভার দেই। আমরা ঠিক করিয়া লইয়াছি, উকীল, বারিষ্টার ছাড়া দেশে বুদ্ধিমান লোক আর নাই। আছে কিনা খোঁজও করি না। উকীলী ও বারিষ্টারি পরীক্ষাতে যদি ব্যবসার গুপ্ত রহস্য (Trade Secret) বা সাধারণ নিয়মসমূহ শিখান হইত তাহা হইলে তাঁহাদের উপর ভার দিলে মন্দ হইত না। সুতরাং ব্যবসা বিষয়ে আমরা এখনও যে ধূলিখেলার স্তরেই আছি সে বিষয় বলাই বাহুল্য। চতুর্থতঃ যখন কোন ইউরোপীয়, কোন জিনিষ প্রচলন করিয়া বেশ সুফল পাইলেন তখন তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগে কি করিলে আমার ব্যবসা বড় হইবে। তিনি হয়ত যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকেন সেটা তাঁহার পরিশ্রমের সুফল। আমাদের দেশের জিনিষ নির্ম্মাতা যখন কোন একটা জিনিষ বাজারে বেশ কাটতি হইল মনে করেন অমনি দ্বিগুণ লাভ করিয়া রাতারাতি বড় হইবার জন্য খারাপ জিনিষ মিশ্রিত করিয়া মাল চালাইতে থাকেন। আজ, জুয়াচুরি বেশীদিন গোপন থাকে না। ইহার ফলে পরবর্ত্তী ব্যবসায়ীদিগকে তাঁহাদের পাপের ফল ভোগ করিতে হয়। এই সব অসদ্ব্যবহারের জন্য অনেকে দেশী জিনিষের পক্ষপাতী নন। মন্দজিনিষ দেশের তৈয়ারী হইলেও ভাল, অথবা সম্পূর্ণ দেশী না হউক, যাহা হয় তাই লাও, এখনও কি আমাদিগকে ঐরূপ ভাবিলে চলিবে? ১৩১২ সাল হইতে আজ একাদশবৎসর কাল পর্য্যন্ত দেশী জিনিষ চলিতেছে—পরীক্ষার সময় (Experimental period) চলিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ লইয়া ঐরূপ

করিলে, যেন ছোবড়া লইয়া মারামারি হইল মনে হয়। দেশী জিনিষ দেখিয়া না মজিয়া, উহাকে সরস ও সজীব করিবার জন্য লইব না বলিয়া ভেদ করা উচিত। জোর না করিলে চিরদিন জিনিষগুলি ঐরূপই থাকিয়া যাইবে ভাল করিবার জন্য কাহারো আগ্রহ জন্মিবে না। "জরাসন্ধ দেহমত অর্দ্ধবিঘটিত" জিনিষকে যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করাই ভাল। চিরদিন পরের দিকে চাহিয়া থাকিলে নিজেরা বড় হইব কবে? বাঙ্গালী এখনও বিদেশী মাল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যায়। বাঙ্গালীর শিল্প এখনও বাঙ্গলার বাজারে সুখ্যাতি লাভ করে নাই। সে দিন এখনও বহুদূরে, যে দিন বাঙ্গালীর শিল্প সরসতা ও সজীবতা লাভ করিয়া বিদেশে প্রেরিত হইবে। সেই আমরা কবে আবার যবদ্বীপ, বলী, জাপান, চীন, আরব, মিশর ও লেকেন্ড্রিয়ার বাজারে মাল লইয়া গমন করিব? কিন্তু যাক, সে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলাম। এখন নিজের দেশের চিত্তসম্মোহন আগে করা কর্ত্তব্য। ব্যবসায়ীরা কিরূপে শিল্পোন্নতি করিতে পারেন, কিরূপে উন্নতশিল্পের জিনিষ সুলভে বিক্রয় করিতে পারেন, তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার সময় তাঁহাদের এখন আসিয়াছে। আর ত জার্ম্মানী ও জাপানী জিনিষের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিলে চলে না।

* *
*

৬। শিশুপত্রিকা

পূর্ব্বে আমরা শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। আজ শিশুদিগের নিমিত্ত পত্রিকার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলিব।

আমাদের দেশে আজকাল সাপ্তাহিক ও মাসিক এবং দৈনিক পত্রের সংখ্যা কম নহে। দেশে পত্রিকার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে এবং পত্রিকা যত বেশী কাটতি হইবে, ততই সহজে লোকের মধ্যে শিক্ষা-প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবে। আজকাল দৈনিক পত্রিকা ৩।৪ খানা বেশ প্রতিষ্ঠার সহিত চলিতেছে। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রও বেশ চলিতেছে। মাসিক পত্রের সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ নয়। মাসিক পত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। একটী বয়স্থ শিক্ষিত লোকের জন্য এবং ২য়টী শিশুদিগের জন্য। এই প্রসঙ্গে শিশুপত্রের সম্বন্ধে বক্তব্য এই :—অনেকে বালকদিগের শিক্ষাকে সহজ করিবার জন্য এবং তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়কে কৌতুকপূর্ণ করিবার নিমিত্ত মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেক স্থলে তাহা সহজবোধ্য হয় না, কোন কোন পত্রিকাতে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। সেইগুলি শিশুদিগের কেন, বৃদ্ধদিগেরও রুচিকর না হইবারই কথা। শিশুদিগের চিত্তকে সরস করিবার জন্য কোন সম্পাদক বিশেষ যত্ন লইতেছেন না বলিয়াই মনে হয়। তাহাদের চিত্তকে এখন হইতে যে পথে চালিত করা যাইবে সেই পথেই চলিতে থাকিবে। তাহাদের হৃদয় যাহাতে উচ্চভাবের আধার হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহাদের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত এবং চরিত্রকে উন্নত করিবার জন্য উপযুক্ত বিষয়ের প্রবন্ধ ও কবিতা লেখা উচিত। এতদিন যাবৎ দেশ যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহাকে নূতন পথে লইতে হইলে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। অনেক সময় সহানুভূতির মাত্রা কমিয়াছে বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু তা বলিয়া যথার্থ শিশু-শিক্ষকদিগকে বিমুখ হইলে চলিবে না।

আমাদের মনে হয় শিশুপত্রিকা সম্পাদক মহাশয়গণ তাঁহাদের পত্রিকাগুলিকে একটু নূতন নিয়মে পরিচালন করিলে, অনেক সুবিধা হইবে। শিশুচরিত্র গঠন করিবার জন্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বিশেষ উপযোগী।

অনেক পত্রিকাতে প্রাচীন কালের লোক চরিত্রও দেখা যায়। সেই সকল চরিত্রের বিশেষত্ব শিশুর নিকট সহজবোধ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুদিগের উপযোগী রামায়ণ ও মহাভারত বাহির হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই গুলি আজকাল পরিবারের আদর্শ পুস্তক নয়। বাল্মীকি উপস্থিত না হইলে হিন্দুর সংসারে সেইগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই মনে হয় না। কাজেই মাসিক পত্রে সেই গুলিকে নূতন ভাবে দেখিলে আনন্দ হইবে। দধিচী ও কচের আত্মত্যাগ, ইন্দ্রজিত অভিমন্যুর বীরচরিত্র, হিন্দুবালকের নিকট উপেক্ষিত হইতে চলিয়াছে। লক্ষ্মণের নিঃস্বার্থ ভক্তি শিক্ষা করিবার সুযোগ ছাত্রদিগের নিকটে খুব কমই উপস্থিত হয়। জগদ্বিখ্যাত কর্ম্মীদিগের জীবনী, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন, এইগুলিই প্রকৃত ইতিহাস। রাজাদের জীবনী ও প্রাচীনকালের লড়াইয়ের ইতিহাস শিশুদিগের চরিত্রে কোন কাজ করিবে না। এই সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধকে উপন্যাসের ভিতর দিয়া চালাইলে বেশ সুন্দর হয়। শিশুগণও আমোদ পায়। আমাদের দেশে বৃদ্ধদিগেরও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িবার ইচ্ছা এখনও প্রবল হয় নাই। প্রবন্ধগুলিও সরস হইয়া লিখিত হয় না। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়িবার জন্য সাধারণের নিমিত্ত শিশুপত্রিকার শ্রেণীর একখানা প্রকাশিত হইলেও মন্দ হয় না। শিশুদিগের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখক এখনও বাহির হন নাই। যাহা হউক, যে কয়েকখানি শিশুপত্রিকা চলিতেছে, সেইগুলি একটু ফিরিয়া দাঁড়াইলেই কাজ হইবে। ইহা সম্পাদক মহাশয়দিগের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

* * *

৭। মহীশূর অর্থনৈতিক সম্মিলন

দেশের চারিদিকে এখন নানাপ্রকারের সম্মিলন বসিতেছে। ইহা একটী সুলক্ষণ। কোন একটী ভাল কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক আলোচনা ও বিবেচনার প্রয়োজন। উপায় ও পন্থা সুন্দরভাবে নিরূপণ করিয়া কাজে নামা উচিত। নচেৎ বহু বাধা বিঘ্ন আসিয়া জুটে, এমন কি অনুষ্ঠানটী পর্য্যন্ত পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। 'সম্মিলন'-গুলিতে দেশের ভাবুক ও কর্ম্মাভিলাষিগণ মিলিত হইয়া কাজ ও তাহার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইহাই প্রত্যেক অনুষ্ঠানের প্রথম সোপান। দেশের জনসাধারণ সম্মিলনের বক্তৃতা ও নির্দ্ধারণ হইতে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। শিক্ষাবিস্তার, ভাবপ্রচার, জ্ঞানবিস্তার প্রভৃতির জন্য সম্মিলন নিতান্তই আবশ্যক। আর আমাদের দেশে পরস্পরের মেসা মেশা, একত্র জুটিয়া দেশের ও দশের হিতচিন্তার সুযোগ যেরূপ অল্প, তাহাতে সম্মিলন যত বেশী ও যত প্রকারের হয় ততই মঙ্গল। কোন মহদ্ভাব ও মহৎ চিন্তার প্রেরণা না থাকিলে বহুলোক প্রাত্যহিক জীবনের স্বার্থ ও ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া এক উদার ও বিস্তৃত ক্ষেত্রে আসিয়া জুটিতে পারে না। তাই সকলেরই বুঝা উচিত সম্মিলনগুলির পশ্চাতে কোন না কোন উদার ও নৈতিক শক্তি (moral force) কাজ করিতেছে। আমরা হাতে হাতে ফল না পাইয়াও

সম্মিলনে বিশ্বাস হারাই নাই। এই খানেই আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র। আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তা, শ্রেষ্ঠ ভাব, শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য পরিস্ফুট হইবার সুযোগ সম্মিলনে। যে সংহতি শক্তির দৈন্য আমাদিগকে সকল বিষয়ে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে তাহার পুষ্টি ও বিকাশের অবসর আমরা সম্মিলনেই পাইতে পারি।

সম্প্রতি মহীশূরে 'অর্থনৈতিক সম্মিলনের' (Economic conference) এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শৃঙ্খলা ও সুবিধার জন্য সম্মিলন কয়েক শাখায় বিভক্ত করা হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মুমূর্ষু শিল্প বাণিজ্য যাহাতে আবার বাঁচিয়া উঠিতে পারে, অর্থহীন, অন্নহীন দেশবাসিগণ পুনরায় সমৃদ্ধির সাক্ষাৎ পায়, তাহার জন্য শিল্প-বাণিজ্য শাখায় কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শিল্প বিষয়ে আমাদিগকে অন্য কোন উন্নত জাতির অনুকরণ করিতে হইলে প্রাচ্য জাপানই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। মহীশূর রাজ্যের একজন রাজকর্ম্মচারীকে সেই নিমিত্ত জাপানে শিল্প শিখিতে পাঠান হইবে। বস্ত্রশিল্প অনতিকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল। বস্ত্রশিল্প ভারতবর্ষের মস্ত গৌরবের জিনিষ। বহুলোক ইহার কল্যাণে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাইত। কিন্তু এখন সেই বস্ত্রশিল্প মুমূর্ষু। ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা সুসংস্কৃত ও অধিকতর কার্য্যোপযোগী করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দেশের অসংখ্য তন্তুবায় বস্ত্রশিল্পী অত্যল্পকাল মধ্যে তাহাদের শ্রমশীলতা, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গুণের সাহায্যে আবার আপনাদের প্রণষ্ট গৌরব ও সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিবে। ইউরোপেও যন্ত্রবিজ্ঞান এইরূপে শ্রমশিল্পের সহায়তা করিয়াছে।

শিল্প-বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটী বিভাগ খুলিতে হইবে। দেশে কিরূপ শিল্পের সুবিধা আছে, কোন্ জিনিষের কাটতি সম্ভব, কোন্ শিল্প আধুনিক উপায়ে পুনঃ সংস্কৃত করা, নূতন জ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন প্রণালী উন্নত ও বলিষ্ঠ করিয়া তোলা প্রয়োজন, কিরূপ কাঁচা মাল (raw material) দেশে মজুত রহিয়াছে এবং তাহা কি উপায়ে কাজে লাগান যাইতে পারে প্রভৃতি বিষয়ে সঠিক সংবাদ লইতে হইবে।

শিল্পীদিগকে ভাল করিয়া শিল্প শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। উন্নত-প্রণালীতে বস্ত্রবয়ন ও সূত্রধরের কাজ শিখাইবার জন্য সর্ব্বত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। প্রধান প্রধান ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে সংবাদ সংগ্রাহক রাখিতে হইবে। বণিক সভা (chamber of commerce) সংগঠন, ঋণদান সমিতি, ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা সমিতি স্থাপন, দেশের বিদ্যালয় ও কার্য্যালয়-সমূহে সেভিংস্ ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার, চারিদিকে ধর্ম্ম গোলাদির প্রতিষ্ঠা, বড় বড় নগরে শিল্পিটোলা গঠন—এই সকল বিষয়ে সম্মিলনে আলোচনা হইয়াছিল। ব্যবসাদারদিগকে বিদেশ গমনে উৎসাহ দিতে হইবে। ইহাতে তাহাদের চোখ ফুটিবে, পৃথিবীর বিরাট বাণিজ্য বিষয়ক আয়োজন ও অভিজ্ঞান দেখিয়া তাহারা আপনাদের কর্ত্তব্যের স্বরূপ অবধারণ করিতে পারিবে। সাবান, বিস্কুট, ক্রশ, কাগজ, পেন্সিল, বাতি, দিয়াশলাই প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। মহীশূরের প্রত্যেক

জেলায় একজন শিল্পাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন। বাণিজ্য বিষয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা প্রচার ও শিল্পীদিগের উপযোগী পাঠ্য পুস্তক রচনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্থানে স্থানে তাঁত স্থাপন করা প্রয়োজন। ব্যাঙ্গালোর ক্রয় বিক্রয়ের কেন্দ্রস্থান হইবে।

শিক্ষা-শাখায় অনেক দরকারী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাপ্রচার, "অস্পৃশ্য" ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বৃত্তি প্রদান, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য অভিজ্ঞ স্ত্রীশিক্ষকমণ্ডলীগঠন —এই সকল উপায়ের দ্বারা দেশে সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য পুস্তকাগার খোলা আবশ্যক, মহীশূর গভর্ণমেণ্ট—সেগুলিকে অর্থ সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক স্কুল কলেজে শতকরা ত্রিশজন ছাত্র উপযুক্ত বিবেচিত হইলে বিনা বেতনে শিক্ষা পাইবে। শিল্প ও কলা-বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে ছাত্রদিগকে বৃত্তি ও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ইয়োরোপের নানা স্থানে বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষার (College of Commerce) এবং ব্যবহারিক ও শ্রম সম্বন্ধীয় বিদ্যালয় (Technological and Industrial Institute) আছে। ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা ঐ সকল বিদ্যালয়ে পড়িয়া তাদৃশ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। কারণ ইয়োরোপের প্রাকৃতিক বৈষয়িক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক ভারতবর্ষের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক হইতে বিভিন্ন। সুতরাং আমাদের শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার্থীগণের জন্য দেশের অবস্থার উপযোগী শিল্প বাণিজ্য বিদ্যালয় দেশে খুলিতে পারিলেই ভাল হয়। অন্ততঃ বিদেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে শিক্ষার্থীদিগকে তাহাদের দেশের শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে যতটুকু শিখিবার আছে শিখাইয়া লওয়া উচিত। মহীশূরে এইরূপ বাণিজ্য-বিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব হইয়াছে।

ছাত্রজীবনে অনেকেই শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, কোনরূপ ব্যায়াম-চর্চ্চা আদৌ করে না। তাহার ফলে দেহ পুরুষোচিত পেশী শূন্য ও দুর্ব্বল, এবং মন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মহীশূরের বালক বালিকাগণের শরীর সবল এবং শ্রমসাপেক্ষ কর্ম্মের উপযোগী করিবার নিমিত্ত স্কুল ও কলেজে জিউজিৎসু প্রভৃতি ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সম্মিলনের কৃষিশাখায় কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য কতিপয় নির্দ্ধারণ গৃহীত হইয়াছে অভিনব প্রণালী ও যন্ত্রের সাহায্যে কৃষি-প্রধান দেশের কৃষিকার্য্য উন্নত করা একান্ত আবশ্যক। দেশের লোক বিদেশী চিনি খায়। ইহাতে একটী সুন্দর ব্যবসা মাটী হইয়াছে। মহীশূররাজ যাহাতে কয়েকজন কর্ম্মচারীকে জাভা, মরিশস ও ফরমোসায় পাঠাইয়া ইক্ষুর চাষ ও চিনির উৎপাদন সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়গুলি শিখাইয়া আনেন সম্মিলনে সেইজন্য একটী প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

মহীশূর 'অর্থনৈতিক সম্মিলন' এবার হাতে কলমে করিবার মত বিস্তর কাজ আমাদের সকলেরই সম্মুখে ধরিয়াছেন। এখন চাকুরীর মোহ টুটিতেছে। দুর্ভাগ্যের, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর চাবুকও হাড়ে হাড়ে বিঁধিতেছে। আমরাও মুমূর্ষু শিল্পের পুনঃ সঞ্জীবন তথা দারুণ বুভুক্ষাসমস্যার (hunger problem) নিরাকরণ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে হৈ চৈ করিয়া থাকি। এই সম্মিলনের কার্য্যতালিকায় আমাদের শিখিবার জিনিষ অনেক রহিয়াছে।

তবে এখন কথা—আমরা প্রকৃতই কাজ করিতে চাই কি না।

৮। অকালমৃত্যু

প্রায় প্রতিমাসেই আমাদিগকে দেশের কোনও না কোন সুসন্তানের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলিতে হইতেছে। এইরূপে যমদণ্ড সহিয়া আমাদের মত অভাগাজাতি কি করিয়াই বা বড় হইবে? যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলে মার মুখ উজ্জ্বল হইত, লোকের বুকে আশা জাগিত, তাঁহারা এমনি করিয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমাদের অসংখ্য বিড়ম্বনার মধ্যে অকালমৃত্যু এক দারুণ বিড়ম্বনা। এই অভিশাপ বাঙ্গালী জাতির বহু আশা ব্যর্থ করিয়াছে, আমাদের অনেক কাজ ইহাতে পণ্ড হইয়াছে। ৪৪ বৎসর বয়সেই কেশবচন্দ্রের জীমূতনির্ঘোষ নীরব হইয়াছিল। বিবেকানন্দের বীরবাণী ৪০ বৎসর বয়সেই নিস্তব্ধ হইয়াগিয়াছিল। কৃষ্ণদাস, দীনবন্ধু প্রভৃতির দীপ্তি অকালেই নিষ্প্রভ হইয়াছিল। আরও কত জনের কথা মনে পড়িতেছে, কত পুরাণো শোক জাগিয়া উঠিতেছে। আপনার দেশ ও জাতি ভুলিয়া যিনি আকুলকণ্ঠে আমাদের দুঃখিনী মাকে "মা" বলিয়া তাঁহার সেবায় "নিবেদিতা" হইয়াছিলেন, চোখে সত্যই সোণার কাজল পরিয়া যে মনস্বিনী ভারতবর্ষের অসংখ্য দলিতকণ্ঠের মধ্যে শক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, আজ শোকাশ্রুধারার মধ্যে তাঁর নিবেদিতার সেই চিরবন্দনীয় মূর্ত্তিও দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। কয়জনের নাম করিব? এই সুদীর্ঘ শোকাচ্ছন্ন ইতিহাসের কটা কথা এখানে বলিব? ইউরোপে আমেরিকায় লোক যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, আমাদের দেশের কর্ম্মিগণ তখন কার্য্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন! গোখলে, তেলাং ৪৯ বৎসর, ৪০ বৎসর পার না হইতেই স্তূপাকার কর্ম্মরাশি অসমাপ্ত রাখিয়া মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আর প্রায় আশী বৎসর বয়সেও গ্ল্যাডষ্টোন একাকী নির্ভীকহৃদয়ে যুবকের উৎসাহে "হোমরুল বিল্" বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিপুল প্রতিপক্ষ সংহতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরেও ইংরাজ "ছোকরা" থাকে। তখন তাহার যৌবনের তেজ অক্ষুণ্ণ, শক্তি, উৎসাহ ও আশা দুর্দ্দমনীয়। সে তখন জীবনে নূতন আশার ভিৎ গাঁথিতে থাকে, নূতন আকাঙ্ক্ষায় বুক বাঁধে। সে আরও বহু বৎসর বাঁচিবে, আরও কত কাজ তাহাকে করিতে হইবে। বিধাতার তখনও বহু বিলম্ব। রাষ্ট্রনীতি পরিচালকগণ প্রায় সকলেই ষাটের উপরে। তখনও তাঁহারা কেহই বৃদ্ধ নন। আগুনের মত তেজ, সাগরোর্ম্মির মত আশা আর লোহার মত শরীর লইয়া তখন অনেকেই কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কাজে নামেন। আর আমরা? "বল বুদ্ধি ভর্সা—চল্লিশ না হ'তেই ফর্সা।" পঞ্চাশ বৎসরেই সংসারের সব সাধ মিটিয়াছে, সমস্ত আশা নিবৃত্ত হইয়াছে। কোনও মতে শরীরটাকে জোড়াতাড়া দিয়া টিকাইয়া রাখি। বহুমূত্র, অজীর্ণ অম্ল প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া অনেকেই তখন জীবন্মৃত, খাটিবার শক্তি একেবারেই থাকে না, আশার হিল্লোল ভাঙ্গা বুকের এবং ভাঙ্গা শরীরের কাছ দিয়াও বহিতে পায় না। ইহার কারণ কি? কেন এমন হইল? সারাজাতটা কিরূপে মরণাহত, নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল?

(১) দেশ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। দারিদ্র্যের দুশ্চিন্তা, অভাবের জ্বালা, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যতের ভাবনা প্রায় সকলকেই অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি দরিদ্রতা যথার্থই "সর্ব্বশূন্য"—দেশের অর্দ্ধাংশ লোক দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। আর যারা খায় তাহাও অসার, তাহাতে পুষ্টিকর দ্রব্যের ভাগ বড়ই কম। খাঁটি দুধ ঘৃত দুষ্প্রাপ্য, মৎস্য দুর্ম্মূল্য। কুমড়া আর আলু (তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে) খাইয়া হাড়ভাঙ্গা খাটুনি কেমন করিয়া সহিবে? আমাদের শরীরের রক্ত নিয়তই তরল হইয়া পড়িতেছে। রোগের আক্রমণ, পরিশ্রমের চাপ সহিবার উপযোগী শক্তি ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। লোকে পেট ভরিয়া পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে, মৃত্যু এমন সহজে নির্ব্বিরোধে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিতে পাইত না।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলিও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই জানে না। যাঁহারা জানেন তাঁহারাও সেগুলি পালন করিতে মোটেই সচেষ্ট নহেন। ব্যায়াম, বিশুদ্ধ উন্মুক্ত বায়ুতে পর্যটন, সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা, আবাসগৃহ ও গ্রামের পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের বিশুদ্ধি প্রভৃতি সংবাদ পত্র ও পাঠ্যপুস্তকের প্রবন্ধের মধ্যেই থাকিয়া যায়। আমাদের জীবনযাত্রার প্রণালীতে তাহাদের কোনই স্থান নাই।

(৩) দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বাস্থ্য-পরিদর্শন-বিভাগের মন্তব্য পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গের কোথাও স্বাস্থ্যকর স্থান নাই। ম্যালেরিয়ার বিষ ত সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর কলেরা, বসন্ত, উদরাময়, যক্ষ্মার প্রকোপও বড় কম নয়। বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যবান শিশু জন্মিতে পারে না। আর নীরোগ হইয়া বাঁচা উপকথার গল্পের মত হইয়া উঠিয়াছে। এমন ব্যাধিদূষিত দেশে লোক কেমন করিয়া দীর্ঘজীবী হইবে।

(৪) জীবনযাত্রার রীতি নীতি প্রায় আমূল বদলাইয়া গিয়াছে। সকলেই ভোগ লালসায় অধীর, বিলাস সকলেরই কাম্য। দেশের জলমাটির উপযোগী প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বিলাসকামী সম্ভোগলিপ্সু জনমণ্ডলী সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার ফল স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যু। ইহা প্রকৃতির নিষ্ঠুর প্রতিশোধ।

(৫) দুরূহ বিদেশী ভাষার সাহায্যে, বিদেশীয় প্রথায় অধ্যয়ন বাঙ্গালার ছাত্রমণ্ডলীকে নির্জীব করিয়া ফেলে। বাঙ্গালা ভাষায় যে বিষয় আয়ত্ত করিতে একমাস লাগে ইংরাজিতে তাহা এক বছর লাগায়। পৃথিবীর সর্বত্রই মাতৃভাষায় লোকে শিক্ষা পায়। আমরা সেই শিক্ষা পাইতে ১০।১২ গুণ পরিশ্রম করি। আর এক একবার পরীক্ষার শেষ দ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হইবার পর আধমরা হইয়া পড়ি। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দুর্বল, চক্ষু নিস্তেজ পাকস্থলী স্বাভাবিক ক্রিয়ায় অক্ষম, শরীর অবসন্ন। কতগুলি শক্তিহীন, আনন্দহীন নির্জীব কঙ্কাল বৎসর বৎসর দারুণ জীবিকা সঙ্কটের তূর্ণিপাকে হাবুডুবু খাইয়া ভাসাইয়া যাইতেছে।

(৬) নৈরাশ্যের করাল ছায়া দেশের চারিদিকে। এত পড়িয়া, এত শিখিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া চাকুরী, মাষ্টারী, ওকালতী! সেখানেও মহা ভিড। বহুপোষ্যের আহার যোগাইতে হইবে। কিন্তু এই উপায়ত্রিতয় ছাড়া আর কোনও পথ ত খোলা নাই। হাজার হাজার মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বহুকষ্টে দিন কাটাইয়া নিঃসম্বল স্ত্রীপুত্রদিগকে পথে বসাইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। আশায় মানুষ বাঁচিয়া থাকে। যখন অভাগার দল দেখে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোথাও কিছু আশার আভাস নাই, তখন পলে পলে তাহাদের বুক দমিয়া যায়। নৈরাশ্যের নিষ্ফল চাপে তাহাদের ক্ষীণ জীবনীশক্তি পিষিয়া ফেলে।

(৭) বাল্য বিবাহাদি প্রথাগুলির সংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বেকারদিনের অনেক ভাল জিনিষ আমরা বিসর্জন দিয়াছি। এখন দুই চারি বারগায় আমরা পুরাতনের দোহাই দিয়া আত্মসুবিধার পোষকতা করি। ১৩।১৪ বৎসরে যাহারা সন্তান প্রসব করে, এত প্রতিকূল অবস্থা কাটাইয়া তাহাদের পুত্র কন্যাগণের অপুষ্ট শোণিতাস্থি ক দিন টিকিবে?' বাল্যবিবাহ, অন্ততঃ বাল্য মাতৃত্ব দূর করা এখন নিতান্তই আবশ্যক।

* *
*

৯। স্বর্গীয় সুকবি বরদাচরণ মিত্র

গত ১৩ আষাঢ় (১৩২২), ২৮ জুন ১৯১৫, সোমবার লোকপ্রিয়, অমায়িক, সদালাপকুশল, সুবিচারক, সুবিদ্বান্, সুকবি বরদাচরণ মিত্র এম্‌এ, সিএস্ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ১২৬৯ সালের ২৯ পৌষ, (১৮৬৩।১১ জানুয়ারী) পৌষ সংক্রান্তির দিন তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার ৫৩ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল। তিনি সাহিত্যপরিষদের বহু প্রাচীন সদস্য ছিলেন। তিনি বালককাল হইতে মাতৃভাষার সেবা করিয়া

আসিতেছিলেন, তিনি বাঙ্গলা কবিতায় কয়েক খানি বহিও লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি যখন প্রথম বাহির হইয়াছিল, তখন লোকে আগ্রহ করিয়া সে গুলি পড়িত।

তাঁহার বিচারবিভাগের কার্য্যভার এত বেশী ছিল যে তিনি মাতৃভাষার সেবা করিবার ইচ্ছামত অবসর বা সুবিধা পাইতেন না। তিনি সর্ব্বদা সেই আক্ষেপ করিতেন, আর বলিতেন, পেন্‌সন্ লইয়া কলিকাতায় গিয়া বসিতে পারিলে একবার সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবেন। বিধাতা তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইবার অবসর দিলেন না! তাঁহার সংস্কৃত কাব্য, নাটক আর প্রাচীন বাঙ্গালী কবিদের কাব্য লইয়া আলোচনা করিবার সখ ছিল। তিনি যখন বীরভূমের জজ ছিলেন, তখন জয়দেবের ও চণ্ডীদাসের স্মৃতিমন্দির স্থাপন আর চণ্ডীদাসের পদাবলী সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। জয়দেবের কেন্দুলীর মেলায়, জয়দেবের স্মৃতি জাগরূক আছে আর চণ্ডীদাসের পদাবলী কীর্ণাহার স্কুলের হেড মাষ্টার নীলরতন বাবু সংগ্রহ করিতেছেন, জানিয়া শেষকালে তিনি সেদিকে আর তত্টা ব্যস্ত হন নাই,—না হইবার কারণ আরও একটা এই যে তাঁহাকে শীঘ্রই বীরভূম হইতে বদলী হইতে হয়। আজ নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলী সাহিত্য পরিষৎ বাহির করিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর যখন তিনি বাঁকুড়ার জজ হইয়া গিয়াছিলেন, তখন তিনিই সেখানে সর্ব্বপ্রথমে সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের উপর তাঁহার কতটা শ্রদ্ধা ছিল, সাহিত্য-পরিষদের উপর তাঁহার কতটা স্নেহ ছিল, সাহিত্য-পরিষদের কাজ করিতে তিনি নিজ হইতে কেমন সচেষ্ট ছিলেন, তাহা এই সকল ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মরণে সাহিত্য-পরিষৎ একজন যথার্থ স্নেহবান্ হিতৈষী বন্ধু হারাইয়াছেন বলিতে হইবে।

কলিকাতা কুমারটুলীতে তাঁহাদের প্রায় দুইশত বৎসরের বাস। তাঁহাদের পুরানিবাস চাকদহে ছিল। তাঁহার পিতার নাম ৺বেণীমাধব মিত্র। বেণীবাবু কাষ্টম হাউসের সে কালের ইম্‌পোর্ট বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। ব্যবসাদী মহলে সকলেই তাঁহাকে সম্ভ্রম করিত। স্পেশাল পেনসন লইয়া বেণীবাবু বহুদিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। কাষ্টম হাউসে এখনও তাঁহার ছবি আছে। চাকুরীতে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। বেণীবাবুর রোজগার বেশ ছিল, ধনে জনে ক্রিয়া কলাপে তাঁহার পরিবার সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইত। কেবল দুঃখ ছিল, বেণীবাবুর পাঁচ কন্যা একটিও পুত্র ছিল না। সকলেই বেণীবাবুর পুত্র হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিত। এই সময়ে শিবপুরে শাস্ত্রিস্বস্ত্যয়ন পারগ একজন সাধক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার নাম ভগবতী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বেণীবাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাকে পুত্রবর দেন এবং তাঁহাকে যথাসময়ে স্বস্ত্যয়ন করাইতে বলেন। বেণীবাবু পরামর্শ মত যথাসময়ে স্বস্ত্যয়ন করাইলে বেণীবাবুর পত্নী গর্ভবতী হন। সাধক ব্রাহ্মণ গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলামঙ্গল গণিয়া বেণীবাবুকে বলেন,—এই গর্ভে পুত্র হইবে, পুত্রটি সুপুরুষ হইবে, কিন্তু সে অন্ধহীন হইবে আর যদি অন্ধহীন হয় তবে সে নিশ্চয় বিচারপতি হইবে। ব্রাহ্মণের কথা ফলিয়াছিল, উদ্ভিত মঙ্গলের অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, জ্যোতিষ্মান, সুপুরুষ ও হীনাঙ্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার দুইখানি হাতের আঙ্গুলগুলি একবারে জোড়া ছিল। শৈশবে অস্ত্র করাইয়া দুএকটি আঙ্গুল আলগা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এইরূপ হাতের দোষ সত্ত্বেও তাঁহার হাতের বাঙ্গলা ও ইংরাজী লেখা সুস্পষ্ট, সুন্দর, মুক্তার মত সাজান ছিল। তিনি খুব দ্রুতই লিখিতে পারিতেন। তাঁহার কোষ্ঠীর গ্রহসংস্থানের ফলাফল তাঁহার ভাগ্যে প্রতিঘটনাতেই মিলিয়া যাইত।

বয়দাচরণ ১৮৭৪ পর্য্যন্ত নর্ম্মাল স্কুলে, ১৮৭৬ পর্য্যন্ত হেয়ার স্কুলে এবং ১৮৮২ পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিলেন। শৈশব হইতে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিতেন আর বৃত্তি পাইতেন। এফ এ, বি এ ও এম্ এ পরীক্ষায় ফলারশিপ

পাইয়াছিলেন। এম্ এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ১০০৲ টাকার পুরস্কার ও স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিতে গিয়া তিন দিন পরীক্ষার পর তাঁহার ওলাউঠা হইয়া প্রাণসংশয় করিয়া তুলিয়াছিল, কাজেই কেবল সেইটায় তিনি সফল হইতে পারেন নাই।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হন। এই কলেজ এখন নাই। ১৮৮৫ সালে টনি সাহেব তাঁহাকে ঢাকা কলেজের অধ্যাপক করিয়া দেন, কিন্তু সেই বৎসর ষ্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম হইয়াছিলেন বলিয়া সে চাকুরীতে তাঁহার যাওয়া হয় নাই।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্ব্ব প্রথম সরকারী কর্ম্ম পান। তাঁহার প্রথম চাকরী পাবনায় আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহার পরবৎসর তিনি ময়মনসিংহে অনেষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তাহার পরবৎসর শ্রীরামপুরে সাবডিভিজানাল ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। এই সময় কিছুদিন তিনি উড়িষ্যায় সেটেলমেণ্ট অফিসারের কাজ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে বীরভূম জেলায় অস্থায়ী জজ করা হয়। জজিয়তি করিতে তাঁহাকে বাঙলার ও সাঁওতাল পরগণার বহু জেলায় ঘুরিতে হইয়াছে। শেষ চাকুরী তাঁহার হুগলীতে। প্রথমেই বীরভূমে তাঁহার জজিয়তীর আরম্ভ আর শেষে বীরভূমের জজিয়তী হইতে হুগলীতে বদলী হইয়াই তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ হয়।

বিশবৎসর পূর্ব্বে "মেঘদূত" বাহির হয়। ১৮৯৩ সালে উহা প্রথম ছাপা হইয়াছিল। তখন বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূতের অনুবাদ ছাড়া আর কোন অনুবাদ ছিল না। বরদাবাবুর তখন এই অনুবাদের বেশ আদর হইয়াছিল। সেখানি ১৩০২ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সেকালকার সাময়িক পত্রিকায় তাঁহার যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছিল তাহারই কতকগুলি একত্র করিয়া এইখানি ছাপান হয়। ইহাতে তাঁহার রচিত কয়টি ইংরাজী কবিতাও আছে। ইংরাজী কবিতাতেও তিনি রমেশচন্দ্র ও মাইকেলের মত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ষ্ট্যাটুটারী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা লইয়া রঙ্গ করিয়া তিনি ইংরাজীতে একখানি কবিতা পুস্তিকা ছাপাইয়াছিলেন। সেখানির নাম—The Meeting of the Witangemot. ইহা ব্যতীত তাঁহার আরও বহু কবিতা (ইংরাজী ও বাঙলায়) নানা কাগজে ছাপা হইয়াছে। গদ্যরচনায়ও তাঁহার বেশ হাত ছিল। ভারতী, সাধনা, নবপ্রভা, নব্যভারত, প্রবাসী, বিশ্বকোষ, ইণ্ডিয়ান নেশান, কলিকাতা রিভিউ, ন্যাশানাল ম্যাগাজিন, ব্রহ্মচারি, হিন্দু প্রভৃতি কাগজে তাঁহার বহু রচনা বাহির হইয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিয়া বহি করিয়া ছাপান উচিত। তিনি ইংরাজী কবিতায় সমস্ত চাণক্যশ্লোক অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মহিম স্তবের অনুবাদ গত পূর্ব্ব বৎসর কলিকাতার সাহিত্য সম্মিলনে পড়া হইয়াছিল। তাঁহার লেখা একখানি নাটকও আছে। যত কবিতা ও দেব দেবীর স্তব অনেকগুলি লেখা আছে।

স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজ শিল্প
ও
বাণিজ্য *

ইংরাজেরা নিরেট ভিত্তির উপর তাহাদের ধনসম্পদ স্থাপন করিতেছিল। স্পেন এবং পর্ত্তুগালের লোকেরাও কয়েকশত বৎসরের ভিতর দুনিয়ার শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। তাহাদের ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি এই শ্রীবৃদ্ধির কারণ। কিন্তু ইংলণ্ডে আর স্পেন পর্ত্তুগালে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই দুই দেশের লোকেরা যেন একটা লটারিতে জিতিয়া বাজী মাত করিয়াছে, আর ইংরাজেরা ধীরে ধীরে পাকা গৃহস্থের মত ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। স্পেনিশ ও পর্ত্তুগীজ জাতীয় জনগণ "হঠাৎ বড়" হইয়া উঠিয়াছিল—আর ইংরাজেরা যুগে যুগে নানা ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম্মের ফলে শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল। একটা জুয়া খেলার জয়লাভের সঙ্গে স্পেন ও পর্ত্তুগালের সৌভাগ্য তুলনা করা চলিতে পারে—কিন্তু ইংরাজের সমৃদ্ধি বিচক্ষণ ও হিসাবী গৃহকর্ত্তার দৈনিক ও মাসিক সঞ্চয়পরায়ণতার সুফল। খেলোয়াড়ের হাতে প্রচুর অর্থ দেখিয়া মানুষের হিংসা হয়—কিন্তু তাহার যত্র আয় তত্র ব্যয়। জুয়াড়িরা কখনও টাকা জমাইতে জানে না—তাহারা রোজ আনে রোজ খায়—সর্ব্বদা বিলাসে ও অতিব্যয়ে ডুবিয়া থাকে। কিন্তু হিসাবী গৃহস্থ অর্থের সদ্ব্যবহার করে—টাকা হাতে আসিলেই এক নিঃশ্বাসে উড়াইয়া দেয় না। বরং ভবিষ্যতে আরও অর্থসঞ্চয় যে উপায়ে হইতে পারে সেই উপায়েই বর্ত্তমানে তাহারা খরচ করিয়া থাকে।

স্পেনে হৃষ্টপুষ্ট মেষ অসংখ্য পালিত হইত। স্পেন হইতে বিলাতে পশম রপ্তানি হইত। এই বিদেশীয় দ্রব্য বয়কট করিবার জন্য ইংল্যণ্ডের রাজা প্রথম হেন্‌রি ১১৭২ খৃষ্টাব্দে এক বিধি প্রবর্ত্তন করেন। এমনকি তাহারও একশত বৎসর পূর্ব্বে ইতালীয় শিল্পীরা স্পেন হইতেই তাহাদের প্রয়োজনীয় পশম আমদানি করিত। তাহারও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বিস্কে-সাগরোপকূলবাসী জনগণ লৌহ শিল্পে, নৌ-চালনে এবং মৎস্য পালনে সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তিমি-মাছ ধরিবার কৌশল এই সকল লোকই প্রথম আবিষ্কার করে। ইংরাজেরা এবিষয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত নিতান্ত নাবালক ছিল। শেষে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এই জনপদ হইতে ওস্তাদ লইয়া যায়। স্পেনিশ বীরগণ বিলাতে তিমিমৎস্য ধরিবার প্রণালী শিখাইয়াছে।

দশম শতাব্দীতে স্পেনে মুসলমান সাম্রাজ্য ছিল। তৃতীয় আবদুল রহমানের আমলে (৯১২-৯৫০খৃঃ অঃ) মুরেরা ভেলিন্সিয়া জনপদে তুলা, ইক্ষু, চাউল, তুঁত ও অন্যান্য দ্রব্যের আবাদ স্থাপন করিয়াছিল। এইরূপ কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত শিল্পকেন্দ্রও বহুস্থানে

* ফ্রেডরিক লিষ্ট প্রণীত "জাতীয় অর্থবিজ্ঞান" গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিভাগের এক অধ্যায়।

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কর্ডোভা, সেভিল ও গ্রানাডা অঞ্চলে বস্ত্র তুলার ও রেশমের কারখানা ছিল। ভেলেন্সিয়া, সেগোভিয়া, টোলেডো এবং ক্যাষ্টাইল প্রদেশের অন্যান্য নগরে পশম কারখানা প্রসিদ্ধ ছিল। এক সেভিলেই ১৬০০০ তাঁতে কাজ চলিত। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে সেগোভিয়া নগরের পশম কারখানায় সর্ব্বসমেত ১৩০০০ শিল্পী কর্ম্ম করিত। যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র এবং কাগজ প্রস্তুতও কম হইত না। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহী ফলবার্টের আমলেও ফরাসীরা স্পেন হইতে বস্ত্র আমদানি করিত। স্পেনের বন্দরসমূহে ধীবর ও মৎস্যপালকগণের অহরহ গতিবিধি দেখা যাইত। সুবিস্তৃত বাণিজ্যের বহুলক্ষণ সমুদ্রকূলস্থিত নগরে প্রতীয়মান হইত। দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত স্পেনের নৌবল বিশেষ পুষ্টই ছিল। এক কথায় স্পেনে বৈষয়িক শ্রীসমৃদ্ধির সকল উপকরণই চূড়ান্ত পরিমাণে ছিল। ধর্ম্মে গোঁড়ামি এবং রাষ্ট্রে নির্য্যাতননীতি এই দুই শক্তির ফলে সোনারদেশ ছারখার হইয়া গেল। ইহুদিরা যখন ধর্ম্মনির্য্যাতনের ফলে স্পেন হইতে নির্ব্বাসিত হইল তখন হইতে তাহার অধোগতির সূত্রপাত। স্পেনের চরম অবনতি সাধিত হইয়াছিল যখন মুসলমানেরা খৃষ্টান গোঁড়ামির অত্যাচারে বহিষ্কৃত হইয়া গেল। বিশলক্ষ শিল্পকলাবিৎ ধনবান্ নরনারী ধর্ম্মের এক মোহাইয়ে স্পেনকে ধনহীন, শিল্পহীন, কৌপরা করিয়া ছাড়িয়া চলিল।

ধর্ম্মনির্য্যাতনের ফল বিবিধ। প্রথমতঃ দেশীয় শিল্পী ও বণিকসম্প্রদায় দেশত্যাগী হইল। দ্বিতীয়তঃ বিদেশীয় শিল্পিগণও স্পেনে আসিতে পারিত না। কাজেই স্পেন পর্ত্তুগালের ধনশক্তি নিতান্তই শুকাইয়া আসিল। তাহার পর আমেরিকা আবিষ্কার এবং ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কারের যুগ। এই আবিষ্কারে স্পেন পর্ত্তুগালই অগ্রণী ছিলেন—এবং প্রথম লাভ ইহাঁদের ভাগ্যেই ছুটে। কিন্তু স্থায়ী উপকার ইহাঁদের হইল না। সাময়িক ধনাগম হইয়াছিল মাত্র—গৌরব টিকিবার উপায় ছিল না। বরং এই উপায়েই তাঁহাদের ধনসম্পত্তি, শিল্প বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রক্ষমতার অস্তিমদশা ঘনাইয়া আসিল।

পরবর্ত্তী যুগে ওলন্দাজ বণিকেরা এই সকল নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের কৃষিজাত দ্রব্যনিচয়ের বিনিময়ে স্বদেশীয় শিল্পজাত পদার্থ প্রদান করিত। ইংরাজেরাও আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায়ে এই নিয়ম মানিয়া চলিত। কিন্তু স্পেন-পর্ত্তুগাল এই ধরণের ব্যবসায় চালাইবে কোথা হইতে? তাঁহাদের শিল্পশক্তি যে পূর্ব্বেই অবসন্ন হইয়া গিয়াছে! তাঁহারা এই সকল আবিষ্কৃত উপনিবেশসমূহ হইতে অত্যাচার করিয়া সোনারূপা আদায় করিতেন আর এই সোনারূপার বিনিময়ে ইয়োরোপীয় দেশসমূহে শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতেন। পূর্ব্বে স্পেন-পর্ত্তুগালের লোকেরা শিল্পী ছিল, বণিক ছিল—এক্ষণে তাহারা দাস-ব্যবসায় সুরু করিল। গোলাম ধরা, গোলাম কেনা, গোলাম বেচা ইহাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য হইল। উপনিবেশসমূহে স্পেন-পর্ত্তুগালের রাজপ্রতিনিধিরা অশেষ উপায়ে জনগণের উপদ্রব করিত—সকলেই এক একজন যথেচ্ছাচারী 'নবাব' হইয়া বসিত। এই প্রণালীতে কোন সমাজের ধনসম্পদ কতদিন টিকিতে পারে? এই জন্যই বলিতেছিলাম স্পেন-পর্ত্তুগালের শ্রীবৃদ্ধি জুয়াড়ির রাতারাতি বড়লোক হইবার সমান।

ফলতঃ ওলন্দাজ এবং ইংরাজের শিল্পকেন্দ্রগুলিই ফুলিয়া উঠিল। স্পেন-পর্ত্তুগালের লোকেরা উহাদের নূতন খরিদদার হইল। স্পেন-পর্ত্তুগালের উপনিবেশগুলি ওলন্দাজ এবং ইংরাজেরই বাজারে পরিণত হইল এই উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজদ্বয় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—অবশেষে তাহারা স্পেন-পর্ত্তুগালের নৌবল ধ্বংস করিয়া ধনে প্রাণে সারা করিল। স্পেনের রাজারা আইন জারি করিলেন—"বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য স্পেনে আসিতে পারিবে না। স্পেনের টাকা পয়সা বিদেশে রপ্তানি হইতে পারিবে না।" কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। আইনের জোরে মুখের কথায় পুরাতন শিল্প সঞ্জীবিত করা যায় না—নূতন শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয় না গোঁড়ামি, যথেচ্ছাচার, শিল্পনির্ব্বাসন, ধর্ম্ম নির্য্যাতন, প্রজানিপীড়নের দেশে লক্ষ্মী বাস করেন না। বেকুবির ফল ভুগিতেই হইবে —কাজেই স্পেনিশ পর্ত্তুগীজদিগের কপাল আর ফিরিল না।

পর্ত্তুগাল একবার গাঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল। পুরাতন ভুল সংশোধন করিবার জন্য একজন মন্ত্রী সচেষ্ট হইলেন। স্মরণাতীত কাল হইতেই পর্ত্তুগালে মেষপালন চলিয়া আসিতেছে। ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো বলেন যে এশিয়া হইতে কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর মেষ পর্ত্তুগালে আনীত হয়। সেই সমুদয়ের বংশ হইতে উৎকৃষ্ট সাবক উৎপন্ন হইয়াছিল। কাজেই পর্ত্তুগালে শ্রেষ্ঠ পশম পাওয়া যাইত। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী এরেসিরা এই পশম হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য পর্ত্তুগালে কারখানা খুলিবার আয়োজন করিলেন। এইজন্য বিলাত হইতে বস্ত্রশিল্পী আমদানী করা হইল। পুরাদমে স্বদেশী সংরক্ষণ-নীতি জারি করা হইল তিন বৎসরের ভিতরেই স্বদেশী শিল্প-কারখানাগুলি যারপরনাই উন্নতি দেখাইতে পারিল। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয় বস্ত্র বয়কট করিবার জন্য আইন প্রচারিত হইল। সেই সময় হইতে ১৯ বৎসর কাল পর্ত্তুগালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। এই যুগে পর্ত্তুগীজ শিল্পীরা পর্ত্তুগালের পশম পর্ত্তুগীজ তাঁতে বয়ন করিত। পর্ত্তুগালে বিদেশীয় বস্ত্র আমদানী হইত না—বরং পর্ত্তুগীজ তন্তুবায়গণের প্রস্তুত বস্ত্রই আমেরিকা ও ভারতবর্ষের উপনিবেশে রপ্তানি করা হইত।

ইংরাজ তন্তুবায় ও বণিকেরা পর্ত্তুগালের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ভীত হইলে তাহারা এই প্রতিযোগীদিগকে পরাস্ত করিবার ফিকির অনুসন্ধান করিতে থাকেন। পর্ত্তুগীজেরা বিলাতী বস্ত্র সম্বন্ধে বয়কটবিধি প্রচার করিয়াছে। কাজেই বিলাতী বস্ত্র পর্ত্তুগালে রপ্তানি করা অসম্ভব। কিন্তু ইংরাজেরা নূতন ধরণের কাপড় প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেগুলির দ্বারাও পুরাতন পদার্থের কার্য্যই চলিত। এগুলির নাম নূতন করা হইল—এবং কথঞ্চিৎ নূতন উপাদানে এই সমুদয় কাপড় প্রস্তুত করা হইত। অনেকটা নূতন সামগ্রীই যেন দাঁড়াইয়া গেল। এই মালগুলি পর্ত্তুগালে কিছুকাল রপ্তানি হইতে থাকিল। পরে পর্ত্তুগীজেরা দেখিল, "ইংরাজেরা কৌশল করিয়া আমাদের তন্তুবায়গণকে পরাস্ত করিতেছে। প্রায় পুরাতন জিনিষই নূতন নামে দেশে আসিতেছে। কাজেই এইগুলিও বয়কট করা আবশ্যক।" পর্ত্তুগীজেরা আবার বিলাতী মাল বয়কট করিল। পর্ত্তুগালের রাষ্ট্রবীরেরা সত্যসত্যই স্বদেশীশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।

ইংরাজ রাষ্ট্রবীরগণ এইবার নূতন চাল

চালিলেন। ছলে বলে কৌশলে পর্তুগীজদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেই হইবে ভাবিয়া ইংরাজ কিছু বক্রভাবে খেলোয়াড়ী হাত দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। এই কৌশল বা চালের নাম মেথুয়েন-সন্ধি।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ রাষ্ট্র-নায়ক এরেসিরার মৃত্যু হয়। তখন ব্রিটিশ রাজদূত পল মেথুয়েন পর্তুগীজ রাষ্ট্রশাসকগণকে বলিলেন—"আমি পর্তুগালের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছি। বিলাতে পর্তুগাল এবং অন্যান্য দেশ হইতে মদ আমদানি করা হয়। সকল বিদেশীয় মদের উপরেই আমরা সমান শুল্ক বসাইয়া থাকি। কিন্তু পর্তুগালের মদ আমরা স্বার্থত্যাগ করিয়া কম শুল্কে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। এইজন্য আপনাদিগকেও ইংরাজের জন্য কিছু ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইবে। ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতী-বয়কট প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পর্তুগীজেরা আমাদের বস্ত্রশিল্পের উপর যে কর বসাইতেন এক্ষণে সেই পরিমাণ কর বসাইলেই আমাদের সুবিধা হয়।" পর্তুগীজেরা ভাবিল—"বিলাতী বস্ত্র দেশে আসিলে শুল্ক হইতে রাজসরকারে কিছু আদায় ত হইবেই। অধিকন্তু বিলাতে পর্তুগীজ মদের কাটতি বেশী হইলে দেশে মদের ভাটি বেশী চলিবে এবং মহুয়া ফলের চাষও অধিকতর হইবে। কাজেই জমিদারেরা খাজনা বেশী পাইতে পারিবেন।" ফলতঃ ইংরাজে পর্তুগীজে ব্যবসায়-সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডেশ্বরী য়্যান্ পর্তুগীজরাজকে তাঁহার "বহুদিনকার বন্ধু ও আত্মীয়"রূপে সন্ধিপত্রে বর্ণনা করিলেন! এইরূপ ভ্রাতৃভাব ও বন্ধুত্বের নজির আমরা রোমক সাম্রাজ্যের আমলে অনেক পাই। রোমের রাষ্ট্র-পরিষৎ-সেনেট যে সকল বিদেশীয় রাজন্যবর্গকে ছলে বলে কৌশলে নিজ খপ্পরে আনিয়া ফেলিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে মহা বন্ধু ও আত্মীয়রূপেই বর্ণনা করা তাঁহাদের রীতি ছিল।

সন্ধিস্থাপনের পর হইতেই পর্তুগাল বিলাতী দ্রব্যে প্লাবিত হইয়া গেল। এই বিলাতী প্লাবনের ফলে পর্তুগীজ স্বদেশী ভাণ্ডারগুলি একদম ধূলিসাৎ হইল। পর্তুগীজ শিল্পের চিহ্নমাত্র রহিল না। বিদেশী মালের বন্যায় পর্তুগাল ভাসিয়া গেল।

সেইযুগে ইংরাজ বণিকেরা মিথ্যা কথা যথেষ্টই বলিত। তাহারা পর্তুগালে রপ্তানি মালের পরিমাণ খুব কম করিয়া লিখাইত এই উপায়ে তাহারা পর্তুগালকে দেয় শুল্কের অর্দ্ধাংশ মাত্র দিয়াই রেহাই পাইত। কাজেই পর্তুগীজ রাষ্ট্রশুল্ক হইতে বেশী আদায় করিতেও পারিত না। পর্তুগাল মেথুয়েন-সন্ধির ফলে বাস্তবিকই "ইতোনষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া পড়িল। কথায় বলে—"জাতিও গেল পেটও ভরিল না!"

"বৃটিশ মার্চ্যাণ্ট" গ্রন্থে প্রকাশ—"পর্তুগীজ-রাষ্ট্র বিলাতী বয়কটবিধি রদ করিলেন। আর আমরা পর্তুগালের বাজার ছাইয়া ফেলিলাম। অল্পকালের ভিতরই পর্তুগালে রূপার টাকা নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহাদের লোকজনের দৈনিক বিনিময় কার্য্যেও অসুবিধা উপস্থিত হইল। পরে আমরা সোনার টাকা দখল করিতে সুরু করিলাম।" পর্তুগালের সঙ্গে ইংরাজের এইরূপ ব্যবসায় সম্বন্ধ অদ্যাপি রহিয়াছে।

পর্তুগীজেরা আমেরিকার উপনিবেশসমূহ হইতে সোনারূপা লইয়া আসিত। ইংরাজেরা শিল্পদ্রব্য বেচিয়া এই সোনারূপার অধিকারী হইত। পরে এই টাকার সাহায্যে তাহারা

চীনে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শিল্পদ্রব্য প্রেরণ করিত। কিন্তু এই দ্রব্যসমূহ বিলাতে আমদানি করা হইত না। ইংরাজ বণিকগণ এইগুলি অল্পমূল্যে ইয়োরোপের বাজারে বেচিত। ইয়োরোপ হইতে তাহারা কৃষিজাত দ্রব্য এবং প্রাকৃতিক উপকরণ বিলাতে চালান দিত। মোটের উপর স্বদেশের শিল্প রপ্তানি এবং বিদেশ হইতে উপকরণ আমদানি এই দুই নিয়মে ইংরাজেরা চিরকাল বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে। মেথুয়েন-সন্ধির ব্যবস্থাও ইংরাজের সনাতন ব্যবসায়-পদ্ধতির বিকাশই দ্রুত সাধিত হইয়াছে।

পর্ত্তুগীজেরা ইংরাজের নিকট বস্ত্র ক্রয় না করিলে বিলাতি শিল্প অত উন্নত হইতে পারিত না। পর্ত্তুগীজেরা যদি স্বদেশী আন্দোলন চালাইয়া বিলাতী বয়কট বজায় রাখিত তাহা হইলে ইংরাজের বহুপরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য বস্তাবন্দি হইয়া পচিত। কাজেই বিলাতে শিল্প কারখানার কাজ ক্রমশঃ কমিতে থাকিত। তাহা হইলে ইংরাজেরা সোনারূপার নগদ টাকা বেশী মজুত করিতে পারিত না। তাহা হইলে ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসায় চালান কঠিন হইত। ভারতবর্ষের মাল সংগ্রহ না করিতে পারিলে ইংরাজ ইউরোপের বাজারেই বা কি বিক্রয় করিত? ইয়োরোপের সঙ্গে কারবার কম হইলে বিলাতে কৃষিজাত দ্রব্যের আমদানিও স্বতই কমিয়া আসিত। মেথুয়েন-সন্ধি পর্ত্তুগীজ স্বদেশী আন্দোলন ধ্বংস করিয়া ইংরাজের বিশ্ববাণিজ্য, জমকাল করিয়া তুলিল।

এদিকে পর্ত্তুগালের অবস্থা কি হইল? "ব্রটিশমার্চ্যাণ্টের" লেখক বলিতেছেন—"প্রতিবৎসর আমরা বিলাত হইতে পর্ত্তুগালে প্রচুর পরিমাণ শিল্পজাত দ্রব্য পাঠাইতেছি। পর্ত্তুগাল হইতে আমাদের দেশে সেই পরিমাণ দ্রব্য আমদানি হয় না। আমাদের নিকট পর্ত্তুগাল প্রতি বৎসর দশলক্ষ পাউণ্ড ঋণী থাকেন।" ইহার ফলে ১০০ পাউণ্ড মূল্যের পর্ত্তুগীজ মাল বিলাতে ৮৫ পাউণ্ড মাত্রে বিক্রয় হইত। ইহাতেও পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষতি কম হয় নাই। বলা বাহুল্য ইংরাজেরা সকলেই মেথুয়েন-সন্ধির ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন।

পর্ত্তুগালের কৃষিকার্য্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিল। পর্ত্তুগীজ শিল্পশক্তি, পর্ত্তুগীজ বাণিজ্য, পর্ত্তুগীজ অর্ণবাধিপত্য সবই ধূলায় মিশিয়া গেল। আর একবার পর্ত্তুগালে উন্নতিসাধনের চেষ্টা আরব্ধ হয়—সে মন্ত্রী পম্বালের উদ্যোগে। কিন্তু বিলাতী প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তাহা পলকেই নির্ব্বাপিত হইল। তথাপি পম্বালের স্বদেশী-সংরক্ষণ-নীতিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এরেসিরার ন্যায় পম্বালও পর্ত্তুগীজ রাষ্ট্রের একজন দূরদর্শী স্বদেশ-হিতাকাঙ্ক্ষী কর্ণধার ছিলেন।

এইরূপ স্বদেশী-সংরক্ষণ এবং বিদেশী-বর্জ্জন স্পেনেও কিয়ৎকালের জন্য সুরু হয়। পঞ্চম ফিলিপ এবং তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারী ফরাসী বোর্বোঁবংশসম্ভূত ছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্সে চতুর্দ্দশ লুইয়ের ধনসচিব কলবার্ট সাহিত্যে, শিল্পে ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিতেছিলেন। এই নীতির প্রভাব স্পেনেও আসিয়া পৌঁছে। স্পেনের রাষ্ট্রশক্তি ফরাসী আদর্শে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ করিয়া ছিল। অবশ্য এই সময়ে শাসনকর্ত্তারা দক্ষতার সহিত রাষ্ট্রবিধিগুলি প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। বিদেশীয় দ্রব্যের

শুল্ক আদায় অনেক সময়েই নিয়মিতরূপে হইত না। স্পেনের জেলায় জেলায়, পাড়ায় পাড়ায় স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছিল। কিন্তু যোগ্যতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা এবং কর্মক্ষমতার অভাবে আন্দোলন হইতে স্পেনিশেরা বিশেষ উপকার লাভ করিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অন্তরায় ছিল দেশে সুশাসন ও শান্তির অভাব। স্পেনের রাস্তাঘাট নিতান্ত অসুবিধাজনক ছিল—হোটেলবাটি বা সরাইয়ের অভাবে বণিকেরা পথে যারপরনাই কষ্ট পাইত। সেতু, খাল, নৌকা ইত্যাদি যথাস্থানে যথাকালে পাওয়া যাইত না। স্পেনের আন্তর্দ্দেশিক বাণিজ্যে অশেষ বিঘ্ন ছিল। এক জেলা হইতে অন্য জেলায় মাল আমদানি রপ্তানি করিতে শুল্ক দিতে হইত। পথে ডাকাইতির ভয় ছিল না—অবৈধ বাণিজ্য বাধা দিবার জন্য প্রহরী ছিল না। অধিকন্তু জনগণের উপর কড়া হারে খাজনা বসান হইত। এ সকলি অসুবিধার কুফল এড়াইয়া স্বদেশী আন্দোলন সফল করা একপ্রকার অসাধ্য। বিদেশী-বয়কট প্রবর্ত্তন করিলেই কি স্বদেশের শিল্পোন্নতি বিধান করা যায়? তাহার জন্য দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনুকূল হওয়া আবশ্যক। স্পেনের তখন সর্ব্ব অঙ্গে ঘা—কাজেই সংরক্ষণ-নীতির সুফল ফলিল না।

এদিকে ইংরাজেরা স্পেনের উচ্ছেদ সাধনে অগ্রসর হইল। পর্ত্তুগালের সঙ্গে যেরূপ মেথুয়েন-সন্ধি, স্পেনের সঙ্গেও সেইরূপ একটা বাণিজ্য-সন্ধি স্থাপিত হইল। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সঙ্গে ইংল্যণ্ডের চুক্তি হইল যে,—ইংরাজেরা স্পেনশাসিত আমেরিকার কতিপয় আফ্রিকাবাসী কুলী আমদানি করিবে, এবং বৎসরে একবার করিয়া একখানা ইংরাজ জাহাজ পোর্টোবেলো বন্দরে আসিবে। এই সন্ধির ফলে ইংরাজেরা গুপ্তভাবে বহু মাল আমেরিকায় রপ্তানি করিতে পারিল। স্পেনের রাজ্যে ইংরাজের বাজার স্থাপিত হইল।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ইংরাজরাষ্ট্র ইয়োরোপের অথবা এশিয়ার যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যসন্ধি স্থাপন করিয়াছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই সকল দেশের শিল্পশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করা উদ্দেশ্য রহিয়াছে। ইংরাজ স্বকীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার খুলিতে ও বাড়াইতে সর্ব্বত্রই চেষ্টা করিয়া থাকে। সকল সমাজকেই ইংরাজ বুঝাইয়া দেয় যে বাণিজ্যের ফলে তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্যের কাটতি বাড়িবে। এদিকে সস্তায় শিল্পজাত বিলাতী দ্রব্য বিক্রয় করা এবং বহুকালব্যাপী ঋণদানের ব্যবস্থা করাও ইংরাজ-বাণিজ্য-নীতির সনাতন প্রথা। যথাসম্ভব অল্প শুল্কে স্বদেশী মাল ভিন্ন ভিন্ন দেশে রপ্তানি করিবার জন্য ইংরাজের সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা থাকে। তাহা যদি নিতান্তই অসম্ভব হয়, তখন নানা উপায়ে শুল্ক এড়াইবার ফন্দি বাহির করিতে ইংরাজ সুপটু। অধিকন্তু পুলিশ প্রহরীদিগের চোখে ধূলা দিয়া গুপ্তভাবে অবৈধ বাণিজ্য চালানও ইংরাজ বণিকগণের স্বধর্ম্ম। পর্ত্তুগালে ইংরাজেরা শুল্ক এড়াইতে পারিয়াছেন—স্পেনের ভিতর তাহারা যথেষ্ট গুপ্ত বাণিজ্য চালাইত।

ইংরাজেরা বহির্ব্বাণিজ্যে মালের মূল্য অনুসারে (advalorem) শুল্ক আদায়ের পক্ষপাতী। তাহারা মালের বস্তা ওজন করিয়া অথবা গণনা করিয়া শুল্ক বসাইতে চাহে না। এইজন্য সকল দেশেই তাহারা মূল্য অনুসারে বিলাতী মালের উপর শুল্ক

দিতে ইচ্ছা করে। ইহাতে ইংরাজের চাতুরী ও প্রবঞ্চনা বিস্তৃত ক্ষেত্র পায়। কারণ মালের মূল্য অল্প করিয়া বলা সহজ—কিন্তু মালের ওজন বা সংখ্যা কমান সহজ নয়। প্রশিয়া মূল্য অনুসারে শুল্ক আদায় করেন না—ওজন অনুসারে করেন। এইজন্য ইংলণ্ডে প্রশিয়ার মনোমালিন্য চলিতেছে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

মহম্মদ*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মহম্মদ প্রাতেই শয্যাত্যাগ করিতেন; রমজানমাসে সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই গাত্রোত্থান করিয়া তিনি নিভৃতে এক গুহায় ধ্যানস্থ থাকিতেন। জনকোলাহলমাত্রবিহীন—ঝরঝর শব্দে ঝরণার জল পড়িতেছে, উদ্দাম বায়ু মধ্যে মধ্যে কি অব্যক্ত ভাষায় এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ স্থানে আকুল মহম্মদ প্রশ্নসমাধানের আশায় চিন্তামগ্ন থাকিতেন। ভগবৎ কৃপায় তাঁহার একদিন জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল; তিনি আনন্দ বিহ্বল হইয়া পত্নী খাদিজাকে সে মঙ্গলময়ী বাণী শুনাইলেন। যে সমস্ত কাষ্ঠ-খণ্ডের উপাসনায় এবং অনুষ্ঠানে আরববাসী উন্মত্ত তাহা কিছুই নহে—মেকী। কাঠ কখনও ভগবান হয়? কাষ্ঠ, কাষ্ঠই, ভগবান্ এক—একমেবাদ্বিতীয়ং। তিনিই সত্য; কাষ্ঠের পুতুল কিছুই নয়। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ—ইহা ক্ষণস্থায়ী ছায়া, তাঁহার অনন্ত ভাস্বর ঔজ্জ্বল্যের ক্ষণভঙ্গুর আবরণ মাত্র। তিনি অদ্বিতীয়, আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ। কিন্তু তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে আমরা ত বাধ্য, তাহাতে আর বিশেষত্ব কি? তা নয়, এ আত্মসমর্পণ সেরূপ নহে—ইহা সানন্দে ভগবদিচ্ছায় আত্মবিসর্জ্জন। যত কেন বিপদ্ আসুক না, কিছুতেই হটিব না, তাঁহার ইচ্ছা অকুণ্ঠিত-চিত্তে পালন করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণকবি গেটে এই কথা পড়িয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহাই যদি মুসলমানধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আমরা কি সকলেই ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী নয়?' বাস্তবিক ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের ত চলিতে হইবেই কিন্তু সকল সময়ে যদি এই ইচ্ছাকে শুভেচ্ছা মনে করিয়া আনন্দে উহার অনুসরণ করি তবেই ত আমাদের যথার্থ আত্মবিসর্জ্জন।

এই আত্মবিসর্জ্জনই সকল নৈতিকতার মূলীভূত সত্য। সকল ধর্ম্মেই ইহা অলঙ্ঘ্য অক্ষরে লিখিত। যে নিয়মের দ্বারা এই জগৎ চলিতেছে, মানুষ যখন সেই নিয়মে নিজের সত্তা হারাইয়া ফেলিতে পারে, সেই নিয়মের আজ্ঞাধীন হইয়া নিজেকে এবং সমাজকে চালাইতে পারে তখনই তাহার মানবত্ব পরিস্ফুট হয়; ইহার পরিপন্থী হইলে সমাজ,জাতি, দেশ ছারেখারে যায়। এই মূলী-ভূত নিয়মের উপযোগী করিয়া মানবজীবন চালাইতে হইলে প্রথমে ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ দরকার। ইহাই মুসলমান ধর্ম্মের, তথা ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মেরও প্রাণস্বরূপ। ইস্‌লামধর্ম্ম ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র।

* কার্লাইল রচিত "Hero-orship" পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

যদি ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্ম না থাকিত ইহার অস্তিত্বও থাকিত না। ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মও আমাদিগকে ভগবানে আত্মবিসর্জ্জন করিতে, দশজনের চর্ব্বিতচর্ব্বণলব্ধ জ্ঞান হইতে দূরে থাকিতে, অন্তঃসার শূন্য অনুষ্ঠান হইতে জীবন মুক্ত রাখিতে, সেই মূলীভূত নিয়ম অনুসারে মানবাত্মাকে পরিচালিত করিতে শিক্ষা দেয়। 'ইস্‌লাম' অর্থই আত্মবিযোগ; মানবাত্মার বিশ্বাত্মার সহিত মিলনই—ইস্‌লাম।

যে সত্যের সন্ধানে তিনি আকুলপ্রাণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিলেন, যখন সেই সত্যের বিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, অজ্ঞানান্ধকার যখন জ্ঞানালোকে নিরাকৃত হইল, তখন বিস্ময়নির্ব্বাক্ মহম্মদ ইহাকে ঐশী প্রেরণা ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিলেন না। জীবনব্যাপী সাধনা যদি সহসা সিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বতই মনে হয় যে ইহা ভগবৎ-প্রেরণা, নিজের জ্ঞানলব্ধ নহে। মহম্মদের ঠিক তাহাই হইয়াছিল—প্রবুদ্ধ মহম্মদ মনে করিলেন যে গেব্রিয়েল নামে এক স্বর্গ দূতের দ্বারা এই সত্য তাঁহার নিকট প্রতিভাত। ঐশী করুণায় মহম্মদ যখন জাগরিত হইলেন, তখন কি তাহা তিনি প্রচার না করিয়া থাকিতে পারেন? সে জাগরণ শুধু তাঁহারই হইয়াছে আর কাহারও ত হয় নাই; এই ভগবৎ করুণায় সম্মানিত মহম্মদ আপনাকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রচার করিতে বাধ্য হইলেন।

তাঁহার স্ত্রী খাদিজাই প্রথমে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই জন্য খাদিজার মৃত্যুর পরও মহম্মদ তাঁহার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ ছিলেন। বাস্তবিকই বহুবর্ষব্যাপী সাধনার ফলের যদি একজন অংশীদার পাওয়া যায় তাহা হইলে মন স্বতঃই তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়। খদিজা, তাঁহার ক্রীতদাস জেইদ, পিতৃব্যপুত্র আলি এই কয়জনই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

তিনি এখানে সেখানে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু তিন বৎসরে তিনি মাত্র তেরটি শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন। তারপর তিনি মেক্কার চল্লিশ জন প্রধানকে এক ভোজে আহ্বান করিয়া আপনার ধর্ম্ম তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। বিশ্বাসসিদ্ধ শ্রোতৃবর্গের মধ্যে আবুতালেবের পুত্র একমাত্র ষোড়শবর্ষ বয়স্ক আলিই সাগ্রহে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণের বাসনা জানাইয়াছিল। এই আলির চরিত্র বড়ই মধুর বড়ই তেজস্বী। উদার অন্তঃকরণে একদিকে যেমন করুণা অপরদিকে তেমনই সিংহবিক্রম।

মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারে কাবা এবং বিগ্রহগুলির রক্ষয়িতৃদিগের মধ্যে স্বভাবতই একটা বিদ্বেষভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এত আসিয়েই—কোথা হইতে কে একজন আসিয়া তাহাদের সনাতন স্থান হইতে তাহাদিগকে চ্যুত করিতে চায়। স্নেহমুগ্ধ আবু তালেব মহম্মদকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনেক বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু মহম্মদ বলিলেন যদি চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত তাঁহাকে এই মহান্ সত্য প্রচারে নিরস্ত করিতে আসে তথাপি তিনি হটিবেন না, কোরিশ ত কোন্ ছার! দাদামহাশয়ের প্রাণে এরূপ আঘাত দিয়া মহম্মদ কাঁদিয়া ফেলিলেন; কি করিবেন, কর্ত্তব্য যে বড় কঠোর, স্নেহ সেখানে স্থান পায় না।

তিনি সমভাবেই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কদাচিৎ কাহাকেও দীক্ষিত করিতে পারিলেন না। অত্যাচারের আশঙ্কায় তিনি তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য

আবিসিনিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এই সময় মহম্মদের পক্ষে বড়ই দুর্দিনই চলিয়াছিল; একদিকে স্নেহময় আবু তালেব, প্রিয়তমা খদিজা মৃত, অপরদিকে কোরাইশ কোরিশ জাতির নিত্য নূতন শত্রুতা। অসহ্য ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি যেন ভগবদ্দত্ত দুর্ভেদ্য আবরণে রক্ষিত, কিছুতেই কিছু হইল না।

ধর্মপ্রচারের ত্রয়োদশ বর্ষে মক্কার সকল পাষাণকেই তাঁহার উপর খড়্গহস্ত দেখিয়া মহম্মদ অতি কষ্টে দুই শত মাইল দূরবর্ত্তী ইয়াথ্রেব নামক স্থানে যাইলেন; সেইখানে তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য ছিল; তাহারা তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিল। মহম্মদ ৬২২খৃঃ অব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে ইয়াথ্রেবে পলাইয়া আসেন, তাঁহার পলায়নের পর হইতেই ইয়াথ্রেব, মেদিনা বা 'মেদিনৎ অলনবি'—'অবতারের সহর' নামে রূপান্তরিত হয় এবং ৬২২ খৃঃ অঃ হইতে মুসলমান সংবৎ গিনিয়া প্রচলিত হয়। মহম্মদ যখন দেখিলেন শুধু উপদেশে সেই মহান্ সত্যের প্রচার হইল না তখন তিনি এক অভিনব উপায়ে উহার প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। সমস্ত মক্কাবাসী যখন তাঁহার ধর্মপ্রচার বন্ধ করিতে এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত লইতে তরবারি ধারণ করিল, তখন তিনিও তরবারি দ্বারাই ধর্ম্মপ্রচার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এই তরবারি সাহায্যে ইস্‌লামধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্য অনেকে মহম্মদকে নিন্দা করেন। অবশ্য শুধু উপদেশে যদি কার্য্য সিদ্ধি হয়, কে আর রক্তপাতে ইচ্ছা করে? কিন্তু যদি এই শক্তির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাকে কোন ধর্ম্মের সত্য মিথ্যার সম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করি তাহা হইলে আমরা বড়ই ভুল করিব। তরবারির সাহায্যে ধর্ম্মবিস্তার করিতে হইলে প্রথমতঃ ত তরবারি চাই। মানুষের মন যদি আকর্ষণ করিতে না পারা গেল তবে খড়্গধারী আসিবে কোথা হইতে? যে ধর্ম্ম হউক না কেন প্রথমতঃ একজনের মনেই আঘাত করে। এই ব্যষ্টির আঘাত ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিয়া সমষ্টিতে যা দেয়। এই সমষ্টির আঘাত দুই প্রকারে সম্ভব; এক উপদেশে অপরটি সামর্থ্যে। সামর্থ্যই যদি হয় তাহাতে দোষ কি? শক্তি যদি না থাকে তবে শক্তির প্রয়োগ করিবে কে? কালই কোন বিষয়ের সত্য মিথ্যা নিরূপণ করে। কোন বিষয়কে কালের কবলে ফেলিয়া দাও, যদি সময়ের সহিত সংগ্রামে ইহার শক্তি হ্রাস না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ইহার ভিতর জিনিষ আছে। প্রকৃতির, সময়ের সহিত সংগ্রামের ফলাফলই সত্য-মিথ্যার পরিজ্ঞাপক।

প্রকৃতি কখনও মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় না। অনেক আবর্জ্জনার সঙ্গে ধান পোতা হয় কিন্তু অঙ্কুরোদ্গম হয় শুধু ঐ ধানগুলি হইতেই, আর যে গুলির ভিতর কিছু সার নাই প্রকৃতি সেই গুলি জীর্ণ করিয়া ফেলে। সত্য যেটুকু সেটুকু ঠিক চিরকাল বর্ত্তমান থাকে, তাহার আনুষঙ্গিক মিথ্যাগুলিই ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতির বিচার বড়ই নিরপেক্ষ, মেকী কখনও তাঁহার নিকট আশ্রয় পায় না।

সত্য চিরস্থায়ী, কালের গতির সঙ্গে তাহার ব্যত্যয় বা ধ্বংস হয় না। আমরা কুটিল বলিয়া সত্যের সন্ধান পাইলেও তাহার উপর কতকগুলি তর্কের আবরণ চড়াইয়া দেই; সময়ে সেই পোষাকগুলি জীর্ণ হইতে পারে এবং তাহার স্থলে নূতন পোষাক আসিতে

পারে কিন্তু সেই অন্তর্নিহিত সত্যটুকু ঠিক থাকে, তাহা অবিনশ্বর।

মহম্মদের ধর্ম্মকে আমরা ক্রিশ্চিয়ানিটির রূপান্তর বলিয়াছি; ইস্‌লাম প্রচারের সময় সিরিয়ায় ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম্মের প্রাণ ছিল না; কতকগুলি সত্যহীন অনুষ্ঠানে, তর্কের কূটজালে ভিতরকার সত্যটু আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল; তখন উহার মৃতকল্প অবস্থা; সেই সময় ইস্‌লামের তূর্য্যনিনাদ; সত্যের প্রবল আঘাতে মিথ্যা অনুষ্ঠান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, আরবে এবং অপরাপর স্থানে প্রাণহীন অনুষ্ঠানের এবং কূটতর্কের স্থলে একটা জীবন্ত সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল।

মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য কি? সত্যের প্রতিষ্ঠা। সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই এ জগতের মূলীভূত নিয়ম। মানুষের কর্ত্তব্য ইহার পরিপন্থী না হওয়া, যাহাতে মিথ্যা আবরণগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং সত্যের উপর এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য। ইসলামে এই সত্যপ্রতিষ্ঠারই ব্যাকুল আহ্বান শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল; কাজেই দলে দলে লোকে মিথ্যা আবর্জ্জনা দূরে রাখিয়া মহম্মদের পতাকামূলে সমবেত হইয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিতে মহম্মদ যখন ইতস্ততঃ তরবারি হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেই সময়েই তিনি মধ্যে মধ্যে শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান করিতেন; সেই সমস্ত উপদেশ একত্রিত হইয়াই কোরাণের সৃষ্টি। মুসলমানের নিকট কোরাণের তুল্য পবিত্র জিনিষ আর কিছুই নাই, কোরাণের প্রতি তাহাদের ভক্তি অসীম, অপরিমেয়। খুব কম ক্রিশ্চিয়ানই আছেন যাঁহারা বাইবেলের প্রতি এইরূপ ভক্তিমান্। কোরাণ মুসলমানের জীবনের নিয়ামক। সামান্য খুঁটিনাটি হইতে মহামহা সমস্যার সমাধান পর্য্যন্ত তাহারা এই কোরাণ হইতেই করে। ঐশী প্রেরণায় এই সমস্ত মঙ্গলময়ী বাণী মহম্মদের নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, কাজেই তাহাদের এই অবিচলিত বিশ্বাস। এই ত্রয়োদশশত বৎসর ধরিয়া শত শত মস্‌জিদে, কোটী কোটী কণ্ঠে এই কোরাণেরই মহান্ ঝঙ্কার প্রতিধ্বনি তুলিতেছে, কোটী কোটী লোক এই কোরাণকেই তাহাদের জীবনের ধ্রুবতারা করিয়াছে।

কিন্তু এই কোরাণের বক্তব্যগুলি মোটেই সুবিন্যস্ত নয়। যে কোরাণের নিকট প্রত্যেক মুসলমানের মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়ে আমাদের তাহা পড়িতে পড়িতে বিরক্তি ধরিয়া যায়। এমন ভাবে ভাবে অসামঞ্জস্য, এমন নির্ব্বোধ সমাবেশ কোথাও কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কর্ত্তব্যপ্রেরণা ভিন্ন অপর কিছুই আমাদিগকে ইহা পড়িতে প্রণোদিত করে না। মহম্মদের শিষ্যবর্গ খণ্ড খণ্ড ভাবে ইহা পাইয়াছিলেন, কাজেই ইহার এই দুরবস্থা। পরিচ্ছেদের দৈর্ঘ্য অনুসারে তাঁহারা পুস্তকখানি সাজাইয়াছিলেন; কিন্তু শেষের দিকে যে পরিচ্ছদগুলি আছে সেগুলি মহম্মদের সর্ব্বপ্রথম রচনা। শেষের দিক্ হইতে পড়িয়া গেলে তবু কোন রকমে ইহা পাঠ করা যায়। মুসলমানেরা বলেন যে ইহা কতকটা ছন্দোবদ্ধ, অনুবাদে ইহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না; তবে পুস্তকখানির ভিতর দিয়া যে এক উদ্ভ্রান্ত প্রাণের ব্যাকুল স্পন্দন রহিয়াছে তাহা বেশ অনুভূত হয়।

মুসলমানেরা কোরাণকে যে এত প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করে তাহার কারণ ইহার প্রাণস্পর্শী সরলতা। ভাষা জটিল হইতে পারে,

ভাব সুবিন্যস্ত না থাকিতে পারে কিন্তু পুস্তকের যাহা সার—সরলতা, তাহা ইহার পূর্ণমাত্রায় আছে। প্রথম পাঠে ইহার সম্যক্ উপলব্ধি হয় না কিন্তু পুস্তকখানি যখন দূরে রাখিয়া চিন্তা করি তখনই উহার অন্তর্নিহিত সত্যগুলি আপনা আপনি আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। বাস্তবিক প্রাণথেকে যে জিনিষ বাহির হয় তাহা সহজেই অপরের হৃদয় স্পর্শ করে। অনেকে বলেন ইহা ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ, মহম্মদের যে সমস্ত দোষ ছিল সেগুলির ঢাকনের জন্য ইহার রচনা, কিন্তু এসকল মিথ্যা প্রলাপে এখন আর লোকের মন ভুলে না! অবশ্য মহম্মদের মন যে একেবারে সরল, তাহাতে মারপ্যাঁচের চিহ্নমাত্র ছিল না, একথা আমি বলিতে চাহি না—এ জগতে একেবারে সরল কে হইতে পারে? তবে মহম্মদ যে ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া শুনিয়াও দোষ ঢাকনার্থ কোরাণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে অস্বীকার্য্য। মহম্মদের ভাষাশিক্ষা হয় নাই, কেমন করিয়া উত্তম শব্দ সমাবেশে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা যায়, সে শিক্ষা তাঁহার ছিল না। একে ত মহান্ সরল হৃদয় বলিয়া, সৃষ্টি স্থিতির জটিল রহস্য হৃদয়ে প্রতিফলিত বলিয়া মনভাবে পরিপূর্ণ—প্রকাশ করিতে গেলে প্রাচুর্য্য হেতু গোলমাল বাধিয়া যায়, তাহার উপর ভাষার আধিপত্য নাই কাজেই কোরাণের এইরূপ অসামঞ্জস্য। কোরাণের ভিতর যে একটী ব্যাকুল স্পন্দন রহিয়াছে—সৃষ্টি স্থিতির জটিল রহস্য সমাধানের একটা গভীর প্রচেষ্টা রহিয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মহম্মদের প্রচারক জীবন বড়ই ঘাতপ্রতিঘাত-সঙ্কুল; কোরাণ প্রণয়নেও তাঁহার উন্নতি অবনতির একটা ছাপ পড়িয়াছে, কখনও ভাবগুলি সুন্দর ভাবে কথিত, কখনও দুর্ব্বোধ্য জটিল ভাবায় পরিপূর্ণ।

মহম্মদ এই ত্রয়োবিংশতি বৎসর ধরিয়া যুদ্ধই করিয়া আসিতেছেন, কত বিনিদ্র রজনী কাটিয়া গিয়াছে, চিন্তা জর্জ্জর মহম্মদ তখন প্রাণে প্রশ্নের উত্তর পাইলেই ভগবৎ প্রেরিত বলিয়া মনে করিতেন—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। প্রাণের অনুসন্ধিৎসার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না, সে সময়ে হঠাৎ যদি কোন উত্তর পাওয়া যায় তখন ভাব প্রবণ হৃদয় স্বতই তাহা ভগবৎ-প্রেরণা বলিয়া মনে করে; এইজন্য মহম্মদ কোরাণকে ভগবৎ-প্রেরিত বলিয়া তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে প্রতিভাত বলিয়া মনে করিতেন। ইহাতে ভণ্ডামী ছিল না—মহম্মদের কাছে এ জীবন বড়ই সত্য; বড়ই বাস্তব, তিনি এই জীবন লইয়া কি জাকামীর প্রশ্রয় দিতে পারেন? দোষ তাঁহার ছিল, থাকিতেও পারে—কিন্তু তাঁহার ভাব পরিপূর্ণ, তেজস্বী, উদ্দাম প্রাণ ছিল, তাহাতে আত্ম-সম্মান-লাভের উচ্চাশার স্থান ছিল না।

কোরাণ নানা দোষে দুষ্ট হইলেও তাহার ভিতর দিয়া একটা সরলতার ঝঙ্কার অনুভূত হয়। তাঁহার যে প্রকৃতির অন্তস্তম প্রদেশ পর্য্যন্ত একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার ভিতর দিয়া গভীর চিন্তাশীলতার এবং প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের প্রবাদ, প্রবচন লইয়া ইহার অধিকাংশ পূর্ণ হইলেও বিরক্তিজনক পুনরুক্তিতে ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইলেও একটা কবিজনোচিত নিপুণ প্রেক্ষণে ইহা অমূল্য। আল্লার মহিমস্তোত্রগুলির সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কিছুই নাই; কারণ সে সমুদয় সম্ভবতঃ হীব্রু হইতে প্রাপ্ত, তাহা না

হইলেও তাহাদের অপেক্ষা অনেকানেক উত্তম স্তোত্র আছে; ইহাতে কোরাণের বৈশিষ্ট্য নয়, বৈশিষ্ট্য ইহার সরলতায় ইহার গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে।

কোরাণে কোনও অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ নাই। অদ্ভুত ঘটনা? মহম্মদ বলিতেন, এ পৃথিবীতে কি অদ্ভুত নয়? উপরে এই তারকাখচিত অনন্ত নীল আকাশ, আশে পাশে মুকুলিত পাদপসমূহ, দূরে উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্র, ইহাদের চেয়ে অদ্ভুত আর কিছু আছে? সকলের সেরা অদ্ভুত জিনিষ মানুষ; সামান্য ধূলিকণা হইতে ভগবান্ মানবের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রাণ আছে, ক্ষমতা আছে, চিন্তাশক্তি আছে, সর্ব্বোপরি আপনা আপনির প্রতি একটা সহানুভূতি আছে; ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত আর কিছু আশা করা যায়?

মহাপুরুষের যাহা সর্ব্বপ্রধান জিনিষ—সরলতাপ্রসূত গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তাহা মহম্মদের পূর্ণমাত্রায় ছিল; তাঁহার প্রাণ ছিল, কাজে কাজেই তিনি ধর্ম্মপ্রচারক না হইয়া যে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেন। সকল মহাপুরুষই এক উপাদানে তৈয়ারি, বেষ্টনীর গুণে কেবল তাঁহাদের পার্থক্য। গলিত লৌহ যেরূপ ছাঁচে ঢালা হয় সেইরূপ আকার ধারণ করে, মহাপুরুষও সেইরূপ বেষ্টনী অনুসারে আকার ধারণ করেন।

এই সাগর মেখলা ধরিত্রী যে এক অদ্ভুত জিনিষ, ইহা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরূক থাকিত। তিনি জানিতেন যদিও পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য্য, এত ভীষণ কঠোরতা, এত অদ্ভুত জিনিষের একত্র সমাবেশ তথাপি ইহা কিছুই নহে, ছায়া, তোজবাজী; ভগবানের সৌন্দর্য্যের একটা আবরণ মাত্র। যে পর্ব্বত সমূহ ঘুগ ঘুগ ধরিয়া কঠোর হস্তে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, সেও কবে কোন্ আঘাতে চূর্ণ, বিচূর্ণ হইয়া কালস্রোতে মিশিয়া যাইবে, এখানের কিছুই স্থায়ী নহে, সব নশ্বর। এই সমস্ত জিনিষের ভিতর দিয়া যতদিন ভগবানের অনন্তশক্তি লীলা করিবে, ততদিনই ইহাদের অস্তিত্ব; সেই শক্তিলীলার অবসানে ইহারাও কোন্ অজানা রাজ্যে চলিয়া যাইবে। এখন লোকে আর এই বিশ্বব্যাপিনী ঐশী শক্তিতে বিশ্বাস করে না, এখন তাহারা প্রকৃতি পাইয়াছে, প্রকৃতি হইতে নানা তর্কের এবং পরীক্ষার সাহায্যে কত নিয়ম বাহির করিয়াছে; এখন তাহারা তাঁহার সত্তার অনুভূতি আর পায়না। এ পৃথিবী যে কিছুই নয়, ইহা ত তাহারা স্বীকারই করে না অধিকন্তু ইহা যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ উপাদানে নির্ম্মিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত, ইহাতে যে সেই তথাকথিত ভগবানের কোন হাতই নাই ইহা তাহারা খুব নিপুণতার সাহায্যে আবিষ্কার করিয়াছে। যে বিজ্ঞান ভগবানের বিশ্বব্যাপী স্পন্দনের কোনও সন্ধানই রাখে না তাহাত মৃত, স্পন্দনই প্রাণ; তাহা যদি না রহিল তবে আর শক্তি কোথায়? এ বিজ্ঞান এখন শুষ্ক প্রাণহীন বৃহৎ কাষ্ঠ, ইহা আর পল্লবিত হইবার কোনও আশাই নাই। প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে গ্রহনক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলই ত অদ্ভুত—এই জ্ঞান হইলে মানুষ গভীর বিস্ময়ে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধান করে; তাঁহার প্রতি তাহার প্রাণ স্বতই নত হয়। ভক্তি এই বিস্ময় প্রসূতা, ভক্তিই আবার জ্ঞানের মূল। আজকালকার বিজ্ঞান বিস্ময় প্রসূত ভক্তির অভাবে শুষ্ক। প্রাণ যদি শুষ্ক হয়, তবে তাহাতে আর জ্ঞানের সঞ্চার হইবে কোথা হইতে?

মহম্মদের ধর্ম্মকে অনেকে ভোগাত্মিক বলিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা তাঁহার দোষ নয়; আরবের তদানীন্তন অবস্থার দোষ; বিলাসিতায়, পাপে আরব তখন ডুবুডুবু খাইতেছিল। মহম্মদ তাহাদের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সাধ্যমত সেগুলি দূরও করিয়াছিলেন। তৎপ্রোক্ত ধর্ম্ম ভোগাত্মিক ত নয়ই বরং বহু আয়াসসাধ্য; কঠোর উপবাস, দিবসে পাঁচবার উপাসনা, তৎপূর্ব্বে স্নান, ইত্যাদি নানা কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুষ্ঠান ইহার অঙ্গ। ভোগে যাহার পরিতৃপ্তি এমন কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রাণস্পর্শ করিতে পারে, না এত শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে? মহম্মদীয়গণ যে সমস্ত লোকহিতকর কার্য্যে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সে সমস্ত কি কখনও সম্ভোগ-প্রণোদিত হয়? মানুষের আত্মসম্মান জ্ঞান বড়ই প্রখর, অতি অধম পাপীও কোন না কোন বিষয়ে আত্মসম্মান দেখাইয়া থাকে। মানুষকে সুপথ দেখাইয়া দিলে মানুষ বড়ই তাহার অনুসরণ করে; ভোগবিলাসের উত্তেজনার দরকার হয় না।

মহম্মদ নিজে কখনও বিলাসী ছিলেন না, অতি সামান্য আহারে এবং পোষাকে তাঁহার পরিতৃপ্তি। মন উঁচু সুরে বাঁধা থাকিলে কি আর তাহা পার্থিব চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়? তাঁহার চরিত্র যদি এই সমস্ত গুণে অলঙ্কৃত না হইত তাহা হইলে কি আজন্ম-প্রকৃতি-পালিত আরবগণ তাঁহাকে বড় বড় সম্রাট্ অপেক্ষাও পূজা করিত? তাহারা, তাহাদেরই মত অথচ তাহাদের পথপ্রদর্শক একজন পাইয়াছিল কাজেই ভক্তি-প্রণত-চিত্তে অবতার বলিয়া তাঁহাকে জগৎ সমক্ষে প্রচার করিয়াছিল।

মহম্মদের অন্তঃকরণ বড়ই উদার, ভগবানে বড়ই নির্ভরশীল ছিল। যখন তাঁহার কন্যা কালগ্রাসে পতিত হইলেন তখন প্রকৃত মহাপুরুষের মত সরলভাবে বলিয়া ছিলেন যিনি দিয়াছিলেন তিনিই নিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক যখন তাঁহার দ্বিতীয় শিশু সেইদ্ ট্যাবক্ যুদ্ধে পতিত হইল তখন তিনি বলিয়াছিলেন 'সে তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া ভগবানের নিকট গিয়াছে, তাহাতে আর শোকের কি আছে?' কিন্তু সেইদের কন্যা আবার সেই মহম্মদকে সেইদের মৃতদেহ লইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিল এই সমস্ত ঘটনা হইতে মহম্মদের প্রকৃত মানবত্ব পরিস্ফুট হয়। তিনি যে উঁচু হইয়াও নিজেকে সকলের সমান বলিয়া মনে করিতেন, মানবের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী—ইহাই তাঁহার চরিত্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মহম্মদের মনে গর্ব্বের চিহ্নমাত্র ছিল না। না জানিয়াও পতিত হইয়া তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তাঁহার মুখে মধু অন্তরে হলাহল ছিল না। যুদ্ধে কত নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে হইত সে দোষ ক্ষালনার্থ তিনি কখনও সূক্তগর্ভ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন না। রাজা মহারাজা হইতে দীন দরিদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে সমব্যবহার এবং অপক্ষপাত উপদেশ পাইত। তোষামোদ তাঁহার কাছে ঘৃণা। এ জীবন তাঁহার কাছে বড়ই সত্য, বাস্তব, খেলার জিনিষ ছিল না। তিনি সত্যের প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, আমাদের ন্যায় করিতে হয় বলিয়া গতানুগতিক অনুসন্ধান করিতেন না।

মহম্মদের উপদেশগুলি যে একেবারে অতি সুন্দর একথা আমরা বলিতে পারিব না, তবে তাহাতে যে যথার্থ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার একটী গভীর আকুলতার ব্যঞ্জনা আছে তাহা বলিতেই হইবে। ক্রিশ্চিয়ানিটির ন্যায় এক-

গালে মারিলে আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়াই ক্ষমা তাঁহার ধর্ম্মে নাই তাঁহার ধর্ম্ম যথোচিত প্রতিশোধ লইতে শিক্ষা দেয় তাঁহার ধর্ম্মে উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই—সকলেই সমান। পরোপকারের জন্য তিনি ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন; যথার্থ মুসলমানকে তাহার উপার্জ্জনের দশমাংশ আর্ত্তের অভাব মোচনে ব্যয় করিতে হইবে।

মহম্মদের ভোগাত্মিক স্বর্গ, নরক আমাদের মনে কেমন একটা বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয়। বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে ইহার অধিকাংশই পরবর্ত্তী মৌলবীগণের রচনা। যাহা কিছু মহম্মদের সময়কার তাহা আরবের তদানীন্তন অবস্থাজনিত। কোরাণে স্বর্গের ভোগ বিলাসের প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বড় বিশেষ কিছুই নাই। আছে শান্তির কথা; পৃথিবীর বিদ্বেষ, শত্রুতা সেখানে স্থান পায় না, আছে শুধু শান্তি।

কোরাণের স্বর্গ, নরক সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ, ভোগবিলাসের কথা থাকিলেই যে তাহা অত্যন্ত দোষের হইল তাহা নয়; ভোগের ক্রীতদাস হওয়াটাই দোষাবহ, ভোগ করি অথচ করি না, ঐশ্বর্য্য স্তূপের উপর বসিয়াও নির্ব্বিকার ভাব—ইহাতে দোষাবহ কি আছে? দ্বিতীয়তঃ, ভোগাত্মিক স্বর্গ, নরকের দৃষ্টির দ্বারায় মহম্মদ শিষ্যগণের মন কর্ত্তব্যের পথে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। মানুষের কর্ম্মের যে এ জগতেই পরিসমাপ্তি নয়, ইহার পরও পাপীর শাস্তি হয়, পুণ্যাত্মা সুখ, শান্তি লাভ করে; ইহা তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন।

মহম্মদের ধর্ম্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই মুসলমানেরা অবিচলিত বিশ্বাসে ইহাকেই আঁকড়িয়া এই ত্রয়োদশশত বর্ষকাল পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। বিশ্বাস উন্নতির মূল। অন্ধকার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবে যখন মহম্মদের আবির্ভাব হইল, তখন তাহারা তাঁহার ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়াই মুসলমানধর্ম্ম এখনও এত প্রবল। ঘনান্ধকার রাত্রে হঠাৎ বজ্রপাতে ভূমিতলস্থ শুষ্ক কাষ্ঠসমূহ যেমন জ্বলিয়া উঠে, আরবও সেইরূপ মহম্মদের জলন্ত ঐশী উত্তেজনায় প্রজ্বলিত হইয়াছিল। কাল সে তেজের কিছুমাত্র হ্রাস করিতে পারে নাই, তার দীপ্তি এখনও চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বি, এ।

কবে দেখা পাব?

কতদিনে তোমার দর্শন পাইব? দেখিব দেখিব মনে করিয়া জগৎময় ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছি, কবে দেখা পাইব? এ দীনের প্রতি কৃপা করিয়া কবে দেখা দিবে? ভীষণ জঠরযন্ত্রণা ভোগের পর এই আঁধার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইয়া জ্ঞান হওয়া অবধি পশুবৃত্তি লইয়া কেবল বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য অহরহ প্রধাবিত হইয়াছি। কই, একদিনও ত তোমাকে দেখিতে চাহি নাই। আজ সহসা কেন—তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল?

চিরবাসনার দাস হইয়া অন্ধ হইয়া গিয়াছি—দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর। ভাল মন্দ কিছু বিচার

করিয়া লইবার শক্তি আমার নাই। তবুও ত দর্শনের আশা যায় নাই। জানিয়াছি চিরসুন্দর তুমি। মানুষ চিরকালই সৌন্দর্য্যের ভিখারী। তাইকি আজ তীব্র রূপের মোহ লইয়া তোমাকে দেখিতে চাহিতেছি ? তাই কি ? সুন্দর যে তাহাকে ত সকলেই দেখিতে চায়। কাননে প্রস্ফুটিত কুসুমের ললিত সৌন্দর্য্য বিকশিত দেখিলে, কাহার প্রাণ না বিমোহিত হয় ? যখন নববর্ষাসমাগমে শস্যশ্যামলা ধরিত্রীর শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, তখন সে দৃশ্য দেখিলে কাহার হৃদয় না মুগ্ধ হয় ? রূপ ত মোহের জন্যই।

তুমি সুন্দর বলিয়া কি রাঙ্কিত স্বার্থের বোঝা লইয়া তোমাকে দেখিতে চাহিতেছি ? যে লালসা লইয়া নর নারীর অনুসরণ করে, অথবা যে আকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দম্যবেগের বশে পশু আপন সঙ্গিনীর সঙ্গমাভিলাষ করে, সেই বাসনা, সেই হীন লালসা লইয়া কি তোমায় দেখিবার প্রয়াসী হইয়াছি ?—মূর্খ আমি, বুদ্ধিহীন, হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিলাম, কিছু বুঝিলাম না। কেবল প্রবল বাসনার বশে হাহাকারে জগৎময় অন্বেষণ করিতে বাহির হইলাম। মনে হইল, যে সুন্দর, তাহাকে সকলেই ভালবাসিতে চায়, যে কুৎসিত, তাহাকে কে ভালবাসে ? কুৎসিতকে যে ভালবাসে সেই সুন্দর! সেই স্বার্থহীন অকপট প্রেমিক! আত্মতৃপ্তির লেশ যাহার হৃদয়ে আছে, সে কখন কুৎসিতকে ভালবাসিতে পারে না; সম্ভোগের তীব্র বাসনা যাহার হৃদয়াধিকার করে নাই, যে স্বভাববশতঃ না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে না, সে সুন্দর অসুন্দর, সুরূপ কুরূপ, কিছুরই বিচার করে না। জগৎসংসারের চতুর্দ্দিকেই তাহার ভালবাসার ধন বিরাজিত থাকে। যাহাকে দেখে তাহাকেই ভালবাসে।

তোমাকে দেখিবার এই যে বাসনা আজ হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে ইহা কি ? দেখিয়াই তৃপ্ত হইব—না আর কিছু চাহি। জ্ঞানচক্ষুহীন, কিছুই বুঝিতে পারি না। মানবের মধ্যে কেহ বা ক্রমাগত ভোগ্যবস্তু আহরণ করিয়া ভোগ না করিয়াই অন্য ভোগ্যবস্তুর অন্বেষণে প্রধাবিত হয়। কেহ বা ভোগ্যবস্তু পাইয়া তাহাকে ভোগ করিয়া যখন দেখে যে তাহাতে কিছু নাই, তখন অন্য শ্রেষ্ঠতর ভোগ্যবস্তুর অন্বেষণ করে। এই দুই প্রকারের কামনা জগতে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমটি তামসিক ও দ্বিতীয়টি সাত্ত্বিক কামনা। তোমাকে দেখিবার যে বাসনা লইয়া আমি বাহির হইয়াছি, ইহা কোন্ জাতীয় ? কে বুঝাইবে, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ? কোথা গুরুদেব, আজ সন্দেহে আন্দোলিত হৃদয়কে মিষ্ট উপদেশে শীতল করিবে—কাহার মধুময় আশ্বাসবাণী শ্রবণে আমার প্রাণ সুস্থির হইবে ? চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। কোন্ ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া এ অকূলসমুদ্রে কূল পাইব ? হায় এ অভাগার কি হইবে ?

দেখা কি দিবে না ? নাথ, দেখিতে দেখিতে যে দিন ফুরাইল। যখন অবশ ইন্দ্রিয়গণ স্বকার্য্যে বিরত হইবে, বায়ু আর দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে না—তখন কি দেখা দিতে আসিবে ? যখন এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূতে মিশিবার চেষ্টা করিবে, যখন নদনদীচাঞ্চল্যতা বিপুলা ধারত্রী আস্তে আস্তে আমার নয়নের অন্তরাল হইতে উদ্যত হইবে, তখন কি আসিবে ? তখন আসিলে কি ফল হইবে ? যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম আপন কার্য্যসাধনে অক্ষম হইবে, যখন সবে ঘিরিয়া সংসারপ্রবৃত্তি সমূহ আসিয়া হানা দিবে, হয় ত মনের ক্রিয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিবে, তখন কি এ দীনকে

দয়া করিবে? তখন আসিলে কি হইবে? তখন কি এ মনের কথা জানাইবার শক্তি থাকিবে? তাই এই বেলা দেখা দাও, প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে। এস, এস, হৃদাসন পাতিয়া রাখিয়াছি! সহকষ্টে, অশ্রুজলে ধৌত করিয়াছি, তোমার বসিবার উপযুক্ত আসন হইয়াছে কি না জানি না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিমত আসন পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এস, এস নাথ, আমার শূন্য হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত হও। আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাউক। আর পারি না। সংসারের শত সহস্র প্রলোভনের সহিত অহরহ সংগ্রাম করিতে আর পারি না। প্রবল রিপুগণের প্রহারে হৃদয় মন জর্জ্জরিত, এস দয়াময়, একবার সেই দেবমুনীন্দ্রবাঞ্ছিত রাঙ্গাচরণ আমার হৃদয়ে স্থাপন কর, সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাক্। প্রবৃত্তিকে বিদূরিত করিয়া নিবৃত্তিকে স্থাপিত কর, প্রাণে শান্তি আসুক। আর অশান্তি লইয়া ঘর করিতে পারি না। তোমার অদর্শন যে তোমাগত প্রাণ ভক্তের কত যন্ত্রণাদায়ক, তাহা ভক্তই জানে। আর কে বুঝিবে? যখন নন্দালয়ে রাখালবালকগণের সহিত প্রত্যহ প্রাতে গোষ্ঠে গোচারণ করিতে যাইতে, তখন মাতা যশোমতী ও অন্যান্য গোপগোপীর যে কি দশা হইত তাহা তাঁহারাই জানে। রাসোৎসব সম্ভবপর হইয়া যখন তুমি ব্রজদেবীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলে, তখন তাঁহাদের যে কি হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের করুণস্বর শুনিলেই উপলব্ধি হইবে।

"অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাং।"

গোপী গীতা—

তোমার নিমেষমাত্র কাল অদর্শন তাহাদের যুগপরিমিত কালের সমান হইয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়াছিল। নয়নের নিমেষ সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া আজ সৃষ্টিকর্ত্তাকেও তাঁহারা গালি-পাড়িয়াছেন। তোমায় দেখিতে দেখিতে চক্ষুর পলক পড়ে কেন? নির্নিমেষলোচনে তোমাকে দেখিব বলিয়া যে তাহারা সর্ব্বত্যাগিনী, তোমাতে ত তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান ছিল না, তাই শ্রীভাগবতকার বলিলেন "আরবৃত্যাপি সঙ্গতা।"

কি বলিব? কি বলিয়া ডাকিলে তুমি শুনিতে পাইবে? বুঝিতে পারিবে কি যাতনায় প্রাণ জ্বলিতেছে, ভাষায় এমন কি বাক্য আছে যাহা প্রয়োগ করিব? কি বলিয়া ডাকিব? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, কোন ভাবে তোমায় আবাহন করিব? কোন ভাবে তোমায় আবাহন করিলে তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে? আমার অন্ধকার হৃদয়াগার আলোকিত করিতে তোমার মোহনরূপে উদিত হইবে? বল বল দেব, কিরূপে তোমায় পাইব? কেমন করিলে তুমি দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিবে? দেখা দাও, দেখা দাও, আর থাকিতে পারি না। প্রাণ যে কত ব্যাকুল বলিয়া কি জানাইব? প্রাণের এ জ্বালা জুড়াইতে, এ ব্যাকুলতা দূর করিতে একবার দেখা দাও। সেই কতকাল তোমা ছাড়া হইয়া এ সংসার-রণ্যে বিচরণ করিতেছি, আরও কতকাল কাটিবে? দেখা কি দিবে না? আর দেখিতে কি পাইব না? যখন ত্রিতাপতপ্ত প্রাণ শান্তির আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার পানে চায়, তখন সেই কাতর অশ্রুসিক্ত বদন

দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না ? কাছে আসিয়া সান্ত্বনা করিতে ইচ্ছা হয় না ? শ্রীচরণে এত কি অপরাধ করিয়াছি যে এই মরণাধিক যাতনা চক্ষে দেখিয়াও নিরপেক্ষ রহিয়াছ ? এ জীবনে কি হইবে না ? জীবনের এপারে যদি না হয়, জীবনের পরপারেও কি হইবে না ?

তোমায় দেখিব। শুনিয়াছি যখন পাণ্ডববীর অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলে তখন নাকি বলিয়াছিলে—

"দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ
পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্।"

কে আমায় দিব্যচক্ষু দিবে ? এ চর্ম্ম চক্ষে যদি দেখিতে না পাই, তবে কে দয়া করিয়া তোমায় দর্শনের উপযোগী নয়ন দিবে ? কাহার পদে প্রণত হইলে, দয়া করিয়া আমায় দিব্য চক্ষু দিবেন ? বল, বল নাথ, সে কি আমাদের জগজ্জননী পরা প্রকৃতি যোগমায়া যাহার খেলায় এই জগত খেলিতেছে ? যাহার বর্ণনা শ্রীভাগবতে ২য় স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে বলিতেছেন—

"জ্ঞানেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥"

ঠাকুর, ইহা ত তোমার বাক্য, ব্রহ্মাকে ত তুমিই উপদেশ দিয়াছ। তোমাকে দর্শন করিতে হইলে, প্রত্যক্ষানুভূতি বা পরমাত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনুকূলা মায়ার সাহায্য লইতে হয়। যে শক্তির দ্বারা সত্য বস্তুই স্বরূপে জানা যায়, তাহাই অনুকূলা মায়া শক্তি। ইহার সাহায্যে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই শক্তিকেই কি পূজা করিব ? ইনি কি দয়া করিয়া তোমায় দেখাইবেন ? সেই ভাল—

কই মা দয়াময়ী, একবার দয়া কর মা। তোমার প্রতিকূলা শক্তি ত্যাগ করিয়া একবার অনুকূল হও মা ! শ্রবণ কীর্ত্তনাদিদ্বারা প্রেমের উদয় হইলে যে অপরোক্ষানুভূতি বলে রূপগুণাদি মাধুর্য্যময় ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সে প্রেম আমার নাই। তোমার প্রতিকূলা শক্তির বলে চক্ষুহীন অন্ধ আমি। একবার অনুকূল হও মা, এ অন্ধ নয়নে দৃষ্টি দে মা। আমি তোর শরণাগত মা ! ভজনসাধনহীন উন্মার্গগামী পুত্র, তা বলিয়া কি দয়া হইবে না ? তুমি শরণাগতপালিনী, তুমি দয়া করিয়া চক্ষু খুলিয়া দাও। আমি প্রাণ ভরিয়া রূপ দেখি। সেই মদনমোহন, সেই অপ্রাকৃত নবীন মদনরূপ প্রাণ ভরিয়া দর্শন করি। নির্নিমেষ পলকহীন চক্ষে সেই রূপ দেখি। এ দর্শনের উপযোগী নয়ন আমায় দিবে কি ? আমার দগ্ধ ভাগ্যে সে সুযোগ দিবে কি ?

কাঙ্গালের ঠাকুর, তোমায় যখন দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন দেখি কতদিনে দয়া কর। কতকাল পরে এ নয়নের সমীপে উদিত হও। মাকে এত ডাকিলাম, মা কি দয়া করিবে ? মা আমার আবরণ বিক্ষেপরূপা প্রতিকূলা মায়াশক্তিদ্বারা সব আবরিত করিয়া রাখিয়াছেন। কতদিনে এ মোহ যবনিকা অন্তরিত হইবে ? কতদিনে এই বিশাল মায়ার খেলার অন্তরালে, কি অমূল্য, কি মধুর, কি প্রাণভরা ধন লুক্কায়িত আছে দেখিতে পাইব ? পাইব কি ? এ জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সে অতীন্দ্রিয় বস্তু কিরূপে উপলব্ধি হইবে—না মহামায়ারূপী মা আমার কার্য্যের সুসার করিবেন না। তবে আর কাহার শরণাগত হইব ? কে দীনকে পথ বলিয়া দিবে ? কোন্ পথে যাইলে আমার ইহ পরকালের সর্ব্বস্ব ধন আমার সমীপবর্ত্তী

হইবে? শুনিয়াছি আমার প্রাণধন নাকি কৃষ্ণলীলা সহজ বোধ্য করিবার জন্য শ্রীধাম নবীয়ানগরে অবতীর্ণ হইয়া আচণ্ডালে উদ্ধার করিয়াছিলেন? সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়াছিলেন আর মূর্ত্তিমান সেবানন্দ নিতাই-চাঁদ রূপে জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন? নিতাইচাঁদ দয়ার অবতার, তাঁহাতে প্রপন্ন হইলে—শুনিয়াছি সব সুলভ হয়! নিতাইচাঁদ অবতীর্ণ না হইলে, হরিনাম স্রোতে কে জগৎ ভাসাইত? নিতাই প্রেমের অবতার; দুর্ব্বৃত্তের প্রহারেও যাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই, অজস্র শোণিতপাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যিনি সেই শোণিতপাতকারীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তিনি ব্যতীত পতিত উদ্ধারকারী আর কে আছে? নিতাইচাঁদের দয়া হইলে তবে জীব তোমার শ্রীচরণে স্থান পায়। অবিরত "হা নিতাই দয়া কর, হা নিতাই দয়া কর!" এই বলিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে নয়নজলে হৃদয়মলা বিধৌত হইলে তবে চিত্তদর্পণে সেই অনুপম ভাতি, সেই মোহন মূরতি প্রতিভাত হইবে। নতুবা আর উপায় নাই। প্রেমভাণ্ডারের চাবি আমার নিতাইচাঁদের হস্তে, তাঁহার দয়া না হইলে সে প্রেমসম্ভোগ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমলাভের ইহা ভিন্ন উপায় নাই। তাই আজ কাতর প্রাণে নিতাইচাঁদের পদকমলে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। নিতাইচাঁদ প্রেমবিষয়ে মুক্তহস্ত। প্রেমদানে তাঁর পাত্রাপাত্র বিচার নাই। জাতিনির্ব্বিশেষে প্রেমদান দয়াল প্রভুর স্বভাব, তাই আজ আশা হইতেছে মনস্কামনা পূর্ণ হইলেও হইতে পারে। কারণ,

"সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ প্রেমোদ্দাম
প্রভু আজ্ঞায় কৈলা যাঁহা তাঁহা প্রেমদান।"

সেই নিতাইচাঁদ যদি এই দগ্ধভাগ্য দীনজনের প্রতি সদয় হইয়া সেই অমূল্য, দেবদুর্লভ ধনের সন্ধান যেন তবেই হইবে, নতুবা এই কাতরক্রন্দনই সার।

জানি, সব জানি, সব বুঝিতে পারি, কিন্তু পোড়া মন বোঝে না। জানি, যাহার চরণে প্রাণমন সমর্পণ করিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে, প্রমত্ত মনকে কৈ কোন মতেই ত সেদিকে ফিরাইতে পারিতেছি না। কি হইবে, তবে কি করিব—কোথায় যাইব? কাহার শরণ লইলে আমার নয়ন সার্থক করিয়া সেই ভুবনমোহনরূপ আমার সম্মুখে উদিত হইবে? কতদিনে প্রাণনাথের শ্রীমুখ দর্শন করিব ও বলিব

"নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।"

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না যেন তোমাতে অচলা ভক্তি থাকে। নির্ব্বাণমুক্তি চাহি না; পরমহংসদেব বলিতেন "চিনির পাহাড় হওয়া চেয়ে পিপ্‌ড়ে হওয়া ভাল।" আমায় পিপীলিকা কর, যেন তোমার প্রেমের মধুর এক বিন্দু আস্বাদন করিয়া বিভোর হইয়া যাই।—লক্ষ লক্ষ বার জঠর যন্ত্রণা ভোগ করিব, লক্ষ লক্ষ বার পৃথিবীতে আসিব কিন্তু তোমা ছাড়া না হই। দেব, নাথ, দয়াময়, এই করিও যেন তোমা বিরহিত হইয়া ধরিত্রীতে আর কখন আসিতে না হয়। এইবারে যে জ্বালা সহিতেছি, তোমা ছাড়া হইয়া এ জীবনে যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা ভোগ হইতেছে, হে দয়াল ঠাকুর, এ যাতনা যেন আর না পাইতে হয়, তোমা ছাড়া হইতে না হয়। সংসারে আসিয়া শত সহস্র কর্ম্ম করিবার অবসর হয় কিন্তু তোমাকে

এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণ ভরিয়া ডাকিবার অবসর হয় না। ইহাই বিচিত্র লীলা! তাই ভক্ত কবি গাহিলেন, সন্তপ্ত প্রাণে বলিলেন

"আধ জনম হম, নিদে গোঙায়নু
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতনু
তোহে ভজব কোন বেলা।"

জন্মগ্রহণ করিয়া শিশুকাল ও বৃদ্ধকাল সামর্থ্যহীন অবস্থায় কাটিয়া গেল, ক্রমে যৌবন আসিলে, যৌবনের পশুবলদৃপ্ত হৃদয় লইয়া কেবল রমণীলতাস্থলাভে জগৎময় ছুটাছুটী করিতে হইল, আর জীবনের অর্দ্ধাংশ কাল কেবল নিদ্রাতেই কাটিল, ভক্ত কবি অনুশোচনার সহিত তাই বলিলেন

"তোহে ভজব কোন বেলা!"

দয়াময়, এইরূপ মায়ার কুহকে পতিত হইয়া আর কতকাল তোমা বিরহিত হইয়া থাকিতে হইবে? দেখা কি দিবে না? দীনের কলুষতপ্ত হৃদয় শীতল করিতে মোহনরূপে কি একবার উদিত হইবে না? না হয়, লও, এ তাপাক্রান্ত অসার জীবন লও, এবারের লীলা খেলা সাঙ্গ করিয়া দিয়া, বারান্তরে যাহাতে তোমাগত প্রাণ হইয়া আসিতে পারি, দয়া করিয়া, এই কর। আর পারি না, দৃষ্টি হীন হইয়া আর এ অন্ধকূপে নিমজ্জিত থাকিতে পারি না। দেখা দাও, দেখা দাও দয়াময়। প্রাণ যে আকুল হইয়া উঠিল। তোমার বিরহানল যে হৃদয়ের পরতে পরতে বিষজ্বালা ধরাইয়া দিল। এ জ্বালা কি শান্ত হইবে না?

আমি সিদ্ধি চাহি না। আমি মোক্ষ চাহি না, আমি স্বর্গ চাহি না, অণিমা, মহিমা, লঘিমাদি অমানিকী সিদ্ধি, দৈহিক সিদ্ধি, ঐন্দ্রিয়িক সিদ্ধি কিছুই চাহি না। দয়া করিয়া তোমার শ্রীচরণে একটু স্থান দাও, তোমার শ্রীচরণতলে বসিয়া বসিয়া নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে তোমার দর্শন করিব। সেই কন্দর্পদর্পহা, সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ রূপ দর্শন করিয়া বিভোর হইয়া যাইব। দেবত্ব চাহিনা, ইন্দ্রত্ব চাহিনা, ব্রজদেবীগণ যে স্থানে পদক্ষেপ করেন, সেই স্থানের একটি ক্ষুদ্র রেণুকা হইয়া তাঁহাদের চরণস্পৃষ্ট হইব। যদি তাঁহাদের অগাধ প্রেমের কণামাত্র পাইয়া ধন্য হইতে পারি। আর কিছু চাহি না। কবে

"নয়নং গলদশ্রু ধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি।"

তোমার নাম, ঐ অমিয়ামাখা সুমধুর নাম গ্রহণ মাত্রেই কবে আমার হৃদয় পুলকপূর্ণ হইবে? নয়ন হইতে দরদরিত ধারা প্রবাহিত হইবে, কবে তোমার নাম স্মরণ মাত্রেই আমার হৃদয়ে তোমার ও মূর্ত্তি ও অনুপম মনোহর মূর্ত্তি উদিত হইবে? এই মাত্র চাই, আর কিছু চাই না। তোমার অদর্শনে "ত্রুটি যুগায়তে," তোমার বিরহে জগৎ অন্ধকার। এস, এস নাথ, আমার হৃদাসনে এস, আমার হৃদয়ে উদয় হও

"আমার হৃদয় মাঝে, সেই মোহন সাজে
উদয় হওহে ব্রজের বাঁকা হরি।"

নহিলে প্রাণ যায়। যেমন তোমার অদর্শনে গোপীগণের

"যুগায়িতং নিমিষেন চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥"

নিমেষ মাত্র কাল যুগপরিমিত বোধ হইত, তোমার অদর্শনে তাহাদের নয়ন প্রাবৃট্‌কালের আকাশের ন্যায় হইত ও সর্ব্বদিক শূন্যময় বোধ হইত।

ঠাকুর, সে প্রেম আমি কোথা পাইব?

বিন্দু কি সিন্ধুর সমান হইতে পারে? তুমি দয়াময়, তুমি দয়া কর। দয়া করিয়া দর্শন দাও। অদর্শনে প্রাণ যায়। আমি প্রেম জানি না, ভক্তি জানি না, ভজন, সাধন কিছুই জানি না, কেবল জানি তোমার নাম। তোমার স্বরূপ জানি না, তোমার বিভূতি জানি না, জানি কেবল তোমার রূপ, গুরুদেব শিখাইয়াছেন, তাই জানি "জ্যোতিরভ্যন্তরে-রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং।" দেখা কি দিবে না? দেখিব দেখিব মনে করিয়া কি আশার আশায় এ পাপের বোঝা আজীবন বহিব? মনে হয় দেহত্যাগ করিলে, প্রাণ ভরিয়া যে তোমার নাম করিতেছি তাহাও আর হইবে না। তাই ভাবি দেহ থাক্। যতদিন দেহ থাকিবে, তোমার নাম করিতে করিতে যাইব। শুনিয়াছি নাম করিলেই নামীর উদয় হয়, নাম ও নামী অভেদ। নাম করিতে করিতে যদি মনে মুখে এক করিয়া সরল প্রাণে একদিন ডাকিয়া ফেলি তাহা হইলে আর থাকিতে পারিবে না। আসিতেই হইবে, দেখা দিতেই হইবে। তাই ডাকিব, দেখা পাই বা না পাই যতদিন দেহ থাকিবে, ততদিন ডাকিয়াই যাইব, দেখি কতদিনে তোমার দয়া হয়—কতদিনে দেখা দেও।

তুমি ত নিষ্ঠুর নও। তুমি যে প্রেমময়, ডাকিলেই দেখা দাও। তোমায় দেখিবার জন্য, তোমায় দেখিয়া জীবনধারণ সার্থক করিবার জন্য তোমায় যে ডাকিবে, সে ত তখনই তোমার দর্শন পাইবে। তবে দেখি কতদিনে তোমার দর্শন পাই। শুনিয়াছি তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেই সঙ্কল্প সিদ্ধিলাভ হয়। মনকে জিজ্ঞাসা করিয়াও ত বুঝিতে পারিলাম না, তোমাকে বিশ্বাস করি কি না। বিশ্বাস করিলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইত। তবে কি তোমাতে আমার বিশ্বাস নাই? না—না, তোমাতে অবিশ্বাসী হইলে জীবন থাকিত না। বিশ্বাস আছে, কিন্তু যে বিশ্বাসে তোমাকে দর্শন পাওয়া যায়, মনস্কামনা সিদ্ধ হয় সে বিশ্বাস আমার নাই, তাই এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত তাপ।

তুমি বলিয়াছ নিঃসঙ্গ হইয়া তোমায় স্মরণ করিলে তোমার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সঙ্গ কিরূপে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও জানি না। অনন্ত বাসনার দাস, মায়াবরণে চক্ষু বাঁধা কি করিয়া নিঃসঙ্গ হইব? তুমি দয়া করিয়া গুরু-রূপে, চৈতন্যগুরুরূপে আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া কি করিতে হইবে বলিয়া দাও, কি করিলে তোমায় দর্শন পাইব, নহিলে উপায় নাই।

তোমাকে স্মরণ করিবার যে পদ্ধতি উদ্ধবকে বলিয়াছিলে, সেরূপ স্মরণশক্তি বা অধিকার আমার নাই। সেই প্রাণায়াম, সেই পূরক, কুম্ভক, রেচক, প্রভৃতির দ্বারা বায়ুশুদ্ধি করিয়া ইন্দ্রিয় জয় আমার ন্যায় ক্ষুদ্র শক্তি মন্দমতি মানবের পক্ষে সুদূরপরাহত। সেই সগর্ভ ও অগর্ভ প্রাণায়াম প্রভৃতি কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ অণুজীবাত্মার সাক্ষাৎ-কারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিব, তোমায় দেখিব সে শক্তি আমার নাই—সে শক্তি আমায় কে দিবে? আজীবন কামিনী কাঞ্চনের দাস, অসংযত মতি, সে শক্তি কিরূপে পাইব? আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম অবলম্বনে যে শক্তি সঞ্চয় হয়, অসংযত উন্মার্গগামী ইন্দ্রিয়ের দাস আমা হইতে তাহা কিরূপে সম্ভবে? তাই নিতাইচাঁদের পদে প্রপন্ন হইয়াছি। সাক্ষাৎ সেবানন্দরূপী নিতাইচাঁদ তোমার স্বরূপ শক্তি, পরম দয়াল। তিনি দয়া না

করিলে আর উপায় নাই। পাপও জগাই মাধাই উদ্ধার হইল, নিতাইচাঁদের দয়া পাইয়া ধন্য হইল, আর এ দীনের ভাগ্যে কি হইবে না? জগাই মাধাই অপেক্ষাও দুষ্কৃতকারী এ হতভাগার উপায় কি হইবে না? নিতাইচাঁদের দয়া না হইলে আর অন্য আশ্রয় নাই। সেই শ্রীপাদপদ্মই জীবের অভয়ের কারণ ও আশ্রয় যথা শ্রীভাগবৎ ১০।৪৯।১২

"নান্যৎ তব পাদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম্।
বিভ্যতাং মৃত্যুসংসারাদীশ্বরস্যাপবর্গিকাৎ।"

তোমরা ঈশ্বর, তোমাদিগের মোক্ষপ্রদ পাদপদ্ম ভিন্ন মৃত্যু কারণ সংসার ভয়ে ভীত মনুষ্যগণের অন্য আশ্রয় দেখিতে পাই না। তাই বলি ঠাকুর—

"নমঃ কৃষ্ণায় শুদ্ধায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
যোগেশ্বরায় যোগায় ত্বামহং শরণং গতা।"
শ্রীভাগবৎ ১০।৪৯।১৩।

তাই শ্রীচরণে প্রার্থনা—

"আত্মন্যতে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার কূপ পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"
শ্রীভাগবৎ ১০।৮২।৩৫

গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, "হে পদ্মনাভ, সংসারকূপে পতিতদিগকে উত্তোলন করিবার অবলম্বন স্বরূপ তোমার পদারবিন্দ গভীরজ্ঞানী যোগেশ্বরগণই সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন। আমরা গৃহে থাকিয়া সেবা করিলেও যেন আমাদিগের মনে সর্ব্বদা উদয় হয়।" এই প্রার্থনা।

কোন শক্তি নাই দয়াময়, পাদপদ্মে স্থান দাও। তোমার কৃপালাভ করিবার যে প্রণালী, যে সাধনার প্রয়োজন তাহা সিদ্ধ করিতে আমার বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই। নিজগুণে দয়া করিয়া আমার উপায় কর, চরণে শরণাগত দীনকে দয়া কর, নহিলে কে রক্ষা করিবে? ক্ষীণশক্তি, দুর্ব্বলচিত্ত, ইন্দ্রিয়ের দাস আমার কি উপায় হইবে, উপায় হীনের উপায় তুমি, দীনহীনের সখা তুমি। দয়া কর, দয়া কর দয়াময়!

"নমঃ রামায় কৃষ্ণায় বসুদেব সুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ॥"

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

বিলাত যাত্রার অবশেষ

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২১ সালের গৃহস্থ পত্রে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বিলাত যাত্রা' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, কতিপয় পত্রিকায় সেই প্রবন্ধের অনুকূল ও প্রতিকূল মত প্রচারিত হয়। প্রতিকূল মত প্রচারকগণ সেখনিত বিবেচনা করিয়া বিলাত যাত্রার পক্ষপাতী, অথবা তর্করত্ন মহাশয়ের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্বেষসম্পন্ন কিম্বা কোন বিলাত প্রত্যাগত ধনীর অর্থে একান্ত বাধ্য। মানসীর লেখক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রথম প্রকারের ব্যক্তি। কিন্তু ১৩২১ সালে শ্রাবণ সংখ্যায় মানসীতে প্রকাশিত তাঁহার লিখিত প্রতিবাদের প্রতিবাদ প্রেরণের জন্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্য স্মৃতিতীর্থ মানসীর সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখেন—এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল অদ্যাপি তাহার উত্তর

আসে নাই। ১৩২১ সালের সাহিত্যে আষাঢ় সংখ্যায় যে সমালোচনা হইয়াছে, তাহাতে সমালোচক যে কোন্ প্রকারের অন্তর্গত তাহা সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। এই জন্য তদ্বিষয়েও প্রতিবাদ করা চলে। যে সকল পত্রিকার লেখক প্রথম প্রকারের অন্তর্গত নহেন বলিয়া স্থিরীকৃত, তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ করিব না।

যাঁহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশধর এবং স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতাধ্যাপক তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ তর্করত্ন মহাশয় করিতে পারেন। অন্যের প্রতিবাদ তিনি করেন না। তবে জিজ্ঞাসু হইলে তাহার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন। আমি মাননীতে রমাপ্রসাদ বাবুর লিখিত আপত্তি এবং সাহিত্যের প্রতিকূল সমালোচনার কথা প্রসঙ্গক্রমে তর্করত্ন মহাশয়কে স্থলবিশেষে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। প্রতিকূল পক্ষের বক্তব্যের সারাংশ, তদ্বিষয়ে আমার প্রশ্ন ও তর্করত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত উত্তর এবং স্থলবিশেষে আমার স্বকৃত উত্তর নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মাননীতে রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন,

তর্করত্ন মহাশয় বিলাত ফেরত সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

"বিলাত প্রত্যাগত ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত থাকিলেও অন্য ব্রাহ্মণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও পংক্তি ভোজনাদির অধিকারী হইবেন না"

শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের মধ্যস্থগণ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, তর্করত্নমহাশয় এস্থলে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। আমার সংশয়, একথা শাস্ত্রানুসারে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা?

বৌধায়নস্মৃতির প্রথম প্রশ্নের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণস্ত তথোত্তরতঃ।"

অথোত্তরতঃ ঊর্ণা বিক্রয়ঃ সীধুপান মুভয়তোঽস্তি ব্যবহার আয়ুধীয়কং সমুদ্রাসন (যান?) মিতি···

এখানে উত্তরাপথের অধিবাসীর পক্ষে সমুদ্র যাত্রা দেশপ্রামাণ্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার চারিপংক্তি পরেই বৌধায়ন বলিতেছেন "অবন্তয়োঽঙ্গ মগধাঃ"···

সুতরাং ফলে দাঁড়াইল মনু যে দেশকে মধ্যদেশ বলিয়াছেন অর্থাৎ সরস্বতী নদীর অন্তর্ধানের স্থান হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হিমবৎ বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী যে দেশ, তাহার অধিবাসীদিগের এবং কাশী কোশল ও মিথিলার অধিবাসীদিগের সমুদ্রযাত্রা দূরে থাক, সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া মগধ বা সুরাষ্ট্র যাত্রাই নিষিদ্ধ।

প্রথমতঃ উত্তরাপথের অধিবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা দেশ প্রামাণ্য বলিয়া পরক্ষণেই এরূপ বিধান অসঙ্গত মনে হয়। কিন্তু কল্পসূত্রকার বৌধায়ন যে এতবড় মোটা ভুল করিয়াছেন তাহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং এ বিরোধের মীমাংসার জন্য বলিতে হয় বৌধায়ন সকল উত্তরাপথের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা দেশ প্রামাণ্য বলেন নাই। মধ্যদেশ বাদ দিয়া সৌরাষ্ট্র বঙ্গাদি সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বাহ্যদেশ নিচয়ে সমুদ্রযাত্রা দেশাচার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায়—সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গপ্রকৃতি সমুদ্র নিকটবর্ত্তী দেশসমূহও রমাপ্রসাদ বাবুর মতে উত্তরাপথের অন্তর্গত। তাহা না হইলে সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গ প্রকৃতি দেশের সমুদ্রযান উত্তরাপথের দেশ প্রামাণ্য বলিয়া মীমাংসিত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় অঙ্গ উত্তরাপথ হইতে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে নিষিদ্ধ দেশে গমন করিতে হয়।

অতএব (১) আমার প্রশ্ন এই যে উত্তরাপথ বা উত্তর দেশ বলিতে কোন্ দেশ বুঝায় ?

(২) সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গ প্রভৃতি দেশের সমুদ্রযান উত্তরাপথের দেশ প্রামাণ্য সিদ্ধ কি না ?

(৩) উত্তরাপথ হইতে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে অঙ্গবঙ্গাদি নিষিদ্ধ দেশে গমন করিতে হয় কি না ?

১ম প্রশ্নের উত্তর।—(শ্রীযুক্ত তর্কবত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত)

মৎস্যপুরাণে ভারতবর্ষকে নিম্নলিখিত রূপে বিভক্ত করা হইয়াছে—মধ্য, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, বিন্ধ্যপৃষ্ঠ এবং পার্ব্বত্য। এতন্মধ্যে

"বাহ্লীকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
পুরন্ধ্রাশ্চৈব শূদ্রাশ্চ পল্লবাশ্চান্ত খণ্ডিকাঃ।
গান্ধারা যবনাশ্চৈব সিন্ধু সৌবীর মদ্রকাঃ।
শকা ক্রুহ্যাঃ পুলিন্দাশ্চ পারদা হারমূর্ত্তিকাঃ।
রামঠাঃ কণ্টকারাশ্চ কৈকেয়াদশনামকাঃ।
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্র কুলানিচ।
অম্বষ্ঠোঽথ ভরদ্বাজাঃ প্রমুখাঃ সঙ্ঘবেষকাঃ।
লম্পাকা তল গানাশ্চ সৈনিকাঃ সহস্রাশ্বৈঃ।
এতে দেশা উদীচ্যাস্তু।

মৎস্যপুরাণ ১১৪ অধ্যায়।

বাহ্লীক, সিন্ধু সৌবীর প্রভৃতি দেশ উত্তরাপথ বা উত্তর দেশের অন্তর্গত। মহাভারত সভাপর্ব্বে ২৭ অধ্যায়ে বাহ্লিকাদি দেশ উত্তর দেশ মধ্যে গণিত। উত্তরাপথস্থ জনপদ সমূহের পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত হইলেও সৌরাষ্ট্র বা বঙ্গদেশ যে উত্তরদেশের বা উত্তরাপথের অন্তর্গত নহে তাহা স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যথা

"প্রাচ্যান্ দেশান্ নিবোধত।
অঙ্গা বঙ্গা মগুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরা।
সুহ্মোত্তরাঙ্গঃ প্রবিলয়া মার্গবা গেয়মালবাঃ।
প্রাগ্জ্যোতিষাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ বিদেহা
তাম্রলিপ্তকাঃ।
শাল্যমাগধ গোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যা জনপদাস্মৃতাঃ।

অঙ্গ, বঙ্গ, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মগধ প্রভৃতি দেশ প্রাচ্যজনপদ। মহাভারত সভাপর্ব্বেও ২৯শ অধ্যায়ে প্রাচ্যদেশ মধ্যে এই অঙ্গ বঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"তেষাং পরে জনপদা দক্ষিণা পথ বাসিনঃ।
কাকীকাশ্চৈব সৌরাষ্ট্রা আনর্ত্তা অর্ব্বুদৈঃ সহ।"

দক্ষিণাপথস্থ জনপদ সমূহের মধ্যে সৌরাষ্ট্র উল্লিখিত। মহাভারত সভাপর্ব্বেও আছে—

"তথৈব সহদেবোঽপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ।
মহত্যা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশম্।"

এইরূপে প্রস্থান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা পাণ্ড্য প্রভৃতি দেশ জয় করিতে করিতে "মাদ্রী সুত ততঃ প্রায়াদ্ বিজয়া দক্ষিণাং দিশম্।...

বশে চক্রে মহাবাহুঃ সুরাষ্ট্রাধিপতিং তথা।"

দক্ষিণ দেশের অনেকাংশ অতিক্রম করিয়া সহদেব সুরাষ্ট্র জয় করিলেন। অতএব সুরাষ্ট্র বা সৌরাষ্ট্র উত্তরাপথ নহে, দক্ষিণাপথ।

মৎস্য পুরাণে যে দিগ্‌বিভাগ চিহ্নিত জনপদ সমূহের উল্লেখ আছে, বিন্ধ্যপর্ব্বতের অবস্থানই তাহার মূল। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্ত বর্ত্তমান সসারাম জেলায় পরিসমাপ্ত এবং পশ্চিম প্রান্ত সমুদ্রকূলে গিয়াছে। এই সমুদ্র বর্ত্তমান সময়ে আরবসাগর নামে কথিত। সসারাম হইতে আরবসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকে যে সকল জনপদ আছে তন্মধ্যে মধ্যদেশ ব্যতীত সমস্ত জনপদ উদীচ্য বা উত্তরদেশ বলিয়া মৎস্য পুরাণে অভিহিত, সমুদ্রের সন্নিবেশ অসমান হইলেও সমুদ্র,—বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমপ্রান্ত অপেক্ষা তদীয় উত্তরাংশে সমরেখায় না

থাকিয়া কিয়দ্দূর পশ্চিমাংশে থাকিলেও বিন্ধ্য-কৃত বিভাগ অনুসারে সেই পশ্চিম ভাগের সমুদ্র সন্নিহিত জনপদও উদীচ্য বা উত্তরদেশ মধ্যে গণনীয়। এই জন্য সিন্ধুদেশ মৎস্য পুরাণে উদীচ্য। দক্ষিণে বিন্ধ্য, উত্তরে হিমালয়, পূর্ব্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, এই ভূখণ্ডের নাম মধ্যদেশ। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ দক্ষিণাপথ বা দক্ষিণ জনপদসমূহ। বিন্ধ্যপর্ব্বতের পশ্চিমে সমুদ্র—সুতরাং জনপদ নাই—বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে উত্তর দক্ষিণে সমরেখা টানিলে উত্তরদিকে যে পশ্চিম ভাগ বাহির হয়—তন্মধ্যে জনপদ থাকিলেও অব্যবহিত পশ্চিমে জনপদ নাই বলিয়া পশ্চিম জনপদের নির্দ্দেশ মৎস্য পুরাণে নাই। বিন্ধ্যের পূর্ব্ব প্রান্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব ভাগে বহু জনপদ আছে, সেই সকল জনপদ ও তৎসম রেখাস্থ জনপদসমূহ প্রাচ্য নামে কথিত হইয়াছে।

বৃহৎ সংহিতায় ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বাদি সংজ্ঞা আছে। দক্ষিণ, মধ্য এবং উত্তর এই তিন খণ্ড প্রথমে ধরিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে পূর্ব্ব পশ্চিম এবং মধ্য এই তিন খণ্ডে বিভাগ করা হইয়াছে।

তবে এই ভারতবর্ষ বৃহত্তর, বর্ত্তমান তিব্বত প্রদেশ কান্দাহার প্রভৃতি দেশও ইহার অন্তর্গত। এই বিশাল ভারতের নৈর্ঋত কোণে সিন্ধুসৌবীরদেশ। এবং ব্রহ্মাবর্ত্তের আধুনিক পঞ্জাবের কোন অংশ কেন্দ্র ধরিয়া তাহার নৈর্ঋত কোণেও সিন্ধু সৌবীর দেশ সন্নিবিষ্ট। এই মতে উত্তর দেশ, কৈলাস, কাবুল কান্দাহার প্রভৃতি। অতএব বৌধায়নের 'উত্তরতঃ' অর্থে মৎস্যপুরাণোক্ত উদীচ্য জনপদ বা বৃহৎ সংহিতোক্ত উত্তরদেশ বা সমগ্র 'উত্তরাপথ' বুঝিতে হইবে।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় বৌধায়নস্মৃতিতে যে উত্তর ও দক্ষিণের কথা আছে তাহা মৎস্যপুরাণের উত্তর দক্ষিণ বিভাগের অনুবর্ত্তী। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর দক্ষিণ লইয়াই সাধারণতঃ ভারতের উত্তরভাগ ও দক্ষিণভাগ ব্যবহার হইয়া থাকে। টীকাকারেরাও 'উত্তরতঃ' 'দক্ষিণতঃ' শব্দের সেইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। (গৃহস্থে 'সমুদ্রযাত্রা' প্রস্তাবে যে বৃহৎ সংহিতার মত গৃহীত হইয়াছিল, পরে তাহার আলোচনা করিবার কথা ছিল, পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয় বলিলেন, সে আলোচনা আপাততঃ এই স্থানেই পরিসমাপ্ত হইল)।

অপিচ, বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগ হইতে হিমালয় ও সমুদ্রের অন্তরালে উত্তর দক্ষিণে সমরেখা টানিলে যে সকল জনপদ পূর্ব্বভাগে পড়িবে তাহা প্রাচ্য। দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরাংশ, পশ্চিমে বাহ্লিক, পূর্ব্বে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে আনীত উত্তর দক্ষিণায়ত সরল রেখা এবং উত্তরে হিমালয়—এই চতুঃসীমাযুক্ত প্রদেশ সাধারণতঃ উত্তর দেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার যোগ্য কিন্তু এতন্মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ব, প্রয়াগের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর এই চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট প্রদেশ মধ্যদেশ নামে আখ্যাত হওয়াতে এতদ্ব্যতীত সমগ্র উত্তর দেশই উদীচ্য, সেই উদীচ্যই উত্তর দেশ. বৌধায়ন কথিত 'উত্তরতঃ' বা উত্তর দেশ, প্রশ্নকর্ত্তার ভাষায় ইহারই নাম উত্তর পথ, কাশী পঞ্জাব প্রভৃতি দেশ এই দেশের অন্তর্গত।

২য় প্রশ্নের উত্তর—(শ্রীযুক্ত তর্করত্ন মহাশয় প্রদত্ত)

সৌরাষ্ট্র সকল মতেই দক্ষিণাপথের জনপদ

এবং বঙ্গ প্রাচ্য জনপদ। ঐ উভয় দেশ কোন মতেই উত্তর দেশের অন্তর্গত নহে, অতএব ঐ দুই দেশে সমুদ্র যাত্রা অনুষ্ঠিত হইলে তাহা 'উত্তরতঃ' বিপ্রতিপত্তি মধ্যে গণিত হইবে না। সুতরাং 'দেশপ্রামাণ্য' ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গ যে উত্তর-দেশ নহে তাহার প্রমাণ প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেখিবে।

২য় প্রশ্নের উত্তর—(শ্রীযুক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রদত্ত)

সিন্ধু সৌবীর দেশ উত্তরাপথ এবং সমুদ্র-কূলবর্ত্তী, সেস্থান হইতে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইলে দেশান্তরে যাইতে হয় না। আর একটী উত্তরও আছে, তাহা আবশ্যক হইলে বলিব, এখন নহে।

এক্ষণে আর প্রশ্নোত্তরে প্রয়োজন নাই। আমি মানসী প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশের প্রতিবাদ করিতেছি। রমাপ্রসাদ বাবু পরে যে প্রতিকূল তর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সার এই যে—"বিলাত ফেরত ব্যক্তিও সমাজের উপকার করিয়া থাকেন; তবে অনেক সময়ে যে করিতে পারেন না, সমাজের প্রবেশ পথে বাধাপ্রাপ্তিই তাহার হেতু। এই বাধাদান নিতান্ত অন্যায়ত; বিলাতী বিলাসের বিষবিভীষিকা যদি এই বাধাদানের হেতু হয়, তাহা হইলে চৌরঙ্গীতে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন হওয়াও অনুচিত, এবং বালিগঞ্জ চৌরঙ্গীযাত্রা নিবারণে যত্ন করাও উচিত। কেন না বালিগঞ্জ চৌরঙ্গীতেও বিলাসের শতচুল্লী ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে।"

আমরা বলি কথাটি কি ঠিক হইল? সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া তাহার লহরীলীলা দর্শন ও সমুদ্রবক্ষে জলপ্রধান কি এক? সেখানে ঘরে বাহিরে এখনও নিবৃত্তির শত পতাকা চক্ষুষ্মানের সতত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সেই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে চৌরঙ্গীর বিলাস হিন্দুর চক্ষে সমুদ্রতরঙ্গ পরিচালিত শবদেহের ন্যায় পরিহরণীয় রূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে, তাহাতে কয়জনে আকৃষ্ট হয়। তবে যাহারা মনে মনে পূর্ব্ব হইতে বিলাসে মজিয়াছে শিক্ষার দোষে—সংসর্গের দোষে বা জন্মের দোষে যাহারা নিবৃত্তির প্রতি একেবারেই বিমুখ, ত্যাগে যাহাদের বিদ্বেষ তাহারাই চৌরঙ্গীর বিলাস-দর্শনে আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহারা কিন্তু ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর ত্রিসীমায় পদার্পণ করে না।

তাহাদের চিকিৎসাবিধান অন্যপ্রকার। চৌরঙ্গীযাত্রা নিষেধ করিলেও তাহাদের শোধন হয় না। চৌরঙ্গীযাত্রার পূর্ব্বেই যে তাহারা মজিয়া আছে।

বিলাতযাত্রা প্রথমেই আপনাদিগকে নিকৃষ্ট এবং বিলাতি জাতি সমূহকে শ্রেষ্ঠ মনে করে; তাহাদের শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান করে; তাহাদের রীতি নীতিকে প্রকৃষ্ট জ্ঞানে আদর করে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদিগের প্রাচীন এ শিক্ষা ও রীতি নীতিকে অপকৃষ্ট এবং কুসংস্কার-প্রসূত বিবেচনা করিয়া উপেক্ষা করে।

শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ "নস্যাৎ" করিয়া উড়াইয়া দেয়। এইরূপে যাত্রী হইয়া তবে বিলাতে গমন করে। সেখানকার বাহ্য সম্পদ দর্শনে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত মনোভাব অধিকতর পুষ্ট হয়। এইরূপ ব্যক্তি সমাজে গৃহীত হইলে তাহার ভাবই সমাজে প্রতিফলিত ও প্রচারিত হইয়া পড়ে। ইহার ফলই জাতি-ধ্বংস। আমরা যে সহস্র বৎসর পরাধীন থাকিয়াও সমান আছি, তাহার হেতু—আমাদের আত্মাভিমান। অভিমান সাধারণতঃ

নিশ্চিত হইলেও "রামো দ্বির্নাভি ভাষতে" অর্থাৎ রাম দুই কথা বলে না এইরূপ অভিমানের ন্যায় হিন্দুর জাতিগত আত্মাভিমান নিবৃত্তিমূখী প্রবৃত্তির অবলম্বন। এই আত্মাভিমান আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বিলাতফেরতের সে আত্মাভিমান থাকিতে পারে না। তাহার ভাবে ভাবুক ব্যক্তিগণও সেই অভিমান হারাইবেন—তাহার ফল ধ্বংস। সেই ধ্বংস নিবারণের জন্যই বিলাতফেরতের সমাজ প্রবেশ পথে বাধা দান। তাঁহারা বাধা না পাইয়া সমাজে প্রবেশ করিলে পরিণামে ধ্বংস ত আছেই, বর্ত্তমানেও ক্ষতি ঘটে। সমাজপোষণশক্তি তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেরই থাকে, কেন না বিলাস ব্যয় তাঁহাদের অত্যধিক। যে বিলাত-প্রত্যাগতের মাসিক আয় ৩৫ শত টাকা তিনি এক প্রকার দরিদ্র। তিনি আত্মপরিবার পোষণে ব্যতিব্যস্ত, সমাজ পোষণ করিবেন কিরূপে? পক্ষান্তরে বিলাতী মোহে অনভিভূত ব্যক্তির মাসিক ৩৫ শত টাকা আয় থাকিলে তিনি ধনী মধ্যে গণ্য। তাঁহার সমাজপোষণ শক্তি থাকে। আমরা বিলাত ফেরতের সম্পর্কে থাকিলে মাসিক ৩৫ শত টাকা আয়ের ধনীদিগকে হারাইব; তাঁহারাও দরিদ্র হইয়া যাইবেন; সুতরাং তাঁহাদের নিকটে সমাজপুষ্টির আশা থাকিবে না। এইরূপে সমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ২।১ জন প্রভূত ধনবান্ বিলাত প্রত্যাগত স্বদেশী সমাজের উপকার করিতেছেন—এই দৃষ্টান্ত সাধারণ সমাজের উপযুক্ত নহে।

অতএব রমাপ্রসাদ বাবুর যুক্তি সারশূন্য।

রমাপ্রসাদ বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন "হিন্দুর হৃদয়ে নব প্রেম ও নব জ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে"—এই জন্যই বিলাতফেরত হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করিতে চাহেন—ইহাই তাঁহার কথার তাৎপর্য। আমরা বলি ইহা প্রেম নহে—ইহাও বিলাতী অনুকরণ। প্রকৃত প্রেম হইলে শাস্ত্র অবলম্বন হইত, ধর্ম্ম আশ্রয় হইত। প্রেমিক মুসলমান বা খৃষ্টান যেরূপ স্ব স্ব ধর্ম্ম পুস্তকে শ্রদ্ধাবান্, স্ব-ধর্ম্ম পালনে যত্নবান্—আমাদের বিলাত-প্রত্যাগত প্রেমিক হিন্দুর মধ্যে সেরূপ একজনও দেখি না। হয়ত কপট প্রায়শ্চিত্তের জন্য স্মৃতির বচন মানিতেছেন, আর আহারের সময় বেদের গোমেধ যজ্ঞের দোহাই দিতেছেন। অর্থাৎ ধর্ম্ম—তাঁহার মনগড়া জিনিষ। ইহা প্রেম নহে। আত্মদর্শী হিন্দুর পক্ষে ধর্ম্ম-প্রেম না হইলে দেশপ্রেম অসম্পূর্ণ। কেবল অসম্পূর্ণ নহে অশ্রেয়ঃ।

সেই ধর্ম্মই যখন বিলাতপ্রত্যাগতের নিকট স্বরুচি অনুসারে কল্পিত, তখন তাহাদের প্রেমকে আমরা প্রেম বলি না, বিলাতী মোহেরই আর একটী ফল। তর্করত্ন মহাশয় বিলাত যাত্রা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—"খলতা কপটতা সমাজে থাকিতে পারে। তাহার নিরাকরণে, সচেষ্ট হওয়াই উচিত,তাহার দৃষ্টান্তে নূতন কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।"

এইস্থলে রমাপ্রসাদ বাবু লিখিয়াছেন, "কপটতার সাতপ্রকার বা দশপ্রকার ভেদ কিরূপ? নূতন কপটতার এবং পুরাতন কপটতার প্রভেদ কি? তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কপটতা একটা বাহ্য বস্তু নহে, যে তাহার প্রকারভেদ হইবে।"

এই অংশও অসঙ্গত। বাহ্য বস্তু না হইলে যে তাহার প্রকারভেদ হয় না—এরূপ যুক্তি সারহীন। প্রেম বাহ্য বস্তু নহে, অথচ তাহার প্রীতি ভক্তি স্নেহ ইত্যাদি প্রকারভেদ সকলেরই বিদিত।

আশ্রয় বস্তুর প্রকারভেদ আলম্বন, কাল এবং আশ্রয়ভেদেই হইয়া থাকে। কপটতা স্থলেও আলম্বনাদিভেদ আছে। যে শাস্ত্রে যে প্রায়শ্চিত্তে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি না, সেই শাস্ত্রমতে সেই প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেছি—এইরূপ ভাবপ্রকাশ—কপটতার নূতন আলম্বন, এই জন্যই তাহাকে নূতন কপটতা বলা হইয়াছে। রমাপ্রসাদ বাবু কপটতার লক্ষণ করিয়াছেন—"আত্মাকে ছদ্মবেশ পরাইবার দুষ্প্রবৃত্তির নাম কপটতা"। তিনিই কপটতার পর্য্যায় শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'কৈতবং কপটং কূটং ব্যাজ ছদ্মো সাধিচ্ছলম্।'

সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত প্রমাণ মতে—কপট আর ছদ্ম একার্থক। সুতরাং তাঁহার মতে লক্ষণ হইবে—আত্মাকে কপট-বেশ পরাইবার দুষ্প্রবৃত্তির নাম কপটতা। কপটতা বুঝিতে গিয়া আমাকে কপট বেশ বা কপটতা বুঝিতে হইতেছে। ইহাকে আত্মাশ্রয় দোষ বলে। সুতরাং ইহা লক্ষণ নহে। অতএব ইহা কপটতার লক্ষণ হইতে পারে না। কপটতার একটী লক্ষণ থাকিলেই যে তাহা স্বরূপতঃ এক হইয়া যাইবে। এমন কোন কথা নাই; পক্ষবিশিষ্ট জীবের নাম পক্ষী পক্ষীবোধক এই একটী লক্ষণ বলিয়া পক্ষী যে এক হইয়া যাইবে, তাহা নহে, লক্ষণ দ্বারা অন্য জাতি হইতে পক্ষিজাতির ভেদ হয়, এই মাত্র। তেমনই কপটতার যদি কোন লক্ষণ হয়, তাহা অন্য জাতি হইতে কপটতাকে পৃথক্ করিয়া দিবে। ভয় বা প্রেম হইতে যে কপটতা ভিন্ন, তাহা লক্ষণ দ্বারা বিরীকৃত হয়। যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লই যে ঐরূপ দুষ্প্রবৃত্তিই কপটতা—তাহা হইলেই কি কপটতা এক হইয়া যায়। রামের দুষ্প্রবৃত্তি ও শ্যামের দুষ্প্রবৃত্তি সবই কি এক? দুষ্প্রবৃত্তি গুলি সকলের এক হইলে রামের দুষ্প্রবৃত্তির উদয় মাত্র বুঝিতে হইবে—তাহা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দুষ্প্রবৃত্তি। তাহা কি হয়? দুষ্প্রবৃত্তির ব্যক্তিভেদ আছে, জীবভেদে কাল-ভেদে এবং আলম্বনভেদে সেই ব্যক্তিভেদ হইয়া থাকে। এক দুষ্প্রবৃত্তি সকলের নহে, এক দুষ্প্রবৃত্তি সকল কালে থাকে না, এক দুষ্প্রবৃত্তি সকল বিষয় লইয়া হয় না। এই রূপ-ভেদ বশতঃই নূতন পুরাতন ভেদ। তন্মধ্যে যে গুলি আছে সেগুলির পরিহারে যত্ন করা বিধেয়। শাস্ত্র ও প্রায়শ্চিত্তের নামে যে কপটতা তাহা নূতন। তাহার প্রবেশপথ রুদ্ধ করাই সমীচীন।

রমাপ্রসাদ বাবু বলিয়াছেন, "আবহমান শ্রুতি স্মৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই হিন্দু এতদিন বাঁচিয়া আছে।"

কোন্ জাতি ধর্ম্মশাসন লঙ্ঘন না করা অপরাধে ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ প্রদর্শন না করিলে রমাপ্রসাদ বাবুর এ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না। প্রত্যুত যাহারা ধর্ম্ম শাসন লঙ্ঘন করে তাহারাই লুপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে পারস্যের প্রাচীন পারসীক জাতি বর্ত্তব্য। পারস্যে পারসীক পার্সিজাতি নাই, মুসলমান হইয়াছে। তাহারা কি ধর্ম্মশাসন লঙ্ঘন করে নাই? বোম্বাই অঞ্চলে পার্সিজাতি বাঁচিয়া আছে, তাহারা কি ধর্ম্ম-শাসন লঙ্ঘন করিয়াছে?

যে সকল শৈব পাশুপত বা বৈষ্ণবের নিন্দা পুরাণে আছে তাহারা শ্রুতি স্মৃতি বিরোধী, শ্রুতি স্মৃতি এবং পুরাণ প্রভাবে তাহাদের অস্তিত্ব সঙ্কুচিত। হিন্দুসমাজের বহুলাংশই শ্রুতি স্মৃতির অনুবর্ত্তী, তবে

অনুষ্ঠানাংশ—মানব প্রকৃতি সুলভ দুর্ব্বলতা হেতু কমিয়া যাইলেও শ্রদ্ধা তাহাতেই আছে এখনও সোম যাগ হইলে হিন্দু আমাদের এই যাগ বলিয়া অভিমান করে, দেখিবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়। বৈদিক সংস্কারহীন বিজাতি একেবারেই নাই। এইগুলিই হিন্দুর জীবন লক্ষণ। ধর্ম্মশাসন লঙ্ঘন জীবন লক্ষণ নহে। কোন স্থানে ক্ষত হইলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়—ইহাই জীবনের লক্ষণ, বৈদ পাশুপত বৈষ্ণবাদির কোন সময়ের প্রাদুর্ভাব বেদ-বিরুদ্ধ ছিল—তাহাই সমাজ-শরীরের ক্ষত, বৈদিক আচারের দ্বারা সে ক্ষত শুষ্ক হইয়াছে—ইহাই জীবনের লক্ষণ। পরিত্যক্ত বিলাতফেরতের বৈধ পরিণীতা পত্নীগর্ভজাত পুত্র কন্যাগণ স্বয়ং স্বেচ্ছায় ভোজনাদি না করিলে তাহারা প্রায়শ্চিত্তান্তে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। এই যে বিধান ইহা জীবনের লক্ষণ, যথেচ্ছাচার—জীবনের লক্ষণ নহে। এ বিষয়ে বিস্তার নিষ্প্রয়োজন, পূজ্যপাদ তর্করত্ন মহাশয়ের মূলপ্রবন্ধ 'বিলাতযাত্রা' বিচার সহকারে পাঠ করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাঁহার যুক্তির সারবত্তা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অতঃপর "সাহিত্যের" কথা।

১৩২১ সনের 'সাহিত্য' আষাঢ় সংখ্যায় 'গৃহস্থ' সমালোচনা প্রসঙ্গে তর্করত্ন মহাশয়ের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে যথা "সমাজে যে অংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রভুত্ব আছে—" ইহার উপর সমালোচক বলিতেছেন সমাজে কোন্ অংশে, কোন্ জেলায়, কোন্ পরগণায়, কোন্ গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রভুত্ব আছে ইত্যাদি আমার প্রশ্ন সমাজে কোন্ অংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রভুত্ব আছে? এবং আপনার লিখিত ঐ সকল কথার তাৎপর্য্য কি?

তর্করত্নমহাশয়ের উত্তর—

সমাজের বৈধ অনুষ্ঠানাংশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রভুত্ব। পূজা, পার্ব্বণ, ব্রত, নিয়ম, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য এই অংশের অন্তর্গত। পূজাদি কার্য্যে তামসিক নৃত্যগীতাদি বিলাসের চিহ্ন। উপবাসে অনুকল্প বিলাসের লক্ষণ। এইরূপ কিছু কিছু বিলাস প্রবেশ করিলেও সাধারণতঃ এ অংশও অপরাংশ অপেক্ষা প্রকৃষ্ট অতএব এই অংশই সমাজের মেরুদণ্ড। এসকল বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুখাপেক্ষা সমাজস্থ ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন। যদি সামাজিকগণের শাসন বা পোষণ করিতে হয় ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এই অংশকেই অবলম্বন করিবেন। এই অংশ যাহাতে সুনিয়মিত ভাবে নির্ব্বাহিত হয়, এই অংশের ব্যবস্থাগুণে শিষ্য যজমানের হৃদয়ে সাত্ত্বিকভাবের স্ফুরণ হয়, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের অন্তর্গত গুরু পুরোহিত শ্রেণী সেইদিকে সম্যক্ দৃষ্টি রাখিবেন, স্বয়ং ত্যাগী বা সংযমী হইবেন, শিষ্য যজমানের অনাচার দেখিলে তাহার সংশোধনে যত্ন করিবেন, যত্ন সফল না হইলে তাঁহার সংস্রব ত্যাগ করিবেন, অথচ তাঁহার উপকারে যত্ন করিবেন, কদাচ বিদ্বেষী হইবেন না, এইরূপভাবে আশ্রম করিলে, মেরুদণ্ডকে এইভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে সুফল অবশ্যম্ভাবী।

তর্করত্নমহাশয় লিখিয়াছিলেন,

"৺ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ব্যবহার্য্যতা আকাঙ্ক্ষা করিতেন না"। 'সাহিত্যে' লিখিত হইয়াছে "মিথ্যাকথা। অব্যবহার্য্যতা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় ছিল।"

তর্করত্নমহাশয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের গলদশ্রুলোচন দেখিয়া তাহাই লিখিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে 'সাহিত্যে' লিখিত হইয়াছে "ব্রহ্ম-

বান্ধবের গলদশ্রু লোচন অষ্টাপদমৃতাবিশেষের মত ··· সেই অগ্নিগর্ভলোচন গলদশ্রু !"—

এই অংশ তর্করত্ন মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, বৎস! ব্রহ্মবান্ধব থাকিলে আজ ইহার সম্যক্ মীমাংসা হইত। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থাকিলেও অনেকের সংশয় দূর হইত। তথাপি বলিতেছি এখনও ১৩২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ কবিরাজ শ্রী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন আছেন, স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের নিকটজ্ঞাতি শ্রীমান্ জ্যোতিষ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন—ব্রহ্মবান্ধবের বৃত্তান্ত তাঁহাদের অবিদিত নহে। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথের ত্যাগশীল যোগ্যপুত্র শ্রীমান্ সতীন্দ্রনাথও এ ঘটনা জানেন বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মবান্ধব বলিতেন, "হিন্দুত্ব—উপাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, শাক্ত বৈষ্ণবের উপাস্য উপাসনাও তৎ-প্রণালীর আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও শাক্তও হিন্দু বৈষ্ণবও হিন্দু, আমি খৃষ্টান হইলেও হিন্দু নহি কেন ?"

এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের সহিত আমার এবং স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইত।

একদিন সুবক্তা ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "উপাধ্যায়। কি দুঃখে তুমি এই বেনামী হিন্দুয়ানির দাবি কর, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমি মহর্ষি শাণ্ডিল্যের বংশধর, ভক্তিসূত্র তোমারই পূর্ব্বপুরুষের উপদিষ্ট, আজ স্বর্গ হইতে তোমাকে দেখিয়া মহর্ষি কি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন না। উপাধ্যায়! তুমি ত্যাগী একাংশে তুমি সংযমী, তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণে তোমার সামর্থ্য হইতে পারে, কিন্তু তুমি সে পথে না গিয়া এমন পথে আছ যাহাতে প্রতিক্ষণ তোমাকে কপট ভাবের আশ্রয় লইতে হয়। তুমি খৃষ্টান হইয়াও তোমার স্বকৃত পরিভাষায় হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান কর, অথবা সেই-রূপ প্রতিপন্ন হইবার যত্ন কর—ইহা কি কপট ভাব নহে ?"

ইন্দ্রনাথ এই কথাগুলি এমন ভাবে বলি-লেন, যে বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠরোধ হইতে লাগিল, এবং নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। ব্রহ্মবান্ধবও সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে বলিলেন, জীবনের একটা মস্ত ভুল হইয়াছে, যদি উপায় থাকে ত এই ভুল সংশোধন করিব।

ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—

উপায় আছে,—প্রায়শ্চিত্ত করিতে পার, তবে ব্যবহার্য্য হইবে না, তা তুমি সন্ন্যাসী—তোমার ব্যবহার্য্যতায় প্রয়োজন নাই, প্রায়-শ্চিত্ত কর। এই ঘটনাই ব্রাহ্মবান্ধবের প্রায়শ্চিত্তাকাঙ্ক্ষার মূল। সুতরাং অব্যবহার্য্যতা ব্রাহ্মবান্ধবের উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় নহে। তাহার পর অশ্রুপাতের কথা, মানবের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে সকলেই বুঝিবেন। অগ্নি-গর্ভ লোচনের অশ্রুপাতই প্রকৃত অশ্রুপাত, তাহাই হৃদয় প্রক্ষালনের মন্দাকিনী ধারা। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই মন্দাকিনী ধারায় অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ইহা মিথ্যা নহে—সম্পূর্ণ সত্য"।

তর্করত্ন মহাশয় এই বলিয়া নীরব হইলেন, আমারও প্রবন্ধ সমাপ্ত হইল। ইতি

শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।

পুণ্যক্ষেত্র ৺কালীক্ষেত্র

(৩)

(কালীঘাটের কয়েকজন সন্ন্যাসী)

কালীঘাট সম্বন্ধে প্রবন্ধ ক্রমশঃ অতি দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের চিত্ত সাধারণতঃ চঞ্চল, এক বিষয়ে অধিক আলোচনা সেই হেতু অনেকের পক্ষে অপ্রীতিকর হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। যাহা হউক তীর্থ-কাহিনী প্রসঙ্গে তীর্থ-গৌরব সাধু সন্ন্যাসীগণ সম্বন্ধে দু এক কথা না বলিলে প্রবন্ধটি অন্যায় ভাবে অঙ্গহীন রহিয়া যায়।

সাধু সন্ন্যাসীর কথা উঠিলে আমাদের অনেকের মনে আজকাল অনেক রূপ ভাবের উদয় হয়। দিব্যৈশ্বর্য্য সমূহের চির আধার ভগবানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি স্বরূপ সাধু সন্ন্যাসীগণের পবিত্র লাভ ও পবিত্র কাহিনী শুনিবার জন্য প্রাচীনপন্থী হিন্দু সন্তানগণের হৃদয় নিয়ত বুভুক্ষিত। পক্ষান্তরে কালমাহাত্ম্যে ও বিকৃত শিক্ষার পরিণামে, নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই সাধু সন্ন্যাসীর নামেই যেন খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। দেব ব্রাহ্মণে ইঁহারা ভক্তিহীন, সাধু সন্ন্যাসীর মহিমায় আস্থাহীন। সন্ন্যাসীকুলের অধিকাংশই ঘোর মূর্খ, অনাচারিত্র, ভণ্ড, ভিখারী, সমাজের জঞ্জাল ও গলগ্রহ স্বরূপ, নব্য শিক্ষায় অনেকেই এই ভাবে শিক্ষা পান ও সাধু সন্ন্যাসীগণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইরূপ মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এরূপ না হওয়াই বিচিত্র; একে ত এই কলিকালে দেবশক্তি স্বভাবতঃ গুপ্ত ও সুপ্ত ভাবে অবস্থিত সুতরাং দিব্য প্রভাব সম্পন্ন সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতির দর্শন লাভ কিছু দুর্লভ, তদুপরি যে ইউরোপীয় শিক্ষা বন্যায় দেশ আজ প্লাবিত তাঁহাদের নিজের দেশে ব্রাহ্মণস্থলীয় ধর্ম্মযাজকগণের প্রভাব বহুকাল হইতে ক্ষীণবল। বাঁশের চেয়ে অনেক সময় যে কঞ্চি দড় হয়, প্রবাদ বচনই আছে। ইউরোপের শিক্ষা প্রণিহত স্বরূপ আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই যে সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উপর বীতরাগ হইবেন বিচিত্র কি? তাই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সুশিক্ষা দান জন্য তাঁহাদিগকে গুরু ও শিক্ষকের আসন হইতে অপসৃত করিয়া ও নানারূপ আইনের নাগপাশে ফেলিয়া আমাদের ইচ্ছানুরূপ ভাবে পরিচালিত করিবার জন্য সময় সময় আমরা ব্যস্ত হই ও চেষ্টা পাই।

উত্তমের অনুসরণ করিয়াই অধম চিরকাল তরিবার চেষ্টা পায়। যেখানে অনুসরণে শক্তি কুলায় না, সেখানে বাহ্য অনুকরণই অনেকের সম্বল। শুধু সাধু সন্ন্যাসীকুলের দোষ দেখিলে চলিবে কেন, আমাদের মাঝেও অনেক দাঁড়কাক ময়ূরপুচ্ছে অঙ্গ আবৃত করিয়া শিখীর দলে মিশিতে নিয়ত কি প্রয়াস পাই না? ভক্তের সঙ্গে এইরূপে ভাক্ত বা ভক্তবিটলও দেখা যায়; ঠগ বাছিতে গাঁ ওজাড়ের ন্যায় সাধু খুঁজিতে গিয়া অপদার্থ ভণ্ডের দলই নজরে পড়ে। ইহাতে প্রকারান্তরে প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হয়। খনির কয়লা রাশির মাঝে হীরকের ন্যায় ইঁহারা সব সমাজের মহার্হ রত্নরাজি স্বরূপ। ইহাদের ন্যায় শোভা

পাইতে অনেকেরই সাধ যায় কিন্তু শক্তিতে কুলায় না।

প্রকৃত সাধু মহাত্মাগণের দর্শন ও সঙ্গলাভ আরও এক কারণে কিছু কঠিন। যশোলিপ্সা তাঁহাদিগকে পরিচালিত করে না, প্রতিষ্ঠাটা তাঁহারা শূকরী বিষ্ঠাবৎ ঘৃণা করেন। সমাজে পরিচিত হইবার জন্য চেষ্টার পরিবর্ত্তে, অনেক সময় তাঁহারা জড়োন্মত্ত পিশাচের বেশে গুপ্তভাবে বিচরণ করেন। আবার নিকটে পেয়েও অনেক সময় আমরা তাঁহাদিগকে চিনিতে পারি না। নিজে ভাল না হলে পরের ভাল ধরা যায় না। যুধিষ্ঠির চেষ্টা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নিকট কয়েকজন মন্দ লোককে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিতে পারেন নাই, পক্ষান্তরে দুর্য্যোধন জগতে সৎ-লোকের সেইরূপ অভাব দেখিয়াছিলেন। জহুরীই জহর চিনিতে সমর্থ হয়, আমরাও সেইরূপ প্রকৃত সাধুর দর্শন লাভে অনেক সময় বিফলমনোরথ হই। একে ত সংসারা-সক্তগণের মাঝে অধিকক্ষণ অবস্থান করিতে সাধুরা ভাল বাসে না, তার উপর তাঁহাদিগকে নিকটে পাইলেও আমরা অনেক সময় চিনিতে পারি না।

কেবল দয়া স্নেহ প্রেমের নিকট গুণাগুণের বিচার নাই। মহাদেবী যদি কৃপা করেন তবেই তাঁহার প্রিয় সন্তান সাধু মহাত্মাগণেরও দয়া হয় ও তখন চিনি বা না চিনি যেচে এসে অনেকে কোল দেন, কিন্তু হায় এ শুভ সংযোগ সকলের ভাগ্যে সকল সময় ঘটে না।

এতক্ষণ যে সুদীর্ঘ কৈফিয়ৎ দেওয়া গেল, উহা হইতেই, পাঠক যদি অবুঝ না হন, লেখকের নিকট হইতে সাধু সন্ন্যাসীগণ সম্বন্ধে কোন অসাধারণ চিত্তদ্রবকর বৃত্তান্ত শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া শেষে আর নিরাশার বিড়ম্বনা সহিবার পথ রাখিবেন না এবং লেখকও এইরূপে "আগুসার" বা আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিয়া লইয়া অতঃপর নির্ভয়ে আপন বক্তব্য বলিয়া যাইতে পারিবেন।

কালীঘাটের ন্যায় তীর্থস্থানে নিত্যই অসংখ্য লোকের সমাগম হচ্ছে, এই সঙ্গে কত সাধু মহাত্মা প্রসিদ্ধ পুরুষের শুভাগমন হয় কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? অনেক সুপ্রসিদ্ধ পুরুষের সহিতও সকলের চাক্ষুষ আলাপ থাকে না এবং এক জনের যিনি পূজ্য বা পরম আদরের পাত্র আর একজনের নিকট তিনি ঐরূপ না হইতেও পারেন, সুতরাং কালীঘাটে ইহাদের কেহ আসিলেন কি না অল্প লোকই সে সংবাদ রাখে। "পত্রা-বলীর" সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা হরনাথ এবং ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলীর দেশবিখ্যাত পর্য্যটক-কুলকুষণ সন্ন্যাসীপ্রবর স্বর্গগত ধর্ম্মানন্দ মহা-ভারতী মহোদয় এই কালীঘাটে আগমন করিলে, তাঁহাদের সহিত চাক্ষুষ আলাপ ঘটিয়া লেখক কৃতার্থ হন। কত সাধক সদ্‌গুরু সমাগম প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন এইখানে যাপন করেন ও আশাপূর্ণ হলে চলে যান। কত মহাত্মা এইরূপে নিভৃতে শিষ্য পার্শ্বে সমবেত হয়ে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। জনশ্রুতি এই, এখানে গভীর নিশীথে ও অন্যান্য সময়েও অনেক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের স্থূল বা সূক্ষ্মদেহে শুভাগমন হয় কিন্তু নিয়তি প্রসন্ন না হলে তাঁহাদের দর্শনলাভ ঘটে না বা কোন অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার এক বিশ্বাস্য বন্ধু মিলি-টারি সপ্লাই একাউন্টস্ ডিপার্টমেণ্টের একজন সুযোগ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সরকার মহাশয়ের মুখে নিম্নলিখিতরূপ একটি ঘটনার

কথা শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺উমেশচন্দ্র সরকার মহাশয় ৺গয়াধামের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ও দেশপ্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। উমেশ বাবুর কৃতীপুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার কলিকাতা হাইকোর্টের একজন যশস্বী উকীল এবং গোজাতির উন্নতি-সাধন ও রক্ষা কল্পে "গোপাল বান্ধব" নামে উৎকৃষ্ট পুস্তকের রচয়িতা। ৺গয়াধামে "কাণকাটা" বাবাজি নামে এক মহাপুরুষ উমেশ বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কর্ণবেধ সংস্কারটি হিন্দুর সুপরিচিত হইলেও, বাবাজির দুই কাণের এই বেধ বা ছিদ্র দুইটি একটু অসাধারণ গোছের বৃহৎ থাকায় সকলে তাঁহাকে এই নামেই চিনিত। এই মহাপুরুষ একদিন নিজের কর্ণদেশ হইতে দুইটি জবাফুল লইয়া ৺কালীমাতার নির্ম্মাল্যস্বরূপ উমেশ বাবুকে তাঁহার ৺গয়ার বাটিতে রাত্রি আট ঘটিকার সময় প্রদান করিলেন এবং কহিলেন অল্পক্ষণ মাত্র হইল তিনি কালীঘাট হইতে আসিতেছেন, ভবানীপুরে তাঁহার পরিজনবর্গ সকলে ভাল আছে দেখিয়া আসিয়াছেন। উমেশ বাবু শুনিয়া অবাক্, কারণ তিনি প্রত্যহই বাবাজির দর্শন লাভ করেন, ইহার মধ্যে কখন তিনি কালীঘাট গেলেন এবং কখনই বা আগমন করিলেন। এক বেলার মধ্যে গয়াধাম হইতে কালীঘাটে গমনাগমন রেলযোগেও এখনও সম্ভবপর নহে। তিনি টেলিগ্রাম করিয়া জানিলেন, সত্যই ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে একজন সন্ন্যাসী তাঁহাদের ভবানী-পুরের বাটিতে অতিথিরূপে আগমন করিয়া-ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় মহাপুরুষ-গণের কালীঘাটে আগমন সম্বন্ধে জনশ্রুতিটা ভিত্তিহীন নহে।

স্বর্গগত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয় একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ও সুপণ্ডিত সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" ও অন্যান্য পুস্তক বঙ্গ সাহিত্যে তাঁহাকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। আয়ুর্ব্বেদের অনুশীলন-কারিগণ অবগত আছেন, সাধু সন্ন্যাসী তান্ত্রিকগণের প্রাণপাত প্রযত্নে, অতীতকালে আমাদের আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অনেক উন্নতিসাধন হইয়াছে। এখনও দেশের লোক, অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাধিসমূহের কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায়, সাধু সন্ন্যাসীগণের শরণ লয়। পারদ হরিতাল প্রভৃতি ধাতুভস্ম এবং অন্যান্য অনেক ঔষধ, প্রচলিত প্রথাসমূহ হইতে স্বতন্ত্র প্রণালীতে ও উৎকৃষ্টতর ভাবে ইঁহারা প্রস্তুত করিতে পারেন, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করেন। স্বর্গগত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহোদয়ও কথাপ্রসঙ্গে আমা-দিগকে একটি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধের যে প্রকার প্রস্তুত প্রণালী বলিয়াছিলেন তাহাও পুস্তক লিখিত প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র এবং সহজ ও স্বল্পব্যয়সাধ্য। "গৃহস্থ" যে উদ্দেশ্য হৃদয়ে লইয়া প্রচারিত তাহাতে এতদ্বিষয়ের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

আমাদের দেশের নারিকেল গাছের অভাব নাই। ভৈষজ্য-রত্নাবলীগ্রন্থে শূল ও অম্লপিত্ত রোগে এই নারিকেল সহযোগে প্রস্তুত "নারিকেল লবণ," "নারিকেলখণ্ড," "বৃহন্নারি-কেলখণ্ড," এবং "নারিকেলামৃত" এই চারিটি ঔষধের উল্লেখ দেখা যায়। শেষোক্ত তিনটি ঔষধ সঙ্গে সঙ্গে বলবীর্য্য পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ক্ষয় নিবারক বলিয়া প্রশংসিত। আজকাল আমাদের দেশের অনেকেই "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" পীড়ায় আক্রান্ত। লক্ষণ দেখিলে "ডিস্‌পেপ্‌-সিয়া" রোগটি অম্লপিত্তেরই নামান্তর বা

রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। এক সময় আমরা আমাদের ব্যবহার্য্য মিষ্টান্নসমূহের অনেকগুলাই, এই শূল ও অম্লপিত্ত পীড়ার পরম উপকারী এই নারিকেল হইতে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা পাইতাম। এখন ভেজাল ময়দায় ও ঘিয়ে ভাজা বহুবিধ খাজা গজা প্রভৃতির প্রেমে পড়ে, সেকালের সেই নারিকেল লাড়ু, নারিকেলছাপা, চন্দ্রপুলি, রসকরা, মনোহরা প্রভৃতিতে আমাদের আর মন মজে না। কিন্তু মিষ্টান্নের বাজারে নূতনের মোহে পড়ে পুরাতনকে একেবারে না ভুলিলে, আমরা হয় ত এই দ্রুতপ্রসারী অম্লপিত্ত পীড়ার বিস্তারে বাধা দিতে অনেকটা সমর্থ হইতে পারি।

উপরোক্ত ঔষধ চারিটির মধ্যে "নারিকেল লবণ" প্রস্তুত প্রণালীটি অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া, কবিরাজ শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত অব্যর্থ মুষ্টিযোগ নামক পুস্তক হইতে এখানে উদ্ধৃত হইল।

"জলযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্ধব লবণ ধরিতে পারে সেই পরিমাণ সৈন্ধব লবণ উহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ দিতে দিতে যখন জল শুকাইয়া আসিবে তখন উহার মুখে কাদামিশ্রিত গোময়মাটী লেপন করিয়া পরে সর্ব্বাঙ্গও ঐরূপ মাটীমাখা নেকড়া দ্বারা উত্তমরূপে জড়াইবে অনন্তর আবার মাটী লেপন করিবে, এইরূপ লেপন করিতে করিতে যখন দুই অঙ্গুলি আন্দাজ পুরু হইবে তখন রৌদ্রে শুখাইয়া দুই হাত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং গভীর এরূপ একটি খাত প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক ঘুটিয়া দ্বারা উক্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ মাটি মাখা নারিকেলটি রাখিয়া ঘুটিয়ার রাশিতে অগ্নিসংযোগ করিবে। অনন্তর যখন দেখিবে যে পুড়িয়া রক্তবর্ণ হইয়াছে তখন উহা অগ্নি হইতে তুলিয়া রাখিবে। পরে উপরিস্থ মৃত্তিকাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল লবণ মাত্র লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ চারিআনা পরিমাণে লইয়া শীতল জলের সহিত প্রাতঃকালে পান করিবে। ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় ঘুটিয়ার অল্পভাগ গর্ত্তে রাখিয়া তাহার উপর নারিকেলটি স্থাপন করিয়া অবশিষ্ট ঘুটিয়া দিয়া উহা ঢাকিয়া দিবে। এই ঔষধ সুক্ষ্মচূর্ণ পরিপাক হইবার শেষাবস্থায় যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহার অর্থাৎ পরিণাম শূলের অব্যর্থ মহৌষধ।"

মহাভারতী মহোদয় বলিয়াছিলেন "নারিকেল লবণ" প্রস্তুতের উহা প্রকৃত বা প্রকৃষ্ট প্রণালী নহে। তাঁহার মতে নারিকেল পত্র দগ্ধ করিয়া তাহা হইতে যে ক্ষার বাহির হয় তাহাই প্রকৃত "নারিকেল লবণ"। পুঁথিগত বিদ্যাবলে আমাদের জানা আছে, পাতা লতা দগ্ধ করে, সোডা ও পটাশ পাওয়া যায়; আমরা আরও জানি এই সোডা ও পটাশ নানারূপ হয়, যথা "বাইকার্ব্বনেট অফ্ সোডা," "ব্রোমাইড্ অব্ পটাশ" ইত্যাদি ইত্যাদি। পরীক্ষালব্ধ কার্য্যকরী বিদ্যার অভাবে নানারূপ পাতালতা দগ্ধ ক'রে সেই সব ভস্ম হ'তে নানারূপ ক্ষার বা সোডা পটাশ প্রভৃতি বাহির করিয়া লইবার কৌশল আমরা জানি না। মহাভারতী মহোদয় বলিয়াছিলেন, নারিকেল পাতা পোড়ান ছাই, জলে গুলিয়া একদিন রাখিয়া দিলে, এবং পরদিবস ঐ খিতান জলটি লইয়া রৌদ্র বা অগ্নিতাপে জলীয়াংশ উড়াইয়া দিলে প্রকৃত নারিকেল লবণ পাওয়া যায়।

"নারিকেলখণ্ডে" এবং "নারিকেলামৃতে"

মূল নারিকেলের শাঁসটিই ঔষধরূপে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়; প্রচলিত প্রথায় প্রস্তুত "নারিকেল লবণে" নারিকেল সহযোগে প্রস্তুত সৈন্ধব লবণটি মাত্র ব্যবহার্য্য; মহাত্মাগণী মহোদয় কথিত প্রণালীতে নারিকেল গাছের পাতাগুলি অবধি ঔষধরূপে ব্যবহারে আসিবে। নারিকেল পত্র হইতে এইরূপে ঔষধ গুণোপেত লবণ নিষ্কাশনে কৃতকার্য্য হইলে, "Eno's fruit salt" প্রভৃতির ন্যায় উহা নানাদেশে বিক্রয় করিয়া বিদেশ হইতে অর্থাগমের একটা পথ এবং অনেকের জীবিকার উপায়ও হইতে পারে। এরূপে ক্ষার নিষ্কাশনে চেষ্টা পাইলে সরকারি নিমক বিভাগের কোপ নয়নে পড়িতে হইবে কিনা আমরা অবগত নহি। কিন্তু আইনের নাগপাশে নানাদিকে হাত পা বাঁধিয়া ফেলিয়া এই শ্রেণীর জগৎ হিতসাধক পরীক্ষা প্রভৃতিতেও বাধা দেওয়া সদাশয় সরকার বাহাদুরের সম্ভবতঃ উদ্দেশ্য নহে। যাহাহউক দেশনেতৃবর্গের এই বিষয়টা বোলদা করিয়া সকলকে জানান উচিত, শেষে যেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাপ্রিয় নিরীহ কোন ব্যক্তি দশের কল্যাণ করিতে গিয়া নিজে বিপদে না পড়েন।

সে কালের রমণীমহলে অনেকে ঘোকা তামাক ও নারিকেল পাতা পুড়াইয়া "গুল" নামক পদার্থ প্রস্তুত করিয়া মুখে রাখিতেন। তাঁহারা বলেন উহাতে দাঁতের উপকার হয়। আমরা জানি, (অন্যান্য উপাদানের সহিত) নারিকেল গাছের মূল পোড়ান ভস্ম ব্যবহার করিয়া অনেকে স্বগৃহে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর টুথপাউডার বা দাঁতের মাজন ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা হইতে মনে হয় পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত "নারিকেল লবণ," শূল ও অম্লপিত্ত পীড়ার উপকার ব্যতীত দন্তরোগেও হিতকর হইতে পারে এবং পত্র ও মূলজাত ক্ষারে যদি উপকার হয় তা হ'লে নারিকেল গাছের অবশিষ্ট অন্যান্য অংশ যথা নারিকেলের মালা, ছোবড়া, নারিকেল গাছের কাণ্ড প্রভৃতি হইতে লঙ্ক ক্ষারেও উপকার পাওয়া অসম্ভব নহে। বলা বাহুল্য নারিকেল মালা, ছোবড়া প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইলে, ক্ষারের অনুরোধে উহাদিগকে পুড়াইয়া ফেলা উচিত নহে এবং একটি গাছ মারিয়া ফেলা অপেক্ষা উহার পাতাগুলি মাত্র কার্য্যে লাগাইলেই লাভ আছে। নারিকেল গাছের পাতা মাঝে মাঝে ছাড়াইয়া লইলে, গাছের উপকার হয়।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাহ্য চালচলনে সন্ন্যাসীর ন্যায় না হইলেও, ধর্ম্মভাব বিভোর প্রকৃতি ও চরিত্রের প্রভাবে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসীগণ সহ তুলনীয়। তাই আমরা ইঁহাকেও সন্ন্যাসীর পর্য্যায় ভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। ইঁহার "পত্রাবলী" দেশের মাঝে ধর্ম্মে মলয় পবন বহাইতে, অনেকের মনে ধর্ম্মানুরাগ সঞ্চারিত করিতে বহুপরিমাণে সাহায্য করিতেছে। "পত্রাবলী"র পত্রে পত্রে ইঁহার ভিতরকার ফটো বা হৃদয়ের পরিচয় প্রকটিত। ইঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক ধারণা একেবারে নূতন বলা না যাইলেও অনেক বিষয়ে একটা যেন নবভাব ও নববল সম্পন্ন। ইঁহার সঙ্গলাভে মাঝে মাঝে সুযোগ পাইয়া এ সম্বন্ধে যেরূপ বুঝিয়াছি, দুএকটির আভাস এখানে দিবার চেষ্টা পাইলাম। (১) আমাদের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বাভিমানটি সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্ব প্রযত্নে পরিবর্জ্জনীয়, প্রকৃত কর্ত্তা যিনি তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। (২) তুমি যখন কর্ত্তা নহ, তখন তোমার পাপ পুণ্যের জন্যও তুমি দায়ী নহ, অতএব পাপ পুণ্য জনিত ইষ্টানিষ্ট

চিন্তা তাঁর উপর সমর্পণ করে, শুধু অনুরাগের আকর্ষণে তাঁর অভিমুখে আকৃষ্ট হও; তোমার সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম সুখ দুঃখাদি ভোগ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই, রঙ্গালয়ে অধিকারীর নির্দ্দেশানুযায়ী অভিনয় স্বরূপ মাত্র ও বস্তুতঃ অনিত্য। (৩) চিন্তাকর্ষক ভাববিষয়ই শ্রীকৃষ্ণের কোন না কোন মূর্ত্তিভেদ মাত্র; তাঁহার অনন্তরূপ; কাহারও নিকট তিনি ধনমানের লোভ, কাহারও নিকট বা নিন্দা নির্য্যাতনের ভয়ের আকারে আকর্ষণকারী কর্ত্তারূপে বিরাজমান। ভাবুক সুজনের সঙ্গলাভের ফলে শ্রীকৃষ্ণের নব নব উচ্চতর মনোহর মূর্ত্তি সকলের পরিচয় লাভ ঘটে। বিশুদ্ধ বৈরাগিক যিনি তিনিও ভক্ত—শ্রীকৃষ্ণের নির্গুণ মূর্ত্তিই তাঁর নিকট শ্রেষ্ঠ সুন্দর। (৪) তাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ করে, সর্ব্বক্ষণ বিচরণের নাম "অষ্ট-প্রহর হরিনাম জপ" "ঘুমাতে ঘুমাতেও হরিনাম" ইত্যাদি। (৫) পঞ্চভূতাত্মক দেহ এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কার পেয়ারের এই আটটি সখীর সাহায্যেই তাঁহার সহিত আমাদের মিলন হয়; সময় সময় সখীদের কথায় ভুলে তাঁর উপর মান করে বিমুখ হয়ে বসি কিন্তু তার জন্য বিশেষ ভাবনার কারণ নাই, এরূপ হয়েই থাকে। পত্নী বিচারিণী হ'বার সম্ভাবনা দেখিলে পতি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, তা ছাড়া বস্তুতঃ বিচারিণী হ'বার উপায় নাই, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় পতি যে নাই; গৃহের ব্রাহ্মণ পতি, বিচারকের বেশে আদালতে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণীর সত্যসত্যই দু জন পতি হয় না। (৬) সগুণ নির্গুণ এই উভয় অবস্থার মধ্যে শুধু একটার উপর অনুরাগী ও আর একটার নামে আতঙ্কগ্রস্ত হইলে তাহাকে নিষ্কপেশ মুক্ত পুরুষ বলা সাজে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কালীক্ষেত্রে সমাগত সন্ন্যাসী মহাত্মা-গুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত শ্রীমৎ কাণকাট্টা বাবাজি প্রভৃতির ন্যায় অনেকে অল্পক্ষণের জন্য আসি-য়াই চলিয়াই যান; কেহ কেহ কি জানি কি উদ্দেশ্যে, প্রায়শঃ ছদ্মবেশে কিছুদিন অবস্থান করিয়া সহসা একদিন অন্তর্হিত হন, অনেকে আবার স্থায়ীভাবেই এখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। প্রথমোক্ত সন্ন্যাসীগণের আভাস কথঞ্চিৎ প্রদত্ত হইল। অপর শ্রেণীগুলির দু একটি করিয়া নমুনা বারান্তরে প্রদানের বাসনা রহিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

মার্কিণ রাষ্ট্রের ফেডারাল কেন্দ্র

প্রথম অধ্যায়

ওয়াশিংটনের পথে

পণ্ডিত মহলে স্থিতিশীলতা

হার্ভার্ড ছাড়িবার পূর্ব্বে একজন এঞ্জিনীয়া-রের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের পুরু অঞ্চলের বহু কারখানার পরামর্শদাতার কার্য্য করিয়া থাকেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এঞ্জিনীয়ারিংবিভাগেও ইনি অধ্যা-পকতা করেন।

ইহার স্ত্রী বেদান্তভবনে ঘন ঘন যাওয়া আসা করেন—দুই এক পংক্তি সংস্কৃতও মুখস্থ আছে দেখিলাম। সপত্নীক অধ্যাপক র‍্যাড্যাম্‌স্‌ ভারতীয় ছাত্রগণের পরম হিতৈষী। ভারতবাসী মাত্রেই ইঁহাদের অতিথি হইয়া থাকেন। কথা বার্ত্তায় জানা গেল বষ্টন-কেম্ব্রিজে আজ পর্য্যন্ত মাদ্রাজী, মারাঠা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী যত ছাত্র আসিয়াছে ইঁহারা সকলকেই ভাল রকম চিনেন। অনেকের নাম ইঁহাদের মুখে শুনিলাম। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরূপ আগ্রহ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে উৎসাহিত হইলেন কি করিয়া?" র‍্যাড্যাম্‌স্‌-পত্নী বলিলেন—"মহাশয়, এরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের ফলে আমাদের লাভই হইয়াছে। বিদেশীয় লোক জনের সঙ্গে মিশিয়া আমরা দুনিয়ার বিশালতা ও বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ভারতবর্ষের হাবভাব, আদর্শ ও চিন্তা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে বার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। কিন্তু ঘরের সম্মুখে যখন ভারতবর্ষ উপস্থিত তখন তাহার সন্ধান করিব না? ইহাতে বিনা পয়সায় জ্ঞানবৃদ্ধি ও হৃদয়ের প্রসার লাভ সাধিত হইতেছে। আমাদের জগৎ যেন বাড়িয়া গিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিশক্তিও বাড়িয়াছে।"

বস্তুতঃ কোন জনপদে বিদেশীয় নরনারী আসিতে থাকিলে সেই জনপদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না। বিদ্যাকেন্দ্রসমূহে এইরূপ ছাত্রছাত্রীগণের আমদানী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি আইওয়া, ইলিনয় এবং মিশিগ্যান প্রদেশত্রয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশীয় ছাত্রগণের নিকট বার্ষিক বেতন আদায়ের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার ফলে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা জাপানী, ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের দরিদ্র ছাত্রেরা আর আসিতে পারিবে না। অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে বুঝাইয়াছেন—"দেখুন বেতন আদায়ের নিয়ম করিয়া আপনারা ভাবিতেছেন কিছু লাভ করিবেন? ইহা আপনাদের বুঝিবার ভুল। গত ৮।১০ বৎসরের ভিতর আপনাদের এই সকল কেন্দ্রে বিদেশীয় ছাত্রগণ আসিয়াছে। তাহাদের আগমনে আপনাদের ইয়াঙ্কি অধ্যাপক ও ছাত্রগণ লাভবান্ হন নাই কি? প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ভিতর বাস করিতে করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকজন খানিকটা অন্ধ ও গতানুগতিক হইয়া যায়। বিদেশের নূতন দৃষ্টি এবং নূতন চিন্তাসম্পদ্ লইয়া যে সকল ছাত্রেরা এখানে আসিয়াছে তাহারা সত্যসত্যই আপনাদের আবেষ্টনের মধ্যে কতকগুলি নূতন শক্তি দান করিয়াছে। সেই শক্তিসমূহের ওজন করা কঠিন—পয়সার হিসাবে মাপা বোধ হয় অসম্ভব। কিন্তু একটু গভীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করুন। দেখিবেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া এই বিদেশীয় প্রভাবে উন্নত, উদার ও প্রশস্ত হইয়াছে। একঘেয়ে একটানা চিন্তা ও কর্ম্ম প্রণালীর ভিতর বৈচিত্র্য, বহুত্ব ও নবীনত্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সার্ব্বজনীনতা লাভ করার কি কোন মূল্যই নাই? আমার বিবেচনায় পয়সা খরচ করিয়া, বৃত্তি প্রদান করিয়া বিদেশীয় ছাত্র আমদানী করাই কর্ত্তব্য। যাহারা আসিয়াছে অথবা আসিতে চাহে তাহাদিগকে বেতন বৃদ্ধির ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা-পরিষদের

কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ নিজ নিজ কেন্দ্রে বিদেশীয় ছাত্রগণকে অন্নবস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা 'সংরক্ষণ' করিতেন। বিদেশীয় ছাত্র মাত্রেই ভারতবাসীর ধারণায় 'nations' guests' বিবেচিত হইত। ভারতবর্ষের এই শিক্ষানীতি সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে প্রত্যেক শিক্ষা কেন্দ্রে বিশ্বমুখীনতা ও সার্ব্বজনীনতা সহজেই সৃষ্ট হইতে পারিবে।"

বিদেশীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা 'culture' বৃদ্ধির একটা প্রশস্ত পথ সন্দেহ নাই। এইরূপে বিনা খরচে হৃদয়ের প্রসার বৃদ্ধি করিবার জন্য ইয়োরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতেরা এশিয়াবাসীদিগের সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করেন। কোন পর্য্যটক উপস্থিত হইয়াছেন শুনিলেই ইঁহারা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার সুযোগ খুঁজিয়া লন। য়্যাড্যাম্‌স্ পরিবারের ভারত সমাদর অবশ্য কথঞ্চিৎ অসাধারণ।

য়্যাড্যাম্‌স্ এঞ্জিনীয়ার—কিন্তু নানা কারখানার ও কারবারের সঙ্গে যোগ থাকায় ইনি ব্যবসায় বাণিজ্য, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির সংবাদ বেশ রাখেন। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজকাল যুক্তরাষ্ট্রে বৈষয়িক আন্দোলনের গতি কোন্ দিকে বুঝিতে পারা যায় কি? Socialism বা সমাজতন্ত্র সমবায়, সংরক্ষণ, কুটির-শিল্প, নগর-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ক রব ত এদেশে বেশী শুনিতে পাই না। কলাম্বিয়া এবং হার্ভার্ডের অধ্যাপক মহলে গতানুগতিক ধনবিজ্ঞানের চর্চ্চা হইয়া থাকে বোধ হইতেছে।"

য়্যাড্যাম্‌স্ বলিলেন—"মহাশয়, কোন নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন নামজাদা অধ্যাপক কখনও নূতন কোন আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন কি? ইঁহাদের নিকট নূতন জীবন গঠনের অনুরূপ চিন্তা কখনই পাইবেন না। ইঁহারা সাধারণতঃ মামুলি গতানুগতিক চিন্তাপ্রণালীর দ্বারা রক্ষা করিয়া চলেন। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই স্থিতিশীল—ইঁহারা নড়ন চড়ন ভাল বাসেন না।"

আমি বলিলাম—"রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে এই-রূপই দেখা যায়। একবার কোন জাতি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিলে শীঘ্রই সে অপরাপর জাতিপুঞ্জের উন্নতি রুদ্ধ করিতে চাহে। জগতের শান্তি রক্ষাই তাহার লক্ষ্য ও ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। জগতের কোথাও কোন পরিবর্ত্তন তাহার ভয়ের ও উদ্বেগের কারণ হয়। এইজন্য "Status quo" স্থিতিশীলতা, conservatism ইত্যাদি শব্দে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতিমাত্রের নীতি বিবৃত করা যাইতে পারে। সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রেও এইরূপ দেখা যায়। একবার কোন সম্প্রদায় বিদ্যাবলে অথবা চরিত্রবলে অথবা ধনবলে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিলে শীঘ্রই সে নূতন উদীয়মান সম্প্রদায়ের বিপক্ষে দাঁড়াইতে ইচ্ছা করে। নূতন কর্ম্মপ্রণালী, নূতন সমাজগঠন, 'transvaluation of values,' যুগান্তর সাধন তাহার স্বার্থের বিরুদ্ধে থাকে। সকল বিষয়ে পুরাতন সমাজবন্ধন রক্ষা করাই তাহার লক্ষ্য। কিন্তু বিদ্যাক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা, গতানুগতিকতা ইত্যাদির উৎপত্তি হয় কেন? পণ্ডিতমহলে ত নিত্য নূতন ভাঙ্গাগড়াই দেখিবার আশা করা উচিত।"

য়্যাড্যাম্‌স্ বলিলেন—"আজকাল এ দেশে "Single Tax"-নীতি জনসমাজে আলোচিত হইতেছে। দেশের সকলেই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। আমাদের বৈষয়িক আন্দোলনসমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। 'ভূমির মালিকেরা খাজনা দিবেন—যাঁহাদের ভূমি নাই তাঁহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে না'—এই

নীতির উদ্দেশ্য এইরূপ। কিন্তু এই নীতির আলোচনা কোন প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না। অধ্যাপক সীগার, অধ্যাপক সেলিগ্‌ম্যান্, অধ্যাপক টাওসিগ্ ইত্যাদি নামজাদা ধনবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ সকলেই এ সম্বন্ধে Conservative অর্থাৎ যাহা আছে তাহাই রক্ষা করিতে চাহেন—নূতন মতের সমর্থন করেন না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশেষ কোন কারণ আছে কি? য়্যাড্যাম্‌স্ বলিলেন—"প্রথমতঃ, ইহাঁদের সকলেই প্রবীণ এবং প্রসিদ্ধ। নূতন কোন সংস্কারের আন্দোলনে যোগ দিলে লোকে ইহাদিগকে নাবালক ও অবিবেচক বলিবে। এইজন্য লোকনিন্দার ভয়ে ইহাঁরা দূর হইতে আন্দোলনটা দেখিতেছেন—আন্দোলনের ভিতর প্রবেশ করিতেছেন না। দ্বিতীয়তঃ, স্বার্থহানির ভয়। এদেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধনকুবেরগণের অর্থে পরিপুষ্ট। ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীদিগকে সন্তুষ্ট রাখা এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা কর্তব্য বিবেচনা করেন। তাহা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনাগম বন্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই অধ্যাপকগণ ধনী ব্যক্তিদিগের স্বার্থ বুঝিয়া মত প্রচার করিতে বাধ্য হন। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ ধন-কুবেরদিগের নিকট বিশেষ কারণে ঋণী। বৃদ্ধ বয়সে ইহাঁরা ধনকুবের প্রদত্ত ভাণ্ডার হইতে পেন্সন পাইয়া থাকেন। সুতরাং স্বাধীন মত প্রচার করা অধ্যাপকগণের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। এই সকল কারণে হার্ভার্ড কলাম্বিয়া ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গতানুগতিক মতবাদই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। নিতান্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত না হইলে প্রসিদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তিরা নূতন মতবাদ গ্রহণ করিতে অসমর্থ।"

২। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রমণী

অনেক পাশ্চাত্য রমণী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—মহাশয়, আমরা আমাদের ছেলে মেয়েকে যেরূপ ভালবাসি আপনাদের দেশে জনক জননীরা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকে সেরূপ ভাল বাসে কি?" ভারতবাসী এই প্রশ্ন শুনিবা মাত্রই স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন। কারণ ভারতীয় নরনারীর বিশ্বাস তাঁহাদের মত স্নেহপরায়ণ, করুণ-হৃদয়, বাৎসল্যপূর্ণ লোক জন পৃথিবীতে আর নাই। অথচ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দেখিতেছি এই সকল দেশের নরনারীও নিজেদেরকে অতিশয় হৃদয়বান্ বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রেম, ভালবাসা, দয়া দাক্ষিণ্য, স্নেহ করুণা ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা প্রাচ্যেরও একচেটিয়া নয়, পাশ্চাত্যেরও একচেটিয়া নয়।

একজন ইয়াঙ্কি রমণী একটি ভারতীয় ছাত্রকে প্রায়ই বলিতেন—"ওহে বাপু, তোমার কি মা বাপ নাই? না তোমাদের দেশের মা বাপদের মায়া মমতা নাই?" ছাত্র থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিত—"সে কি? এরূপ প্রশ্নের অর্থ কি?" রমণী বলিতেন—"দশ বার হাজার মাইল দূরে সন্তানকে পাঠাইয়া যে মাতাপিতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন তাঁহাদের হৃদয় নাই বলিব নাত কি? ইহা আমার ধারণার অতীত।" দেখা যাইতেছে যে ভারতীয় জনক জননীর দুর্বলতা ইয়াঙ্কিস্থানেও আছে। মানব হৃদয় সর্বত্রই একরূপ। সাদা চামড়া ও কাল চামড়ার প্রভেদ অতি সামান্য মাত্র। দুই প্রকার নরনারীর শরীরেই রক্তের চলাচল হয়—দুয়ের বক্ষঃস্থলেই হৃৎপিণ্ড ধড়ফড় করে। কোন জাতিই আগাগোড়া দেবতুল্য নয়—কোন জাতিই পুরাপুরি পশু স্বভাব নয়।

একজন ইয়াঙ্কি ছাত্র আমাদের এক ভারতীয় ছাত্রের বন্ধু ছিল। ভারতীয় ছাত্র ইয়াঙ্কিছাত্রের গৃহে পয়সা দিয়া বাস করিত। ইয়াঙ্কি জননী গৃহকর্ত্রী ছিলেন। ইংলাণ্ডে ও আমেরিকায় পুরুষেরা ঘরের কর্ত্তা থাকেন না। সর্ব্বত্রই Landlady অর্থাৎ বাড়ীওয়ালীর প্রভাব। এই ইয়াঙ্কি বাড়ীওয়ালী ভারতীয় ছাত্রকে সন্তানের মত ভাল বাসিত। গতবৎসর মেক্সিকোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই বাধিতেছিল। সেই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশে প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে দলে ভলাণ্টিয়ার হইতে লাগিল। ইয়াঙ্কি ছাত্র বিশেষ কর্ম্মঠ ও উৎসাহী সুতরাং সেও বাপমার অনুমতি না লইয়াই স্বেচ্ছাসেবকগণের দলে যোগ দিল। এদিকে তাহার মাতা তাহাকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। কিন্তু সাম্‌নাসাম্‌নি বচসায় কোন লাভ নাই। কারণ পুত্র মাতার কথা কোনমতেই শুনিবে না—মাতার ইহা বেশ জানা ছিল কাজেই ইয়াঙ্কি রমণী ভারতীয় ছাত্রকে মধ্যস্থ করিলেন। ভারতীয় ছাত্র রমণীর সুখদুঃখের কথা শুনিত ও সহানুভূতি প্রকাশ করিত। ভারতীয় জননীরাও অসমসাহসিক কার্য্য হইতে নিজ সন্তানগণকে এই উপায়ে বিরত করিতে চেষ্টিত হন। জননীচরিত্র দুনিয়ায় এক।

পাশ্চাত্য রমণীদিগের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলিলে পর দেখা যায় যে শেষ পর্য্যন্ত ঘরকন্নার কথা, হাঁড়ীকুঁড়ীর কথা, রান্নাবাড়ির কথা ইত্যাদিই আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দুএক দিনের আলোচনায় দেশ, সমাজ, কাব্য, চিত্র, রাষ্ট্র ইত্যাদি লম্বা লম্বা বোলচাল বেশ চলে। ক্রমশঃ মেয়েলি গল্প সুরু হয়। মেয়েলি গল্প জগতের সর্ব্বত্রই একপ্রকার—ভারতীয় মেয়েতে আর পাশ্চাত্য মেয়েতে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বিবাহের গল্পে আসিয়া ঠেকিতে বেশীক্ষণ লাগে না। ভারতবর্ষেও যেরূপ এদেশেও সেইরূপ। তবে পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহের পূর্ব্ববর্ত্তী একটা অবস্থা আছে—পুরুষ ও রমণীর জীবনগঠনে তাহার প্রভাব অত্যধিক ভারতবর্ষে ইহা নাই। এইজন্য এ সম্বন্ধে গল্প আমাদের দেশে চলে না। এখানে কিন্তু তাহাই মেয়েলি গল্পের প্রধান কথা।

আমাদের দেশে মেয়েমানুষের কৃপায় তীর্থস্থানগুলি গুলজার থাকে। এসকল দেশেও দেখিতেছি একমাত্র মেয়েমানুষেরাই ধর্ম্ম কথার আলোচনা করে। অবশ্য পেশাদার পাদ্রী মহাশয়গণ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে বাধ্যই। বিলাতী স্ত্রীলোকেরা রোমাণ ক্যাথলিক প্রোটেষ্টাণ্ট ইত্যাদি সম্প্রদায় ভেদ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে না। কিন্তু ইয়াঙ্কি রমণীদের ভিতর সাম্প্রদায়িক ভাব যথেষ্টই লক্ষ্য করিতেছি। 'অমুক লোক ব্যাপ্‌টিষ্ট, তাহার সঙ্গে আমার চলাফেরা অসম্ভব' অথবা 'রোমাণ ক্যাথলিকদের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম!' ইত্যাদি কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। এদিকে নূতন নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় আমেরিকায় রোজই সৃষ্ট হইতেছে। আজ Christian Science এর দল, কাল Bahaism কিম্বা Theosophy এর দল স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। এইসকল সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার পক্ষে রমণীরাই অগ্রণী। এইজন্য বেদান্তধর্ম্মের শিষ্যগণের মধ্যে স্ত্রীসংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফেডারেল্ দরবারের

রাষ্ট্র-কেন্দ্র

১। রবিবারে ওয়াশিংটন

শনিবার রাত্রিকালে ওয়াশিংটন পৌঁছিলাম। পথে ফিলাডেল্‌ফিয়া নগর পড়িল। এই নগরকে ইয়াঙ্কিরা স্বাধীনতার জন্মস্থান বিবেচনা করিয়া থাকে। এই নগরে সম্মিলিত হইয়াই তের উপনিবেশের প্রতিনিধিবর্গ ইংরাজের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই ফিলাডেল্‌ফিয়া সত্যসত্যই ইয়াঙ্কি স্থানের স্বাধীনতা-পুর ছিল। এই কারণে এখনও ইহার গৌরব। সাধারণতঃ কিন্তু ফিলাডেল্‌ফিয়ার ভিগ্রীধারী ও উপাধি প্রাপ্ত চিকিৎসকগণকে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঠাট্টা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ফিলাডেল্‌ফিয়ার বিশেষত্ব কিছু নাই।

ইয়াঙ্কিস্থানের রেলপথগুলি সহরের ভিতর দিয়া গিয়াছে। প্রায়ই দেখিতে পাই নগর ও পল্লীর বড় রাস্তার উপর রেল চলিতেছে। সাধারণতঃ সহরের ভিতর যেরূপ ট্রাম চলে সেইরূপ এখানে রেলগাড়ীও চলে। গাড়ীর মধ্যে থাকিয়া একাধিক নগরের দোকান, বাজার, প্রাসাদ, অট্টালিকা ইত্যাদি দেখিতে পাইয়াছি।

শীতকালে গাছের পাতা নাই—বৃক্ষগুলি সবই শুষ্ক কাষ্ঠম্। এ কয়দিন বরফ পড়িতেছে না—কাজেই নূতন কোন সৌন্দর্য্যও সৃষ্ট হইতে পারে নাই। রেলপথের দুইধারে হয় নগরাদির চিহ্ন—না হয় সমতল ভূমি। ফ্রান্স ছাড়িয়া অবধি যথার্থ প্রাকৃতিক শোভা আর দেখিতে পাইলাম না। গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডকে সবুজ বর্ণে মণ্ডিত দেখিয়াছি। কিন্তু ইয়াঙ্কি স্থানের পূর্ব্ব প্রান্তে কোন প্রকার নয়নরঞ্জক দৃশ্য দেখিতে পাইলাম না। এদেশের নগরগুলিকেও সুন্দর বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার বটে কিন্তু বাড়ীঘরের আকৃতি ও আয়তন সবই নিতান্ত ব্যবসাদারীর নিয়মে গঠিত বলিয়া বোধ হয়। কোথাও বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ওয়াশিংটন যুক্তদরবারের (Federal Government) রাষ্ট্র-কেন্দ্র। ইয়াঙ্কিরা ইহাকে 'The nation's copital' বলিয়া থাকে। পঁয়তাল্লিশটা স্বাধীন প্রদেশ স্বেচ্ছায় মিলিত হইয়া ইয়াঙ্কি স্থানের যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সেই যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রনগর ওয়াশিংটন। কাজেই ওয়াশিংটনে প্রাদেশিকতা, সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে ঐক্য, মিলন, সমবায়, ইত্যাদিই বিশেষ প্রকটিত। এই জন্য ষ্টেসনের নাম ইউনিয়ন (union) ষ্টেসন। এমন কি এই নগরের কতকগুলি রাস্তাও পঁয়তাল্লিশটা রাষ্ট্রের নামে পরিচিত। পাছে কোন এক প্রদেশের অবমাননা করা হয় এই ভয়ে সকল বিষয়েই এই নগরে সার্ব্বজনীনতা ও সম্মিলনপরতা রক্ষিত হইয়াছে।

ষ্টেসন দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। বিরাট কারখানা। লোহালক্কড়, গাড়ী, প্ল্যাটফরম, লোকের চলাচল ইত্যাদি প্যারি ও লণ্ডনে এইরূপই বরং বেশী। এখানকার বিশেষত্ব "মোসাফেরখানা।" এত বৃহৎ অট্টালিকা আর কখনও দেখি নাই। এক ছাদের তলে এইরূপ প্রশস্ত দীর্ঘ ও উচ্চ গৃহ জগতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। শুনিলাম ৫০,০০০ লোক এইখানে দাঁড়াইতে পারে। ছাদ আগাগোড়া খিলান করা। খিলানের দিকে তাকাইলেও বিস্মিত হইতে হয়। রোম নগরের "triumphal arches" দেখিয়া নাকি এঞ্জিনীয়ার এই মোসাফেরখানার খিলান তৈয়ারী করিয়াছেন।

রেল হইতে নগরের ভিতর একটা উচ্চ ওবেলিস্ক দেখিতে পাইলাম। মিশরীয় কায়দায় কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত থাকিবে মনে হইল। ষ্টেসন হইতে বাসস্থানে আসিবার পথে বুঝা গেল এই নগর নিউইয়র্ক অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়।

"কন্‌মন্‌স্‌ক্লাবে" বাস করিতেছি। পূর্ব্ব হইতে এখানে কামরা ঠিক করা ছিল। "হার্ভার্ড ক্লাবে"র মত এই ক্লাবেও সভ্য এবং সভ্যগণের বন্ধু ভিন্ন আর কেহ বাস করিতে পারেন না। সাধারণতঃ হোটেলে যেরূপ খরচ পড়ে এই সকল ক্লাবেও সেইরূপ খরচ। কিন্তু হোটেলে বাস করিয়া এদেশের চিন্তাস্রোত ও কর্ম্ম প্রবাহের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই হিসাবে সাধারণ হোটেল অপেক্ষা বাড়ী-ওয়ালীর কামরা ভাল। ক্লাবে থাকার অনেক লাভ আছে। লেখা পড়া বেশ চলিতে পারে। হোটেলে যেরূপ বার ভূতের নৃত্য এখানে সেরূপ নয়—অন্ততঃ তত্টা নয়। কন্‌মন্‌স্‌ক্লাব ওয়াশিংটনের একটা নামজাদা প্রতিষ্ঠান। এখানকার বিজ্ঞান-পরিষৎ, সাহিত্য-পরিষৎ, নৃতত্ত্ব-পরিষৎ, দর্শন-পরিষৎ, রসায়ন-পরিষৎ ইত্যাদি ১৪।১৫টা বিদ্বৎসমিতি এই ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই পরিষৎ-সমূহের সভ্যগণ এই ভবনে তাঁহাদের বক্তৃতা, আলোচনা, পরামর্শ, সম্মিলন, পানভোজন, ইত্যাদি করিয়া থাকেন। এই ক্লাবকে ওয়াশিংটনের চিন্তাকেন্দ্র বিবেচনা করা যাইতে পারে। লাইব্রেরী, পাঠাগার ইত্যাদি মন্দ নয়। প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসনও এই ক্লাবের মেম্বার।

রবিবারে ইংলণ্ডের মত ইয়াঙ্কিস্থানেও কাজকর্ম্ম, চলাচল, ইত্যাদি সবই স্থগিত। নিউইয়র্ক, বষ্টন, কেম্ব্রিজ সকল নগরই এই দিন জনপ্রাণীহীন। ক্লাব হইতে বাহির হইয়া দেখি ওয়াশিংটনও রবিবারে নির্জ্জীব। লোক জন রাস্তায় নাই বলিলেই চলে। কোথাও দুইচারিটী নরনারী গির্জ্জায় যাইতেছে অথবা হাঁটিয়া বেড়াইতেছে।

"কন্‌মন্‌স্‌ ক্লাবে"র ভবনও সুপ্রসিদ্ধ। এই গৃহে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ম্যাডিসন বাস করিতেন। অন্যান্য বিখ্যাত জননায়কও এই বাড়ীতে বাস করিয়া গিয়াছেন। এই বাড়ীর সমীপবর্ত্তী স্থান ওয়াশিংটনের চৌরঙ্গী স্বরূপ। এখান হইতে দুই মিনিটের ভিতর প্রেসিডেণ্টের White House বা শ্বেতহর্ম্ম্যে যাওয়া যায়। ক্লাবের সম্মুখেই "লাফেয়ে ফোয়ার।"

ফরাসী বীর লাফেয়ে (Lafayette) ইয়াঙ্কি স্বদেশসেবকগণের আরাধ্য দেবতা। ইয়াঙ্কি স্থানের স্বাধীনতা-সমরে লাফেয়ে তাঁহার ফরাসী অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কারণে কৃতজ্ঞ ইয়াঙ্কি নরনারী এই সকল ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক ভলান্টিয়ারগণকে এখনও

পূজা করিয়া থাকে। লাফেয়েতের নামে নগর পল্লী ও রাস্তা যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রদেশে দেখিতে পাই। লাফেয়েতের নামে পরিচিত পার্ক বা উদ্যান কম্‌মস্ ক্লাবের সম্মুখে বিরাজিত।

গৃহ হইতে বাহির হইয়াই পার্কে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখের কোণে এক বীরমূর্ত্তি। লেখা আছে "কসিউস্কো"। রুশিয়ার ফ্রেডরিক এবং রুশিয়ার ক্যাথেরিন যখন পোলাণ্ডের ভাগবাটোয়ারা করিতেছিলেন সেই সময়ে পোলিশজাতির কর্ম্মবীর কসিউস্কো তাহাতে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি কৃতকার্য্য হন নাই—পোলাণ্ড তাঁহার পর ত্রিধা বিভক্ত হইল। লাফেয়েতোয়ের কসিউস্কো মূর্ত্তির নিম্নে লিখিত আছে :—

"And Freedom shrieked as Kosciusko fell."

স্বাধীনতার করুণ ক্রন্দনের চিত্র দেখিবার পর স্বাধীনতার বিজয়-চিত্র দেখিতে পাইলাম। ইহা স্বেচ্ছা-সেবক লাফেয়েতের প্রতিমূর্ত্তি। অনুচরসহ লাফেয়ে দণ্ডায়মান—আমেরিকার আধাত্রী দেবী তাঁহাকে উৎসাহ দিতেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে বিদেশীয় স্বেচ্ছা-সেবকগণের স্থান নগণ্য নহে। এইজন্য চীনা স্বদেশ-সেবকগণ ইয়াঙ্কিদের নিকট আবদার করেন—"তোমরা ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক লাফেয়েতের সাহায্য পাইয়াছিলে। এক্ষণে একজন ইয়াঙ্কি লাফেয়ে আসিয়া চীনা স্বদেশ-সেবকগণের সাহায্যদাতা হউন।"

উদ্যান দেখিয়া প্রেসিডেণ্টের শ্বেত-প্রাসাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। কোন সময়ে সামান্য দরিদ্র নগণ্য লিঙ্কন কালে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হইয়াছিল। "From Log Cabin to White House" গ্রন্থের নাম সর্ব্বত্র প্রবাদস্বরূপ পরিচিত প্রাসাদের পর আবার প্রান্তর ও উদ্যান। পার্শ্বিকদের চলিয়া সেই ওয়েলিংটনের 'মনুমেণ্ট' আসিলাম। কথঞ্চিৎ উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর এই পিরামিডশীর্ষ চতুষ্কোণ স্তম্ভ নির্ম্মিত। ইহা'ত স্থানের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মবীর স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি ওয়াশিংটনের স্মরণার্থে এই স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে।

এই স্মৃতিস্তম্ভ হইতে পূর্ব্বদিকে প্রায় দেড় মাইল পর্য্যন্ত বাগানের পর বাগান চলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি প্রাসাদতুল্য ভবন—কোনটা বিজ্ঞানালয়, কোনটা মিউজিয়াম, কোনটা বিষৎপরিষদ ইত্যাদি। ইয়াঙ্কি স্থানের জগৎপ্রসিদ্ধ স্মিথসোনীয়ান ইন্‌ষ্টিটিউশন ইহাদের অন্যতম। কলিকাতার ধর্ম্মতলার মোড় হইতে পোড়াবাজারের মোড় পর্য্যন্ত পথের মাঠ বিস্তৃত। এখানেও প্রায় সেইরূপ মাঠের স্থানে স্থানে নানাপ্রকার Public Buildings. একটা বোটানিক্যাল উদ্যানও এই সঙ্গে দেখা গেল। অবশেষে ওয়াশিংটনের কাছারী-পাড়া। লণ্ডনের ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার মহাশয় যেমন সরকারী বাড়ী ঘর আফিস ও কর্ম্মক্ষেত্রসমূহ অবস্থিত ওয়াশিংটনের এই অঞ্চলেও সেইরূপ রাষ্ট্রীয় কার্য্যালয়গুলি অবস্থিত। এখানকার Capitol (ক্যাপিটল-সৌধ) লণ্ডনের পার্লামেণ্টভবন স্বরূপ। ক্যাপিটল সৌধের দুইধারে রাষ্ট্রসভার সভ্যগণের আফিস—একধারে বড়ঘরের কর্ত্তারা (Senator) থাকেন—আর একধারে ছোট ঘরের কর্ত্তারা (Representatives) থাকেন। ক্যাপিটলের সম্মুখে বিরাট লাইব্রেরী।

"ক্যাপিটল" ভবন এবং লাইব্রেরী-ভবন উভয়ই ওয়াশিংটন নগরের তাজমহল স্বরূপ।

নানাপ্রকার চিত্রে ও স্থাপত্যে সৌন্দর্য্য সুশোভিত। ক্যাপিটলের এক অংশে The Genius of America অথবা "আমেরিকার প্রতিভা" নামক একটি মূর্ত্তিপুঞ্জ আছে। এই স্থাপত্যকর্ম্মে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহিদিগের চরিত্র বুঝান হইয়াছে। ইতালিরা দুইটি দিবসের গৌরব করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই। এই দিনের নাম Independence Day. এই দিবস কিলাডেল্‌ফিয়ার সম্মিলনে ইংলণ্ড হইতে ইতালি স্থানের স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়াছিল। এই ঘোষণার পর ইংরাজে ইতালিতে যুদ্ধ চলিতে থাকে। দ্বিতীয় দিবস ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ। যুদ্ধে জয়লাভের পর ইতালি স্থানের স্বাধীনতা ইংরাজ-কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল—ইংরাজ ইতালি স্থান হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাহার পর ইতালিসমাজে রাষ্ট্রশাসনপ্রণালী আলোচিত হইতে থাকিল। যুদ্ধের সময়ে ১৩ উপনিবেশ কোন মতে মিলিয়া কার্য্য করিয়াছিল। কিন্তু সকলের মধ্যে ঐক্যস্থাপন দু এক বৎসরের কার্য্য নয়। যুদ্ধাবসানের পর ঘরোয়া সমস্যা উপস্থিত হইল। ঐক্যপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-রাষ্ট্রের মধ্যে সমবায় স্থাপনের জন্য কথাবার্ত্তা ও বুঝাপড়া চলিতে লাগিল। সমবায় রাষ্ট্রের (United States) অর্থাৎ ফেডারাল দরবারের একটা খসড়া শাসন প্রণালীও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই খসড়া Federal Constitution ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। এই "কন্‌ষ্টিটিউশন" লইয়া বহুকাল ঝগড়া চলিয়াছে—এমন কি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রে একটা গৃহবিবাদ (Civil War) ও হইয়া গিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র অনেকবার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মোটের উপর সেই কন্‌ষ্টিটিউশনই বর্ত্তমানেও দাঁড়াইয়া আছে।

শিল্পী আমেরিকাদেবীকে ঈগল বাহনীরূপে মধ্যস্থলে দাঁড় করাইয়াছেন। এক বেদীর উপর তাঁহার ঢাল অবস্থিত। বেদীতে "৪ঠা জুলাই ১৭৭৬" এই অক্ষরগুলি খোদিত। আমেরিকা আশাদেবীর কথা শুনিতেছেন এবং ঢালের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। ঢালের হস্তে একখানা কাগজে '১৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৮৭' এই কথা অঙ্কিত।

Congressional Libraryতে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। এইগুলি দেখিলে ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ বুঝিতে পারা যায়। একটি চিত্রের নাম "The Progress of Civilisation" অর্থাৎ 'সভ্যতার ক্রমবিকাশ'। ইহাতে শিল্পী জগতের বারটি জাতি ও যুগকে বার রকমের কৃতিত্বের অধিকারিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শিল্পীর মত নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

১। মিশর—প্যাপিরাস-পত্রে হায়োগ্লিফিক লিপির চিত্র। চিত্রকর বুঝাইতে চাহেন যে মিশরীয়েরা চিরস্থায়ী ঐতিহাসিক লিপি প্রদান করিয়াছেন। Written recordsএ মিশরবাসীর প্রতিভা বিকশিত।

২। জুডিয়া—ইহুদি পুরোহিত ঐক্য ভাষায় প্রচার করিতেছেন—'Thou shalt love thy neighbour as thyself.' ইহুদিগণের গৌরব ধর্ম্মপ্রচারে।

৩। গ্রীস—গ্রীক প্রতিভার পরিণতি দর্শনালোচনায়।

৪। রোম—রোমান সৈন্যের চিত্র। শাসনপ্রণালী, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিতে রোমীয় শক্তির বিকাশ হইয়াছিল।

৫। মুসলমান—একজন আরব্যপোষাকধারী ব্যক্তি কাচের যন্ত্র এবং গণিত শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লইয়া দণ্ডায়মান। শিল্পীর মতে জগৎকে মুসলমান জাতি পদার্থ-বিজ্ঞান উপহার দিয়াছে।

৬। মধ্যযুগ—এই যুগের বর্ণনায় যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী সৈনিক পুরুষগণের বীরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে—নূতন ধরণের ধর্ম্মগৃহ রচনা (Gothic Cathedral) চিত্রিত হইয়াছে—এবং রোমীয় ধর্ম্মযাজক পোপের প্রবল প্রতাপ বুঝান হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক ইয়োরোপের জাতীয় ভাষাসমূহের মূল প্রস্রবনও দেখান হইয়াছে।

৭। ইতালী—তুলি, বাটালি, বীণা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি ইতালীর নিদর্শন। নানাপ্রকার সুকুমার শিল্পে ইতালীয়দিগের গৌরব।

৮। জার্ম্মাণি—পঞ্চদশ শতাব্দীর পোষাকে একব্যক্তি ছাপাখানার কাজ করিতেছে এবং প্রুফ সংশোধন করিতেছে। জার্ম্মাণির গৌরব মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার।

৯। স্পেন—নাবিকের পদতলে ভূমণ্ডলের মূর্ত্তি। স্পেন-প্রতিভা নূতন জগৎ আবিষ্কারে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

১০। ইংলণ্ড—সেক্‌স্‌পীয়রের Mid Summer Night's Dream নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা হাতে লইয়া এলিজাবেথান যুগের পোষাক পরিয়া একব্যক্তি ইংরাজজাতির প্রতিনিধি হইয়াছে। ইংরাজের গৌরব সাহিত্যে।

১১। ফ্রান্স—রমণী স্বাধীনতার টুপি মাথায় দিয়া এবং রণবেশে সজ্জিত হইয়া কামানের উপর বেষ্টিত। তাঁহার হস্তে The Rights of man বা "মানবের অধিকার" পত্র। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীবিপ্লবের কর্ত্তারা এই সকল অধিকার প্রচার করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতি স্বাধীনতার পুরোহিত।

১২। আমেরিকা—একজন ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ার ডাইনামো হস্তে আমেরিকার প্রতিনিধি। বিজ্ঞান ও শিল্প আমেরিকা প্রতিভার বিশেষ ক্ষেত্র।

এই 'সভ্যতার ক্রমবিকাশ' চিত্রে চীন অথবা ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই। শিল্পীর কল্পনা অতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই।

২। ওয়াশিংটনের "গড়ের মাঠ"

এখানকার ময়দানের পার্শ্ববর্ত্তী এবং ভিতরকার অট্টালিকাগুলি দেখিলেই ওয়াশিংটন দেখা হইল: পর্য্যটকগণের পক্ষে ওয়াশিংটনে আর কিছুই নাই। রবিবার সবই বন্ধ ছিল—বাহির হইতে দেখিয়াছি মাত্র। আজ এক নিঃশ্বাসে অনেকগুলির ভিতরটা দেখিয়া লইলাম।

ক্লাবের পাঠাগারে বসিয়াই কলিউম্বো মূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। রাস্তায় বাহির হইয়া ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে আসিলাম। এই অঞ্চলে প্রেসিডেণ্ট-ভবন, টাঁকশাল ও মালখানা, আমেরিকা সম্মিলনীর কার্য্যালয়, বিপ্লব-ললনা-সমিতি (Daughters of American Revolution), শিল্পদল ইত্যাদি অবস্থিত।

প্রথমে প্যান্‌আমেরিকান্ ইউনিয়নের (Pan-American Union) গৃহ দেখা গেল। ভারতবাসীরা "প্যান্" উপসর্গের ব্যবহার বেশী করেন না। 'প্যানে'র অর্থ 'সর্ব্ব', যথা সর্ব্ববঙ্গ-শিক্ষাসম্মিলন। সমগ্র ভারতের লোকেরা মিলিত হইয়া জাতীয় মহাসমিতি কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই সমিতিকে 'প্যান্ ইণ্ডিয়ান্ ইউনিয়ন' বলা চলে। আমরা ইহাকে "ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" নামে অভিহিত করিয়াছি। 'ন্যাশ-

স্থান' শব্দটা এইস্থলে 'প্যানে'র পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হিসাবে আমরা, ইয়াঙ্কিদের যুক্তরাষ্ট্র হইতে শব্দটা গ্রহণ করিয়াছি। 'ন্যাশন্যাল' অর্থে ইয়াঙ্কিরা 'যুক্ত' 'সঙ্ঘ' অর্থাৎ 'প্যান্' বুঝিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে 'ন্যাশন্যাল' 'প্রাদেশিকে'র ('State' অথবা Province') বিপরীত। ন্যাশন্যাল শব্দের অন্যান্য অর্থও আছে।

ভারতবাসীরা স্বয়ং 'প্যান্' শব্দ ব্যবহার করেন না। কিন্তু ভারতে প্যান্ উপসর্গ বিশিষ্ট আন্দোলন পৌঁছিয়াছে। প্রথমতঃ "প্যান্ ইস্‌লাম" আন্দোলন। মিশর, তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকা, আরব, পারস্য, ভারত, চীন ইত্যাদি সকল দেশের মুসলমান ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইতে চাহেন। এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসকে ইয়োরোপীয়েরা Pan-Islam বলিয়া থাকেন। খৃষ্টান মহলে ইহার ফলে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের নিকট প্যান্-ইস্‌লাম শব্দ নূতন নয়। দ্বিতীয়তঃ ইয়োরোপীয়েরা আর একটা আতঙ্ক তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন। ইহাঁদের বিশ্বাস এশিয়ার সকল জাতি মিলিত হইয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার জাতিপুঞ্জের সঙ্গে শীঘ্রই সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবে। এশিয়াবাসীর এই সমবায়কে পাশ্চাত্যেরা প্যান্-এসিয়াটিক (Pan-Asiatic) আখ্যা দিয়া থাকেন। এশিয়ার সঙ্গে ইয়োরোপের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু এশিয়ার জাতিপুঞ্জ পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় ও কর্ম্মবিনিময় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এশিয়ার বিভিন্নদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় বিদ্যা-সম্বন্ধীয়, বাণিজ্য বিষয়ক এবং অপরবিধ সম্বন্ধের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এশিয়ার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান নরনারী পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। বিংশ শতাব্দীতে ইঁহাদিগকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐক্যবন্ধন অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর দেখা যাইতেছে।

প্যান্ উপসর্গযুক্ত আন্দোলন ইয়োরোপেও দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সময়ে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার ভিতর তিন তিনটা 'প্যান্' আন্দোলনের সম্ভাত হইয়াছে। প্রথমতঃ প্যান্-স্লাভিজম্ (Pan-slavism) রুশিয়ার স্লাভনীয় জাতি সার্ভিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্লাভদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বস্লাভ সম্মিলনের সূত্রপাত করিতে চাহেন। এই জন্যই জার্ম্মাণজাতিপুঞ্জ সমবেত হইয়া প্যান্-জার্ম্মাণ (Pan-German) আন্দোলন খাড়া করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্যান্-ইংলিশ (Pan-English) সম্মিলনী স্থাপনের উদ্যোগও চলিতেছে। ইংরাজ পণ্ডিতেরা অষ্ট্রেলিয়া ক্যানাডা, ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ইত্যাদি ইংরাজী ভাষাভাষী জনগণের সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের ইংরাজী ভাষাভাষী নরনারীকে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ করিতে চেষ্টিত। ইহাঁদের বিশ্বাস এইরূপ একটা ইংরাজ-সম্মিলনী স্থাপিত না হইলে স্লাভসম্মিলনী কিম্বা জার্ম্মাণ-সম্মিলনী, কিম্বা ইস্‌লাম-সম্মিলনী, কিম্বা এশিয়া-সম্মিলনীর বিরুদ্ধে কোন ইংরাজ রাষ্ট্র, উপনিবেশ অথবা যুক্তরাষ্ট্র আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

ক্যানাডা ইংরাজসাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশ। কাজেই ইহার পুরাপুরি স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা নাই। ইহার ভাগ্য ইয়োরোপের সঙ্গে জড়িত। এইজন্য আমেরিকা-সম্মিলনীতে ইহার স্থান নাই। আমেরিকা-সম্মিলনীতে উত্তর দক্ষিণ আমেরিকার ২০টি ল্যাটিন রাষ্ট্র এবং ইয়াঙ্কিদের

যুক্তরাষ্ট্র ঐকাবদ্ধনের উপায় আলোচনা করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিগ্রহ না করিয়া যাহাতে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ মিটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করাই Pan-American union-এর উদ্দেশ্য ইয়োরোপের হেগ-নগরে দুনিয়ার সভারাষ্ট্র সমূহ এই উদ্দেশ্যেই কনফারেন্স করিয়া থাকেন। আমেরিকার এই সম্মিলনী এবং হেগের আন্তর্জাতিক বৈঠক উভয় প্রতিষ্ঠানেই ধনকুবের কার্ণেগি অজস্র অর্থব্যয় করিয়াছেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কার্ণেগি একজন অগ্রণী। ইহার অর্থেই ওয়াশিংটনের আমেরিকা-সম্মিলনীগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইয়াঙ্কিরা দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকার ল্যাটিন রাষ্ট্রসমূহ সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। তাহারা একবার এই ইউনিয়নের গৃহে পদার্পণ করিলে সহজে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে। একটা মিউজিয়াম ও লইব্রেরী আছে। একখানা মাসিক পত্র সম্পাদিত হয়। তাহা ছাড়া সময়ে সময়ে নানাপ্রকার পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়া থাকে। একখানা পুস্তকের নাম "The Young Mans' Chances in South and Central America."

ইউনিয়নের একটা প্রকোষ্ঠে কলাম্বাস-সম্পর্কিত নানাপ্রকার চিত্র, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে। একখানা পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা দেখিলাম—ইহা মূল হইতে নকল। কলাম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া স্পেনিশ ভাষায় এক পুস্তিকা রচনা করেন। পরে তাহা ল্যাটিনে অনূদিত হয়। সেই পুস্তিকার সম্পূর্ণ নামের ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :—

Letter from Christopher Columbus to whom our age oweth: much concerning islands of India beyond the Ganges, recently discovered. In the search of which he was sent eight months ago under the auspices and at the expense of the most invincible king of the Spains, Ferdinand. Addressed to the Noble Lord Rafal Sanchez, treasurer of the most grand king, which the noble and learned man Alexander de Cosco translated from spanish idiom into Latin, the third day of the Calender of May 1493.

আমেরিকা-সম্মিলনীর সংগ্রহালয় দেখিয়া বিপ্লব-লালনা-সমিতি দেখিলাম। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ফিলাডেল্‌ফিয়ার কংগ্রেসে ইয়াঙ্কিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাহার পর ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রামে তেরটা প্রদেশের লোক লিপ্ত ছিল। বর্ত্তমান কালের ইয়াঙ্কিরা সেই তের প্রদেশকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। আমাদের পরিভাষায় বলিব যে সেই প্রদেশ সমূহের লোকেরা "ব্রাহ্মণ" পদবাচ্য। পাশ্চাত্য মাপকাঠিতে উহাদিগকে aristocracy এর অন্তর্গত করা হয়। যাহারা সেই যুগের স্বাধীনতাসমরে যোগ দিয়াছিল তাহাদের বংশধরগণ এইজন্য বিশেষভাবে গৌরববোধ করে। আজকাল ইয়াঙ্কিসমাজের রমণীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহারা সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একটা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। তাহার নাম National Society of the Daughters of American

Revolution. এই সমিতির গৃহে যাইয়া দেখি তের রাষ্ট্রের বহির্ভূত অন্যান্য রাষ্ট্রের মহিলারাও এই গৌরবরক্ষাকার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। প্রদর্শক বলিলেন—"আজকাল সেই সকল বীরপুরুষগণের বংশধরেরা নানা রাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্য বহু দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতেও বিপ্লবযুগের স্মৃতিচিহ্ন ইত্যাদি আসিতেছে। কিন্তু যাহারা বিপ্লবকারীদিগের সন্তান নহেন তাঁহারা এই পরিষদের সভ্য হইতে পারেন না।"

বিপ্লব-ললনা সমিতির পার্শ্বেই সুকুমার শিল্পসদন। ইহাকি স্থপতিগণের কার্য্য মন্দ নয়। এখান হইতে টাকশালের ভিতর যাওয়া গেল। পর্য্যটকগণকে টাকা ও নোট তৈয়ারী করিবার প্রণালী দেখাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহার পর ওয়াশিংটনের "বাকিংহাম প্যালেস"-স্বরূপ শ্বেতভবনে আসা গেল। ইহার ভিতরে আসিতে 'পাশ' দরকার হয়। শুনিলাম আজ সভাপতি উইল্সন ইয়োরোপীয় সংগ্রামের অবস্থা আলোচনা করিবার জন্য মন্ত্রী প্রধানের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। জার্ম্মাণির 'অসামরিক' non-combatant প্রজাবৃন্দকে ও তাতে মারিবার জন্য ইংরাজ ও ফরাসী রাষ্ট্রদ্বয় নূতন বাণিজ্য নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য উদাসীন দেশের ব্যবসায় নিতান্ত বাধাপ্রাপ্ত হইবে। উইল্সন জার্ম্মাণির শত্রুগণের এই নিয়ম বোধ হয় গ্রাহ্য করিবেন না।

খানিক দূর চলিয়া Smithsonian Institutionএ আসিলাম। কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিদ্যায় মৌলিক অনুসন্ধানের ফল মানবসমাজে প্রচারিত করা এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। জগতের সর্ব্বত্র ইহাদের গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে বিতরিত হইয়া থাকে। ইহাই এই পরিষদের বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের নানাস্থানেও স্মিথ্‌সোনিয়ান পরিষদের পুস্তকসমূহ প্রেরিত হয়। এই পরিষদের নূতন বিভাগের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিলাম। ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয় আমি, যদি আমার গৃহে একটা লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া আপনাদের নিকট পুস্তকের জন্য আবেদন ক'র তাহা হইলে কি আপনারা গ্রন্থগুলি পাঠাইয়া দিবেন?" ইনি বলিলেন—"আমরা কোন ব্যক্তিকে পুস্তক পাঠাই না। সমিতি, বিদ্যালয়, পরিষৎ, য়্যাকাডেমী পাঠাগার গ্রন্থশালা ইত্যাদির নিকট পুস্তক পাঠানই আমাদের উদ্দেশ্য। যাহাতে গ্রন্থগুলি সুপ্রচারিত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা কার্য্য করি।"

স্মিথ্‌সোনিয়ান্-পরিষৎ তাঁহাদের গ্রন্থাবলী বিক্রয় করেন না। এই সকল গ্রন্থে নবা বিজ্ঞানসমূহের আবিষ্কারগুলি সন্নিবেশিত আছে। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর গ্রন্থ বিশেষরূপেই আবশ্যক। বিনা পয়সায় এইরূপ উচ্চ সাহিত্যলাভের জন্য ভারতীয় লাইব্রেরী এবং কলেজের কর্ম্মকর্ত্তারা সচেষ্ট হইতে পারেন। এখানকার কর্ত্তাদের নিকট কয়েকটা ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা দিলাম। যথাসময়ে ভারতবাসীরা পুস্তকগুলি পাইবেন।

এই পরিষদ্ ভবনের নিকটেই Bureau of Fisheries. এইখানে যুক্তরাষ্ট্রের মাছের চাষসম্পর্কিত সকল সংবাদ অবগত হইলাম। কর্ত্তা বলিলেন—"বাঙ্গালাদেশের একজন আমাদের নিকট মাছের চাষ শিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিশেষভাবে ইলিশমাছের ডিম পুষিতে পারেন। সম্প্রতি আমরা ক্যালিফর্ণিয়া হইতে বহু ডিম পঞ্জাবে পাঠাই-

হাড়ি বোধ হয় এখনও পৌঁছে নাই। আমার বিশ্বাস মাদ্রাজে মাছের চাষ ভাল হয়। সেখানকার শাসনবিভাগ হইতে নিকল্‌সনকে আমেরিকায় পাঠান হইয়াছিল। তিনি অনেক দিন এই অঞ্চলে থাকিয়া এই কার্য্য পরিচালনা শিখিয়া গিয়াছেন। আজকাল কস্‌মস্ ক্লাবে একজন অষ্ট্রেলিয়ান বাস করিতেছেন। ইনি মাছের চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।"

জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ব্যবসায়ীরা স্বাধীনভাবে মাছের চাষ করিয়া থাকে। কিন্তু ইয়াঙ্কিস্থানে গবর্মেণ্ট এই কার্য্য করিতেছেন। উত্তম ডিম বিনামূল্যে দুনিয়ার সর্ব্বত্র পাঠান যুক্তরাষ্ট্র একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন। ইহা একপ্রকার ভাবুকতা সন্দেহ নাই।

মাছের চাষ সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিয়া Capitol এবং Congressional Library এর ভিতর দেখিতে বাহির হইলাম। সংক্ষেপে সারা গেল। ময়দানের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত আসিলাম।

(৩) ইয়াঙ্কির চরিত্র সমালোচনা।

মৎস্য পালন বিভাগের কর্ত্তা বলিতেছিলেন—"মহাশয় আজকাল বাজারে shad মাছ উঠিয়াছে। এই মাছ সমুদ্রে থাকে এই ঋতুতে নদীতে উজান বহিয়া আসে। shad আপনাদের ইলিশ।" এ কয়দিন ক্লাবে রোজই ইলিশ মাছ ভাজা খাইতেছি! দেশ হইতে বাহির হইয়া প্রথম পাঁচ ছয় মাস পুরাপুরি নিরামিষাশী ছিলাম। ক্রমশঃ মাছ মাংস ধরিয়াছি—এখনও 'গবাদি' ধরিতে হয় নাই।

একজন শিক্ষিতা নিগ্রো রমণীর সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি মিশিগান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—এক্ষণে ওয়াশিংটনের এক কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। ইহার ভগ্নীরাও গ্র্যাজুয়েট এবং শিক্ষকতা করেন। ইহারা বহুকাল হইতে এই নগরের বাসীন্দা। ইহাদের গৃহ দেখিলাম—সাধারণতঃ শ্বেতাঙ্গদিগের গৃহে যে সমুদায় আসবাব পত্র দেখা যায় এখানেও তাহাই দেখিতে পাওয়া গেল। ইহাদের কথাবার্ত্তা চালচলন সবই অন্যান্য ইয়াঙ্কিদের মত। জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা 'নিগ্রো' নাম পছন্দ করেন—না 'coloured' নাম পছন্দ করেন?" ইহাদের মতে নিগ্রো নামে কোন আপত্তি নাই কিন্তু coloured বলিয়া পরিচয় দিতেই ইহারা চাহেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কেন?" উত্তর পাইলাম—"আফ্রিকান অথবা নিগ্রো শব্দে খানিকটা বিদ্বেষ এবং দূরত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু আমরা আমেরিকার সম্বন্ধ ছাড়িতে চাহিনা। এ দিকে coloured বলিয়া পরিচিত হইতে আমাদের কোন দুঃখ নাই—কারণ জাপানী চীনা ইত্যাদি পীতাঙ্গ জাতিরাও coloured."

ময়দানে যাইয়া স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়াম দেখিলাম। [যুক্ত রাষ্ট্রের উদ্ভিদ জীবজন্তু প্রস্তর ধাতু ইত্যাদিই বিশেষরূপে সংগৃহীত। চিত্রসংগ্রহ এবং মূর্ত্তিসংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। চীনা ও জাপানী সুকুমার শিল্প বহুলের ন্যায় এখানেও পরিমাণে মন্দ নয়।

মিউজিয়ামে জাতিতত্ত্ব বিভাগের কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ হইল। ইহার দেশ ইয়োরোপের বোহিমিয়ায়। ইনি Physical Anthropology বা Somatology বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ মিউজিয়ামে একটা মাথামাপার কারখানা আছে—এই কারখানায় ইনি গবেষণা করিয়া থাকেন। ইনি বলিলেন—"যদি ছয় সপ্তাহ আমার সঙ্গে কাটাইতে পারেন তাহা হইলে

আপনাকে কিছু শিখাইয়া দিতে পারি। যাহাহউক দুএকদিনের ভিতর আমাদের অনুসন্ধান-প্রণালী কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন।" ইঁহার নাম Dr. Hrdlicka (হ্রেলিস্কা)।

ইয়াঙ্কি জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দুইজন প্রসিদ্ধ লেখক দুই খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পর্য্যটকগণের 'আমেরিকা ভ্রমণ' যেরূপ হয় এই দুই গ্রন্থ সেই ধরণের নয়। একটা জাতিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বুঝিবার প্রয়াস গ্রন্থকারেরা দেখাইয়াছেন বহুকাল ইয়াঙ্কি সমাজে বসবাসের পর ইঁহারা গ্রন্থরচনায় হাত দিয়াছেন। এই দুইখানা গ্রন্থই ভারতবাসীর পাঠ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ বর্ত্তমান কালে আমেরিকার বিশেষত্ব ভারতবর্ষে বেশী আলোচিত হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশীয় সমাজকে বুঝিবার জন্য কিরূপভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত তাহাও ভারতবাসীর জানা আবশ্যক। পুস্তক দুইখানা পাঠ করিলে এই দুই উদ্দেশ্যই সুসিদ্ধ হইবে।

মুন্‌ষ্টারবার্গের The Americans গ্রন্থে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে :—

I. Political Life—
  1. The Spirit of Self-Direction
    Political parties ইত্যাদি
  Economic Life—
  11. The Spirit of Self-Initiative
  12. The Economic Rise
  13. The Economic Problems
    The Silver Question
    The Tariff Question
    The Trust Question
    The Labour Question
III. Intellectual Life—
  14. The Spirit of Self-Perfection
IV. Social Life—
    The Spirit of Self-Assertion
  22. The Self-Asertion of Women
  23. Aristocratic Tendencies.

দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম The American People A study in National Psychology. লেখক Maurice Law. মুন্‌ষ্টারবার্গ Experimental Psychologyএর একজন ধুরন্ধর—কাজেই তাঁহার গ্রন্থেও এই গ্রন্থের ন্যায় জাতীয় চিত্তের বিশ্লেষণই করা হইয়াছে।

The American People দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগের নাম The Planting of a Nation. ইহার সূচীপত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

II. The American People a new Race
III. The Influence of Environment on Race
IV. Amalgamation of Race
VIII. Puritanism gives birth to Democracy
X. has always been a rebel
XIV. Tobacco and Slavery
XVII. Rice produces new Social coditions

দ্বিতীয় খণ্ডের নাম The Harvesting of a Nation. ইহার কয়েক অধ্যায় নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

V. A country without a capital

XII. The constitution
XIV Why the American people have a contempt for Law
The Influence of Immigration on American Development
XIX. The effect of the Civil War on National Psychology
The Psychological Influence of the Spanish War

বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে হইলে দুনিয়ার বিচিত্র মানবসভ্যতাগুলির পরিচয় লইতে হইবে। তাহার জন্য বিশেষরূপে নিজকে প্রস্তুত করা আবশ্যক। প্রথমতঃ তথ্য দেখিবার দৃষ্টি থাকা চাই। অধিকন্তু সেই সমুদয় বুঝিবার ক্ষমতা থাকা চাই। আমেরিকা বিষয়ক গ্রন্থ দুইখানা এবিষয়ে ভারতবাসীকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

শ্রীকৃষ্ণের সংসার

সহৃদয় পাঠক পাঠিকা।

আমি আজ "গৃহস্থে"র পাঠক পাঠিকার নিকট গৃহস্থালীর ব্যাপার লইয়া দুই চারিটি কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছি।

"আর পারি না সংসারের জ্বালায় মরিলাম" এই কথাটি আমরা সকলেই প্রায়শঃ ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিনা, কেন এমন কথা বলি, আর কেনই বা এমন হয়। আমাদের সংসার অর্থাৎ হিন্দুর সংসারের ন্যায় এমন জ্বালা জুড়াইবার বা ধর্ম্মের বা কর্ম্মের সংসার জগতে আর কোনও জাতির নাই। এইজন্যই এই সংসারের পতন কোনও কালেই নাই, কতশত ঝঞ্ঝাবাতে ইহা অচল অটল। তথাপি কেন যে আমরা এইরূপ কথা বলি তাহার একমাত্র কারণ আমরা আমাদের সংসার প্রকৃত গড়িয়া তুলিতে পারি না। ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি আর্য্য ঋষিগণ যে আদর্শে এই হিন্দুর সংসার গড়িয়াছিলেন, হিন্দু আজ সে আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছে, কাজেই সংসার দুঃখের হইয়াছে। হিন্দুর সংসারে যাহা কিছু শিক্ষা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক পড়িয়া তাহা হয় না এই জন্যই হিন্দুর সংসার হিন্দুর বিশ্ববিদ্যালয়; কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি আর্য্যঋষিগণ অতএব এখানে যাহা কিছু শিক্ষা হয়, সমস্তই ধর্ম্মমূলক এবং ইহা কর্ম্মক্ষেত্র হইয়াও ধর্ম্মক্ষেত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম হইতেই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলে। যে আদর্শ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য্য ঋষিগণ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের বলেই অদ্যাপি এই সংসারের শিক্ষক ও গুরু ব্রাহ্মণ।

যদিও আজ ব্রাহ্মণ আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া নানা পথে চলিয়াছেন, যদিও তাঁহার যজ্ঞোপবীত কেবল লক্ষণেই দাঁড়াইয়াছে তথাপি তিনি ব্রাহ্মণ—আর্য্য ঋষিসন্তান। যে আগুন আগে ধাউ ধাউ জ্বলিতেছিল সেই অগ্নি আজ ইন্ধনাভাবে ক্ষীণতাযাপন্ন, কিন্তু কণামাত্রাবশিষ্ট ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যদিও সেই কণামাত্রাবশিষ্ট বহ্নির ন্যায় কালের স্রোতে ব্রহ্মতেজ ক্ষীণ হইয়াছে তথাপি যদি আজ ইহাতে সাধনার হাওয়া দেওয়া যায় পুনরায়

কণামাত্রাবশিষ্ট অগ্নির দ্বারা দাউ দাউ জ্বলিতে পারে, পুনশ্চ ব্রাহ্মণ সেই ঋষিপত্নী পাইতে পারেন, ঘরে ঘরে সুস্নিগ্ধ ধর্ম্মের চাওয়া পুনশ্চ বহিতে পারে, আবার বশিষ্ঠ বা অরুন্ধতীর আবির্ভাব হইতে পারে এবং যে হিন্দু নানা কারণে উচ্ছৃঙ্খল ভাবাপন্ন হইয়াছে আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া বিপথে চলিতেছে, বিলাসিতা-সাগরে নিজেকে ভাসাইয়াছে আর যাহাদের সংসার ধর্ম্মক্ষেত্র হইয়াও কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে তথাপি এই দুর্দ্দিনে এই ঘোর আত্ম-সংগ্রামের দিনে এই ব্রাহ্মণ এই হিন্দুর সংসারেই গুরু ও পুরোহিত বেশে ধর্ম্মপথ প্রদর্শক-রূপে সারথি শ্রীকৃষ্ণ হইবে।

গুরু করি কেন! জগতে আশ্রয় ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। সামান্য নদীতে সন্তরণ করিতে হইলে যখন একটী আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, ক, খ, শিক্ষা করিতে হইলে গুরুমহাশয়ের প্রয়োজন হয় তখন এই দুস্তর ভবসাগর পার হইতে হইলে অথবা "যত ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতি-নিপাদ্য প্রাণের প্রাণ একজন যে আছেন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে হইলে যাঁহার প্রয়োজন হয় তিনিই আমার গুরু এবং তাঁহারই চরণতরি আশ্রয় করিয়া এই দুস্তর ভবসাগর জীব পার হয় এবং সেই প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে সমর্থ হয়। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ"
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ॥"

'জগতে আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে' অতএব তাঁহাকে সামান্য মানবজ্ঞানে অব-মাননা করিও না বা কোনওরূপ হিংসা করিও না কারণ গুরুদেহে সমস্ত দেবতা বিরাজ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার পুনশ্চ এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন যে—

"গুরু কৃষ্ণরূপে হ'ন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ দুই একরূপ॥"

আপনি শিক্ষিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজ আপনার কেবল কর্ম্ম বা যশঃসৌরভে সুরভিত, আপ-নার কথার ছটায় যুক্তি বা তর্কে কেহই আপনার সমকক্ষ নহে—অতএব আপনার গুরু স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তথাপি আমি আপনার সহিত দুই চারিটি কথা কহিতে অগ্রসর।

আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের জন্য নানা বেদ দর্শন ও উপনিষদ্ রাখিয়াছেন সত্য; কিন্তু এই ঘোর দুর্দ্দিনে কলির অপ্রাপ্ত সাংসারিক জীবের জন্য প্রেমাবতার শ্রীগৌর প্রেমনিধি ঘরে বসিয়া ভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার জন্য যে সহজসাধ্য প্রেম ও ভক্তি-লাভের পন্থা বা সুস্নিগ্ধ প্রেমের আলোক কলির অন্ধ জীবের জন্য দেখাইয়া গিয়াছেন জীব যদি সেই পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারে তাহা হইলে এই হিন্দুর সংসার নিশ্চয়ই কৃষ্ণের সংসারে পরিণত হইবে পুনশ্চ প্রত্যেক হিন্দুর দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট আরোপিত হইবে পুনশ্চ নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহাসূত্রে পরস্পর বদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়া প্রেমের আলোক পাইয়া এই অন্ধজীব প্রেম ভক্তি-রাজ্যে যাইতে সমর্থ হইবে। অতএব—

"প্রেম ভক্তি রাজ্যে যদি করিবে গমন।
জীবে ভাল বাস কর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥"

আমি জানি আপনি জ্ঞানী বা কর্ম্মী তথাপি ঐ দেখুন নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ সমাসীন। ইঁহারা অনেক জ্ঞান বা কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিয়াছেন কিন্তু প্রাণে প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সকলেই ম্লানচিত্তে বলিতেছেন অনেক কর্ম্মের বা জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিলাম প্রাণে প্রকৃত শান্তি ত পাইলাম না; কেনই বা এমন হইল? অহো বুঝিয়াছি— জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাসনার গণ্ডীর মধ্যে থাকিবে ততক্ষণ প্রাণের প্রকৃত শান্তিপ্রদ অপার্থিব সেই কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইতে পারে না কারণ যেখানে স্বার্থভরা ভালবাসা সেইখানেই প্রাণের জ্বালা।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমরা সংসারকে সেই স্বার্থের মধ্য দিয়া ভালবাসি বলিয়াই প্রায়শঃ আমরা বলি—"আর পারি না বড় জ্বালা" এবং আমরা ভগবানকেও ভালবাসি স্বার্থের খাতিরে কাজেই প্রাণে প্রকৃত শান্তি পাই না। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—

"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যতেতোষ
কারণম্।"

গৃহস্থের অহৈতুকী ভক্তিচন্দন মিশ্রিত তুলসী বা এক গণ্ডূষ জল পাইলে ভগবান যেমন সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, এমন আর কেনও আশ্রমীর প্রতি অনুগ্রহ করেন না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম্ হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

'নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে অথবা যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না। কিন্তু মদগতচিত্ত মদেকধ্যানপর ভক্তগণ যেখানে আমার গুণগান করে আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি।' ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ এই আকর্ষণের বলেই নানা বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। কাম্যকবনে দ্রৌপদীর করুণ ক্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া সাধের দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়া দুর্ব্বাসার দুর্ব্বিসহ রোষানল হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে বাঁচাইয়া ছিলেন এবং এই ভক্তির আকর্ষণের বলেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বৃন্দাবনবিহারী শ্রীহরিকে গৌরহরিবেশে নদিয়ায় আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আমরা গৃহী অতএব আমাদের সকল কর্ম্মই তাঁহার উদ্দেশে করা উচিত এবং অনাসক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম্মের ফল তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে যদি অর্পণ করিতে পারি তাহা হইলে সেই সেই কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য এক অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারিব। বাজারে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ভোজ্যদ্রব্য রহিয়াছে যদি সেই সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ক্রয় করিয়া ভোজনের পূর্ব্বে শ্রীভগবদুদ্দেশে উৎসর্গ করা যায় বা দরিদ্রনারায়ণকে খাওয়ান যায় তাহাতে প্রাণে যত আনন্দ হয় কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিলে তাহা হয় না।

এইজন্যই অদ্যাপি কোনও নূতন দ্রব্য আমদানী হইলে সমাজ তাহা দেবতা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া পরে নিজে উপভোগ করিয়া থাকেন। হিন্দুর পঞ্চযজ্ঞ বলিয়া একটি কর্ম্ম আছে কিন্তু কালের করাল স্রোতে উহা কেবল নামেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। অতিথিসেবা এই যজ্ঞের অন্যতম যজ্ঞ। অতিথিসেবা দূরে থাকুক গৃহসেবা বা স্বামী পুত্রের সেবা করিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিতা হন। পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম যজ্ঞ হোম। এই হোমকার্য্য পুরুষ বা নারী উভয়েরই অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু কালবশে কেহই প্রায় ইহার অনুষ্ঠান করিতে চাহেন না। পূর্ব্বে আর্য্যনারীগণ যে হোম অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করিতেন অর্থাৎ অতি পবিত্রভাবে চুল্লী ধরাইয়া নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি—পতিদেবতার সেবা করিতেন;

আজ সেই পবিত্রভাব দূরে গিয়াছে, আজ সেই পবিত্র হোমের হোতা অজ্ঞাতকুলশীলা পরিচারিকা আর পবিত্র অন্নব্যঞ্জনাদির উৎসর্গ কর্ত্তা—বামুনঠাকুর।

উপর ধরার ব্যাপারটি সামান্য নয় শাস্ত্রকারগণ ইহাকে পঞ্চযজ্ঞের অন্যতম যজ্ঞ এবং স্বামী পুত্রের সেবা ঠাকুর সেবার তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই গৌরবেই হিন্দু গৌরবান্বিত বা হিন্দুনামে পরিচিত। এই সমস্ত ব্যাপার অন্য জাতির সংসারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও প্রায় শিক্ষিত হিন্দুর গৃহে এভাব দেখিতে পাওয়া যায় না তথাপি একবারে বিদূরিত হয় নাই; এখনও প্রতি পল্লীতে প্রতি গৃহস্থের ঘরে এইভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে।

গার্হস্থ্যাশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষস্থানীয়। নানা ফল-পুষ্পাদি-শোভিত স্নিগ্ধবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া যেমন নানাদিকদেশ হইতে সমাগত আশ্রয়বিহীন্ নানাজীব আশ্রয় করিয়া থাকে সেইরূপ এই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া নানা আশ্রমী বাস করিয়া থাকে। রাজা যেমন প্রজার পালক। সেইরূপ গৃহস্থও নানা আশ্রমীর পালক। কিন্তু এই আশ্রম একপক্ষে যেমন সহজ অন্য পক্ষে তেমান কঠিন অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ লাভ করিতে যেমন সহজ আশ্রমের কর্ম্ম পালন করাও তেমনি কঠিন। ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে।

কোনও এক বিষ্ণুভক্ত রাজার ইচ্ছা হয় যে তিনি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎলাভ করেন। ভক্তবৎসল শ্রীহরি রাজার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া একদিন স্বপ্নে বলিলেন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে আমি অমুক দিন অমুক সময়ে আসিব। রাজা স্বপ্নের কথা মনে করিয়া নির্দ্ধারিত দিনে বসিয়া আছেন কখন ভগবান আসিবেন, ক্রমে বেলা বৃদ্ধির সহিত তাঁহার উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল তথাপি ভগবানের সাক্ষাৎ নাই। রাজা ভগবৎ বাক্য মিথ্যা হয় দেখিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মান ক্রমশঃ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন এদিকে শ্রীভগবান ভক্তের অবস্থা দেখিয়া ব্যথিতান্তঃকরণে স্বপ্নে রাজাকে বলিলেন। "মহারাজ! আমি তিনবার গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তিনবারই ফিরিয়া আসিয়াছি।"

রাজা মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর ভাবিতে লাগিলেন। আমি প্রাতঃকাল হইতে বসিয়া আছি ইহার মধ্যে কেহই ত আসে নাই। যাহা হউক অনুসন্ধান করি। অনন্তর দৌবারিকের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে সে তিনবার তিনটী লোককে ফিরাইয়া দিয়াছে।

প্রথম বারে এক দীন দরিদ্রকে দ্বিতীয় বারে জীর্ণ শীর্ণ বর্ষীয়ান্ ভিক্ষুককে এবং তৃতীয় বারে অর্দ্ধনগ্নাবস্থা জীর্ণশীর্ণ কলেবরা এক দীনা ভিখারিণীকে। রাজা শ্রবণ করিয়া হা হতোঽস্মি রবে ভূমিতে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়! হায়! আমি এমনি অতিথিসেবা পরাঙ্মুখ গৃহস্থ আজ তাঁহাকে অতিথি বেশে পাইয়াও চিনিতে পারিলাম না। যাঁহাকে কত যোগে বা ধ্যানে পাওয়া যায় না আজ তিনি দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যাইলেন হায়! আমার ধিক!"

শাস্ত্রে দেখা যায়,—

"অতিথির্যস্য ভগ্নাশঃ গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি।"

অতিথি বিফলমনোরথ হইয়া যে গৃহস্থের দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে সে নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়া গৃহস্থের যত সঞ্চিত পুণ্য লইয়া

প্রস্থান করে। অতএব পূর্ব্বেই বলিয়াছি গৃহস্থাশ্রম সহজ হইলেও অনুষ্ঠান পালন করা বড়ই কঠিন।

এক জন বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন :—

"ওনাথ! ফিরিছ জীবের দ্বারেতে দ্বারেতে
ডাকিছ তাহারে কতই স্নেহেতে
বহু না পাইয়া বাঁশী ওহে কালশশী
ডাকিছ জীবেরে আয় আয়।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি যদি আমরা সমস্ত কার্য্যই নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবৎ পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের অশান্তিময় সংসার শান্তিপূর্ণ হইতে পারে।

ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্।"

তুমি যাহা কিছু করিবে বা ভোজন করিবে, হোম করিবে বা দান করিবে অথবা তপস্যা করিবে তৎসমস্ত বা তত্তৎকর্ম্মানুষ্ঠান জন্য ফল আমাকেই অর্পণ করিবে। কারণ—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"
কর্ম্মেই অধিকার আছে জীবের নাহি তার
কর্ম্ম জন্য ফলে।

ভগবান্ ফল ভোক্তা আমরা কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা—জীব এই বিশ্বাস বা দৃঢ়তা যদি রাখিতে পারে তাহা হইলে তাহার—

"বাসনার ক্ষয় হবে পরম আনন্দ পাবে
মিলবে অন্তে বৃন্দাবন।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি সৌনকাদি ঋষিগণ বহুদিন যাবৎ জ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া বা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া যখন প্রাণে শান্তি পাইতেছেন না অথচ প্রকৃত শান্তির লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। কেন এমন হয়? উত্তরে এই বলা যাইতে পারে জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভক্তি-রাণীকে মনোরাজ্যের অধীশ্বরী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার শীতল ছায়ায় বসিয়া কৃষ্ণপ্রেমের অমিয় ধারা সংসার-তাপদগ্ধ হৃদয়ে পতিত না হইবে ততক্ষণ সে প্রকৃত শান্তি পাইবে না। কারণ—

"জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণ বশ হেতু এক কৃষ্ণ প্রেম রস।"

এই জন্যই সৌনকাদি ঋষিগণের হৃদয় অশান্তিপূর্ণ ও শান্তির আশায় লালায়িত এবং অদূরে দুস্তর ভবসাগর দর্শন করিয়া ভীত ও ত্রস্ত। ভয়, কি করিয়া দুস্তর ভবসাগর পার হইব। নাবিকও তরিবিহীন উত্তাল তরঙ্গ-সংক্ষুব্ধ নদী দেখিয়া পারগমনেচ্ছু পথিক যেমন হতাশ হইয়া পড়ে, সেই সময় হঠাৎ নাবিক দেখিতে পাইলে তাহার হৃদয় যেমন আনন্দপূর্ণ হইয়া থাকে; সেইরূপ সৌনকাদি ঋষিগণ হঠাৎ সেই পরম যোগীন্দ্র কটি-বিলম্ব-কৌপীনবস্ত্রপরিধায়ী অহরহঃ কৃষ্ণলীলা স্ফূরিত বদন সূত গোস্বামীকে দর্শন করিয়া প্রাণের আবেগে বলিয়াছিলেন,—হে সূত! আমরা বড়ই ভাগ্যবান। আমরা যাঁর জন্য লালায়িত সেই হৃদয়ের ধন কৃষ্ণ সনাতন তোমার হৃদয়ে বিরাজমান। হায়! ঐ সম্মুখে উত্তালতরঙ্গসংক্ষুব্ধ দুস্তর ভবসাগর দেখিয়া বড়ই ভয় হইয়াছিল কিন্তু তোমাকে দর্শন করিয়া সাহস হইল। যদি আনিয়াছ সেই কৃষ্ণলীলামৃত পণ্য আমাদিগকে প্রদান কর এবং সেই প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধুর মধুময়ী লীলা শ্রবণ করাও। হায়!

"অমূলাধন্যানি দিনান্তরাণি
হরেত্বদবলোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।"

হায়! হায়! জ্ঞান বা কর্ম্ম কাণ্ডের ব্যাপারে আমাদের সেই সেই দিনগুলি বৃথা

গিয়াছে। এযাবৎ তোমার সেই মধুর মূর্ত্তিকেই একদিনও ত দেখি নাই। হে দীন-জনশরণ! হে করুণাসাগর! এই অনন্ত কোটি কাল কেমন করিয়া যাপন করিব।

আরও

"প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ॥"

কলিপাপাহত জীব প্রায়ই অল্পায়ু অত্যন্ত অলস ও মন্দবুদ্ধি, কুসঙ্গে কুপথগত সৎকর্ম্মবিহীন এবং রোগ শোকগ্রস্ত। অতএব কলির জীবের যাহা সহজসাধ্য সাধন তাহা আমাদিগকে বল।

সহৃদয় পাঠক! আমরাও সেই কলির মলিন গৃহী, আমাদের পাপের উপায় সেই আর্য্য ঋষিগণ অতি পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন এবং চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে শিখাইয়াছেন, যদি অশান্তিময় প্রাণে শান্তি পাইতে চাও আইস নাম সঙ্কীর্ত্তন করি। এই কলিকালে নাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতিরেকে যোগে বা ধ্যানে কর্ম্মে বা জ্ঞানে তুমি প্রাণের শান্তি পাইবে না। জগৎগুরু মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

"কোনও ভাগ্যে কোনও জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু সঙ্গ করয়॥"

ঐ দেখুন প্রাণের আকুলতায় শ্রদ্ধার আকর্ষণে ভাগ্যবলে শৌনকাদি ঋষিগণ সেই পরম ভাগবত সূতকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি এই কলির মলিন জীবের হৃদয়ে যদি ঐ সমস্তের সমাবেশ হয় তাহা হইলে সেও একদিন কোনও না কোনও সৎগুরুর আশ্রয় পাইবেই পাইবে, ইহা ধ্রুব সত্য।

ভগবান্ জীবকে নিজের কাছে লইয়া যাইবার জন্য কত সাজে কত বেশে বিশ্বের সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা দুষ্ট ছেলের মত দূরে দূরে মাথা ঘড়ি পলায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। কখনও মাতৃভাবে বাৎসল্য প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করিয়া জগৎকে বাৎসল্যভাবে কোলে টানিয়া লইতেছেন; কখনও পুত্র মাকে কখনও বা বন্ধুভাবে কখনও বা পতি পত্নীভাবে পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য এবং পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য শিখাইতেছেন।

কখনও বা দীন দুঃখী আতুরের বেশে গৃহীকে জীবসেবার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি শিখাইয়া জগৎ-পরীক্ষক জীবকে কত প্রকারে পরীক্ষা করিতেছেন। কখনও বা শ্রীগুরুরূপে পরা-বিদ্যায় জীবকে উপদিষ্ট করিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইতেছেন। আমরা মায়ায় আবদ্ধ খেলার পুতুল কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না সূত্রসঞ্চালিত পাঞ্চালিকার ন্যায় যখন যেদিকে লওয়াচ্ছেন তখন সেইদিকে যাইতেছি। লীলা-ময়ের লীলার এইটুকুই বিশেষত্ব। তথাপি :—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম কভু সাধ্য নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥"—

সেই অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে সাধুসঙ্গ বা সদগুরু কৃপা একান্ত প্রয়োজন। কারণ :—

"সাধু সঙ্গ হইতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্তের হয় সর্ব্বানর্থ নিবারণ।
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যের রুচি উপজয়॥
রুচি হইতে হয় আসক্তির প্রচুর।
আসক্তি হইতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হইলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥"

সামান্য পার্থিব জগতে কাহারও সহিত পরিচিত হইতে হইলে যখন কাহারও আশ্রয় প্রয়োজন হয়, তখন সেই অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমে

প্রেমিক হইতে হইলে তদগতচিত্ত ভক্তাবাপন্ন সাধু সঙ্গের প্রয়োজন হয় না কি? শাস্ত্রে দেখা যায়—

"মহৎ বিচলনং নৃণাং গৃহীনাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সে ভগবন্! কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥"

কলিপাপাহত মলিনচিত্ত সংসারীর গৃহে সাধু সজ্জনের আগমন কেবল তাহার মঙ্গলের জন্যই হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা যাঁহার কাছে যাইব বা যাঁহাকে ভাল বাসিব তিনি আমার কে কোন্ প্রয়োজনে কোন্ সম্বন্ধ লইয়া কাহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিব এবং তাঁহাকে কি ভাবে ভালবাসিলে তাঁহার দেখা পাইব সহজেই যেন এ কথাটী হৃদয়ে আসিয়া ধাক্কা দেয়।

জীবের প্রয়োজন নানারকম থাকিলেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সাধন ভজন; কারণ কলিপাপাহত জীবের সাধন ভক্তি ভিন্ন কদাচ প্রেম ভক্তির উদয় হইতে পারে না। অতএব নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে গুরুপদ আশ্রয় করিয়া তাঁহার উপদেশমত বৈধ সোপানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রাগমার্গের উচ্চসোপানে উঠিতে হয়। কারণ ছাদে উঠিতে হইলে নিম্ন সোপান আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ যেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর ক্রমে উচ্চতম সোপান অতিক্রম করিয়া ছাদে উঠিতে হয় তেমনি রাগমার্গের উচ্চ সোপানে উঠিতে হইলে বৈধসোপান আশ্রয় প্রথমে কর্ত্তব্য এবং এই রাগ বা অনুরাগের ভজনই ব্রজের ভজন বলিয়া অভিহিত।

এই ভজনে বিধি নিষেধ নাই তথাপি অনুষ্ঠান করা বড় কঠিন। এই জন্যই বিধিমার্গ দ্বারা উক্ত রাগমার্গে যাইতে বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়া থাকেন। কারণ সেইরূপ অনুরাগই বা আমাদের কোথায়। অতএব—

"সেইত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায়
বৈধী ভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

সেই প্রেমময়ের প্রেমের রাজ্যে গমন করিতে হইলে গুরুপদাশ্রয় করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ সাধন ভজন জীবের একান্ত প্রয়োজন। অতএব—

"গুরুপদে মন দিয়ে নিতাই অনুগত হয়ে
ভজ গৌর শ্রীশচীনন্দন।
বিষয় পিয়াসা যাবে আশ্রয় রসে ভাসিবে
মিলয়বে অন্তে বৃন্দাবন।
পরম আনন্দ পাবে নিরানন্দ দূরে যাবে
চিরশান্তি হৃদয়ে বিকাশ।
সুখ দুঃখ মোহ তাপ অভিমান অনুতাপ
অবিদ্যা অজ্ঞান বিনাশ।
গোলকে বসতি হবে পুলকে প্রাণ নাচিবে
ভক্তি মুক্তি হবরে বিনাশ।
সাক্ষাতে সেবা লভিবে পরোক্ষ ভাবনা যাবে
অনুক্ষণ শ্রীমঙ্গে বিলাস।

অতএব আইস ভাই বন্ধুগণ! যদি সেই প্রেমরাজ্যে যাইতে চাও জগৎগুরু প্রেমাবতার যে আদেশ দিয়াছেন আজ আমরা সেই আদেশে আদিষ্ট হইয়া সকল ভাই বন্ধু মিলিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হই। কারণ:—

"হর্ষে প্রভু কহে স্বরূপ রাম রায়।
নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন॥"

সমাজে একটী কথা আছে "কে আর সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেয়", স্বর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কে আর কাচ গ্রহণ করিতে চায়; কিন্তু আমরা গৃহী সংসারী অসার বস্তুর প্রলোভনে প্রকৃত সারকে পরিত্যাগ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুর গৃহমণ্ডপে পূজাপার্ব্বণ না হইয়া হয় কেবল আখড়াই দেওয়া। দরিদ্রনারায়ণের জন্য আর তাহার প্রাণ কাঁদে না, কাঁদে কেবল হাবভাব লাবণ্যবতী-বিলোলকটাক্ষীদের জন্য। বলিলে অত্যুক্তি হয় না আজ প্রত্যেক হিন্দুর কর্ম্ম কামনাপূর্ণ; তাহার কোন কর্ম্মই যেন কামনাশূন্যতার পরিচায়ক নহে।

সত্যনারায়ণের পূজা হইতে বৃহৎ বৃহৎ যাগ যজ্ঞের মধ্যেও সেই বাসনা বিরাজ করিতেছে। কামনা ছাড়া যেন হিন্দু এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন না।

হিন্দু ইহা জানেন না কামনার মধ্যে থাকিলে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা অনন্তকোটিগুণ আনন্দ অনুভব করা যায় যদি তিনি বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। ইহা তিনি জানেন না "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" তুচ্ছ স্বর্গের আশায় বড় বড় যাগ করিতেছি বটে তৎকর্ম্ম জন্য সোনার বেড়ী পায়ে দিয়া স্বর্গে যাইতেছি বটে কিন্তু যখন সেই কর্ম্মের ফল ক্ষয় হইবে তখন পুনশ্চ এই সংসারেই আসিতে হইবে। অতএব কেন যে হিন্দু সেই কামজ কর্ম্মের জন্য ধাবিত হন তাহা বুঝিতে পারি না। এবং এই জন্যই প্রাণে প্রকৃত শান্তি তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না। কারণ—

"ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তি সুখ স্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে ভোগেচ্ছা বা মোক্ষেচ্ছা বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ কোনও প্রকারেই সন্তাপনাশিনী ভক্তিরাণীর উদয় হইতে পারে না।

ভগবান বলিয়াছেন, "নীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনা:"—যাহারা সমস্ত কর্ম্মের ফল আমাকেই অর্পণ করিয়াছে বা যাহারা আমারই হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি কিছু দিতে ইচ্ছা করি তাহা তাহারা লয় না। চায় কেবল "ত্বদ্দাস দাস দাসানাং দাসত্বং দেহিমে প্রভো"—নাথ! এই অসার সংসারে আমরা আর কিছু চাহিনা; তবে এই প্রার্থনা তোমারই দাসের দাস তার দাসের দাসত্ব পাইতে যেন আমি বঞ্চিত না হই—

"প্রভো এই ভিক্ষা পদে
আমার জনমে জনমে যুগল চরণে
রতি মতি যেন রহে॥"

ঐদেখুন ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ কত শত বিপদে পতিত হইয়াও বলিতেছেন :—

"নাথ! যোনি সহস্রেষু যেষু-যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচলা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"

নাথ! যে যোনিতেই আমি ভ্রমণ করি না কেন যেন তোমাতেই আমার অচলা ভক্তি থাকে।

ঐ দেখুন মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা রাসমণ্ডল মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইবার ভয়ে সাশ্রুনেত্রে বলিতেছেন :—

"দুর্ব্বৃত্তি হি ত্বয়ি রতিং কুরুতাদ্য আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং।
তন্নঃপ্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দ নেত্র॥"

নিত্যপ্রিয় তোমাতেই দুষ্টমতী জন।
রতি মতি সকলই করে সমর্পণ॥
পতি পুত্র বন্ধুগণ পীড়াপ্রদ হয়।
পরমেশ মোর আশা কর'না ক ক্ষয়॥

হায়! হায়! আমরা এমন অসার গৃহস্থ হইয়াছি, এমন বিলাসিতাসাগরে ডুবিয়াছি যে এমন সহজসাধ্য, এমন মরাগাঙে বান ডাকান, এমন প্রাণ জুড়ান প্রেম, ভক্তিপ্রদ হরিনাম একবার ভ্রমেও বলি না। যদি কেহ বলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে বা তাহার অনিষ্ট সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হই না।

অনন্ত শক্তিময় নাম যেমন জীবে ও ভগবানে সম্বন্ধ পাতাইতে সক্ষম তেমনি ইহার একটি এমনি শক্তি আছে, যাহা পরস্পর পরস্পরকে প্রেমের রজ্জুতে এমন একতাসূত্রে বাঁধিয়া দেয় যে সে বন্ধন সহসা কেহ খুলিতে পারে না, বা এমন মাতাল করিয়া দেয় যে তাহার উঁচু নীচু জ্ঞান থাকে না। সমাজ ইহা বুঝে না তাই সে এমন জিনিষ ছাড়িয়া অন্যের দিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু পার্থিব জিনিষ যতই অন্ধকারে থাকুক একবার যদি সূর্য্যের উদয় হয় তখন সমস্তই আলোকিত হইয়া যায় তেমনি সমাজে যতই অসারগ্রাহী জীব থাকুক না কেন বা সমাজ যতই পাষণ্ড হউক না কেন যদি কোনও ভক্তসূর্য্যের উদয় হয় তখন সমাজ আর তেমন থাকিবে না, সমাজের মধ্য দিয়া এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুতের খেলা খেলিয়া যাইবে—এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিবে—সমাজ মানুষ হইবে। একটা কথা আছে—

"সজাতঃ যেন জাতেন যাতি বংশ সমুন্নতিম্।
পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কো বা ন জায়তে॥"

এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে দিন দিন কত শত মরিতেছে ও জন্মাইতেছে। কিন্তু যাহার জন্মগ্রহণে বংশ প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হয় সেই যথার্থ জাত। সৎপুত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিলে যেমন বংশের ও সমাজের উন্নতি হয় তেমনি সম্প্রদায়ের মধ্যেও যদি সজ্জনের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে যথেষ্ট সাম্প্রদায়িক উন্নতি হয়।

শিক্ষাই যেমন জাতীয় উন্নতির মূল ভিত্তি তেমনি প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃত সাধনপথে অগ্রসর হওয়াই সাম্প্রদায়িক উন্নতির মূল ভিত্তি।

ঐ দেখুন পূর্ণব্রহ্ম প্রেমাবতার শ্রীগৌরবিধু যবন পদদলিত ভক্তি বিবর্জ্জিত নবদ্বীপের আকাশে উদিত। যবনের অত্যাচারে শাস্ত্রের অবহা ব্যাখ্যায় সমাজ ভগবদ্বহির্মুখ। কিন্তু গৌর প্রেমনিধির অসাধারণ প্রতিভায়—নবদ্বীপের অজ্ঞানতম নাশ হইয়া—ধীরে ধীরে প্রেম সূর্য্যের উদয় হইল। বাত্যাপীড়িত অন্ধকারমগ্ন জীব আলোকরশ্মি পাইলে যেমন তাহার দিকে ধাবিত হয় হঠাৎ অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানের গন্ধ পাইয়া অন্ধকারের মধ্যে আলোক পাইয়া মরা প্রাণে যেন প্রাণ পাইল। সমস্ত জীব দলে দলে আসিয়া গৌরপাদপদ্মে শরণ লইল এবং নামরূপ একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ কাঁপাইয়া তুলিল।

ঐ দেখুন পূর্ণপ্রেমাবতার শ্রীগৌরপ্রেমনিধি ভিখারীবেশে বিষ্ণুপ্রিয়াকে অনাথিনী করিয়া, অশীতিপরা বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া, নবদ্বীপবাসীকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া সেই পূর্ণামৃতাস্বাদন আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনরূপ মহামন্ত্র সেই জগৎগুরু কলিপাপাহত দীন গৃহস্থকে দিবার জন্য প্রত্যেক অসার বিষ-বিষাধারভোজী গৃহীর দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বলিতেছেন—ভাইগণ। বন্ধুগণ! আমরা কলির পাপাহত জীব এই সহজসাধ্য নাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতিরেকে আর আমাদের দ্বিতীয় উপায় নাই। যাহা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত কোন কালেই জীব যাহা

পায় নাই সেই প্রেমামৃত তোমাদের হিতের জন্য আনয়ন করিয়াছি। তোমরা একবার হরি বল, মন প্রাণ শুদ্ধ করিয়া হরি বল, সকল ভাই বন্ধু মিলিয়া হরি বল, এই হরিনাম ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই। শাস্ত্রে দেখা যায় "কলৌ তৎনাম কীর্ত্তনাৎ" অর্থাৎ কলিকালে এক নাম সঙ্কীর্ত্তনেই সেই পরম পুরুষকে লাভ করা যায়।

ঐ দেখুন অক্রোধ পরমানন্দ প্রেমদাতা নিত্যানন্দের অবস্থা। জগাই মাধাইএর নিক্ষিপ্ত কলসী কাণার আঘাতে তাঁহার মস্তক হইতে অবিশ্রান্ত রক্তপাত হইতেছে তথাপি বলিতেছেন,

"মেরেছ বেশ করেছ হরি বলে নাচ ভাই"

এখন সাধিয়া যাচিয়া মার খাইয়া প্রেমদান ক্ষমার আধার দয়াল নিতাই বিনা জীবের হিতের জন্য এই সোণার বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর ঘরে বাঙ্গালীর ঠাকুরঘরূপে কেহ কি পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন!

বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেখা যায় যিনি বৈষ্ণব তিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, যেমন কাঠুরিয়া বৃক্ষ ছেদন করিতেছে বৃক্ষ কিন্তু শীতল ছায়াদানে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে না, সেইরূপ পরম সহিষ্ণু নিতাইচাঁদ বৃক্ষের ন্যায় নানা যাতনা সহ্য করিয়া পতিত জগাই মাধাইকে নামের সুস্নিগ্ধ শীতল ছায়া দানে বঞ্চিত করিতেছেন না। অতএব :—

"নিতাই পদ কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
দৃঢ় করি ধর নিতাইএর পায়।"

জীব যদি এইরূপ সৎগুরু আশ্রয় করিয়া কলির সাধন ভজন নামসঙ্কীর্ত্তন করিতে পারে তাহা হইলে সে নিজের স্বরূপ বিচারের সহিত কে তাহার অভিধেয় বুঝিতে পারিবে এবং দাস্য ভক্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তাঁহার দাস হইয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে।

আমাদের অভিধেয় আর কেহই নহেন, —যাঁহাকে পাইলে বা ভাবিলে জীব নিজেকে ভুলিয়া যায়, যাঁহাকে পাইলে—'আমার আমার' জ্ঞান দূর হয়—যিনি রসময় স্বরূপ—যিনি স্বরূপশক্তি রাধারাণীর সহিত বিজড়িত সেই সর্ব্বশক্তিময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আমাদের একমাত্র অভিধেয়।

"শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছেন নিশ্চয়।"

কিন্তু :—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দাস্য জনে রাজা যেন নরকে ডুবায়।
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।"

আমাদের স্বরূপ নিত্যকৃষ্ণদাস। আমরা প্রেমময় শান্তিস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া কি করিতেছি? হায়! 'আমার আমার' জ্ঞানে মায়ায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। আমরা যে তাঁহারই তিনি ভিন্ন আমাদের জ্বালা জুড়াইবার দ্বিতীয় স্থান নাই। হায়! আজ কর্ম্ম দোষে তাঁহাকে ভুলিয়া মায়ার দড়ি গলায় পরিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া এই সংসারে বিচরণ করিতেছি। তথাপি আমরা তাঁহারই —তাঁহার সহিত একটা ভাবনানুরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয় এবং সেই ভাবনা দ্বারাই ভাবনিধি ভগবানকে পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

যে আমায় যেমন ভাবে ভাবিবে আমি তাহার কাছে সেই ভাবে উপস্থিত হই। অতএব ভাবনিধি ভগবানকে পাইতে হইলে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মাধুর্য্য বা কান্ত ভাবের একমত ভাব স্বীকার করিয়া

ভাবনিধি ভগবানকে ভাবিতে হয় এবং এই ভাবনার নাম জীবে ও ভগবানে সম্বন্ধ স্থাপন।

প্রথমেই বলিয়াছি আমরা তাঁহার খেলার পুতুল আমাদের হৃদয়ে যে ভাব দিয়া যখন যেমন ভাবান আমরা তখন সেই ভাবে ভাবি—তাহা অন্যথা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যদিও আমরা সংসার-তাপদগ্ধ জীব তথাপি যদি উক্ত ভাবপঞ্চের একতম ভাব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ভাবিতে পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের অশান্তিময় সংসার শান্তিপূর্ণ হইবে এবং এই সংসারই কৃষ্ণের সংসারে পরিণত হইবে ভাব কি তাহা প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এক কথা ভাবনিধি যদি ভাবান ও সাধু ভক্তের যদি আশীর্ব্বাদ পাই তাহা হইলেই ভাবিতে পারিব।

"তোমার ভাবে ভাবাও আমায়
আমি সেই ভাবেতে হই বিভোর
নাথ! তোমায় ভাবেতে পাগল হইয়া
গাহিব যে নাম হইয়া ভোর ॥ ১ ॥
আমার ভাবে দেখা দাও ওহে প্রাণ সখা
প্রাণ যায় দুঃখে যাও দিয়ে দেখা
কবে তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব হে নাথ প্রেমের ডোর ॥ ২ ॥
কবে লইতে সে নাম আমি হারা হব
আমা-ছাড়া-প্রাণে তোমায় দেখিব
কবে লইতে সে নাম হয় অবিরাম
নয়নেতে ব'বে আনন্দ লোর ॥ ৩ ॥
কবে তোমায় হেরিব সদা এই চিতে
প্রাণের বাসনা সদা এই চিতে
তোমায় না দেখে নয়নে ত্রিতাপ দহনে
জ্বলে যায় হায় হৃদয় মোর ॥ ৪ ॥
হরি ঘুচিবে কবে হে সকল ভেদাভেদ
বাসনা ঘুচিবে যাবে মনের খেদ
আর রেখনা দূরেতে তোমার কাঙালে
ছিঁড়ে দাও হরি সংসার-ভোর ॥

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ
ভাগবতভূষণ।

পল্লীশিক্ষার উন্নতি চিন্তা

পল্লীর রক্ষার নিমিত্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে কোন কোন পল্লীহিতৈষী শিক্ষিত মহোদয়গণের প্রবন্ধ সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়। পল্লীর অধিবাসিগণকে নানা-প্রকার রোগে যেমন ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে, শিক্ষার অভাবেও তাহা-দের সর্ব্বস্ব ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। এক কথায় এই শিক্ষার অভাবই তাহাদের অধঃপাতের একমাত্র কারণ। তাহারা অধঃ-পতনের মাত্রা ধরিবার জন্য অবসর পায় নাই; কেহ বুঝায়ও নাই। চিন্তাশীল লেখক-গণের পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত কয়জন শিক্ষিত ভদ্রলোক সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাইয়া অশিক্ষিতকে আবার আলিঙ্গন দিয়া-ছেন? যাহা হউক এই প্রবন্ধে তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু বলিতে চাহি না। গ্রামের অর্দ্ধশিক্ষিত ভিন্ন এক সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি; বর্ত্তমান যুগে তাহারাও সমাজের নিকট অজ্ঞ বলিয়া পরিচিত।

আমাদের অনেক গিয়াছে, যাইতেও

বসিয়াছে। গ্রামের অবৈতনিক শিক্ষার স্থান "টোলগুলি" ক্রমে ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। প্রাচীন গুরুগৃহই বর্ত্তমানে টোলের আকার ধারণ করিয়াছে। গুরুগৃহের অন্যান্য শিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে; আছে কেবল জ্ঞানদানের ক্ষীণ বাসনাটুকু। গুরুগৃহের দ্বার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তিনবর্ণের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান টোলগুলি অনেকদিন যাবৎ কেবল ব্রাহ্মণ ছাত্রদের দ্বারাই পূর্ণ রহিয়াছে। শাস্ত্রালোচনার জন্যই হউক অথবা পুরুষানুক্রমে চলিত প্রথা ধরিয়াই হউক তাহারাই ইহার ছাত্র। তাহাদের উন্নতি অবনতি যেমন টোলের উপর নির্ভর করে, আবার তেমনই তাহাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর অশিক্ষিত লোকের শিক্ষাও ভবিষ্যতে তাহাদেরই শিক্ষা ও সদ্ব্যবহারের উপর নির্ভর করিতেছে।

বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুর, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে টোলের অস্তিত্ব দেখা যায়। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামেও টোল চলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানেও কতকগুলি টোল আছে। বিক্রমপুরে পূর্ব্বের চেয়ে টোলের সংখ্যা অনেক কম হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহার প্রধান কারণ অন্নসংস্থানের অভাব।

হুগলীর বিশ্বনাথ-চতুষ্পাঠী, বর্দ্ধমানের বিজয়-চতুষ্পাঠী, বহরমপুরের জুবিলীটোল এবং মুলাজোড় প্রভৃতি স্থানের টোলগুলি প্রতিষ্ঠার সহিত চলিতেছে। প্রথমটী ৺ভূদেব বাবুর, দ্বিতীয়টী বর্দ্ধমানের মহারাজার, তৃতীয়টী রাণী আন্নাকালীর, এবং চতুর্থটী কলিকাতার ঠাকুরদের দান ও ভূসম্পত্তির বার্ষিক আয়ে পুষ্ট। সংস্কৃত পরীক্ষার পর সংবাদপত্রে টোলের নাম দেখিয়া থাকি অনেকেই; কিন্তু তাহার মধ্যে কতগুলি সত্তেজ থাকিয়া উন্নতির পথে যাইতেছে? টোলের নাম দেখিয়া মনে হয় সংস্কৃতচর্চ্চা যথেষ্টই হইতেছে প্রকৃত অবস্থা কয়জনে খোঁজ রাখিয়া থাকেন? কয়জন অধ্যাপক নিশ্চিন্ত হইয়া টোল চালাইতে পারিতেছেন? তাঁহারা হয় ত পূর্ব্বপুরুষের ভিটায় টোল প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য পুরুষপরম্পরায় শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। অথবা অন্য উপায় না পাইয়া জীবনের প্রথম বয়সে বিদ্যাদানকেই জীবিকার অবলম্বন করিয়াছেন। আবার হয়ত চাকুরী করাকে অধম বৃত্তি মনে করিয়া দীনভাবে বিদ্যাদান করিতেছেন।

পূতচরিত্র ব্রাহ্মণদিগের বর্ত্তমান বংশধরগণ কিঞ্চিৎ বিদ্যা চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়া শ্রাদ্ধে বা বারমাসে তেরপার্ব্বে পরান্ন ভোজনকেও একটা বৃত্তির মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রগণ নিজের ধী-শক্তির পরিচয় প্রদানে অক্ষম হইয়া ও সংযম পালন অনাবশ্যক ভাবিয়া পিতার নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতেছেন। তারপর টোলে পূর্ব্বের ন্যায় গ্রামবাসিগণের দানের অভাব। তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় টোলকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। ইহাকে শুধু বার্ষিক খরচের একটা কারণ মাত্র মনে করেন। দশ গ্রামের দশটী ছেলেকে তাহারা আর রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। পূর্ব্বে দরিদ্র ছাত্রগণের নিমিত্ত যে 'বার্ষিক' নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে। যদি উপযুক্ত সময়ে টোলের শিক্ষা ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক সমাপ্ত হইত, তাহা হইলে ছাত্রগণ অধিকতর কষ্টসহিষ্ণু হইতেন। গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তান সন্ততিগণের জন্য বিচলিত হইতেন না। চারিদিকের অভাবের তাড়নে প্রথমেই

'বার্ষিক' খোঁজ করিতে হইত না। জনক-দশরথকে পাইতে হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য-বাশিষ্ঠকে অনুসরণ করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পথে ইন্দ্রিয় জয় করিতে হয়। আজ কি আমার সে সাধনা, তাঁহাদের নিষ্ঠার অনুকূলে আসিবে না?

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে যেরূপ ঘুরবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে টোলের শিক্ষা, শিক্ষাপ্রচারের পক্ষে উপযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করি। পল্লীতে এবম্বিধ অবৈতনিক শিক্ষাই যথেষ্ট উপকারী। যদি প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারাও পল্লীর শিক্ষা প্রচার অবৈতনিক হইয়া টোলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-বিভাগ উন্নত হইবে। টোলের শিক্ষা বহুমুখী হইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে সুফল পাওয়া যাইবে। অনেক পিতা পুত্রদিগকে ইংরাজীস্কুলে পড়িতে দিয়া অবশেষে চারিদিকের ব্যয় বৃদ্ধি হেতু পড়াইতে অক্ষম হইয়া পড়েন। কাজেই ছাত্রগণ উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবনকে ভার বোধ করিতে থাকে। টোলের শিক্ষাপ্রণালী বহুকাল যাবৎ এক নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা দর্শন পড়েন তাঁহারা কাব্য পড়েন না; যাঁহারা ন্যায় পড়েন তাঁহারা স্মৃতি পড়েন না। কিন্তু ব্যাকরণ সকল ছাত্রকেই পড়িতে হয়। খুব কম লোকই দেখা যায় যাহারা দুই তিনটী বিষয়ে কৃতী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে চলিতে হইলে অনেক দিক আয়ত্ত করা দরকার। বিভিন্ন দেশীয় জ্ঞানের মাত্রা ধরিতে না পারিলে নিজের পূর্ণতালাভ অসম্ভব।

যে সকল ছাত্র সহরে পড়ে, টোলের ছাত্রগণ তাহাদের নিকট কতকটা উপহাসের পাত্র বলিয়া গণ্য হয়। তবে গ্রামের স্কুলে যাহারা পড়ে তাহাদের সঙ্গে টোলের ছাত্রদের অতটা খাপ ছাড়া ভাব দেখা যায় না। ২৪ ঘণ্টাই তাহাদের সঙ্গে অশন বসন হাসি তামাসার সম্বন্ধ রহিয়াছে। একটা কথা প্রচলিত আছে, ব্রাহ্মণের যে ছেলেটী মূর্খ সেইটীই টোলে যায়। একথা কতকটা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু যাহারা টোলে যায় তাহারা কি সকলেই ঐরূপ হয়? অনেকে বলেন বর্ত্তমানকালে "যে প্রণালীতে টোলে শিক্ষা দেওয়া হয়, ইহাকে মন্দ বলা যায় না। কোন বিষয়ের এইরূপ গভীর আলোচনা না হইলে শিক্ষায় গভীরতা লাভ করিতে পারে না।" যদি পঠনীয় বিষয়, একটী দ্বারাই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ হইত তাহা হইলে এই শিক্ষা প্রণালী উৎকৃষ্ট হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের চারি পার্শ্বে অসংখ্য অভাব, শিক্ষাক্ষেত্রে টোলের ক্ষীণ-প্রভা দেখিয়া বোধ হয়, টোলের শিক্ষাদাতৃগণের শিক্ষাপ্রণালীর গতিকেই ছাত্রগণ জড় হইয়া যান। যিনি কাব্য বা স্মৃতি বা অন্য কোন বিষয় পড়িবেন তিনি প্রথমেই পাঁচ বৎসরের জন্য ব্যাকরণ ইজারা লইবেন; যিনি ব্যাকরণ পড়িবেন তাহার ত কথাই নাই।

অনেকে মনে করেন টোলের ছেলেরা কিছুই বোঝে না, তাই অতটা সময় নষ্ট করে। একথা আমরা বিশ্বাস করি না। এমনও দেখাগিয়াছে, কোন কোন ছাত্র ৮।১০ বৎসরের ভিতর ৩।৪ টী বিষয়ে বেশ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ হিন্দুবিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন কোন অংশ আলোচনা করিতেছেন। যদি তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা হইতেন তাহাহইলে একটা দর হইত। এস্থলে দেখা যাইতেছে সরকারী স্কুলের ছাত্রগণের শিক্ষার

তুলনায় তাহারা অধিক কার্য্যক্ষম। কতজনের হয় ত প্রথমশ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিতেই জীবনান্ত হয়।

অভিজ্ঞতার তুলনায় দেখা যায়, ইংরাজী শিক্ষার্থী ও টোল শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরাজী স্কুলের ছাত্রগণ দেশের সকল আন্দোলনের সংবাদ জানিতে পায়। যে কোন ঘটনা সহরের ছাত্রের দ্বারা অথবা সংবাদপত্রের দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। দৈনিক পত্রিকাসমূহ তাহাদিগকে অনেক সাহায্য করে। দৈনিক পত্রিকা ইংরাজী ভাষাতেই লিখিত হয়; অবশ্য বাঙ্গলা সাপ্তাহিক মাঝে মাঝে ক্ষীণ-প্রাণ লইয়া দেখা দেয়। টোলের ছাত্রগণ, "অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল" হইতে "নীল-সিন্ধু-জল-ধৌত-চরণতল" পর্য্যন্ত "অনিল-বিকম্পিত-শ্যামল অঞ্চলের" উপর কত পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, তাহার কোনই বিশেষ খবর রাখে নাই। তাহারা কোনরকমে দু'বেলা পত্রের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহাদের দারিদ্র্যময় জীবনে এই জ্ঞানলাভই প্রধান কর্ত্তব্য। ২।৩ টী টোল ব্যতীত বিখ্যাত ও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ খুব কম টোলেই আছে। অধিকাংশ লোকেরই জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায় এবং ইহাই তাহাদের সংসার-জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাহাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এরূপ সংকীর্ণ জ্ঞানলাভের কারণ, শিক্ষিত লোকদিগের অনাদর। অনেকেই বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত চর্চ্চাকে মূর্খতার কারণ নির্দ্দেশ করেন। এই অনাদরের ফলে আটচালার অষ্টপ্রহর মুখরিত তান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু ক্ষীণদেহ লইয়া জীবিত আছে, চণ্ডীমণ্ডপ বা বাহিরবাড়ীর ভাঙ্গা ঘর তাহার পক্ষে যথেষ্ট। এখন যাহারা গ্রামের গণ্যমান্য লোক তাহাদিগের পিতা বা পিতামহগণ প্রত্যহ বৈকালে টোলে পণ্ডিতগণের শাস্ত্রালোচনা শুনিতেন অথবা ধর্ম্মতত্ত্বের গূঢ়ব্যাখ্যা অবগত হইতেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। "কালস্য কুটিলাগতিঃ।" এইটী তাহাদের নিত্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল।

যে প্রণালীতে টোলে শিক্ষা দিবার কল্পনা চলিতেছে তাহা প্রচলিত হইলে টোলের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে ভূগোল শিক্ষা দেওয়া একপ্রকার বন্ধ হওয়ার মধ্যে। টোলের ছাত্রদের ত দূরের কথা এবং বলাই বাহুল্য; এই যে জার্ম্মাণ এবং ফরাসী ইংরাজের যুদ্ধ হইতেছে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের স্থান অধিকার করিতেছেন, ধ্বংস করিতেছেন, তাহার ভৌগলিক সংস্থান কয়জনে দেখিয়াছেন। কাণে শুনিয়াই তৃপ্ত, অথবা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াই নিজেকে খুব বড় মনে করিতেছেন। জার্ম্মাণী বেলজিয়ম অধিকার করিল ইংাতে তাহার কি সুবিধা হইল, ইহা খুব অল্পলোকেই ভাবিয়াছেন। তুরস্ক ও ইটালীর যোগদানের কারণ কি? বেলজিয়মের মানচিত্রও অনেকে দেখেন নাই।

১৯০৯ খৃঃ অব্দের পর হইতে ভূগোল, পাঠ গ্রহণ ও ত্যাগ ছাত্রদের স্বেচ্ছাধীন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তবুও বাধ্য বাধকতায় কতকটা শিখিতে হইত। বাণিজ্যবিষয়ক ভূগোল, গণিতশাস্ত্রবিষয়ক ও জ্যোতিষসম্বন্ধীয় ভূগোল পড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই যেন বোধ হয়। বাণিজ্যে পঙ্গু হইয়া ঘরে বসিয়াছি, সুতরাং বাণিজ্যবিষয়ক ভূগোল পড়াইবার কোন প্রয়োজন না হইতে পারে। গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় ভূগোল শিক্ষায়ও আমরা অক্ষম কি? কিছুদিন পূর্ব্বেও কাশীর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ৺ সুধাকর

বিবেদী মহাশয় আর্য্যাণ গণিতজ্ঞগণের মতের উপর নিজ প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। বাকী ছিল সাধারণ ভূগোলশিক্ষা, তাহাও বন্ধ হইতে চলিল। ভূগোল শাস্ত্রকে আমরা কমলানেবুর সঙ্গেই হজম করিতে চলিয়াছি। এরূপ স্থলে নূতন শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিক্ষার দ্রুত উন্নতি দেখিতে হইলে, অধ্যাপকদিগকে সাংসারিক চিন্তা হইতে দূরে রাখা দরকার। পল্লীশিক্ষা প্রচারে পাঠদান ও পাঠ গ্রহণই তাহাদের একমাত্র কায নয়। অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের ব্যয়ভার গ্রামের শিক্ষিত লোকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। তাহাদের দান ক্ষুদ্র হইতে পারে কিন্তু তাহা সহানুভূতির পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ স্থলে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যক্তিগণের দান না পাইলে সুশৃঙ্খলা হওয়া অসম্ভব। তাহারা মুখ তুলিয়া না চাহিলে কার্য্য যে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। টোলের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নতি লাভ করুক, কিন্তু যদি বন্ধ হইয়া যায়, তবে বহুকাল প্রচলিত অবৈতনিক শিক্ষা লোপ পাইবে। জাতির গৌরবের এক অংশে পটপরিবর্ত্তন হইবে। আমাদের দেশের কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া টোলে দান করিয়া থাকেন। কেহ বা টোলের ছাত্রদিগকে উপহার দিবার নিমিত্ত সম্পত্তির অংশও দান করিতেছেন। টোলের যে অবস্থা তাহাতে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ছাত্রগণকে উৎসাহ দিবার অভাব হইবে না। অবশ্য কুতীর দর সর্ব্বস্থানেই আছে। পরোক্ষ ভাবে উহাই কি ছাত্রকে উৎসাহ দেওয়া হইল না?

সংস্কৃত-চর্চ্চা প্রসারলাভ করুক আর নাই করুক, সংস্কৃতভাষা কালে বাঙ্গলা ভাষার কুক্ষিগত হইয়া যাইবে। সংস্কৃতভাষার বৃক্ষ হইতে নানাপ্রকার উপাদেয় ফল বাঙ্গলা ভাষার স্বচ্ছ আবরণের মধ্যে রক্ষিত হইবে। বাঙ্গালীজাতি বাঙ্গলাভাষা দ্বারা নানা দিগ্‌দেশে পরিচিত ও সম্মানিত হইবে। সুতরাং এরূপক্ষেত্রে বাঙ্গলাভাষাকে দূরে রাখিয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহার পুষ্টির জন্য ধনী ধন দান করুন, পণ্ডিত মস্তিষ্ক চালনা করিয়া মাতৃভাষাকে অক্ষয় করিয়া রাখুন। টোলের পণ্ডিতগণ বাঙ্গলা ভাষাকে অন্যভাবে দেখিয়া থাকেন। পারিবারিক ভাষা বাঙ্গলাকে তাঁহাদের সম্মানের চক্ষে দেখা উচিত। তাঁহাদের মধ্যে খুব কম লোকেই বাঙ্গলাভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া দেশের লোককে নূতন জিনিষ দিতে পারিয়াছেন। সংস্কৃতভাষা বাঙ্গলার সঙ্গে মিশিয়া গেলে তাহা আমাদেরই থাকিবে। অনেকের ধারণা বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃতের স্থানে পৌঁছিতে পারিবে না। ইহাতে বিদ্বেষভাবের কিছুই নাই। কিন্তু যুগে যুগে ধর্ম্ম ও সমাজবিপ্লবের মত ভাষা ও সাহিত্যের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ইহা কেহই রোধ করিতে পারিবে না। মানব প্রতিনিয়ত উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে; সুতরাং তাহার আবশ্যক বস্তুমাত্রেই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইবে। টোলের অধ্যাপকদিগকে ভাবিয়া দেখা উচিত—তাঁহারা এতদিন অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা না করিয়া সমাজের নিকট শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন একটা ভিন্ন সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা না করিলে আরো দূরে সরিয়া যাইবেন। কারণ বিভিন্ন দেশীয় গ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এজন্য বাঙ্গলা ভাষার সহিত

সুপরিচিত হওয়া প্রয়োজন। বৈদেশিক ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ দ্বারা যেমন জাতীয় সাহিত্য পুষ্টিলাভ করে, তেমনি নিজদেশের প্রাচীন জ্ঞানের খনি হইতে অপরিচিত রত্নসমূহ সাধারণের নিকট উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। আর্য্যদিগের জ্ঞানের ছবি একটি একটি করিয়া উপস্থিত করিলে পাঠকের মনে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে, স্বদেশের প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। অন্যদিকে বাঙ্গালা ভাষা ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। সত্যনারায়ণ ও শনির পাঁচালী বাঙ্গলায় মুদ্রিত হইয়াছে। চণ্ডীও বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুর আদর্শ গ্রন্থনিচয় ইতি-পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি মন্ত্রগ্রন্থসমূহ বাঙ্গলায় অনূদিত হইলে লোকে ঐ সকলের অর্থ বুঝিয়া প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হইবে। নচেৎ উহা পুরোহিতের পাঠ করান ভিন্ন আর কোন প্রয়োজনেই আসিতেছে না। ২।১ জন পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল; তাঁহারা বলিলেন "তোমরা বুঝিতে পারিবে না, ইহা দেবভাষা। তোমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার ফলে এসব বিষয় ভাবিতেছ।" যে সময় মন্ত্রগ্রন্থ প্রভৃতি লিখিত হয়, সেই সময় দেশে সংস্কৃতই চলিতভাষা ছিল। এখন ত সেই দিন চলিয়া গিয়াছে। তবে কি করা উচিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মৌলিক ও অনুবাদগ্রন্থ বাঙ্গলায় প্রকাশিত হইয়া বিক্রয় হইলে, টোলের একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের পথ হইবে। সুতরাং এ বিষয় অধ্যাপকদিগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ছাত্রগণেরও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক-দিগকে সহায়তা করা উচিত। দুই দিকেই লাভ হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে টোলের ছাত্রগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই ইংরাজী ভাষাশিক্ষা করিতেছেন। ইহাতে বেশ বোঝা যায়, তাহারা নানা বিষয়ের শিক্ষার জন্য ব্যগ্র। অবশ্য অনেকে বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষকতাকার্য্যে উন্নতি দেখাই-বার জন্য শিখিয়া থাকেন। যাহা হউক জ্ঞানপিপাসা কখনও ছাপা থাকিতে পারে না। তাহারা অবৈতনিক ছাত্র থাকিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিলেই অধিকতর উপকৃত হইবে।

টোলে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এককালে অধ্যাপকদের নিয়োগ করিতে গেলে ব্যয়ভার বহন করা দুষ্কর হইবে। অতএব ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন দেশ হইতে উপযুক্ত পণ্ডিত আনাইয়া বিদ্যা চর্চ্চার দ্বারা গ্রামকে পুণ্য-তীর্থে পরিণত করা আবশ্যক। জাতি-নির্ব্বিশেষে জ্ঞানের তুলনা করিয়া চরিত্রবান অধ্যাপক নিয়োগ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজের মধ্যে পরিগণিত হইবে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে ভূমিদান ও সাময়িক ফসল দান করিতে হইবে। অবশ্য ভূমি ও ফসল টোলের সম্পত্তি হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আনীত পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পারিবারিক ব্যয় সম্পাদনের নিমিত্ত টোলের আয় হইতে একটা বৃত্তি পাইবেন। যে সকল পণ্ডিত অধ্যাপনায় বা বিদ্যাচর্চ্চায় অক্ষম বা অনিচ্ছুক তাঁহাদের বিদায়বৃত্তি বন্ধ করিয়া অথবা হ্রাস করিয়া টোলের শিক্ষায় নিযুক্ত পণ্ডিতদিগকে দান করিলে বিদ্যা ও বিদ্যার্থী উভয়কেই সম্মান করা হইবে।

হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপিত হইলে নিকটবর্ত্তী দুই তিন গ্রামের মধ্যে প্রথমে একটী টোল বেশ চলিতে পারে। ইহাতে আরম্ভকালীন ব্যয়-ভার লঘু হইবে। ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি

একত্র হইয়া বিশেষ দুঃসাধ্য কার্য্যও সম্পন্ন করিতে পারে। পূর্ব্বে এক গ্রামের ভিতর ৩৪ টী টোলও বেশ চলিয়া যাইত। এই অবৈতনিক পল্লীশিক্ষার জীবনদান গ্রামবাসীদিগের সহানুভূতির উপরই নির্ভর করিতেছে। যে সকল স্থানে টোল উঠিয়া গিয়াছে বা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই গ্রামবাসিগণ সেই সেই স্থানে আবার নূতন ভাব লইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করুন। গ্রামের অশিক্ষা কুশিক্ষা দূর করিয়া ছেলেদিগকে শিক্ষিত চতুর ছেলেদিগের ছাঁচে ঢালিতে হইলে, এই পল্লীশিক্ষাই একমাত্র ব্যবস্থা। ব্যয়বহুল পল্লীগ্রামেই শিক্ষা অধিক উন্নত হইবে। সকলের পক্ষে ব্যয় বহুল সহর শিক্ষার স্থান হইতে পারে না।

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

সুন্দর

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়"

আহা কি মাধুরী, কি রূপ! এ রূপের কি তুলনা আছে? সাধে কি ব্রজবালা কুল, লাজ, মান সব যমুনার জলে ভাসাইয়া দিয়া, যথাসর্ব্বস্ব সেই শ্যামসুন্দরের রাঙ্গা পায় সঁপিয়াছিল। সাধে কি তাদের "জাতি কুল শীল সকলই ডুবিল, ছাড়িলে না ছাড়ে কালা!" সাধে কি সকল সৌন্দর্য্য-ললামভূতা শ্রীরাধা সেই মদনমোহনের রূপে এমন মজিয়া গিয়াছিলেন। এমন আপনহারা হইয়া সাধে কি প্রেমের ফাঁসি গলায় দিয়া কাঁদিয়াছিলেন—

"বঁধুয়া কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।"

সে মোহন রূপ দেখে না মজে কে? সেই প্রাণ-মাতান সব-ভুলান মাধুর্য্য দেখে কে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে?

সে মদনমোহনের কথা নয় ছাড়িয়া দিলাম—বলি, রূপ দেখে কে না মজে? যতই কেন তুমি স্থিরচিত্ত হও না, রূপের মোহ তোমায় কখনও ছাড়ে কি? মহা তেজস্বী উগ্রতপাঃ বিশ্বামিত্র যখন স্বর্গের অপ্সরা মেনকার অমিয়-মাখা পাগলকরা রূপের ছটা দেখিয়াছিলেন, তখন কি তিনি আপনাকে সামলাইতে পারিয়াছিলেন? যাহা সুন্দর, যাহা মধুর, মানুষ যে তাহার প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হয়—ইহাই যে তার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। সে করিবে কি? যখন ঐ পূর্ব্ব-দিক্‌চক্রবালে রক্তোজ্জ্বল লোহিত-ছটালাঞ্ছিত উষার আলোকলেখা দেখি, যখন ঐ বিশাল অনন্ত-বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়ের অসংখ্য উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে নবোদিত তরুণ অরুণের হেমাভ কিরণ প্রতিফলিত হইতে দেখি, যখন সিন্ধুতীরে বসিয়া—

দূরাদশ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা

দেখি, তখন আমরা যে আপনহারা না হইয়া, সব না ভুলিয়া, বিভোর না হইয়া থাকিতে পারি না। ইহাই যে আমাদের স্বভাব! আমরা করিব কি? তাই বলিতেছিলাম, রূপ দেখে মজে না কে?

এই যে সুন্দরের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক টান, তাহার মূল মানুষের হ্লাদিনী শক্তি বা তার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। মানুষের—মানুষ কেন সকল জীবেরই—সুখভোগের ইচ্ছা তাহার অস্থিমজ্জাগত। যাহাতে সে সুখ পায় সহজেই তার টান সেই দিকে। সুখ বলিতে অবশ্য আমরা অনেক সময়ে দুঃখের অভাব বুঝি। জীব মাত্রেই দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। দুঃখই জীবকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে। দুঃখবোধই জীবের প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিবার প্রধান সহায়। জীব যদি প্রতিকূল শক্তির পীড়নে দুঃখ বোধ না করিত, যদি বিরুদ্ধ অবস্থা-সংঘাতের মধ্যে পড়িয়াও তার সাড়া দিবার ক্ষমতা না থাকিত, তাহা হইলে অকালেই তাহাকে কালের করাল কবলে পতিত হইতে হইত! কিন্তু জীব প্রকৃতির কারুণিক বিধান অনুসারে সহজেই দুঃখ সহ্য করিতে রাজি নহে। দুঃখ পাইলেই জীব কোমর বাঁধিয়া তার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করে। দুঃখ হইতেই তার কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উৎপত্তি। প্রতিপক্ষ শক্তির নিরাকরণ করিবার জন্য কর্ম্ম করা প্রাণের একটা লক্ষণ। শুধু তাহাই নহে—জীবনী-শক্তির কার্য্য এইখানেই শেষ হয় না। জীব জীবন-ধারণের পক্ষে সহযোগী উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া জীবনী-ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়া আনন্দ অনুভব করে। প্রাণধারণের জন্য তাহাকে সহায়তা করে, জীব তাহা লাভ করিতে পারিলে বড় আরাম অনুভব করে।

দুঃখভোগ করিতে জীব একেবারেই পরাঙ্মুখ বলিয়া জীবকে এই রকমে বাহিরের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হয়। বিরুদ্ধ-শক্তির সহিত তাহাকে সতত সংগ্রাম করিতে হয়—তবে ত জীব বাঁচে?

মানুষও প্রথমে এই রকমে দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম করে; কিন্তু সে কেবল দুঃখ-নিবৃত্তিতেই সুখ পায় না; সে নানা রকমে সুখ-সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে। পশু পক্ষী, যতটুকু তাহাদের প্রাণ-ধারণের পক্ষে উপযোগী, ততটুকু পাইলেই সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপ্রতিহত; সে শুধু প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি পাইয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে চায় তাহার ঢের বেশী। তাই তার সভ্যতা, তাই তার ব্যবহারিক বিজ্ঞানের এত কারিগরি। মানুষ কত রকমে তার প্রয়োজনের গণ্ডী বাড়াইবার জন্য সতত উৎসুক। আদিম মানব কখনও কি আধুনিক কালের সুখ স্বচ্ছন্দের আড়ম্বর কল্পনায়ও আনিতে পারিত? অথচ বৈজ্ঞানিকগণ দুঃখ করেন, বিজ্ঞান এখনও শিশু—তাঁহারা যখন এখনও সহজে হাওয়ায় উড়িতে পারেন না, তখন তাঁহারা কি আর পারিয়াছেন?—যেন হাওয়ায় উড়াটা তাঁহাদের অবশ্য প্রয়োজনের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। শারীরিক দুঃখ কোন রকমে নিবৃত্তি করিতে পারিলেই পশু পক্ষী সুস্থ হয়। মানুষ কিন্তু এখানে নিবৃত্ত হয় না—সে যে আনন্দস্বভাব; সে তখন আনন্দ অন্বেষণ করে। প্রথমে অবশ্য আনন্দবৃত্তি কেবল ইন্দ্রিয়জ ও কামজ সুখভোগেই পরিস্ফূর্ত্তি পায়; কিন্তু সে সুখ এত ক্ষণিক যে, ভোগ করিতে না করিতেই তার অবসান হয়। তাই শুধু কামজ বা ইন্দ্রিয়জ সুখেই মানুষ তৃপ্ত হয় না। তারপর মানুষ যত জ্ঞানে ও সভ্যতায় উন্নত হইতে থাকে, সে নানা রকমে তার এই আনন্দ-বৃত্তিকে সন্তুষ্ট করিতে সমুৎসুক হয়। সুখভোগ প্রবৃত্তিবশে তাহার ভোগ্য বস্তুকে শুধু তার ভোগের উপযোগী করিয়া, ব্যবহারের উপ-

যোগী করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় না—সে তাহাকে সুন্দর করিতে চায়—সুন্দর দেখিতে চায়। তাই প্রয়োজনের সহিত 'বাহারের'—'useful'র সহিত 'ornamental' এর সম্মিলনের চেষ্টায় শিল্পের এত উন্নতি। তাই বাসোপযুক্ত সামান্য পর্ণকুটীর মনোহর পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য তাজমহলে পরিণত হইয়াছে—সামান্য নৌকা সুবৃহৎ অর্ণবযানে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু ইহাতেও মানুষের পরিত্রাণ নাই। এত করিয়াও তাহার যেন কিসের অভাব থাকিয়া যায়। ইহাতেও তাহার হ্লাদিনী শক্তির সম্যক্ পরিতৃপ্তি হয় না। হইবে কি করিয়া? মানুষ কি সামান্য? সে যে অমৃতের সন্তান। তার আনন্দময় স্বভাব যে সেই 'সচ্চিদানন্দ'-ময় ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন। তাই মানুষ যতক্ষণ না সেই পূর্ণানন্দের সন্ধান পায়—যতক্ষণ তার আনন্দ ক্ষণিক অল্প আত্মসুখে নিমগ্ন—যতক্ষণ তার আনন্দে 'অহঙ্কারের' লেশমাত্র থাকে—ততক্ষণ সে ক্ষান্ত হয় না—ততক্ষণ সে সুখকে হাতড়াইয়া জগৎময় ঘুরিয়া বেড়ায়। যতক্ষণ না সে বিরাট ক্ষুমা আনন্দময়ের সন্ধান পায়, ততক্ষণ কি সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? সে যে সেই বিরাটকে দেখিতে চায়। সে যে বিরাটের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে চায়। তাই যতক্ষণ বিরাটের সহিত তাহার সম্মিলন না ঘটে, ততক্ষণ তার আশা অফুরন্ত, ততক্ষণ তার তৃষা অতৃপ্ত থাকে; ততক্ষণ কি যেন কিসের অভাব তাহাকে সদাই বিব্রত করে। কোথায় যেন তার সাধ অসম্পূর্ণ থাকে। আর এই অশান্তির জন্য সে কতই না বিড়ম্বনা ভোগ করে—সে নিতুই নব নব উপায়ে নব নব সুখসাধনের পন্থা উদ্ভাবন-কল্পে কতই না যন্ত্রণা ভোগ করে। তবু তার অতৃপ্তি কেবল বাড়িয়াই যায়। যতদিন সে আত্মসম্ভোগের জন্য সুখ চায়, ততদিন তার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা মিটিবার নহে; একের পর আর এক, তারপর আবার এক, এই রকম করিয়া অনন্ত কাল পর্য্যন্ত সে সুখের আশায় আকুল হইয়াও মুক্তি পায় না।

মানুষের আনন্দময় স্বভাবই তাহার ভূমার সহিত মিলিবার আকাঙ্ক্ষার বিরাট আত্মপ্রকাশ। তাই যতদিন না সে মিলন হয়, ততদিন তাহার বিরাম নাই; কিন্তু মানুষ যে আনন্দ চায়, তাহা ত কেবল কামনাজ আত্মতুষ্টি নয়। যে বিপুল আনন্দের জন্য মানুষ লালায়িত, সে আনন্দের মূলে 'অহং' ভাবের লেশ মাত্র থাকিলে ত চলিবে না। সে আনন্দের অভিব্যক্তি আত্মসম্ভোগে নহে, আত্ম-নিবেদনে;—আত্মম্ভরিতায় নহে, আত্ম-বিস্মরণে;—আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে, আত্মবিসর্জ্জনে। তাই যেখানে মানুষ সে আনন্দের একটুও আভাস পায়, তাহার প্রতি সে আপনিই আকৃষ্ট হয়; তখন তার প্রাণের সেই নিভৃত মিলন আকাঙ্ক্ষাটির সাড়া পাইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে; তখন সে আপনাকে ভুলিয়া সেই আনন্দের বিষয়টির জন্য আকুল হয়।

এই জন্যই মানুষ সৌন্দর্য্যের কাঙাল। যাহা সুন্দর, যাহা মধুর মানুষ তাকে ভালবাসে—সে রূপ দেখিয়া মজে। তাই যখন প্রকৃতি-দেবী তার চক্ষের সম্মুখে সৌন্দর্য্যের পট প্রসারিত করিয়া দেয়, তখন কি এক অদ্ভুত রসের আস্বাদ পাইয়া আত্মহারা হইয়া মানুষ সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। উন্মত্ত বাত্যা-বিলোড়নে বারিধিবক্ষে উত্তাল তরঙ্গের দোলায় ভীষণ

সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে এমন চিত্তহারা হইয়া যায় যে, পোতমধ্যে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহার মনে থাকে না। তখন মহা সমাধি-বলে মহানন্দময় মহাসাগরে সে ডুবিয়া যায়। তখন সব একাকার হইয়া যায়! তখন তার আমিত্ব কোথায় লয় হইয়া যায়; আর তাহার স্থানে এক বিরাট্ অনুভূতির মধ্যে সেই মহান্ সৌন্দর্য্য তাহার ক্ষুদ্রত্বকে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' হইয়া ভূমানন্দময় রূপে আবির্ভূত হয়। আর মানুষ সে মিলনের আস্বাদ পাইয়া পাগল হইয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া আমরা ভূমাকে যেমন আপনার মতন করিয়া দেখিতে পাই, এমন আর কিছুতেই পাই না। সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিরাটের যে আত্ম প্রকাশ, তাহা আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়। যাহা সুন্দর, তাহা সার্ব্বভৌমিক। সৌন্দর্য্য ত দেশ কালের বিচার করে না, পাত্রাপাত্রের অপেক্ষা করে না; তাহা যে সকলেরই প্রিয়, সকলেরই আপনার—বড় আপনার। তাই বলিতেছি সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমরা বিরাটকে যেমন সমগ্রভাবে দেখিতে পাই, এমন কি আর কিছুতে পারি? ভূমার বিরাটত্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন করিয়া ধরা পড়ে, এমন কি আর কিছুতে পড়ে?

জ্ঞানের দুর্গম পথ দিয়া আমরা আমাদের চিরবাঞ্ছিত মিলনপথে বড় বেশীদূর যাইতে পারি না। বুদ্ধি দ্বারা আমরা কেবল আবরণ সৃজন করিয়া সত্যকে আরও দূরে রাখি। বুদ্ধি সত্যকে জানিবে কি করিয়া? বুদ্ধির বিকাশ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ স্থাপন করিয়াই হয়। কিন্তু এমন করিয়া সত্যকে দূরে দূরে রাখিলে ত চলিবে না। যতদিন না সত্যেতে আর আমাতে অভেদ দেখিব ততদিন সত্যকে আমরা যথার্থ পাইতে পারি না। ততদিন আমাদের বিড়ম্বনাই সার; কিন্তু মানুষ তার প্রাণের ব্যাকুলতায় ভূমার সন্ধানে যুক্তি বিচার অবলম্বন করিয়া হতাশ হইয়াছে। 'বুদ্ধিভেদ্য তর্কারণ্যে' প্রবেশ করিয়া সে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে।

কিন্তু তার প্রাণের দেবতা যে শুধু সত্য নয়, তিনি যে আবার শিবসুন্দর। রসবৈসঃ—তিনি যে সকল রূপের সকল সৌন্দর্য্যের উৎস, তিনি সুন্দর বলিয়াই যে জগৎ সুন্দর—তাঁহার সৌন্দর্য্যেই যে জগতের সৌন্দর্য্য। আর সে সৌন্দর্য্য মানুষের যে চির-পরিচিত। সৌন্দর্য্য দেখিলে মানুষ যে আপনিই বিভোর হয়। শিক্ষা দীক্ষার ধার ধারে না, মানুষ সৌন্দর্য্যের প্রভাব তার হৃদয়ের প্রতি পরতে, প্রাণের প্রতি স্পন্দনে অনুভব করে, আপন করিয়া অনুভব করে—আপনাকে হারাইয়া সুন্দরের অস্তিত্ব অনুভব করে। তাই যখন যমুনার কূলে শ্যামের বাঁশী বাজিল, সে বেণুরব 'ব্রজবাসীরা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মন প্রাণ', তখন 'ঘরজ তরণী হইল বাউরি', কূল মানের অপেক্ষা করিল না—তখন তারা পাগল হইয়া সেই বংশীবদনের অনুগামী হইল। আবার সেই কদম্বের মূলে—

"শরদ শশধর　　বদন মনোহর
রজনী বদন হি সুবধ চকোর
নীল ইন্দিবর　　সুন্দর লোচন
অঞ্জন অরুণ তরুণ চিত্তচোর
মাণিক অধরে　　মনোহর বংশী
রসের তরঙ্গিম মতিমোর
অমিয়া বচন　　শ্রবণ অনুরঞ্জন
গঞ্জন নীরদাভাস
এক অনুপম　　জগমনমোহন
হাসি অনু বিজুরী প্রকাশ।"

সেই কালাচাঁদের রূপ 'যে জন দেখিল সে জন ভুলিল কি তার কুল বিচার'। সেই 'নীল নাবনি অবনী তরল রূপ' সেই 'জগ-মনমোহন' রূপ দেখিয়া না মজিয়া, আত্মহারা না হইয়া কেহ কি আর থাকিতে পারে? তখন যে তাহার অতৃপ্ত মিলন-আকাঙ্ক্ষাটি সমস্ত ক্ষুদ্রত্বের বাঁধ ভাঙিয়া চুরিয়া তাহাকে সেই বিরাটের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। এমন করিয়া তাহার প্রাণের দেবতা তাহাকে ধরা দিলে সে আপনহারা না হইয়া করিবে কি? যার অভাবে সে এতদিন অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, আজ যে সেই চিরঈপ্সিত তার এত নিকটে—তাই সে বিভোর হইয়া সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে লাজ, মান, আমিত্ব, আপনার সব ক্ষুদ্রত্ব ডুবাইয়া দিয়া অপলক নেত্রে সেই রূপ দেখিতে লাগিল; তার সমস্ত মন প্রাণ দুটি চক্ষু হইয়া সেই রূপ দেখিতে লাগিল। 'নিমিখে নিমিখে নাহি হয়' তবুও আশ আর মিটে না, যুগে যুগে এই রূপ দেখিয়াও তৃপ্তি আর ফুরায় না। এত দেখিয়াও সে রূপের অভিনবত্ব খর্ব্ব হয় না। সে যে 'নিতুই নূতন',

'জনম অবধি ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল'।

সে আনন্দময়ের রূপ একবার যে দেখিয়াছে—সে যে সব ভুলিয়াছে। একবার যে সে রূপের ছটা দেখিয়াছে, একবার যে সে মাধুর্য্যের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার কাছে জগৎ মধুময়, বিশ্বের যা কিছু সবই সুন্দর। সে মাধুর্য্যের নিকষে সব সোনা হইয়া যায়, সব মধুময় হয়।

"ঐ রূপে নয়ন দিলে বিশ্ব হয় মধুময়
তখন সকলি মধুর,
তখন তুমিও মধুর, আমিও মধুর
বিশ্বে যা দেখি, তাই সকলই মধুর।" *

এমন ভুবনমোহন মাধুরী একবার যে দেখিয়াছে, তাহার দৃষ্টি তখন সেই রূপ ছাড়া আর কিছুই কি দেখিতে পায়?

এইখানে মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতির চরম পরিণতি। মানুষ যখন সেই আনন্দময়ঘন ভূমার কমনীয় রূপ দেখে, তখন তাহার যে বিপুল আনন্দ সঞ্চার হয়, তাহা অসীম, অপরিমেয়। তাহার বিকার নাই, ক্ষয় নাই। অনন্ত কাল ধরিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিয়াও নিঃশেষ করা যায় না। সে কি তৃপ্তি, কি সুমহান্ আনন্দ! তখন স্বার্থ-সাধনের দাসত্বের মুক্তি লাভে, ক্ষুদ্র আত্ম-দমনের বিপুল আত্মপ্রসাদের মহা পূর্ণতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়। তখন যে তৃপ্তি হয় তাহার তুলনা নাই, তাহা অনির্ব্বচনীয়। সে এক নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ ভাব—ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাহাই মুক্তি—মানুষ তখন আপন পর জ্ঞান ভুলিয়া যায়—তখন তাহার 'অহং', 'ইদং' ভাব থাকে না। তখন তাহার কাছে সব একাকার হইয়া যায়। সে তখন যাহা দেখে তাহাকেই সুন্দর দেখে, তাহাতেই সেই সুদর্শন মধুসূদনের মাধুরী দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যায়, তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিবার জন্য পাগলের মতন ছুটিয়া যায়; দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ঐ কৃষ্ণ, ঐ আমার কালাচাঁদ বলিয়া তখন সে মত্তমাতঙ্গের পদতলে লুটায়—সর্ব্বস্বকে অন-

* এই পদটি ভক্তপ্রবর অধিনীকুমার দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক রচিত একটি গানের অংশ; এই বৎসরের 'ভারত-বর্ষের' শ্রেষ্ঠ সংখ্যায় গানটি বাহির হইয়াছে।

লের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়ে; আবার অস্পৃশ্য হরিদাস যবনেরও পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। তখন তাহার প্রেমময়ের মাধুর্য্য সারা বিশ্বময় ছাইয়া পড়ে। তখন থাকে কেবল—সে আর তাহার প্রাণের ঠাকুর সেই আনন্দময় পুরুষ, মাঝে নাই কোন বাধা ব্যবধান। তখন সে আপনাকেও সেই আনন্দময়ের মধ্যে হারাইয়া ফেলে। তখন সে আর ভগবান একই সত্তাতে মিশিয়া যায়। তখন তাহার কাছে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সবই আনন্দময়, মধুময়।

ভগবানের আরাধনার প্রকৃত অর্থ যদি—'তন্ময়ত্ব' প্রাপ্তি হয়—তাঁহাকে পাওয়ার মানে যদি তাঁহাতে একেবারে লীন হওয়া হয়, তবে তাঁহার মাধুর্য্যের মধ্যে তাঁহাকে আমরা যেমন ভাবে আপনার বলিয়া ধরিতে পারি—তাঁহার সৌন্দর্য্যের সহিত যুক্তাত্মা হইয়া তাঁহার যেরূপ প্রাণভরা আরাধনা করিতে পারি, এমন আর কিছুতেই পারি না। ভগবান আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ বলিয়া এ জগতের সহিত তাঁহার যেরূপ সম্বন্ধ তাহাও—আনন্দময়, মধুময়। তাই ত মানুষ আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য এত ব্যাকুল। আর তাহার আনন্দ ভোগ বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের, উৎস, সর্ব্ব আনন্দের আকর সেই ভূমানন্দময়ের উপাসনায়। মানুষ তাই সেই 'জগমনমোহন' রূপ দেখিয়া আপনাকে ভুলিয়া গিয়া তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই চিত্তহারা ব্যাকুলতার নামই ভক্তি, প্রেম। সেই প্রেমিক পুরুষের সংস্পর্শে যে একবার আসিয়াছে সেই প্রেমে মজিয়াছে—ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিয়াছে—

"পিরীতি ধরম পিরীতি মরম
পিরীতে পরাণ দিব।"

তখন যে তাহার সমস্ত চেতনা, সমস্ত অনুভূতি সেই প্রেমিক কানুর প্রেমেতেই ভরপুর। পাছে তার ঐহিক জীবন সেই প্রেমের পথে অণুমাত্রও বিঘ্ন ঘটায়, তাই যত প্রিয় যে প্রাণ তাহাকেও বিনাশ করিতে সে তখন কুণ্ঠিত নহে,

"পিরীতে লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা।"

শুধু কি তাই! কানুর প্রেমের দায়ে তখন সে বিশ্বপ্রেমিক হইয়া উঠে। তখন সে আপনাকে ভুলিয়া জগৎকে ভালবাসে। বিশ্বপ্রেমের পুষ্পাঞ্জলিতে বিশ্বপ্রেমিকের পূজার্চ্চনা করে। সে যে তখন তার প্রাণের দেবতাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত দেখে। তাহার প্রেমের চক্ষে তখন যে জগৎ সুন্দর, রমণীয়। সে তখন যাহাকে পায় তাহাকেই প্রেম বিলাইবার জন্য পায়ে ধরিয়া কাঁদে। জাতি কুল বিচার রাখে না, অত্যাচার লাঞ্ছনা মানে না, যাহাকে দেখে তাহাকেই বলে 'ওগো আমার ভরাগাঙে বান ডেকেছে', আমি যে আমার ক্ষুদ্র বক্ষে এত প্রেম আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না—আয় তোরা নিবি আয়, তোরা না নিলে আমি যে পাগল হইয়া যাইব।' এমন বিশ্বপ্রেম, এমন আকুল প্রাণভরা ভগবদারাধনা আর কোথাও আছে কি? এমন করিয়া না ধরা দিলে কি আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতাম? আমরা যদি সৌন্দর্য্যের কাঙাল না হইতাম—যদি রূপ দেখিয়া না মজিতাম—তাহা হইলে কি আমরা আর তাঁহাকে এত নিকটে পাইতাম?

মানুষ আনন্দ ভোগ তৃপ্তির জন্য, যে ঐহিক সুখের জন্য লালায়িত, সে সুখ বড় ক্ষণিক, বড় তুচ্ছ, আলেয়ার মতন প্রাপ্তিতেই তাহার বিলয়। সে সুখ তৃপ্তি আনে না,

আনে কেবল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, আর সেই আকাঙ্ক্ষার বন্ধন; কিন্তু আমরা চাই শান্তি হইতে, ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে—সেই সচ্চিদানন্দময় ভূমাকে পাইতে। অন্ধ আমরা, মূঢ় আমরা—বৃথা আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমরা যাঁহাকে চাই, তিনি যে প্রেমিক নাগর, ভক্তবৎসল। শান্ত নির্মল চিত্তে সেই ভূমানন্দস্বরূপের ধ্যান করিলে—ভক্তি প্রেমের অবাধ অসীম উচ্ছ্বাস লইয়া আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন? ভক্তের আকুল আবেদন তিনি কি অগ্রাহ্য করিতে পারেন? প্রেমের বাঁধনে তাঁহাকে যে বাঁধা পড়িতেই হইবে। ভক্তি প্রেমের নিগড়ন পাইয়া তাঁহাকে যে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়

'বল করি চিত চোরাবল মোরি'

ভক্তের জন্য তাঁহাকেও যে কাঁদিতে হয়—আকুল হইয়া কাঁদিতে হয়। ভগবদ্ প্রেমে আপনাকে যে ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার মান-ভঞ্জন-কল্পে ভগবানকে যে সেই প্রেমিকের পায়ে ধরিয়াও কাঁদিয়া বলিতে হয় "দেহিপদ-পল্লবমুদারম্"। তখন ভক্তই বা কে, ভগবানই বা কে; তখন যে ভক্ত সেই ভগবান্; আর যিনিই ভগবান্ তিনিই ভক্ত। ভক্তের প্রেম, সে ত তাঁহারই প্রেম। ভক্তের লাঞ্ছনা ভক্তের ঠাকুরের হৃদয়ে শেলাঘাত করে। ভক্তি প্রেমে তো কোন ভেদাভেদ নাই—তাহাতে যে উপাস্য উপাসক একাত্মা হইয়া যায়। এমনটি কি আর কোথাও আছে? কোথাও কি ভগবান্‌কে মানুষের পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কেহ দেখিয়াছে? ভগবান্‌কে ভক্তের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করাইতে আর কোথাও কেহ কি সাহসী হইয়াছে?

কোথা বনমালী, কোথা বংশীধারী—ভক্তের নাথ, প্রেমের ঠাকুর, তুমি কোথা? আজ তোমার কত আদরের মানুষ ভক্তির পথ হারাইয়া বড়ই বিব্রত—বড়ই বিপথ-গামী! এস নাথ, এস বঁধু, বিশ্বস্পন্দ-যমুনা-তীরে একবার এসে দেখা দাও! প্রেম-ভক্তি-মন্দাকিনীর পূতধারাতে স্নাত হইয়া বিশ্বের সব মলিনতা সব অবসাদ দূর হইয়া যাক্।

হে আমার চিরঈপ্সিত, তুমি সুন্দর, তুমি চির-আনন্দময়। একবার তোমার সেই ভুবনমোহন-রূপ দেখাও। একবার এসে তোমার নিখিল সৌন্দর্য্যের সুষমা লইয়া আমার হৃদয়-রাসমন্দিরে দেখা দেও, আমি প্রেমের অসীম আবেগে তোমার সেই চির-কিশোর কমনীয় রূপ দেখি—দেখিয়া বিভোর হই, মাতোয়ারা হই। একবার এস, সংসার-কদমতলায় আবার তেমনি করে ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াও—তেমনি করে পাগলকরা বাঁশী বাজাও। সুধার লহরীতে আবার তেমনি করিয়া বল 'সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—আমরা সেই প্রাণমাতান ডাক শুনিয়া 'সব তেয়াগি' তোমার কাছে ছুটে যাই, লাজ মান সব ভাসাইয়া আবার তোমার জন্য পাগল হই, আবার আমাদের তাপিত হৃদয় শান্ত করি যে সংসার জ্বালায় আমরা জ্বলিতেছি—তোমার ঐ সবভুলান মাধুরী তাহাতে শান্তি-বারি সিঞ্চিত করিয়া আমাদের শীতল করুক। তুমি প্রেমময়, তুমি মধুর

"এস, এস বঁধু এস
আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া (আমি) তোমায় দেখি হে।"

এস সুন্দর, এস নন্দন-হৃদিরঞ্জন, আবার আঁধারে আলোক আন। একবার যেমন শ্রীরাধাকে ভুলাইয়াছিলে, তেমনি করিয়া আবার আমাদের সংসারতাপদগ্ধ প্রাণ জুড়া-

ইয়া যাও। তুমি ত শুধু রাধিকাহৃদি-বল্লভ নও, তুমি ত কেবল গোপী-জন-বল্লভ নও—তুমি যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের—তুমি যে 'জগমন-মোহন' নিখিল ভুবনমনচোরা। এস, আবার এস, আবার মানুষকে তোমার কাছে টানিয়া নাও। আবার মানুষের সহিত বিরাটের যুগলমিলন ঘটাও।*

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু।

মফঃস্বলের বাণী

১। সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্

সকল প্রকারে পরবশ্যতাই দুঃখজনক। ইউরোপে লড়াই বাধিল, বাঙ্গালার কৃষকের ঘরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল—কেননা পাট খরিদের জন্য আমরা ইউরোপের মুখাপেক্ষী। বাণিজ্যবিষয়ক আমাদের এই বশ্যতা দুই রকম। আমরা শুধু কাঁচা মালই উৎপন্ন করিয়া থাকি—ইউরোপ তাহা লইয়া তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আবার আমাদের নিকটেই বিক্রয় করিয়া আমাদের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। —সুতরাং বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের উভয়সঙ্কট উপস্থিত—আমাদের কাঁচা মাল ঘরে পচিতেছে অথচ ইউরোপের জিনিষও পাইতেছি না।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতিসমূহ নিজ নিজ অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যতদূর সম্ভব নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যেই উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে। ইংলণ্ডে কাপড়াদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হইলেও রংএর জন্য তাহাকে এতদিন জার্ম্মাণীর বাজারে যাইতে হইত। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মাণীর বাজার বন্ধ হইয়াছে—অমনি রংএর অভাবে বিলাতের অনেক কারবার মাটী হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মবীর—সে ইহাতে কিছুমাত্র দমিত না হইয়া নিজের দেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রং তৈয়ারীর চেষ্টা করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। ভবিষ্যতে যাহাতে জার্ম্মাণীর রংএর বাজার একেবারে মাটী হয় তজ্জন্য ইংলণ্ডে বিশেষ আয়োজন অনুষ্ঠান চলিতেছে। আমাদেরও নিকটেও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বাসনাশক্তি যত প্রবল, কর্ম্মশক্তি তাহার শতাংশের একাংশও নহে। তাই আমরা নিজেরা কোনও কিছুতে হাত না দিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট করযোড়ে অর্থ ভিক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ সুযোগ হারাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অর্থ সাহায্য প্রদান যে সম্ভবপর নহে তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। কেননা ভিক্ষাই আমাদের জাতিগত ব্যবসায়। আমরা ভিক্ষাকেই কর্ম্মের আসনে বসাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকি। বড় ও ছোট জাতির পার্থক্য এইখানে।

পৃথিবীর জাতিনিচয় যখন অনন্যসাপেক্ষ হইতে চলিয়াছে, আমরা তখন সাধ করিয়া পরবশ্যতাশৃঙ্খল আপন গলায় পরিতেছি। স্বাবলম্বন শক্তির উন্মেষ ও বিকাশসাধনই যাবতীয় শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য—আর আমরা শিক্ষা লাভ করিতেছি পৃথিবীর

* বর্দ্ধমান—শাখা সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

জাতিসমূহের নিকট আত্মবিক্রয়ের জন্য। আমাদের মধ্যে যে যত শিক্ষিত সে তত পরবশ—তাহার নিত্য ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্য তত বিদেশী, ভাবে ভাবে আচারে ব্যবহারে কার্য্যকলাপে সে তত বিদেশী ভাবাপন্ন। "অন্নসমস্যা" "অন্নসমস্যা" করিয়া চীৎকারে আমরা মেদিনী কম্পিত করিতেছি। কিন্তু এই অন্নসমস্যা বাস্তবিকই কি আমাদের অনেকটা নিজের ইচ্ছাকৃত পাপের প্রতিফল নহে? আমরা দৈনিক যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার অনেকগুলিই কি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে? এগুলিকে কি আমরা ধরসহকারে বর্জ্জন করিতে পারি না? বড় লোক ও সাধারণ লোকের মধ্যে এই তথাকথিত অন্নসমস্যা ততটা করাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই, যতটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট করিয়াছে। কেন? সাধারণ লোকের বিলাস বাসনার ততটা অনুশীলন হয় নাই—তাহার অভাব অল্প। বড় লোকের প্রচুর টাকা আছে, না থাকিলেও সম্পত্তি আছে যাহা রেহাণ দিয়া বা বিক্রয় করিয়া অনায়াসেই প্রচুর টাকা পাইতে পারেন। কিন্তু তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর "পেটে ভাত নাই কিন্তু কপালে সিন্দুর চাইই," এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নাই কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর আছে পুরাপুরি। অফিসের কেরাণিগিরিই যার জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল তার এত বাড়াবাড়ি কেন? কথায় বলে পেটের জ্বালায় বাঘে ধান খায়। অন্নসমস্যা প্রখর হইলে ঘরে ঘরে এত বাবুয়ানা এত বিলাসিতা কেন? ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, যখন আর কোনও যুক্তি খুঁজিয়া না পাইবে তখন প্রতিপক্ষের উকীলকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিও। আমাদেরও তাহাই হইয়াছে, আমরা নিজে সামাল হইয়া চলিতে পারি না—দোষ দেই গবর্ণমেণ্টকে।

আমাদের এই পরবশতার আদি অন্ত নাই। আমাদের পিতামহী মাতামহীগণ নিজহস্তে রাঁধিয়া দু'শ পাঁচ'শ লোককে খাওয়াইতে পারিতেন—তাহাতে তাঁহাদের জা'ত যায় নাই। এখন হাতা বেড়ী দেখিলেই আমাদের সভ্যা ভব্যা সুশিক্ষিতা গৃহিণীগণের আতঙ্কে প্রাণ আঁতকে উঠে। উঠবে নাই বা কেন? তাঁহারা ত আমাদের সহধর্ম্মিণী বটে—আমাদেরই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে বাড়ীর ছেলে পিলের সামান্য অসুখ-বিসুখে গৃহিণীরাই ধন্বন্তরীকল্পা ছিলেন। এখন মেডিকেল কলেজের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডাক্তার না হইলে আমাদের ছেলে মেয়েদের সর্দ্দি সারে না। পোষাক পরিচ্ছদের কথা নাই বা বলিলাম। ফলতঃ এক্ষণে আমরা অফিস আদালতে লাথিঘুঁসি খাইয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকি আমাদের পতিগতপ্রাণা গৃহিণীগণের প্রসাদাৎ তাহার অধিকাংশই উড়িয়া ব্রাহ্মণ, হিন্দুস্থানি চাকর, ও চিকিৎসা-ব্যবসায়িগণ ভাগাভাগি করিয়া লইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা অলঙ্কার ও পোষাক বিক্রেতার নিকট পূর্ব্বজন্মকৃত ঋণ পরিশোধেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে "ধনবানে কিনে ঘোড়া জ্ঞানবানে চড়ে।"

বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষার ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু বাস্তবিকই কি এতই বাড়িয়াছে যে আর আমরা তাহা যোগাইতে পারিতেছি না? ছেলেরা যখন যে টাকার হুকুম করে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তখন তাহাই দিয়া থাকি। কিন্তু সুদূর কলিকাতার মেসে ও হোষ্টেলে পিতৃভক্ত সন্তানেরা কত টাকা কিভাবে উড়াইয়া থাকে তাহার কি কোনও খোঁজ খবর রাখি?

আমরা যে শুধু আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস সম্বন্ধেই পরবশ তাহা নহে পরন্তু প্রাপ্ত শিক্ষার পরিমাণানুসারে আমরা আমাদের কথিত ও লিখিত ভাষা সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ পরাধীন। যখন দুইজন শিক্ষিত বাঙ্গালী পরস্পর কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হয়, নিকটস্থ অশিক্ষিত লোকের নিকট কিষ্কিন্ধ্যা-বাসী জীব বিশেষের কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

এই অহেতুকী পরভাষাপ্রিয়তা আমাদিগকে নানাপ্রকারে পরপদানত করিয়া রাখিতেছে। ইহা তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মাঝখানে একটি দুরতিক্রম্য প্রাচীর উত্তোলন করিয়া দিয়াছে, সুতরাং অযথা বিতক্ত হওয়াতে উভয়েই অনায়াসে পরাহত হইয়া পড়িতেছি। শুধু তাহাই নহে। শিক্ষিতদের মধ্যেও ভাববিষয়ে দৈন্যতা উপস্থিত হইতেছে। পৃথিবী অনবরতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে—একমুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই। পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহ প্রাণপণ চেষ্টায় এই গতির সহিত ছুটিতেছে। তাহাদের দৃষ্টি সর্ব্বদাই অগ্রভাগে সবদ্ধ, পশ্চাদ্দিকে তাকাইবার তাহাদের অবসর নাই। আজ যাহা তাহাদের কাছে নূতন ও আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে, কালই তাহারা তাহা নিতান্ত পুরাণো ও অকেজো বলিয়া পশ্চাতে নিক্ষেপ করিয়া আবার নূতনের জন্য অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য জাতি যাহা পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে, আমরা তাহাই মহারত্ন জ্ঞানে সাদরে কুড়াইয়া ঘর সাজাইতেছি। তাই আজ আমরা বিংশশতাব্দীতেও উনবিংশ শতাব্দীর পুরাণো ও অকেজো জীব সাজিয়া বসিয়া আছি।

সুরাজ।

২। ভারতে জাপানী ব্যবসায়

অন্ধকে সুদৃশ্য চিত্র দেখান বৃথা, কারণ সুন্দর অসুন্দরের ধারণা যাহার নাই সে তাহার কি বুঝিবে? সহযোগিনী "সঞ্জীবনী" ভারতে জাপানের ব্যবসায়ের একটী চিত্র এবং হিসাব দেখাইয়াছেন উদ্দেশ্য, সেই হিসাব দেখিয়া যদি আমাদেরও কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে আমরাও উদ্যোগী হইয়া কিছু কিছু নিজেদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই। কিন্তু সে আশা দুরাশা। দাসত্বনিরত বাঙ্গালীর সে চক্ষু নাই, সে জ্ঞান নাই, আমরা যে চিরনিদ্রিত; বুঝি কেবল টাকার সুদ, আর চাকরী, উমেদারী। এই ঘোর সময়ের মধ্যেও উদ্যোগী জাতিগণ আপনাদের স্বার্থসাধনে তৎপর কেবল আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব এবং পরমুখাপেক্ষী হইয়া জীবন কাটাইব। ইহাই বাঙ্গালীর বিধিলিপি।

১৯১৩।১৪ সালের আগষ্ট হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ৮ মাসে জাপান হইতে কলিকাতায় যত টাকার যে জিনিস আমদানী হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যুদ্ধের পর এই ৮ মাসে কত টাকার দ্রব্য আসিয়াছে তাহার তুলনা করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।

গত মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত জাপান ভারতবর্ষে ৩,২৬০০ গ্যালন বিয়ারমদ্য পাঠাইয়াছে, মূল্য ৫১৯৭। ১৯১৩।১৪ সালের এই সময়ে ৪৮৬ গ্যালন পাঠাইয়াছিল দাম ১০২৭ টাকা।

কাচের মুক্তা প্রভৃতি জাপান গত আগষ্ট হইতে ৪ লক্ষ টাকারও বেশী পাঠাইয়াছে। গত বর্ষে পাঠাইয়াছিল ২৭৮০০০ টাকার। অন্যান্য বৎসরে ১৮ লক্ষের উপরে পাঠাইত।

১৯১৩-১৪ সালে মোটরের সাজ সরঞ্জামের জন্য এদেশে কেহ জাপানের দিকে তাকায়

নাই। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে এদেশে ১১১৭০২ টাকার মোটরের সরঞ্জাম আসিয়াছে।

১৯১৩-১৪র আগষ্ট হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত জাপান আমাদিগকে ১৮,২৮৮ টাকার সাবান দিয়াছিল। গত আগষ্ট হইতে ২৪০৫৬ টাকার দিয়াছে।

ছোট ছোট জিনিসপত্র কিতা বাঁশী সাবান এ সমস্ত বিক্রয়ে জাপান গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মাণীকে হারাইতে চলিয়াছে। কেন না ১৯১৩।১৪র আগষ্ট হইতে মার্চ্চের মধ্যে ছুতানাতা করিয়া আমাদের কাছথেকে ২০৬-১২৯ টাকা লইয়াছিল গত আগষ্ট হইতে ২১০৩৩১ টাকা লইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে কার্পাসের কাপড় জাপানের কাছ থেকে ৬৭৪৮৯৪ গজ লইয়াছিল, দাম ১১১৮-৪৬৪ টাকা। পূর্ব্বে কিন্তু ১৫৮৫৬৫০ গজ আসিয়াছে তাহার দাম ৩০০৫০২ টাকা মাত্র।

যুদ্ধের পর চা'র বাক্স আসিয়াছে ২৩৯০২১ টাকার। ১৯১৩-১৪ আগষ্ট মার্চ্চে ৬১২৪৩ টাকার আসিয়াছিল।

১৯১৩-১৪ এ মিষ্ট দ্রব্য কেবল ৫০ টাকার আসিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে হাজার টাকার মিষ্ট দ্রব্য আসিয়াছে।

আর আমরা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া কেবল তারিফ করিতেছি মাত্র। উদ্যোগের কথা ত দূরের কথা, স্বপ্নেও কিছু করিবার চিন্তাও এক্ষণ হৃদয়ে স্থান দিই নাই। এই টুকুই আমাদের বিশেষত্ব আর কি।

বীরভূমবার্ত্তা।

৩। সামাজিক ধর্ম্মলোপ

একথা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে আমাদের পারিবারিক সুখ শান্তি আর আগেকার মত নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার বহুল বিস্তার সত্বেও আমাদের পারিবারিক জীবন পূর্ব্বাপেক্ষা দুঃখময় হইয়াছে। আমরা ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়াছি সন্দেহ নাই কিন্তু তদ্দ্বারা সুখী হইতে পারি নাই। পূর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষা, সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্য বাড়িয়া গেল কিন্তু সুখ শান্তি কমিয়া গেল! কথাটা যেন আপাততঃ আত্মবিরোধী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। একটু তলাইয়া দেখিলেই এ ভ্রান্তি দূর হইবে।

প্রথম কথা—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা আমাদের জাতীয় জীবনে সুখ শান্তির উপাদান সংগ্রহে সমর্থ কি না তাহা দেখিবার বিষয়। এইটী বিবেচনার সময় একটী কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। আমরা যেন মনে না করি যে আমাদের জাতি ডিম ফাটিয়া হঠাৎ আজ বাহির হইয়াছে অথবা আকাশ হইতে অকস্মাৎ পতিত হইয়াছে। আমাদের জাতিটী অতি প্রাচীন, অতি পৌরাণিক ইহা যেন সর্ব্বদাই আমাদের মনে থাকে। শুধু তাহা নহে,—আমাদের জাতি বর্ব্বর অসভ্যজাতি নহে পরন্তু সভ্য জাতির শিরোমণি, তাহার অতীত ইতিহাস অতি গৌরবময়, তাহার শিক্ষা সভ্যতা আদর্শস্থানীয় ইহা যেন সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণে থাকে। মানুষ অবস্থার দাস। জাতিতো মানবসমষ্টি মাত্র। তাই আজ আমরা প্রতিকূল অবস্থার আবর্ত্তে পড়িয়া হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছি, পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া তাহার স্মৃতির দংশনে ব্যথিত হইতেছি।

জাতিটী যদি আধুনিক হইত, যদি বিলাতের আমদানী করা নূতন জিনিষ হইত, যদি ইংরাজ জাতির হাতগড়া হইত তাহা হইলে আর তাহাদের শিক্ষা সভ্যতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার আবশ্যকতা ছিল না। পাশ্চাত্য

হংবভাব আমাদের রক্ত মাংসের সহিত এক হইয়া যাইত, জল বায়ুর মত অবাধে নিত্য ব্যবহারের উপযোগী হইত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির কারণ হইত। কিন্তু জাতিটী যে অতীতহীন ভুইফোড় নহে ইহাই মুস্কিল, এখানেই গোল বাঁধিয়াছে এবং এই জন্যই পাশ্চাত্য ভাবে অভিভূত হইয়াও আমরা সুখী হইতে পারিতেছি না।

আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সমাজ হইতে অনেকটা পৃথক ধরণের। একথা বলাই বাহুল্য যে উভয়ত্রই যথেষ্ট দোষগুণ বিদ্যমান্ আছে। কোন কোন অংশে পাশ্চাত্য সমাজ আমাদের সমাজ হইতে উন্নত হইতে পারে কিন্তু প্রাচ্য সমাজের নিকটও তাহাদের যে যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় আছে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সমাজ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে তাহারা যতটা একাকী থাকিতে ভাল বাসে আমরা ততটা নহি। "মানুষ সামাজিক জীব"। একথাটা আমাদের সম্বন্ধে যতটা খাটে তাহাদের সম্বন্ধে ততটা নহে।

পুরাকালে সমাজ সেবার পরিচয় আরও অনেক পাওয়া যায়। আশ্রয়হীন শ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করা, অতিথিসৎকার, বিনা বেতনে শিক্ষা দান—তাহার অন্যতম উদাহরণ। লোক শিক্ষার জন্য সমাজে যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা অতুলনীয়। ধর্মশাস্ত্র পুরাণাদি কথকতার সাহায্যে সহজ বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া সাধারণে প্রচারিত হইত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কথকতা করিতেন সমাজে তাঁহাদের যথেষ্ট সম্মান ও আদর ছিল। পূর্ব্বকালে শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেতন গ্রহণ করা হইত না। এবং যাঁহারা এই পবিত্র লোক-হিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন তাঁহারা জমিদার ও ধনীলোক কর্ত্তৃক যথেষ্টরূপে সাহায্যকৃত ও সম্মানিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ের টোল ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় ইহার অস্থি কঙ্কালময় চিহ্ন মাত্র। এই প্রথাটী জাতীয় জীবনের উন্নতির পক্ষে বড়ই অনুকূল। কথকতার সাহায্যে বর্ণজ্ঞানহীন ধনী নির্ধন স্ত্রীলোক পুরুষ সকলেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। পাপ পুণ্য জিনিষ কি তাহা সকলেই বুঝিত এবং তদ্দ্বারা পাপে ঘৃণা ও পুণ্যে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। তখনকার সমাজের অধস্তন শ্রেণীর লোকেরাও জানিত যে "পরপীড়নে পাপ হয় এবং পরোপকারে পুণ্য হয়"। "মানুষ যত বড়ই ক্ষমতাশালী হউক না কেন তাহার উপর সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান আছেন" 'মানুষের বর্ত্তমান জীবনই তাহার অস্তিত্বের শেষ নহে'। তাহারা যে ইহা শুধু জানিয়াই সন্তুষ্ট হইত তাহা নহে; এই সব ধারণা ও বিশ্বাস তাহাদের প্রতিকার্য্যে প্রতিফলিত হইত। এই জন্যই আগেকার দিনে মানুষ গরীব হইয়াও পারিবারিক সুখ শান্তি প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে সমর্থ হইত। আর এজন্যই আমরা আজ পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতা ও ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য সত্ত্বেও প্রকৃত সুখ হইতে বঞ্চিত। আজ সমাজের দিকে চাহিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আজ ঘরে ঘরে দ্বেষ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা বিরাজমান। রাজদণ্ড ছাড়া মানুষ আর কিছুকে ভয় করে না। এখন আর মদ খাইলে পাপ হয় না, চুরি করিয়া সারিতে পারিলে আর দোষ হয় না। তাই চৌর্য্য দস্যুতা ও লাম্পট্য সমাজে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এখন যেরূপ কথায় কথায় খুন হয়, যেরূপ সামান্য অভাবে লোক চুরি ডাকাতি করে পূর্ব্বকালে নিশ্চয়ই সেরূপ ছিল না। আইনের কঠোরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে কিছুই হইতেছে না, হইবেও না—বস্তুতঃ মানুষ যদি স্বভাবতঃ ভাল না হয় তবে আইন যতই কঠোর হউক না কেন তাহাতে কোনই ফলোদয় হইবে না। সামাজিক ধর্ম্ম জাগ্রত না হইলে মানুষের ভাল হইবার উপায় নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে সামাজিক বন্ধনের অভাবেই আমরা পারিবারিক শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

বরিশাল হিতৈষী।

৪। জাতীয় দুর্দ্দিনে আত্মত্যাগের প্রয়োজন

আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্য্য

সুসিদ্ধ হয় না অনেকে স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ এই দুইটী বিষয় একার্থবোধক মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি মুষ্টি মুষ্টি স্বর্ণদান করিয়াও দেখিলেন, তাঁহার অক্ষয় ভাণ্ডার প্রায় একই ভাবে রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাঁহার স্বার্থত্যাগ করা হইল, কিন্তু আত্মত্যাগ করা হইল না। যখনই আমি আমার নিজের অত্যাবশ্যক সুখ সুবিধার কিঞ্চিন্মাত্রও পরের জন্য বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হই, তখন পরে বলিলেও আমি প্রকৃতপক্ষে আত্মত্যাগের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া থাকি। জগৎ কবি রবীন্দ্রনাথের "শ্রেষ্ঠদান" কবিতায় এই আত্মত্যাগের চিত্র প্রকৃতই সুস্পষ্ট হইয়াছে। আত্মত্যাগের মহৎ চিত্র এতদপেক্ষা উজ্জ্বলভাবে কখনও প্রদর্শিত হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না।

"রৌদ্র উঠে ফুটে, জেগে উঠে দেশ,
মহানগরীর পথ হল শেষ,
পুরপ্রান্তে সাধু করিলা প্রবেশ
কাননে।
"হীন নারী এক ভূতলে শয়ন
না ছিল তাহার অশন ভূষণ,
সে আসি নমিল সাধুর চরণ—
কমলে।
"অরণ্য আড়ালে রহি' কোন মতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে,
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে
ভূতলে।
"ভিক্ষু ঊর্দ্ধভুজে করে জয়নাদ,
কহে 'ধন্য মাতঃ, করি আশীর্ব্বাদ,
মহা ভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ,—
পলকে।'
"চলিলা সন্ন্যাসী ত্যজিয়া নগর
ছিন্ন চীরখানি লয়ে শিরোপর,
সঁপিতে বুদ্ধের চরণ-নখর—
আলোকে।"

কিন্তু কে আমাদিগকে আজ এই আত্মত্যাগ শিক্ষা দিবে? দেশের নেতৃমণ্ডলী ও ভূস্বামিগণ—যাঁহারা ধনবল ও জনবলের অধিকারী—তাঁহারা অদ্যাপি দেশের অবস্থা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কেমন করিয়াই বা হইবেন? জনৈক মহাপুরুষ বলিয়াছেন:—আমি যদি পেট ভরিয়া খাইলাম, তবে কিরূপে যাহারা একদিন হইল খায় নাই তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিব?" স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন:—

"চিরসুখীজন, ভ্রমে কি কখন
ব্যথীর বেদনা বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যা'রে!"

সুতরাং আমি যদি টাকার অভাবই না বুঝিলাম, তবে কিরূপে অর্থহীন ব্যক্তির কষ্ট বুঝিব?

আমাদের দেশের প্রবল পরাক্রান্ত ভূস্বামিগণ ও শিক্ষিত সমাজ সময়ে সময়ে যে অর্থের অপব্যয় করেন, তাহার অতি সামান্য অংশও দেশের কল্যাণকল্পে নিয়োজিত হইলে দেশ ধন্য হইতে পারে।

বাঙ্গালার অনেক জেলায় ভীষণ অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, লোকে অন্নকষ্টে, কঙ্কালসার দেহে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, অনেক স্থান বন্যাপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র অন্নকষ্টের হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু দেশের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহাদের প্রাণে এই সকল দুঃখদুর্দ্দশার অনুভূতি প্রবল ভাবে জাগ্রত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দেশের এই দুঃসময়ে দেশের জমিদার ও অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কর্ত্তব্য, তাঁহারা সাধ্যানুসারে অর্থক্লিষ্ট ও ব্যাধিপ্রপীড়িত লোকদিগকে সাহায্য করেন। কিন্তু সে বিষয়ে অনেক স্থানেই কোন উদ্যোগ, আয়োজন দেখিতেছি না।

অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ সাময়িক। কিন্তু যে সকল পাপতাপ প্রতিনিয়ত সমাজকে ধ্বংস করিতেছে, সমাজ সংস্কারকগণ তাহার কি করিতেছেন? বাঙ্গলার কায়স্থ-সভা সমাজ হইতে পণপ্রথা বিদূরিত করিতে পারিলেন না, এখনও এই পাপপ্রথা সুকুমারী বালিকাদের প্রাণ হনন করিতেছে! বিবাহাদি উৎসবে এখনও অপরিমিত অর্থব্যয় হয়! যখন অন্নকষ্টে লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে, তখনও দেশের ধনীদিগের কেহ কেহ বিলাসব্যসনে, কবি গানে, খেমটায়, কুরুচিপূর্ণ অভিনয়ে অর্থব্যয় করিতে ইতস্ততঃ করেন না।

ইহাতেও কি বলিতে হইবে, আমাদের মধ্যে জীবন আছে ?

ফল কথা এখন সমাজ স্বেচ্ছাচারিতায় পূর্ণ, সর্ব্বত্র মনুষ্যত্বহীনতা বিরাজ করিতেছে। সমাজের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই মহাত্মা বিদ্যাসাগর বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন, "যদি বাঙ্গালা দেশের তিন হাত পরিমিত ভূমি বঙ্গোপসাগরের জলে ভাসাইয়া দিয়া নূতন মানুষের সৃষ্টি করা যায়, তবেই এ জাতির উন্নতির আশা আছে, অন্যথা নহে।" কবি গাহিয়াছেন :—

"সপ্তকোটী সন্তানেরে হে বঙ্গ জননী।
রেখেছ কাঙ্গালী ক'রে মানুষ কর নি।"

এখন প্রশ্ন এই, দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় কে সমাজকে সুপথে পরিচালিত করিবে ? আজ আমরা দেশের সুকুমারমতি ছাত্রদিগকেই এই প্রশ্ন করিতেছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনেক সুমহৎ কার্য্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। তাঁহারা পদে পদে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন। যখন দেশের সহস্র সহস্র বালকের অর্থাভাবে বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, যখন লক্ষ লক্ষ লোক অর্দ্ধাশনে জীবন ধারণ করিতেছে, কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া আত্মহত্যা করিতেছে, তখন ছাত্রগণ এই লক্ষ লক্ষ নরনারীর জন্য কিছু আত্মত্যাগ করিতে পারেন না কি ? বোলপুর—শান্তিনিকেতনের বালকগণ দেশে অন্নকষ্ট আরম্ভ হইলে ঘি খাওয়া পরিত্যাগ করেন, এবং উদ্বৃত্ত অর্থ অন্নক্লিষ্ট নরনারীদের জন্য পাঠাইয়া দেন। চাঁদপুরের অন্তর্গত কোন বালিকা-বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালিকাগণ তাহাদের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলিয়াছিল, "আমরা পুরস্কার চাইনা। এই সকল পুরস্কার বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা অন্নক্লিষ্ট নরনারীদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হউক।" কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় আদর্শ ! কিন্তু আমরা কি করিতেছি ?

আমাদিগের প্রার্থনা বর্ত্তমান জাতীয় দুর্দ্দিনে ছাত্রগণ এইরূপ আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হউন, দেশ ধন্য হউক। ভগবান আমাদিগের মঙ্গল করুন।

রঙ্গপুর দর্পণ।

৫। সমাজ ও ব্যক্তি

সমাজ সমষ্টিগতভাবে আমাদের জনক-জননী। আমরা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে সমাজের পুত্র-কন্যা। আমি যখন একা তখন সমাজ আমার পিতামাতা—আশ্রয় অবলম্বন শিক্ষক ও গুরু ; সমাজের অন্ন বৃহৎ আবেষ্টনের কোলে আমি সুরক্ষিত। আর সমষ্টিগতভাবে প্রতি জন যখন সম্বন্ধ তখন আমরা আর ব্যক্তি নই, সমষ্টি, ভিন্ন নই এক, তখন জলাধার নই, জলধি। বিশ্ব-মানবত্বের আদর্শে এই মণ্ডলীবদ্ধ একত্ব বোধ হইলে, আমরাই সমাজ আমরাই জনক-জননী স্থানীয় হইয়া দাঁড়াই। তখন পিতাতে পুত্রত্ব ও পুত্রেতে পিতৃত্ব বোধ জন্মে। সমাজ বলিতে ইষ্টক বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মন্দির নয়,—বৃহৎ জনসংঘের অসীম সংজ্ঞাত্মক ক্ষুদ্র বা সসীম অভিব্যক্তি। ধ্যানযোগে বা জ্ঞানযোগে আমরা যখন বিশ্বদেবের চরণে মিলিত হই, তখন আমাদের সংজ্ঞার মধ্যে যে সত্তাজ্ঞান থাকে, তাহা মন্দির নহে, তাহা নাম উপাধি নহে, তাহাই মানব-সমষ্টি বা সমাজ—(church) বা পরমাত্মাতে মানবাত্মার অনন্ত মিলনমন্দির। পিতা পুত্ররূপে জাত হন, আবার পুত্রই পিতা হন। সমাজ ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্ত ও ব্যক্তি সমাজরূপে সম্বদ্ধ।

এই বোধ জন্মাইতে অনেক সময় অনেক শক্তি ক্ষয় হইতেছে—তা অনিবার্য্য। পৃথিবী তরল-উষ্ণ-বাষ্পরাশির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ও পরিণতি। পৃথিবীর এরূপ দৃঢ়, শীতল, শ্যামল শস্যপূর্ণ, সুন্দর পশু পক্ষী ও মানবমণ্ডলীর বাসভূমিতে পরিণত হইতে কত যুগ অতীত হইয়াছে। মানবের বর্ত্তমান সভ্যতা, বর্ত্তমান ধর্ম্মজ্ঞান অর্জ্জন করিতে পৃথিবীর মত অনেক সহিতে হইয়াছে। তবুও কিন্তু পরস্পরের দ্বন্দ্ব কলহ বিরোধ বিচ্ছেদের সীমার শেষ হয় নাই, কোন দিন পূর্ণরূপে হইবে কিনা জানি না। তবে তা সম্ভব হইতে হইলে অসীমতার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত সসীমতার বোধ আবশ্যক। আমি রামের শ্যামের তুলনায় আমাকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া অবসন্ন ও মহৎ ভাবিয়া উদ্ধত হইতে পারি, কিন্তু সমগ্রের তুলনায় আপনাকে তেমন ভাবিবার স্থান

নাই, এখানে ঔদ্ধত্যেরও স্থান নাই, অবসন্ন অকিঞ্চন অধম বলিয়া উপেক্ষিত পরিত্যক্ত হওয়ারও আশঙ্কা নাই।

ব্রহ্মবাদী।

৬। গান্ধির আদর্শ

ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত মহাত্মা গোখলের মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত গান্ধির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। দম্পতি যেখানেই যাইতেছেন, আন্তরিক আদর ও সম্মান পাইতেছেন। —শুধু তাঁহাদের দেশহিতৈষণা ইহার কারণ নয়, তাঁহাদের প্রতিভাও ইহার কারণ নয়; তাঁহাদের দীনতা ও ত্যাগ, তাঁহাদের সেবার সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের পূজা আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহারা কবি টলষ্টয়ের শিষ্য। জীবনের অভাব যত কমান যাইতে পারে তাঁহারা তাহা কমাইবার জন্য সাধন করিতেছেন; দেহের রক্তমাংসের প্রভাবের উপর জয়লাভ করিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়চিত্তে চেষ্টা করিতেছেন। আত্মজয়, আত্মত্যাগ, আত্ম সমর্পন,—এই মন্ত্রের তাঁহারা উপাসক। পূর্ব্ব বল, পশ্চিম বল, এই ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত না হইয়া কোন দেশের মানুষই মানুষকে কল্যাণের পথে, প্রকৃত মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারে নাই।

সেবক।

৭। রোজা

কোরানে ভগবান ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে বিশ্বাসী বৃন্দ, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায় তোমাদের জন্য রোজা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেন তোমরা (পাপ হইতে) বাঁচিতে পার। ইহা নির্দ্দিষ্ট কয়েকদিন মাত্র। যদি তোমাদের মধ্যে কেহ রুগ্ন হয়, অথবা প্রবাসে থাকে, তবে অন্য সময়ে তাহা পূরণ করিবে। আর যাহাদের ক্ষমতা থাকে, তাহারা এক এক রোজার জন্য একজন দরিদ্রকে ভোজন করাইয়া দিবে। পরন্তু যাহারা স্বেচ্ছায় সৎকার্য্য করে, তাহাদের জন্য তাহাতে মঙ্গল অবধারিত। আর যদি তোমরা রোজা রাখ, বুঝিতে পারিলে দেখিবে, তাহাতে তোমাদের জন্য মঙ্গল আছে।"

এই রোজা ধর্ম্মজগতে যে নূতন জিনিষ নহে, তাহা সকলেই জানেন। ইহুদীদিগের মধ্যে রোজা আছে, খৃষ্টানগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে উপবাসের আবশ্যকতা এবং মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মেও এই বিধান আছে—আর হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে ত ইহার ছড়াছড়ি ব্যবস্থা। বস্তুতঃ জগতে এমন সম্প্রদায় খুব কম, যাঁহাদের মধ্যে ইহার প্রভাব কিছু মাত্র নাই।

সাধারণতঃ লোকে জানে, দিবাভাগে পান এবং আহার না করার নামই রোজা। ইহার অধিক আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা নহে, 'হাদীসে' লিখিত আছে—

যে ব্যক্তি বৃথা বাক্য এবং বৃথা কার্য্য বর্জ্জন না করিল, খোদার নিকট তাহার আহার এবং পান বর্জ্জন করার কোন আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি দমন করাই রোজার প্রধানতম উদ্দেশ্য। যখন মানুষের খাওয়ার সময় হয়, সকলে যখন খায়, তখন ধৈর্য্য সহকারে নিজের ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া প্রবৃত্তিনিচয়কে নিজের আয়ত্ত করাই রোজার কর্ত্তব্য।

সেবক।

"বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যা ক্ষেত্র.....সাঙ্খ্যসূত্র প্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগ করিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়।..... চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞান-মার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষায় প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ("পুষ্পাঞ্জলি")

৬ষ্ঠ খণ্ড
৬ষ্ঠ বর্ষ

আশ্বিন, ১৩২২

দ্বাদশ সংখ্যা।

আলোচনা

১। পূজা

পূজা আসিয়াছে। এবার দেবী চণ্ডী-মূর্ত্তিতে আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন। দেশ বন্যায় ভাসাইয়া, দুর্ভিক্ষ মহামারি গ্রামে গ্রামে বিস্তার করিয়া তাই তাঁহার আবির্ভাব হইতেছে। বহুদিন ধরিয়া জগদ্ধাত্রীর ক্রমাগত স্নেহ বর্ষণে আমরা 'আদুরে গোপাল' হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের উদ্যম গিয়াছে—আলস্য বাড়িয়াছে। উদারতা ছাড়িয়াছে—স্বার্থ ঘিরিয়াছে; আমাদের নেত্র হইতে জ্ঞানাঞ্জন লুপ্ত—তাহাতে কেবল অবিদ্যার গাঢ় কালিমা।

জগজ্জননীর অতুলনীয় স্নেহ-দানকে আমরা প্রতিপদে অহোরহ লাঞ্ছিত করিয়া ফিরিয়াছি —তাঁহার স্নেহের শিক্ষা আমাদের হৃদয়কে বৃহত্তর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিল, আমরা সে শিক্ষাকে ব্যর্থ করিয়াছি। ভগবতী আমাদিগেরই দ্বারা ধরাতলে স্বর্গ গড়িবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। আমরা তাহা নিষ্ফল করিয়া দিয়াছি। তাই নূতন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়াছে আমরা যাহাতে নিজের ভিতরটাকে চিনিতে পারি, আমাদের জড়তা যাহাতে অবলুপ্ত হয়, আমাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি যাহাতে হীন স্বার্থ গণ্ডীর মধ্যেই পর্য্যবসিত না হইয়া যায়—প্রতিবেশী, গ্রাম এবং গ্রামান্তরে প্রসারলাভ করে, এবার তাহারই আয়োজন চলিয়াছে। তাই দুয়ারে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারি। কে আজ আলস্যের তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখিতে পারিবে? কে আজ শুধু নিজের আত্মীয় স্বজনকে ত্রাণ করিয়াই কর্ত্তব্যমুক্ত হইবে? আজ প্রবল উদ্যম না আনিলে আজ সহানুভূতি ও সাহায্যের ক্ষেত্র না বাড়াইলে, মরণ ত অবশ্যম্ভাবী! মরণকে সকলেই ডরায় এবং ডরায় বলিয়াই তাহা হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য ঐক্যকে গ্রহণ করে। শান্তির মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া বঙ্গবাসী যাহার কথা ভুলিতে বসিয়াছিল, জননীর চণ্ডীরূপ আজ তাহাই সন্তানকে দেখাইয়া দিতেছেন। আজ প্রাণের ঐক্য, হৃদয়ের ঐক্য, কর্ম্মের ঐক্য না গ্রহণ করিলে মরণের হাত হইতে রক্ষা নাই। তাই দেশব্যাপী সেবায়, শুশ্রূষায়, সহানুভূতিতে এবার মায়ের পূজা হইবে। বঙ্গসন্তান, এই পূজায় ব্রতী হইয়া জীবন সার্থক কর। ভুলিয়োনা—চণ্ডীর রোষকষায়িত লোচন তোমারি মঙ্গলের জন্য।

* *
*

২। জাতীয় অবসাদ

মানবজীবনে সময় সময় অবসাদ আসিয়া থাকে। সেই অবসাদে লোক জীর্ণপ্রায় হইয়া যায়। ক্ষুদ্র স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতে না পারিয়া নিজকে অকর্ম্মণ্য বোধ করিয়া অবসাদগ্রস্ত হয়। আবার কোন সময়ে একটা বড় কাজ সম্পন্ন করিতে যাইয়া চতুর্দ্দিকে নিজের দুর্ব্বলতা দেখিয়া প্রহত হইতে থাকিলে অবসাদ আসিয়া থাকে। অবসাদ ও দুর্ব্বলতার নিকট সম্বন্ধ। দুর্ব্বলতার পরিণাম অবসাদ।

কোন জাতি উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিলেই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়—সে কি চায়? তাহার বাসনার দৌড় কতদূর? বাসনা ক্ষুদ্র কি মহৎ? ইত্যাদি। কেহ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, কিন্তু একটা জাতির পক্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ সহজ নয়। সকলে একবারে দম না দিলে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়ায়। সমাজের এক কোণে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে সমাজ উন্নত হয় না। তাহার আদর্শে সমাজে একটা উন্নতির পন্থা পাওয়া যায়। যদি একজনের দ্বারাই সমাজের সকল লোক উন্নত হইত তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের নেতৃত্ব প্রয়োজন হইত না।

আজকাল আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে অবসাদের ছায়া পতিত হইয়াছে। এতদিন সকলেই একভাবে ছিল, কেহ চিন্তা করার ধার ধারিত না। এখন সকলেই এক আধটুকু চিন্তা করিতেছে, আত্মচিন্তা করিলেও কিছু কিছু পরার্থের জন্য হইয়া থাকে। চিন্তা করিতে যাইয়া পথ না পাইয়া হতাশ হইয়া যাইতেছে। অবসাদ ক্রমেই ঘনীভূত

হইতেছে। তাহাদিগকে শান্ত্বনা দিয়া অবসাদ দূর করিবার কেহই নাই। এই অবসাদের কারণটী উচ্চ বলিয়া আশা হয়, অবসাদের কারণ ফলপ্রসূ হইবে। জনসাধারণ শিক্ষালাভ, অর্থাগম ও ধর্ম্মলাভের ঠিক উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না। এই তিনটী বিষয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মলাভ না হইলে আমাদের চলিবে না। ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থাগম না হইলে ধর্ম্মচিন্তা করিবে কি করিয়া? শিক্ষালাভের গভীরতা, শিক্ষিত সম্প্রদায় পূর্ব্বাহ্নেই উপলব্ধি করিয়াছেন। শিক্ষার চরম বিকাশ ধর্ম্মলাভে। সাধারণ লোকের যাহা ধর্ম্ম তাহা এক গৎ বাঁধা উহার সঙ্গে শিক্ষার কোন সম্বন্ধই নাই। তাহারা যে ধর্ম্ম পালন করে তাহা আলোকের পরিবর্ত্তে অন্ধকারে টানিয়া লইতেছে। লোকে ধর্ম্মের নামে দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় দিয়া শান্তি পাইতেছে। আত্মার প্রসারতা ও শাশ্বত পদার্থ লাভের আকাঙ্ক্ষাই উচ্চধর্ম্মের কার্য্য। লোক কখন এক অবস্থায় থাকিতে চায় না। শত সুখকর হইলেও তাহাকে আরো সরস করিতে চায়। সুতরাং আমরা যে পুরাতন অবস্থা ছাড়িয়া নূতনটী চাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের সমাজে এই অবসাদ নূতনত্ব লাভের জন্য। অনেকে অবসাদের ছায়া ঘনীভূত দেখিয়া ভয় হইয়া সাধারণ জনের ন্যায় ধর্ম্মপালন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে চায়। ইহা কি হইতে পারে? যিনি অবসাদের ছায়া দেখিয়াছেন, সে অবসাদ অপসারিত না করা পর্য্যন্ত, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি কোথায়? তিনি দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় দিতে পারেন না। কি করিতে হইবে, কি করা উচিত, কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ইত্যাদি চিন্তার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অনেকেই নাস্তিকতার ভাব দেখাইতেছেন। আমাদের হৃদয় হইতে অবসাদ দূর হউক। এখন সমস্ত সভ্য জগতের উন্নতির যুগ। অন্যান্য জাতির উন্নতি দেখিয়া হতাশ হইলে দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইবে। পাপের মাত্রা বাড়িবে। 'হতাশময় বর্ত্তমান'কে দূর করিতে না পারিলে এইখানেই সব ফুরাইবে। যখন পিছনে পড়িয়াছি, তখন পিছনেই চলিতে হইবে। দুর্ব্বলতার ফলে অবসাদকে আশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু, মূর্চ্ছা আসে নাই। আমরা পূর্ব্ব পুরুষগণের গুণকীর্ত্তন করি কিন্তু কখনও কেহ অভিভূত হইয়াছি কি না বলা কঠিন। আমরা বলিবার কালে গৌরব করি সে পরকে জানাইবার নিমিত্ত। আত্মগরিমা কতটুকু জন্মিয়া থাকে তাহা উপলব্ধি করি কিনা সন্দেহ। সাময়িক ভাগ্যবশে কিছুই আসে না, যায় না। যাহাতে জড়ের মত 'অবসাদ হিমে' ডুবিয়া না যাই তাহাই করিতে হইবে। মুক্তকণ্ঠে ভগবানকে বলিতে হইবে আমার হৃদয় হইতে, আমার জাতির হৃদয় হইতে সকল মলিনতা, অবসাদের ছায়া দূর কর। সকলকে যুগধর্ম্মে দীক্ষিত কর। আমার জাতির হৃদয়ে পিতৃপিতামহগণের ধর্ম্মভাবের বীজ রোপণ কর। আমাদিগকে তাঁহাদের মৃতগৌরবের অধিকারী কর।

* *
*

৩। তর্পণ

সকল দেশের সকল জাতির মধ্যেই যাঁহারা নিজ নিজ উদার পন্থা দ্বারা সমাজদেহে প্রাণ সঞ্চার করেন, তাঁহারা আপনাদিগের কর্ম্ম সমাপন করিয়া চলিয়া যান; আর পরবর্ত্তী

যুগের সন্তানেরা তাঁহাদের পন্থানুসরণ করিয়া চলিতে থাকে। ইহাই সংসারের নিয়ম। উত্তরাধিকারীর একমাত্র উপায় সেই পন্থা, আর পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যের গৌরবই তাহাদের সম্পত্তি। যে জাতি যত বেশী অসভ্যতার পঙ্কে পতিত এবং যাহাদের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান যত অল্প তাহারাই সংসারে তত বেশী দুর্ব্বল। তাহাদের প্রতিভা বহুমুখী করিবার জন্য বিভিন্ন সময়ে বহু বহু কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করেন নাই। যেখানে যতটুকু প্রয়োজন মানবজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায় ঠিক ততটুকুই লাভ করিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে বর্ত্তমান যুগের চক্ষে আমরা বিশেষ উন্নত না হইলেও প্রাচীন ইতিহাসে আমরা দুর্ব্বল নহি। শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিবাজি পর্য্যন্ত বীরগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তারপর রামানুজ ও চৈতন্য হইতে রামমোহন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত মহাপুরুষগণ জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে ধর্ম্মের এক বাণী আজও শুনাইতেছেন। আমাদের সাধু-সন্ন্যাসী ও মুনি ঋষিদিগের অতীত ইতিহাসের কাহিনী ছাড়িয়া দিলেও আমাদের জাতির গৌরব যাহারা, যাহারা বাঙ্গালার জল, স্থল ও আকাশ কবিতার যন্ত্রধ্বনিতে কম্পিত করিয়াছেন সেই কবিদিগকে, মাতৃমন্ত্রের প্রচারক বঙ্কিম-বিবেকানন্দকে, গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু এবং দুর্গাদাস ও সত্যবতীর চরিত্র চিত্রকরকে এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালার শিশু অবস্থার উপযুক্ত অভিভাবক বিদ্যাসাগরকে লইয়াই গৌরব বোধ করিতেছি।

কিন্তু ইহাই বড় দুঃখের বিষয় আমরা তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকি সত্য, কিন্তু গভীরভাবে নহে। হিন্দুশাস্ত্রে তর্পণ করার বিধি আছে। যাঁহাদের নিকট হইতে সমুদয় জীবন উপকৃত হইয়াছে একদিন শ্রাদ্ধে তাঁহাদের প্রতি ভক্তি দেখাইয়াই আমাদের ভক্তির শেষ হয় না। প্রতি তিথিতে তাঁহাদের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া মন্ত্র পড়িতে হয়। তাই, আমাদের বাঙ্গালী জাতি, যাঁহাদের ক্রিয়াকৌশলে গঠিত হইয়াছে, যাঁহাদের গরিমায় বরুদ্ধীত করিয়া চলিয়াছে তাঁহাদিগের উদ্দেশে একদিন সভা হইলে বা বিদ্যালয় বন্ধ হইলেই কি কাজ ফুরাইয়া গেল? ২১ জনের বার্ষিক উৎসব ব্যতীত আর কাহারো জন্য আমরা মিলিত হইয়াছি কি? আমরা আবার সকলকেই স্মরণ করিব। যদি প্রতি তিথিতে তাঁহাদের তর্পণ করিতে না পারি তবে বৎসরান্তে একবার প্রত্যেকের উদ্দেশে তর্পণ করিতে নিশ্চয় পারিব। এ তর্পণ-উৎসবে পিতা সন্তানকে লইয়া উপস্থিত হইবেন। মৃত মহাপুরুষের গুণাবলী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন। বালকের ভবিষ্যৎ জীবন পিতার শিক্ষায় এবং মহাপুরুষদিগের চরিত্রের আদর্শে গঠিত হইবে। যাঁহারা আমাদিগকে অক্ষয় সম্পদের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা আমাদের প্রাণে সজীবতা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে একদিনকার সভায় স্মরণ করিয়া বিদায় দিব, ইহার মত অকৃতজ্ঞতা আর কি হইতে পারে? তাঁহাদের অনেকেই ঊনবিংশ ও বিংশশতাব্দীর প্রথম অংশের লোক। এমন কি ১৯০৪ সনের পর হইতে কয়জন মৃত মহাপুরুষকে আমরা ভাবিয়া থাকি? যাহা হয় সেটা যৌথিক। তাঁহাদের মৃত্যুর দিন বিদ্যালয় বন্ধ হইলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মান করা হয় অনেকে মনে করেন। কিন্তু কি চলিয়া গেল, আমরা

কি যে হারাইলাম, সে বিষয় ভাবিয়া কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন কি? এরূপ ছুটীতে হৃদয়ে একটা অনুভূতি আসা দূরের কথা ছাত্রদের শান্তির দিন রবিবারের মত আর একটী বন্ধের দিন সূচনা করে। আমরা এই তর্পণ উৎসব শুধু বাঙ্গালার জন্যই অনুষ্ঠিত হইতে বলিতেছি না। সমস্ত ভারতের মহাপুরুষগণের তর্পণ উৎসব হউক। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-হেমচন্দ্র-মাইকেল যাহাদের, রাণাডে-গোখলে গোবিন্দ ও ত্যাগরাজী তাহাদেরই। যদি এই অনুষ্ঠান না হয় তবে স্বদেশপ্রীতি স্বজাতিপ্রীতি উচ্চারণ করনার কথাই হইবে। দশজনে এক জায়গায় মিলিত হইয়া প্রত্যেকের জীবনের রহস্য (Secret of Life) আলোচনা করিতে হইবে।

বৃদ্ধেরা এই অনুষ্ঠান না করিতে চান, যুবকদিগকেই ইহা করিতে হইবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা আমাদের দেশের জলবায়ুর গুণে আমরা স্কুল ছাড়িয়া চাকুরী আরম্ভ করিলেই বৃদ্ধের দলে নাম লিখাই! যে দেশে যুবকের কর্ম্মকুশলতার পিছনে বৃদ্ধের উপদেশ নাই, সেখানে যুবকই পিতা আর বৃদ্ধই শিশু। সুতরাং যুবকদিগেরই ইহা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা এই উৎসব আরম্ভ করিলে বরাবর চলিতে থাকিবে এবং আমাদের ধর্ম্মের একটা অঙ্গ হইয়া যাইবে। তর্পণ উৎসব দিনের সঙ্গীত-ঝঙ্কারে মৃত আত্মা তৃপ্ত হইবে। তাঁহাদের আত্মা অনন্ত ব্যাকুলতায় ব্যাকুলিত। পিণ্ডদানে তাঁহাদের আত্মার তৃপ্তি হইতে পারে না। সামান্য প্রাণীর ন্যায় তণ্ডুলকণা তাঁহাদের প্রার্থিত নয়। তাঁহাদের কথা স্মরণে-মননে, তাঁহাদের আদর্শানুসারে জীবন-গঠনেই তাঁহাদের যথার্থ প্রীতি। ঘরে ঘরে এবম্বিধ তর্পণোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে আমাদের ধর্ম্ম বজায় থাকিবে, আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে, আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিব, আমরা কত বড় ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; এবং সে ঐশ্বর্য্য অব্যাহত রাখিবার ক্ষমতাও আমাদের আছে।

৪। বড়োদা ও মহীশূর

স্বদেশীর প্রথমযুগে শিক্ষাপ্রচারে 'বড়োদা' নিজ আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন, আর দ্বিতীয় যুগে 'মহীশূর' ব্যবসাক্ষেত্রে নিজ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে যাইতেছেন। কলিকাতার ও মফঃস্বলের কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা মধ্যে মধ্যে শিল্প ও ব্যবসা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

গাইকোবাড় পাশ্চাত্যদেশ ভ্রমণ করিয়া সুলভ শিক্ষা প্রচারের জন্য নিজরাজ্যে বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনি জাপানী ও আমেরিকার পদ্ধতিতে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত। আমরা জানি কত অসহায় পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্রকে বিদ্যালয়ে দিয়া তাহার পরিবার পোষণের ভার নিজে লইয়াছেন। তিনি প্রকৃতই রাজধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। আমরা সম্প্রতি মহীশূরের শিল্প-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে দেখিতেছি—আমাদের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা এখনও স্পন্দিত হইতেছে। অনেকে বলিয়া থাকেন স্বদেশী আর নাই। ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। মহীশূরের শিল্প-প্রতিষ্ঠান কি সেই স্বদেশীরই ফল নয়? বার বৎসর পূর্ব্বে এই মহীশূর রাজ্য ছিল, এই রাজাও ছিলেন কৈ তখন ত এসম্বন্ধে কোন প্রস্তাবই উত্থাপিত হয় নাই। তখন ত কেহ

ভাবেন নাই। স্বদেশী গাছের ফল নয় যে পড়িবার আশঙ্কা আছে। স্বদেশী আমাদের "বুকের রুধিরে প্রাণের যত্নে" পুষ্ট হইতেছে। স্বদেশীর ভাব, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ তরল পদার্থের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া, মানব-হৃদয়ে ভূমিকম্পনের আয়োজন করে। সেই কম্পনে কয়জন ঠিক থাকিতে পারিয়াছেন? কয়জন নিজকে স্থির রাখিতে পারেন? যিনি সেই দিকে পারিয়াছেন ছুটিয়া গিয়া উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় উঠিয়াছেন ও উঠিতেছেন। উদ্বেলনের গভীরতা দ্বারাই উচ্চও নীচ হইয়া থাকে। সেই কম্পন, সেই অস্থিরতার ফলেই না মহীশূরাধিপতি আজ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্রতী। এত বড় আয়োজন, বিভিন্ন বিষয়ের এক কারখানা আমাদের দেশে এই প্রথম বলিয়াই মনে হয়। মহীশূরের শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভারতবাসীর গৌরবের জিনিষ; আশা ও আকাঙ্ক্ষার স্থল। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা, বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রশিল্প, দেশালাই, সাবান, কাগজ ইত্যাদির ছোট বড় রকমের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দেশী সুতা দিয়া মহীশূরের কারখানায় কাপড় তৈয়ারী হইবে। অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের কলগুলি বন্ধ করা ইহার উদ্দেশ্য নয় বলিয়াই মনে হয়। গুজরাটের কারখানায় মহীশূরের কাচের কারখানার পরিচালক কাজ দেখিতে গিয়াছেন। সেই কারখানার কাচের জিনিষ অন্যান্যদেশে চলিয়া থাকিতে পারে কিন্তু বাঙ্গালার বাজারে হয় বিলাতী, জার্ম্মাণী, বা জাপানী এমন কি ডেন্মার্ক ও বেলজিয়মের কাচের জিনিষ কিনিবার জন্যই যার উমুক্ত ছিল। তার পর সাবানের কারখানা ত কম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অন্যান্য দেশে উহার অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু দেশালাই ও পেন্সিল ভিন্ন ভিন্ন দেশে তৈয়ারী হইয়াছে। কোনটীও হয় ত কাঠ ভাল হইল শীষ্ ভাল হইত না। যত্নের অভাব কি অভিজ্ঞতার অভাব দেখা-নেই কথা। দেশালাইর দু'চারটী কারখানার কথা শোনা যাইত; সেগুলি প্রথমতঃ বাজারের পক্ষে তেমন যথেষ্ট ছিল না, দ্বিতীয়তঃ উৎকৃষ্টতা লাভ করিতে পারেন নাই। শোনা যায়, কাঠ সুইডেন, অষ্ট্রিয়া ও জাপান ব্যতীত অন্য কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। মোটের উপর উৎসাহ দেয় নাই পায়ও নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় খাঁটী ও উৎকৃষ্ট জিনিষ যত শীঘ্র বাহির হয় কারখানার পক্ষে ও গ্রাহকের পক্ষে ততই মঙ্গল। স্বদেশী জিনিষের বদ্‌নাম ঘুচিয়া যাইবে। এক কারখানায় অধিক বিষয়ের প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এইরূপ ২।৪টী বিষয় লইয়া একটী কারখানা খুলিলে কারখানার ক্ষতি হইবার কোন কারণ নাই। বাজার মন্দ হইলে একটী অন্যটীকে সাহায্য করিবে। মহীশূরের মহারাজের মত আরো ২.৪ জন মহারাজের মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে দেশে কাশ্মীর হইতে ত্রিবাঙ্কোর পর্য্যন্ত এবং শ্রীহট্ট হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধ স্বাধীন নরপতি ও জমিদার এবং তালুকদারগণ বাস করেন সেই দেশে স্বদেশী শিল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে ভাবনা কি? কাজ করিতে দাঁড়ায় কে? বড়োদার শিক্ষালয় ও মহীশূরের শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় আরো বহু বহু প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করিতে পারি।

আমাদের শেষ বক্তব্য এই আমাদের দেশের যুবকগণ পরীক্ষায় পাশ হইলেও তাহাদের আত্মবিশ্বাস আদৌ জন্মে নাই। পূর্ব্ব প্রথা মত একটা চাকুরী করিতে পারিলেই হয়। ঐ সকল যুবকদিগকে নিয়োগ করিলে

ফল শুভ হইবে। পক্ষপ্রদেশের যেখানেই হউক এই রূপ শিক্ষালয়ে সংসার পরিচালনকারী যুবকদিগকে প্রাদেশিকতার গণ্ডীর মধ্যে না আনিলেই উপযুক্ত বিবেচনা হইবে। ভারত—ভারতবাসীর ইহাই বোধ হইবে, নতুবা সঙ্কীর্ণতা দূর হওয়া অসম্ভব। বড়োদার শিক্ষাগৃহেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দরিদ্র যুবকের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সমস্ত দেশ উপকৃত হইবে। নালন্দা ও তক্ষশিলার বিহার আবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না কি? আর কাল বিলম্ব না করিয়া এই শুভক্ষণে রাজা ও মহারাজগণ 'মহীশূর' ও 'বড়োদা'র পন্থা ধরিলে আমাদের ভাবীফল করতলগত হইবে। আমরা 'বড়োদা' ও মহীশূরের শিক্ষালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি। গাইকোবাড় ও মহীশূরের মহারাজের উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হউক। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের চিত্র অক্ষয় হইয়া থাকুক।

৫। উপদেশ-সহস্রী

লোটাস লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ প্রচারক সধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আর একখানি অমূল্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত উপনিষদ, সর্ব্ববেদান্তসার-সংগ্রহ, ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইতিমধ্যে সাধারণে আদৃত হইয়াছে। আমরাও তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের প্রশংসা গৃহস্থে প্রকাশিত করিয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদের একটা মস্ত অভাব দূর করিলেন।

বাঙ্গলা অক্ষরে এই মহামূল্য গ্রন্থ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের রচয়িতা ভগবান শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার বিরচিত বেদান্ত প্রকরণ গ্রন্থের মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া শুনা যায়। এই গ্রন্থে মূলের সহিত, অন্বয়, বাঙ্গলা প্রতিশব্দ, রামতীর্থ স্বামী বিরচিত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য প্রভৃতি দেওয়ায় পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। আর সম্পাদক ও অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়ও এই গ্রন্থ সম্পাদনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকা হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ পরিচয় প্রদান করিতেছি—

"এই গ্রন্থ প্রধানতঃ গদ্য ও পদ্য—এই দুই ভাগে বিভক্ত। পদ্যে তিনটি প্রকরণ আছে, তন্মধ্যে প্রথম—শিষ্যানুশাসন-প্রকরণ, দ্বিতীয়—কূটস্থ স্বতাত্ত্ববোধ-প্রকরণ এবং তৃতীয়—পরিসংখ্যান-প্রকরণ। গদ্য প্রবন্ধে তিনটি প্রকরণেই গুরুশিষ্য-সংবাদরূপে বহু উপদেশ বিবৃত হইয়াছে; গুরু, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন বিদ্যার নিমিত্ত গুরুসন্নিহিত সম্যক্‌রূপে পরীক্ষিত ব্রাহ্মণশিষ্যকে যথাবিধি ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিবেন, যে পর্য্যন্ত শিষ্য উত্তমরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয়, তাবৎকাল পুনঃপুনঃ উপদেশ দ্বারা তাহাকে প্রতিবোধিত করিবেন। গুরুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, শিষ্যের যদি সংশয় হয়—আমি ব্রাহ্মণপুত্র, ব্রহ্মচারী, পরিচ্ছিন্ন স্বভাব, আমি বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্ম-বিহীন, অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ কিরূপে হইব,—তাহা হইলে গুরু সে সমস্ত বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম অজ্ঞান প্রযুক্ত অধ্যস্ত, ইহা প্রতিপাদন করিয়া শিষ্যের হৃদ্‌গত বিপরীত জ্ঞান দূর করিবেন। এইরূপে যতকাল শিষ্যের ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সন্দেহ থাকিবে, বুদ্ধিমান্

শিষ্য তাবৎকাল আত্মার প্রকৃত স্বরূপ-জ্ঞানের জন্য পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, পরম কারুণিক গুরুও সেই সেই বিষয়ে শিষ্যের সমুদায় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন। এই গ্রন্থে শিষ্য-মুখে যত বিষয় বিবৃত হইয়াছে এবং গুরুমুখে তাহার সমাধানও কথিত হইয়াছে।

পঞ্চভাগে ১৯টি প্রকরণ আছে, প্রত্যেক প্রকরণের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কারণ, তাহা সূচীপত্র দেখিলে সকলে অনায়াসে জানিতে পারিবেন। সাধারণতঃ মধ্যাংশ হইতে পঞ্চভাগ কঠিন। ইহাতে জ্ঞানের মোক্ষহেতুতা, জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়বাদের নিরাস, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ, আত্মার বিশুদ্ধস্বভাবতা ও অদ্বিতীয়তা, আত্মার সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা, ব্রহ্মাত্মস্বরূপভূত জ্ঞানের নিত্যতা, আত্মার সাক্ষিত্ব ও স্বয়ং প্রকাশ-স্বভাবত্ব, পদার্থ-বিবেক, তত্ত্বমসি বাক্যার্থবিচার, আত্মার অকল্পিতত্ব এবং আত্মভিন্ন বস্তুর কল্পিতত্ব, বিজ্ঞানবাদ, ক্ষণিক-বাদ ও শূন্যবাদ প্রভৃতির নিরাস,—ইত্যাদি বহু বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ বিচার ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও উপনিষদ্‌ভাষ্যাদির ব্যাখ্যা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ, ইহাতে সেই সমস্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণ দৃষ্ট হয়।"

* *
*

৬। গোখলে ছাত্রসমিতি

লক্ষ্ণৌএর ছাত্রসম্প্রদায় পরলোকগত গোখলে মহোদয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য—

(ক) লক্ষ্ণৌএর সর্ব্বজাতীয় ছাত্রসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সংরক্ষণ ও পোষণ করা।

(খ) সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া।

(গ) সভ্যগণের বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক-চরিত্র যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তদভিপ্রায়ে উপায় অবলম্বন করা।

(ঘ) উদার বুদ্ধি এবং সমাজ-সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়া এবং তাহাতে উৎসাহ প্রদর্শন করা।

যে সমস্ত রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক কর্ম্মচেষ্টার সহিত সমাজসেবার কোন সম্পর্ক নাই, সে সকল সমিতি কর্ত্তৃক বর্জ্জনীয়।

(ঙ) জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার করা।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সমিতির দুইটি বিভাগ হইয়াছে। প্রথমটি—সাধারণ বিভাগ। সভ্যবৃন্দ যাহাতে মধ্যে মধ্যে একস্থানে মিলিতে পারেন, বক্তৃতা বা অন্য উপায়ে যাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা এই বিভাগের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়টি—সমাজ-সেবা বিভাগ। নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা, জনসাধারণের নিমিত্ত সহজবোধ্য বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা, এবং যে যে উপায়ে তাহাদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহার উপায় স্থির করা এই বিভাগের কার্য্য।

* *
*

৭। স্বর্গীয় মন্মথনাথ

গত আষাঢ় মাসে আমরা একজন অকৃত্রিম সুহৃদ, একজন অকপট সাহিত্য-সেবক—এক-জন একনিষ্ঠ স্বদেশ-সেবক হারাইয়াছি। এই মেকীর দিনে, আড়ম্বর বাহুল্যের বাজারে

স্বর্গীয় মন্মথনাথ একজন খাঁটী মানুষ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে ভেজাল ছিল না, অন্তরে বাহিরে তিনি এক ছিলেন।—তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ অথচ বিনয়ের অবতার মন্মথনাথকে হারাইয়া আমরা শোকসন্তপ্ত। মাত্র চল্লিশ বর্ষ বয়সে আমাদের সকলকে কাঁদাইয়া, দেশজননীর কার্য্য সেবা করিতে করিতে সেবক মন্মথনাথ চলিয়া গেলেন।

যিনি মন্মথনাথের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তিনিই তৃপ্ত হইয়াছিলেন—মন্মথনাথকে ভাল বাসিয়া ছিলেন। তাঁহার সরল সুন্দর ব্যবহার, তাঁহার সেই একনিষ্ঠ দেশ-প্রীতির কথা ভাবিয়া মনে হইতেছে, আমরা কি দুর্ভাগ্য। অকালে এই স্ফুটনোন্মুখ সুরভি কুসুম কীটদষ্ট হইল। যে ব্রত গ্রহণ করিয়া মন্মথনাথ দেশজননীর সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, জানিনা কতদিনে, কবে—তাঁহার সেই আরব্ধ অসম্পূর্ণ কার্য্য আবার কে সমাপ্ত করিবে?

মন্মথনাথ ওকালতী পাশ করিয়া ভাগলপুরে প্রাক্টিস আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩।২৪ বৎসর। প্রায় ১২।১৩ বৎসর কাল তথায় ওকালতী করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এবং গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। প্রভেদ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন—প্রকৃত সম্পাদকের কার্য্য মন্মথনাথকেই করিতে হইত। গত তিন বৎসর কাল তিনি অতি দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করেন।—এবং তাঁহার সম্পাদনে পত্রিকার পূর্ব্ব গৌরবশ্রী অক্ষুণ্ণ ছিল।

তিনি সুন্দর ইংরেজী লিখিতে পারিতেন; আর তাঁহার লেখার মধ্যে একটা ওজস্বিনী শক্তি ও প্রাণ ছিল। পড়িলেই বুঝিতে পারিতাম, ইহা মন্মথনাথের লেখা। বিছানায় শুইয়া রোগে ভুগিতে ভুগিতেও তিনি পত্রিকায় লিখিতেন।

ইংরেজী ব্যতীত তিনি সুন্দর বাঙ্গালা লিখিতেও পারিতেন। ভারতবর্ষ, উদ্বোধন, সাহিত্য ও আনন্দবাজার প্রভৃতি সাময়িক ও সাপ্তাহিক পত্রে তাঁহার বহু বাঙ্গলা রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

৮। পাটনা কলেজ চাণক্যসমিতি

পাটনা কলেজের ছাত্রবৃন্দ দ্বারা "চাণক্য সমিতি" নামে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

স্থানীয় শ্রমশিল্পগুলির অবস্থা অনুসন্ধান, গ্রামের নানাবিধ তথ্য তালিকা সংগ্রহ, পারিবারিক আয় ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ এবং বৎসর বৎসর তাহাদের তুলনা করিয়া প্রদেশবাসীর প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বিশুদ্ধভাবে নির্দ্ধারণ করাই সমিতিটির উদ্দেশ্য। বিরাট উদ্দেশ্য হইলেও সুবিজ্ঞ চালকের অধীনে কার্য্য করিয়া ছাত্রবৃন্দ বেশ ভাল ফলই দেখাইতেছে। এইরূপ প্রণালীতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ছাত্রদের অর্থনীতিবিষয়ক জ্ঞান শুধু মাত্র পুঁথিগত হয় না। হাতে কলমে কাজ করিয়া তাহাদের যথার্থ জ্ঞানই অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এতদনুরূপ অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইলে, তাহাদের স্ব স্ব অনুসন্ধান-ফল ভারতীয় অর্থনীতি বিজ্ঞান রচনার সহায়তা করিবে—ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আমরা বহুপূর্ব্বে 'গৃহস্থে' বঙ্গদেশের বাছাদির কয়েকটি জেলার ঐরূপ পারিবারিক আয় হিসাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কলেজের বিভিন্ন জেলাবাসী ছাত্রদিগের দ্বারা ঐ সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দীর্ঘ বন্ধে ছাত্রেরা বাড়ী যাইয়া আলস্য ও বৃথা আমোদ প্রমোদে দিন না কাটাইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের উপদেশানুসারে অনুসন্ধানে ব্রতী থাকিত—ইহাতে তাহাদের গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সামাজিকতা বৃদ্ধিপাইবার বেশ সুযোগ হইত। জানি না, অধ্যাপক মহাশয় এখনও ঐ প্রণালী চালাইতেছেন কি না। আমাদের দেশের প্রত্যেক ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপক যদি কেবল মাত্র পুঁথি না পড়াইয়া এবং ছাত্রদিগকে পরীক্ষায় সহজে পাশ করাইবার উদ্দেশ্যে নোট লিখাইয়া না দিয়া এইরূপ অনুসন্ধান কার্য্যে তাহাদিগকে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের শিক্ষাকার্য্য যথার্থ সফলতালাভে সমর্থ হয়। ছাত্রেরা তাহা হইলে আর অতীত পুঁথির বুক্নি আওড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তাহাদের চোখ কাণ ফুটিতে পারে এবং দেশের আর্থিক অবস্থা ও তাহার উন্নতি-অবনতি কল্পে তাহাদের মতবাদ একেবারে উড়াইয়া দিবার জো থাকে না।

* *
*

৯। জনসাধারণের যুগ

আমাদের সম্মুখের যুগ জনসাধারণের আদর ও উন্নতির যুগ। যুগযুগান্তের উপেক্ষা, অবজ্ঞা ও ধিক্কার যাহাদের মনুষ্যত্ব এতদিন পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবার ভগবানের সেই ব্যথিত, লাঞ্ছিত, ঘৃণিত সন্তানগণ জাগিয়া উঠিবে। তাহাদের হৃষিকেশ এবার সাড়া দিবেন। সবাই যাহাদের অবনত করিয়া রাখিয়াছে, শৃঙ্খলের উপর শৃঙ্খল পরাইয়া যাহাদিগকে চিরদিনের মত পঙ্গু করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, এবার করুণাময়ের পাঞ্চজন্যের অমোঘ নির্ঘোষে তাহারা আপনাদের দাবী বুঝিয়া লইবে। ইহারা পুরাতন সমাজে নবীনতার বান আনিবে। ইহাদের সরসতা রুক্ষ, নীরস প্রাণ বিচিত্র আনন্দে বলবান্ করিয়া তুলিবে, নির্জ্জীব, নিষ্পন্দ জীবনে ওজস্বিতা জাগাইবে। যাহারা এই দুর্দ্দমনীয় গঙ্গাস্রোতের সম্মুখে বাধা দিবে, মদমত্ত ঐরাবতের মত তাহাদিগকে লাঞ্ছিত, বিপর্য্যস্ত হইতে হইবে।

পৃথিবীর অন্যত্র ইহারা আপনাদের অন্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, ললাটের কলঙ্করেখা মুছিয়া মনুষ্যত্বের রাজটীকা পরিয়াছে। আমাদের দেশেই শুধু এই প্রকাণ্ড সঞ্চিত শক্তি উপেক্ষিত; ইহার ফলে ধর্ম্ম ও সভ্যতার আদি লীলাভূমি ভারতবর্ষ পক্ষাঘাতে অবসন্ন। আমাদের সর্ব্বশরীরে চেতনার আনন্দস্পন্দন সঞ্চারিত হইতে পায় না; একটা অঙ্গ একেবারে অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে।

সত্য সত্যই কোটী, কোটী লোক একেবারে অপদার্থ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রাণে উন্নতির আশা জাগিতেই পায় না। তাহারা নির্ব্বিবাদে, নিশ্চেষ্টভাবে আপনাদের দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া লইয়াছে। যথার্থই তাহাদের প্রাণ মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু এবার জগন্নাথের রথ চলিবে। যাহারা পথ জুড়িয়া দাঁড়াইবে তাহাদিগকে রথচক্রের নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। সুতরাং মানুষের পশুত্বমোচন ও মনুষ্যত্বের জাগরণ এখন সানন্দে ও সাগ্রহে অভিনন্দন করিয়া না লইলে চলিবে না।

* *
*

১০। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বাণী

রামমোহন লাইব্রেরীর গৃহে দেশের শিক্ষিত জনমণ্ডলীর সম্মুখে ডুপেস্রবাবু ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বিজ্ঞানজগতে দিগ্বিজয়ী আমাদের জগদীশচন্দ্র বসুকে যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদাপূর্ণ ভাষায় অভ্যর্থনা করেন, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি আমাদের দেশের লোককে কতকগুলি মূল্যবান্ ও কাজের কথা বলিয়াছেন। তিনি এবার জড়বিজ্ঞানের জ্ঞানগর্ব্বিত ইউরোপ, আমেরিকা, ও জাপানের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণকে নববিজ্ঞানের নূতন বাণী দিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন। এ ব্যাপারটা আজ ভারতবাসী মাত্রকেই এক অভিনব গৌরবদান করিয়াছে। তাঁহার সাফল্য আজ ভারতের যুবক হৃদয়ে কতই না আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ফাঁকা আবেগ ও উত্তেজনায় কাজ হইবে না। আমাদের ইচ্ছা জগদীশচন্দ্রের দিগ্বিজয়ের সাফল্যে যে আজ আমাদের জাতীয় প্রতিভায় বিশ্বাস আনিয়াছে, আমাদের দেশের ধনীর ধনিগণ সেই বিশ্বাসের পূর্ণ সার্থকতায় সচেষ্ট হউন। বহু বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি যে কতকগুলি প্রাণী-বিজ্ঞানবিষয়ক নূতন মত আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই মতগুলির নিগূঢ় অনুসন্ধান ও তাহার সাহায্যে অন্যান্য মতের উদ্ভাবন করে অন্ততঃ ১২।১৪টী ছাত্রকে বৃত্তি প্রদান করা হউক। তবেই অন্ততঃ সেই কয়টী ছাত্র তাঁহার বিজ্ঞানাগারে থাকিয়া ঐগুলি উত্তমরূপে শিখিতে ও ভবিষ্যতে উহারাও নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কারে সমর্থ হইবে, আর ইহাতে বসু মহাশয়েরও কার্য্যের অনেকটা সুবিধা ও সাহায্য হইবে। অপরপক্ষে দেশের বিজ্ঞানশিক্ষাভিলাষী ছাত্রগণেরও গবেষণা-বৃত্তি-বিকাশের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। সেদিন লাইব্রেরীগৃহে অধ্যাপক বসু মহাশয় বলেন, সরকারের পক্ষ হইতে এই যে চতুর্থবার তিনি পাশ্চাত্যদেশে আপনার আবিষ্কৃত তত্ত্বের কথা বলিতে গিয়াছিলেন তাহাতে যে এতটা সাফল্য অর্জ্জন করিবেন তাহা তিনি আশা করেন নাই। ভিয়েনা, পারিস, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লণ্ডন, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, সিকাগো, কলম্বিয়া এবং টোকিও প্রভৃতি স্থানের শিক্ষিত পণ্ডিতগণ তাঁহার যথেষ্ট গুণগ্রহণ করিয়াছেন। যদিও তাঁহার নূতন তত্ত্বের কোন কোন বিশিষ্টাংশ দুই একটী প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সত্যতাপ্রমাণে কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাধা দেয়, তথাপি সেই অংশের মতগুলি সকল স্থানেই অনুমোদিত হইয়াছিল। ইহার একমাত্র কারণ তিনি তাঁহার যে সমস্ত নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা তত্ত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলেন সেগুলি সমস্তই সূক্ষ্মতম ও সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এবং তিনি যেরূপ কৌশলে যন্ত্রের দ্বারা কাজ করিয়াছিলেন ও পরীক্ষাগুলি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে উহা সকলেরই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিল। এমন কি ভিয়েনার শ্রেষ্ঠ সুধী সমালোচকগণও তাঁহার উদ্ভাবিত তত্ত্বসমূহের মৌলিকত্ব ও বিশেষত্ব স্বীকার করিতে ও সেইগুলির উপর সৌরবসূচক অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পদার্থ ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বলিত এই নূতন আবিষ্কারগুলির কথা শুনিয়া তাঁহারা বলেন বাস্তবিকই এই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপকে আজ ভারতবর্ষের দ্বারে দাঁড়াইতে হইবে। তাঁহারা ইহাও স্বীকার করেন যে, যেদিন পাশ্চাত্য চিন্তার বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রাচ্যের সংশ্লেষণতত্ত্বের সহিত পরিচিত হইবে, সেই-

দিন হইতে বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি আরম্ভ হইবে। অন্যান্য যে সকল শিক্ষাসমিতিতে তিনি বক্তৃতা দেন সকলেই ঐকণ্ঠভাবে তাঁহার প্রতিভার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকার সুবিখ্যাত বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রগণের অনেকেই প্রাণী ও পদার্থ বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় নূতন তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী শিক্ষালাভকল্পে আচার্য্য বসু মহাশয়ের বিজ্ঞানাগারে কাজ করিবার একান্ত ইচ্ছা জানাইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা-পত্র পাঠান।

এখন আমাদের কথা এই যে, বিদেশী ছাত্রগণ ত এখন ভারতের বিজ্ঞানমন্দিরের পূজারী জগদীশচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে; এখন যদি আমাদের দেশের ধনিগণ কয়েকটী ভারতীয় মেধাবী ছাত্রকে ঐ জাতীয় গর্ব্বাত্মক পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে সুবিধা না দেন, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সম্মুখে আজ আমাদের লজ্জায় হেঁটমুখ হইতে হইবে। আর "আমাদের জগদীশচন্দ্র" এ কথা বলিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না।

আচার্য্য জগদীশ বলেন যে, যে সমস্ত অজ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান তিনিই প্রথম এদেশে এখন আরম্ভ করিয়াছেন, ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী সেইগুলিরই মৌলিকত্ব অর্জ্জনের অনুকূল ও উপযুক্ত। গর্ব্বিত পাশ্চাত্য জগৎ আজ স্বীকার করিয়াছে ভারতের সাহায্য ছাড়িয়া দিলে মানবের জ্ঞানভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা আমাদের বড় একটা আশার কথা, আর আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদিগের নিকট উৎসাহেরও কারণ বটে। তিনি বলেন বৈচিত্র্যময় জগতের বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলীর মধ্য হইতে মূল সত্যটুকু টানিয়া বাহির করিবার উপযোগী তীক্ষ্ণ কল্পনাশক্তি এই দেশের লোকেরই ছিল আর প্রাচীন মুনিদিগের একাগ্রচিত্তে বহুকালব্যাপী ধ্যানের কথা এই দেশেই শুনিতে পাওয়া যায়। তক্ষশীলা, নালন্দ ও কঞ্জিবেরামের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখিয়া আসিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভারত শীঘ্রই তাহার প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। তাঁহার মতে অচিরে আমাদের দেশে যে জ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রত্যেক শিক্ষকই এই নবযুগের নূতন সন্ন্যাসী হইবেন। তাঁহারা সাংসারিক দুশ্চিন্তা ও গোলযোগের হাত এড়াইয়া যাবজ্জীবন এই মন্দিরে অবস্থান করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিবেন আর আসন্ন মৃত্যুর দিনে তাঁহার সমস্ত অসম্পূর্ণ কার্য্যের ভার শিষ্যদিগের সবল হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। তাঁহার বিশ্বাস জগতে শ্রমসাধনার বহির্ভূত কিছুই নাই। তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে তিনি কখনও শ্রমকাতর হইয়া পড়েন নাই এবং পার্থিব জাঁক জমক বা লাভ কখনও তাঁহাকে জীবনের ব্রত ভুলাইতে পারে নাই। তিনি যখনই নূতন তত্ত্বের কণামাত্র আভাস পান তখন তাহার স্থির সিদ্ধান্ত না করিয়া ছাড়েন না। জগদীশচন্দ্র এযুগে আমাদের দেশের এক মহাতাপস; তাই তিনি আজ শিক্ষিত জনমণ্ডলীর নিকট এতটা প্রাণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটা বিবাদ চলিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের পুণ্য ভূমিতে লোকে জ্ঞানকে চিরকালই ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞান আজ যে তাহার কপট মূর্ত্তি লইয়া বিশ্বের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে,

এখানে উদ্ভিবিজ্ঞানের মূর্ত্তি কোন দিন মানবভাবে প্রকটিত হইতেই পারিবে না। ইউরোপ আজ জাহাজ উড়াইয়া আকাশে নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে; এটা যদি এখানে হইত, আমাদের মনে হয় মানব হৃদয়ের এই নূতন জ্ঞানের বিকাশকে এক সৌম্য দেবমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভারতের মন্দিরে মন্দিরে তাহার পূজার ব্যবস্থা করা হইত। যে কোন জাতিই এরূপ ভাবের পূজার গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। আমাদের আশা ভারতের শিক্ষিত পুত্রকন্যাগণ তাঁহাদের বাস্তব সাধনা ও ক্রিয়া কলাপের দ্বারা বিশ্ব-সমাজে এই কার্য্যের গুরুত্ব বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। আচার্য্য বসু পৃথিবী ভ্রমণের ভাল দিনগুলি তাঁহার জাপানে কাটাইয়াছিলেন। তিনি এখানে জনসাধারণের সহিত পরিচয়ের যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। এখানে দেশের লোকের মধ্যে স্বজাতির ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও দুর্দ্দমনীয় চেষ্টা তিনি দেখিয়াছেন। জনসাধারণের কৃতিত্ব দেখিয়া কেহ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। এই কলকারখানার যুগে জড় পদার্থের জ্ঞান ও কার্য্যকরী শক্তিই সভ্যতা ও উন্নতির পরিমাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রিয়া কর্ম্মের শিক্ষায় যে জাপান তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষকত্বের দাবী করেন, সেই জাপানকে আজ ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপানের বাণিজ্যপোত বা কারখানাকুঠী ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যভাবে এই অল্প সময়ের মধ্যেই জাপানী ষ্টীমার লাইন সমৃদ্ধিশালী হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকাংশস্থলে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া লইয়াছে। আজ জাপানী ষ্টীমারের বাহুল্যে অত বড় মার্কিন লাইনগুলিকে শীঘ্রই ঐখানকার পোত বাহন বন্ধ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট ও অন্যান্য দেশীয় লোকের সাহায্যে জাপানীরা বিদেশের বাজারেও আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালাইতে পারিয়াছে। জাপানী জাতীয় চরিত্রের একটী প্রশংসনীয় গুণ—তাহাদের বহুদর্শিতা। জাতির উন্নতিকল্পে যে সমস্ত জাতির সহিত তাহারা শান্তিতে বাস করিতে চায় বড় কৌশল ও বিবেচনা সহকারে তাহাদের সহিত হাবাম হুজ্জৎ হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদাই দূরে রাখিবার চেষ্টা করে, ও কার্য্যতঃ রাখিতে পারে। তাহারা জানে অন্য কোন জাতি তাহাদের দেশের এই সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা পাইলে ঐ জাতির সহিত নিশ্চয়ই তাহাদের বিপদ বাধিবার সম্ভাবনা। যাহাতে বিদেশজাত দ্রব্যসম্ভার জাপানে আসিতে না পারে, সেইজন্য অনেক ভাবিয়া ও বুঝিয়া ঐ সকলের উপর উহারা ভারী শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। জাপানীদিগের এই সমস্ত কাজ কর্ম্ম হইতে আমাদের অনেক শিখিবার রহিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের অবসরে ও সুবিধায় জাপান কেমন ভারত জুড়িয়া আপন বাজার খুলিয়া বসিল, ইহা আমাদের ব্যবসা ও শিল্পোন্নতির পথে একটা কি ভয়ানক অন্তরায় তাহা অনেকেই বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। আচার্য্য বসু মহাশয় যে শুধু একথা আমাদের জানাইয়াছেন তাহা নহে। ডাক্তার নীলরতন সরকারও এ বিষয়ে আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন:—"ইউরোপের কোন জাতিই ভারতবর্ষের উপর আপনাদের রাজনৈতিক বা অন্য কোন প্রকার অধিকার পাইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখে না, তবে

প্রাচ্যের উন্নত ও শক্তিশালী জাতিগণের পক্ষে একথা কোন ক্রমেই খাটে না।"

বসু মহাশয় বলিয়াছেন জাপানীরা জানে যে অন্য বিদেশীয় জাতি তাহাদের দেশের ব্যবসায় সুবিধা পাইলে ঐ জাতির সহিত ভবিষ্যতে তাহার বিবাদ নিশ্চিত। তবেই ত আমরাও উহাদের মত হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে জাপানীরা এদেশে এমন যুদ্ধের অবসরে ব্যবসাবাণিজ্যের যে প্রচুর সুবিধা ভোগ করিতেছে, ভারতগবর্ণমেণ্ট ও এদেশের লোকে একমত হইয়া জাপানীদিগকে ঐ সুবিধা হইতে এখনই বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা ভবিষ্যতে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহিত জাপানের অসদ্ভাব ঘটিতে পারে। জাপানের এই শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক বিপদ যে দিন দিন নিকটতর হইয়া আসিতেছে, ইহার আভাষ "প্রবাসী" ইতি-মধ্যেই দিয়াছেন। যাহা হউক জাপান যে ভারতে তাহার বাণিজ্যবিস্তার করিয়া বসিল ইহাতে এখানকার শিল্পবাণিজ্যের দুর্গতি দিন দিনই বাড়িতে থাকিবে। কে এখন জাপানকে ইহা হইতে বিরত রাখিবে ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। আচার্য্য বসু মহাশয় বলেন—জাপান যে আজ ভারতের বাজার অধিকার করিয়া বসিল ইহাতে আমাদের যে ভীষণ দুর্দ্দশা ঘটিবে ইহা কি এখন চিন্তার বিষয় নয়? এইরূপভাবে চলিলে আমাদের ব্যবসা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। চীন-দেশে সেদিন যাহা ঘটিয়া গেল তাহা দেখিয়াও কি এদেশবাসীরা বুঝিবেন না? এই শেষ অবসর আর ছাড়িলে চলিবে না—ভারত-গবর্ণমেণ্টকেও বিশেষতঃ দেশের লোক সমূহকে এখন আমাদের শিল্প বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য আবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা অনেক চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়াছি একথা খুব সত্য। কিন্তু দেশের অভাব ও দারিদ্র্য মোচন করিতে হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি না করিলে চলিবে না। গবর্ণমেণ্টও দেশের লোকদিগের এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা ছিল বটে কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিধি বন্দোবস্ত ছিল না। ঐ চেষ্টা মধ্যে মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিত এবং তাহার পরেই আবার উহাতে ভাটা পড়িত। ইহার কাজকর্ম্ম যাহাতে সুশৃঙ্খলরূপে চলে সেই জন্য সরকারের কয়েকটী ভারতীয় সভ্য লইয়া একটী পরামর্শ সভা গঠন করা এবং শিল্প ও ব্যবসাদির কার্য্যে শিক্ষাভিলাষী ছাত্র নির্ব্বাচনের জন্য কয়েকটী নিয়মকানুন রচনা করাও একটা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ সমস্ত শিক্ষালাভ কল্পে বিদেশ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ঐ ছাত্র-গণের দেশীয় কলকারখানা সমূহের অবস্থা ও তাহাদের কাজে সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। যে কোন একটী শিল্পের বিষয় শিখিতে হইলে তিনজন ছাত্র লইয়া একটী মণ্ডলীগঠন করিতে হয়। তাহা হইলে তাহাদের দুইজন ঐ শিল্পটী সুশৃঙ্খলরূপে শিখিতে ও তৃতীয় ব্যক্তি তাহার ব্যবসাবাণিজ্যের কৌশলাদি বুঝিয়া লইতে পারে। বৈদেশিক জ্ঞান অনেক সময় ভার-তীয় অবস্থার অনুকূল না হওয়ায় অনেক অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু শিল্প ব্যবসাদির বিষয়ে শিক্ষিত ও এই সমস্ত বিষয়ের মৌলিক চিন্তায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ঐ অসুবিধাগুলির হাত হইতে অনেক সময় অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। গবর্ণ-মেণ্টও এবিষয়ে অনেক উপায়ে আমাদের

সাহায্য করিতে পারেন—(১) যে সমস্ত জিনিষ শিল্পকর্ম্মে প্রয়োজনীয় সেই গুলির সরবরাহে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। (২) অভিজ্ঞলোকের পরামর্শদানে উৎসাহিত করিতে পারেন। (৩) পরীক্ষার নিমিত্ত ছোট ছোট শিল্পানুষ্ঠান আপন খরচে আরম্ভ করাইয়া দিতে পারেন। এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ও দেশের লোকের স্বার্থ সমান। উভয়ের বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্য পরস্পরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা জাগাইয়া দেয়। আর বোধ হয় অদূর ভবিষ্যতে জীবন বিপদ-পাতের যে ভীতিপ্রদ চিত্র বিশ্বের ঘরে ঘরে দেখা দিয়াছে ইহা ভারতের খুব একটা মঙ্গলের সূত্রপাত করিয়া দিবে। হয় ত সমগ্র বিশ্বের এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের মধ্যে স্বার্থের ঐক্যবোধ বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিতে পারে।

উপসংহার

আচার্য্য বসু মহাশয় সর্ব্বশেষে নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা বলিয়া আপন বক্তৃতা শেষ করেন। তিনি এখানকার দেশভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আমাদের এখন প্রাচীন, মহৎভাব ও আদর্শগুলিকে যথালব্ধ বাঁচাইয়া এই বর্ত্তমান বিজ্ঞানপ্লাবিত যুগের জ্ঞানমত্ত, উন্নতিপ্রয়াসী জাতিগণের মধ্যে আপনাদের স্থান খুঁজিয়া লওয়া উচিত। ভারতের যে ভীষণ দুর্গতির দিন সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে তাহার গতি ফিরাইতে হইলে কি একান্ত চেষ্টা ও প্রচণ্ড পরিশ্রমের প্রয়োজন! দারিদ্র্য বা অর্থাভাব যে এখন আমাদের একমাত্র দুর্গতি তাহা নহে। এই যে বৈদেশিকভাব-সমূহ প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার মহৎ চিন্তা ও সনাতন ভাবগুলিকে গ্রাস করিতে ছুটিয়াছে তাহা হইতে উহাদের রক্ষা করিতে হইবে। একনিষ্ঠ সাধনা ও ত্যাগের বলে বলীয়ান না হইলে কেহই মহৎভাবের সাধক হইতে পারে না। আমাদের এই অভাব মোচনার্থে ভারত-সন্তানগণকে কি প্রচণ্ড তপস্যাই না সাধন করিতে হইবে! একদিকে ইউরোপ কল-কারখানা ও কুলী মজুরের হটোপাটীকেই তাহাদের জীবনের একমাত্র ও চরম উন্নতি বলিয়াই জানিয়াছে অপরদিকে ভারত তেমনি একটা স্বপ্নময়, অসাড়, নিস্পন্দ জীবন মোলা-য়েমভাবে কাটাইয়া আসিতেছে; আর প্রত্যেক কর্ম্মে পরনির্ভরশীলতা আমাদের দিন দিন কতই না অবনত করিয়া দিতেছে। ভারতবর্ষে এখন দুইটী বিপরীত আকৃষ্টভাবের খেলা চলিতেছে। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে উচ্চতম আদর্শ দেশের লোকের সম্মুখে ধরিতে হইলে দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে জনসাধারণ, মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত জনমণ্ডলীর কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে দেশাত্মবোধ বেশ স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং দেশের নামে জনসাধারণের হৃদয়ে একটা মহৎ ভাবের প্রেরণা দিতে হইবে তবে সেই ডাকে জাতি তাহার নিস্পন্দতা ছাড়িয়া অবশ্য সাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে।" মাননীয় পরলোকগত স্বদেশসেবক গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লের সহিত জগদীশচন্দ্রের খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের রাজনীতিবিৎ গোপালকৃষ্ণ গোখলে, যাঁহার শোকে দেশ আজ অবসন্ন, ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্রের সহিত কিছুদিন একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। গোখলে মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন এই তাঁহাদের শেষ দেখা। বন্ধুর নিকট বিদায়গ্রহণ কালে গোপালকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন "বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ

জগতের কথা কিছু বলিতে বা দেখাইতে পারে কিনা? তাহা বলিতে পারুক্ আর নাই পারুক্ আমি ইহা নিশ্চিত জানি যে আমার এই পুরাতন দেহের অবসান হইলে আমি আবার আমার প্রাণের টান, হৃদয়ের ভালবাসা ও প্রেমের পুলক নিকেতন এই ভারতেই জন্মাইব আর আবার আমার এই দীন দেশের সেবার ভার প্রফুল্লচিত্তে স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া লইব।" যে দেশ গোপালকৃষ্ণ গোখলের ন্যায় সন্তানকে ক্রোড়ে ধরিয়াছে তাহার সুদিন যে আসিবেই এ কথায় কে আর অবিশ্বাস করিবে?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এই প্রাণস্পর্শী বাণী এখন আমাদের ধ্যানে, চিন্তায় ও কর্ত্তব্য সাধনে আশার নূতন পাথেয় যোগাইবে, আমাদের কর্ত্তব্যের স্বরূপ বুঝাইয়া দিবে। ভারতবর্ষের এই বরেণ্য সন্তান যে মহাসত্যের মূর্ত্তি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, যুগকণ্ঠে কর্ত্তব্যের যে পবিত্রমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা যেন আমাদের মর্ম্মে প্রবেশ করে।

মার্কিণ রাষ্ট্রের ফেডার‍্যাল কেন্দ্র

(১০৫৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর ।)

ফেডার‍্যাল্ দরবারের রাষ্ট্র-কেন্দ্র

৪। নিগ্রোপরিবারে কাফি-পান

নৈশভোজনের পর নিগ্রোগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল। পরিবারে তিন ভগ্নী এবং এক ভ্রাতা। সকলেই শিক্ষিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—প্রত্যেকেই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

যুবকের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখি তিনি একখানা আর্ষাণ বই পড়িতেছেন। ইনি ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে আর্ষাণের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। ভারতবর্ষের অনেক কথাই ইহাঁর জানা আছে। পূর্ব্বে এতটা আশা করি নাই। মনুসুন বাতাস হইতে আরম্ভ করিয়া হকি ক্রিকেট 'চেস্', কিপ্লিঙের Rim ও Jungle Book পর্য্যন্ত নানা কথার আলোচনা হইল। উচ্চশিক্ষিত ইংরাজ অথবা ইয়াঙ্কি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারেন এই নিগ্রো যুবক তাহা অপেক্ষা বেশী জানেন বোধ হইল। ইহাঁর সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও কোন ভারতবাসীর দেখা হয় নাই। মাসিক পত্র এবং পুস্তক পাঠ করিয়া ইনি ভারতবর্ষের সংবাদ রাখিয়া থাকেন।

ভ্রাতার পাঠাগারে জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া কথোপকথনে যোগ দিলেন ইনি কলাবিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—সম্প্রতি এক Manual training school এর শিক্ষয়িত্রী। ইনি প্রথমেই বলিলেন "মহাশয়, আমি ঘোরতর ইয়াঙ্কি। গত গ্রীষ্মের সময়ে আমি ইয়োরোপে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্যারি, লণ্ডন, এডিনবারা ইত্যাদি নানা নগর দেখিলাম—কিন্তু ওয়াশিংটনকে ভুলিতে পারি নাই। আমিরিকার মায়া ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব।" ইনি ধর্ম্মচর্চ্চা কিছু বেশী করেন—ইহাঁর গলায় যীশুখৃষ্টের ক্রস ঝুলিতেছিল।

পাঠাগারের আসবাব পত্র ছবি ফটো ইত্যাদি সবই উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গদের অনুরূপ। ইহাঁদের ধরণধারণ, কথা বলিবার ভঙ্গী, গলার আওয়াজ কোন বিষয়েই নূতনত্ব লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় ভগ্নী আসিয়া বলিলেন—"বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" সকলে মিলিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। বন্ধুর সঙ্গে করমর্দ্দন হইল। বুঝা গেল এই অভ্যাগত রমণী নিগ্রো—কিন্তু গায়ের রং অথবা চুলের গঠন কিম্বা মুখের আকৃতি দেখিয়া বিন্দুমাত্র এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। নিগ্রোগৃহে ইহাঁর সঙ্গে দেখা না হইলে ইহাঁকে শ্বেতাঙ্গ ইয়াঙ্কি রমণী জানিতাম।

এই শ্বেতাঙ্গস্ত্রীর নিগ্রোরমণী বলিলেন—"মহাশয়, আমি আপনাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাবলী পাঠ করিয়া থাকি। ভারতবর্ষের আর কোন কথা জানি না।" ইতিমধ্যে আর একজন গ্র্যাজুয়েট রমণী উপস্থিত হইলেন। ইনি বলিলেন—"আমি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে চিনিতাম। তাঁহাদের নিকট ভারতবর্ষের কথা শুনিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা ভারতবর্ষের বিষয় জানিতে চাহেন কেন?" ইহারা বলিলেন—"আজকালকার দিনে দুনিয়ার সংবাদ না রাখিলে শিক্ষিত হওয়া যায় কি? পৃথিবীর আয়তন যেন ছোট হইয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষ ত ঘরের কোণে! কাজেই প্রতিবেশীর কথা জানিয়া রাখা নিতান্তই স্বাভাবিক।"

ক্রমশঃ দুই জন পুরুষ আসিলেন। একজন ইতিহাস-শিক্ষক। আর একজন বিদ্যালয় পরিদর্শক। ইনি যুক্তরাষ্ট্রের গবর্মেণ্ট-কর্তৃক তাঁহাদের শাসিত ফিলিপাইন দ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। পরিদর্শক মহাশয় তিন বৎসর ম্যানিলায় ছিলেন। তাহার পর ভারতবর্ষ দেখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষে দুইমাস কাটাইয়াছিলেন। মণ্ডালে, রেঙ্গুন, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কলম্বো ইত্যাদি নগরের কোন কোন কথা ইহার মনে আছে। ইনি খ্রীষ্টান পাদ্রীদের কথা এবং ইউরোপীয়ানদের কথা পাড়িলেন। কালীঘাটের পাঁঠাবলি সম্বন্ধে বলিলেন "প্রাচীন ইহুদিরাও এইরূপ করিত।"

বৈঠকখানা হইতে ভোজনালয়ে যাওয়া গেল। যথারীতি কফি পান করা হইল। নানাপ্রকার গল্প চলিতে লাগিল। সর্ব্বসমেত তিন ঘণ্টা কাটাইলাম—কিন্তু একটা নূতন ভারতীয় নরনারীর সঙ্গে কথা চলিতেছে বুঝা গেল না। সর্ব্বসমেত ৮।১০ জন লোক উপস্থিত—কাহারও নিকট এই দীর্ঘকালের ভিতর এমন কিছু পাইলাম না যাহাতে মনে হইতে পারে যে কোন নিকৃষ্ট সমাজের মধ্যে বসিয়া আছি। বর্ত্তমান কালে জগতের সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক পরিমাণে এক ধরণের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহার প্রভাবেই ইয়াঙ্কি স্থানের শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গে এবং শিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। সর্ব্বত্র চিন্তাপ্রণালীর একটা সমতা সৃষ্ট হইয়াছে।

যে কয়জন নিগ্রোজাতীয় লোকের সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাদের কেহই পুরাপুরি কৃষ্ণাঙ্গ নহেন। এমন কি ইঁহাদের কাহাকেও খাঁটি নিগ্রো বলা চলে না। ইঁহাদের গায়ের রং সাধারণ ভারতবাসীর অনুরূপ। পুরুষগণের চুল অধিকাংশ স্থলেই ক্ষুদ্র মেষের লোমের মত কুঞ্চিত। ইয়াঙ্কিস্থান নিগ্রো-সংখ্যা এক কোটি—তাহার মধ্যে খাঁটি কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো মাত্র পঁচিশ লক্ষ। অবশিষ্ট নিগ্রোরা এই নিগ্রো পরিবারের ন্যায় গৌর-শ্যামল।

৫। বহুত্ব, অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধি

বাঙ্গালী আজকাল কোন একজন লোককে গুরু মানিয়া চলে না। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য নাই। সাহিত্যের আসরেও কোন ব্যক্তিবিশেষের মত বিনাবাক্যব্যয়ে স্বীকৃত হয় না। সর্ব্বত্র সকল বিভাগেই বহুনায়কতার যুগ চলিতেছে। অনেক ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি বীরপদবাচ্য, অনেক ব্যক্তি পূজ্য। অনেক ব্যক্তি পথপ্রদর্শক, অনেক ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য বিবেচিত হইতেছেন। সাহিত্যে, শিল্পে, শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে, সংবাদ পত্রের পরিচালনায়, কর্ম্ম-কেন্দ্র গঠনের প্রয়াসে নানা

কর্ম্মী ও চিন্তাশীল নরনারীর কৃতিত্ব দেখিতে পাই—ন্যূনাধিক পরিমাণে এক সঙ্গে বহু লোক যশস্বী হইতেছেন এবং জনগণের সম্মান পাইতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন স্থান-বিশেষের মাহাত্ম্যও আজকাল স্বীকৃত হয় না। কোন নগর বা জেলাকে বাঙ্গালীরা একমাত্র চিন্তাকেন্দ্র অথবা একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্র অথবা গুরুস্থানীয় বিবেচনা করে না। কলিকাতার প্রভুত্ব বাঙ্গালী সমাজ হইতে একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে মফঃস্বলের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বিভিন্ন জীবনকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন একটা কর্ম্মের আন্দোলন রাজধানীতে উদ্ভূত হইলেই যে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র তাহা অনুসৃত হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং জেলায় জেলায় যে সব আন্দোলনের সৃষ্টি হয় তাহাই ক্রমশঃ রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছে। মফঃস্বলের বাণী কলিকাতার বাণী অপেক্ষা নিম্ন স্থান প্রদত্ত হয় না। সেইরূপ একমাত্র তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণই আজকাল জনসাধারণের প্রষ্টার্হ নহেন। অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ নরনারীর কর্ম্মশক্তি ও চরিত্রবল উচ্চশিক্ষিত মহলে আদৃত হইতেছে। বঙ্গীয় নেতৃগণের মধ্যে তথাকথিত অশিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সংখ্যাও কম নহে। জাতীয় চিন্তাসম্পদ ও কর্ম্মশক্তি দেশের নানা স্থানে নানা কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বহুবিধ পরিষৎ, সম্মিলন, সমিতি, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা এই শক্তি-বিকীরণের অন্যতম লক্ষণ। এই জন্যই হার্ভার্ডে থাকিতে থাকিতে মনে হইতেছিল যে বাঙ্গালীর জীবন দার্শনিক জেম্‌সের "বহুত্ব"বাদ প্রচারিত করিতেছে। সুতরাং ইহার Pluralistic Universe এবং Varieties of Religious Experience নামক গ্রন্থদ্বয় বঙ্গসাহিত্যে প্রবর্ত্তিত হইবার যোগ্য।

যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ংই বহুত্ব, অনৈক্য ও ভেদবুদ্ধির দেশ এখানে কোন এক কেন্দ্রের আধিপত্য দেখিতে পাই না। যুক্তরাষ্ট্রের (United States) নামে (unity অর্থাৎ) ঐক্যের গন্ধ যথেষ্টই আছে। কিন্তু এখানে ঐক্য বেশী প্রবল, কি অনৈক্য বেশী প্রবল বিচার করা কঠিন। নামের মধ্যেই 'states' শব্দে বহুবচনের ব্যবহার লক্ষ্য করিলেই 'pluralism' প্রতীয়মান হইবে। বস্তুতঃ, যুক্তরাষ্ট্রকে pluralism, variety, বহুত্ব, বৈচিত্র্য, decentralisation বহুকে স্বীকরণ, regional independence, জনপদগত স্বতন্ত্রতা ইত্যাদির প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করিতেই প্রবৃত্তি হয়। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক নগর নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা সেরা বিবেচনা করে—সকলেই 'আপসে আপ্' চলিতেছে—কেহই কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। নিউইয়র্ক নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর মনে করে। শিকাগো এবং সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো নগরের লোকেরা নিউইয়র্ককে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে। বষ্টনের আস্পর্দ্ধা বষ্টনের বাহিরে নিন্দিত হইয়া থাকে। সকলেই বলে—"আমাকে দেখ।" এই জন্যই যুক্তরাষ্ট্রকে লোকে "A country without capital" বলিয়া জানে। এখানে এমন কোন নগর নাই যাহাকে দেশের হৃৎপিণ্ড, অথবা জাতির মস্তিষ্কস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। বিলাতে যেরূপ লণ্ডন, ফ্রান্সে যেরূপ প্যারি, রুশিয়ার যেরূপ পেট্রোগ্রাড, জার্ম্মাণিতে যেরূপ বার্লিন, যুক্তরাষ্ট্রে সেইরূপ কোন নগর নাই। কোন এক নগরে যা লাগাইলে যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র

আন্দোলন পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। বষ্টন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ইত্যাদি সবই স্বয়ং-প্রধান।

যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে Marice Law বলিতেছেন :—"We are to study the history of a people who from their begining and up to the present day have never had a capital, in which there has never been one great centre to which gravitated by the natural force of attraction all that was best and worst, which held the highest intellectual and social development, which set for the whole country the fashions, to which men turned as irresistibly in search of fame or fortune as in the time of Cœsar every Roman looked to Rome, or as in our own day, every provincial, who has only his courage and brains to inspire him, goes up to London to begin his conquest of the world, or the Frenchman of the departments set out for Paris hopeful of grasping the end of the rainbow. It is true that there is today in the United States a political capital, a commercial metropolis, and numerous local political and commercial centres and it is equally true that from the beginning, in colonial times and until the Revolution, each colony had its seat of government—in Massachusetts, Boston; in Maryland, Annapolis; in the Ccarolines, Charleston, and so on—just as today each state has its capital; but that is entirely different from Rome or London or Paris."

এই অনেককেন্দ্রীকরণের দৃষ্টান্ত ত্রিশ কোটি নরনারীর ভারতে বিশেষরূপেই ধ্যান করা উচিত। পরস্পর পরস্পরকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শনের স্বভাব গভীর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রাদেশিকতা, জনপদগত স্বতন্ত্রতা, ব্যক্তিত্ব, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি নিতান্ত অবহেলার বস্তু নয়। পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর না করাই পরস্পর পরস্পরকে যথার্থ সম্মান করিবার উপায়। হিন্দুসমাজের বহু দেবদেবীতত্ত্ব, সম্প্রদায়-ভেদ, রীতি নীতির বৈচিত্র্য, ব্যক্তিগত সাধন-প্রণালীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, 'বার মাসে তের পার্ব্বণ', তীর্থক্ষেত্রের বহুত্ব কেন সৃষ্ট হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। এইরূপ বৈচিত্র্য, বহুত্ব, অনৈক্য ও জটিলতার সমাজেও কি উপায়ে বৈদান্তিক ঐক্য, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদির জয় জয়কার চলিতেছে তাহা দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের রীতিতে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। এক-দিকে নানা মুনির নানা মত, এবং নিত্য নূতন দেবতার পূজা, অপরদিকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সখ্য সহানুভূতি ও পরস্পর সম্মান —এই দুইয়ের সামঞ্জস্য যে জাতি করিতে পারিয়াছে তাহারা রাষ্ট্রীয় Decentralistion, *Zaisser faire* Toleration ইত্যাদি যুক্ত-রাষ্ট্রের মূলকথা সহজেই হজম করিতে

পারিবে। একটা তথাকথিত 'ইউনিটি', 'জাশন্যাল', একতা স্থাপন ইত্যাদি কর্ম্মের প্রভাবে ভারতবাসীর বিচলিত হইবার প্রয়োজন নাই। মানবস্বভাবের দিকে এবং দেশের জল বায়ুর দিকে লক্ষ্য রাখিলেই ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল শাসনপ্রণালী হিন্দুস্থানী নরনারীর পক্ষে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রদ ও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

৬। শ্বেত প্রাসাদে রোমাঞ্চ

লণ্ডনের পার্লামেণ্টগৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মনে হইয়াছিল—"তুমিহার সকল পার্লামেণ্টের সূতিকাগারে পদার্পণ করিতেছি।" ইংরাজজাতির মহাসমিতি জগতের সর্ব্বপুরাতন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—ইহাই অন্যান্য পার্লামেণ্টের জন্মদাত্রী।

বর্ত্তমান সংগ্রামের প্রারম্ভে বাকিংহাম প্রাসাদের সম্মুখে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাগম দেখিয়াও রোমাঞ্চিত হইয়াছি। ভাবিতাম —"এই জাতি রাজা ও রাণীকে কার্য্যতঃ ক্ষমতাহীন ও অধিকারহীন এবং সকল উপায়ে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। অথচ হৃদয়ে হৃদয়ে ইহাদের রাজভক্তি কি অসীম!" ইংরাজসমাজে রাজা প্রকৃতপক্ষে পুতুল ও খেলনার সামগ্রী মাত্র—অথচ রাজপরিবারকে দেখিবার জন্য, রাজপ্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য, রাজারাণীর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিবার জন্য জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যগ্র। রাজপূজা সত্য সত্যই ইংলণ্ডবাসীর মজ্জাগত।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট-প্রাসাদে পদার্পণ করিয়াই এক বিচিত্র মনোভাবে পূর্ণ হইয়া গেলাম। ইয়াঙ্কিরা রাজারাণী নামে কোন পদার্থ বুঝিতেই পারেন না। 'রাজ'শব্দটা পর্য্যন্ত ইহাঁদের অভিধানে পাওয়া যায় না। রাস্তা হইতে রামাশ্যামার মত একটা লোক খুঁজিয়া আনিয়া এই জাতি তাহাকে দেশের কর্ত্তা করিয়া তোলে। অথচ তাহার ক্ষমতা অত্যধিক—বিলাতের রাজা কোন দিন যে সকল অধিকারের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না ইয়াঙ্কিদের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে সেই সমুদয় অধিকার স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ। ইংলণ্ডের রাজা রাজবংশে জন্মিয়াও সামান্য ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষমতাবান্ নহেন। আবার ইয়াঙ্কিদের প্রেসিডেণ্ট একজন সাধারণ ব্যক্তি হইয়াও রাজবংশসম্ভূত নৃপতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাবান্। ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি দুই জাতিই মোটের উপর বিলাতী পূর্ব্বপুরুষগণের সন্তান। দুই জাতিই ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক শাসনের অধীন ছিল। দুই জাতির মাতৃভাষাও এখন পর্য্যন্ত একই। অথচ রাষ্ট্রীয় জীবনে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য। ইংরাজচরিত্র ইয়াঙ্কি বুঝিতে পারে না—ইয়াঙ্কি-চরিত্র ইংরাজ বুঝিতে পারে না।

আমাদের দেশে ফরিদপুর জেলার এক নমঃশূদ্রের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করা যাউক। পল্লী-পাঠশালায় বিদ্যালাভের পর সে যেন নগরের উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। ক্রমশঃ দেশের উচ্চতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃতিত্ব দেখাইয়া যশস্বী হইল। ধরা যাউক এই উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কোন বিদ্যালয়ে মাষ্টারী আরম্ভ করিল। মাষ্টারী করিতে করিতে কলেজের অধ্যাপক হইল—শেষ পর্য্যন্ত চরিত্রবলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব পর্য্যন্ত জুটিল। ফরিদপুরে বাল্যজীবন কাটাইয়া এই নমঃশূদ্র যেন কলিকাতায় যৌবনকাল কাটাইয়াছে—অবশেষে মাদ্রাজের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি বা

চাঙ্গেলার পদে বৃত হইয়াছে। এই সময়ে ঘটনাচক্রে তাহাকে দিল্লীতে যাইয়া অথবা বোম্বাই নগরে বসিয়া সমগ্র ভারতের শাসন-ভার বহন করিতে হইল। গোটা ভারতের লোক যেন তাহাকে এই গুরুদায়িত্ব প্রদান করিল। কয়েক বৎসর এই কার্য্য করিবার পর সে আবার একজন অধ্যাপক হইল। এই চিত্র কল্পনা করিতে পারিলে ইয়াঙ্কি-যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিত্ব বুঝিতে পারিব। দেশে বসিয়া, কেতাব পড়িয়া, এই চিত্র বহুবার কল্পনা করিয়াছি। কিন্তু ওয়াশিং-টনের 'হোইট হাউসে' প্রবেশ করিবামাত্র সত্যটা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিলাম—শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া গেল। স্থূল জগতে সপ্তম আশ্চর্য্য, অষ্টম আশ্চর্য্য ইত্যাদির গল্প শুনা যায়—এবং সেগুলি চোখে দেখিয়াও পুলকিত হওয়া যায়। কিন্তু ভাবরাজ্যের মধ্যেও বিস্ময়জনক তথ্য কম নাই। ইয়াঙ্কি স্থানের শ্বেত প্রাসাদ সেই বিস্ময় পুলক ও রোমাঞ্চের মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহের ভিতরে তাজমহলের গৌরব নাই—বাকিংহাম প্রাসাদেরও ঐশ্বর্য্য নাই। অথচ ইহার সঙ্গে তুলনা করিবার যোগ্য দ্বিতীয় ভবন পৃথিবীতে নাই। সত্যসত্যই "এমন ঘরটি কোথায় খুঁজে পাবে না ক তুমি।" ইয়াঙ্কি রিপাব্লিকের পর ফরাসী বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্র শাসনের সূত্র-পাত। ইয়াঙ্কিরাই জগৎকে এই প্রেসিডেন্ট তত্ত্ব দান করিয়াছে।

হয় ত ইয়াঙ্কি স্থানের সভাপতিত্ব ইয়োরোপে অথবা এশিয়ায় অনুকরণ করা অসম্ভব। হয় ত নানা ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজ বা জার্ম্মাণ, জাপানী বা রুশ ইয়াঙ্কি সভাপতির মত একজন দেশের কর্ত্তা নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা কোন মতেই বুঝিয়া উঠা হয় ত সুকঠিন। কিন্তু শ্রবণবান্ মানুষ মাত্রেই এই দৃশ্য দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইবেন সন্দেহ নাই।

৭। কৃষ্ণাঙ্গ মহাল্লায় অর্দ্ধদিন

কাল ফেডারাল রাষ্ট্রের শ্রমজীবি-বিভাগের একজন কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল। বিলাতী পরিভাষায় ইনি মন্ত্রিস্থানীয়। ইনি বলিলেন—মহাশয় "আমরা মন্ত্রী বটে—কিন্তু বিলাতী মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা প্রেসিডেণ্টের সহকারীমাত্র। কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালনায় আমাদের কোন হাত নাই—আমরা কংগ্রেসের কোন সভায় বসিতে পর্য্যন্ত পারি না।" ইহার নিকট শ্রমজীবিবিভাগ এবং ব্যবসায়-বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র বুঝিয়া লওয়া গেল।

যুক্তরাষ্ট্রের Statistics বা তথ্যসংগ্রহ বিভাগের একজন কর্ত্তার সঙ্গেও কথাবার্ত্তা হইল। ইনি পূর্ব্বে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। প্রিন্সটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সভাপতি উড্রোউইলসনই বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি রহিয়াছেন।

আজ কমার্স ক্লাবে মৎস্যপালন বিভাগ, তথ্যসংগ্রহ বিভাগ এবং ব্যবসায় সম্পর্কীয় বিচারালয় বিভাগের কর্ত্তাদের সঙ্গে ভোজন করা গেল। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম—"যুক্তরাষ্ট্রের নব নব নিয়মে প্রদেশগুলির ক্ষমতা কমিয়া আসিতেছে—নানা উপায়ে ফেডারাল দর-বারের কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িতে চলিয়াছে। বিশেষতঃ ফিলিপাইন দ্বীপ অধিকারের পর ইয়াঙ্কিরা ক্রমশঃ সাম্রাজ্যনীতির পক্ষপাতী হইতে সুরু করিয়াছে।

খাওয়াদাওয়ার পর নগরের নিগ্রো টোলায় বেড়াইতে গেলাম। নিউইয়র্ক ও বষ্টনে বেশী নিগ্রো চোখে পড়ে নাই। কিন্তু

ওয়াশিংটনে রাস্তাঘাটে গণ্ডায় গণ্ডায় কৃষ্ণাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যতই দক্ষিণ অঞ্চলে যাইব ততই নিগ্রোসংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। ওয়াশিংটন এই হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্ত্তী জনপদ।

হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ ছিল। হাওয়ার্ড একজন ইয়াঙ্কি শ্বেতাঙ্গ। ইনি ১৮৬১-৬৫ খৃষ্টাব্দের Civil Warএর সময়ে জীবিত ছিলেন। তাহাতে দক্ষিণপ্রান্তের রাষ্ট্রসমূহ পরাজিত হয় এবং তাহাদের গোলাম-স্বত্বাধিকারীরা দাসজাতিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হন। হাওয়ার্ড মুক্তিপ্রাপ্ত দাসজাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন। তাঁহার প্রারব্ধ অনুষ্ঠানই ক্রমশঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ কৃষ্ণাঙ্গদিগের জন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণাঙ্গ সম্পাদক কুক একজন কর্ম্মঠ উৎসাহশীল ব্যক্তি। বুকার ওয়াশিংটন ইত্যাদি কর্ম্মবীরের চরিত্র কুকের ভিতর আছে বোধ হইল। ইহাঁর পত্নীও শিক্ষাসংক্রান্ত নানা আন্দোলনে লিপ্ত থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে খানিকক্ষণ কাটাইয়া সপত্নীক কুকের সঙ্গে বাহিরে আসিলাম। কুক বলিলেন—"আজ একটে একটা বড় উৎসব হইবে চলুন দেখিয়া আসি।"

ওয়াশিংটন নগরের মধ্যস্থলে "সেণ্ট্রাল হাই স্কুল" অবস্থিত। ইহা ফেডারাল রাষ্ট্রের অধীনে পরিচালিত হয়। প্রধানতঃ শ্বেতাঙ্গ বালক বালিকারা এই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। সম্প্রতি চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহার জন্য নূতন গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। আজ তাহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এই উপলক্ষ্যে বিরাট সভা। যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম—নানা শ্রেণীর নরনারী মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ফেডারাল রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগীয় কর্ত্তারা, বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ এবং কংগ্রেসের কোন কোন বড় সভ্য বক্তৃতা করিলেন। তিন চারি মিনিটের বেশী কাহারও বক্তৃতা হইল না। বক্তারা সকলেই প্রায় একসুরে কথা বলিয়া গেলেন। "এতটাকা খরচ করা হইতেছে—কিসের জন্য? ছাত্রছাত্রীরা সকলেই উপযুক্ত Citizen বা স্বদেশসেবক হইতে পারিবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের Constitution বা শাসনপ্রণালী সম্মান করিয়া জীবন যাপন করিতে শিখিবে।" সকলের মুখেই এই আশা ও উপদেশ প্রচারিত হইল। প্রিন্সিপ্যাল ছাত্র ও ছাত্রীগণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ বিদ্যালয়ের নিজস্ব-গীত গাহিলেন। এই সকল দেশে প্রত্যেক বিদ্যালয়েরই এক একটা 'খাস' গান আছে। তাহার পর কংগ্রেসের সভ্যগণ অন্যান্য ফেডারাল কর্ত্তারা এবং সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী মিলিত হইয়া আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত গাহিলেন।

সভাভঙ্গের পর কুক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। চিকিৎসকের মোটরে চড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিলাম। চিকিৎসক মহাশয় একটা নিগ্রো হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক। তাহার ভিতর যাইয়া কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া দিলেন। প্রায় ৩৫০ রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। পুরুষ, রমণী, শিশু ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কামরা রহিয়াছে। আমেরিকার হাসপাতাল যেরূপ হওয়া উচিত ইহা সেইরূপই দেখিলাম। ডাক্তার বলিলেন—"দুই একজন শ্বেতাঙ্গ ধাত্রী আমাদের এইখানে কাজ করেন। ইহা একটা নূতন তথ্য। কারণ শ্বেতাঙ্গেরা কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে সমানভাবে মিশিয়া কাজ করিতে চাহেন না।"

হাসপাতাল হইতে চিকিৎসক নগরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। পথে দুই একজন রোগী দেখা হইল—আর একজন কৃষ্ণাঙ্গ চিকিৎসকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল। পরে ইনি দুই তিনজন আত্মীয়ার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন। তাঁহারা শিক্ষকতা করেন।

৮। মানবজগতে জাতি-বিভাগ

ভাষা হিসাবে মানবসমাজ নানা জাতিতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে "আর্য্য" জাতি অন্যতম। আর্য্যজাতি বলিলে শুদ্ধচরিত্র, পবিত্রাত্মা অথবা বিশেষ কোন প্রকার শারীরিক গঠনযুক্ত নরনারীর সঙ্ঘ বুঝায় না। বিশেষ একপ্রকার ভাষার নাম আর্য্য। সেই ভাষাভাষী জনগণকে আর্য্যজাতিভুক্ত করা হয়। এই শব্দে রক্তের বিশুদ্ধতা অথবা সংমিশ্রণ ইত্যাদি কিছুই বুঝা যায় না।

পৃথিবীতে কোন ধরণের বিশুদ্ধ রক্তবিশিষ্ট জাতি আছে কিনা সন্দেহ। মানব সমাজের সকল জাতিই hybrid বা দোআঁসলা। রক্ত হিসাবে, চেহারা হিসাবে, শরীরের গঠন হিসাবে, মাথার পরিধি হিসাবে এই দোআঁসলা জাতিগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা অসম্ভব নয়। এইরূপে জাতি নির্ণয় করাই Physical Anthropology এর কার্য্য।

ন্যাশন্যাল মিউজিয়ামে ডাক্তার হ্রেলিকার সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাইলাম। ইনি প্রথমে তাঁহার লাইব্রেরী দেখাইলেন। একটা ছোট ঘরের ভিতর অনেক জিনিষ দেখা গেল। হ্রেলিকা বলিলেন—"মহাশয়, আমাদের বিজ্ঞানটা এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। এ বিষয়ে গ্রন্থ বেশী রচিত হয় নাই। নানা মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি বাহির হয়—তাহা ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচারিত হয়। আমার নিকট এইরূপ পুস্তিকা সহস্র সহস্র জমা হইয়াছে। এইগুলি নানা ভাষায় লিখিত। এই সমুদয় সাজাইয়া রাখিবার জন্যই যথেষ্ট খাটিতে হইয়াছে।"

আমেরিকার সর্ব্বত্রই দেখিতেছি কোন লাইব্রেরীতে মুদ্রিত ক্যাটালগ বা গ্রন্থতালিকা থাকে না। লাইব্রেরীয়ানগণ বলেন—"পুস্তকাকারে ক্যাটালগ থাকিলে বড় অসুবিধা হয়—কারণ প্রতিদিন নূতন নূতন বই বাহির হইতেছে—সেগুলি বর্ণমালানুসারে যথাস্থানে রাখিতে হইলে রোজই পুস্তক বদলান আবশ্যক হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে Card-Catalague ব্যবহার করাই ভাল। পুস্তকের নাম ও বিবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ডে লিখিলে কার্ডগুলি বর্ণমালানুসারে সাজাইলেই চলিতে পারে। নূতন নূতন পুস্তকের জন্য নূতন নূতন কার্ড লিখিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা সহজ।"

হ্রেলিকার লাইব্রেরীতে দেখিলাম কার্ডগুলি যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে। প্রবন্ধ ও পুস্তিকাসমূহ বিষয় অনুসারে সাজান রহিয়াছে। মানবের চুল সম্বন্ধে রচনা স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত, সেইরূপ দাঁত, রং, হাড়, চামড়া, মাথার খুলি ইত্যাদির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আলমারির খোপ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার ছবি এবং ফটোগ্রাফ ও কার্ডের মত বর্ণমালানুসারে রক্ষিত হইতেছে।

লাইব্রেরী দেখিয়া সংগ্রহালয়ে প্রবেশ করিলাম। হ্রেলিকা বলিলেন—"এই যে অস্থিগুলি দেখিতেছেন এরূপ অস্থি মানবজাতির শরীরে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক মানবদেহে এই সমুদয় থাকিত। এগুলি একণে পর্ব্বতগাত্রে ফসিল আকারে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ দেখুন

কতকগুলি বিচিত্র মাথার খুলি। এই সমুদয়ও বর্ত্তমান মানবজাতির প্রাচীনতর অবস্থার সাক্ষী। এই কয়েকটা আলমারীর বস্তুসমূহ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে বর্ত্তমান মানবের শারীরিক গঠন ঐতিহাসিকভাবে বুঝিতে পারা যায়। মানবের শরীর চিরকাল একরূপ ছিল না। যুগে যুগে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে।"

কোন আল্‌মারির এক পার্শ্বে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র মাথা দেখিলাম অপর পার্শ্বে অতি বৃহৎ খুলি দেখিলাম। ব্লেনিস্কা বলিলেন "একই লোহিতাভ জাতির প্রবীণ ব্যক্তিগণের মস্তকে এইরূপ প্রভেদ দেখা যায়। সবই প্রৌঢ় মানুষের মাথা—কিন্তু কতকগুলি নিতান্ত ছোট, কতকগুলি অতি বৃহৎ।"

একস্থানে জীবন্ত নরনারীর মাথা মাপিবার কল দেখা গেল। অন্যত্র প্রায় দুই হাজার মস্তিষ্ক ভিন্ন ভিন্ন কাচের পাত্রে সাজান রহিয়াছে। ব্লেনিস্কা বলিলেন—"কতকগুলি মানবের মস্তিষ্ক, কতকগুলি স্তন্যপায়ী অন্যান্য জীবের মস্তিষ্ক। এগুলি এমন এক জলীয় পদার্থে ভিজাইয়া রাখা হইয়াছে যাহার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতি সঙ্কুচিত অথবা বর্দ্ধিত হইতে না পারে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন একটা মাথার খুলি দেখিয়া বলিয়া দিতে পারেন কি এটা কোন জাতীয় লোকের?" ব্লেনিস্কা বলিলেন—"মহাশয়, মানবের জাতিগুলিকে সর্ব্বাংশে তফাৎ করিয়া ফেলা বড় কঠিন। কতকগুলির প্রভেদ অতি বেশী—সেই সকল জাতীয় মাথা দেখিবামাত্র চিনিতে পারা যায়। কিন্তু অনেক জাতির বিভিন্নতা সামান্য মাত্র—তাহাদের প্রভেদ লক্ষ্য করা বড় কঠিন—অনেক বিষয়েই তাহাদের মধ্যে সাম্য আছে। এই সকল ক্ষেত্রে মাথা দেখিয়া মাত্র তাহাদের জাতি নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব।"

তাহার পর জাতি বিভাগ, শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি আলোচিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "Botany অথবা Zoologyতে যেরূপ Taxonomy বা Classification অধ্যায় আছে সেইরূপ শ্রেণীবিভাগ মানবসমাজে সম্ভবপর কি? Anthropology বিজ্ঞানের দ্বারা মানবসমাজকে উচ্চ নিম্ন স্তরে বিভক্ত করা চলে কি? উদ্ভিজ্জগতে Algæ হইতে সপুষ্পক তরুবর পর্য্যন্ত একটা জীবনধারা লক্ষ্য করা যায়। জীবজগতেও Protozoa হইতে আরম্ভ করিয়া স্তন্যপায়ী ও শিরঃপাড়াবিশিষ্ট জীবপর্য্যন্ত শারীরিক ক্রমবিকাশের রীতি বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ মানবজগতে নিম্নতম শারীরিক গঠন বা আকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম শারীরিক গঠন বা আকৃতির ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ধরিতে পারেন কি?"

ব্লেনিস্কা বলিলেন—"একেবারে অসম্ভব নয়। মানবসমাজে সর্ব্বনিম্নশ্রেণী কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো এবং সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী শ্বেতাঙ্গ। অন্যান্য জাতিরা মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। নিম্নতম হইতে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীর প্রভেদ বেশী নয়—কিন্তু সর্ব্বনিম্নে এবং সর্ব্বোচ্চে প্রভেদ অত্যধিক।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোকে সর্ব্বনিম্ন মানব বলিতেছেন কেন?" ব্লেনিস্কা বলিলেন—"আমি শারীরিক গঠন হিসাবে কথাটা বলিতেছি। নিগ্রোর হাত পা কান ঠোঁট, চোয়াল, মুখভঙ্গী, নাক সবই প্রাগৈতিহাসিক সর্ব্বপুরাতন মানবের অনুরূপ। সম্প্রতি যবদ্বীপে একটা প্রাগৈতিহাসিক মানবশরীর পাওয়া গিয়াছে। তাহা

হইতে ইয়োরোপীয় মানব অথবা ভারতীয় মানবের প্রভেদ অত্যধিক—কিন্তু নিগ্রোর সঙ্গে অনেক বিষয়েই তাহার মিল আছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"খেতাঙ্গ কাহাকে বলে?" ডাক্তার বলিলেন—"ইয়োরোপের সকল জাতি, প্রাচীন মিশরীয়গণ এশিরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ইহুদিজাতি এবং ভারতবর্ষের জাতিপুঞ্জ সকলকে এই শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া থাকি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভারতবাসীকে খেতাঙ্গ ভাবিলেন কি করিয়া?" ডাক্তার বলিলেন—"খেতাঙ্গ একটা পারিভাষিক শব্দ। একমাত্র চামড়ার রং দেখিয়াই কোন জাতিকে খেতাঙ্গ বলিতেছি না। নাক চোখ মুখ কান, চিবুক, মুখের আকৃতি, মাথার খুলি, শারীরিক দৈর্ঘ্যের তুলনায় মাথার পরিমাণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই ভারতবর্ষের অধিকাংশ জাতি মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ইহুদি, আরব, পার্শী এবং ইয়োরোপের রুশ, জার্মাণ, ইতালীয়, ইংরাজ ইত্যাদি সকল জাতির সমকক্ষ। ভাষা হিসাবে এই জাতিগুলি আর্য্য, সেমিটিক ইত্যাদি হলবুক—কিন্তু রক্ত হিসাবে ইহারা সকলেই এক গোত্রের অন্তর্গত। তাহাকে আমরা "খেতাঙ্গ" বলিয়া থাকি।"

হেডলিকার মতে ভারতবর্ষের লোকেরা যদি কিছুকাল শীতপ্রধান দেশে থাকে তাহা হইলে অল্পকালের ভিতরেই তাহারা খেতাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে—ইহারা বাস্তবিক কৃষ্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু চীনা জাপানী ইত্যাদি পীত জাতি খেতাঙ্গ হইতে পারে না। ইহাদের মধ্যে লোহিতাঙ্গের বীজ আছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার লোহিতাঙ্গ ইণ্ডিয়ান্ পীত জাতিরই এক শাখা। হেডলিকার মতে পীতজাতি শারীরিক হিসাবে কৃষ্ণ ও খেতের মধ্যবর্ত্তী। কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোদের সমীপবর্ত্তী জাতির মধ্যে নিগ্রেটো, মেলানেসিয়ান, অষ্ট্রেলিয়ান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। মানব হিসাবে যে জাতি যত নিম্নে পশু হিসাবে সে তত উচ্চে। এই জন্য কৃষ্ণাঙ্গের শারীরিক শক্তি খেতাঙ্গের অপেক্ষা যথেষ্ট বেশী।

হেডলিকা বলিলেন—প্রথম যুগের মানব শারীরিক হিসাবে নিগ্রো ধরণের ছিল। তখনও জাতিগুলি বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পরে নানা আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া জাতিগুলি বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। আধুনিক নিগ্রো প্রাচীনতম কাঠামো বেশী বদলায় নাই—কিন্তু অন্যান্য জাতি যথেষ্টই বদলাইয়াছে।"

তাহার পর মস্তিষ্কের কথা আলোচিত হইল। হেডলিকার মতে "শারীরিক গঠন হিসাবে কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো প্রাচীনতম মানবের সমীপবর্ত্তী কিন্তু চিন্তাশক্তি হিসাবে তাহা হইতে বহু দূরে। বরং খেতাঙ্গে এবং কৃষ্ণাঙ্গে মস্তিষ্ক হিসাবে বেশী প্রভেদ নাই। তবে একজাতির মস্তিষ্ক বিকাশলাভ করিয়াছে—অন্যজাতির মস্তিষ্কশক্তি এখনও প্রকটিত হয় নাই। কাজেই একমাত্র শারীরিক গঠন, চুলের আকৃতি, মুখশ্রী, মাথার খুলি, চামড়ার রং ইত্যাদি দেখিয়া সভ্যতা হিসাবে কোন জাতিকে উচ্চ বা নিম্ন বলা যায় না। Physical Anthropologyর বিচারে কতকগুলি জাতিকে উচ্চ, কতকগুলিকে নিম্ন বলা হয়—কিন্তু Cultural Anthropology হিসাবে সেই সকল জাতির উচ্চ বা নিম্ন হইবে কি না তাহা বলা কঠিন। তাহার জন্য স্বতন্ত্র অনুসন্ধান আবশ্যক।"

৯। কংগ্রেসের "রেপ্রেজেণ্টেটিভ্"

ভারতবর্ষে কংগ্রেস শব্দ সুপরিচিত। বর্ত্তমান জগতে ইহাকি যুক্তরাষ্ট্রই এই শব্দ

এবং এই শব্দের অন্তর্গত বস্তু আবিষ্কার করিয়াছেন: ইয়াঙ্কিস্থান হইতেই ভারতবর্ষে এই শব্দের আমদানী। কিন্তু ভারতীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ইয়াঙ্কি কংগ্রেসের পরিচয় পাওয়া যায় না।

কংগ্রেস বিচারালয় নয়, কংগ্রেস শাসন বিভাগও নয়, কংগ্রেস আইন প্রস্তুত করিবার সম্মিলনী যাহাকে ভারতবর্ষে ব্যবস্থাপক সভা বলা হয়। বিলাতের পার্লামেণ্ট যে বস্তু, ব্রিটিশশাসিত ভারতের "লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল" যে বস্তু যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল কংগ্রেসও সেই বস্তু। অথচ আমাদের Legislative Council কিম্বা British Parliament ইত্যাদি ব্যবস্থাপক সভার বৃত্তান্ত জানা থাকিলেই ইয়াঙ্কিদের ব্যবস্থাপক সভা বুঝিতে পারা যায় না। বিলাতী পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্য্যপরিচালনা-প্রণালী এক প্রকার, ইয়াঙ্কিদের জাতীয় মহা সমিতির ক্ষমতা ও কার্য্য পরিচালনা প্রণালী অন্য-প্রকার। সম্প্রতি ব্রিটিশ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই—কারণ বিজিতদেশ শাসন করিবার জন্য ইংরাজকে কতকগুলি স্বতন্ত্র নিয়ম করিতে হইয়াছে। সেই সমুদয়ের প্রয়োগ বিলাতে অথবা ইয়াঙ্কিস্থানে কিম্বা অন্য কোন স্বাধীন দেশে দেখা যায় না। আর ভারতীয় উকীল নেতাদিগের "জাতীয় মহাসমিতি"র কথা এক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক—কেন না ইহা বিজিত দেশের কতকগুলি নেতৃস্থানীয় লোকের মজ্‌লিস্ মাত্র। শাসনকর্ত্তাদিগকে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক করিয়া রাখাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখা উচিত যে ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, ভারতীয় সুপ্রিম লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিল, বিলাতী পার্লামেণ্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল কংগ্রেস—সকল সম্মিলনই জাতিতে এক। আইন প্রস্তুত করা ইহাদের কার্য্য—ইহারা আইন প্রয়োগও করে না অথবা সেনাবিভাগ ও পুলিশ বিভাগের ন্যায় দেশ শাসনও করে না।

ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল ভবন কংগ্রেস বা ব্যবস্থাপক সভার গৃহ—এখানকার পার্লামেণ্ট-গৌরবস্বরূপ। ক্যাপিটল হইতে কংগ্রেসের কয়েকজন কর্ত্তার চিঠি পাওয়া গেল। দেখিলাম চিঠির উপর কোন ডাক টিকিট লাগান নাই। পরে বুঝিলাম—কংগ্রেসের সভ্যগণ আমরা যেখানে ষ্ট্যাম্প লাগাইয়া থাকি সেই খানে নিজের নাম সহি করিয়া দিয়াছেন। কর্ত্তাদের নাম সহিই ষ্ট্যাম্প লাগাইবার সমান।

বিলাতী পার্লামেণ্টের দুই মহল—ছোট মহলের নাম 'হাউস অব্ কমন্স' বড় মহলের নাম 'হাউস অব্ লর্ডস্'। এক মহলে পয়সা-ওয়ালা লোকেদের প্রতিনিধিরা বসেন—অপর মহলে রামাশ্যামাদের প্রতিনিধিবর্গ অর্থাৎ ছোট মহলই বিশেষ প্রতাপশালী, বড় মহলের ক্ষমতা অতি অল্প। ইয়াঙ্কি পার্লামেণ্ট বা কংগ্রেসেরও দুই মহল—কিন্তু ছোট মহলে বড় মহলে যে প্রভেদ থাকে এখানে সে প্রভেদ নাই। দুই মহলের ক্ষমতা, কর্ম্ম-ক্ষেত্র এবং কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন—কেহ কাহারও অধীন বা নিয়মস্থ নয়। বিলাতে যেরূপ Lower House ও Upper House শব্দ প্রযোজ্য এখানে সেরূপ প্রযোজ্য নয়। ইয়াঙ্কিদের এক মহলের নাম House of Representatives অপর মহলের নাম Senate। দুই মহলের জন্য জনগণ দুই ধরণে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে।

পয়সাওয়ালা প্রতিনিধির দল অথবা দরিদ্র প্রতিনিধির দল—এইরূপ দলভেদ ইহাতে স্থানে নাই। একদল প্রতিনিধিকে 'রেপ্রেজেণ্টেটিভ্' বলে অপর দলকে 'সেনেটার' বলে।

আজ একজন নামজাদা রেপ্রেজেণ্টেটিভের সঙ্গে ক্যাপিটলে দেখা হইল। ইনি দক্ষিণ অঞ্চলের আলাবামারাষ্ট্রের অন্যতম প্রতিনিধি। আলাবামা প্রদেশের টাস্কেগী নগরে নিগ্রোনায়ক বুকার ওয়াশিংটনের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় অবস্থিত। রেপ্রেজেণ্টেটিভ মহাশয় বহুবার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেসের খাজনা আদায় এবং করস্থাপন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। দেখা হইবামাত্র ইনি বলিলেন—"মহাশয়, কাল পর্য্যন্ত আমি হাউস্ অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ্সে প্রতিনিধি ছিলাম—আজ হইতে আমি সেনেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছি। এখন আমি সেনেটার।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "সে কি,মহাশয়, রেপ্রেজেণ্টেটিভ থাকিতে থাকিতে আপনি সেনেটার হইলেন কি করিয়া? একমহল হইতে আর এক মহলে বদলি হইবার নিয়ম আছে কি?" রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিলেন—"এক মহল হইতে অপর মহলে বদলি হইবার নিয়ম নাই। আমি এক মহল হইতে অপর মহলে বদলিও হই নাই। কাল আমার রেপ্রেজেণ্টেটিভ মহলে আয়ু স্বাভাবিক ক্রমে পূর্ণ হইয়াছে। সাধারণ নিয়মে আজ হইতে আমি নিষ্কর্ম্মা—দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু ঘটনাক্রমে আলোবামা প্রদেশের জনগণ আমাকে সেনেটে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়াছে। কাজেই এক মহলের কার্য্য শেষ না হইতেই অপর মহলে কার্য্য পাইলাম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জনসাধারণ সেনেটের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে কেন? জনসাধারণ ত একমাত্র হাউস্ অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ্সে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অধিকারী। সেনেটার নির্ব্বাচনের জন্য প্রদেশরাষ্ট্রই দায়ী নহে কি? আলাবামারাষ্ট্র আপনাকে নির্ব্বাচিত করিবে ইহাই ত স্বাভাবিক বলিয়া জানি।" রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিলেন—"মহাশয়, আপনি পুঁথিপড়া বিদ্যা আওড়াইতেছেন—বিগত দুই তিন বৎসরের ভিতর আমাদের কন্‌ষ্টিটিউসনের অনেক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়মের ফলে জনগণই আজকাল সেনেটার নির্ব্বাচিত করে।" আমি বলিলাম—তাহা হইলে দেখিতেছি প্রদেশরাষ্ট্র কংগ্রেসের কোন মহলেই আর প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে না। জনগনই রেপ্রেজেণ্টেটিভ নির্ব্বাচন করিয়া আসিতেছে—নূতন নিয়মে সেনেটারও নির্ব্বাচন করিবে। আর কংগ্রেসের বাহিরে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন ত জনগণের হাতে আছেই। তাহা হইলে প্রদেশরাষ্ট্রের ক্ষমতা একপ্রকার লুপ্ত প্রায়।" জনগণের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে রেপ্রেজেণ্টেটিভ বলিলেন—"মহাশয়, আর একটা কথা জানা আবশ্যক। জনসাধারণই দুই প্রকার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে সত্য—কিন্তু প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা জেলা হইতে ভিন্ন ভিন্ন রেপ্রেজেণ্টেটিভ নির্ব্বাচিত হইবেন। সুতরাং রেপ্রেজেণ্টেটিভ প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র প্রদেশের প্রতিনিধি নহেন—তিনি কোন জেলা বা বিভাগ বিশেষের প্রতিনিধি নহেন—তিনি সমগ্র প্রদেশের প্রতিনিধি। তাহাছাড়া কোন প্রদেশ হইতেই দুই জনের বেশী সেনেটার নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। যে

প্রদেশে মাত্র দশ হাজার লোক সেখান হইতেও দুইজন সেনেটে আসিবেন আবার যেখানে একলক্ষ লোক সেখান হইতেও দুইজন মাত্র সেনেটার নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু রেপ্রেজেণ্টেটিভ সংখ্যা প্রত্যেক প্রদেশের লোকসংখ্যার উপর নির্ভর করিবে। কোন প্রদেশ হইতে রেপ্রেজেণ্টেটিভ হয় ত একজন আসিবেন—কোন প্রদেশ হইতে হয় ত দশজন ইত্যাদি।"

ইয়াঙ্কি কন্‌ষ্টিটিউশন বুঝিবার জন্য কল্পনার আশ্রয় লওয়া যাউক। ইয়াঙ্কি স্থানের লোক-সংখ্যা দশ কোটি—প্রদেশ সংখ্যা ৪৫। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ত্রিশ কোটি, প্রদেশ সংখ্যা (করদ রাজ্য লইয়া) অগণিত। সহজে বুঝিবার জন্য গোটা ভারতের কথা ছাড়িয়া কেবল বঙ্গভাষাভাষী জনগণের দৃষ্টান্ত ধরিতেছি। বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশ ও আনুমানিক লোক সংখ্যা গ্রহণ করিতেছি। মনে করা যাউক এই প্রদেশ বা বিভাগ গুলি যেন স্বতন্ত্র স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্র বিশেষ।

উত্তরবঙ্গ—	১০,০০০,০০০
মধ্যবঙ্গ—	৭,৫০০,০০০
পশ্চিমবঙ্গ—	১২,৫০০,০০০
পূর্ব্ববঙ্গ—	১৫,০০০,০০০
চট্টগ্রাম—	৫,০০০,০০০
	৫০,০০০,০০০

এই কাল্পনিক বঙ্গীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বসমেত ৫ কোটি লোক—বিলাত, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি রাষ্ট্রের লোক সংখ্যা প্রায় এইরূপ। পাঁচটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের সমবায়ে এই দেশ গঠিত। ইহার জন্য ইয়াঙ্কি আদর্শে Constitution স্থাপন করিতে হইলে পাঁচকোটি লোক মিলিয়া একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রণালী এখনও বর্ণনা করা হয় নাই। ব্যবস্থাপক সভা বা কংগ্রেসের কথাই বলা হইতেছিল। সেনেটমহলে দশজন মাত্র নির্ব্বাচিত হইবেন—প্রত্যেক রাষ্ট্র দুই-জন সেনেটার পাঠাইবেন—পূর্ব্ববঙ্গের দেড় কোটী লোকও দুইজন প্রতিনিধি সেনেটে পাঠাইবেন—আবার চট্টগ্রামের অর্দ্ধকোটি লোকও দুইজনই পাঠাইবেন। এই উপায়ে সেনেট প্রতিষ্ঠানে পূর্ব্ববঙ্গের সঙ্গে চট্টগ্রামের এবং পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সাম্যরক্ষিত হইবে। ইহার ফলে কোন রাষ্ট্রই অপর রাষ্ট্র হইতে নিজকে ছোট বা বড় বিবেচনা করিতে পারিবে না। পূর্ব্ববঙ্গের দেড়কোটি লোক কোথা হইতে এই দুইজন সেনেটার বাছিবেন? পূর্ব্ববঙ্গের সকল জেলা হইতে। বলা বাহুল্য যাহারা সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধ তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

তারপর রেপ্রেজেণ্টেটিভদের কথা। ধরা যাউক যেন 'হাউস অব্ রেপ্রেজেণ্টেটিভ্‌সে' সর্ব্বসমেত ৩০০ প্রতিনিধি আবশ্যক। বঙ্গের লোক সংখ্যা ৫ কোটি। এই পাঁচ কোটিকে তিনশত দিয়া ভাগ করিতে হইবে—ভাগ ফল হইল ১৬০,০০০। প্রত্যেক ১৬০,০০০ লোক একজন করিয়া রেপ্রেজেণ্টেটিভ নির্ব্বাচন করিবে। উত্তরবঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৬৫ জন প্রতিনিধি আসিবে—উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিভাগ হইতে প্রায় ৯০ জন আসিবে ইত্যাদি।

ইয়াঙ্কি কন্‌ষ্টিটিউশনে দুইটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে—(১) কোন রাষ্ট্র অপর কোন রাষ্ট্র হইতে হীন নহে—ছোট হউক বড় হউক, ধনী হউক, নির্ধন হউক রাষ্ট্র মাত্রেরই সমান অধিকার। অতএব সমবায়-রাষ্ট্রে ইহার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই জন্যই সেনেটে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দুই প্রতিনিধি।

(২) কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি হইতে হীন নহে—ধনী হউক নির্ধন হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক ব্যক্তিমাত্রেরই সমান অধিকার। অতএব সমবায় রাষ্ট্রে ইহার জন্য ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এই জন্যই রেপ্রেজেন্টেটিভ্ মণ্ডলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

১০। ইয়াঙ্কি স্থানের পরিচয়

সকাল সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত "কায়েন মনসা বাচা" পরিশ্রম করিতে হয়। দিনের পর দিন ইহাই নিত্য-কর্ম্মপদ্ধতি। হয় ভ্রমণ না হয় কথোপকথন, না হয় পঠন পর্য্যটকের ডায়েরীতে অন্য কোন তথ্য থাকা অসম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে বক্তৃতা করা অথবা প্রবন্ধপাঠের ব্যাধি ধরে নাই। তাহা হইলে আরও মেহনতের আশঙ্কা থাকিত। অধিকন্তু নানা উপায়ে সংবাদদাতাদিগের উৎপাত এড়ান গিয়াছে। মোটের উপর, 'যাই যাই ঘুরে বেড়াই'—'চলে যাই আপন মনে চাহিনা কারও পানে।'

ঘণ্টা দুএক খরচ করিয়া Navy yard দেখা গেল। জাহাজ এখানে প্রস্তুত করা হয় না—একটা ক্ষুদ্র মিউজিয়াম আছে—তাহা ছাড়া মেক্যানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদিগের বোধগম্য বহুবিধ কলকারখানার কারবার চলিতেছে। সাধারণ চোখে দেখিয়া কিছু বুঝিবার যো নাই।

বিলাতে যখন ছিলাম তখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন শেষ হইয়া আসিতেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশকাল উপস্থিত হইতেছিল। প্রায় সকল স্থানেই তাহা আসন্ন দেখিয়াছি। যুক্তরাষ্ট্রেও সেইরূপই অবস্থা। বড়দিনের ছুটিতে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলাম—পরীক্ষার ছুটির সময়ে হার্ভার্ডে গেলাম। কাজেই কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিবার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অত্যধিক সময় কাটাইতে হইয়াছে। ওয়াশিংটনে উপস্থিত হইয়া দেখি সেনেটার ও রেপ্রেজেন্টেটিভ মহাশয়গণ মহা ব্যস্ত। কংগ্রেসের কার্য্য এই বৎসরকার মত খতম করিয়া সকলেই বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। আমাদের দেশে পূজার ছুটির এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আফিসে বিদ্যালয়ে যেরূপ হৈ হৈ হট্টগোল বিশৃঙ্খলা এখানকার কংগ্রেসে মণ্ডলেও প্রায় সেইরূপ দেখিতেছি।

ইতিমধ্যে কেহ কেহ ওয়াশিংটন ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন—কেহ কেহ ফিলিপাইন, হনলুলু ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জে রাষ্ট্রীয় সহরে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আর একজন সুপ্রসিদ্ধ রেপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে পরিচয় হইল। ইনি নিউইর্কে প্রদেশের প্রতিনিধি। ইনি প্রথমেই বলিলেন—"মহাশয়, আর নয় মাসের ভিতর কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হইবে না। যদি প্রেসিডেণ্ট বিশেষ কোন জরুরি কার্য্যের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করেন তাহা হইলে হয়ত আবার আমরা আসিয়া জুটিতে পারি।" ইনি appropriations অর্থাৎ ব্যয় বিভাগের কর্ত্তা। ইনি উপরাউপরি নয়বার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ইহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। ইহার আফিসে কয়েকটা কল দেখিলাম। টেলিফোনের উন্নত সংস্করণ একটা যন্ত্রে দেখিলাম। ইহাতে মুখ লাগাইয়া কথা বলিতে হয় না—অথবা কাণে পাতিয়াও শুনিতে হয় না। এই ব্যক্তি সেইখান হইতে কথা বলিতে লাগিলেন—কলের ভিতর দিয়া আওয়াজ আসিয়া পৌঁছিল। ঘরের সকলেই শুনিতে পাইলাম। রেপ্রেজেন্টেটিভ্ তাঁহার

স্থানে বসিয়াই সহকারীকে আদেশ করিলেন। কথাটা কলের ভিতর দিয়া সহকারীর নিকট পৌঁছিল। ইহার নাম Dictograph। আর দু একটা কলের সাহায্যে বড় বড় অঙ্ক কষা হইতেছে দেখিতে পাইলাম। এইরূপ automatic calculator এর ব্যবহার ইয়াঙ্কি স্থানের সর্ব্বত্রই চলিতেছে। সেদিন Statistics বিভাগের কর্ত্তা বলিতেছিলেন —যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আর বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে হয় না। তথ্য সংগ্রহ বিভাগে আসিয়া কলগুলি দেখিয়া যাইবেন।"

রেপ্রেজেন্টেটিভ মহাশয় ভারতবর্ষের সংবাদ কিছুই রাখেন না। বর্ত্তমানযুগে উচ্চ শিক্ষিত লোকের মধ্যে এত অনভিজ্ঞতা আছে বিশ্বাস করা কঠিন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ভারতবর্ষের ফরাসী ভাষায় চল বোধ হয় কিছু বেশী!" শুনিবামাত্র মনে হইল —"এই ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রনায়কের দোষ কি? বিলাতেও অসংখ্য লোক ভারতবর্ষের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। বহু লোক জানে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ। কাহারও কাহারও ধারণা যে এখানে ওলন্দাজদিগের একটা উপনিবেশ আছে। অধিকন্তু বর্ত্তমান সংগ্রামের সময়ে ভারতবাসীকে ইংরাজেরা রুশ, ফরাসী, জাপানী ইত্যাদির ন্যায় বন্ধু রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ allies বিবেচনা করিতেছে। সাধারণ ইংরাজ নরনারী, গুর্খা, শিখ, পাঠান, রাজপুত এবং অন্যান্য ভারতীয় সৈন্যগণকে ইংলণ্ডের সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবক অথবা মিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেছে। ভারতবর্ষ যে ইংরাজের একটা জমিদারী বিশেষ তাহা ইংরাজেরাও জানেন না!"

আমরা বলিভিয়া অথবা ভেনেজুয়েলা সম্বন্ধে যতটুকু জানি ইয়াঙ্কিরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষা বেশী জানেন না। উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণের কথাই বলিতেছি —অর্দ্ধশিক্ষিতেরা ত ভারতবর্ষের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই।

ভারতবর্ষের শিক্ষিত মহলে ইয়াঙ্কিস্থান অনেকটা সুপরিচিত। আমরা বিলাত সম্বন্ধে যতটা জানি যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে প্রায় ততটাই জানি। ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থে বাল্যকাল হইতেই আমরা আমেরিকার গল্প শুনিয়া আসিতেছি। কলম্বাসের আবিষ্কার কাহিনী এবং ইয়াঙ্কি স্বাধীনতার বিবরণ অন্ততঃ এই দুইটি বিষয় অর্দ্ধশিক্ষিত ভারতবাসীরও জানা আছে। উচ্চশিক্ষিতেরা ইংরাজী সাহিত্যের সাহায্যে আমেরিকার অনেক তথ্যই অবগত আছেন। এখানকার শিল্প, বিজ্ঞান, কারখানা, ব্যবসাদারী, কাব্য, দর্শন, ধর্ম্মচর্চ্চা ইত্যাদি নানা বিষয়েই আমরা আমেরিকাকে চিনি। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহুগ্রন্থের রচয়িতা ইয়াঙ্কি। এই সূত্রেও ভারতবাসী ইয়াঙ্কিস্থানের সংবাদ কম রাখেন না। আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন তড়িৎ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ধন বিজ্ঞান, ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাবলীর জন্য অনেক সময়েই আমরা ইয়াঙ্কি প্রকাশকগণের শরণাপন্ন হইয়া থাকি। এই সকল বিষয়ে ভাল ভাল গ্রন্থ জার্ম্মাণ অথবা ফরাসী ভাষায় পাওয়া যায়। আমরা অনেকেই এই দুই ভাষা ব্যবহার করিতে অসমর্থ। ইংরাজী-ভাষায় লিখিত গ্রন্থের উপর যাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র বিলাতী লেখকের রচনা পর্য্যাপ্ত নয়। ইয়াঙ্কি লেখকেরা অধিকাংশ স্থলে ভারতীয় বিজ্ঞান সেবিগণের রসদ জোগাইয়া থাকেন।

অধিকন্তু, মৌলিক কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে

আমরা সেক্সপিয়ার, স্কট্, জর্জ এলিয়ট টেনিসনকে যেরূপ জানি ইহারি বলের সাহিত্যবীরগণকেও সেইরূপই জানি। লংফেলোর কবিতাবলী, Whittier এর "songs of Labour", হথর্ণের "Scarlet Letter", হুইট্‌ম্যানের Leavs of grass, Bancroft, Prescott এর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ, Irving এর The sketch Book, Motby এর Dutch Republic, এমার্সনের বক্তৃতা লেখসের দর্শনবাদ মোটামুটি পরিমাণে ভারতবাসীর জানা আছে। তাহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের কালেজের ও শিক্ষা প্রণালী কেহ কেহ আলোচনা করিয়া থাকেন। বিগত ৩।১০ বৎসরের ভিতর আমেরিকার ভারতীয় ছাত্রেরা ইংরাজীতে অথবা হিন্দী মারাঠী বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় দেশবাসীকে ইহারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল কারণে আমেরিকায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই এখানকার বহুকথা আমাদের জানা থাকে। আসল জায়গায় পদার্পণ করিয়া চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটান হয় মাত্র। ইংলণ্ড ও আমেরিকা সম্বন্ধে দেশে বসিয়াই এতকথা জানি যে যথাস্থানে আসিয়া নূতন কিছু শিখিলাম কিনা সন্দেহ হইতেছে। অবশ্য চোখে দেখায় আর কাণে শোনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু জগতের অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে সমাজের এত বিস্তৃত ও গভীর জ্ঞান আছে বলিতে পারি না। রুশিয়া, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান, চীন, মিশর, পারস্য ইত্যাদি দেশের ভাষা আমাদের কয়জনে জানেন? ইংরাজী ভাষার কৃপায় ঘরে বসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দুনিয়ার অনেক পাই! ফরাসী এবং অন্যান্য ভাষা না জানা থাকিলে জগতের অন্যান্য কেন্দ্র সম্বন্ধে অন্ধ ও অন্ধ থাকিতে বাধ্য। বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে হইলে উচ্চ শিক্ষিত ভারতবাসীকে দুই তিনটা বিদেশীয় ভাষায় সুপণ্ডিত হইতে হইবে।

ইহাকিস্থান সম্বন্ধে ইংরাজীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থই আছে। ভারতবাসী অনেক গ্রন্থই পাঠ করিয়া থাকেন। Bryce প্রণীত The American common wealth এর নাম জানেন না পৃথিবীতে এমন কোন লোক নাই। ইহাকি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারাল কন্‌ষ্টিটিউশন সম্বন্ধে ইহা একখানা Classic পুস্তক। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন প্রণীত The state গ্রন্থ আজকাল ভারতবর্ষের বি, এ, ক্লাসে পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহাতে আমেরিকার শাসন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। এইটুকু পাঠ করিলে ব্রাইসের বই না পড়িলেও চলে। কয়েকবৎসর হইল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রশাসনাধ্যাপক Hart একখানা আমেরিকার ইতিহাস 'সম্পাদন' করিয়াছেন। কয়েকজন নামজাদা লেখকের সাহায্যে সেই গ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগ লেখান হইয়াছে। পুস্তকের নাম The American Nation, তাহা হইতে কয়েকটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যায় সঙ্কলন করিয়া অধ্যাপক হার্ট একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার নাম "Social and Economic Forces in American History." ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর অঞ্চল, দক্ষিণ অঞ্চল, পূর্ব্ব অঞ্চল ও পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্নতা এবং ক্রমবিকাশ বুঝান হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশগুলি বাস্তবিকপক্ষে গত ৭০ বৎসরের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে, এবং পশ্চিম প্রদেশে বনজঙ্গল মাত্র ছিল। এত অল্পকালের ভিতর

কি করিয়া সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপিত হইল, নগর গঠিত হইল, কারখানা ও বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিল এই সকল কথা হার্ট সঙ্কলিত পুস্তিকায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রই একটা নূতন দেশ—তাহার ভিতরেও নূতনতর, নূতনতম প্রদেশ আছে—এ কথা ভারতবাসীর হয়ত ভাল রকম জানা নাই। নূতন গঠিত দেশের সমাজে কর্ম্ম ও চিন্তাপ্রণালী কিরূপ হয় তাহা বুঝিবার জন্য আমেরিকায় আসা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে হার্টের গ্রন্থ অতীব মূল্যবান্।

আমরা ভারতবর্ষে চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ Imperial Gazetteer of India পাঠ করিয়া থাকি। ঠিক এই ধরণের একখানা ইয়াঙ্কি গ্রন্থের নাম The United states. ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত—সম্পাদকের নাম Shaler, ইহার বিস্তৃত নাম—A Study of the American commonwealth, its Natural resources, People, Industries, manufactures, commerce and its work in Literature, Science Education and Self Governments, অভিধানের ন্যায় এই গ্রন্থ সর্ব্বদা কাছে রাখা ভাল।

লণ্ডনে থাকিবার সময়ে একটা উৎসব দেখিয়া আসিয়াছিলাম। ১৯১৪ সালে ইয়াঙ্কি ইংরাজের সন্ধি ও মিত্রতার শতবর্ষ পূর্ণ হয়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে বেলজিয়ামের ঘেণ্টনগরে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজে ও ইয়াঙ্কিতে দুইবার লড়াই হয়। প্রথম লড়াইয়ের ফলে ইয়াঙ্কিরা স্বাধীন হন। সে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের কথা। ইংরাজ ইয়াঙ্কিকে শীঘ্র ছাড়িতে চাহেন নাই। পুনরায় যুদ্ধবাধে—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তাহার সমাপ্তি হয়। তাহার পর একশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর সম্পূর্ণ সময়ে ইহাঁদের কেহই প্রস্তুত হন নাই—পশ্চাতে পশ্চাতে ডিপ্লোমেসীর সাহায্যে পরস্পর পরস্পরকে কাবু করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন মাত্র। যাহা হউক একশত বৎসর শান্তি ছিল। এই জন্য গত বৎসর লণ্ডনে এক প্রদর্শনী খুলিয়া উৎসব করা হইল। কস্‌মস্ ক্লাবের লাইব্রেরীতে অনেক নূতন নূতন পুস্তকের আমদানী দেখিলাম। তাহার মধ্যে একখানার নাম The British Empire and the United states, লেখক কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানাধ্যাপক Dunning, ইহার Political Theories গ্রন্থ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। ডানিং এই নূতন গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই পুস্তকে ইংরাজ-ইয়াঙ্কির শত-বর্ষব্যাপী রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে এই দুই জাতির ভিতর মনোমালিন্য এক দিনের জন্যও বন্ধ থাকে নাই। বহুবারই যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ডানিং স্বয়ং একথা প্রচারও করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধুয়া এই—"যদিও অমুক অমুক বিষয় লইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গোলযোগ রহিয়াছে, যদিও অমুক অমুক ১৫ ক্ষেত্রে লড়াই বাধ বাধ হইয়াছিল তথাপি বলিতে হইবে আমাদের একশত বৎসর শান্তিতেই কাটিয়াছে। কারণ আমরা যে জ্ঞাতি ও কুটুম্ব। একবার লড়াই করিয়া স্বাধীন হইয়াছি তাহাতে কি হয়? আমরা বন্ধু!"

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

ইন্দ্রাণী ও উজানী *

এই প্রবন্ধ পাঠের কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়গণের "উজানী ও মঙ্গল কোট" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রবন্ধ "সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রবন্ধ কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় নাই, সেইজন্য গৃহস্থে প্রকাশিত হইল।

আমাদের এই "সুজলা সুফলা" বঙ্গভূমি বহুকালের সভ্যদেশ। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশের একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলিত হইল না। বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস লিখিতে হইলে বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার যে সকল প্রাচীন গৌরবস্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতে আরম্ভ হইয়াছে সেই সকলের উদ্ধারের জন্য উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন করিতে হইবে তাই আমরা আজ বর্দ্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী ও উজানীর ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ তথ্যানুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলাম।

আমি সাহিত্য পরিষদের গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে রাঢ়দেশে অবস্থিত শূরনগরের আদিশূর রাজার রাজধানী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে সকলে জানিতে পারিয়াছেন যে, মহারাজ আদিশূর কিছুদিন রাঢ়দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসের উপাদান" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে অবগত হইলাম যে, আদিশূরের পুত্র ভূশূর গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়দেশে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং অনুমান হয় যে, ভূশূরও রাঢ়দেশে অবস্থিত নিজ পৈতৃক রাজধানী শূরনগরে থাকিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন রাঢ়ীয় কুল পঞ্জিকার মতে আদিশূরের পুত্র ভূশূর আদিশূরের জীবদ্দশাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন লিখিত আছে যথা—

"ভূশূরে না দেখি পুত্র আদি নৃপমনি।
নিজ তনয়লক্ষ্মীকে পুত্রিকায় গণি॥"

চির প্রচলিত কিংবদন্তী, প্রাচীন গ্রন্থ, প্রস্তর বা তাম্র ফলকলিপিতে কোদিত লিপি প্রভৃতি আলোচনা করিয়া এবং প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বর্দ্ধমান জেলার ইন্দ্রাণী ও উজানীর ঐতিহাসিক তথ্য যতটুকু পরিজ্ঞাত হইয়াছি তাহাই অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। আশা করি ভবিষ্যতে কোন বিজ্ঞতর প্রত্নতত্ত্ববিদ এই সকল ঐতিহাসিক তথ্যের বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের অঙ্গপুষ্টি করিতে অগ্রসর হইবেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সময় হইতে বর্ত্তমান বৃটিশ রাজত্বকাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশে অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ প্রাচীন জৈন গ্রন্থ

* বর্গীয় পণ্ডিত অধিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয় লিখিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১১ সালের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী অষ্টাদশ বর্ষকাল এই রাঢ়দেশে বাস করিয়া তাঁহার বিমল ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা রাঢ়দেশবাসীগণকে ধর্ম্মমার্গে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাণী এবং উজানী রাঢ়দেশের দুইটী প্রাচীন রাজধানী সুতরাং ইন্দ্রাণী ও উজানীতে যে তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী তাঁহার বিমল ধর্ম্মোপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এই দুই স্থানে বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শনও বিরল নহে। ইন্দ্রাণী ও উজানীর প্রায় প্রতিপল্লীতেই ধর্ম্মরাজের গান এবং মুচী ও ডোম জাতীয় পুরোহিত দ্বারা পূজিত শীতলষষ্ঠীর অস্তিত্ব বৌদ্ধ প্রভাবের শেষ নিদর্শন স্বরূপ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও অনেক চিহ্ন অদ্যাপি এই দুই স্থানে বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা যথাস্থানে তাহা বিবৃত করিব।

কথিত আছে, প্রায় দুই হাজার চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ভাগীরথী তীরস্থিত ইন্দ্রাণী তীর্থে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে একজন ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী ইন্দ্রাণীনগর, কাটোয়ার উত্তরস্থিত শাঁকাই হইতে দাঁইহাটের দক্ষিণস্থিত তাওসিং পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। তাঁহার সুব্যবস্থায় ইন্দ্রাণীনগর এককালে ইন্দ্রালয় তুল্য শোভা সম্পদশালী হইয়াছিল। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা তথায় ইন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন ও হরগৌরীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ভাগীরথী-তীরে "ইন্দ্রেশ্বর ঘাট" নামে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজিও উক্ত ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের ধ্বংসাবশেষ ধর্ম্মকামাত্রেরই হৃদয়ে সেই মহাত্মার অতীত কীর্ত্তি কাহিনী জাগাইয়া দিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি কাটোয়ার ৺কালীদাস কর্ম্মকারের বাটীতে ইন্দ্রেশ্বর ঘাটের শেষ চিহ্ন একখণ্ড প্রস্তর রক্ষিত আছে।

ইন্দ্রাণী নগর যখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল তখন ইন্দ্রাণীর প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীতীরে বাদশঘাট ও ত্রয়োদশ হাটের যথেষ্ট জাঁকজমক ছিল। সেই সময় তথায় বিখ্যাত ইন্দ্রেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর ও শম্ভেশ্বর শিবলিঙ্গের অভ্রভেদী শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে দেশ বিদেশ হইতে কতশত যাত্রী আগমন করিত। বিশেষতঃ সেই সময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইন্দ্রাণী তীর্থে • সুদৃশ্য প্রস্তর মন্দিরে ইন্দ্রেশ্বরী নাম্নী দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেন।

কথিত আছে ভারতবর্ষের বহুস্থান হইতে শত সহস্র নরনারী আসিয়া তথায় মিলিত হইয়া ভক্তিভাবে ইন্দ্রেশ্বরীর পূজার্চ্চনা করিতেন। কালক্রমে ভাগীরথীর স্রোত পরিবর্ত্তনের ফলে সেই শ্রীমন্দির ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সেই মন্দিরের শেষ নিদর্শন একটী প্রস্তরস্তম্ভ অদ্যাপি কাল্না-কাটোয়া রাজপথের পার্শ্বদেশে প্রোথিত আছে। লোকে এক্ষণে সেই স্তম্ভটীকে হনুমানের লাটি বলিয়া থাকে।

ইন্দ্রাণী নগরে পাতাইচণ্ডী, আকাইচণ্ডী ও বুলাইচণ্ডী নামে আরও তিনটী দেবী ছিলেন; এখনও সেই চণ্ডীত্রয়ের অস্তিত্ব

• ইন্দ্রাণী যে স্থানে তপস্যা করিয়া বাসবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন সেই প্রয়াগতুল্যতীর্থের নাম "ইন্দ্রাণী তীর্থ" "ইন্দ্রাণী নামে তীর্থাখ্যাং ইন্দ্রাণী কৃত বাসবং। তপস্তপ্তা পতিং লেভে, সৈব পাতু প্রয়াগবৎ।" (ইতি মহাভারতে বাচস্পত্যে বিশ্বকোষে ৩ঃ)।

বিলুপ্ত হয় নাই। আজ পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণী পরগণার অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—

"বার ঘাট তের হাট তিন চণ্ডী তিনেশ্বর।
ইহা যেই জানে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর॥"

তিনেশ্বর ও তিন চণ্ডীর নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। * এক্ষণে বার ঘাট ও তের হাটের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

দ্বাদশ ঘাট

বারোদুয়ারীর ঘাট।
কালুর ঘাট।
কদম তলার ঘাট।
স্বরূপ পালের ঘাট।
বক্সীর ঘাট।
গনেশ মাতার ঘাট।
শিবের ঘাট।
দেওয়ানের ঘাট।
মনোহারীর বা মালের ঘাট।
বসন্ত বাবুর ঘাট।
ইন্দ্রেশ্বর ঘাট।
শঙ্খেশ্বরীর ঘাট।

ত্রয়োদশ হাট

১। দস্তিহাট বা দাঁইহাট।
২। পাতাই হাট।
৩। বিকি হাট।
৪। মণ্ডল হাট।
৫। খাকাই হাট।
৬। পাহু হাট।
৭। গুড়ে হাট।
৮। ঘোষ হাট।
আতু হাট।
বীরহাট বা বেরা।
নলহাটী।
১২। কৃষ্ণপ্রসূপুর।
১৩। গঞ্জ মুরশিদপুর বা কাটোয়া।

এই সকল হাটের মধ্যে বীর হাটই ইন্দ্রাণীর শ্রেষ্ঠাংশ ছিল। এই স্থানেই ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার রাজধানী ছিল। এক্ষণে তথায় ভগ্নাবশিষ্ট রাজ-প্রাসাদের কয়েক খণ্ড প্রস্তর পতিত থাকিয়া ইন্দ্রাণীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যখন মৌর্য্য বংশের সংস্থাপক প্রবল প্রতাপান্বিত চন্দ্রগুপ্ত কূটনীতি বিশারদ স্বীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী চানক্যের বুদ্ধি কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ সাম্রাজ্য হস্তগত করেন, এবং পাটলী পুত্রের রাজসিংহাসনে বসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন, তখনও ইন্দ্রাণী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থানিস্ অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বঙ্গভূমি তখন স্বতন্ত্র পরাক্রান্ত রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। প্রচলিত ইতিহাসে বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক বঙ্গাধিপতি সিংহবাহুর রাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময়ে কোন স্বতন্ত্র পরাক্রান্ত বঙ্গরাজ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং অনুমান হয় যে, মেগাস্থানিস্ বঙ্গদেশের ইন্দ্রাণী রাজ্যের কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! পরিবর্ত্তন-

* সকল ঘাট ও সকল হাটের প্রাচীন নাম অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই, সেই জন্য ঘাট ও হাটগুলি বর্ত্তমান সময়ে যে নামে পরিচিত তাহাই লিখিত হইল।
কেহ কেহ নলহাটির পরিবর্ত্তে সরয়ূপুরের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

নীল জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মে আজ তাহা অলীক স্বপ্ন কাহিনীর ন্যায় প্রতিভাত। কোন্ সময় হইতে ইন্দ্রাণী রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বোধ হয় অসীম ক্ষমতাশালী ও মহাবল পরাক্রান্ত গুপ্ত রাজাদিগের সময় হইতেই ইন্দ্রাণীর ক্রমশঃ অবনতি আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতেই "বার ঘাট ও তের হাট" ক্রমশঃ ইন্দ্রাণীর অঙ্গচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। অবশেষে কেবল রাজধানী বীরহাটই ইন্দ্রাণী নামে পরিচিত হইল।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বা ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহা পরাক্রমশালী সমুদ্র গুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যখন নিজ ভুজ-বলে আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন সেই সময়ে শতসৌধ পরিশোভিত ইন্দ্রাণী তাঁহার করতল-গত হইয়াছিল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তিনি রাঢ় দেশে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে স্থানের বর্ত্তমান নাম সমুদ্র-গড়।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলীর নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী তীরে অবস্থিত পাকুলিয়া নামক স্থানে প্রায় অর্দ্ধমাইল স্থান ব্যাপী একটী প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, সে স্থান এখন জঙ্গলময় হইয়াছে। পূর্ব্বস্থলী নিবাসী ভারতবিখ্যাত প্রত্নবিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখ অনেকের মুখে শুনিয়াছি, ঐ স্থানে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের একটি রাজধানী ছিল। তথায় অতি সুন্দর প্রস্তরময় একটী শিব মূর্ত্তি আছে। শিবের অঙ্গে একস্থানে "৫ং" শব্দ লিখিত আছে. চিরাগত কিংবদন্তী এই যে ঐ শিব মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এক্ষণে লোকে ঐ শিবকে "বুড়োশিব" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যদি এই কিংবদন্তীর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকে তাহা হইলে ইন্দ্রাণীর প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশধরগণকে শাসনে রাখিবার জন্যই এই রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়. কারণ পাকুলিয়া ইন্দ্রাণী হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

গুপ্ত রাজাদের পর ইন্দ্রাণী, উজানীর রাজা বিক্রম কেশরীর হস্তগত হয়। তৎপরে ইহা পাল বংশীয় ও শূর বংশীয় রাজাদের করতল-গত হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ আদিশূর গৌড়ের একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তৎপরে ইন্দ্রাণী সেন রাজাদের করতলগত হইয়াছিল।

সম্প্রতি কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নৈহাটীতে বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে বল্লাল সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন বংশীয় রাজাগণ সমগ্র রাঢ়দেশে অপ্রতিহত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও ইন্দ্রাণীর প্রাচীন গৌরব এক-বারে বিলুপ্ত হয় নাই কারণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক বৈষ্ণব কবি এবং তৎপরবর্ত্তী অন্যান্য মহাকবিগণের রচিত গ্রন্থাবলীর অনেক স্থানেই ইন্দ্রাণীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব কবি পরমানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে প্রাচীন ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত কাটোয়ার * গৌরব বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে যথা—

* মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের স্থান।

"ধন্য ধন্য কাটোয়া নগরে
কেশব ভারতী যথা।
মহাভারত দ্বিজ শত শত
সপ্তধারা নদী যথা।
সুতার সদন ইষ্টকারচিত
প্রাচীর সুন্দর মঠে।
কূপ তড়াগ সুরঞ্জিত চত্বর
বিরাজিত গঙ্গাতটে।
আম্র পনস গুবাক নারিকেল
চম্পক তাল কদম্বে।
বেল নারেঙ্গ হরীতকী
মন্দার বকুল নিম্বে।
সারীশুক চক্রবাক পারিজাত
মধুর হংস কোকিলে।
মল্লিকা মালতী কেশর কেতকী
মত্ত মধুব্রত মেলে।
সভার মন্দিরে তোরণ কদল
ধ্বজ পতাকা বিচিত্রে।
শঙ্খ মৃদঙ্গ রবাব
চন্দ্রতপাপি বিচিত্রে।
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নিরন্তর
পুষ্পের বাজার পড়ে।
প্রণা পুষ্পোদ্যান বড় রম্যস্থান
দেব দেবালয় গড়ে।
দিবামূর্ত্তি যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদে।
কাটোয়া নগরী যেন সুর পুরী
সর্ব্বসুখ প্রমোদে।
দেব ঋষি মুনি স্নান সুরধুনী
কপট সন্ন্যাস বেশে।
ন্যাসী চক্রবর্ত্তী কেশব ভারতী
পুণ্য শতাবধি দেশে।
ব্রাহ্মণ কুমারী ইন্দ্র বিদ্যাধরী
কাটোয়া নগরী বসে।
রূপ লাবণ্য যত ত্রিজগত মোহিত
বচনে মাণিক্য খসে।
নাহে বাটে হাটে নিরন্তর
স্বস্তিক সিন্দুর লেখা।
ধ্বজ কলস চূতাঙ্কুর পল্লব
দিব্য চন্দ্রাতপ শাখা।
দধি ঘৃত মধু কজ্জল রোচনা
দর্পণ ধান্য রজত।
কাঞ্চন জড়িত রজত চামর
ধূপদীপ শত শত।
পূর্ব্বে ইন্দ্রেশ্বর ঘাট মনোহর
উত্তরে অজয় গঙ্গা,
মধ্যে কাঁটোয়া গুপ্ত বারানসী
নিত্য নবরঙ্গ সঙ্গ।
গোধূলি সময় মৃদঙ্গ শঙ্খ
মধুর ধ্বনি প্রমোদে।
ভূদেব সম্পত্তি দিব্য পরিচ্ছদ
তর্ক সাহিত্য বিনোদে।
গুপ্ত বারাণসী কাঁটোয়া নগরী
দরশনে পাতক খণ্ডে।
শ্রবণে মুক্তি নিত্য শুদ্ধ মতি
মহাপাপ খণ্ডে দণ্ডে দণ্ডে।"

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মঠ ও মন্দির, ঘাট ও বাট, সুখ ও শান্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধি, ধন ও গৌরব একাধারে এককালে তথায় সবই ছিল, কিন্তু কালের সর্ব্বনাশকারিণী শক্তিতে এখন সবই গিয়াছে।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইন্দ্রাণীর

* একণে কাটোয়ার সাতটী নদীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র উত্তরে অজয় এবং পূর্ব্বে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। ইহা ছাড়া মঙ্গল ঘাট, রাজ নগরী, গোঁড় পাড়া, মনগ্রাম, বাঁশবুড়া, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া কাটোয়া পর্য্যন্ত বিষদহ নামে একটী নদী প্রবাহিত ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

গৌরব কেবলমাত্র বীরহাটে সীমাবদ্ধ সেই সময়কার উক্ত রূপ উন্নত কাটোয়ার সহিত তুলনায়ও ইন্দ্রাণী শ্রেষ্ঠ ছিল। যথা :—

শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাঁটোয়া নামে গ্রাম।
যথা আছেন কেশব ভারতী ভক্ত নাম।"

কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী "চণ্ডী" কাব্যের অনেক স্থলে ইন্দ্রাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :—

১। "মণ্ডলঘাট ডাহিনে আছে,
থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখে ইন্দ্রাণী ভুবনে দুর্লভ আনি,
দেব আইসে যাহার সদন।"

২। "ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা বৈল দিয়ে ফুল পাণি।"

৩। "লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয় নদ পাইল ইন্দ্রাণী।"

ভাষা মহাভারত রচয়িতা মহাকবি কাশীরাম দাস মহাশয়ও মহাভারতে লিখিয়াছেন :—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
যাহে তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী।"

শ্রীচৈতন্য দেবের সময়ে কাটোয়ার ন্যায় ইন্দ্রাণীর আকাই হাট ও আতুহাটেও কোন কোন ভক্ত বৈষ্ণবের পাটবাটী ছিল। যথা :—

১। "আকাইহাটে কালা কৃষ্ণদাসের বসতি।
পূর্ব্বেতে লবঙ্গ সখা যার নাম খ্যাতি।"
(পাট পর্য্যটন।)

২। "আতুহাট পূর্ব্বে গঙ্গা চড়ার উপরে।
এক মনোহর বটবৃক্ষ শোভা করে।
তাহার তলেতে বসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বিষ্ণুদাসে প্রেমদানে করিলেন ধন্য।"*
(বিষ্ণুদাস রচিত।)

ইন্দ্রাণীর রাজধানী বীরহাটে "তারা রূপ মাতে দিগম্বরী নাচ গো মা।"

গীত রচয়িতা বিখ্যাত শক্তি সাধক রামানন্দ পঞ্চমুণ্ডাসনে বসিয়া নরমুণ্ডধারিণী কালীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তথায় রামানন্দের পঞ্চমুণ্ড-বেদিকা বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান ভূপতিগণের রাজত্বকালেও ইন্দ্রাণীর বক্ষে অনেক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। ১২৭২ খৃঃ প্রবল পরাক্রান্ত আহাম্মার সাহাকে পরাজিত করিয়া ফারকশিয়ার দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালার দেওয়ান মুরশিদ কুলি জাফর খাঁ সুবে বাঙ্গালার দেওয়ান ও নায়েব নাজিম ছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে ইন্দ্রাণীর ত্রয়োদশ হাটের মধ্যে প্রধান হাট কাটোয়া মুরশিদপুর নামে পরিচিত হয়। আহাম্মার সাহের পরাজয়ের পর তাঁহার উজীর সৈয়দ নাহা আলম খাঁ বাহাদুর দিল্লী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কাটোয়া বা গঙ্গ মুরশিদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ১২২৭ হিজরি সালে (খৃঃ ১৭১৫) একটী সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মালোচনায় জীবন অতি-

* এই বিষ্ণুদাসই মহাপ্রভুর মস্তক মুণ্ডনকারী ক্ষৌরকার। ইনিই বঙ্গের মধুবাসিত বা মরমা জাতীর আদি পুরুষ। ইনি অনন্তের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে কালাবর এবং লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে হরিদাস নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বাহির করেন। ঐ মস্‌জিদ্ সংলগ্ন প্রস্তর ফলকে আরবি ভাষায় নিম্নলিখিত কথা কএকটী খোদিত আছে :—• "ইস্মল মস্‌জিদ। ফি ইস্মল ফা কানিল আজমে ফি সুলতানিল আকরা মিল।

আম্‌রাজে মহম্মদ ফরয়োখ শেয়র পাদশা গাজি খয়রাল্লাহো আলা মলুক হোঁ আসলতানা তাঁহো মিনেল মহরমে সৈয়দ সাহা আলম খাঁ বাহাদুর।

আলফা মেয়াতাসব—আ-ইশ-রিণ ১০০০ + ১০০ + ১ × ১ + ১১২ = ২০ হিজরি।"

বর্গীর হাঙ্গামার সময় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ গঙ্গা মুরশিদপুর বা কাটোয়ায় তাহাদের ছাউনী স্থাপন করিয়াছিল। তৎপরে নবাব আলিবর্দী খাঁ বহু কষ্টে বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণ করিয়া কাটোয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের অধিবাসীগণের ধন প্রাণ রক্ষা করেন। ঐ সময়ে কাটোয়ায় মুসলমানদিগের একটী দুর্গও ছিল। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ্যের সংস্থাপক লর্ড ক্লাইব গঙ্গা পার হইয়া পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে গমনের মন্ত্রণা স্থির করিবার জন্য কাটোয়ার উক্ত দুর্গে অবস্থান করিয়াছিলেন, একথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সময় হইতে ইংরাজ রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণীতে এরূপ অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, যাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য।

(ক্রমশঃ)

বর্ত্তমান বঙ্গের পল্লী-সমাজ

বিরাট বিশ্ব-প্রকৃতি আলোচনা করিলে স্বতঃই প্রতিভাত হয় এই বিশ্বযন্ত্র প্রতিনিয়ত কিরূপ সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে। প্রতীতি হয় যেন কোন এক মহাপ্রাণের অঙ্গুলী সঙ্কেতে জগতের ক্রিয়া প্রক্রিয়া অপ্রতিহত গতিতে চলিতেছে। ঐ ঊর্দ্ধে আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়, দেখিতে পাই অসংখ্য নক্ষত্রমালা যেন এক-সূত্রে বাঁধা, এক প্রাণের আকর্ষণে মনের আনন্দে যেন গলিয়া গলিয়া হাসিতেছে; তাহাদের শুভ্র সুন্দর আনন নিচয় যেন কখনও কোনও মলিনতা স্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই। প্রাকৃতিক নক্ষত্রসমাজ বাস্তবিকই হৃদয়ে সুগভীর ভক্তি জাগাইয়া তুলে।

পুনরায় যখন আমরা দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভূতলে পর্য্যবেক্ষণ করি, যখন আমরা নয়ন ভরিয়া জলধির তরঙ্গ-লীলা প্রত্যক্ষ করি, উৎকর্ণ হইয়া নিকুঞ্জ-বিহারী বিহঙ্গের মধুর প্রভাতী কূজন শ্রবণ করি, যখন আমরা উদ্যানস্থ কুসুমপুঞ্জের হাসির লহরী অথবা অটবী-রাজ্যে বিটপী-শ্রেণীর মধুর সন্নিবেশ তৃপ্তির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করি তখনই উহা প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনিত হয় যে বাস্তবিক যেখানে বহুত্বের অন্তস্তলে একত্ব প্রকৃষ্টরূপে বিরাজমান তাহাই সুন্দর, তাহাই মধুর; কারণ তাহাতেই প্রকৃত বিরাট পুরুষের স্নিগ্ধ সুশীতল প্রেমের স্রোত নীরবে নীরবে প্রবাহিত !! অরণ্যের একটীমাত্র বৃক্ষ, সমুদ্রের একটী মাত্র তরঙ্গ, আকাশের একটী মাত্র

• শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত "কাটোয়ার ইতিহাস" প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

নক্ষত্র লইয়া যখন আমরা চিন্তা করি তখন উহাতে সৌন্দর্য্য নাই, উহাতে প্রাণ নাই, শক্তি নাই, নাই বলিতে যেন কিছুই নাই। কিন্তু যখন ইহাদের মধুর সমবায়—বিস্তীর্ণ হরিত ক্ষেত্র, সুনীল সুবিশাল সমুদ্র ও অসংখ্য তারকাবলী-খচিত বিশ্বস্তর-প্রসারী আকাশ,—প্রত্যক্ষ করি তখন মনে হয়, বাস্তবিক সমাজই দেশের প্রাণ, সমাজই সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের উৎস, প্রকৃত সমাজই আনন্দের রম্য নিকেতন অথবা সমাজই ঈশ্বরের প্রেমচালা চির শান্তিময় নন্দনকানন !!

এইরূপে আমাদের দেশও কতকগুলি পল্লীগ্রামের সমবায়। সুতরাং পল্লীসমাজই দেশের ভিত্তি অথবা জীবনীশক্তি। পল্লীসমাজ একই মন্ত্রে উজ্জীবিত, এক ইঙ্গিতে নিয়মিত, একই নিয়মে নিয়মিত হইলে দেশটীও জগদ্বাসীকে স্বীয় উন্নতি-মাধুর্য্যে বিমোহিত করিতে পারে; অজস্র মুখে দেশের সৌরবধ্বনি বিঘোষিত হয় এবং মঙ্গলময় ভগবানের আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য উপভোগ করিয়া প্রজানিচয়ের মন প্রাণ পবিত্র ও আমোদিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হয়, সমাজের উদ্দেশ্য এস্থলে ব্যর্থপ্রায়। কারণ এস্থলে সমাজ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া কোনও স্থানে এক ব্যক্তিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং যে স্থলে প্রাণের এত বৈষম্য সেখানে সামাজিক উন্নতি অবশ্য কষ্ট-কল্পিত সন্দেহ নাই।

বিপুল বিশ্বরাজ্যে বঙ্গদেশ উর্ব্বরতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এজন্যই এই সময়েও একটী প্রবাদ পৃথিবীর অপরিজ্ঞাত পল্লীতেও বোধ হয় প্রচলিত আছে যে "বাংলাদেশ সোনার রাজ্য"। এই উর্ব্বরতার লোভে আকৃষ্ট হইয়া, এই বঙ্গের সম্পদ্ ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া কত বৈদেশিক জাতি ভারতে সমবানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। ভূমির উর্ব্বরতার সুবিধালাভ করিয়াই অধিকাংশ বঙ্গবাসী পল্লী-গ্রামে নিরুপদ্রবে কালাতিপাত করিতেছে। সুতরাং পল্লীসমাজ বঙ্গসমাজের মূলস্বরূপ।

এক্ষণে বঙ্গদেশের অবস্থা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে বঙ্গের লোকালয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে ও তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের সূক্ষ্মদৃষ্টি গ্রহণ করিতে হইবে। বঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা সম্পদ্ অতুলনীয়, বঙ্গভূমির উর্ব্বরতা কেবল ভূমিতেই পর্য্যাপ্ত নহে, বঙ্গীয় ফল জল সম্ভোগে বঙ্গাধিবাসীর মস্তিষ্কও তদনুরূপ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক, বাঙ্গালীর বুদ্ধি, বাঙ্গালীর বীর্য্য, বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য তখনও ছিল এখনও আছে; তবে তাহা ব্যবহার অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে—যেমন "পৃথিবী গর্ভে অগ্নি"। বাঙ্গালীর সেই মানসিক বল, সেই শারীর শক্তি এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহাও সৎকর্ম্ম প্রবুদ্ধ নহে। বাঙ্গালীর তেজঃ আছে, বীর্য্য আছে; কিন্তু তাহা আপনার অমঙ্গলের জন্য। বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, তাহা কাম ক্রোধাদি রিপুনিচয়ের দাসত্বের জন্য কিন্তু তাহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য নহে। বাঙ্গালীর ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু তাহা স্বার্থ-পরতার সেবার জন্য—পরদুঃখ দূরীকরণের নিমিত্ত নহে। বাঙ্গালীর প্রীতি স্নেহ মমতা আছে, কিন্তু পরাক্রমশালীর জন্য; আর্ত্তের দুর্ব্বলের পীড়িতের বা দুঃখিতের নিমিত্ত নহে। ফলতঃ বাঙ্গালীর হৃদয়ের গুণরাজি এক্ষণে নিম্নাভিমুখে পরিচালিত। এক্ষণে যেন সেই পৌরাণিক স্বর্গীয় ভাবের ছায়াটী পর্য্যন্তও বাঙ্গালী-হৃদয় হইতে বিদায় লইতে চলিয়াছে।

জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী বঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বঙ্গবাসী অধিকাংশ স্থলে স্বাস্থ্যহীন। তবে সাধারণতঃ কৃষক সম্প্রদায় ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণ প্রায়ই সুস্থ ও সবল হয়। কিন্তু অফিসের কর্ম্মচারী, বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই স্বাস্থ্যহীনতার আভাস অতিরিক্ত মাত্রায় লাভ করা যায়। ছাত্রবর্গ পাঠের সময়াভাবে অঙ্গ চালনা করিবে না, নিয়মিত আহার করিবে না, কারণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে কিছু পাঠ করিতে পারিবে। আবার কেহ কেহ আলস্য হেতু অকালে স্বাস্থ্যরত্ন বিনষ্ট করে। অফিসের কর্ম্মচারী ও ধনী সম্প্রদায় অপরিমিত পান ভোজনেই আপনাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া নানাবিধ পীড়া ভোগ করিয়া থাকে। ফলতঃ ভূমণ্ডলে এমন বৈভবপূর্ণ দেশ দারিদ্র্যাঙ্কিত হইতে দৃষ্ট হয় নাই। কত অসংখ্য কাঙ্গাল রাজপথ প্রান্তে হাহাকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। কিন্তু কে তাহাদের প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে? কে তাহাদের ক্ষুধাতুর ও পিপাসাতুর কণ্ঠে সামান্য পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় তুলিয়া দিবে?

বঙ্গবাসী অল্পায়াস লভ্য জীবিকার প্রভাবে ও পাশ্চাত্যজগতের অনুকরণে এতই পটু হইয়া উঠিয়াছে যে বিলাসপরায়ণতা ও আলস্যপরায়ণতা প্রভৃতি দৌর্ব্বল্য একে একে সকলই তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাহাদের জলপূর্ণ দীঘিকা আছে, সুবৃহৎ জলাশয় আছে, কিন্তু তাহাতে পানীয় জলের সম্পূর্ণ অভাব। নিজের অবহেলা বশতঃ তাহারা পুষ্করিণীর জল দূষিত ও দুর্গন্ধময় করিয়া তোলে। পলিত লতাপাতা মূত্রপুরিষ ও অন্যান্য আবর্জ্জনাদির সংমিশ্রনে অসংখ্য কীটানুকীটের প্রিয় আবাস স্থল হইয়া জল ধ্বংসের নিদান হয়। ওলাউঠা বা কলেরা ও বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সাধারণতঃ এইরূপ স্থলেই প্রাদুর্ভূত হয় এবং অসংখ্য মানব উদরসাৎ করে।

অধিকাংশ পল্লীতেই রাস্তাঘাটের সুবন্দোবস্ত নাই। কোন কোন স্থলে বর্ষাকালেত কথাই নাই গ্রীষ্মকালেও একহাঁটু জল কর্দ্দম অতিক্রম করিতে হয়। পথ-পার্শ্বস্থ বৃক্ষের পত্রাদি গলিত হইয়া বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই উহা নিকৃষ্ট অবস্থায় পতিত থাকে। বায়ু দূষিত হয়। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ অচিরে অসংখ্য লোকের মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইহাতেই সামাজিক ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত বৈষম্য স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে। তাহারা পরস্পরের উপর নির্ভর করিয়া, হিংসা, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপে অলক্ষিত ভাবে আপনাদের পদে আপনারাই যে কুঠার ক্ষেপ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা অনুভব করিতে যেন সক্ষম নহে। তাহারা সমস্ত বৎসর রোগ-শয্যায় শয়ন করিয়া রোগ-নিপীড়ন আস্বাদন করিবে, প্রতিমাসে আপনার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থভাণ্ডার শূন্য করিয়া ডাক্তার কবিরাজের পকেট পূর্ত্তির বন্দোবস্ত করিবে, যমের হস্তে আপনাদের হৃদয়-নন্দন সোহাগ-পুত্তলী সন্তান সন্ততিগণকে তুলিয়া দিবে তবুও সামান্য প্রয়াস স্বীকার করিয়া জীবন রক্ষার বিঘ্নাদি সমূলে উৎপাটিত করিবে না।

পুরাতন ভাব, পুরাতন রুচি সকলই দেশ হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গদেশেও যতটী বিদ্যালয় ছিল না, এক্ষণে

প্রত্যেক জেলাতেই স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্ন পাঠশালাদিতে শিক্ষিত লোকের অভাব প্রায়ই কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বে যে গ্রামে একজন শিক্ষিত লোকও দৃষ্ট হইত না এক্ষণে সেই পল্লী হইতে কত যুবকই না শিক্ষার চেহারা লইয়া লোক-চক্ষুতে বিদ্যার রঙ্ ফলাইতেছে। পূর্ব্বে গুরুমহাশয়ের একচালাতে অথবা বট অশ্বত্থ প্রভৃতি শাখা-পল্লব-বিশিষ্ট ছায়া-বহুল বৃক্ষ-তলে উপবেশন করিয়াই ছাত্রগণ পরম আনন্দে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া বিদ্যার্জ্জনা করিত, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে বাহ্যিক আড়ম্বর পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে, এক্ষণে নয়ন রঞ্জনিত হর্ম্মতলে উপবেশন না করিলে পাঠে ছাত্রের মনোযোগই আকৃষ্ট হয় না। সুতরাং বেঞ্চ, টেবল প্রভৃতি অন্যান্য সরঞ্জাম-পত্রে এক্ষণে পাঠগৃহ পরিপূর্ণ। কোন স্থলে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের বায়ু-সঞ্চালন। এরূপে নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুতে কত আড়ম্বর যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। সেই সময়ে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আভরণে অলঙ্কৃত করিত। তখন ছাত্রদের উদ্দেশ্যই ছিল ভিন্ন ধরণের। পবিত্রতা ছিল তাহাদের সাধনার চরমলক্ষ্য, ভগবৎপ্রেম ছিল তাহাদের সুখের সার উপাদান, কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদন ছিল অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও পরম তৃপ্তির বস্তু। কিন্তু হায় সেদিন গিয়াছে; এক্ষণে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই, বিদ্যালয় আছে কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানলাভে অনুরাগ নাই, ভক্তি নাই, ব্রতসাধনে দৃঢ়তা নাই। কোথায় সেই হিন্দুদের ব্রহ্মচর্য্য। সেই নির্ম্মল পবিত্র জীবন! সেই জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি শিক্ষা-নিরত ছাত্রদল! গিয়াছে; সেই ব্রহ্মচর্য্য, সেই গার্হস্থ্য সেই বাণপ্রস্থ সকলই একে একে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ছায়াটী মাত্র যেন পরিলক্ষিত হয় না। এক্ষণে লোকের ধ্যানের বস্তু জ্ঞান নহে, পৃথিবীর সুবর্ণরাশি, তপস্যার ধন এজগতের সম্পদ্‌ভাণ্ডার, স্বকীয় আধিপত্য—স্বকীয় প্রতিপত্তি।

এক্ষণে বলিতে হ'লে মানুষ নিজের গৌরব, নিজের সুখ সম্ভোগে আত্মহারা হইয়া ধর্ম্মনীতি জলাঞ্জলি দিয়াছে। আপন তৃপ্তির অনুরোধে—আপনার লালসার আহুতি প্রদান করিবার নিমিত্ত আজ বঙ্গ সন্তানকেও পৃথিবীর মত সমুদয় বিস্তৃত হইতে হইতেছে! বলিতে কি যিনি এই বিপুল সৌন্দর্য্যের আধার, পরম সৌন্দর্য্যসাগর, যিনি অসংখ্য প্রাণীর সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহার অপার করুণায়, যাঁহার অতুল প্রেমে জগৎ পরিচালিত, এক কথায় যিনি এই জগদ্‌যন্ত্রের যন্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত বিরাট পুরুষ, সেইরূপ প্রাণের সাগর ও সেইরূপ প্রেমের সাগরকেও এক্ষণে বঙ্গের মানুষ একটীবার হৃদয়ের কোণে স্থান দিতে ইচ্ছুক নহে। বিজ্ঞান-জগতের প্রভাব বাঙ্গালী হৃদয়ও এতদূর বিমোহিত। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রাচুর্য্য জগতে কি দুর্দ্দিনই না আনয়ন করিয়াছে!

এক্ষণে মানুষের আর সেই বিশ্বাস নাই, সেই সহানুভূতি নাই। মানুষ পূর্ব্বে পুস্তকের প্রতি অক্ষরে, গুরু মহাশয়ের প্রতি উপদেশ-বাক্যে অক্ষয় রত্নভাণ্ডার দর্শন করিত এবং অনুশীলন প্রভাবে ঐ সমুদয় আয়ত্ত করিয়া হৃদয়কে ধর্ম্মনীতির উর্ব্বরতায় সারবান অথবা জ্ঞানের কিরণনিচয়ে আলোকিত করিত। কিন্তু এক্ষণে মানুষ কিসে অপরের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া আপন ধনকোষ পূর্ণ করিবে, অপরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া স্বীয় পূর্ণ

উদর পূর্ণতর করিবে তাহার ছলনা অন্বেষণেই নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। এক্ষণে পরের দুঃখে মানুষের হৃদয় কাঁদিয়া উঠে না, পতিতকে দেখিয়া উত্তোলনার্থ মানুষের হস্ত প্রসারিত হয় না, ক্ষুধিতের মুখে এক মুষ্টি অন্ন তুলিয়া দিতে তাহাদের প্রাণ-দেবতার কিরূপ বিরক্তিব্যঞ্জক নাসাকুঞ্চন।

এই বঙ্গদেশ—এই পুণ্যপূত বঙ্গভূমির মুখ একদিন জ্ঞান গরিমায় সমুজ্জ্বল ছিল; কিন্তু জ্ঞানদেবীর আসন টলিয়াছে। অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গবাসী পশ্চিমের চাকচিক্যে বিমোহিত হইয়াছে এবং আপাতরম্য বস্তুনিচয়ে হৃদয় সমর্পণ করিয়া দুর্লভ মানব জন্মকে অকাতরে অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারেই অমঙ্গলের করে উৎসর্গ করিতে যাইতেছে। প্রকৃত নীতিশিক্ষার অভাবই ইহার প্রধানতম কারণ। কারণ ব্যক্তিবিশেষ ধর্মনীতিতে হৃদয় সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইলে অতুল-পরাক্রম দুনিবার বিরুদ্ধ-প্রভাবও তাহা বিচলিত করিতে পারে না। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে স্ত্রী-শিক্ষার অভাবই নীতিশিক্ষাভাবের অন্যতম কারণ। কারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ; 'জ্ঞান' অর্থ জানা, বিদ্যালয়ে ইহারই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় যে বালক বা ছাত্রগণ কোনও নির্দিষ্ট বিষয় জানে কিনা। কিন্তু জানা ও করা দুইই বিদ্যালয়ে হয় না। যথা "মিথ্যা-কথা মহাপাপ" কথাটী ছাত্র সুন্দররূপে জানিল ও মুখস্থ রাখিল। কিন্তু কথা বলিবার সময় শতকরা নিরানব্বইটী মিথ্যা বলিল। ইহাতে প্রকৃত কোনও উপকারই হইল না। উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে হইলে চিত্তকেও উপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত করিতে হইবে। ক্ষেত্র সুচারুরূপে কর্ষণ না করিয়া বীজ বপন করিলে ফললাভের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং গৃহই আমাদের নীতি-শিক্ষালাভের প্রকৃত বিদ্যামন্দির। এ বিষয়ে মাতাই আমাদের যথার্থ শিক্ষয়িত্রী।

ফলতঃ যতদিন বঙ্গমহিলা অজ্ঞান-অবগুণ্ঠনে তাহাদের আনন আবৃত করিয়া রাখিবে ততদিন বঙ্গে মঙ্গলের আশা সুদূর পরাহত। বঙ্গবাসী যেরূপ অসংযতেন্দ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, যেরূপে ফণীহারকে মণিহার বলিয়া গলদেশে ধারণ করিতেছে এরূপ সময়ে বিদুষী বঙ্গজননী ব্যতীত অন্য কেহ এই দুনিবার স্রোতের পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কারণ আমরা যতই করিতে প্রয়াস পাই না কেন অন্তর্জগতে প্রবলতা লাভ করিতে না পারিলে বহির্জগতের অপ্রতিহত গতির সমক্ষে বালির বাঁধ মুহূর্ত্তে বিনষ্ট হইবে। সুতরাং স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সহজবোধ্য তাহা নিঃসন্দেহ।

আমরা সমাজ-সংস্কারার্থ যতই উপায় অবলম্বন করি না কেন, যতই বিভিন্ন সম্প্রদায় করি না কেন, যতই স্কুল কলেজ স্থাপন, রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ, জলাশয়াদি খনন, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি রোধ, বিধবা-বিবাহ প্রচলন, পণপ্রথা নিবারণ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন এবং অন্যান্য বহুবিধ মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যতই করি না কেন, তাহা নিষ্ফলতায় সমাপ্ত হইবে। অন্তর্জগত নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হইলে তবে বাহ্যিক কর্ম্মের সাফল্য লক্ষিত হইবে। সুশিক্ষিতা বঙ্গজননীই এস্থলে একমাত্র ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে।

ইহা বোধ হয় স্বীকার্য্য যে মানুষ মনুষ্যত্ব-হীন হইয়া জীবজগতে জন্মগ্রহণ করে না। মানুষের যাহা যাহা থাকা প্রয়োজনীয় শিশুর নিকট সে সমস্তই থাকে। তখন তাহার

আত্মা শুদ্ধ, মন পবিত্র, শরীর হৃষ্টপুষ্ট, যেন দেহ হইতে কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য, অতুল মাধুর্য্য অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা চারিদিকে খসিয়া পড়িতেছে। এমন শিশু, ভগবানের সোহাগসুধাসিক্ত এমন প্রেমনিধি কেন বয়োপ্রাপ্ত হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়া উঠে? ইহার কারণ একমাত্র মাতৃস্পর্শী নহে। জননীকেও বা শুধু সেই অপরাধ-ভাগিনী করিব কেন? বঙ্গজননী কোথায় এই অস্বাভাবিক ভাবগ্রহণ করিয়াছেন? সেই পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বের প্রাচীনা হিন্দু রমণী বর্ত্তমান সভ্যতা-বিলাসিনীর ন্যায় ছিলেন? তবে এই অন্তঃপুর-নিবদ্ধা রমণী-হৃদয়ে কে এই কালিমা লেপিয়া দিয়াছে এবং অকুণ্ঠিত-চিত্তে পুত্র স্নেহময়ী কলঙ্কহীনা জননীগণকে এরূপ দোষভারে প্রপীড়িতা করিয়া আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে? সেই ত বঙ্গের শিক্ষিত সভ্যপুরুষ!! সেই ত কামিনী-কুলকে দূষিত করিয়া বঙ্গসমাজের এই দুর্গতি-কার্য্য অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে। মাতা পিতার দোষ গুণরাশিই সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হয়। বঙ্গসন্তান যে মাতাপিতার দুর্ব্বলতায়ই স্বভাবতঃ শক্তিহীন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কতিপয় সূক্ষ্মদর্শী বঙ্গবীরের চক্ষে দেশের এই মহান অভাব অনুভূত হইয়াছিল এবং তাঁহাদেরই উদ্যমে বঙ্গে কতিপয় স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু হায়! কয়টী পূর্ণশিক্ষিতা রমণী ঐ সমুদয় বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃত হইয়া বঙ্গের গৃহ আলোকিত করিয়াছে? কৈ তাহাদের স্ত্রীসুলভ বিলাসহীনতা ভক্তিপরায়ণতা ও আত্মসুখ-বিমুখতা? কৈ সে বঙ্গবালার নীতি-সুগঠিত হৃদয়? কৈ বা তাহাদের আত্ম-সংযম? স্ত্রীশিক্ষা তাহাদিগকে নভেল পড়িতে শিখাইয়াছে, গৃহকর্ম্মে অপ্রিয়তা, বৃথা আড়ম্বর শিখাইয়াছে। বসনভূষণ ও নূতনত্ব বৈচিত্র্যের প্রতি তাহার অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছে। শিক্ষা তাহাদিগকে গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সঙ্গীতের সুর টানিতে অথবা হার-মোনিয়মাদি বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে শিখাই-য়াছে। শিক্ষা তাহাদিগকে গৃহে বসিয়া দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করিতে, সুবাসিত তৈলে কেশ-বিন্যাস করিতে ও গুরুজনের সহিত বিদ্যার গৌরব প্রদর্শনপূর্ব্বক কলহ করিতে শিখাইয়াছে। হায়! বঙ্গরমণী, তুমি একদিন এই বঙ্গেরই "গৃহলক্ষ্মী" ছিলে। এক্ষণে তোমার সুকুমার বৃত্তিসঙ্কুচিত সুকোমল হৃদয়ও বিলুপ্তভাবে পুরুষবৎ কঠোর করিয়া তুলিয়াছে। তোমাকে লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে পুন-রায় অলক্ষ্মী বলিতে হইল। কিন্তু বঙ্গরমণী মাত্রেই যে অন্তঃসারহীন হইয়াছে তাহা নহে; তবে সেইরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। দুইবিন্দু বিশুদ্ধ বারিকণা বিশাল জলধির লবণত্ব বিনষ্ট করিবে, স্বপ্নেও অবি-শ্বাস্য। সুতরাং বঙ্গের শিক্ষাস্রোত ফিরা-ইতে হইবে; যাহাতে নব্য সভ্যতার স্রোতে বঙ্গরমণী বিলাসোন্মাদিনী না হইয়া যথার্থ রমণীজনোচিত গুণরত্নরাশিতে ভূষিতা হয় তাহার বিধান করিতে হইবে, অন্যথা সর্ব্ব-প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। কারণ সমাজের "মূলে গৃহ, গৃহের মূলে রমণী, এবং সেই রমণীই এক্ষণে মতিভ্রষ্টা।" বঙ্গের শিক্ষার চিত্র নারীকুলে এইরূপই হইল। পুরুষমণ্ডলে তদপেক্ষা হীনতর। শিক্ষা বহির্ম্মুখিনী হইয়া শুধু বহির্ভাগেতেই চক্ষুর বিকাশ করিতেছে। এবং অন্তর্জ্জগৎ ক্রমে মলিন ও মলিনতর হইয়া সমাজের জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতে চলিয়াছে। জলাধারের পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জিত

হইলে জল বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। অন্তর্দেশে ময়লা সঞ্চিত হইয়া জল দূষিত ও প্রাণহানিকর হয়। সুতরাং বহির্ভাগ মার্জ্জনা না করিলেও তত ক্ষতি হয় না। কিন্তু অন্তর্ভাগ পরিষ্কৃত করিতেই হইবে, নতুবা জীবন বিপদগ্রস্ত হইবে নিঃসন্দেহ। এজন্যই আমাদিগকে বহির্ভাগ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অন্তর্ভাগের প্রতি দৃকপাত করিতে হইবে। তাহা হইলে শিক্ষার সফলতা অচিরে দৃষ্ট হইবে। নতুবা স্কুল কলেজে দেশ পরিপূর্ণ করিলে অথবা সহস্র সহস্র ছাত্রের শিক্ষাপ্রদানে অজস্র স্রোতে অর্থ ও সময় ব্যয় করিলে তাহাতে কোন সফলতার আশা সম্পূর্ণ বৃথা।

অতএব হে স্বদেশ প্রেমিক, হে স্বদেশ আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপী জ্ঞানার্থী বঙ্গ-সন্তান, তোমরা যদি আপন উন্নতির অভিলাষ কর, তোমরা যদি আপন দেশের ও আপনা-দের জ্ঞানগৌরবের প্রয়াসী হইয়া থাক, যদি তোমাদের প্রকৃত জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করিবার বাসনা থাকে তবে বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হইও না, অন্তর্দৃষ্টি সহকারে প্রাণপণে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া বঙ্গের গৃহে গৃহে উচ্চ আদর্শ ধারণ কর; যতদিন তোমা দের অন্তর্জগত আলোকিত হইয়া না উঠিবে ততদিন অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টাতেও মঙ্গলের আশা করিও না। একবার স্থিরনেত্রে দেশের দুর্দ্দশা ভাবিয়া দেখ; যদি প্রকৃত প্রেমিক হও, যদি প্রকৃত উন্নতির সাধক হও, যদি প্রাচীন বঙ্গবাসীদের পূর্ণ হৃদয়ের বিন্দুবৎ শোণিতেরও উত্তরাধিকারী হইয়া থাক তবে দেশের এই দারুণ অবস্থায় তোমাদের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিবে; দেশের জন্য, জাতির জন্য, সমাজের জন্য, মানুষের জন্য অথবা এক কথায় বিরাট বিশ্বপুরুষের জন্য তোমাদের হৃদয় প্রসারিত হইবে; এবং উন্মাদ প্রেমের উদ্বোধনে পাগল হইয়া সমস্ত দেশকে এক বিরাট পুরুষরূপে দেখিতে পাইবে এবং দেশের প্রাণে আপনার ক্ষুদ্র প্রাণটীও ঢালিয়া দিবার নিমিত্ত উধাও হইবে। এই হেতুই পুনঃ পুনঃ উক্ত হইতেছে যে "পূর্ব্বে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন কর"। মনুষ্যত্বই ব্যক্তিগত, জাতিগত অথবা বিশ্বগত উন্নতির একমাত্র সুগম ও সুনিশ্চিত পন্থা।

হে বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়, মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিণত হইতে আর বিলম্ব নাই; তোমরা বদ্ধপরিকর হইয়া দেশকে পুনরায় মনুষ্যত্বের রাজ্যে উত্তোলন কর। বাহ্যিক মোহে বিমোহিত না হইয়া সেবাব্রত অবলম্বন করিতে হইবে। আত্ম-সম্ভোগে নিরত না হইয়া পরের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহা দেওয়া নহে, ইহাই পাওয়া; যতদিন আমাদের জীবন বিশিষ্টরূপে আমাদেরই সুখ সম্ভোগে অর্থাৎ দেহে সীমাবদ্ধ থাকিবে তত-দিন আমাদিগকে জীবিত বলিব কি? আত্মা অসীম, সসীম নহে; ইহা পরের প্রাণে আপ-নার প্রাণ মিলিত করিয়া এক হইয়া থাকিবে, ইহাইত আত্মার স্বভাব। তবে যেদিন আমাদের সেই হৃদয়ের বা প্রাণের একতা লাভ ঘটিবে সে দিনই আমাদের জন্ম; নতুবা আমরা চিরদিনই মৃত। অতএব আমাদিগকে মুখে বক্তৃতা করিলে চলিবে না, বাৎসরিক সম্মিলনীতে অন্যান্য দেশের অদ্ভুত ব্যাপারের কাহিনী প্রকাশ করিলে চলিবে না অথবা নানাবিধ প্রস্তাবের তুফান তুলিলে ও সভা-পতি মহাশয়ের অভিভাষণ-পুস্তিকা বিতরণ করিলে সমস্ত ব্যয় ঘুমে নিঃশেষিত হইবে। "বাঙ্গালী মুখে দড়" এই অপবাদ আমাদিগকে

ঘুচাইতে হইবে। নিজে করিতে হইবে এবং নিজের কৃতকার্য্যতা অন্য বাঙ্গালীর চক্ষের উপর ধারণ করিতে হইবে। অতঃপর বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আপন পথানুসারী করিতে হইবে। তাহা হইলেই সভাসমিতির উদ্দেশ্য সার্থক হইতে পারে। এজন্যই আপনি কৃষিকর্ম্ম করিয়া প্রতিগৃহে কৃষিবিদ্যা প্রচার কর; "বাঙ্গালার মাটীতে আবার সোণা ফলিয়া উঠুক"। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের হস্তেই সমাজ; তাহারা সমাজকে ভাঙ্গিতে, গড়িতে অথবা ইচ্ছানুরূপ ছাঁচ ঢালাইতে পারে। কারণ শিক্ষিতসমাজ দেশকে যেরূপ ভাব প্রদর্শন করিবে দেশও তদ্রূপ অনুকরণ করিবে —"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"। বঙ্গে বর্ত্তমান জড়ত্বের প্রভাবও শিক্ষিতসমাজ কর্ত্তৃক আনীত। অতএব আমাদিগকে স্বয়ং প্রত্যেক স্বদেশ-হিতকর কর্ম্মে ব্রতী হইয়া হতাদর কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির প্রকৃত মর্য্যাদাজ্ঞান পুনরায় বঙ্গহৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে হইবে।

সর্ব্বোপরি সমাজে সংযম-শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। লোক যেরূপে নিয়মিত জীবনযাপনক্ষম হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু "উচিত" বলিলে হইবে না সভাসমিতিতে সাধারণতঃ 'উচিতে'ই কার্য্য সমাপ্ত হয়। সেখানে শুধু প্রতি বক্তার কণ্ঠে, এমন কি প্রতি বাক্যেই 'উচিত' 'কর্ত্তব্য' অথবা 'বিধেয়' ও তদ্বোধক কোন না কোনও শব্দ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে কে অগ্রসর হইবে? তখন "Who is to bell the cat?"

সুতরাং যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠানে শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে অগ্রণী হইতে হইবে। দুঃসময়ের উপায় স্বরূপ গ্রামে গ্রামে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া লোককে সঞ্চয়শীল করিতে হইবে। প্রতি গ্রামের যাতায়াতের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও সংস্কার এবং স্বাস্থ্য-মঙ্গলকর বিশুদ্ধ জলাধার প্রভৃতি খনন করিয়া লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিকাশসাধন করিতে হইবে। শিক্ষার্থ স্থানে স্থানে নীতি পুস্তকাগার স্থাপন করিয়া লোকের সৎকার্য্য-প্রবৃত্তি আনয়ন করিতে হইবে। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে অধঃপতিত বঙ্গ আর উঠিবে না। এজন্য শৈশব হইতে বালক বালিকাগণ যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয় তাহার সুবিধান করাই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

মানব জীবনের ভিত্তি শৈশব কাল। শৈশব কালই শিক্ষালাভের প্রকৃত সময়। এই সময়ে শিশুর সুকুমার চিত্তকে ইচ্ছানুরূপ গঠন দেওয়া যাইতে পারে। "Child shows the man as morning shows the day". শিশুই ভাবী বঙ্গীয় যুবক। সুতরাং শিশুশিক্ষার আবশ্যকতা অনির্ব্বচনীয়। এস্থলে আমরা সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিব। "As the twig is bent, says Pope, so is the tree inclined" অতএব তাহাকে এইরূপ শিক্ষায় অভ্যস্ত করিতে হইবে যেন সে স্বভাবতঃই সদ্ভাবে ও সৎকার্য্যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাহ্যিক ভাবের প্রাবল্য বয়স্কের পক্ষেও দুরতিক্রম্য সুতরাং শিশুর সুকোমল চিত্তে যে উহা সহজেই ক্রিয়া করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? সুতরাং শিশুকে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য নিয়মানুসারে রক্ষা করিতে হইবে। বাহ্য-বস্তুর দুষ্ক্রিয়া যাহাতে শিশু-হৃদয় অধিকার করিতে না পারে তজ্জন্য তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশু ভগবানের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার হইতে সুন্দর শরীরে ও সুন্দর হৃদয় লইয়াই আসিত হয়। পিতামাতার কর্ত্তব্য এই যে

তাঁহারা যেন শিশুর নির্ম্মল চিত্ত, প্রেমভরা আননের বিমল হাসি সেই সুবর্ণসুন্দর জ্যোতিশ্ময়কান্তি অক্ষতভাবে রক্ষা করেন। মাতাপিতা যে সন্তানমুখদর্শনে পুংনামক নরক হইতে ত্রাণ লাভ করেন ইহার কারণ কি? জন্মগ্রহণ সময়ে সন্তানমুখ ভগবজ্জ্যোতিতে উদ্ভাসিত থাকে। মুখ দর্শনেই জনক জননীর কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ যে পিতা-মাতা আপনার সন্তানের শৈশবসৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়েন তাঁহাদের মহাপাতক অনিবার্য্য। যাহার মুখ দর্শনে নিরয় যন্ত্রণা হইতে রক্ষালাভ করা যায় তাহার প্রতি জনক জননীর কর্ত্তব্য যে গুরুতর তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

সন্তানগণ যাহাতে সুস্থ ও সবল হয় তন্নিমিত্ত তাহার পিতামাতাকেও সুস্থ ও সবল হইতে হইবে। অপরিণত বয়সে পরিণীত ব্যক্তির সন্তানাদি প্রায়ই প্রত্যেক দিকেই অপরিণত হয়। অতএব যদেশ মঙ্গলেচ্ছু মাত্রকেই বাল্য-বিবাহ বর্জ্জন করিতে হইবে। নির্দ্দোষ সন্তানলাভহেতু মাতা-পিতাকে পূর্ব্বেই নির্দ্দোষ হইতে হইবে।

শিশুর যাহাতে বিলাসস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে না পারে তজ্জন্য আহারে বিহারে, পরিচ্ছদ-ভূষণে ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারে শিশুর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার পূর্ব্বে শিশুকে স্বাভাবিক শোভা উপভোগ করিতে হইবে। নির্ম্মল বায়ু, সুবিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র, সুবৃহৎ জলাশয়, সমুন্নত বৃক্ষ ও চন্দ্রোদ্ভাসিত আকাশে শিশু যাহাতে ভগবানের করুণা উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য মাতা-পিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে তদ্বিষয়ক সরল প্রশ্ন করিতে হইবে। সেই সৌন্দর্য্য-সাগর হইতে আগত শিশু এই সৌন্দর্য্য-সম্পদ উপভোগ করিতে পারিলে তাহার বিস্মৃতপ্রায় ভগবৎ-প্রেম পুনরায় হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান সভ্যতাযোগে স্ত্রীসুলভ কোমলতা কমনীয়তা পুরুষসুলভ আক্রমণ অসংখ্য অনর্থের নিদান হইয়াছে। এস্থলে ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কল্পনা-কথিত এতদ্বিষয়ক মত উদ্ধৃত হইল :—"আমরা ছেলে-পিলের যেরূপ নামকরণ করিতেছি অর্থাৎ কাহাকেও রমণীমোহন, কামিনীরঞ্জন, ননী-গোপাল প্রভৃতি নাম দিতেছি ইহাতে আমা-দের শরীর ও মন দুর্ব্বল হইয়া যেন মেয়েলী রকমের হইয়া পড়িতেছে।" বাস্তবিকই অধিকাংশ স্থলে বঙ্গীয় পুরুষ সন্তানসন্ততি-প্রতি আব্দার বা প্রশ্রয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে; যে ব্যক্তি অতি দরিদ্র, হয় ত কঠোর পরিশ্রমে উদরপূর্ত্তির সংস্থান করি-তেছে সেও আপনার প্রাণপ্রিয় ননীর পুতু-লের আহার ভূষণের নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া শৈশবেই তাহাকে বাবুয়ানা বা বিলাসপ্রিয় করিয়া তুলিতেছে। কি আশ্চর্য্য! অপত্য-স্নেহ বাঙ্গালীর ভূতভবিষ্য কর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত করিয়া ফেলিয়াছে। যতদিন তাহারা এতাদৃশ অপত্যস্নেহের বিষময় পরিণাম উপলব্ধি না করিবে, যতদিন সন্তানগণ অন্যায় প্রশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ততদিন বঙ্গসমাজের অস্তা-চলাশা আকাশে অট্টালিকানিশ্বানবৎ ব্যর্থ হইবে।

সুতরাং আমাদিগকে সেই পূর্ব্বপুরুষগণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদিগকে পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে না। সে পথে মোহ নাই, প্রলোভন নাই, কামাদি রিপুনিচয়ের অত্যাচার নাই। সে পথ মানুষকে শান্তি ও সুখের রাজ্যে চালনা করিবে।

এক্ষণে কতিপয় কর্ত্তব্য প্রণালীর উল্লেখ পূর্ব্বক আলোচ্য বিষয়ের উপসংহার করা হইবে।

(১ম) শিক্ষা সম্বন্ধে—উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক, ও আধ্যাত্মিক উন্নতি—

১। শৈশবেই শারীরিক উন্নতির নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর ক্রীড়ায় যোগদান করিবার প্রবৃত্তি শিশুহৃদয়ে জাগাইতে হইবে।

২। বিদ্যালয়ে ব্যায়াম ও অন্যান্য অঙ্গ-চালনাদি পরীক্ষার অঙ্গ হইবে। সে বিষয়ে পাশ না হইলে তাহাকে উত্তীর্ণ হওয়ার সার্টি-ফিকেট দেওয়া হইবে না। এজন্য উৎসাহ-জনক পুরস্কারাদি ঘোষণা করিতে হইবে।

৩। প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম শিক্ষাদানার্থে অতিরিক্ত বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে হইবে।

৪। ছাত্রদের বেতন সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াই হউক বা অন্য উপায়ে স্কুলে ছাত্রদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৫। দূর হইতে আগত ছাত্রদের সুবিধার জন্য, যাহাতে তাহারা ছুটির পর ব্যায়াম করিতে পারে তজ্জন্য স্কুলের কার্য্য অপেক্ষা-কৃত কিছু পূর্ব্বে আরম্ভ করা হইবে।

৬। সম্ভবপর হইলে মধ্যে মধ্যে শিক্ষক মহাশয়কে অথবা অন্য তত্ত্বাবধায়ককে ছাত্র-দের বাটীর আহার বিহার পাঠাগার ও অপরা-পর বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব অবগতির চেষ্টা করিতে হইবে।

(২য়) মানসিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে—

১। বিদ্যালয়ের পাঠ পুনঃ কার্য্যের অনু-শীলনে প্রদর্শন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা হইতেছে কি না।

অন্ততঃ মাসিক একদিন নৈতিক শিক্ষা-সমিতি আহূত হইবে।

প্রতি গ্রামে সাপ্তাহিক সাধ্যসমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(ক) সমিতির একজন সম্পাদক থাকিবে। সেই সম্পাদক সচ্চরিত্র হইবে ও শিক্ষকসভাকর্ত্তৃক নির্ব্বা-চিত হইবে।

(খ) সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে দৈনিক বিবরণী লিখিতে হইবে।

(গ) কর্ত্তব্যাবলীর ক্যাটেসিনের ডাইরী অনু-সারে উক্ত পুস্তক গঠিত হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক সভ্যকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

(ঙ) নির্ব্বাচিত সম্পাদক তাহাদের ডাইরী দেখিয়া প্রত্যেকের দৈনিক উন্নতি লক্ষ্য করিবেন এবং সদ্বিবে-চনানুযায়ী উপদেশ দিবেন। সম্পা-দক প্রাণান্তেও কাহারও দোষ বা অভাবাদি অন্যের নিকট প্রকাশ করিবেন না।

(চ) মাসিক সমিতিতে কেবল সম্পাদক ও অন্যান্য নীতিজ্ঞ ব্যক্তি বা শিক্ষকই উপস্থিত থাকিবেন। সম্পাদক তাঁহাদের নিকট আপন আপন পল্লীর বিবরণী পুস্তক প্রদান করিবেন এবং উপস্থিত ব্যক্তি প্রত্যেক স্থলে আপনাদের মন্তব্য লিখিয়া প্রকাশ করিবেন এবং প্রতিযোগিতার জন্য কোন্ পল্লীর কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষজনক হইতেছে তাহা সভাতে সর্ব্ব-সম্পাদক সমীপে জ্ঞাপন করিবেন।

ইহাতে আপন আপন পল্লীর উন্নতি-পিপাসা জাগাইয়া তুলিবে।

(ঙ) বৎসরের শেষে যে পল্লী শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহাতে উৎসাহ-বৃদ্ধিকর পুরস্কারাদি প্রদান করিবেন।

(চ) এতদ্ব্যতীত প্রতি পল্লীর সম্পাদককে যতদূর সম্ভব দেখিতে হইবে সভ্যগণ প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিতেছে কি না।

(ছ) প্রত্যেক ছাত্রকে প্রাকৃতিক শোভা প্রদর্শনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

(জ) প্রতি পল্লীতে ধর্ম্ম ও নীতি পুস্তকাগার স্থাপন করিতে হইবে অথবা মূল লাইব্রেরী হইতে ছাত্রগণকে ঐরূপ পুস্তক ধার দিতে হইবে।

(ঝ) প্রত্যেক ছাত্রকে যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য্য নিয়মানুসারে কার্য্য করাইতে হইবে।

(ঞ) প্রত্যহ ভক্তিলাভের উপায় স্বরূপ কতক্ষণ নির্জ্জনে আরাধ্য দেবতার নিকট ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিতে হইবে। পুষ্পচন্দনাদি প্রদানে নিত্য নৈমিত্তিক পূজায় যতদূর সম্ভব যোগদান করিতে হইবে।

(ট) তাহাদিগকে সৎ সংসর্গে ও সদ্ভাবে জীবন যাপনের পন্থা করিয়া দিতে হইবে।

(ঠ) ধনী দরিদ্র সকলকেই বিলাস সামগ্রী চক্ষুর অন্তরাল করিতে হইবে।

(ড) তাহাদিগকে ক্রমশঃ ত্যাগ শিক্ষা দিতে হইবে।

(ঢ) রঙ্গালয় অথবা সাধারণ নাটকাভিনয় হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখিতে হইবে।

ফলতঃ তাহাদিগকে প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ—"সংযম শিক্ষা"।

(৩য়) যুবক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য।

১। বর্ত্তমান সংসারী লোকের একটী ধারণা আছে, মানুষ উচ্চশিক্ষা লাভ করে শুধু অর্থ প্রতিপত্তি ও সুখ সম্ভোগের জন্য। এজন্য জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া পার্থিব প্রতিপত্তির অন্বেষণেই মন প্রাণ সমর্পণ করে। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রথমতঃ এই ভ্রান্ত সংস্কার দূরীকরণে বদ্ধ পরিকর হইতে হইবে। এজন্য তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষিত ও ধনী সন্তান হইলেও জীবনের প্রকৃত উজ্জ্বল চরিত্র ও মহৎ উদ্দেশ্যের আদর্শ হইয়া তাহা লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে।

২। সমাজ-সংস্কারে শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তিকে অগ্রণী হইতে হইবে।

৩। শিক্ষিত-সমাজকে কৃষিক্ষেত্রে, বাণিজ্য-ব্যাপারে ও শিল্পের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতে হইবে। নতুবা সভাসমিতি আহ্বান করিয়া যদি শিক্ষিত সমাজ,—কেহ জজ, কেহ ম্যাজিষ্ট্রেট, কেহ বারিষ্টার, কেহ উকিল, কেহ বা অন্যান্য উচ্চপদ কর্ম্মচারীরূপে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সামান্য পরিমাণেও দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে না।

৪। শিক্ষিত সমাজকে সংযমী হইতে হইবে, ধার্ম্মিক হইতে হইবে, পর-সেবক হইতে হইবে।

৫। প্রত্যেক পরগণায় একটী বাৎসরিক সমিতি আহ্বান করিয়া প্রতি বৎসরের ফলাফল আলোচনা করিতে হইবে।

৬। প্রত্যেক পরগণায় বৈষয়িক কি পাকবারিক প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে শ্রমজাত পদার্থনিচয়ের প্রদর্শন হইবে ও পুরস্কারাদি প্রদানে উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইবে।

৭। প্রত্যেক পল্লীর শিক্ষিত লোককে নিঃস্বার্থভাবে আপন পল্লীর রাস্তা ঘাট, জলাশয় খনন ও সংস্কার, ও সাধারণের উপকারার্থ অন্যবিধ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৮। প্রত্যেক পল্লীতে অন্ততঃ একজন সুযোগ্য ডাক্তারের বন্দোবস্ত হইলে বিশেষ মঙ্গল হয়; অগত্যা প্রত্যেক তিন চারি পল্লীতে একখানি সরকারী ডাক্তারখানা বিশেষ আবশ্যকীয়।

৯। বাল্যবিবাহ রোধ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির প্রচার করিতে হইবে।

১০। যাহাতে প্রতিগ্রামে কলহ বিবাদ হ্রাস হয়, যাহাতে লোককে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে না হয়, যাহাতে লোক অমিতাচারে মদ্যপানাদি ও অন্যান্য অপব্যবহারে অর্থশ্রাদ্ধ না করে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

১১। উৎকোচ গ্রহণ, অপরিমিত সুদে কর্জ্জ প্রদান এবং অন্যান্য অন্যায় উপায়ে অর্থ গ্রহণ নিবারণ করিতে হইবে। বহু বিবাহ ও বিবাহের যৌতুক নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। দেশবাসীদিগকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়শীল করিবার জন্য স্থানে স্থানে ব্যাঙ্ক প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে।

১৩। গো মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের চেষ্টা করিতে হইবে।

১৪। শিল্পাদি শিক্ষার জন্য লোক বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে। এবং বিদেশ-প্রেরিত পরার্থপর দেশসেবককে নিঃসঙ্কোচে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৫। প্রতি পরিবারের কর্ত্তাকে এক একটী লাইব্রেরীর সভ্য হইতে হইবে।

১৬। প্রত্যেক বঙ্গহিতৈষীকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে 'ভারতের বাহ্য সম্পদ ও উন্নতি কেবল মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।' প্রাচীনকালে তাহাই হইয়াছিল। এখনও বা বাঙ্গালীর না হইতে পারিবে কেন? ভারতের মস্তিষ্ক জাপানবাসীর হইতেছে ত।

শ্রীরমণীমোহন চৌধুরি বি, এল,

বর্ত্তমান যুদ্ধ ও আমাদের দুরবস্থা

দেখিতে দেখিতে ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কালাগ্নি বৎসরাধিককাল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদয় মহাদেশ ভস্মীকৃত করিতে চলিল। এখনও নির্ব্বাপিত হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তথাকার জনসাধারণের দুরবস্থা সহজেই অনুমেয়। আমাদের দেশ মহাসমরাঙ্গন হইতে বহু দূর হইলেও ভগবানের লীলায় আমাদের অদৃষ্ট এখন পৃথিবীর যাবতীয় সুসভ্য জাতির অদৃষ্টের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। সুতরাং ইতিমধ্যেই আমাদের দেশের জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবিকানির্ব্বাহ ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে।

আমাদের পূর্ব্বকালের শিল্প বাণিজ্যের গৌরব আমরা যতই করি না কেন উহা এখন কেবলমাত্র কাহিনী বা স্বপ্নের কথা। সে কথা আলোচনা এখন নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিদের উপযুক্ত হইলেও জনসাধারণের তাহাতে কিছুই আসে যায় না। উহারা জানে "প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, বেতে কিছুতেই দেশ স্বাধীন নহে।" সামান্য ক্রীড়নক হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অত্যাবশ্যকীয় যাবতীয় দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমাদের দেশে আমদানী হয় বলিয়াই আমরা এক প্রকার সুখে দুঃখে জীবন যাপন করিতেছিলাম। আমাদের দেশে যে সকল কাঁচা মাল উৎপন্ন হয় সে সকল মালের খরিদদার আমাদের দেশে নাই। বিদেশী ব্যবসাদার আমাদের দেশে আসিয়া সে সব খরিদ না করিলে আমাদের ক্ষেতের শস্য ক্ষেতেই পচিতে থাকিবে। উহারা সে সব খরিদ করে বলিয়াই আমাদের ঘরে দুই এক পয়সা আসে। তাহাতেই আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই গ্রাসাচ্ছাদন হইতে বাবুগিরী পর্য্যন্ত চলে। সুতরাং বিদেশী খরিদদার আমাদের উৎপন্ন শস্য খরিদ না করিলে, বিদেশী শিল্পী আমাদের সস্তায় শিল্প দ্রব্য সরবরাহ না করিলে আমাদের দুরবস্থার একশেষ হইবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে যে আমাদের সে দশা উপস্থিত হইতে চলিল তাহা কি কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

ফ্রান্স হইতে আমরা সাবান, গন্ধদ্রব্য, রেশম ও পশমের কাপড়, ঘড়ি, খেলনা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক জিনিষ পাই। ফ্রান্সের পূর্ব্বপ্রান্তেই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান নগরগুলি অবস্থিত। সেগুলির অধিকাংশ এক্ষণে জার্ম্মাণীর অধিকারভুক্ত হইয়াছে। বাকি অংশের কল কারখানা এক্ষণে যুদ্ধের আবশ্যকীয় গোলা বারুদ প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপৃত। বেলজিয়ম হইতে এদেশে লোহার কড়ি, জরেষ্ট, টী-আয়রণ, করগেট, কাঁচের বাসনাদি আমদানী হইত। সে বেলজিয়মের অস্তিত্ব এক্ষণে লোপ পাইয়াছে। অষ্ট্রীয়া আমাদিগকে এনামেলের বাসন, দেশলাই, কাঁচের দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত। অষ্ট্রিয়ার এক প্রকার শেষ হইয়াছে। জার্ম্মাণীর শিল্প দ্রব্য আমাদের বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল। অত্যাবশ্যকীয় এমন কোন জিনিষ আমরা ব্যবহার করি না যাহা জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত নহে। জার্ম্মাণীর রাসায়নিক কারখানা হইতে ঔষধ, পথ্য, রং, গন্ধ প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইত। সে সকল কারখানা এক্ষণে বন্ধ। যে সকল রাসায়নিক পণ্ডিতগণ তথায় একালে মানবজীবনের দুঃখ কষ্ট নিবারণার্থ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন তাঁহারাই এক্ষণে নরহত্যার অমোঘ উপায় আবিষ্করণের পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত। যে সকল শিল্পীগণ লোহার কারখানায় বা রেশম পশমের কারখানায় শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ করিত তাহারা এক্ষণে লড়াই করিতে নিযুক্ত। সূচ, ঘুনদী, যন্ত্র, অস্ত্র শস্ত্র, লোহার কড়ি, বরগা, আলো, ছুরী কাঁচী প্রভৃতি সকল দ্রব্য প্রস্তুতই এক্ষণে বন্ধ। এদেশে আমদানী কিরূপে হইবে? ইংলণ্ডের অবস্থাও তদ্রূপ। সম্প্রতি গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের যাবতীয় কলকারখানা এখন বৎসরাধিকাল নিযুক্ত থাকিবে। ইতি মধ্যেই অন্ততঃ পক্ষে ৩০।৪০ লক্ষ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইংলণ্ডের শিল্প বাণিজ্য অত্যন্ত সঙ্কোচ হইয়া পড়িতেছে।

উপরন্তু আর্য্যাণী সভ্যতা যে সকল সামগ্রী আমাদিগকে যোগাইতে ইংলণ্ড ততদূর সভ্যতা সে সকল দ্রব্যাদি এ পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই। পরে পারিবে কি না বলা যায় না। বাজারে যে সকল বিদেশীয় মাল মজুত ছিল তাহাতেই আমাদের বৎসরাধিকাল চলিল। হয়ত আর কিছু দিন কোন প্রকারে চলিবে। ইতিমধ্যেই উহাদের মূল্যও অসম্ভব মত বৃদ্ধি হইয়াছে। পরে আর সে সকল পাওয়া যাইবে না। তখন আমাদের দশা কি হইবে?

গত বৎসর যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই অর্দ্ধেক বঙ্গে হাহাকার উঠিল। পূর্ব্ব বঙ্গের অধিকাংশ প্রজারা পাটের চাষ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এমন কি পাটের চাষ আরম্ভ করার অত্যল্পকাল মধ্যে অনেকেই সম্বতি সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। পাটের খরিদদার কেবলমাত্র বিদেশী সওদাগরগণ। তাহারা লড়াই আরম্ভ হওয়ায় নিজ দেশে শিল্প বাণিজ্য বন্ধ হইবে বুঝিয়া একদম পাট কেনা বন্ধ করিয়া দিল। ইহার ফলে ক্ষেতের পাট ক্ষেতেই দাঁড়াইয়া পচিল। কেহ কাটিল না। যাহারা কাটিল তাহাদের কাটাপাট গুদামজাত হইয়া নষ্ট হইল। অথবা নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইল। যাহারা পাট কেনা বেচার ব্যবসা করিত তাহারা কিছু কাল পাট আটক করিয়া রাখিয়া অবশেষে হতাশে লোকসান দিয়া বিক্রয় করিল। সুতরাং পাটের চাষ আবাদ এবং ব্যবসা একদম লোপ পাইল। সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের জীবিকা অর্জ্জনের উপায় বন্ধ হইল।

এরূপ অবস্থায় আমাদের উপায় কি?

শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায়, বি, এল।

রুশিয়ার স্লাভোফিল নেতৃদ্বয়

একটা জাতির মানসিক গতির স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে অগ্রে সেই জাতির বিগত অনুষ্ঠানগুলির উপর লক্ষ্য করা উচিত। আর্য্যগণদিগের মানসিক গতি নির্ণয় করিতে হইলে কেবলমাত্র তাহাদিগের বর্ত্তমান দার্শনিকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিলে চলিবে না তাহার বিগত চিন্তাপ্রণালী ও সাধনার দিকেও লক্ষ্য করিতে হইবে। তেমনি রুশ চিন্তাশক্তির ধারা বুঝিতে হইলে রুশিয়ার স্লাভোফিল মহামণ্ডলের কার্য্যকারিতাকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং এই স্লাভ-তন্ত্রকে বুঝিবার জন্যই আমরা ইহার কোন যোগ না থাকায় অতি শীঘ্রই ইহাকে দুইটি বিশিষ্ট নায়ক কিরীভেস্কী ভ্রাতাদ্বয়ের গতিবিধিগুলিকে আলোচনা করিব।

কিরীভেস্কী প্রথমে পাশ্চাত্য আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি সাহিত্যসেবার দ্বারা দেশের কার্য্যে ব্রতী হন। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া ইনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে The European নাম দিয়া একটি সাময়িক পত্র সম্পাদিত করিতে থাকেন কিন্তু দেশের প্রাণের সঙ্গে এই পত্রিকার মৃত্যু পথে পতিত হইতে হয়। কিরীভেস্কী এই নৈরাশ্যের পর ১১ বৎসর ধরিয়া একরূপ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন।

'There is no fear of our losing our nationality, religion, historical memories, all our conditions of life are so entirely different from those of the rest of Europe, that it is physically impossible for us to become French, English or German. But hitherto our nationality has been a rough, uneducated one, and stationary as the Chinese. It is only foreign influence that can enlighten and lead it on." এই কৈফিয়ৎ দিয়া তিনি The European বাহির করিতে সাহসী হন। কিন্তু দেশাত্ম-প্রাণ স্লাভোফিলগণ কিরীভেস্কীর এই প্রবোধ-বচন হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বহু নির্য্যাতনের পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, পাশ্চাত্য সভ্যতা-ভ্রান্ত কিরীভেস্কীর প্রাণে প্রকৃত দেশাত্ম-বোধ জাগিয়া উঠিল। উল্টাস্রোত বহিল। কিরীভেস্কীর পূর্ব্বমত সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি রুশিয়ার পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন সভ্যতার আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া স্তম্ভিত ও সচেতন হইলেন, বুঝিলেন এই অনুকরণ-প্রিয়তার মোহ-মদিরায় ঘুমাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। পিটার কিরীভেস্কীর কথার তাৎপর্য্য-গুলি এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"আমরা বৈদেশিক সাহিত্যগুলি অনুবাদ, অনুকরণ এবং অধ্যয়ন করিতেছি, বিদেশীয় সামাজ আন্দোলনেরও আমরা অনুধাবন করিতেছি এবং অপর জাতির আদর্শ এবং প্রণালীগুলিকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিতেছি। সর্ব্ব প্রকার বৈদেশিক উদ্ভাবনা-জাত গ্রন্থাবলীই আমাদিগের পাঠ্যগৃহের উজ্জ্বল সাজ সজ্জা হইয়াছে এবং আমা-দিগের চরিত্রের উপরেও সর্ব্বপ্রকার বিজা-তীয় প্রবৃত্তি প্রভুত্ব করিতেছে কিন্তু আমা-দিগের জাতীয় সভ্যতা ইতিহাসের প্রকৃত বিকাশের সহিত ওই সব বিদেশীয় পদ্ধতির কোনরূপ যোগই নাই। এতদ্দ্বারা আমরা আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় সভ্যতা হইতে ক্রমশঃই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছি এবং তজ্জন্যই আমরা এতকাল আমাদিগের নিজস্ব এক অভিন্ন মানব পরিবার গঠন করিবার কোন চেষ্টাই করিতে পারি নাই। আমা-দিগের প্রকাশিত সাহিত্যগুলি, পাশ্চাত্য সাহিত্য রাশির কেবলমাত্র অনুকরণ বলিয়া পৃথিবীর অপরাপর জাতির কৌতূহল আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এতাদৃশ অনুকরণ-বহুল সাহিত্য চর্চ্চার সহিত আমাদিগের জাতীয় জীবন এবং বিগত ইতিহাসের যে কত প্রভেদ তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। যে ধাতুসমূহের দ্বারা প্রাচীন রুশিয়ার মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যা-ত্মিক জীবন গঠিত হইয়াছিল এবং এখনও যদ্দ্বারা রুশিয়ার বর্ত্তমান জাতীয় জীবন গঠিত হইতেছে, বৈদেশিক সাহিত্য চর্চ্চা দ্বারা আমরা স্বদেশের সেই আধ্যাত্মিক গতিকে স্পর্শ করিতে পারি নাই। আমাদিগের বিগত ইতিহাস এবং জাতীয়তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ রহিত করিয়া সাহিত্যকে আমরা কেবল বৈদেশিক উপাদানেই গঠিত করিতেছি।

"কতকগুলি লোক মনে করেন যে বৈদেশিক সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুকরণ দ্বারা যেমন কতকগুলি সাহিত্যিকের জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তেমনি তদ্দ্বারা কি নিরক্ষর, কি বিদ্বান সর্ব্বশ্রেণীর রুশিয়ানদিগের

অস্তিত্ব personality পর্য্যন্তও সময়ে লোপ পাইতে পারে। এই অদ্ভুত মতের কি আর প্রতিবাদ করিব? ইহা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা তাহার কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না। একটা জাতির ইতিহাসকে উড়াইয়া দেওয়া যেমন অসম্ভব, তেমনি একটা জাতির চরিত্রগত বিশেষত্বগুলিকেও ফুৎকারে নিবাইয়া দেওয়া অসম্ভব। একটা বর্দ্ধিতায়তন জীবের অস্থিগুলি নৈয়ায়িকের তর্ক দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া যেমন সহজ, তেমনি সাহিত্যিক অনুকল্পনা দ্বারা একটা জাতির বদ্ধমূল ধারণাকেও উড়াইয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু বাস্তবিকই যদি এই প্রকার অনুকরণই এতটা অঘটন ঘটাইতে পারগ হয় (জাতীয় প্রকৃতির মূলচ্ছেদ করিতে পারে) তাহা হইলে এই পরিণতি রুশজাতিকে সভ্যতার আলোকে আলোকিত না করিয়া বরং এই জাতির ধ্বংসের কারণ স্বরূপই হইবে। কতকগুলি সংস্কার বা ধারণার সমষ্টি ছাড়া একটা জাতীয় জীবন আর কিছুই নহে। সেই ধারণাগুলিই সেই জাতির আচার ব্যবহারে, কথায় প্রথায়, তাহাদিগের মন এবং হৃদয়ের বিশ্বাসে, তাহাদিগের সামাজিক একতায় এমনি কি তাহাদিগের ব্যক্তিগত জীবনেও বিকশিত হইয়া উঠে। স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় সভ্যতার পরিবর্ত্তে বৈদেশিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে স্থান দিবার কল্পনা আমাদিগের পক্ষে একটা আত্মহত্যা ব্যতীত আর কি? কারণ, একটা উদার আদর্শ বা উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া এই অদ্ভুত ইউরোপীয় সভ্যতা গঠিত হয় নাই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সভ্যতার একটি ধাতু (element) অপর ধাতুর বিরোধী এবং পরস্পর পরস্পরের গতি রোধ করিতেই তৎপর।"

আমি ধৈর্য্য ধরিয়া গঠিত অনুবাদ করিতে একান্ত অযোগ্য। আশা করি সুধী পাঠকবর্গ এই অনুবাদের সত্যাসত্যতা প্রতিপন্ন করিতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের The Hibbert Journal এর Paul Vinogradoff লিখিত The Slavophile creed এর ২৫০-১ পৃষ্ঠা দেখিয়া লইবেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া সূক্ষ্মদর্শী Vinogradoff উক্ত প্রবন্ধে লিখিতেছেন,—

"It is the Roman side of it that was appropriated by western nations and the Roman way of looking at life was dictated by a narrow spirit of individualism, sensuality and predominance of the intellectual standard. The heart had not much to say in this world of naked interests and barren egotism."

সমগ্র ইউরোপ ভোগমূলক রোমক-সভ্যতার আদর্শে অনুপ্রাণিত। রোম রাজ্যের যে কারণে ধ্বংস হইয়াছিল, সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতারও আজ সেই কারণে ধ্বংস উপস্থিত। ব্যভিচার ও অত্যাচারময় রোম-রাজ্য ধ্বংস না হইলে সমগ্র পৃথিবীর যে কি হইত তাহা বলা যায় না! রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মও সম্পূর্ণ একদেশদর্শিতা, তুর্ক ও পোপের আধিপত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পোপ নিকোলাস, হইতে প্রথম লুথার এবং ষ্ট্রাসের (Strauss) আধিপত্যকাল পর্য্যন্ত কেবল ছায় এবং তর্কের দ্বারাই এই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মকে পরিত্রাবিত করিয়া আসিয়াছে।

একদেশদর্শিতা এবং যৌথিকতাতেই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজ বিকৃত হইয়া রহিয়াছে

নানা আভ্যন্তরিক বিপ্লব ও জয়পরাজয়ের উপরেই পাশ্চাত্য জগতের রাজধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ ঘোর বিদ্বেষ-বুদ্ধি ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রোথিত রহিয়াছে। একমাত্র স্বার্থপরতা ও মৌখিকতার উপরেই পাশ্চাত্য নিয়ম-প্রণালী ব্যবস্থিত তজ্জন্য সাম্যের প্রতি বীতরাগ পাশ্চাত্য-সভ্যতার স্বভাববর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। Vinogradoff অতঃপর বলিতেছেন—

"If it (সভ্যতা) had been sound at bottom, why should its full development, the clear and consequent application of its premises, produce such a general feeling of disappointment and discontent ?"

ইউরোপের এই সর্ব্বব্যাপী হতাশ এবং অসন্তোষের তিনাগ্রাডফ তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

(১) The self-moving knife of reason

(২) The abstract syllogism which does not recognise anything but itself.

(৩) That despotic logical faculty, severed from the other forces of the human mind.

এক কথায় একমাত্র আত্ম-প্রবঞ্চনা, একদেশ-দর্শিতা এবং কৌটিল্য-নীতিকে আশ্রয় করিয়াই ইউরোপ আজ অধঃপতনাভিমুখে ছুটিয়াছে। কেবল ইউরোপকেই বা বলি কেন? ভারতবর্ষেরও অধঃপতন ঘটিয়াছিল এই মূল সূত্রগুলিকে আশ্রয় করিয়া। ইউরোপের বিলাসিতা এবং বিজ্ঞান তত দোষী নহে যত দোষী তাহার অধিবাসীগণের স্বার্থ-পরায়ণতা। ইউরোপ বিজ্ঞান দ্বারা প্রভূত কল্যাণের অপেক্ষা বিদ্বেষ-বহ্নিই বৃদ্ধি করিয়াছে, ইউরোপ বিলাসিতা চরিতার্থ করিতে গিয়া হিংসাকেই জীবন এবং পশু বলকেই শ্রেষ্ঠ বল বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

ইউরোপে এই কৌটিল্য-নীতির প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাগুরু ছিলেন Aristotle. নৈয়ায়িক গবেষণার একমাত্র Plato ই ইঁহার সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হন। তাহার পর Decarte, Spinoza প্রভৃতি তার্কিকগণ তাঁহাদের নানারূপ গবেষণা ও যুক্তি দ্বারা মানবজীবনের অধ্যাত্মিকতা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বকেও লোপ করিয়া দেন। তাহার পর Kant প্রমাণ করেন যে একমাত্র বুদ্ধি (reason) ব্যতীত কোন সত্যই থাকা অসম্ভব। Fichte তাঁহার জ্ঞানদর্শনের দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে সমগ্র বহির্জগৎ একটা ভ্রান্তি (fancy) মাত্র এবং বর্দ্ধিতায়তন 'আমি' ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। Schelling ইহার বিরোধী হইয়া প্রচার করেন যে জগৎ সত্য কিন্তু ইহার আত্মা 'আমি' ছাড়া আর কেহই নহে—একমাত্র মানবের রজোগুণের উপর এই জগতের পূর্ণত্ব নির্ভর করিতেছে। Hegel এই এক-দেশ-দর্শিতার চূড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হন। কেবল স্বকীয় বিজ্ঞান-বুদ্ধির উপরেই যে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং এই বিজ্ঞান-বুদ্ধিই যে সমগ্র বিশ্বের অগ্রগত অবতার। ইহাই তাঁহার অভ্রান্ত ধারণা হয়। এক কথায় সমগ্র ইউরোপ-এবং ইউরোপের আধুনিক শিক্ষাগুরু জার্ম্মাণী এতদিন ধরিয়া কেবল নবদ্বীপের নৈয়ায়িকগণের প্রশস্ত পন্থা অবলম্বন করিয়া তর্কজাল বিস্তার করিতেছিল। আমিত্ব বা অহং ভাবকে অভ্রান্ত করিতে, স্বার্থপর-

তাকে মূলমন্ত্র করিতে ইউরোপ এতদিন কেবল আত্মপ্রবঞ্চনায় রত ছিল। ইউরোপের দর্শনের ধারার অনুরূপেই ইউরোপ গঠিত হইয়াছিল। কেবল দেহাত্মবাদ এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধিই ইহার ধ্যান জ্ঞান এবং কল্পনা হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার যথাসর্ব্বস্ব এই ব্যক্তিত্ব বা আমিত্বের উপর দণ্ডায়মান, তাহাতে ইউরোপের আত্মার কতটা উন্নতি হইয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু ইহাতে যে স্বার্থপরতার মাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে আর কোন ভুল নাই। ইউরোপ এতদিন ধরিয়া কেবল অহঙ্কারের অন্ধকারেই ঘুরিয়াছে। এই মহাযুদ্ধের অবসানে সে অন্ধকার নিশ্চয়ই ঘুচিয়া যাইবে। ইউরোপ বুঝিবে—"অচিন্ত্য খলুযে ভাবান তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।" ইউরোপ বুঝিবে রজোগুণ জাগ্রতাবস্থা। নহে সত্ত্বগুণই প্রকৃত জাগ্রতাবস্থা জড়বাদী পাশ্চাত্য জগৎ এখনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে—"বিশ্ব কত্রবলং বলং বলং ব্রহ্ম বলং।" বিশ্বাস এবং প্রেমই যে এক মাত্র মানবের এবং জগতের সদ্গতি ইহা পাশ্চাত্য-সভ্যতা এখনও ধরিতে পারে নাই। আজ এই মহাবিপ্লবের শস্যক্ষেত্রের হুতাশনে তাহার অপূর্ণ মীমাংসা হইয়া যাইবে। মহাভারতের যে ভ্রমাত্মতার অধঃপতন ঘটিয়াছিল, ইউরোপেরও তাহাই ঘটিতেছে। দুর্য্যোধন সূচ্যগ্র মেদিনী দানেও কাতর হইয়াছিল এবং নারায়ণকে ছাড়িয়া তাঁহার নারায়ণীসেনা গ্রহণ করিয়াছিল—অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণী তাহাই চাহিয়াছে—তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। অভিমন্যু বধ যেমন কুরুপক্ষের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল, আমার মনে হয় নিরপরাধী বেলজিয়ম গ্রহণও জার্ম্মাণীর পরাজয়ের কারণ হইবে। যতো ধর্ম্ম ততো জয়ঃ। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর হইতেই ইউরোপ এতদিন ধরিয়া তলে তলে যে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল আজ তাহা একটা সামান্য ছুতা পাইয়া যে বিশ্ব উদ্গীরণ করিতেছে তাহা দেখিলে বাস্তবিকই পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর একটা বীতশ্রদ্ধা আসে।

অষ্ট্রিয়ার আর্চডিউকের হত্যাকাণ্ডের উপর ইউরোপের কুরুক্ষেত্র বাধিয়া উঠিয়াছে। এই স্থানেই ইউরোপীয় সভ্যতার দুর্ব্বলতা। এই মহাযুদ্ধের অবসানে কোটী কোটী জীবনের বিনিময়ে ইউরোপ হইতে যদি materialism (জড়বাদ) এবং Militarism (ক্ষত্রিয়-প্রভাব) চূর্ণ হয় তাহা হইলে ইউরোপের মঙ্গল, জগতের অপরাপর জাতিরও শান্তি। কিন্তু তাহা কি হইবে? এই জড়বাদ এবং ক্ষত্রিয়-প্রভাব যতদিন ইউরোপের আদর্শ হইয়া রহিবে ততদিন ইউরোপেরও শান্তি নাই—জগতেরও শান্তি নাই—শান্তির সময়েও মানবের মনে অশান্তি বিরাজ করিবে—আক্রমণ ভয়ে এবং শত্রু ভয়ে ইউরোপের চক্ষু সতত জাগ্রত থাকিবে—বিশ্ববাসীও নিশ্চিন্তায় এবং নিঃসন্দেহে ঘুমাইতে পারিবে না।

জড়বাদ এবং স্বার্থপরতা ইউরোপের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াগিয়াছে—আবরণ-প্রিয়তা এবং ভোগপরায়ণতা সমগ্র পাশ্চাত্য জাতির শতকরা ৯০ জনের শরীরে মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। কেমন করিয়া ইউরোপ প্রাচ্যের ত্যাগ এবং ঋষিভাবকে গ্রহণ করিবে। যাহারা বাঁচিবার জন্য আহার করে না, আহার করিবার জন্যই বাঁচিয়া থাকে—হিংসাই যাহাদের আদর্শ এবং জীবন তাহারা কেমন করিয়া The Herald of the

Golden age এর আদর্শ অহিংসা পরমো-ধর্ম্মকে সাদরে গ্রহণ করিবে? হিংসা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্কারে পরিণত হই-য়াছে। ইউরোপে যে ডিমক্রেসি ও বিশ্ব-মানবতার ধুয়া উঠিয়াছে তাহা মৌখিক অভিনয় মাত্র! তাই ইউরোপের Civilising mission-এর পশ্চাতেই অমনি Machine Gun-এর হৃদয়স্পর্শী সাড়া পড়ে। সভ্য ইউরোপ, অসভ্য প্রাচ্যকে এইরূপ ধর্ম্মের ডাক বহুবার শুনাইয়াছে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডকে ইউরোপ আজ তাহার সভ্য-তার দাঁড়ের পাখী করিয়া রাখিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিতরে প্রকৃত ধর্ম্মভাব আনিতে হইলে, উহার আচার ব্যবহার ও জীবন-যাত্রার আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এমনকি আহার বিহার ও অযথা আড়ম্বরেরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। Sartor Resartus নৈরাশ্যবাদী কার্লাইল অল্প দুঃখে লিখেন নাই।

যাহা হউক, আমাদিগের মনে হয় এই মহাযুদ্ধের অবসানের পর প্রাচ্য ভাবাপন্ন ধর্ম্মপ্রাণ রুশিয়াই ইউরোপের ভাবী সভ্যতার কর্ণধার ও পথপ্রদর্শক হইবে। ইহারই মধ্যে রুশিয়া ইউরোপের সাহিত্যের পথ-নির্দ্দেশক হইয়াছেন। তাই Vicomte Melchior de Vogue রুশ-সাহিত্য আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন।

"In its own country it has attained independence; abroad it (রুশিয়া) is recognised as one of the artistic forces of the day; yesterday a vassal, it is to-day one of the great Powers; and like more than one state among the nations, it has risen to power by the force fiction."

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর হইতে রুশিয়ার আর সে অবস্থা নাই।

সভ্যতার বিবর্ত্তনে ইউরোপ বিজ্ঞানময় কোষ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিয়াছিল। এইবার আশা করা যায় রুশিয়া তাহাকে সহৃদয়তা ও বিশ্বাসের দ্বারা আনন্দময় কোষে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। পাশ্চাত্য জগতে যদি প্রেম এবং বিশ্বাস স্থাপিত হয় তাহা হইলে The doctrine of non-resistance এর প্রবর্ত্তন রুশিয়ার মহাত্মা টলষ্টয়ের স্থান যে কত উচ্চে হইবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু ভোগ-পরায়ণ বণিক-স্বভাব ইউরোপ কি টলষ্টয়ের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে? এই যুদ্ধের পর রুশিয়া যদি ইউরোপের আদর্শ হয়, তাহা হইলে ইউরোপের বৈষ্ণব হওয়া সম্ভবপর। রুশিয়া যদি ইউরোপের আদর্শ হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ধর্ম্মের পদতলেই বিচরণ করিবে। প্রকৃত ধর্ম্মপথে বিজ্ঞান পরিচালিত হইলে বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের প্রকৃত কল্যাণই সাধিত হইবে। বহুকাল ধরিয়া বিজ্ঞান বিদ্বেষ-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া-ছিল বলিয়াই ইউরোপের এতাদৃশ সর্ব্বনাশ!

রুশিয়ার খ্রীষ্টধর্ম্মে আজি পর্য্যন্ত এমনি একটা সরল বিশ্বাস এবং একপ্রাণতা বিরাজ করিতেছে যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। রুশিয়ার প্রার্থনাগার পোপের অনু-শাসনে শাসিত নহে। রুশিয়ার ধর্ম্মমন্ত্রির সকল রাজধর্ম্ম এবং সমাজধর্ম্মের শিক্ষাস্থল। রুশিয়ার মঠগুলিতে এমনি একটা সার্ব্ব-ভৌমিকতা ও বিশ্বজনীনতা দেখা যায় যদ্দ্বারা পাশ্চাত্য-জগতের একদেশবাদ ভ্রান্তদর্শন

অপেক্ষা অনেক বিস্তৃততর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় শিক্ষালাভ হয়।

জনসাধারণের সরল বিশ্বাসই রুশিয়ার খৃষ্টধর্মকে এখনও সজীব করিয়া রাখিয়াছে। রুশিয়ার গুজনাগরগুলিতে কোনরূপ একশ্রেণীবর্দ্ধিতা বা পাদ্রীর একাধিপত্য নাই। অথচ তদ্দ্বারা কি সমাজ, কি রাজ্য সমভাবে শাসিত হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের শাসন রুশিয়ার সম্রাটও মানিয়া চলিতে বাধ্য। রুশিয়ার ধর্ম্মমঠগুলিও রুশিয়ার স্বধর্ম্ম ও বিশেষত্বের কম সহায়তা করিতেছে না। পাশ্চাত্য-জগতের নৈয়ায়িক গবেষণাপেক্ষা, এই মঠগুলির শিক্ষাপ্রণালী রুশিয়ার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন অতি সুন্দরভাবে গঠিত করিয়া থাকে। ইউরোপ শুষ্ক জ্ঞানের রাজ্য, কিন্তু প্রকৃত ভক্তি তথায় কম। কেবল রুশিয়া সেই ভক্তিবলে বলীয়ান। জ্ঞান ভক্তি দ্বারাই সরল সজীব এবং সম্পূর্ণ হইয়া উঠে। রুশিয়া তাহার বর্ত্তমান চিন্তাপ্রণালীতে এই ভক্তির শক্তি যোজনা করিয়া ইউরোপকে এক নব সভ্যতার পথ দেখাইতেছে। গ্রীসদেশীয় ধর্ম্মযাজকগণের সহিত রুশিয়ার একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য-জগৎ গ্রীক-দর্শনগুলিকে অবহেলা করিয়াই আজ অধঃপতনের পথে ধাবমান। মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাপার জানিতে হইলে গ্রীসের চিন্তাশীলতার ভিতর প্রবেশ না করিয়া উপায় নাই। একত্ব এবং বিশ্বাসই গ্রীক সভ্যতার প্রধান লক্ষ্য ছিল। গ্রীসীয় সভ্যতারও গ্রীক-চার্চ্চ অনুমোদিত খৃষ্টধর্ম্মে অনেক ক্রিয়া পদ্ধতি ও আচার নিয়ম আছে বলিয়া পাশ্চাত্যজগতের চক্ষে গ্রীসীয় সভ্যতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়াই বিবেচিত হয় কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে তাহার ক্রিয়া পদ্ধতিগুলির মধ্যেও অনেক সুগভীর তত্ত্ব ও সাধু উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। গ্রীসের সভ্যতা যে আমাদিগের হিন্দুসভ্যতার নিকট একসময়ে ঋণী ছিল তাহা এখনও গ্রীসের প্রতিমা পূজা (ikons) সাক্ষ্য দিতেছে রুশিয়ার সর্ব্বত্রই ওই ইকন-পূজা এখনও চলিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য রুশিয়া ও ভারতবর্ষের সভ্যতায় খুব অল্পই প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মেখুল; স্লাভোফীল-নেতা ও রুশিয়ার জাতীয় কবি Kireivesky রুশিয়ার পৌত্তলিকতার প্রতি কিরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আমি ইংরাজীতেই কিরীএভস্কীর প্রাণের উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

I stood once in a chapel looking at miracle-working ikon of the Virgin and I thought of the child-like faith of the people that were praying to it. Some women, a few sick and old persons were standing on their knees, making the sign of the cross and bowing before the image. I looked up with fervent hope to the holy face and by and by, the secret of its miraculous power dawned upon me. It is not a mere board covered with painting···in the course of centuries it has been absorbing those currents of impassioned prayer from people in grief and misery and it has become a living medium, a means of communication between the Creator and

His peoples while thinking so, I looked again at the old men, at the women with their children bowing in the dust, and then at the ikon—and I saw the features of the Virgin were alive she looked with pity and love on these poor people, and I fell on my knees and prayed o Her in all humility."

যে কিরীতেস্কী আজ ikonএর নিকট নতজানু হইতে শিখিয়াছেন ইনিই এক সময়ে পাশ্চাত্য-সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক ভাবুক ছিলেন তাহা আমরা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু আজ কিরীতেস্কীর কি অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন। কিরীতেস্কী রুশিয়ার প্রতিভাবান জাতীয় কবি, তাঁহার হৃদয় একণে দেশাত্মবোধে আপ্লুত! তজ্জন্য আজ কিরীতেস্কী স্বদেশের কুসংস্কারগুলিকেও রুশিয়ার জাতীয় অভ্যুত্থানের সহায়ক বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন। রুশিয়ার অতি তুচ্ছ পদার্থকেও আজ এই দূরদর্শী কবি আপনার জাতীয় জীবন গঠনকল্পে ক্রোড় দিতেছেন। এ দেশের যদি কখনও জাগিবার দিন আসে তাহা হইলে আমাদিগকে ইতুপূজাটীকেও বাদ দিলে চলিবে না। ওই ইতুপূজার সরাটীতে যে আমার সমগ্র বঙ্গদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের অন্তঃপুরের ইতুপূজার মধ্যেও যে আমাদিগের জাতীয় জীবনের ভিত্তি ও ঐকান্তিক দেশাত্মবোধ আপ্লুত মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান রহিয়াছে। আছে সবই, কেবল সাধকের অভাব, প্রকৃত সন্তানের অভাব—ভক্তের অভাব। কিরীতেস্কীর প্রতিমাপূজা দেখিয়া আমরা চৈতন্য লাভ করিব কি? রূপের ভিতরে, রূপকের ভিতরে আমাদের স্বদেশের এবং স্বজাতির যথার্থ স্বরূপকে দৃঢ়তার সহিত ধরিতে হইবে। মনে রাখিও ভাই, হিন্দুর পৌত্তলিকতা নিরর্থক হইয়া অস্ত্রগ্রহণ করে নাই, ইহারও একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে, একটা নিগূঢ় অর্থ আছে! আমরা নিদ্রিত বলিয়াই এই সব দেবদেবী আমাদের চক্ষে নিদ্রিত। আমরা জাগিলেই ইহারাও জাগ্রত মূর্ত্তিতে (living medium) প্রকট হইবে। এখন গঙ্গাকে অনেক পরধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন বঙ্গসন্তান 'খানা' বলিয়া তাচ্ছল্য করিতে পারেন কিন্তু এই গঙ্গাস্নান মানসে যে দূর দূরান্তর হইতে আবহমানকাল ধরিয়া গঙ্গাদেবীর নিকট কোটী কোটী ভারতসন্তান মাথা নামাইয়া আসিতেছে, ইহার কি কোন অর্থ নাই—গঙ্গার তীরবর্ত্তী তীর্থসমূহের কি কোন মাহাত্ম্য নাই? সবই কি ভ্রান্ত বিশ্বাসে ও কুসংস্কারে পূর্ণ! বিশ্বাস—বিশ্বাস—এই অটল বিশ্বাসের উপর সমগ্র হিন্দুস্থান আজিও দণ্ডায়মান। গঙ্গার সম্বন্ধেও কি আমরা কিরীতেস্কীর কথায় বলিতে পারি না—"it (ikon) has become a living medium, a means of communication between the Creator and His people." শুধু গঙ্গার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালাকে কেন? গঙ্গাতীরের প্রত্যেক বালুকণাকেও আমাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাসের দ্বারা সজীব করিয়া রাখা উচিত। জড়ের বশীভূত না হইয়া জড়কে জাগ্রতরূপে দেখাই আমাদিগের দর্শনের গোপনীয় রহস্য! আমরা জীবন্ত মূর্ত্তিতে এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকে দেখিয়া থাকি তজ্জন্যই আমাদিগের ধর্ম্মে বহুদেববাদ—তেত্রিশ কোটী দেবতা! আমাদিগের হিন্দুজীবনের উদ্দেশ্য কি? অভিপ্রায় কি? তাহা ভুলিয়াই ত আজ আমাদিগের

এতাদৃশ অধঃপতন! আত্মবিস্মৃত হিন্দু, তুমি তোমাকে চিনিতে শিখ; খুঁজিয়া দেখ কোথায় তোমার স্বরূপ! অপর জাতির সঙ্গে তোমার প্রভেদ এই যে তুমি জড়কে জীবন্ত মূর্ত্তিতে দেখ—অপর জাতি জড়ের দাসত্ব করিয়া থাকে। জড়ের ভিতরে আত্মার অনুভূতি তাহাদিগের নাই।

সমগ্র ইউরোপীয় দর্শনে, বিশেষতঃ জার্ম্মাণ দর্শনে পিটার কিরীভেস্কীর ভ্রাতা জন কিরীভেস্কীও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতার ক্রোড়ে কিরীভেস্কীদ্বয় আশৈশব লালিত পালিত হইয়া কেন যে এইরূপ শেষ জীবনে সৌত্তলিক হইয়া পড়িলেন তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। স্লাভনেতা জন কিরীভেস্কীর মতে, The character of a nation settles gradually into a frame as solid and unchanging as the limbs of a grown-up man. এই জন্যই John স্লাভের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া সরল ভক্তি বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার পথিক হইয়াছিলেন। আধ্যাত্ম-বিভাবলে তিনি মানবজীবনের অনেক নিগূঢ় রহস্য ভেদ করিয়া গিয়াছেন। একটা পরিণত বয়স্ক মানবের নির্ভরশীল পরবর্ত্তের ন্যায় একটা জাতির চরিত্রও সুদৃঢ় এবং অটল হইয়া দাঁড়ায়, ইহাই সুক্ষদর্শী জন কিরীভেস্কীর সিদ্ধান্ত। রুশিয়ার উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতি ও সদ্ভাব স্থাপনাই কিরীভেস্কীদ্বয়ের জীবনব্যাপী সাধনা। রুশিয়ার পল্লীভাব প্রবর্ত্তন গ্রাম্য-কথা (folk-tales) ও প্রাচীন রীতি নীতি লইয়াই পিটার কিরীভেস্কীর লেখনী-সঞ্চালন অধিকাংশ ইহার ভ্রাতা জন কিরীভেস্কীও এই ভাব আলোচনকে এক সুমহান দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সতত চেষ্টাশীল ছিলেন।

স্লাভোফিল দলের একজন বিরুদ্ধবাদী Nicholas Stankwitch এই সব গ্রাম্য রীতি নীতি ও পল্লীভাব প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে বলেন—Why are people so busy with popular tradition? The aim ought to be the humane that which is peculiarly ours is bound to assert itself whether we wish it or not." কিন্তু স্লাভোফিলগণ এতটা উদার হইতে চাহে না। তাহারা তাহাদের পুরাতন প্রথা গ্রাম্য-কুসংস্কারের মধ্যেও আপন স্বাভাবিকতা ও দেশাত্ম-বোধ খুঁজিয়া পায়।

কিরীভেস্কীদ্বয় স্লাভোফিলদলের ভিতর দেশাত্মবোধের বীজ পুঁতিয়া যান তাঁহাদের মহতী চিন্তা ও সাধনা আজ অন্যান্য স্লাভোফিলগণের সমবেত চেষ্টা মহতী সিদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে। এমন কি বর্ত্তমান শতাব্দীর পল্লীসংস্কারক ও জাতীয়তা রক্ষক Tolstoy ও Dostoyevesky স্লাভোফিল না হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে পুরাতন গোঁড়ামীর পক্ষপাতী। এই উক্তির সমর্থনের জন্য আমরা Vinogradoff এর কথাই তুলিয়া দিলাম, যথা—

Tolstoy and Dostoyevesky, the enthusiasts of the village community, present-day nationalists, adherents of a mystic revival of orthodoxy, were not and are not Slavophiles, but one hears familiar slavophile strains in their addresses. ইহার উপর এই স্লাভদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস।

কুসংস্কার

"In all superistition wise men follow fools."—Bacon.
"Automatism to intelligence turns conduct
into stupid idolatry."

১। কুসংস্কারের স্থান

প্রত্যেক সমাজবদ্ধ মানবমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি বিধি নীতিশাসন প্রচলিত থাকে, বস্তুতঃ একজাতীয় কতকগুলি মানব নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী সাধারণ নিয়মে পরিচালিত হইলেই তাহাদের সমষ্টিকে একটি সমাজ বলা যায়। এখনকার মনীষিগণের মতে ঐ সাধারণ নিয়মগুলি সমাজবদ্ধ সর্ব্বাধিক জীবের সর্ব্বাধিক উৎকর্ষ-নির্দ্দেশক হওয়াই প্রকৃত সমাজের গঠনপদ্ধতি—"Greatest happiness to the greatest number of individuals." সমাজনিবদ্ধ প্রত্যেক জীবের স্বার্থ এক আর সমষ্টিসমাজের স্বার্থ অন্য—এইরূপ দুই স্বার্থের অনেকসময়ে পরস্পর বিরোধ হয়; সে ক্ষেত্রে সমষ্টি স্বার্থে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের পরিচালন করা হয়, অন্যথা সমাজ নিজে ভগ্ন হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সমাজবদ্ধ জীবের বিপুল সামাজিক উপকারসমূহ বিনষ্ট হয়। এই জন্যই সমাজের শাসনক্ষমতা বিদ্যমান আছে ও সেই শাসন দোষী অবনতমস্তকে গ্রহণ করিতেছে। সেই সমাজই সম্পূর্ণ সমাজপদবাচ্য যাহার সমষ্টি স্বার্থ ও মণ্ডলীস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ একমুখী ও সমান; সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি। এইরূপ সামাজিক উন্নতিকল্পে নিজোন্নতি চেষ্টা করা সামাজিক জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। "Social instincts originate from the good of the community."

এই সামাজিক রীতিনীতি বিবিধ আজ্ঞাধীন—এক নির্দ্দিষ্ট শাসকের আজ্ঞা, যেমন শাস্ত্রাজ্ঞা, রাজাজ্ঞা প্রভৃতি; আর এক অনির্দ্দিষ্ট শাসকের আজ্ঞা যেমন লোকাচার, মানসম্ভ্রম জ্ঞান, ন্যায়ান্যায় বিবেচনা, স্বাভাবিক নিয়ম প্রভৃতি। এ সকলের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞা মাত্রে অর্থাৎ প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থা, রাজাজ্ঞা, এবং স্বাভাবিক নিয়মাবলী প্রভৃতির শক্তি, সাধারণ হ্রাসবৃদ্ধিহীন, অপরিচ্ছিন্ন ও সমভাব কিন্তু, লোকাচার প্রভৃতি অবশিষ্ট অনির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞার (অর্থাৎ যাহাদের উৎপত্তিকারণ চাক্ষুষ সোচর নহে) শক্তি নিয়মবিগর্হিত, নানাবিধ, ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র। আবার সমাজগত বা জাতিগত কোন কোন রীতিনীতি রাজশাসনাজ্ঞাধীন হওয়ার প্রথম অবস্থাপন্ন হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয়বিধ অনির্দ্দিষ্ট শাসকাজ্ঞাজনিত রীতিনীতির মধ্যেই কুসংস্কার বিদ্যমান থাকিতে পারে।

২। শাস্ত্র ও কুসংস্কার

এক্ষণে মুখবন্ধেই একটি জটিল বিষয়ের কথঞ্চিৎ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক। উপরে বলা হইয়াছে যে প্রকৃত শাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থার মধ্যে কুসংস্কার স্থান লাভ করিতে পারে না—এ কথাটী কতদূর সত্য তাহা

নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য; কারণ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রশাসনে বহুতর কুসংস্কার আশ্রয়লাভ করিয়া স্থানে স্থানে ধর্ম্মশাসনকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিয়াছে, স্থানে স্থানে তাহারা নিজেরা ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া সরল মানবের মনে ভ্রম উৎপাদন করিতেছে ইহার কারণ নিম্নে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। এক্ষণে প্রথমতঃ জানা উচিত হিন্দুর বেদ, মুসলমানের কোরাণ ও খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেলের ন্যায়, ন্যায়শাস্ত্র সম্মত প্রামাণ্য গ্রন্থ; ঐ সকল গ্রন্থের বিধিব্যবস্থা ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ, অতএব সাধারণের বিচার্য্য নহে।

অনেক বিষয়ে মানবের সঠিক কারণ জানিবার সামর্থ্য বা উপায় নাই, সে ক্ষেত্রে অনেক বাদ বা মতের সৃষ্টি হইয়াছে। সমান ন্যায়সঙ্গত বিভিন্নবাদ ভিন্ন ভিন্ন সমাজে বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত আছে তাহা কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা করা অন্যায়। যেমন বিভিন্ন জাতীয় পরলোকবাদ প্রভৃতি। কিন্তু, ন্যায়ানুমোদিত বিচারবুদ্ধির বিরুদ্ধবাদ বা কল্পনা কুসংস্কার মধ্যে গণ্য, যেমন মরিলে ভূত হয়, প্রভৃতি। আবার কেবলমাত্র কারণ অজ্ঞাত বা সঠিক প্রমাণযোগ্য না হইলেই কোন মত কুসংস্কার হয় না। অনেক প্রাচীন বাদ পুরাকালে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য ছিল তখন তাহা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইত না; এক্ষণে, কিন্তু জ্ঞানাধিক্যে ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করা কুসংস্কার। যেমন সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে—বিশ্বাস করা এক্ষণে কুসংস্কার। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধ সম্বন্ধে কয়েকটী নিয়ম পালন করিলে কুসংস্কার হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন—

(১) যে সকল কার্য্যের পারত্রিক ভিন্ন ঐহিক কোন ফল দেখা যায় না তাহা নিরর্থক অতএব ত্যাজ্য। যেমন কুনিমিত্তাদি, জ্যোতিষ করবেখাদি।

(২) হানিকর নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য সকল সময়ই ত্যাজ্য। অনন্যায়; নিয়ম প্রভৃতি।

(৩) ন্যায্য বিচারসিদ্ধ কার্য্য করণীয়; ফল শ্রুতি দেখিয়া বা মনোগত বৃথা কারণোদ্ভূত বলিয়া কুসংস্কার হইতে পারে না। যেমন, এক সূর্য্যে দ্বিভোজন নিষেধ, পক্ষে পলায়ন দান।

(৪) যে সকল সৎকার্য্যের কারণ বা উদ্দেশ্য আমরা জ্ঞাত নই তাহাও পালনীয়। যেমন সূর্য্যোদয় বা অস্ত দর্শন করিতে নাই প্রভৃতি।

৩। অসভ্য সমাজে কুসংস্কার

এই কুসংস্কার নামক মহৎ সামাজিক অনিষ্ট ও লৌকিক দোষ প্রায় সকল সমাজেই অল্পাধিক বিদ্যমান; এমন কি সমধিক সভ্যতাভিমানী সমাজেও ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে অধিক চেষ্টা করিতে হয় না। তথাপি অসভ্য সমাজেই ইহা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় কুসংস্কার অসভ্যতার আনুসঙ্গিক চিহ্নে পর্য্যবসিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। বাস্তবিকপক্ষে, এক এক নীচ সমাজের বিকট অভাবনীয় কুসংস্কার রাজ্যের পরিমাণ বিস্তার ও আধিপত্য দর্শন করিলে প্রকৃতই স্তম্ভিত হইতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ মিশরবাসীদিগের সম্মুখের দাঁতভাঙ্গা, আফ্রিকার ঠোঁট বিদ্ধকরা, কামস্কাটকায় মৃতদেহ প্রেতাত্মার উপকারার্থ কুকুরকে খাওয়ান, অষ্ট্রেলিয়ায় মৃতস্ত্রীর সাথে সঙ্গে অপর কোন জাতির এক স্ত্রীলোককে হত্যা করা, মানববলিদানে ঈশ্বরের তুষ্টি,

নির্দ্দোষীতার পরীক্ষা বিষপানে বা অগ্নি-পরীক্ষার প্রভৃতি কতবিধ আশ্চর্য্যজনক কাণ্ড পৃথিবীর নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়; এতদ্ভিন্ন ভূতপ্রেত ডাকিনী সংক্রান্ত কত প্রকার অদ্ভুত গল্প ও ধর্ম্মমত (Feticism) বিদ্যমান আছে।

এইরূপ কুসংস্কার ব্যক্তিগত জাতিগত ও সমস্ত সমাজগত এই ত্রিবিধভাবে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। আচার ব্যবহার রীতি-নীতি বিশ্বাস বিষয়ের অস্বাস্থ্য মাত্রকেই কুসংস্কার সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কুসংস্কারের উৎপত্তি ও বিস্তার সম্বন্ধেও নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। এক এক সমাজে এক এক বরণে কুসংস্কার অধিক পরিমাণে বিদ্যমান; এক এক মণ্ডলীর এমন কি এক এক মানবের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন কুসংস্কার আছে। নিকটস্থ পর্ব্বত বা গ্রামস্থ কোন বৃক্ষাদি উপলক্ষ করিয়া কত কুসংস্কার সৃষ্ট হয় ও তত্রত্য লোকে বিশ্বাস স্থাপন করে; এগুলি স্থানীয় কুসংস্কার। এক্ষণেও প্রতিনিয়ত যে কতবিধ উপায়ে কত শত রকমের কুসংস্কার জগতে সৃষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। একটি অতিশয় প্রত্যাশিত বিষয়ের সত্যমিথ্যাদি সন্দেহস্থলে অনেক মানব কোন একটি অপ্রাসঙ্গিক ঘটনার উপর যেমন সহসা যে কোন পুস্তকের জোড় কিম্বা বিজোড় পৃষ্ঠা উন্মোচনাদি বা টাকার সোজা বা উল্টাপিট পাতনে, প্রভৃতিতে—সে বিষয়ের স্থিরতা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, গুরুতর ও গাঢ়তর কুসংস্কার অসভ্য সমাজে বা যে সকল সমাজে ন্যায়ানুগ শাসন ও সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অধিক বিস্তার প্রাপ্ত হয় নাই সেই সকল সমাজেই স্থানলাভ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৪। কুসংস্কারের উৎপত্তি

আচার ব্যবহার রীতিনীতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তৎ তৎ বিষয়ের কুনীতির উৎপত্তি অনুমান করা যায়। রীতিনীতির উৎপত্তি এবম্বিধ:—

"A custom is a long and generally observed course of conduct. It originated originally in the conscious choice of the more convenient of two acts or sometimes in the accidental adoption of one of two indifferent alternatives; the choice in either case having been deliberately accidentally repeated till it ripened into habit." This is "the mode in which a path is formed across a common" (Holland)

The cause of a habitual course of conduct is "some ground of expediency, of religious scruples or of accidental suggestion" (Maine)

(ক) অজ্ঞান হইতে ভূতাদি সংস্কার

অসভ্য ও অজ্ঞান অবস্থায় মানব সচরাচর ভয়ের অধিকতর বশীভূত হয় আর নিজ নিজ ভালমন্দের দিকে অধিক লক্ষ্য রাখে। পরার্থ বা পরোপকারে লক্ষ্য করা উচ্চ অন্তরের পরিচায়ক। কিন্তু জ্ঞান সে সময়ে সীমাবদ্ধ, ভ্রমোদ্ভূত। প্রথমতঃ নিজ বিভিন্নাস্তিত্ব জ্ঞান জন্মে (Self conciousness) ক্রমে আত্মার (Spirit or Soul) জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। স্বপ্নে ও মৃত্যুর পর মানবের আত্মার কাল্পনিক অবস্থা লইয়া ভূতপ্রেতের কুসংস্কার রাজ্যের সৃষ্টি। ভালমন্দের জ্ঞান হইতে ভূতপ্রেতও ভালমন্দকারী হইল। মানবের ভবিষ্যৎ

জানিবার ইচ্ছা স্বতঃই প্রবল; যখনই কোন বিষয়ের কারণ চাক্ষুষ দেখিতে পায় না তখনই তাহার কাল্পনিক কারণ অনুসন্ধান করে; এই ভূতপ্রেত দল সেই সকল বিষয়ের কর্ত্তা হইয়া বসিল। মানব ভাল অপেক্ষা মন্দের কারণই বিশেষ অনুসন্ধান করে তজ্জন্য মন্দকারী ভূতের সংখ্যাই অধিক—তাহারা আসিয়া অলক্ষিতে মানবের অনিষ্ট করিয়া যায়. বিশেষ বিশেষ সুযোগে তাহাদের আসিবার সুবিধা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভূতপ্রেত নিবারণকারী ঔষধও লোকের প্রয়োজন হইল। ক্রমে কোন কোন জীবিত লোককেও মন্দকারী ভূতসদৃশ জীব বলিয়া ধারণা জন্মিল—ডাকিনী, প্রভৃতি, তাহারা অবাধে সকলের মন্দ করে, তাহাদের আত্মা দেহ হইতে বাহির হইতে পারে, অপরদেহে এমন কি পশুপক্ষীর দেহেও প্রবেশ করিতে পারে; এর ফলে ক্রমে ডাকিনী-যোগিনী-তন্ত্র অভিচারাদির সৃষ্টি হইল। ভূত মন্দ কার্য্যের অজ্ঞাত কারণের নামান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপরদিকে, ভাল কার্য্যের কারণ নির্দ্ধারণ হইতে বিবিধ দেবদেবীর উপাখ্যানের উৎপত্তি অনুমান করা যায়। এই বিভিন্ন আত্মার জ্ঞান এমন কি পশুর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন কুক্কুর বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের দিকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করে।

(খ) ভবিষ্যৎ জানিবার ইচ্ছা হইতে
সামুদ্রিক শাস্ত্রাদি

মানবের ভবিষ্যৎ জানিবার আশা হইতে আর এক প্রকার কুসংস্কার-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। সামুদ্রিক ও জ্যোতিষ শাস্ত্র। ইহার দ্বারা একদিকে গ্রহাদির জ্ঞানের উন্নতি হইলেও অপরদিকে অজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। এখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানা যায় নাই করতলাদি বা গ্রহাদির সহিত মানব জীবনগতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না। অবশ্য গ্রহাদির আকর্ষণ ফলে (একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা) মানবের শারিরীক অবস্থার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। কেহ কেহ বলেন বহুদর্শনের ফলে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি অর্থাৎ রেখা আকার প্রকারাদি দর্শন করিয়া ফল মিলাইয়া এই শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। এ বিষয় লইয়া অনেক বিদ্যাভিমানী পর্য্যন্তও অনেক কালক্ষেপণ করিয়াছেন, সামান্য যোগাযোগ লক্ষ্য করা ভিন্ন ভগবানের ক্ষুদ্রজগতের মানবকরচিত্রলিপি বা তাঁহার বৃহৎজগতের ব্যোমপ্রদেশের চিত্রলিপি কেহ যে পাঠ করিতে সমর্থ হইতে পারেন তাহাতে বিশেষ সন্দেহ বর্ত্তমান। যাহাহউক, প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক কথায়, প্রতি বৃক্ষপত্রপতনে, পক্ষীর রবে মানবের অদৃষ্ট আবদ্ধ করিয়া রাখা সমাজের মঙ্গলজনক উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

"There is something in our very consciousness which tells us that we are not mere products of chance."

মানবের ভবিষ্যৎ জানিবার এতই প্রবল ইচ্ছা যে কোনরূপ বাহ্যিক প্রমাণের সহিত —যতদূর দূরবর্ত্তী, অস্পষ্ট ও সামান্য হউক না—একটু সামঞ্জস্য পাইলেই একটিকে অপরের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া হাফেজের ন্যায় পর পর ফল অনুসন্ধান করিয়া বহুদূর গমন করিয়া থাকে। এরূপ কল্পনারাশির যে কোনও ফল কারণের সহিত সাধারণভাবে মিলিবে না তাহা একান্ত অসম্ভব। সেই সামান্য এক আধটি মিল স্মরণ রাখা হয়। অমিল বহু ঘটনা অগ্রাহ্য করা হয়। তখন সেই কুসংস্কার

আরও প্রচলিত ও দৃঢ়-ভিত্তি-সম্পন্ন হয়। একবার প্রতিষ্ঠিত হইলে পর অন্তে জ্ঞান সত্ত্বেও অভ্যাসবশতঃ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় না।

"A habitual course of conduct, once formed, gathers strength and sanctity every year. It is generally believed to be salutary, and any deviation from it is felt to be abnormal and immoral."

তৎপরে অগ্রাহ্য করিলে কুফলের ভয় প্রদর্শন করা হয়। অনেক কুসংস্কারই আদিতে নিরর্থক অলস ভ্রান্ত লোকের মস্তিষ্ক-সম্ভূত খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই নহে ("All prejudices are effects of malobservation"); কিন্তু, কালপ্রভাবে সেই বৃথা খেয়াল দৃঢ় সত্য স্বরূপে পরিণত বেদবাক্যের ন্যায় অপরিহার্য্য ও প্রতিপাল্য হয়।

(গ) তুলনা দ্বারা সুনীতি হইতে কুনীতির সৃষ্টি

সুনিয়ম হইতেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক সময়ে কুনিয়মের আবির্ভাব হয়। শাস্ত্রোক্ত অনেক বিধি নিষেধ প্রভৃতির কারণ সাধারণের বোধগম্য নহে, তাহারা কল্পিত কারণ প্রদর্শন করে। তৎপরে তুলনা দ্বারা ঐ কল্পিত কারণের অন্যান্য নিরর্থক ফল উহার সহিত সংযুক্ত করা হয় কিম্বা উক্ত সুনিয়মের অনুরূপ যে কোন কার্য্যকে একত্র করিয়া বহুবিধ বিধিব্যবস্থা নিয়মাদির সৃষ্টি করা হয় ইহার অধিকাংশই কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"The customs are, of course, obeyed by multitudes who are incapable of understanding the true ground of their expediency and who are, therefore, left inveritably to invent superstitious reasons for their permanence. A process then commences which may be shortly described by saying that usuage which is reasonable generates usage which is unreasonable. Analogy the most dangerous of snares. Prohibitions and ordinances originally confined, for good reasons, to a single description of acts are made to apply to all acts of the same class, because a man menaced with the anger of gods for doing one thing, feels a natural terror in doing any other thing which is remotely like it. After one kind of food has been interdicted for sanitary reasons, the prohibition is extended to all food resembling it, though the resemblance occasionally depends on analogies the most fanciful. So, again, a wise provision for insuring general cleanliness dictates in time long routines of ceremonial ablution." (Maine's Ancient Law).

(ঘ) অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারাশায় বা স্বার্থসিদ্ধির মানসে

অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য, জনসাধারণের নিকট প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত করিবার মানসে স্বার্থসিদ্ধি করণার্থে পুরোহিত ধর্ম্মযাজকাদি অনেক স্বকপোলকল্পিত কুসংস্কারের

সৃষ্টি করিয়াছেন, শিক্ষা ও প্রশ্রয় দিতেছেন। ফলশ্রুতি ভয়প্রদর্শন নানাবিধ তীর্থের গল্প ও করণীয় অধিকাংশ এই অর্থে সৃষ্ট। অবশ্য শাস্ত্রীয় অনেক ক্রিয়া উচিত ও একান্ত করণীয়, সেগুলিতে সকলের দৃঢ়ভাবে মনাকর্ষণ করিবার জন্য শাস্ত্র অনেকস্থলে অত্যুক্তম বা অতিরিক্ত কল্পনা প্রদর্শন করিয়াছেন। ন্যায়-সঙ্গত কর্ত্তব্য উপকারী ক্রিয়ার সহিত বৃথা অশাস্ত্রীয় নিরর্থক ক্রিয়াকলাপ বিজড়িত করা অধিক কঠিন নহে। রাজবিপ্লব বা ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময় অনেক যথেচ্ছাচারিতার উদ্ভব হয় তজ্জন্য ঐ সময়ে বা কোন দৈব দুর্ঘটনার সময়ে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত এইরূপ অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ—অনাবৃষ্টির সময় গ্রামস্থ শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে বা বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের সময় কোন নিম্নবৃক্ষ শীতলাদেবীর অধিষ্ঠান হওয়া সম্বন্ধে অনেকে স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়। কোন মানবাদৃষ্টে নিজ কর্ম্মফলে উপর্য্যুপরি বিপদপাতে তৎপ্রতি দৈবগ্রহের কোপ ধারণা প্রভৃতি।

(৬) স্তুতিবাদক ও কবিদিগের সৃষ্টি

আর এক প্রকার কুসংস্কার সৃষ্ট হইয়াছে স্তুতিবাদক কবিদিগের বর্ণনায়। রামায়ণ মহাভারত পুরাতন ইতিহাসাদির কথা ত্যাগ করিলেও ঐতিহাসিক কালেও ইহার উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাদসা সেকন্দর আপনাকে জুপিটর এমনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন। তজ্জন্যে পরবর্ত্তী কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন, কিরূপে জুপিটর সেকেন্দরের মাতাকে বিবাহ করেন কিরূপে সেকেন্দরের জন্ম হয় প্রভৃতি। এইরূপে অধিকাংশ পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সৃষ্টি হইয়াছে;—আকার, বল, চরিত্র ও গুণের তুলনায় মানবকে এক এক দেবদেবীর পুত্র কন্যা কল্পনা করা হয়, যেমন, কবি কালিদাস সরস্বতী দেবীর বরপুত্র।

ধর্ম্ম ও কুসংস্কার

এইরূপে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান উৎপত্তির বহু পূর্ব্বে ভূতাদিগত কুসংস্কার সৃষ্ট হয়, পরে এইরূপ কুসংস্কার সমষ্টিই একপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয় (Fetisism); ইহা অসভ্য সমাজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কুসংস্কার। বিপরীত পক্ষে আবার প্রকৃত ধর্ম্মে ক্রমে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতগণের অত্যাচারে অনেক কুসংস্কার সংযুক্ত করিয়া সেগুলিকে ধর্ম্মের অংশীভূত করা হইয়াছে যেমন, চৈতন্যদেবের পবিত্র ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমোদজনক ইন্দ্রিয়-বিলাসযুক্ত ক্রিয়াকলাপ, প্রভৃতি। প্রকৃত ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের সম্বন্ধ এইরূপ—"Fear of power invisible, feigned by the mind or imagined from tales publicly allowed is religion; not allowed, superstition. And when the power imagined is truly such as we imagine, true religion." (Hobb's Leirathan)

কুসংস্কারের বিভাগ

তাহা হইলে বুঝা গেল কুসংস্কার প্রধানতঃ ত্রিবিধ;—(১) শাস্ত্রীয় বা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কুসংস্কার-রাজ্য—ইহা প্রবল প্রতাপ সম্পন্ন, মহানিষ্টকর, ভ্রমোৎপাদক। (২) সামাজিক এবং ভবিষ্যৎ জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশে জ্যোতিষ ও ভূত-প্রেতাদি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার-রাজ্য—ইহাও শক্তিশালী, চিত্তবিমর্ষকারী, ক্ষতিকারক। (৩) মেষেলী সমাজের অশেষবিধ কুসংস্কার—ইহা নিরর্থক, অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যাস্পদ। যেমন রোমানদিগের গুপ্ত সংখ্যা, ইংরাজদিগের ত্রয়োদশ, আমাদিগের ডিন শক্র, হাঁচি,

টীকটীকির বিষয়, পশ্চাতে আহ্বানাদি, পূর্ণকুম্ভ শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি কতবিধ রকমের শত শত বদ্ধমূল কুসংস্কার। যে সকল দ্রব্যাদি স্বতঃ মনের প্রফুল্লতা নষ্ট করে তাহা বর্জ্জনীয়; ইহার অনেকগুলি আমাদিগের মনকে পূর্ব্ব হইতে তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া মনের প্রফুল্লতা হরণ পূর্ব্বক কুফল আনয়নের সাহায্য করে।

৫। কুসংস্কারের শক্তি এবং ফলাফল

কুসংস্কারের উৎপত্তি যাহাই হউক না কেন ইহার প্রবল প্রতাপ অখণ্ডনীয়। মানবের মন, এমন কি ন্যায়ানুগ বিচারসাপেক্ষ মানব মনও ইহার প্রতাপে পরাজিত। কি কদভ্যাস! সম্পূর্ণ নিরর্থকতা উপলব্ধি হওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ অযুক্তিকর বলিয়া ধারণা হইলেও, একেবারে সত্বহীনতা দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কি এক অদৃশ্য বলের বশবর্ত্তী হইয়া, কি এক অব্যক্তভয়ের অধীন হওতঃ মানব মন ক্রীতদাসের ন্যায় ঘৃণিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ঐ কুনিমিত্ত সকল দৃষ্ট হইতেছে—দিবসে পেচক ডাকিল, সন্ধ্যায় কুক্কুট ডাকিল, সূর্য্যে কলঙ্ক দৃষ্ট হইল, গৃধ্র গৃহছাদে বসিল, দক্ষিণে শৃগাল বামে মৃত সর্প, এ বৎসর তিনটী গ্রহণ ধূমকেতু দেখা দিল—আর রক্ষা নাই; এ বৎসরের ফলাফল বড়ই মন্দ! না জানি কি হয়! মুখ মলিন হইল, প্রাণ নিরুৎসাহময় হইল। হায়! তোমার ঐ ভাব অগ্র হইতেই নৈষ্ফল্য ডাকিয়া আনিতেছে। হইতে পারে দৈনিক মাসিক বা বার্ষিক ঘটনাপর্য্যায় কখন কোন দুর্ঘটনা ঐ কুনিমিত্তের দিবসে মাসে বা বর্ষে ঘটিয়া থাকিবে; সে ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটনার নিজ স্রোতেই ঘটিয়াছে, কুনিমিত্তের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই কারণ ঐরূপ দুর্ঘটনা কুনিমিত্ত বিহীন হইয়াও অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু কুসংস্কার-তমসাচ্ছন্ন মন ঐ সম্মিলন দিবস মাস বা বর্ষ তীক্ষ্ণভাবে স্মরণ করিয়া রাখে, অমিলনের সংবাদ আদৌ রাখে না, কেহ তর্ক করিলে ঠিক তারিখ মাস ও বর্ষের উল্লেখ করিয়া নিজ মতের যুক্তি প্রদর্শন করে।

এই কুসংস্কার তমসাচ্ছন্ন মানস কখনও কোন ঘটনা—এমন কি একটি বৃক্ষপত্র পতন, একটি অক্ষর রব সাধারণ নির্ম্মল দৃষ্টিতে দেখিতে পারে না; তাহার দৃষ্টিতে সকলই ভয়ের আধার, মনসঙ্কোচনকারী। ক্রমে মনের স্বাস্থ্য হারাইয়া ঐরূপ লোকেরা প্রত্যেক দ্রব্য কেবল মন্দভাবে দর্শন করে অর্থাৎ উহারা Pessimists হইয়া দাঁড়ায়।

"Certain people are always complaining of their hard lot and poverty. They go about with disaster written in their very faces; they are walking advertisements of their own failures." (Every Man a King).

ইহাদিগের মনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় ও হাস্যের উদ্রেক হয়। লেখক এইরূপ একজন মন্দদর্শীর সহিত একদিবস ভ্রমণ কালে নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার কথাবার্ত্তা শ্রবণ করেন। একটী বাগানের ভিতর একটা সামান্য মাটীর ঢিপি দেখিয়া তিনি বলেন বোধ হয় ইহার নিম্নে কোন কবর আছে; চারিজনকে খালি গায়ে আসিতে দেখিয়া বলিলেন বোধ হয় উহারা মড়াপুড়াইয়া আসিয়াছে, পথের ধারে জলের কলের কাছে যাইতে যাইতে বলিলেন এখানে নিশ্চয় কত লোকে হাতেমাটী করিয়াছে, কলটী নিশ্চয় কতলোকে উচ্ছিষ্ট ও অশুদ্ধ হাতে ছুঁইয়াছে। এইরূপ তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই

সন্দিগ্ধভাবে দর্শন করিয়া আমার মনে একটু দুঃখ হইল, ভাবিলাম এইরূপ ভাবে তিনি কত নিরর্থক কষ্ট ভোগ করেন, শুনিলাম তাঁহাকে নিত্য ৩৪ বার স্নান করিতে হয়। অনেক শুচিবাই-যুক্ত স্ত্রীলোকের বিষয় জানি তাঁহারা অপরিষ্কার, অশুচি, উচ্ছিষ্ট বিচার করিতে করিতে সমস্ত দিবস সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত কেশে যাপন করিয়া হস্তপদে 'হাজা' নামক ঘৃণিত দুঃখজনক চর্ম্মরোগগ্রস্ত হন। তাঁহারা নিজে অন্যবিষয়ে অপরিষ্কারের একশেষ—অতি মলিন বস্ত্র পরেন, পূতিপর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করেন, বস্ত্র সাতবার মলিনজলে সিক্ত করিলেই শুদ্ধ, রজকালয়ের পরিষ্কার বস্ত্র পর্য্যন্ত অতি মলিন উচ্ছিষ্ট ও অশুচির আধার পুষ্করণীর জলে সিক্ত না করিয়া স্পর্শ করেন না, পরিষ্কার কলের জল চামড়া স্পর্শ দোষে অশুদ্ধ জ্ঞানে তাহা পান না করিয়া ঐরূপ পুষ্করণীর জল পান করেন। এইরূপ ও অনুরূপ কদভ্যাস পুরুষদিগের মধ্যে কম হইলেও নিতান্ত বিরল নহে। এ সকল কদভ্যাস বহুবংশে সৃষ্ট ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, ইহাদের উৎপাটনও অনেক সময়-সাপেক্ষ। বস্তুতঃ, কদভ্যাস লৌকিক জীবনে যে কুফল প্রসব করে, কুসংস্কারও সামাজিক জীবনে সেইরূপ কুফল প্রসব করে, কারণ কুসংস্কার সমাজের কদভ্যাস।

অতএব কুসংস্কার দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। মানবের শাসন জন্য ভগবান্ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ব্যাধি, আত্মীয়-বিচ্ছেদ প্রভৃতি বহুবিধ প্রকৃত দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছেন। তদুপরি আমরা নিজে কল্পিত কুসংস্কাররূপ দুঃখ স্বেচ্ছায় সৃজন করিয়া পুনঃ পুনঃ দুঃখভোগ করিতেছি। এই কুসংস্কারে বিশ্বাস এক মহাপাপ কারণ পাপের ফল তাপ, ইহার ফলও তাহাই। এ দুঃখভোগ কে নিবারণ করিবে? কেবল দুঃখভোগ নহে, নিরুৎসাহে কার্য্যহানি, সুযোগ-গ্রহণে বিলম্ব করায় দারিদ্র্য, কলুষিত নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি কতবিধ কুফল ইহা হইতে উৎপন্ন তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? অনেকে বলেন হিন্দুদিগের শাসনকালের শেষ সময়ের কুসংস্কারাধিক্য তাহাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ—ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আহা কুসংস্কারের কুফল কতদূরগামী!

৬। কুসংস্কারের নিরাকরণ

এক্ষণে এই কুসংস্কাররূপ ব্যাধের হস্ত হইতে কে রক্ষা করিবে? সমূলে শাখা-প্রশাখার সহিত একেবারে উন্মূলন করা ভিন্ন অন্য গতি নাই। যদি তাহার সহিত দুই একটী ভাল প্রয়োজনীয় লতাও ধ্বংস হয় তাহা বরং এক্ষেত্রে ভাল, সেগুলি আবার বসাইয়া লওয়া যাইবে; কুসংস্কারের কিন্তু মূল থাকিলেই আবার বৃদ্ধি পাইবে। সমূলে উৎপাটন—সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা—যাহা হয় হউক, শাস্ত্রভয় করিও না, প্রকৃত বৈদিক শাস্ত্র কোনও কুসংস্কার শিক্ষা দেয় নাই। অবশ্য যাহার কারণ বা উদ্দেশ্য বোধগম্য তাহা ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই—যেমন, রাত্রিতে ঝাঁট দিতে নাই—ইহার অর্থ কোন ক্ষুদ্র দ্রব্য নষ্ট হইতে পারে বা কাহার গায়ে আবর্জ্জনা পড়িতে পারে এবং ভালরূপ পরিষ্কারও করা সম্ভব নয় এজন্য দিবালোক থাকিতে থাকিতে ঐ কার্য্য শেষ করা কর্ত্তব্য তবে একান্ত প্রয়োজন হইলে ঐ সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া করায় কোন দোষ হইতে পারে না। ঐরূপ রাত্রিতে আর্সি দেখিতে নাই—ইহার অর্থ লম্পট লোক ভিন্ন কাহারও প্রয়োজন হয় না। অতএব অশুভার অক্ষর অপেক্ষা অর্থের দিকে

অধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যাহা বিচার-সঙ্গত, অর্থযুক্ত, বিবেকানুমোদিত হইবে তাহাই পালনীয়, কেবল মাত্র অনুজ্ঞা আছে, ফলশ্রুতি আছে, না করিলে অমুক দোষ হয় সেই ভয়ে কখনই উহা পালন করা উচিত নহে।

প্রত্যেক সুবিধির শেষ উদ্দেশ্য সুখ। মানবের শেষ গন্তব্যস্থান আনন্দ। এ সুখ কি? পরার্থে না স্বার্থে? পণ্ডিতগণ বহুবিধ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন দুঃখই মানবত্ব-সাফল্যের উপযুক্ত অবস্থা, তাঁহারাও সুখবাদী, তাঁহারা দুঃখেতেই সুখ অনুভব করেন, কারণ-প্রিয়তাই সুখ। সকল সুখই স্বার্থসম্বন্ধে, বস্তুতঃ স্বার্থ ভিন্ন কার্য্যই নাই। পরার্থ আবার কি? পরোপকার করি কেন? পর দুঃখ দর্শনে উৎপন্ন নিজ অন্তঃকরণের দুঃখ অপনোদন করিতে। ঘোর পরার্থবাদীর পরার্থ ই তাহার স্বার্থ। প্রত্যেক নীতি বিধি পালন সুখোদ্দেশে সৃষ্ট, পরিচালিত ও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। উচিত-অনুচিত, ন্যায় অন্যায় এ সকলের অর্থ কি? আমাদের অন্তরে দ্বিমুখীন বিচার উপবিষ্ট—নীতিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা; একটি আভ্যন্তরিক দৃষ্টি, অপরটি ভবিষ্য বাহ্যিক দৃষ্টি, একটি স্বতঃজ্ঞান (Instinct) অপরটি প্রামাণ্য জ্ঞান (Experience)। অন্তরস্থ বহুবিধ সংবৃত্তির সমবায় বিচার ফলই কর্ত্তব্যজ্ঞান। কর্ত্তব্যজ্ঞান স্বতঃ নীতিজ্ঞান ও প্রামাণ্য জ্ঞানের উপর অধিষ্ঠিত। আভ্যন্তরিক জ্ঞান বাহ্যিক আকার ধারণ করিতে অনেকাংশে দেশ-কাল-পাত্র-গত বিকারপ্রাপ্ত হওয়া স্বাভাবিক। নীতিজ্ঞানে "সদা সত্য কথন" একটী সত্য; কিন্তু বাহ্যিক দেশকালপাত্র বিবেচনায় কখন কখন দেখা যায় অপ্রকৃত কথনে সত্য কথাপেক্ষা অধিক সুফল প্রসব করে। এরূপ স্থলে অনেকে মিথ্যা কহিতে উপদেশ দেন। পণ্ডিত মার্টিনিউ বলেন আমাদের মানব জন্ম সম্পূর্ণ নয় তজ্জন্য এইরূপ হয়; যদি সকলেই সম্পূর্ণ সৎ হইত তাহা হইলে এইরূপ সদসতের বিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ে আমাদিগের আভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা শিক্ষা দিবে তাহাই পালনীয়; এরূপ বৃথা মিথ্যাকে পাপ বা নীতি-বিগর্হিত এইরূপ জ্ঞানে জগতের ও পরোক্ষে নিজের অনিষ্ট করা এ ক্ষেত্রে নীতিবিষয়ের এক প্রকার কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে নীতি অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নূতন নীতি সৃষ্টি করে। অতএব ন্যায়াদায় কোনও অবিচলিত চিরস্থায়ী এক সত্য নহে। আমরা বিবেকবিচারে সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিচার করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিব নচেৎ ভ্রমসঙ্কুল পথে পতিত হইব; তবে আমরা নিজে যেন নিজেকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা না করি।

কুসংস্কার মাত্রেই অযুক্তিকর, উন্নতির অন্তরায়, হানিকর বা বৃথা। ইহাদের ফলাফল বিশেষরূপে বিচার করা কর্ত্তব্য; যাহাতে কোন উপকারিতা দেখা যায় না তাহা পালনীয় নহে; কল্পিত বা পারলৌকিক হিত উপকারিতা নহে। ফলতঃ সম্পূর্ণ অলীক। পশ্চাতে আহ্বান করিয়াছে অকৃতকার্য্য হইব, শূন্য কলসী দেখিয়াছি কুফল ফলিবে, হাঁচি পড়িয়াছে বিলম্ব করা উচিত—এবম্বিধ কারণ ও ফলের কোনওরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান নাই, এ সকল পাগলের প্রলাপ জ্ঞানে উপহাসের যোগ্য; যাহারা এ সকলের প্রশ্রয় দেয় তাহাদিগকে পর্য্যন্ত ক্রূরভাবে উপহাস করা কর্ত্তব্য। মন নিরানন্দময় উৎসাহহীন বিচলিত করিবার এইগুলি অন্যতম কারণ, তজ্জন্য ইহা হইতে যাহা কিছু কুফল ফলিতে

পারে। অতএব চলিত কথায় যে বলে,—"যাহার নাই উত্তর পুব, তার মনে সদাই সুখ" অনেকটা সত্য। এরূপ নিরর্থক সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া অন্যায় ও পাপ মধ্যে গণ্য করা যায়। এবম্প্রকার সহস্র সহস্র কুসংস্কার আবর্জ্জনা মুক্ত হইতে নির্ম্মল ঐশ্বরিক বিশ্বাসস্রোতে সাবধানে প্রক্ষালন করিলে মানসক্ষেত্র স্বচ্ছ করিতে পারিলে আর ঐ সকল ঘটনায় মন মলিন হইতে পারে না বা মনের প্রফুল্লতা নষ্ট হয় না। কার্য্যের ফলাফল অন্যান্য যুক্তিযুক্ত কারণের উপর নির্ভর করে, ততক্ষণ সেই সকলের চর্চ্চা করা শ্রেয় স্কর। পূর্ব্ব হইতে ভাবী কুফল চিন্তা করিয়া মনকে পরিতপ্ত করা নিষিদ্ধ, এমন কি, "ঘরে কুতে যদি ন সিধাতি কোহত্র দোষঃ" নিয়মানুসারে প্রকৃত কুফলেও কাহারও অধীর হওয়া অকর্ত্তব্য। কোনও সময়ে কোনও ঘটনায় মনকে নিরাপথ হইতে দেওয়া দোষাকর; কারণ মলিনতাই পাপ; নিরানন্দ জড় সত্তার পতনশীল; সানন্দ জীবভাব, স্বল্পতার, উদ্ভবনশীল। Pessimism কে সুদূর অন্ধকারময় নরকদ্বারে ত্যাগ করা উচিত। Optimism অনন্ত আকাশবক্ষে আমাদিগকে লইয়া গিয়া পরমাত্মার অধিকতর নিকটবর্ত্তী করিতে সক্ষম।

অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যাবস্থায় উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনেক বিষয়ের প্রকৃতাবয়ব দর্শন করিতে পারি। বাস্তবিক বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থার ক্রমোন্নতি আদিম অসভ্যাবস্থা হইতে সুসভ্যাবস্থার ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে তুলনীয়। এইরূপ ক্রমোন্নতির অবস্থা-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল মিথ্যা পূর্ব্বে সঠিক কারণাবধারণে অসমর্থ থাকায় আমাদিগের নিকট সত্যের বলে বলীয়ান্ ছিল, জ্ঞানালোক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই; পূর্ব্বে অন্ধবিশ্বাসে বা কশাঘাত ভয়ে যে সকল নিয়ম পালন করি পরে তাহাদের প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া স্বেচ্ছায় সে সকল পালন করি এইরূপে স্বতঃ অনেক ভ্রমাদ বিদূরিত হইয়া যায়। অসভ্যাবস্থায় বাল্যাবস্থার ন্যায় প্রকৃত কারণ বুঝাও কঠিন এবং তাহা বুঝাইয়া কার্য্য করানও কঠিন তখন কতকটা ধর্ম্ম পুরস্কারের লোভ দেখান বা ফলাফলের ভয় দেখাইয়া কার্য্যে অভ্যাস করান হয়—ইহাই শাস্ত্রীয় ফলশ্রুতি প্রভৃতির যুক্তি যুক্ততা; তৎপরে আমরা সঠিক অবধারণ করিয়া স্বেচ্ছায় ও অভ্যাস জনিত সহজ উপায়ে ঐ কার্য্যে ব্রতী থাকিব কারণ অভ্যাসই যোগ-নামে কথিত। কিন্তু এই অভ্যাস বড়ই দৃঢ়মূল—সদভ্যাস যেরূপ উপকারী, কদভ্যাস তদপেক্ষা হানিকারক ইচ্ছা থাকিলেও যেরূপ নূতন সদভ্যাস শিক্ষা করা কঠিন অমূলকতা, হানিকারিত্ব, অপ্রয়োজনীয়তা জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও কদভ্যাস ত্যাগ করা সেইরূপ বিশেষ আয়াসসাধ্য। বড় বড় সামাজিক কুপ্রথা —সতীদাহ, প্রভৃতি কেবলমাত্র রাজশাসনের কঠিন কুঠারাঘাতে উন্মূলিত হইয়াছে; লৌকিক জীবনের কদভ্যাস, কুসংস্কারও সেইরূপ মায়াদয়াহীন ভাবে কঠিন পণে ছিন্নমূল না করিলে যায় না। শাস্ত্র ভয়, সমাজ ভয়, লোকলজ্জা, ফলভয়, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া বিবেক বিচার সঙ্গে লইয়া দৃঢ়পণে অগ্রসর হও, সন্দেহস্থলে বিশেষ বিচার কর অদ্য এই মুহূর্ত্ত হইতে যাহা কেন হউক না আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস চিরতরে ত্যাগ করিলাম।

উপসংহার, ধর্ম্মসংস্কার, সমাজ-সংস্কার

এক্ষণে এক কুসংস্কার ত্যাগ করিতে গিয়া আমরা যেন অপর কুসংস্কারে পতিত না হই। কুসংস্কার আছে বলিয়াই যেন আমরা শাস্ত্রে ও ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করি, কিম্বা যেন একেবারে নাস্তিক হইয়া না দাঁড়াই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কুসংস্কার আগাছা ধর্ম্মপাদপের আশ্রয়ে সংসেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ধর্ম্ম পাদপের স্বাস্থ্যহানিও করে। সেই পরগাছা সাবধানে সমূলে ধ্বংস কর, যেন ধর্ম্মপাদপের কোনও অংশে আঘাত না পায়; তাহা হইলে পরে ধর্ম্মপাদপ নিজে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া বিস্তার প্রাপ্ত হইবে। আমার উদ্দেশ্য কুসংস্কার বলিয়া যেন ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়, লক্ষ্মীপূজা প্রতিমা পূজাকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি বস্তুতঃ উপরোক্ত কুসংস্কার সম্বন্ধীয় বিচার পাঠে পূজা পদ্ধতিকে কোনরূপে কুসংস্কার বলিয়া ধারণা করিবার উপায় নাই। ভগবানের আরাধনায় আবাহন, পূজন, বিসর্জ্জন, লিঙ্গপূজা মূর্ত্তিপূজা বা মানসপূজা—এসকল তথাই বিচারসঙ্গত বিবেকসঙ্গত কালপাত্রভেদে নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। সেইরূপ খাদ্যাখাদ্য বিচার ত্যাগ করিয়া যেন অখাদ্য কুখাদ্য ভোজন প্রভৃতি হানিকর কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই। জাতিভেদ প্রথার অত্যধিক নিয়মাবলী কুসংস্কারের মধ্যে গণ্য হইলেও সাধারণতঃ চারিবর্ণের ভেদ থাকা কর্ত্তব্য ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান কারণ উহারা বৃহৎ সমাজভুক্ত শাখা সমাজ মাত্র। নীচ, মধ্যবিত্ত উন্নত ও সর্ব্বোচ্চ জাতি সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহাদিগের মধ্যে বিবাহ বা একত্রবাস সম্ভবপর নহে। তবে ঐরূপ এক এক শাখা সমাজ মধ্যে উচ্ছিষ্ট, স্পর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধীয় অত্যধিক নিয়মাদি সাধারণ পরিচ্ছন্নতার সীমা অতিক্রম করিলেই কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করা উচিত ও তাহা ত্যাজ্য। এইরূপে এক এক শাখা সমাজের মধ্যে কুলীন, মৌলিক, শ্রোত্রীয়, ভঙ্গ, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি অত্যধিক বিভিন্নতা ও পরিহারযোগ্য, যেহেতু অত্যধিক বিভিন্নতায় সমাজ ভগ্ন হয় ও জাতীয় একতা নষ্ট হয়। ব্যবসা সম্বন্ধে জাতিভেদ থাকা অনেকের মতে উপকারক। নাম ও বংশের পরিচয়ের উপাধি বিভিন্ন থাকিলেও বিবাহ উচ্ছিষ্ট স্পর্শ অশৌচাদি সম্বন্ধীয় কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া এক এক শাখা সমাজস্থ বহু জাতির একতা স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

এ স্থলে কেহ যেন না মনে করেন আমরা সমাজে সংস্কারের কথা আনিয়া ফেলিলাম। সংস্কারের অর্থই কুসংস্কার হইতে পরিমার্জ্জিত করা। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য কুসংস্কারের আকার প্রকার, উৎপত্তি, শক্তি ও বিস্তার সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া মাত্র। স্বল্প-শক্তি আমরা সমাজের কি করিতে পারি? এক এক মানবের জীবনগতি যেমন নিজ নিজ কর্ম্মফলে আবদ্ধ, সমষ্টি সমাজেরও এক জীবন স্রোত আছে তাহাও সেইরূপ এক অপরিহার্য্য নিয়মে প্রধাবিত। মানবের পুরুষকার আছে, সমাজেও সেই সংস্কার চেষ্টা আছে উভয় ক্ষেত্রেই পরিচালন ন্যায়ানুগ বিচার-সঙ্গত হওয়া আবশ্যক; তমসাচ্ছন্ন অন্তরে কেবল ভ্রমসঙ্কুল পথে পতিত হওয়াই সম্ভব। কুসংস্কার ধর্ম্মে সমাজে ও লৌকিক জীবনে এই তিন অবস্থায় বিদ্যমান আছে এস্থলে—তাহাই প্রদর্শন করা হইল এবং সেই তিন ক্ষেত্রেই কিরূপে ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দেওয়া হইল। এ সম্বন্ধে প্রত্যেকের অনেক ভাবিবার, বুঝিবার, বিচার করিবার এবং ততোধিক

কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা করিবার বিষয় বাকী রহিল। এ বিষয় কোন প্রবন্ধে বিচার্য্য নহে, কার্য্যক্ষেত্রে করণীয়। আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা ভগবানের নামে সুস্থ মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সদসৎ বিচার পূর্ব্বক এই চিরানিষ্ট উৎপাদক দ্বিধা কুসংস্কারের হস্ত হইতে প্রত্যেকেই উদ্ধার হইতে নিয়ত চেষ্টা করুন—নিজকে নিজে ফাঁকি না দিয়া কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করুন অর্থাৎ নিজের মনের দৌর্ব্বল্য বৃথা কাল্পনিক যুক্তিদ্বারা আবরিত করিতে চেষ্টা না করিয়া কার্য্য করুন, তাহাতে নিজ আত্মার ও সমষ্টি সমাজের যেরূপ উপকার হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আর সর্ব্বদা মনে থাকে যেন স্বেচ্ছায় জ্ঞান সত্বে কুসংস্কারান্ধকারে চক্ষু আবরিত রাখিয়া প্রকৃত বিবেকবিচার জ্ঞান পদদলিত করিয়া ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়বিলাসাদির অনুরূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যে কোন কার্য্য করা মহাপাতক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বি, এল।

পিরীতি *

বাহা,

নিভৃত নিশীথে সমগ্র জগৎ যখন ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িত, তখন নদীর তটে আমার কুটীরের ধারের গাছের তলায় তোমার সহিত নীরবে নীরবে কথা বলিতাম—এই ভাবেই রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। কখন বা নদীর দিকে চাহিয়া দেখিতাম—কুলু কুলু কল কল রবে কি-জানি কত-কি প্রাণের কথা বলিতে বলিতে আকুল প্রাণে উন্মাদিনীর ন্যায় কুটীর-কানন-প্রান্তবাহিনী প্রবাহিনী উধাও ভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে দৃশ্য কি সুন্দর, সেই তরল গভীরের—উজ্জ্বল মধুরের সমাবেশ কি মনোহর। কথা বলিতে বলিতে প্রাণের কথা অনুভূতিতে ডুবিয়া যাইত, স্বপ্নময়ী স্মৃতির রাজ্যে চলিয়া পড়িতাম তখন তুমি আমাকে জাগাইয়া তুলিয়া কখন বা ক্ষুদ্রকুসুম বিনির্ম্মিত অগণ্য নক্ষত্রমালাখচিত নীলনভোস্থলের অধিবাসীদিগের তত্ত্ব জানিবার জন্য শত প্রশ্ন উত্থাপন করিতে, আর তোমার চিত্তবিনোদনের জন্য আমি কখন বা Astro-anthropology কখনও বা Astro-psychology আবার কখনও বা Astrophysics তত্ত্বের কথা বলিয়া তোমায় সুখী করিতে প্রয়াস পাইতাম। বাহা—তখন সেই এক দিন ছিল যখন আকাশ পৃথিবী পাতালের কথা ভাবিতাম, ভাবিতে ভালবাসিতাম, তোমায় বলিতাম, বলিলেও ভালবাসিতাম। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই—জানত, বাহা, চিরদিন কাহারও সমান যায় না এখন আর বাহিরের খটখটি ভাল লাগে না। এমন দিন ছিল যখন সকল প্রকার-logyরই একটা আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। এখন এ সকলের আকর্ষণ একবারেই কাটিয়া উঠিতে পারি নাই। এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি কেবল অনন্তঘটনার পূর্ণ। অনন্ত ব্যাপারের অনন্ত আকর্ষণ আমার অনন্তমুখী প্রতিভা সব বুঝিতে চায়—সব জানিতে চায়—কিন্তু জানিতে গিয়া অজানা রাজ্যের

* পূর্ব্বে এই নামে কোন পত্রিকায় এই প্রবন্ধের কতকাংশ বাহির হইয়াছিল; উপস্থিত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে ইহা প্রকাশিত হইল। লেখক

পরিধি ক্রমেই বাড়িয়া যায়—Knowable সসীম unknowable অসীম। জানিবার ইচ্ছা কাহার না হয়—কিন্তু মানুষ কি কেবল চিরদিনই জানিবার জন্যই ব্যাকুল থাকিতে পারে, তাহার প্রাণে কি আস্বাদনের আশা জাগে না—আর যদি জাগে তাহা কি অস্বাভাবিক? আর সেই জানারই বা পরিনতি কোথায়? যেমন জ্ঞান চাই তেমনি ভোগও তো চাই। ভোগ ভিন্ন—আস্বাদন ভিন্ন মানুষের আত্মা সরস সুন্দর সজীব ও সম্পূর্ণ থাকিতে পারে কি? তাই আজ তোমার নিকট একটা নূতন কথা বলিতে চাই, আজ তোমার নিকট "পিরীতি" তত্ত্ব বলিব।

তুমি দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে ভালবাস। ভগবদ্গীতা তোমার প্রিয় জিনিষ; কিন্তু প্রেমগীতা পড়িয়াছ কি? চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী না পড়িলে তুমি এই প্রস্তাব বুঝিতে পারিবে না। আমি "প্রীতি" না বলিয়া, "পিরীতি" বলিলাম। তুমি হয় ত ইহাতে মনে করিবে, "পিরীতি"টি যখন "প্রীতি" শব্দেরই অপভ্রংস, তখন প্রীতি না বলিয়া গ্রাম্যশব্দ "পিরীতি" বলা হইল কেন? পিরীতি বলিলাম কেন, বাহা! তাহা যদি বুঝিতে পারিবে, তবে আর কঠোর কঠোপনিষদে তুমি রস নিঙড়াইতে বসিবে কেন, অথবা মাণ্ডুক্যকারিকা লইয়াই বা মাথা ঘামাইবে কেন?

তোমাকে স্পষ্টতঃ বলিতেছি, "প্রীতি" আর "পিরীতি এক জিনিষ নহে। প্রীতি কঠোর ও পণ্ডিত। পিরীতি কোমলা ও আহিরী ব্রজবালা; প্রীতি পাণিনীর ব্যাকরণ অথবা ব্যাসদেবের শ্রীমদ্ভাগবত, আর পিরীতি চণ্ডীদাসের পদাবলী। প্রীতি বলিলে যে ভাবের উদয় হয়, পিরীতি বলিলে সে ভাবের উদয় না হইয়া অন্য কথা মনে হয়। রামের সহিত শ্যামের প্রীতি কি সদ্ভাব জন্মিতে পারে, কিন্তু "পিরীতি" হইতে পারে না। "পিরীতি" এক স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রেম যদি পঞ্চম পুরুষার্থ হয়, পিরীতি তবে ষষ্ঠ পুরুষার্থ। বলিতে কি, পিরীতি শ্রীমদ্ভাগবতেরও অগোচর। যাহা, পিরীতি আর প্রেম এক পদার্থ নহে—পিরীতি চণ্ডীদাসের হৃদয়-নিহিত এক মহাভাব। এ ভাব বেদে নাই, উপনিষদে নাই, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নাই, এমন কি শ্রীমদ্ভাগবতেও নাই। তোমরা যাহাই বল, আর, যতই বুঝাও, পিরীতি আর প্রীতি যে একই পদার্থ, তাহা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব না। তোমরা "প্রীত্যর্থে" প্রীতি শব্দের প্রয়োগ কর, হয়ত অজীর্ণ বা অরুচি রোগে আহারে তোমাদের "প্রীতি" থাকে না, কিন্তু সে সব স্থলে "পিরীতি' বসিবে না। "পিরীতি"র জন্য কেবল এক স্থান; পিরীতির কেবল এক ব্যবহার—এক প্রয়োগ। প্রীতি বেদান্ত। প্রীতি সকলকেই এক করিতে চাহে—সকলকেই আপনার মধ্যে আনিতে চাহে। কিন্তু আমার "পিরীতি" সেরূপ নহে। পিরীতি সাংখ্য। সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় পিরীতি একগুঁয়ে, পিরীতি উদারতা জানে না, বিশ্ব প্রেম বা universal love বুঝে না,—কেবল বুঝে নির্জ্জন, কেবল বুঝে কুঞ্জকুটীর—কেবল বুঝে কালিন্দীর তীর, কেবল বুঝে তাণ্ডীর বন—তাহার লক্ষ্য কেবল সেই একরূপ। সেই—

শ্যামল সুন্দর বিশ্ব মনোহর
উজ্জ্বল নটবর বেশম্।

পিরীতি ব্যাকুলা—পিরীতি উদাসিনী—পিরীতি যোগিনী, আরও কত কিছু বলিতে

পারি। কিন্তু ইহা কি বলিবার কথা! কে কবে মানুষের ভাষায় পিরীতির কথা বুঝাইয়া প্রকাশ করিতে পারে? বেদান্তের মায়া অনির্ব্বচনীয়া; অস্ফুটভাষ পিরীতি তাহা অপেক্ষা কম কিসে? যাহা, আমি তোমাকে পিরীতি বুঝাইতে পারিব না। ঠাকুর চণ্ডীদাস কি বলেন শুন দেখি? তুমি বেদান্তসূত্র পড়িবার বেলায় "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" পড়িয়াছ এখন একবার "পিরীতি-সূত্র" পড়।

"তারপরে—সুতরাং পিরীতি-জিজ্ঞাসা।"

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
সৃজিল কোন ধাতা।
অবধি জানিতে সুধাই কাহাকে
ঘুচাই মনের ব্যথা॥"

বেদান্ত-সূত্রের ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ন্যায় এই "পিরীতি-জিজ্ঞাসা'র সূত্রপাত হইল। বেদান্ত-সূত্রের "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'র অনুকরণে এস্থলে "তারপরে—সুতরাং পিরীতি-জিজ্ঞাসা' এইরূপে সূত্রের অবতারণা করিতে পারি। কর্ম্মকাণ্ড সমাপনান্তর যেমন জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তিভাবাদির পরেই পিরীতির কথার সূত্রপাত হয়, যথা শাস্ত্র:—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততোনিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথা সক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামযং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

অগ্রে শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজন-ক্রিয়া, তদনন্তর অনর্থনিবৃত্তি, তারপরে নিষ্ঠা, অতঃপর গুণলীলাদি শ্রবণে অভিলাষ, অনন্তর আসক্তি, তৎপর শুদ্ধভাব, ইহার পরেই প্রেমের উদয়। ইহা শাস্ত্রীয় ক্রম। আমরা বলিব এই প্রেমের পরই "পিরীতি"।

বেদান্তের ২য় সূত্র—

"জন্মাদ্যস্য যতঃ।"

অর্থাৎ যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি হইয়া থাকে। পিরীতি-দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রটা বলিতেছি:—

"এই মোর মনে হয় রাত্রি দিনে
ইহা বহি নাহি আর।
পিরীতি বলিয়া এতিন আখর
এ তিন ভুবন সার॥"

যাহা, এবার একবার বেশ করিয়া মিলাইয়া পড় দেখি? বেদান্ত-সূত্র ও পিরীতি-সূত্রের কোনরূপ সাম্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাও কি না? বেদান্ত-সূত্র বলিতেছেন, এই ব্রহ্ম হইতেই এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। শ্রুতি বলেন:—

"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। বুঝিলে ত পিরীতি-দর্শন দার্শনিক প্রণালীবিহীন নহে। সুতরাং এখন আর ঘট্যাং ঘট্যাং করিয়া কাজ নাই। একবার সূত্রগুলি শুনিয়া যাও, ব্যাখ্যা আবশ্যক হইলে, পাছে হইবে। এই শুন:—

"বিহি এক চিতে ভাবিতে ভাবিতে
নিরমাণ কৈল পি।
রসের সাগর মথন করিতে
তাতে উপজিল রী॥
পুন যে মথিয়া অমিয়া হইল
তাহে ভিয়াইল তি।
সকল সুখের এ তিন আখর
তুলনা দিব যে কি॥
যাহার মরমে পশিল যতনে
এতিন আখর সার।
ধরম করম সরম ভরম
কিবা জাতি কুল তার॥"

এই তিন আখর যাহার মরমে প্রবেশ করে, সে ধরম করম, সরম ভরম, এবং জাতি কুল ইহার কিছুই ধার ধারে না, ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, জীবন মরণ, তাহার নিকট এ সকলই তখন নষ্ট হইয়া যায়। তাই চণ্ডীদাস বলিতেছেন :—

"শ্যামের পিরীতি হৃদয়ে পশিলে
তার কি পরাণ রয়।
পরাণের মাঝে পিরীতি পুষিলে
কে তারে জীয়ন্ত কয়॥"

যাহা বুঝিতে পারিলে কি? তোমার এই সংসারের আশা ভয় বাসনা বা তৃষ্ণায়, পিরীতিময় হৃদয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে না। পিরীত হৃদয়কে অবশ করিয়া রেখে। দিনযায়, রাত্রি হয়, রাত্রির পরে আবার দিন হয়, পিরীতি-মগ্ন হৃদয়ের নিকট দিবারাত্রির ভেদ নাই, আলোক-অন্ধকারের জ্ঞান নাই, সুখ দুঃখের বোধ নাই। এমন মাদকতা আর কাহারও নাই, এমন প্রভাব আর কিছুরই নাই। পিরীতির এমনই রীতি যে প্রাণ গেলেও পিরীতি যায় না।

"পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি
হৃদয়ে লাগিল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে
পিরীতি গড়ল কে॥"

পিরীতি নিত্য। যদি ভাগ্যফলে কাহারও হৃদয় পিরীতিতে মজিয়া যায়, তবে পিরীতি আপন প্রভাবে সে হৃদয়কে নিত্য-পিরীতির আধার করিয়া তোলে। প্রাণগেলেও সে হৃদয় পিরীতি ছাড়া হয় না।

শ্রীমতীর হৃদয়ে যখন শ্যামানুরাগের উদয় হইল, শ্যামের পিরীতিতে যখন তাঁহার হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল, তখন তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল, চণ্ডীদাস এইভাবে তাহার কতকটা আভাস দিয়াছেন—

"শ্যামের পিরীতি আরতি বাড়াঞা
মরণ অধিক কাজে।
লোক চরচায় কুলের পাঁখায়
অগত ভরিল লাজে॥
হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু অরঅর
পাগলী হইয়া যেনু॥"

যদি চণ্ডীদাসের উদয় না হইত, তবে বুঝিবা জগতে পিরীতির ভাষা একেবারেই অস্ফুট রহিয়া যাইত। পিরীতির এই তীব্র ব্যাকুলতা চণ্ডীদাস স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং তাহার স্তরে স্তরে পিরীতির যে সকল অব্যক্ত অস্ফুট, অথচ তীব্র ব্যাকুলতাপূর্ণ কলকাকলী প্রেমিক ভাবুকগণের মানসশ্রবণে ক্ষণে ক্ষণে পরিশ্রুত হইয়া থাকে, তাহা আমরা আমাদের এই মানবীয় ভাষায় কিছুতেই অভিব্যক্ত করিয়া উঠিতে পারিব না। আমরা সংসারের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে বাস করিয়া নিত্য ব্যবহারিক মানব-সমাজের সাংসারিক ভাব ও ভাষা লইয়া পিরীতি-তত্ত্ব বুঝাইতে পারিব না।

"ধরম করম লোক চরচাতে
একথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর যাহার মরমে
সেই সে বুঝিতে পারে॥"

যাঁহারা এই তিন আখর হৃদয়ে লইয়া যোগীর মত ধ্যানমগ্ন হন, তাঁহারাই ইহার মর্ম বুঝিতে পারেন। আমরা ইহার দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের সম্বন্ধে দর্শন বিজ্ঞান লইয়া যতই কেন আলোচনা করিনা, তাহাতে ইহার কিছুই বুঝিতে পারিব না যাহা। চণ্ডীদাসের এই পিরীতি-তত্ত্ব কপিলে নাই, ক্যাণ্টে নাই, গৌতম-সূত্রে

নাই, মিল-বেষ্থামে নাই, পুরাণে নাই, ইতিহাসেও নাই। শ্রীভাগবতে ইহার ভাবচ্ছায়া পাইতে পার, সেখানেও সম্পূর্ণ ভাব আবার করিতে পারিবে না। জয়দেব ও বিদ্যাপতি অনুসন্ধানের স্থল বটে, কিন্তু সেখানেও ষোল-আনা মিলিবে না। শ্রীচণ্ডীদাসই এই তত্ত্বের একমাত্র উদ্ভাবয়িতা, শ্রীরাধা ইহার একমাত্র আশ্রয় এবং মদনমোহন বংশীবদন শ্রীশ্যামসুন্দরই ইহার একমাত্র বিষয়। বাছা! আমি তোমাকে শুনা কথা শুনাইলাম। পিরীতি কেবল চোখের জল! কালাচাঁদ গীতা বলেন—

"শ্রীনন্দন-নন্দনে ভজিহু কি ক্ষণে,
কাঁদি, কাঁদি, কাঁদি মনু।"

আবার ভৈরব—

"অবনত মুখে দেখি সো চাঁদ বদন।
দেখিব কি সখি! মোর সজল নয়ন॥"

বাছা! যদি বুঝিতে পারিয়া থাক, তবে জানিও ইহাই পিরীতি। যদি আরও বুঝিতে চাও, তবে শ্রাবণ মাসের রাত্রিকালে "ঝিমি-ঝিমি বরিষনে"র সময় নীরব নিশার নিভৃতে বসিয়া "জয়রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলী পড়িও প্রসাদদাসের * পদে তোমার রুচি হইবে কি? একটী পদ তোমায় উপহার দিতেছি :—

"শাঙ্কন সঘন ঘন ঘোষত,
গর গর নাদ গভীর।
যামিনী গভরে, তিমির পরিপূরল
বরিষত ঝর ঝর নীর॥
শিখিকুল কলরব, কেক রব গাওত
ঝিল্লা ঝিনিকি ঝন রাব।
নীরদ নীর, পরশ মত মাধুরি
মুদত পুণ উছলাব॥
গোপল তারক অবর কোর।
শীতল সুখকর সময় বিচারত
পুরজনে নিন্দক ঘোর॥
ক্ষিতিরুচ পত্র পরশি ঝর শীকর
জাগত নয়ন চকোর।
পরসাদ দাসক, চিত কব জাগব
করব যুগল পদসেবা॥"

পদচিন্তামণিমালা, ৪২ পৃষ্ঠা।

বাছা! বলিতে গিয়া সকল কথা বলিতে পারি না, লেখনীর মুখেও সকল কথা ফোটে না। এ দোষ কি আমার, না ভাষার? ভাষা ভাবের দাসী। তবে ভাবের অভিপ্রায় ভাষা যোগায় না কেন? কেন, এ প্রশ্নের উত্তর অনেক প্রকার হইতে পারে। কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, মানুষের ভাব অপূর্ণ, ভাষা তা অপেক্ষাও অধিক অসম্পূর্ণ। তাই ভাষা অনেকস্থলেই নীরব। আমরা নিজের হৃদয়ে যাহা আস্বাদন করি, সে আস্বাদন অন্যকে বলিতে চাই, জানাইতে চাই, বুঝাইতে চাই, কিন্তু পারি না, বুকে ভাব খেলিয়া উঠে, কিন্তু মুখে ফোটে না, জানত বাছা, এ সকলি সেই—"মূকাস্বাদনবৎ"।

পিরীতির কথা বলিতে পারিলাম না, যাহা বলিব বলিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই বলা হইল না। কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ ইহারা মহাকবি। কিন্তু প্রেমের কথা বলিতে গিয়া ইহাদেরও ভাষা হার মানিয়াছে, শতাংশের একাংশ হয়ত ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, আর বাকী সকল অংশই সহৃদয় পাঠকগণের হৃদয়ে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া ভাষা নীরব হইয়াছে। এই সকল কবিদিগের এই অংশগুলিই নাকি শ্রেষ্ঠ

* প্রসাদদাস—সুকবি ৺গুরুপ্রসাদ সেন—পদচিন্তামণিমালা রচয়িতা ও কবীয় কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের পিতা।

কাব্য—অর্থাৎ কাব্যের নীরব ভাষাই শ্রেষ্ঠ ভাগ।

বাছা! তুমি হয়ত মনে করিতেছ এ এক প্রহেলিকা—প্রহেলিকা নিশ্চয়ই নয়—অতি সত্য। ইহারই নাম ব্যঞ্জনা—Suggestiveness.

কিন্তু পিরীতি-কাব্যে ব্যঞ্জনারও বড় বেশী প্রবেশাধিকার নাই, তবে বল, কেমন করিয়া তোমায় পিরীতির কথা বলিব?

পিরীতির পথ খুঁজিতে যাইয়া ভোলানাথ সকল হারাইলেন, শ্মশানবাসী হইলেন, ভাবের তুফানে তাণ্ডব নৃত্য ধরিলেন, পঞ্চানন পঞ্চমুখে বলিতে যাইয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না।

প্রিয় বাছা, আমার মনের কথাটি তোমায় বলিব কি? আমার যেন মনে হয়, শ্মশানই বুঝি পিরীতি-তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম পাঠশালা। তাই বুঝি প্রেমপাগল ভোলানাথ শ্মশানকে এত ভালবাসেন। লোকে আগুনকে পবিত্র বলে, কিন্তু শ্মশানের আগুন কি ভীষণ রাক্ষস! মানুষের শোণিত, মানুষের মাংস, মানুষের হাড়—ইহাই উহার খাদ্য। তাই যেন "ক্রব্যাদ" নামে উহার পরিচয় দিয়াছেন। "ক্রব্যাদ" নাম শুনিয়া ভয় করিও না, ঘৃণা করিও না, কেন না শ্মশানই প্রেমগুরু পঞ্চাননের প্রিয়-নিকেতন।

যদি পিরীতির কথা শুনিতে চাও, তা' হইলে ঐ ক্রব্যাদের পাশে কুটীর বাঁধিও; পার যদি দেখিও জগতের স্বার্থের পরিণাম কোথায়? ভোগেরই বা পরিণাম কোথায়? যে আসিল, সে কোথায় গেল? সে কার সন্ধানে আসিয়াছিল এবং কি লইয়াই বা ফিরিয়া গেল? যেখানে স্বার্থ, সেখানে প্রেম নাই, তোমার প্রাসাদপূর্ণ সহরের হাটে-বাজারে অলিগলিতে প্রেমের কোনও খবর পাইবে না। যেখানে সুখ সুবিধা চায়, সে প্রেম জানে না, যে দুঃখকে ভয় করে সেও প্রেম পায় না। প্রেম সুখ দুঃখের অতীত।

"বন্ধুর লাগিয়া যোগিনী হইব
কুণ্ডল পরিব কাণে।
যাব দেশে দেশে বন্ধুর উদ্দেশে
সুধাইব জনে জনে।
বঁধুয়া কোথা বা আছে গো—"

ইহা পিরীতিরই ভাষা, এখানে সুখ নাই, দুঃখ নাই; পাপ নাই, পুণ্য নাই, ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভরসাও নাই—এই ভাবটা প্রকৃত পক্ষেই সর্ব্বধর্ম্মের সমাধি—সর্ব্বস্বার্থের মহাশ্মশান। এখানে ঐ সকল সংসার ব্যাপার পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে—আছে কেবল অনিদ্র, অফুরন্ত তীব্র অনুরাগ। সে অনুরাগ বুদ্ধিহীন, বিচারহীন অথচ দুর্নিবার।

"নবীন পাতসে মীন মরণ না জানে।
কানু অনুরাগে চিত থৈরজ না মানে॥"

বলিয়াছি ত, পিরীতির কথা তোমায় বুঝাইতে পারিব না; কিন্তু আর একটি কথা বলিব, জানিও ইহাই আমার শেষ—

"শ্যাম রে, তুঁহু মোর মরণ সমান,
নাথ সুখ দুখ চিতে কভু না গনিলুঁ
চরণ পরশি অগেয়ান॥"

তোমার পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে consciousness বলেন, আর এদেশের দার্শনিকগণ যাহাকে "সংবিদ" বলেন, উক্ত পদের ভাবরাজ্যে তাহার চিরসমাধি। এই কারণেই বুঝি আমার হৃদয়-সখা কৃষ্ণদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

"অদ্বৈতত্ব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম
সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।

যদি হয় তার যোগ না হয় তার বিয়োগ
বিয়োগ হলে কেহ না জীয়য়।"

হরি! হরি! কোথাকার কথা কোথায়,
সব এলোমেলো, সব যেন উলট পালট,
কাজেই এইখানেই 'ইতি'।

তোমার চিরদিনের সেই
সেবারাম শর্ম্মা

নাট্য-সাহিত্যের বর্ত্তমান গতিসম্বন্ধে কয়েকটি কথা

প্রবীন নট এবং নবীন নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপনার সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় প্রকাশিত "নাট্যসাহিত্যের বর্ত্তমান গতি" শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশে লিখিয়াছেন "দুঃখের বিষয়, ক্ষোভের বিষয়, লজ্জার বিষয় নাট্যসাহিত্যের প্রতি দেশের কোন কৃতবিদ্যেরই লক্ষ্য নাই।" কথাগুলি পাঠ করিলে পাঠকের মনে স্বতঃই উদয় হয় যে, নাট্যসাহিত্যের বর্ত্তমান অবনতির নিমিত্ত প্রকৃতপক্ষে দায়ী কে? দর্শকবৃন্দ না, রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ?

যে পাশ্চাত্য অনুকরণে বাঙ্গালার বর্ত্তমান রঙ্গালয় সকল প্রতিষ্ঠিত, তাহার আদ্যন্ত ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, অতি অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত ব্যতীত, ইউরোপীয় রঙ্গালয়ে অভিনীত প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ নাটকই, রঙ্গালয়ের সহিত সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিশিষ্ট নাট্যকার কর্ত্তৃক রচিত। আমাদের এই যাত্রা—কবি—পাঁচালীর দেশেও এই নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। যাঁহার দল, হয় তিনি নয় তাঁর দলস্থ কোন লোক "পালা"র রচয়িতা। নীলকণ্ঠ, গোবিন্দ, বদন, হরুঠাকুর, দাশরথি প্রভৃতি একদিকে যেমন দলের অধিকারী, অন্যদিকে তেমনি পালারও কর্ত্তা। এইদল, এবং পালা অথবা তাহার রচয়িতা জনসাধারণের মনে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। "বদনের দল গাহিল—কলঙ্ক ভঞ্জনের পালা।" "গোবিন্দ গাহিল—মাথুর।" একালে "গিরিশ ঘোষের থিয়েটার" এমন একটা কথা সাধারণের মুখে কখনও কখনও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, অব্যবসায়ীর দ্বারা ব্যবসা চলে না। কথায় বলে "যার কাজ তারে সাজে অন্যলোকে লাঠি বাজে।" শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র স্বয়ংই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের কোনস্থলে লিখিয়াছেন "আমরা ইঞ্জিনীয়ার হইয়া ডাক্তারকে ডাক্তারী সম্বন্ধে উপদেশ দিই—উকীল হইয়া চাষের কথা কহি—আর লাঙ্গল ফেলিয়া কাব্য লিখি।" ঠিকইতো! যিনি চালের ব্যবসা বুঝেন না তাঁহার উপর সে ব্যবসার ভারার্পণ করিলে ভরাডুবি ভিন্ন আর কি হইবে? কথা এই—অভিনয় অনভিজ্ঞ কবির পক্ষে দৃশ্যকাব্য লেখা বিড়ম্বনা, কেন না দৃশ্যকাব্য বা নাটকের জীবন অভিনয়। আবার শুধু অভিনয় জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, রঙ্গালয়ের কবির কিছু কাণ্ড জ্ঞান থাকাও বিশেষ প্রয়োজন। নাট্যকারকে অনেক বিষয় বিবেচনা করিয়া নাটক লিখিতে হয়। দর্শকের প্রকৃতি প্রবৃত্তি, অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয় নিপুণতা, রঙ্গমঞ্চের কলা কৌশল, এমন

কি পর পর দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সুবিধা অসুবিধা পর্য্যন্তও নাট্যকারের বিবেচ্য বিষয়। বিশ্বজগতে অশরীরি বিভুর ন্যায় নাট্যকার তাঁহার ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চ ওতঃ প্রোত ভাবে ব্যাপিয়া আছেন. নৃত্য গীত হাসি কান্না সকলই তাঁহারই অথচ তিনি নেপথ্যে। কেবল নেপথ্যে নয়, যাঁহার কল্পনা বলে রঙ্গমঞ্চ মুখরিত তিনি স্বয়ং মূক। তাঁহার আত্মপক্ষে একটী কথা বলিবার ও যো নাই। সুতরাং যে সকল উপায়, যাঁহাদের দ্বারা, তাঁহার কল্পনার অভিব্যক্তি হইবে সে সকলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক নয় কি? সুপাচক রন্ধনের মাল মসলা ভাল করিয়া দেখিয়া লন। পরন্তু রন্ধন কার্য্যের শিক্ষা ও রন্ধন শালাতেই হইয়া থাকে, ঠাকুর ঘরে নয়। মহাকবি সেক্সপিয়ার, মহাকবি গিরিশচন্দ্র এইরূপ রঙ্গালয়ে শিক্ষিত। উৎকৃষ্ট নাটক রচনায় কবির প্রতিভা এবং রঙ্গালয়ের শিক্ষা উভয়ই প্রয়োজন।

এখন দেখা যাউক, এদেশে এরূপ শিক্ষা সম্ভব কি না? জন সাধারণের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য, অল্প বিস্তর প্রতিভাবান, নাটক লিখিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেন, থিয়েটারের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাঁহারা শিক্ষার্থী হইয়া প্রবেশ করিতে চাহেন না। ভয়, পাছে লাভের লোভে মূলধন হারাইয়া বসেন। কাজেই ভাল অভিনয়, ভাল নাটকের জন্য, সাধারণকে রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। আর ইহাই স্বাভাবিক। কর্ত্তৃপক্ষগণ রঙ্গালয়কে যদি নিছক আমোদের স্থল না ভাবিয়া সাধারণের একটী হিতকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন এবং নিজ নিজ ত্রুটী, অভাব বিমোচন করিয়া উচ্চ ব্রতে ব্রতী হন, তাহা হইলে রঙ্গালয়ের সংস্কার সংশোধন সহজেই সাধিত হয়।

তারপর রুচি, কুরুচির কথা। অপরেশ-চন্দ্র কৃতবিদ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনারা কুরুচির প্রশ্রয় দেন কেন? এ কথার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে কুরুচি সঙ্গত নাটকের অভিনয়ে যে সকল স্তণগ্রাম বিকশিত মুখ, রঙ্গালয়ের দর্শকমণ্ডলীর শোভা সম্পাদন করিত এখন আর সে সকল মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কুরুচির প্রশ্রয় না দিয়া, রঙ্গালয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তারপর রঙ্গালয়কে ঐ একই প্রশ্ন করা যাইতে পারে—আপনারা কুরুচি অভিনয় করেন কেন? অবশ্য ইহার উত্তর—ব্যবসায় খাতিরে। জনসাধারণও যে কুরুচির অভিনয় দেখেন, তাহাও আমরা বলি—আমোদের খাতিরে। যেমন ক্ষুধার তাড়নায় লোকে অখাদ্য খায়। একথা সহজেই বুঝা যায়। এমন পণ্য নাই যাহার ক্রেতা নাই—এমন দৃশ্য নাই যার দর্শক নাই। রঙ্গালয়ে যেরূপ পণ্য আনিবেন, যেরূপ দৃশ্য দেখাইবেন তাহার ক্রেতা বা দর্শকের অভাব হইবে না। যে সকল দর্শক কুরুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয় দর্শনে আমোদ বোধ করেন, তাঁহারাই আবার সঙ্গে সঙ্গে কুরুচি বলিয়া নিন্দাবাদ করিতে ত্রুটী করেন না। ক্ষণিক আমোদপ্রদ হইলেও কুরুচি যে দর্শকের স্বভাববিরুদ্ধ ইহা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

তবে উপায় কি? সত্যই কি নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির উপায় নাই? যতদিন না রঙ্গালয়ের আবহাওয়া ফিরিবে, যতদিন না তথায় যোগ্য ব্যক্তির স্থান হইবে, যতদিন না তাহার কর্ত্তৃপক্ষগণ নাট্য-সাধনায় ব্রতী হইবেন অথবা রঙ্গালয়ে সংশ্লিষ্ট যে সকল উন্নতি-প্রয়াসী সাধক নাট্যরচনায় ব্রতী হইয়াছেন

তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করিবেন, ততদিন সত্যই উপায় নাই। "বাহির" হইতে অভিনয়োপযোগী নাটক আশা করা কর্ত্তৃপক্ষগণের আপাততঃ দুরাশা মাত্র। এরূপ নাটক রঙ্গালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরই রচনা করা সুসাধ্য। কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ত্তব্য এই সকল ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপে উৎসাহিত করা, নহিলে তাঁহাদের নিজের স্বার্থেরই সমূহ ক্ষতি।

দীর্ঘকাল পরে প্রতিভার উদয় হয়, কিন্তু ততদিন কি নাট্যশালা বন্ধ থাকিবে? কেন? অবতার আসিয়া পথ দেখাইয়া দেন তারপর সাধনায় লোক সিদ্ধিলাভ করে। যে দেশের আদর্শে আমাদের রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত, সেখানে কি সকলেই প্রতিভাবান নাট্যকার? প্রতিভা ত গাছের ফল নয়। সেখানে রুচি বর্জ্জিত নাট্যাভিনয় সুচারুরূপে চলিতেছে। কেননা,—সেখানে মনস্বী সাধক আছেন দুরূহ পথে প্রতিভার আলোক পথ প্রদর্শন করে, মনস্বী সাধক সেই আলোকে পথ চলেন ইহাই স্বাভাবিক বিধি। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সাধারণের পক্ষ হইতে করজোড়ে নিবেদন—রঙ্গালয়ে যাহাতে নাট্য সাহিত্যের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা মনযোগ করুন—নচেৎ অপরেশচন্দ্রের কথাতেই বলি—"বৃথা আমরা অরণ্যে রোদন করিয়া মরিলাম—বুঝিলাম নাট্য-সাহিত্যের কপালে আর ভগবানের অভিপ্রেত নয়।"

অপরেশচন্দ্রের প্রবন্ধে একটী ভুল দেখিলাম, তিনি বলিয়াছেন 'রাবণ বধ' গিরিশচন্দ্রের প্রথম নাটক। তাহা নহে। ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দরহো বা আকবর'ই তাঁহার প্রথম রচনা।

শ্রীশ্রীশিবচন্দ্র মতিলাল।

বিলাসে স্ত্রীধর্ম্ম ব্যত্যয়

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' গৃহ, গৃহ নহে; গৃহিণীকেই গৃহ বলা হইয়া থাকে। আমরা যেমন গৃহের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলাম, জগতে অন্য কোন জাতিই তেমন করিয়া বুঝে নাই। আমাদের সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য। পাশ্চাত্য সমষ্টির সৃষ্টিকল্পনা আগে করিয়া ব্যষ্টিকে তদুপযোগী করিয়া গড়িতে চাহিয়াছিল; আমাদের শাস্ত্রকারগণ ব্যষ্টিকে যাহাতে ক্রমশঃ সম্প্রসারিত করিয়া সমষ্টিগত করা যাইতে পারে, সমগ্র সমাজটাকে তদুপযোগী বিধি ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপ সভ্যতাকে মুখোমুখি না দেখিয়া বিপরীত দিক হইতে দেখিয়াছিল। সে এখন আপনাকে বিভ্রমে পতিত বুঝিতে পারিয়াছে এবং আপনার ভ্রম-প্রমাদের জন্য অনুশোচনা করিতেছে। কিসে আপনার ঘর গোছাইয়া লইবে তাহার জন্য আকাশ পাতাল ভাবিয়া আকুল হইতেছে।

আমরা কিন্তু সাধ করিয়াই সেই ভ্রমসঙ্কুল পথেই পা বাড়াইতে যাইতেছি। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ চিকীর্ষা আমাদিগকে পিতৃপুরুষের আচরিত ধর্ম্মে এবং কর্ম্মে উপেক্ষার ভাব শিখিয়া দিতেছে। ইউরোপ অজ্ঞানকৃত পাপের ভারে বিব্রত, আমাদের এ জ্ঞানকৃত পাপের জন্য আমাদিগকে কঠোরতর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার সূচনা হইয়াছে।

দেশের, সমাজের, জগতের, সকল উন্নতির মূলে ঐ গৃহ। ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাটসিনী লিখিয়াছেন—Family and country are the two extreme points on the same line. অর্থাৎ গৃহ এবং দেশ একটী রেখারই দুইটী প্রান্তভাগ। গৃহের সেবা করিলে, রীতিমত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিলে, পরোক্ষভাবে বিশ্ব-মানবসমাজেরই সেবা করা হয়।

যখন নবীন কর্ম্মের দ্যোতনা মানবের হৃদয় আলোড়ন করে তখন সে কেমন একটু

সংযমবিহীন হইয়া যায়। মনীষী ইমার্সন বলিয়াছেন, প্রত্যেক সংস্কার কিছু স্বেচ্ছাচার বহন করিয়া আনে। আমরাও ঠিক এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি—পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার দৃপ্ত তরঙ্গ প্রাচ্যের শান্ত সৌম্য গৃহপ্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আমাদিগকে আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সুব্যবস্থিতভিত্তিতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। ভগবান বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণঞ্চপি বোদ্ধব্যং
বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং
গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।"

ক্ষণিক উন্মাদ প্রেরণার বশে অধিকতর উন্মার্গগামী না হইয়া আমরা যেটুকু বিপথগামী হইয়াছি কিসে তাহা হইতে শনৈঃ শনৈঃ উপরত হইতে পারিব, কিসে দৃঢ় ভিত্তির উপর আপনাদিগকে দাঁড় করাইতে পারিব এবং কিসে স্থিরীকৃত লক্ষ্যাভিমুখে অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত অগ্রসর হইবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করিতে পারিব, দেশের কর্ম্মযোগীগণকে তাহা এখন বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবার সময় আসিয়াছে। দেশনায়কগণ ইহাতে তৎপর হউন।

সর্ব্বাগ্রে গৃহ ঠিক করিয়া লইতে হইবে। গৃহলক্ষ্মীদিগকে উদ্বোধিত করিতে হইবে। ভাল, মন্দ সকল শক্তির কেন্দ্রস্বরূপিণী তাঁহারা। তাঁহারা জাগিলে যেমন জগতে নব জীবনের সঞ্চার হয় আবার তাঁহাদেরই ঔদাসীন্যে সমাজ শতধা চূর্ণ হইয়া যায়।

জগতের মধ্যে আমরা এখন কঠিন জীবন মরণ সমস্যায় পতিত হইয়াছি। দুর্ভিক্ষ শার্দ্দূলের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিয়া আমরা যে মুষ্টিমিত অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছি, তাহাতে কোনরূপে আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে। হইতেছেই বা বলি কি করিয়া, দেশের কয়জন লোকে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়? পেটের দায়ে মানুষ পশু সাজিতেছে, ব্যাধির প্রকোপে সোনার বাংলা ছারেখারে যাইতে বসিয়াছে। যাঁহার ধন ধান্যে ধরার অন্ন সংস্থান হইত, যাঁহার জ্ঞানালোকোদ্ভাসিত শস্যশ্যামলার একদিন জগতের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, আজ তাঁহার এ দৈন্য দশা কেন?

আমাদের মনে হয়, গৃহমাতৃকাগণের আর পূর্ব্বের ন্যায় মায়া মমতা নাই, বাৎসল্য অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। তাহার প্রবাহ দিনে দিনে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর গণ্ডীতে আবদ্ধ হইতেছে। ক্ষুধিতের মুখের দিকে না তাকাইয়া গৃহলক্ষ্মীগণ এখন আপনার ক্ষণিক সুখের জন্য ব্যস্ত। আর আপনি না খাইয়া পরকে খাওয়াইবার জন্য তেমন করিয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইতেছেন না। বিলাসবেশে বরাঙ্গ সাজাইবার জন্যই তাঁহারা এখন বিব্রত। আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে, শুনিতে পাই। স্ত্রী শিক্ষা ছিল না, এখন রাজার ঘরে সে সৌভাগ্য আমরা নূতন করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু কই? বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম সীমা পর্য্যন্ত রাশি রাশি পুস্তক পড়ান হইয়া থাকে বটে, তাহাতে কয়জনের মানুষের মত জীবনসংগ্রামে দাঁড়াইবার শক্তি জন্মে? দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিক শিক্ষার সিদ্ধিলাভ চাকুরীত্বে—পশুবৃত্তিত্বে, মানবত্বে নহে।

স্ত্রীশিক্ষার নিরর্থকতা ইহা অপেক্ষাও বেশী। পুরুষ যতটা সহজে পরকীয় ভাব আপনার পুষ্টির জন্য পরিপাক করিতে পারে, নারী তাহা পারেন না। তাঁহাদের প্রকৃতিই পুরুষের অপেক্ষা সংরক্ষণশীল। আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা তাই তাঁহাদের স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইতেছে। আবাল্য হইতে যে মাতৃভাব স্ত্রীহৃদয়ে প্রবুদ্ধ হইতে থাকে এবং পরিশেষে অন্বেষের সুশীতল ছায়ার মত যাহা সংসারাতপক্লান্ত ক্লান্ত জীবের শান্তির হেতুভূত হয়, আধুনিক সভ্যতামোদিত পাশ্চাত্য শিক্ষা স্ত্রীহৃদয়ের সেই মহনীয় মাতৃভাবের বিকাশ সাধনের সাহায্য না করিয়া তাহাকে সঙ্কোচিত করিয়া আনিতেছে। সকল ভূমিতে সকল ফল সমান ভাবে ফলে না; খ্রীষ্টের ভূমিই কমলালেবুই আবার বাঙ্গালার মাটিতে জন্মিলে জলবায়ুর প্রভাবে গোঁড়ালেবুতে পরিণত হয়। শিক্ষা-

নেতৃবর্গের এ সত্য সময় থাকিতে বিচার করিয়া দেখা শ্রেয়স্কর।

নারীগণের সুকুমার কলা কার্য্যে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন, ইহা অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু তাহাদিগকে খুব সাবধানতার সহিত ইহা শিক্ষা দিতে হইবে।

আগে তাহাদের হৃদয়ে স্বামী-সেবা, দেব-সেবা, গুরু-সেবা, সমাজ-সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবলভাবে জাগিয়া উঠে, অর্থাৎ কর্ত্তব্য জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়, শিক্ষা তদুপযোগিনী করিতে হইবে। *

তাহা হইলে, তাঁহারা বিদ্যালব্ধ কলা জ্ঞান স্বীয় ভোগ সুখের উদ্দেশে, বিলাস ব্যসনের সাধনায় অপপ্রয়োগ না করিয়া উল্লিখিত ব্রতসমূহ যাহাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তদুদ্দেশ্যেই তাহা ব্যয় করিতে প্রবৃত্তিবতী হইবেন। নতুবা সঞ্জীবনী বিদ্যা হিতোপদেশের সিংহজীবনদায়ক পণ্ডিত প্রবরের যজ্ঞরূপ মঙ্গলজনক না হইয়া নিজের জীবন নাশের কারণস্বরূপ হইয়াছিল, আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার বিষময় ফলে আমাদের সমাজদেহেরও সেই অবস্থা ঘটিবে।

আমাদের স্ত্রী জাতিকে নীতিজ্ঞানে বলবতী করিতে হইলে শাস্ত্রোক্তা রমণীগণের আদর্শানুযায়ী গঠন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে ভক্তিমতী শিক্ষয়িত্রীর হস্তে বালিকাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। স্ত্রী বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষাভার যাঁহাদের উপর অধুনা ন্যস্ত থাকে তাঁহাদের দ্বারা একার্য্য সিদ্ধ হইবার নহে, কারণ, তাঁহারা অনেকেই পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিতা। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধতীতে তাঁহাদের এরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি নাই যে তাঁহারা শিষ্যাদিগকে সেই আদর্শের অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে যত্নশীলা হইবেন। এই সমস্ত নানা কারণেই স্ত্রীশিক্ষা এদেশে ঈদৃশ বিপর্য্যয় গ্রস্ত হইতেছে। ক্ষেত্র উপযুক্তরূপে কর্ষিত হইবার পূর্ব্বেই তাহাতে বীজ বপিত হইতেছে, তাহার ফলে, সুগন্ধি গোলাপ, কাঠ-গোলাপে পরিণত হইতেছে।

ভগবান মনু লিখিয়াছেন—শয্যা, আসন ও বেশ ভূষার পারিপাট্য স্ত্রীগণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; তাই মহর্ষিরা যাহাতে অন্তঃপুরে ইহার প্রাচুর্য্য না হয় সে জন্য বারংবার স্ত্রীজাতিকে মিতবাদিনী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। †

ব্যাস সংহিতাকার কতকগুলি স্ত্রীকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রাদি পাঠ করিতে উপযুক্ত অবসর পান না, তাঁহাদের অবগতি হেতু নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

স্বামী ও স্ত্রী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ে একচিত্ত হইবেন। পত্নী সর্ব্ববিষয়ে পতি সহধর্ম্মিণী হইবেন। ভক্তিযুক্ত হইয়া স্বামীর সেবা করিলে নারীর ত্রিবর্গবিধি সাধন করা হয়। পত্নী পতির শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিবেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবেন। ‡ অতঃপর শয্যাদি যথাস্থানে উঠাইয়া মার্জ্জন

---

* Instruction, like riches can be a source of either good or evil according to the intention with which it is used. Consecrated to the general progress it is a means of civilization and of liberty, used only for personal advantage it becomes a means of tyranny and corruption.

'The Duties of Man'—Mazzini.

ম্যাটসিনী শিক্ষাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) নৈতিক (Education) এবং (২) বুদ্ধি সম্বন্ধীয় (instruction)। তিনি বলেন, ইন্দ্রিয়গুলি যেমন মনের অধীন, অথচ মনে এবং তাহারা যেমন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সাধুকার্য্যে ও পাপকার্য্যে সমভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে তদ্রূপ বুদ্ধি ও নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। এজন্য নীতিমূলক শিক্ষাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। প্রথমটি মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করে দ্বিতীয়টি তাহাকে কর্ত্তব্য সম্পাদনে দক্ষ করায়।

† যত্নে চাপ্যুক্ত বক্তব্যা নরৈ:
সংযতোপস্করাদক্ষা হৃষ্টা ব্যয় পরাঙ্মুখী।
ভূষ্যাচ্ছয়নযোঃ পাত্র বন্ধনং ভর্ত্তুরুৎসবা।
যাজ্ঞবল্ক্য।

‡ প্রথমং প্রতিবুদ্ধ্যেত চরমং সংবিশেত চ।
নিত্যকালময়ং সদ্যো এতৎ সর্ব্বমনং মম।
মহাভারতম্।

ও লেপন পূর্ব্বক গৃহ ও অঙ্গন পরিষ্কৃত করিবেন।

তদনন্তর পাককার্য্যে ব্যবহৃত ঘৃত ও তৈল নিষিক্ত পাত্রগুলি উষ্ণ জলসংযোগে মার্জ্জিত করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিবেন। যে দ্রব্যগুলি ঘুণ * ভাবে না থাকিলে কার্য্যে ব্যবহার করা যায় না, তাহাদিগকে অঘুণ-ভাবে রাখিবেন না। রান্নাঘরের থালা, বাসনাদি খুব ভাল করিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিবেন। তণ্ডুলাদি রাখিবার পাত্রগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া তাহা তণ্ডুলাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিবেন। মৃত্তিকা দ্বারা উনানের সংস্কার সাধন করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিবেন।

পূর্ব্বাহ্নের কার্য্যাদি শেষ করিয়া যাহাতে পরিবারের সর্ব্বব্যক্তির সন্তোষসাধন করা যায়, পত্নী তাহার চেষ্টা করিবেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে অভিবাদন করিবেন। মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা তাঁহাদের আদেশ পালন করিবেন। হিতকার্য্য করিতে ছায়ার ন্যায় পতির সাহচর্য্য করিবেন এবং তিনি কোন কার্য্য করিতে আদেশ করিলে দাসীর ন্যায় তাহা পালন করিবেন।

রন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া স্ত্রী স্বামীকে তাহা জানাইবেন। পরিবারের মধ্যে অন্ন-বয়স্ক ও গুরুজনদিগকে তৎপরে ভোজন করাইবেন। স্বামীর অনুমতি অনুসারে স্বামীকে ভোজ্য দ্রব্য নিবেদন করিবেন এবং পরিশেষে নিজে খাদ্য গ্রহণ করিবেন। দিবা শেষে কত আয় ব্যয় হইল তাহার হিসাব করিবেন। † সন্ধ্যা লাগিলে সাধ্যমতে (দীপ দানাদি) করিবেন। নিশাভোজন শেষ হইলে পতির শয্যা গ্রহণের পর নিজে শয়ন করিবেন।

তিনি উচ্চ কথা কহিবেন না, কটূক্তি করিবেন না এবং অতিরিক্ত কথা বা অপ্রিয় বাক্য বলিবেন না। কাহারও সহিত কলহ বা বৃথা গল্প করিবেন না। তিনি খুব বিবেচনা করিয়া কাজ করিবেন; চিত্তচাঞ্চল্য, ক্রোধ, ঈর্ষা, প্রতারণা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষভাব, নাস্তিকা, লজ্জাহীনতা, অসন্তোষ ইত্যাদি স্ত্রীধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যাদি যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিবেন।

বাঙ্গালার গৃহলক্ষ্মীগণ যদি স্মৃতি-নিয়মিত কর্ত্তব্যগুলি সুষ্ঠুরূপে পালন করিবার উপযুক্ত-রূপে গঠিত হইতেন, যদি তাঁহারা বিলাস বেশাদি স্ত্রী-ধর্ম্ম-বিরোধক কার্য্যে অথবা অর্থ-ব্যয় না করিতেন, নিজে একটু কায়ক্লেশ স্বীকার করিয়া আপনার গৃহকার্য্য দেখিয়া শুনিয়া করিতে যত্নশীলা হইতেন, তাহা হইলে আমাদের দুঃখের বহুরূপে নিরসন হইত।

কিন্তু হায়! হইতেছে কি? বিলাস ব্যসনে অন্তঃপুর ভরিয়া যাইতেছে। স্বার্থ সেখানে ভেদের আগুন জ্বালাইয়া দিতেছে। পাশ্চাত্যের মূঢ় অনুকরণ সেখানে অশ্রদ্ধা ও অভিমানের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। গৃহে অলক্ষ্মীপ্রবেশ করিলে আর কিছুতেই যুটিয়া উঠে না, সমগ্র বঙ্গদেশ এ সত্য আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। বস্তুতঃ ইহার জন্য দোষী, বঙ্গনারী নহেন, আমরাই। আমরা লক্ষ্মীর মানস-পূজা ছাড়িয়া অলক্ষ্মীর মূর্ত্তিপূজা শিখিয়াছি। ‡ এই অন্ধ পৌত্তলিকতায় অধর্ম্ম প্রবৃদ্ধ হইয়া সোনার সংসার ছারখার করিতেছে। ভগবান করুন, বঙ্গে শক্তি-সাধনা ফিরিয়া আসুক।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন।

---

* জোড়াযাতা—যেমন, জুতা, খড়ম, সিল, নোড়া ইত্যাদি—

† অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়েচৈব নিযোজয়েৎ শৌচে ধর্ম্মেঽন্নসংস্কারে পারিণাহস্য রক্ষণে।
মনু

তাহাদিগকে অর্থ সঞ্চয় কার্য্যে ও তাহার ব্যয়ে, পবিত্রধর্ম্মে এবং গৃহস্থালী রক্ষণে নিযুক্ত করিবে। মনু 'অর্থস্য' স্ত্রীর অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন।

‡ 'আদি হাজরোবিলাস না যাবাইলে তার মুখ হয় না'—সাবেকদিগের—৺চন্দ্রনাথ বসু।

ফরাসী-সাহিত্যের অষ্টাদশশতাব্দী

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নৃপতি চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর পর হইতে ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ফরাসী সাহিত্যের যে যুগ তাহা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তিচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই যুগকে আমরা সাধারণতঃ মোটামুটীভাবে "ফরাসী-সাহিত্যের অষ্টাদশশতাব্দী" নামে অভিহিত করিতে পারি। সামাজিক, রাষ্ট্র-নৈতিক, সাহিত্যিক,—সকল বিষয়েই এই যুগের একটী অনন্যসাধারণ ধর্ম্ম বা বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্র ও স্বায়ত্ত-শাসন, রোমান ক্যাথলিক মতবাদের গোঁড়ামী ও সর্ব্ব ধর্ম্মে সমদর্শিতা প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী মতবাদসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয়-সাধনই এই যুগের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। অষ্টাদশ-শতাব্দীর শেষভাগে ও পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের সামাজিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত অভিনব ও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, তৎসমুদয় হঠাৎ এক দিনেই নিতান্ত অতর্কিতভাবে ও অনায়াসে সংঘটিত হয় নাই; উহা ফরাসী-সাহিত্য-সেবিগণের যুগব্যাপী অক্লান্ত ও অকৃত্রিম সাহিত্য-সাধনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সপ্তদশশতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্য সুনিপুণ কারিকরের কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হইলেও উহা সম্পূর্ণ প্রাণহীন;—খাসলোবাকী বাবুয়ানা পরিচ্ছদের ন্যায় ফরাসীর জাতীয় জীবনের সহিত উহার সম্বন্ধ অতি সামান্য। কিন্তু অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্য নিখুঁত কারুকার্য্যের হিসাবে পূর্ব্বগামী যুগের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী না হইলেও উহা বাস্তব-জীবনের অনন্ত উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত। এই হিসাবে সপ্তদশ-শতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্যকে "স্থিতিশীল" (Static) বলিলে অষ্টাদশশতাব্দীর সাহিত্যকে "গতি-শীল" (dynamic) আখ্যাপ্রদান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। এই গতির বেগ আমরা প্রথম প্রথম তাদৃশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু কালক্রমে এই অলক্ষ্য ক্ষুদ্র শক্তিই লোক-নয়নের অন্তরালে বিবিধ শক্তি সংগ্রহপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে বেগবতী স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করতঃ পরিণামে সমস্ত বাধা বিঘ্ন সমূলে উৎপাটিত করিয়া জগতের ইতিহাসে নিজের স্থান নিজেই অধিকার করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল। অষ্টাদশ-শতাব্দীর ফরাসী-সাহিত্যিকগণ বিবিধ সুপক্ক কুসুমে সাহিত্যোদ্যান সুসজ্জিত করিলেও চিন্তা-জগতে তাঁহারা যে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে বাস্তবিকই তাহা সম্পূর্ণ তুলনা-বিহীন।

উপরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি বিষয়ক যে পার্থক্যের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, প্রকৃত-প্রস্তাবে নৃপতিশ্রেষ্ঠ চতুর্দশ লুইর মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই সেই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ লেখক La Bruyere তদানীন্তন ফরাসীস্ সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে যে সকল অন্যায় অত্যাচার ও অমঙ্গলের ছায়াদর্শনে সন্ত্রস্ত ও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীযুগের লেখকগণ তৎসমুদয় কর্ত্তৃক সমধিকভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর লেখকগণের মধ্যে ক্যাম্ব্রে সহরের ধর্ম্ম-যাজক সুপ্রসিদ্ধ ফেনেলনই (Fenelon, ১৬৫১-১৭১৫ খ্রীঃ অঃ) সর্ব্বপ্রধান। পৌরহিত্য-ব্যবসায়ী সাহিত্যিক একদিকে যেমন রাষ্ট্র-নীতির গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহার রচনাভঙ্গীও সেইরূপ স্বচ্ছ, সরল ও অতীব মনোজ্ঞ। ফেনেলন্ ফরাসী সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী বুর্গোর রাজ-কুমারের (Duc de Bourgogne) গৃহ-শিক্ষক ছিলেন এবং ইঁহাকেই রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই সুপ্রসিদ্ধ টেলিম্যাক্

(Télémaque) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে রাজ্যশাসন বিষয়ে রাজার কর্ত্তব্য-সমূহ অতি সহজ ও সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ফেনেলন্ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শুধু বজ্রমুষ্টিতে প্রজা-শাসন করিতে পারিলেই রাজার কর্ত্তব্যের শেষ হইল না; প্রজাসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনেই রাজার রাজত্ব;—যে রাজা ইহা না পারেন, তিনি রাজপদ-লাভের যোগ্য নহেন। চতুর্দ্দশ লুইর অনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাচার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল, ফেনেলনই তাহার সর্ব্বপ্রথম আভাস প্রদান করেন। উপযুক্ত ছাত্র ও শিক্ষকের এই মহতী নীতি সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং ভরসা করা যায় যে তিনি ফরাসী রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে হয়তো ফরাসীবিপ্লব-জনিত নরশোণিতস্রোতে ধরাপৃষ্ঠ কলঙ্কিত হইত না। কিন্তু লীলাময়ের লীলা বুঝা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। সিংহাসনলাভের পূর্ব্বেই বুর্গোর রাজকুমার অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন,—ফেনেলনের সমুদয় চেষ্টা ও যত্ন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বিফলীকৃত হইল।

রাষ্ট্র-নৈতিক মত বিষয়ে ফেনেলন্ যুগ-ধর্ম্মের অগ্রদূত হইলেও, ধর্ম্মমত বিষয়ে সম-সাময়িকগণের সহিত তাঁহার বিশেষ কোনও মিল ছিল না। ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে গভীর সন্দেহ ও বদ্ধমূল অবিশ্বাসই অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী জাতির সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব; কিন্তু ফেনেলন্ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোনও প্রকার বিদ্বেষ না থাকিলেও প্রচলিত রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল।

ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে এই যে একটা অভক্তি ও অবিশ্বাসের ভাব, চতুর্দ্দশ লুইর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহা অল্পাধিক পরিমাণে আত্মপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছিল। ফণ্টেনেল্ (Fontenelle) নামক একজন প্রসিদ্ধ লেখক ১৬৮৭ অব্দে Histoire des Oracles নামে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন ব্যপদেশে প্রচলিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের অতি প্রাকৃত মূল প্রকৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে ফণ্টেনেল্ একক ছিলেন না। Histoire des oracles প্রকা-শের দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৯৭ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ Bayle's Dictionary প্রকাশিত হয়। যে সমস্ত মতবাদ ফণ্টেনেল্ স্বাধীন ভাবে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিতে সাহসী না হইয়া শ্লেষের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বেইল্ তদীয় যুগবিপ্লবকারী "অভিধানে" অতি সরল ও সুস্পষ্ট ভাষায় এবং সম্পূর্ণ নির্ভীকচিত্তে তৎসমুদয়েরই আলোচনা করিয়াছেন, বেইলের গ্রন্থ অতি প্রকাণ্ড ও বহু তথ্য পরিপূর্ণ হইলেও তাঁহার রচনাভঙ্গী তাদৃশ মনোহারী নহে; কিন্তু তথাপি পরবর্ত্তী লেখক সম্প্রদায়ের উপর ইহা অসামান্য ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হইয়া-ছিল। অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসী লেখকগণ যে সাহিত্যসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে বেইল্ প্রণীত এই "অভিধান" গ্রন্থ সদাসর্ব্বদাই অক্ষয় তূণস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চতুর্দ্দশ লুইর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্ব হইতেই ফরাসী জন-সাধারণের মধ্যে তদীয় রাজ্যশাসন প্রথার বিরুদ্ধে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া-ছিল; কিন্তু লুইর মৃত্যুর পরেও কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহা তাদৃশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিতে পারে নাই। অবশেষে ১৭২১ খৃঃ অব্দে ফরাসী সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ মণ্টেস্কিউ (Montesquieu) Lettres Persanes নামে তদীয় অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচার করেন। এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত নূতনভাবে ও নব উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ ও অনুপ্রাণিত। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে যে ভাব ও ধারণা সমগ্র ফরাসীজাতির হৃদয় যুগপৎ আলোড়িত ও বিমথিত করিয়াছিল, তৎ সমুদয়েরই মূল বীজ এই গ্রন্থমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যদেশাগত জনৈক পর্য্যটক ফরাসী রাজ্যের রাজধানী প্যারী-নগরীতে

[illegible]

[illegible] ব [illegible] মিলন।

এ সম্মিলনের ব [illegible] হইতেছে

[illegible] দেশের সাহিত্য। এখানে-

মই প্রকাশ পাবে। কবিগীতিকা নিজের

অন্তরতম [illegible] হইতেছে মানব বিষয় ও হৃদয়-

তত্ত্ব। [illegible] প্রকাশের সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাষাতে

বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই কল্পনা-[illegible]

পারলৌকিক পরিচ্ছেদের ভ্রমণবৃত্তান্তগুলিতে মধ্যেমধ্যে

কিউ চতুর্দশ পুরুষ সময় বাক্যশাসন প্রথা

অতি তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি ভাষায় বর্ণন

করিয়াছেন রাজকর্মচারী ও রাজানুচর-

বৃন্দের অবিশ্রাম্য উক্তি সম্বন্ধে, অভিজাত

সম্প্রদায়ের বাহ্যিক রক্ষিত অধিকারো-

ভোগ, রাজদ্বের সম্বন্ধে অপরোক্ষভাবে, ভেজা

চার বাহ্যের প্রতিজ্ঞাবাক্য—এগুলি

লেখকের তীব্রদৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই

অনির্দেশ্য মাহাত্ম্যের দোষ বর্ণনায় কিরি

রেরূপ নিপুণ ছিলেন, আদর্শ রাজ্যশাসন-

প্রথা কিরূপ হওয়া উচিত তাহার সবিস্তার

আলোচনা ও বিচারেও মন্টেস্কিউ সেইরূপ

গভীর নিপুণতা ও বিশ্লেষণক্ষমতার পরিচয়

প্রদান করিয়াছেন। বর্ণমত বিষয়ে অষ্টাদশ

খণ্ডাদীর যে বিশেষ উপর উদ্ভিত্তি

হইয়াছে, এই পুস্তকেও তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়

পাওয়া যায়। মন্টেস্কিউর মতে কোনও

প্রকার ধর্মবিশ্বাসের সহিত রাজ্য বা রাজ-

নীতির রাষ্ট্রনীতির কিছুমাত্র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই

বা থাকাও উচিত নহে তবে রাজশাসনের

সুবিধার জন্য অন্যান্য ক্ষমতার সহ এই

ক্ষমতার পরিচালনও রাজার পক্ষে সময়ে সময়ে

প্রয়োজনীয় হইতে পারে। (He regards

it rather as one of the functions of

administration rather as an inner

spiritual force) কোনও প্রকার গোঁড়ামী

বা ধর্মবিদ্বেষ মন্টেস্কিউর হৃদয় স্পর্শও

করিতে পারে নাই।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত জটিল ও

দুরূহ আকার হইলেও, মন্টেস্কিউ অতি

সরল, সরস ও সকলের বোধগম্য ভাবে ও

ভাষায় আলোচ্য বিষয়ের যথাযথ বিচার

[illegible] পরিচ্ছেদে

[illegible] স্বাধীনতার

ও রাজনৈতিক [illegible] প্রবন্ধের

[illegible] বা কুটীর [illegible] মাত্র [illegible]

সময়ে [illegible] সুখ আবরণে

বিষয় আচ্ছাদিত [illegible] যাহা

মুক্তবিহঙ্গ পাঠকমাত্রই, অতিশয় সা-

রিক প্রণালীতে পরিচ্ছেদ,

পরিচ্ছেদে [illegible] ন

চতুর্দশ পুরুষে [illegible]

ইউরোপের [illegible] অধিষ্ঠিত ছিল

নীতিবিশারদ [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

চতুর্দশ পুরুষ রাজত্বকালই সর্বপ্রধান কারণ

ও প্রধান লাভের মূলাধার। বিশেষত

[illegible] কিন্তু চতুর্দশ পুরুষ [illegible]

সঙ্গে রাজপরিবারের [illegible]

ভাবে চতুরতাবলম্বী হইলেন। [illegible]

পরী [illegible] [illegible] কেহই যে এক

অংশে চতুর্দশ পুরুষ সমকক্ষ ছিলেন না

[illegible] চতুর্দশ পুরুষ অনুকরণে [illegible]

[illegible] প্রাসাদে আসিয়া [illegible]

যাহা তুলিতে সাহসী হন নাই, তাঁহারা একদে

রাজপ্রাসাদের বন্ধনমুক্ত [illegible]

হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং স্ব স্ব কচি ও

প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দলের সৃষ্টি

করিতে লাগিলেন। রাজপরিবারের [illegible]

বর্তমানে নিজস্ব [illegible] [illegible] [illegible]

লাভ করিয়া অনেকে আবার বাল-সুলভ

সরলতার পরিচয় প্রদানেও দ্বিধা বোধ করিলেন না। এইরূপে সমাজশরীরে নূতন

শক্তির সঞ্চার হওয়ায় নিয়ম-প্রণালী

ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

প্রেরন হইত। তিন সময়ে ফরাসী সাহিত্যাকাশে সাত এক শ্রেণীর লেখকের উদয় হয়। রাজাকে গ্রন্থ পড়িয়াই লেখকদিগকে উৎসাহ বা প্রতিপত্তির জন্য জনসাধারণের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না;—তিনি বৃদ্ধি ও লিপি কৌশলের চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিতেই সাধ্যমতে তাঁহাদের সকল যত্ন ও চেষ্টার পর্য্যবসান হইত। কিন্তু রাজদরবারে এক্ষণে নবীন;—অভিজাত সম্প্রদায় ক্ষেত্রচ্যুত হওয়া বিভিন্নদলে বিচ্ছিন্ন, সুতরাং নবীন লেখকগণ সেদিকে আশানুরূপ সফলতা লাভের আশা না দেখিয়া লেখনী-হস্তে জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; ফরাসী জনসাধারণ যাহাতে অনায়াসে তাঁহাদের লেখা পড়িয়া সহজে বুঝিতে পারে সেইরূপ সরলভাবে ও সকলের বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে ইহাঁরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ করিলেন। জনসাধারণের মনোরঞ্জনই যে সুখের উদ্দেশ্য, সে সময়ে বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের জটিল তথ্যপূর্ণ গ্রন্থের প্রণয়ন সঙ্গতপর নহে এবং বাস্তবিকই অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসীসাহিত্যে আমরা এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচারও দেখিতে পাই না। জনসাধারণ যাহাতে অনায়াসে আমোদ আহ্লাদের সহিত পুস্তক পাঠ করিয়া উহাতে ও উপকৃত হইতে পারে, অতঃপর সেইরূপ ভাবেই পুস্তক রচিত হইতে লাগিল এবং ইহাই অষ্টাদশশতাব্দীর ফরাসীসাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব।

অষ্টাদশশতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ফরাসী চিন্তারাজ্যে মণ্টেস্‌কিউর আধিপত্য ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ Considérations Sur [illegible] des [illegible] প্রভৃতি ও অবশিষ্ট [illegible] প্রাচীন [illegible]

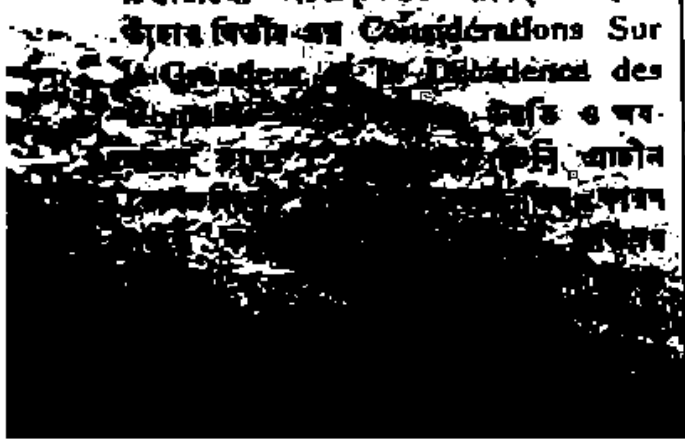

ফরাসীসাহিত্যে যত ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, সকলেরই মূলভিত্তি এই গ্রন্থের উপর সংস্থাপিত করা হইয়াছিল। কিন্তু মণ্টেস্‌কিউ এই গ্রন্থে কোন সময়ে কোনও মতবাদের অবতারণা না করিয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলির প্রকৃতির কারণ পরম্পরায় অবস্থাভেদে ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন।

১৭৪৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ L'Esprit des Lois প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার এই অসামান্য অধ্যবসায় কিছুমাত্র বিফল হয় নাই—কারণ আজ পর্য্যন্তও এই গ্রন্থই সমগ্র সভ্যসমাজে তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনীয় নহে—কারণ উহা খাঁটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক। তবে এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই পুস্তকে মণ্টেস্‌কিউর যাবতীয় বিশেষত্ব,—তাঁহার অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, অল্প-বিস্তর-হীনতা, যুক্তিপ্রিয়তা, স্বাধীনতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, ও সর্ব্বপ্রকার গোঁড়ামীর প্রতি আন্তরিক ঘৃণা, তীক্ষ্ণধার শ্লেষ ব্যবহারে অনন্যসাধারণ নিপুণতা—সমস্তই পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থের রচনা-প্রণালী ও বিষয়-বিন্যাস সম্পূর্ণ মৌলিকতার পরিচায়ক হইলেও, উপনীত সিদ্ধান্তসমূহ অনেক স্থলেই নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলণ্ডীয় রাজ্যশাসন প্রথা সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত মতবাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মণ্টেস্‌কিউর বিশ্বাস ছিল যে ইংলণ্ডে শাসন, বিচার ও আইন প্রণয়ন বিভাগ, সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে। এই তিনের সুষম সামঞ্জস্যেই ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র গঠিত। মণ্টেস্‌কিউ ইহা বুঝিতে পারেন নাই। এই সুশাসনের জন্য এই তিন বিভাগের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ নিতান্ত আবশ্যক, পূর্ব্ব হইতেই মণ্টেস্‌কিউর এই ধারণা ছিল এবং এই নির্দ্দিষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইংলিশশাসনতন্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়ায় [illegible] ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন [illegible] আমেরিকার যুক্তরাজ্যের

রিকার ঔপন্যাসিক ইংরাজের
অনানতাপেক্ষ ছিল না।
হ করেন, তখন তাঁহার
হইলেও মন্টেস্কিউ
লেখক বড়ো বিখ্যাত
সুকুমারতার সাহিত্যের
আর্থে প্রাচীন ও
প্রচলিত আছে।
রূপ নিপুণতা
থাকে

যে সময়ে মন্টেস্কিউর Letters Persa
প্রথম প্রকাশিত সেই
ফরাসী সাহিত্য-গগনে আর একজন
আবির্ভাব হয়। ইহার নাম ভলটেয়ার।

কিন্তু সত্য সত্যই ভলটেয়ার্ (Voltaire) নামেই তখনকার উপন্যাসে ইংরেজ-প্রভাব মন্টেস্কিউর পৌঁছিবার স্থান হইতে হইয়াছিল। আ
কিন্তু, যে সমস্ত পুস্তক লিখিয়া ভলটেয়ার প্রথমে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, এখনে তাহাদের বিস্মৃত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি প্রথমে সাহিত্যজগতে দেখা দিয়াছিলেন—বিয়াদনহা কবিতাতেই (Oedipe) ফরাসী সাহিত্যে তাঁহার নাম রটিয়া উঠে; কিন্তু সে সব কবিতা আজকাল আর কেহ পড়িয়া দেখে না। নাটক লিখিয়াও তৎকালে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু যে যে কারণে এই সমস্ত নাটক তৎকালে সাধারণের হৃদয়কে অধিকার করিত, ঠিক সেই সেই কারণেই লোকসমাজে আজ আর তাহাদের আদর নাই। নাটক-প্রণয়নে ভলটেয়ার-কবিগণের মনোবৃত্তিসাধারণের দিকেই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল—প্রকৃত মানবচরিত্র চিত্রাঙ্কনে তাঁহার ক্ষমতা আদৌ ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সমসাময়িক ফরাসীগণ ভলটেয়ারকে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার Racine এর তুল্য সম্মান প্রদান করিয়াছিল। এই সমস্ত নাটকের চরিত্রাঙ্কন ও কবিতা—উভয়ই নিম্নশ্রেণীর। স্থানে স্থানে শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য পরিলক্ষিত হইলেও কোথাও প্রকৃত কবিত্বশক্তির চিহ্ন দেখা যায় না।

ভলটেয়ার্ ইংলণ্ডে
সুপরিচিত
যেমন
কবিতায় ও
প্রকৃত ঔপন্যাসের
পরিণতি ভলটেয়ার্
আসল শিক্ষক
তাহার

প্রশংসা করিতে হয়।

তাঁহাদের প্রশংসার

কারো, বক্তৃতাবলী, নাটক, ইতিহাস, এমন
সকলেরও লিখিয়াছিলেন তাহাদের
সকলে উঁহাদের
সকলেই হইল। কিন্তু কোন
পুস্তকের জাতীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভের সম্ভব
হয় নাই। উহার কারণ আর কিছুই নহে
প্রতিভাবান ভলটেয়ারের অসাধারণ
শক্তিবলে যাহাই করিয়া থাকুন ছিলেন, ওই
সকল পথের কোনটিতেই তাঁহার সম্যক্
সুযোগের সুবিধা নাই। ভলটেয়ার্ যেন
এই প্রকার প্রতি পাতনার অন্বেষণেই
উপস্থিত হইয়াছিলেন। যে
অনুকরণের যাহার সন্ধান দিতে নাই, একটী
সামান্য ঘটনাতেই হঠাৎ সেই প্রতিভার
উদ্বুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার বয়স যখন
তিন বৎসর, তখন কোনও সম্ভ্রান্ত
সহিত বিরাম হওয়ায় ভলটেয়ারের
পরিত্যাগ করিয়া প্রায় তিন বৎসর
ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতে হয়। এই তিন
বৎসর-ব্যাপী ইংলণ্ডের অবস্থিতি তাঁহার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের উপর এক অদ্ভুতপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উভয় দেশে বাহ্যিক্যাপী যুদ্ধের ফলে পরস্পর পরস্পরের কাছে অপরিচিত-প্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং ভলটেয়ার যখন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন, তখন ইংলণ্ড সম্বন্ধে তাঁহার মনে

৫। শিক্ষা ও বেকারত্ববোধ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] আমরা উত্তরবঙ্গের [illegible] একটী ছোটখাট চিত্র প্রদান করিলাম, উত্তর বঙ্গের অন্যান্য জেলার চিত্রও ইহার সাদৃশ্যে [illegible] আশাপ্রদ হইবে বলিয়া মনে হয়।

যখন দেশের অন্যান্য অনুন্নত সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার অমৃত ইক্ষু স্রোতধারা, তখন অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার উজ্জ্বলালোক বিস্তার করিতে হইলে কিরূপ প্রবল উদ্যম প্রয়োজন, তাহা আমরা সকলকেই তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয় সমিতির সভ্যদিগের মধ্যে ধনবল ও জনবলের অভাব নাই। ইঁহারা চেষ্টা করিলে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। আমরা উদ্যম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা তাঁহাদিগের অর্থের এক ক্ষুদ্রাংশ স্বজাতির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে নিয়োগ করুন। অন্যান্য বন্ধুর সাহায্য বিতরণের সহিত আমরা জানিতে চাই, কয়টি সমিতি স্বদেশ ও স্বজাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অন্ততঃ একটিও নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন, অধুনা শিক্ষালাভে যেরূপ স্পৃহবতীর মধ্যে নিবদ্ধ আছে, চিরদিনই এইরূপ থাকিবে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক, অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণের সহায়তায় একাধিপত্য বিস্তার করিবেন, তবে তাহাদিগকে নিতান্তই ভ্রান্ত বলিতে হইবে। তাহারা বিস্তৃত জ্ঞানিবেন, চতুর্দ্দিকের বর্দ্ধিষ্ণু অজ্ঞতার [illegible] বিদূরিত না করিলে প্রবল [illegible] উন্নত না হইলে [illegible] তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া [illegible]

[illegible] তাঁহারা শিক্ষাবিস্তারে [illegible] সমর্থ হইবেন। এই কার্য্যেই আত্মোন্নতির [illegible] মাত্র অভিজাতবর্গের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিণত করিতেছেন। উত্তরবঙ্গের ক্ষত্রিয়সমিতির সভ্যগণের মধ্যে যাঁহাদিগের অর্থ আছে, যাঁহারা সামাজ পরিমাণেও শিক্ষার গৌরব উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহারা এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া পুরুষানুক্রমে আদৃত অভিধান পৃষ্ঠার সমস্ত দেশকে শিক্ষার উদ্বুদ্ধ করুন।

রঙ্গপুর দর্পণ।

৬ সাধারণ রোগে সহজ মুষ্টিযোগ

দুধতোলা বদহজমে

ছেলেদের দুধতোলা, বদহজম এবং হঠাৎ পেট ভক্ত তরল ভেদে—প্রত্যূষে বা বৈকালে খালি পেটে চুণের জল তুলসী সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ ফল দর্শে মাত্রা হইতে ৬০ ফোঁটা।

ছেলেদের ক্রিমি রোগেও চুণের জল মহৌষধ; মাত্রা ১০ ফোঁটা হইতে ৬০ ফোঁটা। নবণ জোয়ান এক সঙ্গে চূর্ণ করিয়া বা ঘোটিয়া গুড়ের সহিত প্রাতে বা রাত্রে খাইলে সকল প্রকার ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হয়।

পলাশপাপড়ার গুঁড়া ১০ আনা, বয়মানি সমানি ৮০ আনা, লবণ ১০ আনা, নাগেশ্বর ১০ আনা মিশ্র একত্রে খাইলে ক্রিমি নবযৌবন নাশ হয়।

আনারসের পাতার রস এক কাঁচা মাত্রায় উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন সেবন করিলে [illegible] হইলে, বয় ক্রিমি বিশেষতঃ ছোট ক্রিমি নির্গত হইয়া যায়।

পাহাড়ের গাছের পাতার রস ১০ তোলা [illegible] দিন সেবন করিলেই ক্রিমি [illegible]

মেদিনীপুর হিতৈষী